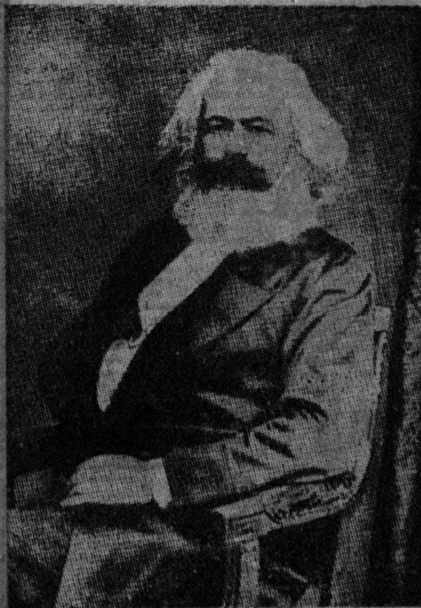


জার্মান সাহিত্যের চিরায়ত পাঠ





এম, সি, সরকার
অ্যাণ্ড সন্স প্রা: লি:

জার্মান সাহিত্যের
চিরায়ত পাঠ

সংকলক : ভলফ্‌গ্যাং ল্যাঙ্গেনবুচার
উপক্রমণিকা : ফ্রাংক আউয়েরবাচ
সম্পাদকীয় টীকা : হ্যারো হিলৎসিংগার

অনুবাদক : সুশীল রায়

This is a co-production of
Horst Erdmann Verlag & Co.
Tübingen, West Germany
and
M. C. Sarkar & Sons Private Ltd
Calcutta-12 India

জার্মান সাহিত্যের চিরায়ত পাঠ

মধ্যযুগ

থেকে

বর্তমান কাল

এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

প্রকাশক : সুপ্রিয় সরকার
এম সি সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট : কলিকাতা-১২

প্রথম সংস্করণ : আশ্বিন ১৩৪৯

Bengali Translation
of
Classical Readings from
German Literature

মুদ্রক : পরাণচন্দ্র রায়
সনেট প্রিণ্টিং ওয়ার্কস
৪ সি, ঈশ্বর মিল লেন, কলিকাতা-৬

মুখবন্ধ

এই বইয়ে পাঠকেরা মধ্যযুগে জার্মান সাহিত্যের সূত্রপাত থেকে আরম্ভ ক'রে একবারে আমাদের কাল, অর্থাৎ বিংশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত সমস্ত বিবরণ পাবেন। গত দেড় হাজার বছর ধরে জার্মান চিন্তাধারার ও সৃজনশীল রচনার যে প্রসার ঘটেছে, এখানে তা পরিপূর্ণভাবে পর্যালোচনা করা হয়েছে। কিন্তু এ বই সাহিত্যের তথ্যগত ইতিহাসই নয়। পাঠকেরা যাতে মূল রচনার মুখোমুখি হয়ে, কিংবা উপযুক্ত অনুবাদের মধ্যে দিয়ে, জার্মান সাহিত্যের সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে পরিচিত হতে পারেন তার চেষ্টাই এখানে করা হয়েছে।

এই বিস্তৃত সময় ধ'রে সৃজনশীল রচনার ঐশ্বর্যমণ্ডিত যে বিশাল ভাণ্ডার গড়ে উঠেছে, তার থেকে দৃষ্টান্ত হিসাবে আমরা শতাধিক তাৎপর্যপূর্ণ রচনার নিদর্শন উপস্থাপিত করেছি। জার্মানী থেকে সকলে যখন অন্যত্র চলে যাচ্ছে তখন দুই ব্যক্তির মধ্যে যা দ্বৈত সংগ্রাম হয়েছিল সপ্তম শতকে লিখিত সেই বীরগাথা হিলডেব্রানডের গান থেকে আরম্ভ করে গটফ্রায়েড বেন, বারটোলট ব্রেশ্‌ট, ফ্রান্‌ৎস কাফকা ও টমাস মান্‌ প্রমুখ একালে স্বনামধন্য প্রতিনিধিবর্গের রচনা এ'তে সংকলিত হয়েছে। আমরা অনেক 'ক্লাসিক' বা চিরায়ত সাহিত্যের নিদর্শন উদ্‌ধৃত করেছি যাতে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের পাঠক জার্মান সাহিত্য সম্বন্ধে সম্যক্ ধারণা করে নিতে পারেন; সেইসঙ্গে আমরা এমন সব রচনাও ব্যবহার করেছি সেগুলির প্রতি সাধারণত অনেকের নজর পড়ে না; অথচ, জার্মান সাহিত্য প্রকৃত পক্ষে কি—সে সম্বন্ধে সকলের ধারণা পরিপূর্ণ ও পরিষ্কার হতে হলে সেসব রচনার সঙ্গেও পরিচিত হওয়া দরকার, এই কথা বিবেচনা করে আমরা সেইসব রচনা থেকেও এখানে উদ্‌ধৃত দিয়েছি। এইজন্যেই আমরা দার্শনিকদের, বৈজ্ঞানিকদের, রাজনীতিবিদ্‌দের ও প্রচারবিদ্‌দের বক্তব্যও এখানে তুলে দিয়েছি: সেইসঙ্গে দিয়েছি কবিতা, নাটক ও মহাকাব্য রচয়িতাদের রচনাও।

জার্মান সাহিত্যের সঙ্গে ভালোভাবে পরিচিত হবার প্রথম সুযোগ অনেকেই এই বই থেকে পাবেন। এই জন্যেই আমরা এই বইয়ে সাম্প্রতিক কালের রচনার উপরেই বেশি জোর দিয়েছি, এবং সাহিত্যের ইতিহাস সম্বন্ধে ব্যাখ্যামূলক বিবরণও যোগ করেছি। যাঁরা জার্মান সাহিত্যের সঙ্গে আগে থেকেই পরিচিত আছেন তাঁদেরও এই সংকলনগ্রন্থটি অনেক নূতন তথ্য জোগান দিতে পারবে।

এই বইটিকে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রথম ভাগে ৭০০ থেকে ১৭০০ সালের জার্মান সাহিত্যের বিশ্লেষণ দেওয়া আছে—মধ্যযুগের পুরাতন ও একাদশ থেকে পঞ্চদশ শতকে ব্যবহৃত তৎকালীন ঐশ্বর্যময় জার্মান সাহিত্যের কথার সঙ্গে মানবতাবাদী সংস্কারবাদী যুগের সাহিত্যের কথাও যেমন বলা হয়েছে, সেই সঙ্গে জটিল ও উদ্ভট সাহিত্যের প্রসঙ্গও দৃষ্টান্তসহ আলোচিত হয়েছে এই ভাগে। দ্বিতীয় ভাগ (১৭০০-১৭৯০) কেবল সংস্কারমুক্তি বিষয়ক সাহিত্যের আলোচনাতেই সীমাবদ্ধ, যা নাকি ক্লাসিসিজ্‌ম্ বা চিরায়ত সাহিত্যের পথ প্রশস্ত করে দিয়েছে। তৃতীয় ভাগ গেটের যুগ (১৭৭০-১৮৪০), এখানে স্টার্ম উণ্ড ড্রাং (ঝড় ও ঝোঁক), ক্লাসিসিজম্ ও রোমান্টিসিজম্ প্রভৃতির রচনাশৈলী নিয়েই আলোচনা করা হয়েছে। চতুর্থ ও পঞ্চম ভাগ যথাক্রমে উনিশ ও বিংশ শতকের সাহিত্যের আলোচনা—এ'তে উভয় দশকের কাব্যের গতিপ্রকৃতির পার্থক্য, ও প্রকাশভঙ্গির পরিবর্তনের বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে। প্রত্যেক যুগের কথা আরম্ভ করার আগে সেই যুগের বৈশিষ্ট্য বুঝিয়ে দেবার জন্যে উপক্রমণিকায় খুঁটিনাটি করে সব কথা বলা আছে, এবং লেখক সম্বন্ধে ও তাঁর রচনা সম্বন্ধে ব্যাখ্যামূলক বিবরণ দেওয়া হয়েছে। এই রকম যে সব উপক্রমণিকা এই গ্রন্থে দেওয়া হয়েছে, তা একত্র করলে জার্মান সাহিত্যের একটা পূর্ণ ইতিহাসই পাওয়া যাবে।

এ ছাড়াও, এই গ্রন্থে সংকলিত রচনাসমূহ এমন অভিনব প্রমাণ দেবে যে, জার্মান সাহিত্য সুদীর্ঘ কালের ঐতিহ্য বহন করে আসছে, যে সাহিত্যে মানবিকতাবোধ আছে, সমাজব্যবস্থার সমালোচনা আছে, এবং যে সাহিত্য কখনো-বা উগ্র, কখনো-বা বৈপ্লবিক।

ভালথার ফন ডার ভগেলওয়েড থেকে আরম্ভ করে বারটোল্‌ট ব্রেশট বা কুর্‌ট টুচলস্কি পর্যন্ত আমরা অনেক রকম চরিত্রের সাক্ষাৎ পাই— যাঁরা সাহসের সঙ্গে যুক্তিবোধের সঙ্গে দেশের ও দশের মঙ্গল সাধনের জন্যে তাঁদের সর্বশক্তি নিয়োগ করেছেন, এর জন্যে তাঁদের ব্যক্তিগত পরিণাম কী হতে পারে তার জন্যে চিন্তিত ছিলেন না।

পুরাতন আমলের যেসব রচনাদির উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে তার থেকেই বোঝা যায় যে, লেখকেরা স্বাধীনতার জন্যে কী ভাবে সংগ্রামী হয়ে উঠেছিলেন, এবং দেশের মানুষের প্রতি তাঁদের দায়িত্ববোধ তাঁদের কীভাবে সক্রিয় করে তুলেছিল। অন্য কয়েকটি রচনা থেকে আমরা অভিজাত সম্প্রদায়ের ও উঠতি-মধ্যবিত্তের মধ্যে সংঘর্ষের বিবরণ পাই। সংস্কারমুক্তি-আন্দোলনের সময়ের লেখকেরা তাঁদের চিন্তার এমন বিশিষ্টতা দেখিয়েছেন, যা ভবিষ্যৎকাল অতিক্রম ক'রেই যেন দৃষ্টি প্রসারিত করে চলার মতন। উনিশ শতকে আমরা সামাজিক ন্যায়পরায়ণতার কথা ও গণতান্ত্রিক আত্ম-প্রত্যয়ের কথা শুনতে পেয়েছি, এবং বর্তমান কালেও লেখকরা যা চান তার মুখ্য বিষয়টি হচ্ছে মানুষের জীবনধারণের উপযোগী একটা ব্যবস্থার পত্তন।

সমগ্র ভাবে দেখতে গেলে এই সাহিত্য জার্মানীর ইতিহাস তার প্রাণশক্তি, তার সংস্কৃতি এবং তার সামাজিক পরিবর্তনের সাক্ষ্য। প্রকৃত সাহিত্য হচ্ছে তা'ই যা একালের ও এখনকার যাবতীয় বাস্তবতার সম্মুখীন হয়ে তার সব সমস্যা মেলে ধরতে পারে, সেখান থেকে সরে গিয়ে গজদন্তমিনারে আশ্রয় নিয়ে যা নাকি সৌন্দর্যের ও শিল্পের দ্বারা মণ্ডিত হয়ে বসে থাকে না।

এফ. এ.

সূচীপত্র

৭০০–১৭০০

১৭০০–১৭৯০

বিংশ শতক :

জার্মান সাহিত্যের চিরায়ত পাঠ

900-5900

উপক্রমণিকা

জার্মান কবিতার সূচনা হচ্ছে টিউটনদের আমল থেকে, খ্রীষ্টধর্ম প্রসারের আগে থেকে, অষ্টম শতকে। কিন্তু সেই আমলের কোনো জার্মান কাব্যসাহিত্যের কোনো নথি একালে আমাদের হাতে এসে পৌঁছয়নি, তার কারণ সে কাব্য মুখে-মুখেই চলত, লিখে রাখার ব্যবস্থা তখন হয়নি। অবশ্য, পরবর্তীকালে এর কিছু কিছু লিপিবদ্ধ করে রাখা হয়।

সে সময়ে জার্মান উপজাতি ইউরোপের বিরাট ও বিস্তৃত অংশে ছড়িয়ে পড়েছিল। কোনো বিশেষ বড় রকমের রাজনৈতিক দলে তারা দলবদ্ধ ছিল না। তাদের মধ্যের একমাত্র যোগসূত্র ছিল তাদের ভাষা এবং তাদের সামাজিক রীতিনীতি। তাদের ধারণায় বহুবিধ দেবতার কল্পনা ছিল, জীবনের বিভিন্ন স্তরে ও বিভিন্ন কর্মধারার সঙ্গে এইসব দেবতার অস্তিত্ব যুক্ত করে রাখা হত। কিন্তু এই সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের উপরেও যার স্থান দেওয়া হত তা হচ্ছে সেই নির্মম ও রহস্যময় নিয়তি বা অদৃষ্ট—মানুষ মাত্রকেই যাকে স্বীকার করে নিতে হবে, এবং শেষ পর্যন্ত যার কাছে মানুষকে নতিস্বীকার করতেই হবে।

এই জার্মান উপজাতির মধ্যে যার প্রাধান্য ছিল সে হচ্ছে মানুষ। এই মানুষ সব সময়ই সংগ্রামী, সব সময়ই একজন যোদ্ধা। তার মহত্তম গুণ ছিল সাহস, উপজাতি নেতার প্রতি আনুগত্য, তার ব্যক্তিগত মর্যাদাবোধ, এবং অদৃষ্টের সঙ্গে সংগ্রাম করার উপযোগী সহিষ্ণুতা। ধর্মগত ও নীতিগত এই আদর্শের প্রতিফলনই বিভিন্ন ধরনের জার্মান কবিতায় দেখা যায়। যেমন, ঈশ্বরের মহিমা কীর্তন করে রচিত স্তোত্র, রাজার প্রশস্তি করে রচিত গান, এবং মহৎকর্মের বর্ণনা সম্বলিত ও অদৃষ্টের লিখনের ফলে উত্থান-পতনের বিবরণ সম্বলিত বীররসাত্মক কাব্য বা মহাকাব্য। প্রথম শতক থেকে পঞ্চম শতক পর্যন্ত বিশেষ করে এই মহাকাব্যই বেশি জনপ্রিয় ছিল, কেননা, এই সময় এক জায়গার মানুষের অন্যত্র গিয়ে বসবাস স্থাপন তখন করছে, জার্মান উপজাতি এর ফলে সারা ইউরোপময় যত্রতত্র আনাগোনা করছে এবং বিরোধীদের সঙ্গে

সংগ্রামে লিপ্ত হচ্ছে ; বিশেষ করে এই সংগ্রাম হচ্ছে পূর্বদেশ থেকে আগত হুনেদের সঙ্গে। সেই সময়কার বিজয় গাথা ও পরাজয় কাহিনী অবলম্বন করে তৎকালীন বিশিষ্ট যোদ্ধাদের নিয়ে পৌরাণিক উপাখ্যানও রচিত হয়েছে, এ'তে ঐতিহাসিক সত্য যেমন আছে তেমনি আছে কিংবদন্তীমূলক গৌরবগাথা। এই পুরাণকথা অনেক উপজাতির মধ্যেই প্রচলিত ছিল, কয়েক শতক পার হয়ে এসে এখনও এইসব কথাই মহাকাব্য রচনার উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত হয়। একটি মাত্র যে জার্মান মহাকাব্যের অস্তিত্ব এখনও আছে তা 'দি সঙ অব হিলডেব্রান্ড্' নামে কয়েকটি বিচ্ছিন্ন অংশমাত্র, নবম শতকের প্রথম দিকে দুজন সন্ন্যাসী তা লিপিবদ্ধ করে রাখেন। বেশ জোরালো ভাষায় ও সংক্ষিপ্ত আকারে লেখা সেই রচনার আরম্ভ এই রকম—

আমি শুনেছিলাম হিলডেব্রান্ড্ ও হাডুব্রান্ড্
আলাদা দুই সেনাবাহিনীর এই দুই বীর
দ্বৈত লড়াইয়ের জন্যে উভয়ে উভয়কে নাকি চ্যালেঞ্জ করে।
বাপ ও ছেলে দুজনে তাদের কর্ম নিল সাফ করে,
যুদ্ধের সাজ প'রে নিল। বুক-পিঠ বেষ্টন করা
আত্মরক্ষার আচ্ছাদনের উপর গুছিয়ে নিল তরবারী।
এই ভাবে সেই বীরেরা যুদ্ধযাত্রা করেছিল।

এই গাথায় বিস্তারিত ভাবে বলা হয়েছে যে, বহু বছর পরে একটি সেনা-বাহিনীর প্রধান রূপে বৃদ্ধ হিলডেব্রান্ড নিজের দেশে ফিরে এসেছিল। সীমান্তে পৌঁছে তার দেখা হল তার পুত্র হাডুব্রান্ডের সঙ্গে, হিলডেব্রান্ড যখন লড়াইতে চলে গিয়েছিল তখন তার এই পুত্রটি প্রায় শিশু। পিতা তার পুত্রকে চিনতে পারল, কিন্তু পুত্র চিনল না তার পিতাকে। পুত্র হাডুব্রান্ডের উপরে তখন তার দেশরক্ষার দায়িত্ব ন্যস্ত। তার পিতার সব কথা ও যুক্তি তার কাছে মিথ্যা ও চতুরতা বলে মনে হল। নিজের সম্মান ও মর্যাদারক্ষার জন্যে হিলডেব্রান্ডকে দ্বৈতযুদ্ধে আহ্বান করতে হল তার পুত্রকে। এই যুদ্ধে পিতার হাতে নিহত হল পুত্র। অদৃষ্ট তাকে নৈতিক মূল্যবোধের এক মর্মান্তিক দ্বিধার মধ্যে এনে ফেলেছে, বীরোচিত সিদ্ধান্ত নিয়ে এই দ্বিধার অবসান ঘটানো হল। পুত্রের প্রতি মমত্ব থেকে নিজের সম্মান ও রাজার প্রতি আনুগত্যই বেশি মর্যাদা পেল। আরও নিদারুণ ব্যাপার এই যে, পুত্রটি তার এই অজ্ঞাত পিতার মর্যাদাবোধের ও সাহসিকতার ভূয়সী প্রশংসা করল।

খ্রীষ্টীয় আদর্শে ক্ষমা প্রদর্শন করে একটি মধুর উপসংহার রচনার প্রশ্নই এখানে ওঠেনি।

অষ্টম শতকে জার্মান জাতির মধ্যে ধর্মযাজকেরা সুপরিকল্পিতভাবে খ্রীষ্টধর্ম প্রচার আরম্ভ করেন। সম্রাট চারলেম্যাগনে (৭৬৮-৮১৪) এবং তাঁর উত্তরাধিকারীরা সরকারী ক্ষমতাবলে খ্রীষ্টধর্ম প্রচার সমর্থন করেন। সেই সময়েই একটি জার্মান জাতি ও জার্মান ভাষা সম্বন্ধে একটা বোধ ও বিশ্বাস দানা বেঁধে উঠেছে, উপজাতিরা সকলেই তখন বসবাস স্থাপন করেছে, স্থির হয়ে বসেছে, একটা রাজনৈতিক সীমারেখাও টানা হয়ে গিয়েছে; জার্মান ভাষাও তখন অনেক উন্নত হয়ে গিয়েছে। জার্মানদের বিশ্বাস ও মূল্যবোধের ছিল এক রকম, খ্রীষ্টীয় বোধ ও বিশ্বাস একেবারে তার বিপরীত। এই কারণে সেকালীন জার্মানদের অতীত ও ঐতিহ্য একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল, এ রকম হওয়ার আরও হেতু এই যে, খ্রীষ্টধর্ম খুব দ্রুত প্রসারলাভ করতে লাগল, তার উপর কখনো-কখনো এজন্যে শক্তিও প্রয়োগ করা হয়েছে।

আসল জার্মান সাহিত্য আরম্ভ হয় আধ্যাত্মিক সাহিত্য হিসাবেই। এর কারণ হচ্ছে এই যে, মঠের অধিবাসী সন্ন্যাসীরাই কেবলমাত্র লেখাপড়া জানতেন, এবং এই কারণেই সভ্যতা ও সংস্কৃতি প্রসারিত হত তাঁদের দ্বারাই। প্রাচীন জার্মান ভাষা প্রথমে শিক্ষা করা হত ল্যাটিন বা প্রাচীন রোমক ভাষা থেকে অনুবাদ করে, এবং তারপর এটি সাহিত্যিক ভাষায় রূপান্তরিত হত; এই ভাষা অতঃপর সর্বজনগ্রাহ্য খ্রীষ্টীয় রচনায় ব্যবহৃত হত বাইবেলের অনুবাদে, প্রার্থনা বিষয়ক বা ধর্মীয় কোনো নিবন্ধ রচনার জন্য। (এ ধরণের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য রচনা হচ্ছে সন্ন্যাসী অটফ্রায়েড ফন ওয়েসেনবার্গ কর্তৃক ৮৬৩ ও ৮৭১ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে লিখিত 'ইভান জেলিয়েন হার্মনি'।) কিন্তু ৯০০ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ এই মৌলিক জার্মান সাহিত্য রচনার কাজ সূচনাতেই বন্ধ হয়ে যায়। এর পরের দুই শ বছর ধরে বিজ্ঞ ধর্মযাজকেরা জার্মান সম্রাটদের (ওথেনিয়ন ও স্যালিয়ান) সহযোগিতায় ল্যাটিন-ক্রিশ্চিয়ান সংস্কৃতি ও সভ্যতা গড়ে তুলতে লাগলেন। ল্যাটিন ভাষা ব্যবহারের ফলে উচ্চস্তরের ও উচ্চশ্রেণীর সংস্কৃতির প্রবল প্রভাব দেখা দিল, এবং প্রাচীন রীতিনীতি অনুসরণ করে কাব্যও রচিত হয়ে চলল ধর্মনিরপেক্ষ পার্থিব ব্যাপার নিয়ে! এই ধরণের নানাপ্রকার আধ্যাত্মিক শক্তির সমাবেশে আদি জার্মান সাহিত্য ও সংস্কৃতির উচ্চমান প্রস্তুত হল, এবং তাই হল জার্মান সাহিত্যের বনিয়াদ।

এ বিষয়ে সামাজিক অবস্থাও অনেক ভাবে সহায়ক হয়েছে। সমাজে এক ধরনের উচ্চবিত্ত মানুষের আবির্ভাব ঘটে, এঁরা হলেন ধর্মনিরপেক্ষ উঁচুস্তরের লোক, এঁরা হলেন সেই সম্মানিত নাইট, সম্রাটের পরিষদে যে মাননীয় ব্যক্তিরা যুক্ত ছিলেন তাঁদেরই বংশধর এঁরা। এদের আত্মবিশ্বাস বেড়ে গিয়েছিল ধর্মযুদ্ধে লিপ্ত হয়ে। একাদশ শতক থেকে খ্রীষ্টধর্মের পীঠস্থান প্যালেষ্টাইন পুনরুদ্ধার করার জন্য এই ধর্মযুদ্ধ আরম্ভ হয়। এটি উদ্ধার করে খ্রীষ্টানদের সর্বময় কর্তৃত্বে আনার জন্যই এই যুদ্ধ। ১১৩০ থেকে আরম্ভ করে অনেক পার্থিব বিষয়ের বিবিধ বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এইসব বিবরণের বাইরের কাঠামো যদিও খ্রীষ্টীয় অনুশাসন অনুসারেই ঐতিহাসিক ঘটনার বিবৃতি দিয়ে তৈরি, কিন্তু এর লক্ষ্য ছিল জনসাধারণের মনোরঞ্জন করা এবং সেজন্যে উচ্চবিত্ত লোকের জীবনের সুখ ও সম্ভোগের কাহিনীই এতে থাকত।

১১৭০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে মধ্যযুগীয় জার্মান সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিকাশ আরম্ভ হয়, এই সময়ে হোহেনস্টাউফেন-বংশের জার্মান সম্রাট্ তাঁর ক্ষমতার ও জাঁকজমকের শীর্ষে পৌঁছে গিয়েছিলেন। রাজন্যবর্গের জীবন-যাপন প্রণালী ও পার্থিব বস্তু সম্বন্ধে তাদের ধারণকে হয়তো 'ক্লাসিক' বা উচ্চাঙ্গের বলা চলে—পাদ্রীদের নির্দেশ বা গির্জার অনুশাসন থেকে নিজেদের মুক্ত করে নিজেদের জীবনের আলাদা একটা মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করাই ছিল জীবনের এই উচ্চাঙ্গতা; কিন্তু সেই সঙ্গে দেশজ নীতিগত মতবাদও সেই চরিত্রগঠনে প্রভাব বিস্তার করত, তার উপর ছিল তাঁদের নিজস্ব আদর্শ যা নাকি খ্রীষ্টীয় প্রভাব থেকে বিশেষ মুক্ত ছিল না। এই আদর্শ হচ্ছে—প্রবৃত্তিকে সংযত রাখা, সব রকম পরিস্থিতির মধ্যেও নিজেকে স্থির রাখা, যুদ্ধে সাহসিকতা প্রদর্শন ও অসাধু পন্থা অবলম্বন না করা, দীন দুঃখী ও দরিদ্রের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন, একাগ্রতা ও আনুগত্য রক্ষা করা; জীবনের মাত্রাজ্ঞান রক্ষার জন্য ও জীবনের পরম আনন্দের লাভের জন্য আত্মসংযম ও আত্মশিক্ষণ। ঠিক এই আমলেই আরও একটি কর্মধারা ছিল যার দ্বারা পার্থিব ব্যাপার সম্বন্ধে মধযুগীয় খ্রীষ্টীয় ধারণার বৈপরীত্য জয় করার প্রবণতা দেখা যায়, এই বৈপরীত্যগুলি হচ্ছে—ইহকাল ও পরকাল, ধর্ম-নিরপেক্ষতা ও আধ্যাত্মিকতা, সৌন্দর্যবোধ ও পাপবোধ। এইসব বৈপরীত্য পরাভূত করে যে জীবনধারণ সেই জীবনই হচ্ছে আদর্শ জীবন, এই জীবনের প্রতিচ্ছবি সে-কালীন কাব্যে ধরা আছে, ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে লিখিত কাব্যের মতন যা

জার্মান কাব্য সাহিত্যের মধ্যে একটি বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। বাস্তবের একটি মহৎ আলেখ্য চিত্রিত ক'রে কবিতা যে জীবন গঠনের ও জীবনচর্যার ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করতে পারে, এ তারই দৃষ্টান্ত।

যোদ্ধাদের নিয়ে এপিক সর্বপ্রথম লেখেন হার্টমান ফন আউ ; তাঁর 'এরেক' ও 'আইওয়েন' (**Erec** ও **Iwein**) কাব্যে তিনি যোদ্ধাদের আচার-আচরণের অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত দেখিয়েছেন, সেই সঙ্গেই তিনি দেখিয়েছেন যে, নিষ্ঠা ও চেষ্টা দিয়ে যে মহৎ জীবন গড়ে তোলা হল উচ্ছৃংখলতা ও অসংযমের জন্য সেই জীবন কীভাবে নষ্ট হয়ে যেতে পারে। ওলফ্রাম ফন এসেনবাক'এর এপিক 'পারজিভাল' লেখা হয় ১২০০ থেকে ১২১০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে, এতে একজন যোদ্ধার ধর্মনিরপেক্ষতার গুণ ও ঈশ্বরের প্রতি তার আনুগত্য—এই দুই বিপরীত মনোভাবের দ্বন্দ্ব দেখানো হয়েছে। যোদ্ধাটির জীবনের খুটিনাটি বিবরণ এতে আছে, সেই সঙ্গে এই কাব্যটি খুবই ধর্মভাবাপন্ন, এবং ঈশ্বরের অন্বেষণে পারজিভালের বিশ্বপরিক্রমা ও আত্মোন্নয়নের যে বিবরণ এতে আছে তাঁর চিরকালীন একটা আবেদন আছেই। পারজিভাল হচ্ছে যুদ্ধে-নিহত একজন যোদ্ধার পুত্র, লোকচক্ষুর অন্তরালে তার মা তাকে লালন-পালন করেন। সে তার মাকে পরিত্যাগ করে জীবন সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ল, একজন যোদ্ধার জীবন লাভ করার জন্যে লালায়িত হয়ে উঠল। বাল্যের অনভিজ্ঞতার দরুণ অনেক রকম গর্হিত ভুল সে করে বসল, অবশেষে গুরনেমানজ নামক একজন যোদ্ধা তাকে যোদ্ধার জীবনের আদর্শ ও আচরণ সম্বন্ধে অবহিত করে তাকে পথ দেখাল। এর ফলে পারজিভাল কিং আর্থারের (এপিকে এঁর নাম 'আরটাস' বলে উল্লিখিত হয়েছে) রাজসভায় সম্মানের ও মর্যাদার আসন পেল—এখানে যোদ্ধাদের যাবতীয় পার্থিব আদর্শই অনুসরণ করা হয়ে থাকে। কিন্তু একজন রক্তমাংসের মানুষ হিসেবে তার শিক্ষার এখানেই শেষ নয়। হোলি গ্রেল প্রাসাদে ঈশ্বরের উপাসনের জন্যে যোদ্ধাদের একটি সমাবেশ ছিল, এখানে পারজিভালের নামে অভিযোগ উঠল যে, তার বাহিরের আচরণই কেবলমাত্র একজন যোদ্ধার উপযোগী, কিন্তু তার নৈতিক দিকটিকে সে সাধারণ মানুষের স্বভাবগত ব্যবহার প্রতিপালনে উদাসীন। প্রাসাদ থেকে সে নির্বাসিত হল। এর পর ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে তার মনে এল সংশয়, এবং সে ঈশ্বরকে অস্বীকার করতে আরম্ভ করল। তবুও, পৃথিবীময় ঘুরে বেড়াবার সময় তার ইচ্ছা ও আগ্রহ হতে লাগল আবার কী ক'রে

ঈশ্বরকে ফিরে পাওয়া যায়। অনেক বছর ধ'রে পরিভ্রমণের পর ট্রেভরিৎএন্ট নামে এক সাধুর সঙ্গে তার দেখা, সেই সাধু তাকে বুঝিয়ে দিল তার দোষ কোথায়, কোথায় তার ত্রুটি; ঈশ্বরের মহিমা সম্বন্ধেও উপদেশ সে পেল এই সাধুর কাছে। এই সাধুই তাকে দেখিয়ে দিল খ্রীষ্টান যোদ্ধার উপযোগী পথ কোন্‌টা। কিছুটা শুদ্ধ ও পরিশুদ্ধ হ'য়ে সে ফিরে এল সেই হোলি গ্রেল প্রাসাদে, যাকে নাকি বলা যায় কৃপা ও করুণার একটি পীঠস্থান। এখানে তার বিয়ে হল এবং সে হল একজন রাজা। সে এখন পরম লক্ষ্যে পৌঁছেছে। এই লক্ষ্য হচ্ছে একটি সম্মানিত জীবন, পৃথিবীর অধিবাসীর কাছে যে জীবনের মর্যাদা আছে, এবং যে জীবন হচ্ছে যোদ্ধাদের ঐতিহ্যবাহী ও ঈশ্বরের অনুমোদিত। গুরনেমানজের উপদেশের কিয়দংশ এই—

শোনো, সব মহত্ত্বই মহৎ উদ্দেশ্য সবই বৃথা
শালীনতা হতে ভ্রষ্ট নয় যদি হৃদয় তোমার।
উদ্ধত অশিষ্ট আচরণে বলো কী কাজ কী কাজ,
জীবনের আহরিত গৌরবের স্বর্ণ উষ্ণীষ
যদি খসে-খসে পড়ে পাখিনীর পালকের মত
সে জীবনে কোন্ মূল্য, জীবিতের সে নরকবাস।
দেখে মনে হয় তুমি বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত একজন
অবশ্যই হবে তুমি একদিন বলিষ্ঠ নায়ক।
মনে রেখো, মহত্ত্বের অবনতি না হয় কখনো,
ক্রমে উর্ধ্বে উঠে যেন সে মহত্ত্ব হয় অভ্রভেদী—
দীনজনে দয়া রেখো, দুঃস্থে হোয়ো কৃপাপরবশ,
শিষ্টাচার রেখো মনে, দাক্ষিণ্যও চাই-যে অপার।
জীবনের শ্রেষ্ঠ ধন, জেনে রেখো, বিনয় নম্রতা।

ঐ সময়ের আর একটি বিশিষ্ট এপিক হচ্ছে Nibelungenlied। এটি লেখা হয় আনুমানিক ১২০০ খ্রীষ্টাব্দে, কিন্তু এর ভিত্তি হচ্ছে আরও আগের সময়ের কবিতা। এই জন্যেই এই এপিকে প্রাচীন জার্মান—টিউটন—বিষয়ে প্রাধান্য পেয়েছে, সেই আমলের বীরোচিত মনোভাব ও বিয়োগান্তক দৃষ্টিভঙ্গিই এতে ধরা পড়ে। যোদ্ধাদের জীবনের নবীন উপলব্ধি এবং খ্রীষ্টান মনোভাব এতে মাত্র আলগা-আলগা ভাবে দেখানো হয়েছে, যার বিশেষ কোনো তাৎপর্য নেই। ট্রিসটান অ্যাণ্ড আইসোলডে কাব্যে গটফ্রায়েড ফন স্ট্রাসবার্গ

সর্ববিষয়ই দেখিয়েছেন যেন প্রেম প্রণয়কে কেন্দ্র ক'রে অনুষ্ঠিত হয়েছে, এর দ্বারা যোদ্ধাদের জীবনের নীতি সম্বন্ধে ধারণাই যেন এলোমেলো হয়ে যায়। এই কাব্যের করুণ পরিণতি সম্ভবত এই কারণেই।

বিবাহিত জীবনের বাইরে নারী-পুরুষের যে একটা সম্পর্ক থাকতে পারে, যোদ্ধাদের একটি সংঘ তার অনুমোদিত ও নিয়মনিষ্ঠ একটি রূপ দেন। এর একটি হচ্ছে Minnedienst—এটি হচ্ছে প্রেমিকের একটি সেবা প্রতিষ্ঠান-বিশেষ, যার কাব্যিক রূপ হচ্ছে Minnesang বা প্রেমগীতি। ঐ সেবা-প্রতিষ্ঠানটিতে সংশ্লিষ্ট নারীকে উচ্চতর সামাজিক মর্যাদার মহিলা হতেই হবে, এখানে যোদ্ধা ঐ মহিয়সী মহিলাকে প্রেম-নিবেদন করবে, তাকে নিজের মিস্ট্রেস বলে মনে করবে, এ সবই সে করবে ঐ মহিলার সেবা ক'রে। ঐ মহিলা যদি তাকে স্বাগত জানায় তখন সে নিজেকে পুরস্কৃত মনে করবে, গৌরবান্বিত হবে, কেননা ঐ নারীকে জয় করা তো তার উদ্দেশ্য নয়, তার সেবা করে নিজেকে উন্নীত করাই তার উদ্দেশ্য। এই কারণে এইসব মহিলা সাধারণ বিবাহিত হয়ে থাকেন। যোদ্ধা ঐ মহিলাকে আদর্শ রূপে মনে করে, এবং তার যোগ্য হবার জন্যে চেষ্টা করে। এই প্রতিষ্ঠানটির একটি শিক্ষামূলক উদ্দেশ্য আছে, যোদ্ধাদের শিক্ষাদানই এর অভিপ্রায়—এই জন্যেই এর একটা সামাজিক গুরুত্ব আছে। একজন সর্বগুণসম্পন্ন যোদ্ধা গড়ে তোলাই এর উদ্দেশ্য। Minnesang হচ্ছে ঐ সেবা প্রতিষ্ঠানটির অন্তর্গত যোদ্ধাদের আত্মকথা বিবৃত করা বা আত্মপ্রতিকৃতি চিত্রিত করা।

সুকুমার শিল্পের একটি মাধ্যম হিসাবে Minnesang অনেক কাব্যিক কৃতিত্ব দেখিয়েছে। ওয়ালটার ফন ডার ভগেলওয়েড (১১৬৮-১২২৮) হচ্ছে মধ্যযুগের সর্বপ্রধান গীতিকবি। তিনি ঐ ধরণের গীতিকবিতা লিখতে আরম্ভ করে-ছিলেন, কিন্তু কিছুকাল পরেই তাঁর মনে হয় ওটা হচ্ছে একেবারে কৃত্রিম কাব্য, ওর গঠন ও স্টাইল সবই কৃত্রিম। তিনি একেবারে অবিকল প্রেমের কবিতা লিখতে আরম্ভ করলেন। সব কবিতা তিনি একটি মেয়েকে উদ্দেশ করে লিখতে আরম্ভ করলেন, ভালোবাসার যে ব্যক্তিগত আনন্দ ও বেদনা তা তাঁর কবিতায় ব্যক্ত হতে লাগল। তিনি অন্য আর-এক ধরণের কবিতাতেও তাঁর কৃতিত্ব দেখিয়েছেন, যাকে বলা যায়, রাজনৈতিক কবিতা, কিন্তু এ ধরণের কবিতাতেও তিনি নিখুঁত কাব্যিক মেজাজ আনতে পেরেছিলেন। এঁর সমসাময়িক কালের লোকের অভিমত এই যে, ইনি এই কবিতায় অনেক

রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছিলেন। ১১৯৭ খ্রীষ্টাব্দে হোহেনস্টাউফেন-বংশের সম্রাট্ ষষ্ঠ হেনরির আকস্মিক মৃত্যুর পর তাঁর উত্তরাধিকারী হওয়া নিয়ে দ্বন্দ্ব বাধে, বৈদেশিক শক্তি এবং স্বয়ং পোপ সেই দ্বন্দ্বে হস্তক্ষেপ করার চেষ্টা করেছিলেন। এই সংকটময় অবস্থার মধ্যে ওয়ালটার ঐ বংশের ডিউক সোয়াবিয়ার ফিলিপের পক্ষ নিলেন। এই বিষয়ে লেখা তাঁর কবিতা—আই হার্ড দি ওয়াটার্স রাশ্ঃ

আমি শুনতে পেলাম জলের তোড় ও তোলপাড়
আমি দেখতে পেলাম সাঁতার কাটছে মাছেরা,
আমি পৃথিবীর আরও অনেক ব্যাপার দেখতে পেলাম
মাঠে-ময়দানে বনে-জঙ্গলে, গাছের পাতায়,
নলখাগড়ায় এবং ঘাসে-ঘাসে ;
যারা বুকে ভর দিয়ে চলে, যারা চলে উড়ে উড়ে,
কিংবা মাটিতে পায়ের ভর দিয়ে যারা চলে
সকলকে আমি চিনতে পেরেছি, তোমাদেরকে চিনিয়ে দেব তাদের।
কোনো জীবই অজাতশত্রু হয়ে বাঁচতে পারে না!

বন্য জন্তু কিংবা সরীসৃপ
তারা সকলেই পরস্পরের সঙ্গে মারামারি করে,
পাখিরাও করে অবিকল ঐ কাজ।
কিন্তু একটা বিষয়ে তাদের যুক্তি বেশ দড়—
তারা যদি নিজেদের একটা মজবুত গোষ্ঠী গঠন করতে না পারে
তাহলে তারা নিজেদের অপদার্থ বলে মনে করে।

তারা রাজা বাছাই ক'রে নেয়, এবং পদমর্যাদা প্রতিষ্ঠা করে তারা,
তারা একজন মনিব ঠিক করে নেয়, ভৃত্যদের তারপর
দেখিয়ে দেয় তাদের জায়গা।

কিন্তু তোমাদের জন্যে দুঃখ হয়, হে জার্মান জাতি,
মর্যাদার এই আসরে তোমার জায়গা কোথায়।
মৌমাছিদেরও রাণী আছে,
তোমার সার্বভৌমত্ব যখন ক্ষয়ে-ক্ষয়ে ক্ষীয়মান
তখন রুখে দাঁড়াও, পথ পরিষ্কার ক'রে নাও।

বিদেশী শাসকদের রাজমুকুটের ছায়া পড়েছে এখানে,
রাজা-বেশী অনুগত প্রজার দল তোমাকে ঠেলে ফেলতে চাইছে,
সম্রাটের রাজমুকুট নিজের মাথায় তুলে নাও, ফিলিপ,
এবং ঐ ওদের পাঠিয়ে দাও, তাদের নিজ নিজ জায়গায়।

১২২০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে রাজযোদ্ধা বা রাজপরিষদ্‌দের যুগের অবসান ঘটে গিয়েছে। উচ্চবিত্ত শ্রেণীর সীমাবদ্ধ একটা অংশ ওদের পৃষ্ঠপোষক ছিল, ত্রয়োদশ শতকের মধ্যেই এঁদেরও গুরুত্ব হ্রাস হয়ে যায়। দ্বিতীয় ফ্রেডেরিকের শাসনকালের (১২১৫-১২৫০) পর থেকে সম্রাটের অধিকার বিভিন্ন অঞ্চলের শাসকদের হাতে হস্তান্তরিত হয়েছিল, ঐ শতকের দ্বিতীয় ভাগে কয়েক বছরের জন্য জার্মানিতে কোনো সম্রাটই ছিলেন না; রাজন্যবর্গের কাছে সম্রাটই ছিলেন জার্মান রাষ্ট্রের প্রতিমূর্তি বিশেষ, এবং সম্রাটই এই রাজন্যদের বিভিন্ন পদমর্যাদা দিয়ে এসেছেন তাদের ধর্মযুদ্ধে অংশগ্রহণের এবং রাজসভার উৎসব পরিচালনায় যোগ্যতার প্রমাণ পেয়ে। মধ্যযুগের সমাজে তিনটি মাত্র শ্রেণী ছিল—পাদ্রী, রাজযোদ্ধা, ও কিষাণ। কিষাণেরা ক্রমশ বিলীন হতে থাকে শহরাঞ্চলে সাধারণ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভবের ফলে। আর্থিক ব্যবস্থার উৎকর্ষের জন্য এবং মুদ্রার ব্যাপক প্রচলনের জন্য অর্থনৈতিক ক্ষমতা গিয়ে কেন্দ্রীভূত হয় ব্যবসায়ীদের হাতে, এবং এযুগের পদাতিকবাহিনীর প্রবর্তনের দরুণ সে কালের রাজযোদ্ধাদের সামরিক ও রাজনৈতিক গুরুত্বও আর থাকে না। ঐ পুরাতন সামাজিক ব্যবস্থা ক্রমে ক্রমে কিভাবে বিলীন হয়ে যেতে আরম্ভ করল তার বিবরণ লিপিবদ্ধ করে রেখে গেলো ওয়ের্ণহার দার্ গারটেনায়েরে তাঁর এপিক কবিতায়—'মেইয়ার হেল্‌ম্‌ব্রেখ্‌ট্'এ, ১২৫০ ও ১২৮০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে এটি লেখা। এই কাব্যে রাজযোদ্ধাদের দেখানো হয়েছে এমন ভাবে যেন তারা লুঠেরা দাগী আসামী মাত্র। সাধারণ ভাবে বলতে গেলে মধ্যযুগীয় কাব্যে এই ধরণের কাব্যের মন্তব্য অবশ্য খুব বেশী হয়নি। এই ধরণের কবিতার বাহ্যিক রূপটা কিছুকাল বহাল ছিল, কিন্তু এর বক্তব্য বিষয় অর্থাৎ নৈতিক মূল্যবোধের দিকটা বেশিদিন মর্যাদা পেল না। এতে অনেক রংদার বাহার ছিল, অনেক অতিরঞ্জনও ছিল, বিষয়ের বিস্তারও ঘটেছিল, কিন্তু যে বক্তব্য অন্তত কিছুকাল স্থায়ী হতে পারে, এমন উপাদানের অভাব তাতে ছিল।

মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সর্ববিধ সাহিত্যই প্রাত্যহিক জীবনকে কেন্দ্র করে

রচিত হয়েছিল, এই শ্রেণী একালেও যাবতীয় সাংস্কৃতিক ব্যাপারের পুরোভাগেই আছেন। যেটাকে নাকি শৈল্পিক গঠন বলা যেতে পারে তার প্রতি বিশেষ নজর দেওয়া হত না, কিংবা অনেক সময় তাকে যেন বাহ্যিক সৌজন্য হিসেবেই গ্রহণ করা হত, অন্যকে কিছু শেখাবার জন্যে বক্তৃতা দেওয়াই ছিল যেন এসব কবিতার উদ্দেশ্য। এই যুগে সবচেয়ে বড় সমস্যা প্রকট হয়ে উঠল এর কিছুকাল পরের ধর্মতত্ত্ব বিষয়ক ব্যবস্থাপনার ও জনসাধারণের মধ্যে ধর্মীয় আন্দোলন আরম্ভ হওয়ায়। পৃথিবী যে আসলে অসার—এই বোধ ও উপলব্ধি থেকেই এই নূতন আন্দোলনের সূত্রপাত। ১৩০০ থেকে ১৩৫০—এই দুই শতকের যা দৃষ্টিভঙ্গি তা কিছুটা অতীত থেকে আগত। এই সময়েই যা ঘটে তাকে বলা যেতে পারে মধ্যযুগীয় অধ্যাত্মবাদ ও সমাজবাদের একীকরণ। এক মাত্র প্রত্যক্ষ যে পরিবর্তন ঘটে সেটা হচ্ছে শহুরে সভ্যতাকে কেন্দ্র ক'রে মধ্যবিত্ত-শ্রেণীর উদ্ভব।

যে অধ্যাত্ম শক্তি আধুনিক কালের পথপ্রদর্শক রূপে এসেছে সেটি হচ্ছে সেই নবজাগরণ, জার্মানিতে যা বিশেষভাবে প্রত্যক্ষ করা যায় সেই মানবিক আন্দোলনে। এ আন্দোলন আরম্ভ হয় ইতালীতে, গ্রীস এবং রোমের প্রাচীন সংস্কৃতি ও সভ্যতার পুনরাবিষ্কারের ও পুনর্জীবনের জন্যেই এই আন্দোলনের সূত্রপাত। মধ্যযুগীয় খ্রীষ্টীয় দৃষ্টিভঙ্গির প্রভাব এক কালে ছিল, কিন্তু সে প্রভাব-এর পরে প্রভাহীন হয়ে পড়ে। এই নবজাগরণ মূল জীবনকেই একটা মূল্য দিয়ে বিচার করে। এর আগে পদমর্যাদা দিয়ে এবং ধর্মবোধ দিয়ে মানুষের মূল্য নির্ধারিত হত, সেই ধরণের মূল্য নিরূপণের যুগ শেষ হয়ে গেল। নিজের শক্তি ও সামর্থ দিয়ে, নিজের অভিপ্রায় অনুসারে নিজের জীবনকে গড়ে তোলার দিকে মানুষের ঝোঁক গেল, এই ভাবেই সে জীবনের চরিতার্থতা চাইল। এই নূতন মনোভাবের দলিল হিসেবে, এবং সেইসঙ্গে একটি সাহিত্যিক সৃষ্টি হিসেবে, উল্লেখ করা যায় 'ডার আকেরম্যান আউস বোহমেন' (বোহেমিয়ার সেই চাষী), এর লেখক হচ্ছেন জোহানেস ফন টেপ্‌ল্‌ (জোহানেস ফন সাৎস্‌ নামেও ইনি পরিচিত)। ১৩০০ খ্রীষ্টাব্দের অল্পকাল পরে এটি রচিত। এটি হচ্ছে মৃত্যুর সঙ্গে ঐ চাষীর বিবাদ, মৃত্যু এসে চাষীর স্ত্রীকে হরণ করে নিয়ে গেছে বলেই এই সংঘাত। চাষী জোরালো ভাবে বাঁচবার অধিকার নিয়ে ও জীবনের সুন্দরতা নিয়ে তার অভিমত প্রকাশ করছে; অপর পক্ষে মৃত্যু কেবলই বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করছে

যে জীবন হচ্ছে অসার, এবং প্রমাণ করে দেখাবার চেষ্টা করছে মানুষের দুর্বলতা কোথায় এবং কতখানি। এখানে দুটি বিপরীত যুক্তির অবতারণা করা হয়েছে, পৃথিবী সম্বন্ধে মধ্যযুগীয় নেতিবাচক মনোভাব এবং নবজাগরণের যুগে জীবনের প্রতি যে প্রগাঢ় প্রণয়বোধ জেগে ওঠে—এই দুটি যুক্তি পাশাপাশি রাখা আছে এখানে। সমস্ত দ্বন্দ্বের উপসংহারে ঈশ্বর যে রায় দিলেন তা এই :

"তোমরা দুজনেই বেশ ভালোমতই লড়াই করেছ ; এখন, এজন্যে সম্মানটি প্রাপ্য হচ্ছে বাদীর এবং জয় মৃত্যুর। প্রত্যেক মানুষেরই কর্তব্য হচ্ছে মরণের হাতে জীবনকে সমর্পণ করা, তার দেহটি পৃথিবীকে অর্পণ করা, এবং তার আত্মাকে আমাদের হাতে সঁপে দেওয়া।"

মৃত্যুর বিরুদ্ধে চাষীর অভিযোগের কিয়দংশ এখানে দেওয়া গেল :

ধিক, ধিক তোমাকে, নির্লজ্জ দুরাত্মা! মানুষের মত মহৎ জীব তুমি কীভাবে ধ্বংস করো, তাকে অসম্মানজনক উক্তি করো, তার অমর্যাদা করো। সমস্ত জীবের মধ্যে মানুষই ঈশ্বরের কাছে সবচেয়ে ভালোবাসার জিনিস, তার সঙ্গে এই রকম ব্যবহার করা ঈশ্বরকেই আঘাত করার তুল্য। যেভাবে তুমি কথা বলছ তাতে আমি বেশ বুঝতে পারছি যে, তুমি মিথ্যাবাদী, এবং স্বর্গ-রাজ্যের দ্বারা তুমি সৃষ্ট হওনি। স্বর্গেই যদি তোমার জন্ম হত তাহলে তুমি অবশ্যই জানতে পারতে যে, ঈশ্বর মানুষ সৃষ্টি করেছেন এবং আরও অনেক-কিছুই সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁর এই সৃষ্টিকাজ সকলের মঙ্গলের জন্যেই। তিনি মানুষকে স্থাপন করেছেন সবার উপরে, সব বস্তুর উপরে আধিপত্য করার অধিকার তিনি দিয়েছেন মানুষকে, মানুষের পায়ের কাছে নতি-স্বীকার করার জন্যেই তাদের সৃষ্টি ; এসবের কারণ হচ্ছে এই যে, মানুষই সকলকে শাসন করে চলবে—মাটিতে সর্বপ্রকার জীবজন্তুর উপরে, আকাশে পাখির উপরে, সমুদ্রে মাছেদের উপরে, এবং পৃথিবীতে সব ফলফুলের উপরে আধিপত্য করবে মানুষ। তুমি যেমন বলছ, মানুষ যদি তেমন নীচ হত, তেমন দুষ্টপ্রকৃতির ও নষ্ট চরিত্রের হত, তাহলে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে ঈশ্বরের সৃষ্টির মধ্যেই গলদ আছে, এবং সে সৃষ্টি অর্থহীন।

১৩৫০ সালের পরে জার্মানিতে মানবতাবাদের প্রসার ঘটল। এর একমাত্র চেষ্টা হল ধর্মতত্ত্ব বিজ্ঞান শিক্ষা সব-কিছু গির্জার হাত থেকে মুক্ত করে নেওয়া। মানবতাবাদীরা পুরাতন পুঁথি পড়লেন তার মূল পাঠ থেকে, কিন্তু এ সম্বন্ধে

নিজেরা যা লিখলেন তা ল্যাটিন ভাষাতেই লিখলেন। এর ফলে এই আন্দোলন কেবল মাত্র মুষ্টিমেয় স্কলারদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, এইজন্যে ইতালীর নবজাগরণের মত সারা জাতির মধ্যে নূতন সংস্কৃতির জোয়ার আনতে পারল না। জার্মানিতে অবশ্য মধ্যযুগের সেই যাজকীয় মনোবৃত্তির প্রতি সমালোচনামূলক মনোভাব জেগে ওঠায় দেখা দিল সংস্কারবাদ। এই আন্দোলনের পুরোধা হচ্ছেন মার্টিন লুথার (১৩:-৩-১৩৪৬)। ইনিও একজন মানবতাবাদী ছিলেন, এর অন্যতম প্রমাণ এই যে, তিনি যাজকীয় ঐতিহ্য পরিহার করে বাইবেলের মূলপাঠের প্রতি অনুরক্ত হন। কিন্তু তাঁর বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা প্রতিষ্ঠিত ও প্রকাশ করার জন্য তিনি মধ্যযুগীয় দৃষ্টান্তই অনুসরণ করেছেন। লুথার নিজে একসময় যাজক ছিলেন, তিনি ক্রমশ অগ্রসর হলেন, তিনি প্রথমে গির্জায় বাহ্যিক কতগুলি ত্রুটি সম্বন্ধে সমালোচনা করতে আরম্ভ করলেন, ক্রমে সেই সমালোচনা গিয়ে দাঁড়াল গির্জার অপরিহার্য নির্দেশনামা বলে যা স্বীকৃত হয়ে আসছিল, তার অসারতা সম্বন্ধে তাঁর অভিমত প্রকাশ। তিনি যা করেছেন তা ভুল বলে স্বীকার করে নিতে তিনি অস্বীকার করলেন, সুতরাং ১৩২০ সালে গির্জা তাঁকে বহিষ্কার করে দিল। এক বছর পরেই সম্রাট পঞ্চম চার্লস্ তাঁকে রাজন্যবর্গের সমাবেশে আহ্বান করলেন। এখানেও লুথার তাঁর কার্য ভুল বলে স্বীকার করতে সম্মত হলেন না। ১৩০০ সালের ১৮ এপ্রিল তারিখে প্রদত্ত তাঁর বিখ্যাত ভাষণটি এতদিন পরেও আমাদের কাছে আছে, এই ভাষণে লুথার স্পষ্টভাবেই বলেছেন যে তাঁর বিবেক কেবল-মাত্র ঈশ্বরের বাণীর দ্বারাই পরিচালিত।

মার্টিন লুথার

সম্রাট এবং তাঁর সাম্রাজ্যের সম্মুখে লুথারের আবির্ভাবের দৃশ্যটি সকলেরই জানা। তাঁর ভাষণের শেষাংশের আংশিক পুরাণকথাটি প্রায় প্রবাদবাক্যে দাঁড়িয়ে গিয়েছে। যে রাজকীয় নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছিল সেটিকে ভুল বলে স্বীকার করে নিতে তিনি অস্বীকার করেন, এবং ঐ রাজ-আদেশ তিনি স্বীকার করে নেন। সযত্নে রচনা করা তাঁর এই বক্তৃতার প্রকৃত ভাষ্যটি আশ্চর্যজনক

ভাবে অজ্ঞাতই থেকে যায়। প্রথমে এই বক্তৃতা দেওয়া হয় জার্মান ভাষায়, তারপর দেওয়া হয় রোমক ভাষায় ; রোমক ভাষায় প্রদত্ত বক্তৃতাটির খসড়া সংরক্ষিত আছে। সেই সময়ে লুথারের পক্ষে কী করণীয় ছিল সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে তিনি কিসের উপর জোর দিয়েছিলেন, এই খসড়া থেকে তা জানা যায়—বিবেকের বিরুদ্ধে কিছু না করা এবং অন্যে যাতে কিছু না করতে পারে তার ব্যবস্থা করা, ঈশ্বরের অভিপ্রায় অনুসারেই যে বিবেক পরিচালিত হবে, এ বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্তে আসা—এই ছিল লুথারের সে সময়ের করণীয় কর্তব্য। এই ভাবেই ধর্মবিপ্লব একটি সঠিক ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত হয়। রাজনৈতিক প্রভাব বা ধর্মযাজকদের অভিপ্রায়ের হাত থেকে মুক্ত করে নেওয়া হয় এই বিপ্লবকে, এবং সংস্কারবাদীদের অভিপ্রায় ও ইচ্ছার কবল থেকেও এ'কে মুক্ত করা হয়। ইতিহাসের দিক থেকে দেখতে গেলে এই কাজ একটি দৃঢ়তাব্যঞ্জক পদক্ষেপ, সেইসঙ্গে এটি যে একটা বৈপ্লবিক কাজও তা সহজেই বোঝা যায়।

মহানুভব প্রভু, ও মহামান্য সম্রাট !

সদাশয় রাজন্যবর্গ, দয়াময় প্রভুবৃন্দ !

গতকাল সন্ধ্যায় আপনারা আজ আমাকে এখানে কিছু বলার জন্যে যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তদনুসারে আমি বিনীত আনুগত্যের সঙ্গে আপনাদের সেই ইচ্ছা পূরণের জন্যে আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত হয়েছি। সদাশয় সম্রাট, মহানুভব রাজন্যবর্গ, ঈশ্বরের কৃপা লাভের আকাঙ্ক্ষায় ধৈর্যসহকারে আমার বক্তব্য শুনবেন—এই বিনীত অনুরোধ জানাই। আমার মনে হয়, আমি যা বলব, তা ন্যায্য ও যুক্তিসঙ্গত। আমার অজ্ঞতার দরুণ আমি যদি সমবেত সুধীবৃন্দের মধ্যের কাউকে যথাযোগ্য সম্বোধন করতে ভুল করে থাকি অথবা অন্য কোনো ভাবে রাজসভার রীতি ও নিয়ম লঙ্ঘন করে থেকে থাকি, তাহলে আমি অনুরোধ করব আমাকে যেন অনুগ্রহ করে মার্জনা করা হয় ; কেন না, রাজসভায় আমি মানুষ হইনি, আমি মানুষ হয়েছি সংকীর্ণ একটি মঠের নিভৃতে। আমার সম্বন্ধে আমি এইটুকু মাত্র বলতে পারি যে, আজ পর্যন্ত যা-কিছু বলেছি বা লিখেছি তার সবই ঈশ্বরের মহিমা প্রকাশের আন্তরিক প্রচেষ্টায়ই করেছি, এবং খ্রীষ্টধর্মীরা যাতে সহজ ও সরল জীবনের ও মনের পরিচয় দেন তারই চেষ্টা করে গিয়েছি।

মহামান্য সম্রাট ও সদাশয় রাজন্যবর্গ! গতকাল মহামান্য সম্রাট আমাকে

দুটি প্রশ্ন করে ছিলেন। তার একটি হচ্ছে—আমার নামে আমারই বই হিসাবে যে বইগুলি প্রকাশিত হয়েছে আমি এখনো সেগুলি আমারই বই বলে স্বীকার করি কি না, দ্বিতীয় প্রশ্ন এই—আমি ঐ সব বইয়ে যে অভিমত প্রকাশ করেছি তা এখনো সমর্থন করি কিনা, কিংবা সেসব অভিমত ভুল বলে স্বীকার করি কি না। প্রথম প্রশ্নের উত্তরে আমি খোলাখুলি ভাবে বলতে চাই যে, আমি যা অভিমত জানিয়েছি তা এখনো সঠিক বলে মনে করি এবং চিরকালই সঠিক বলে মনে করব, ওগুলি আমার বই, আমার নামেই ওগুলি প্রকাশিত। আমার শত্রুপক্ষের বিদ্বেষের বা প্রচারের ফলে আমার মত পরিবর্তনের কথা ওঠে না। আমি স্পষ্টভাবেই জানিয়ে দিতে চাই যে, ওইসব অভিমত আমারই এবং আমার দ্বারাই লিখিত, এসবের কোনো মহৎ ব্যাখ্যার প্রত্যাশা আমি কারও কাছ থেকেই করিনে।

দ্বিতীয় প্রশ্ন সম্বন্ধে আমি অবশ্য এইটুকুই মাত্র মহামান্য নরপতি ও মাননীয় রাজন্যবর্গের অবগতির জন্যে জানাতে চাই যে, আমার সব বইয়ের বক্তব্য এক ও অভিন্ন নয়, বিভিন্ন বইয়ে বিভিন্ন বিষয়ের অবতারণা আছে।

প্রথম গুচ্ছের বইয়ে আমার এমন সব লেখা অন্তর্ভুক্ত আছে যার মধ্যে আমি এমন স্পষ্টভাবে ও খ্রীষ্টধর্মীয় অনুশাসন সম্মত উপায়ে সৎ চিন্তা ও সৎ ভাবে জীবনযাপনের কথা বলেছি যাতে আমার বিরুদ্ধবাদীদেরও স্বীকার করতে হয়েছে যে সেগুলি কাজের কথা, সেগুলি একটুও বিপজ্জনক নয়, এবং খ্রীষ্টানদের পক্ষে সেগুলি পঠনীয়। মহামান্য পোপের অনুরাগীরাও এত বিরুদ্ধবাদী হয়েও কেন বলেন যে, আমার বই বিপজ্জনক নয়; সেইসঙ্গে আবার তাঁরাই এক তরফা স্বেচ্ছাচারী রায় দিয়ে আমার বইকে নিপাত যেতে বলেন। তাহলেই দেখুন, আমার প্রকাশিত অভিমতকে আমি যদি এখন ভুল বলে স্বীকারই করি, তাহলে তার ফল কী দাঁড়াবে? আমি যদি তা করি তাহলে পৃথিবীতে হয়তো একমাত্র মানুষ হিসেবে চিহ্নিত হব যে নাকি শত্রুমিত্র নির্বিশেষে যে সত্যকে মান্য করে নিয়েছে সেই সত্যকে নস্যাৎ করছে, যে নাকি সারা বিশ্বের মানুষের সর্বসম্মত বিশ্বাসের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে।

আমার দ্বিতীয় গুচ্ছের বইয়ে পোপের দপ্তর এবং তার অনুচরদের আক্রমণ করা হয়েছে। আক্রমণ করা হয়েছে, কেননা ঐ দপ্তর যা শেখাচ্ছেন এবং যেরকম খারাপ দৃষ্টান্ত স্থাপন করে চলেছেন যাতে সমস্ত খ্রীষ্টধর্ম নীতিগতভাবে এবং প্রকৃতিগতভাবে ওলটপালট হয়ে যাচ্ছে। এ জিনিস কেউ অস্বীকার

করতে চায় না, উপেক্ষাও করতে চায় না। সকলেই তাঁদের অভিজ্ঞতা থেকে জেনেছেন, এবং জনসাধারণের মনের বিক্ষোভ থেকেও প্রমাণ পাওয়া যায় যে, পোপ যে অনুশাসন চালাচ্ছেন এবং মানুষের মনে যে বিশ্বাস ছড়িয়ে দেবার চেষ্টা করছেন তার দ্বারা খ্রীষ্টধর্ম বিশ্বাসীদের বিবেক অতি নির্মমভাবে পীড়ন করা হচ্ছে। ঐ অনুশাসন অবিশ্বাস্য রকম অত্যাচার করে চলেছে, তার ফলে স্থাবর-অস্থাবর সম্পদও গ্রাস করে নেওয়া হচ্ছে অতি জঘন্য উপায়ে, এবং এই লজ্জাজনক কাজ বিশেষভাবেই হয়ে চলেছে আমাদের এই মহান্ দেশে— এই জার্মানীতে। তাঁরাই কিন্তু তাঁদের অনুশাসনে এই রকম নিয়ম রেখেছেন, সেকশন ৯ ও ২৫, ১ ও ৯ প্রশ্ন দেখুন, তাতে লেখা আছে :

পোপের যেসব আইন যিশুর সুসমাচারের এবং গির্জা অধিকারীদের অনুশাসনের বিরোধী হবে সেগুলিকে ভুল বলে গ্রহণ করতে হবে এবং সে আইন সিদ্ধ বলে গৃহীত হবে না। তাহলেই বুঝতে পারছেন যে, আমার বইয়ে আমি যেসব অভিমত প্রকাশ করেছি তা যদি এখন ভুল বলে স্বীকার করি তাহলে অত্যাচারীকেই মদত দেওয়া হবে এবং তার হাত শক্ত করা হবে। ঈশ্বরকে যাঁরা স্বীকার এবং এই রকম ধ্বংসাত্মক কাজ যাঁরা করে চলেছেন তাঁদের চিনবার জন্যে আমি ছোট, একটা জানালাই মাত্র খুলতে চাইনে, খুলতে চাই বড় বড় দরজা এবং ফটক, এর আগে যা হয়েছে তার চেয়েও অনেক বৃহৎ আকারের ও অনেক উন্মুক্ত প্রকারের। আমি যদি আমারই অভিমত ভুল বলে স্বীকার করি তাহলে অত্যাচারীর সীমাহীন এই লজ্জাকর উৎপীড়ন করার সুযোগ অনেক বেড়ে যাবে, এবং নিরীহ মানুষের উপর পীড়ন করার শক্তি ওদের প্রভূত পরিমাণে বেড়ে যাবে, এবং আগের চেয়েও আরও শক্ত খুঁটি গেড়ে ওরা বসবে, আরও বেশি করে ঐ সুযোগ ওরা পাবে এই জন্যে যে আমি সম্রাটের ও পবিত্র রোমক সাম্রাজ্যের অভিপ্রায় অনুসারেই এ কাজ করেছি। মাননীয় সম্রাট, আমি তখন ঐ জঘন্য বিদ্বেষ ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে নিজের কাছে কী কৈফিয়ত দেব।

আমার বইয়ের তৃতীয় গুচ্ছে আমি কয়েকজন ব্যক্তি বিশেষের বিরুদ্ধে লিখেছি যাঁরা বলতে গেলে এই রোমক অত্যাচার বহাল রাখার জন্যে চেষ্টা করেছেন, এবং যে খ্রীষ্টধর্ম আমি প্রচার করেছি তাঁরা তার বিনাশের চেষ্টা করেছেন। আমি স্বীকার করি আমার ধর্মীয় বিশ্বাস এবং আমার পদমর্যাদার অনুসারে আমার যতটা কঠোর হওয়া উচিত ছিল আমি তার চেয়ে বেশি

কঠোর ভাবে তাদের বিরুদ্ধে বলেছি। এর কারণ, আমি আমাকে একজন ঋষি বলে সাব্যস্ত করতে চাইনে, এবং আমি আমাকে অনুসরণ করতে কাউকে বলিনে, আমার বক্তব্য হচ্ছে খ্রীষ্টের বাণী অনুসরণ কর। আমার বইয়ের অভিমত আমি যদি ভুল বলে স্বীকার করি তাহলে সে কাজটা আইন সংগত হবে না, কেননা তার ফলে এই দাঁড়াবে যে, ঈশ্বর-অবিশ্বাসী অত্যাচারীদের মধ্যে আমিও একজন, এবং মানুষের উপরে প্রভুত্বের ও অত্যাচারের মাগ আরও বীভৎসভাবে বেড়ে যাবে। আমি একজন মানুষ মাত্র, আমি ঈশ্বর নই। আমার লর্ড ক্রাইস্ট যেমন তাঁর বাণী দৃঢ়ভাবে সমর্থন করেছেন, আমিও কি তাঁর অনুরূপ নিজের অভিমত সমর্থন করতে পারি। যখন জন্ তাঁকে তাঁর বাণী সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছিল, এবং এই ভৃতটি যখন তাঁর গালে চড় মেরেছিল, তিনি বলেছিলেন (জন্ ১৮, ২৩) "যদি আমি অন্যায় কিছু বলে থাকি, তাহলে বুঝিয়ে দাও যে এটা অন্যায়।" প্রভু যিশু যদিও জানতেন যে, তিনি কিছুতেই ভুল করতে পারেন না, তবুও তিনি সামান্য একজন অতি নগণ্য ভৃত্যের কাছ থেকেও তাঁর বাণীর ত্রুটি সম্বন্ধে প্রমাণ জানতে চাইলেন। আমার মতন এমন একজন নগণ্য মানুষ, যে নাকি শুধুমাত্র ভুলই করতে পারে, কী ক'রে তার প্রত্যেকটি অভিমত সম্বন্ধে প্রমাণ চাইতে পারে? সেই জন্যে, ঈশ্বরের দোহাই দিয়ে আমি মহামান্য সম্রাট্, মহানুভব রাজন্যবর্গ, কিংবা মর্যাদায় যিনি সর্বশীর্ষে আছেন বা সর্বনিম্নে আছেন, তাঁদের মধ্যে যিনি পারবেন তিনি যেন আমার ভুল প্রমাণ করে দেন, ভুলের জন্যে আমার শাস্তিদানের ব্যবস্থা করেন, এবং ধর্মগ্রন্থাবলীর থেকে প্রমাণ দাখিল করে আমাকে পরাস্ত করেন। আমার ভুল প্রমাণ করে দিতে পারলে আমি আমার প্রত্যেকটি ভুল স্বীকার করে নেব; এবং আমার লেখা সব বই আমি আগুনে নিক্ষেপ করব।

আমি যা বললাম তার থেকে এটা নিশ্চয় স্পষ্ট হয়েছে যে, আমার লেখার ফলে চারদিকে যে অশান্তি ও বিপদ দেখা দিয়েছে, যে চাঞ্চল্য ও অসন্তোষ জেগে উঠেছে, এবং যার জন্যে গতকাল বেশ জোরের সঙ্গে ও গুরুত্বের সঙ্গে আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছে, সে সব বিষয়ের সম্বন্ধে আমি যত্নের সঙ্গে অনেক চিন্তা করেছি। আমার পক্ষে এটা খুবই আনন্দের ও আহ্লাদের কারণ যে, ঈশ্বরের উক্তি উদ্ধার করলে কেমন অসন্তোষ ও চাঞ্চল্য জেগে ওঠে। এইটেই বোধ হয় স্বাভাবিক, ঈশ্বরের বাণীর পরিণতি বুঝি এমনই হতে হয়, যেমন যিশু বলেছেন (ম্যাথু ১০, ৩৪) "আমি শান্তি প্রচার

করতে আসিনি, তরবারি নিয়ে এসেছি। নিজ পিতার সঙ্গে যে মানুষের বিবাদ তাতে ঠিক পথে আনার জন্যেই আমার আগমন। তাহলেই আমাদের বুঝতে হবে যে, আমাদের ঈশ্বরের পন্থাও কত বিচিত্র ও ভয়ংকর, কেননা শেষ পর্যন্ত অশান্তি যাতে দমন করা যায় তার জন্যে ঈশ্বরের বাণীর নিন্দা করলেই চলে না, তার জন্যে অনেক কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকারও করতে হয়। আমাদের সতর্ক হয়ে দেখতে হবে যেন আমাদের এই সুদর্শন তরুণ সম্রাট চার্লস্‌এর গবর্ণমেণ্ট, ঈশ্বরের পরেই যে চার্লস্‌এর উপরে আমাদের ভরসা, তাঁর গবর্ণমেণ্ট যেন কোনো দুঃখজনক সিদ্ধান্ত নিয়ে না ফেলেন। আমি বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ থেকে উদাহরণ উদ্ধৃত করে দেখাতে পারি যে, মিশরের রাজা ফ্যারাও, ব্যাবিলনের সম্রাট্‌, ইজরাইলের রাজারা তাঁদের সাম্রাজ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্যে যখন মনোযোগ দিয়ে নানারকম চতুর কর্মপন্থা নেবার চেষ্টা করছেন তখন তাঁরা কিভাবে নিজেদের প্রায় ধ্বংসের মুখে এনে ফেলেছিলেন। ঈশ্বর কি করেন ? চতুরতা যাদের কাজ ঈশ্বর তাদের চাতুর্য ধরে ফেলেন, এবং তাদের বুঝবার আগেই উলটে দেন পর্বত। সুতরাং আমাদের যা প্রয়োজন তা হচ্ছে ঈশ্বরকে ভয় করা। এ কথা ব'লে আমি অবশ্য বোঝাতে চাচ্ছি নে যে, রাষ্ট্রপ্রধানদের কাছে আমার উপদেশ বা সতর্কবাণীর কোনো প্রয়োজন আছে, কিন্তু আমার এ কথা বলার কারণ হচ্ছে—আমি আমার প্রিয় জার্মান-দেশকে উপেক্ষা করতে পারিনে, এর প্রতি আমার কর্তব্যের কথা ভুলতে পারিনে। সর্বশেষে মহামান্য সম্রাট ও মাননীয় রাজন্যবর্গের কাছে আমার বিনীত নিবেদন এই যে, তাঁরা যেন আমার অত্যুৎসাহী বিরুদ্ধবাদীদের প্ররোচনায় আমার বিরুদ্ধে যুক্তিহীন কোনো পন্থা অবলম্বন না করেন।

আমার বক্তব্য শেষ করলাম।

এর পরে সম্রাটের মুখপাত্র বেশ বক্রভাবে বলেন: আমি নাকি ঠিকমত উত্তর দিই নি, এবং এর আগে কাউন্সিল যার নিন্দা করেছেন এবং যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন সে সম্বন্ধে নতুন করে কোনো প্রশ্ন তোলা যায় না। তাঁরা সেইজন্যে আমার কাছ থেকে কোনো সূক্ষ্ম তত্ত্ব ছাড়াই সহজ উত্তর চান। স্পষ্টভাবে আমাকে বলতে বলেন আমার ভুল স্বীকারে আমি সম্মত কিনা। হ্যাঁ বা না দিয়ে স্পষ্টভাবে এর উত্তর আমাকে দিতে বলেন। তদনুসারে আমি বলি:

আমার কাছে আপনারা সহজ উত্তর চান, আমি তবে সহজভাবে এবং তত্ত্ব ব্যাখ্যা না ক'রেই যা বলতে চাই তা এই: যদি ধর্মগ্রন্থের বাণী উদ্ধৃত

করে এবং পরিষ্কার ও স্পষ্ট যুক্তি দিয়ে আমাকে পরাভূত না করা হয়, তাহলে আমি ধর্মগ্রন্থ থেকে যে যে দৃষ্টান্ত উদ্ধার করেছি তার দ্বারাই আমি নিজেকে পরাস্ত বলে মেনে নিলাম, এবং আমার বিবেক ঈশ্বরের বাণীর কাছেই আবদ্ধ রইল। আমি পোপ'কে এবং কাউন্সিলকে বিশ্বাস করিনে। কেননা অনেক ভুল তাঁরা করেছেন, এবং অনেক পরস্পরবিরোধী কথা তাঁরা বলেছেন। আমি আমার বক্তব্য ভুল বলে মানতে পারিনে, মানব না। কেননা, নিজের বিবেকের বিরুদ্ধে কোনো কাজ করা সংগতও নয়, নিরাপদও নয়।

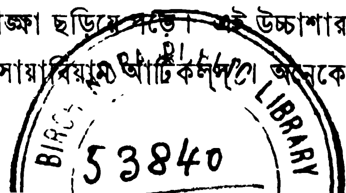
ঈশ্বর আমার সহায় হোন। আমেন।

এর পর লুথার নির্বাসিত হলেন, কিন্তু রোমক সম্রাট নির্বাচনে অংশগ্রহণে অধিকারী স্যাকসনির এমন একজন জার্মান নৃপতি তাঁকে আশ্রয় দেন, ১৩২১ থেকে ১৩৩৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত লুথার বাইবেলের জার্মান অনুবাদের কাজে নিজেকে লিপ্ত রাখেন। সকলের কাছে বোধগম্য এমন উচ্চশ্রেণীর জার্মান ভাষার উদ্ভবে এটি একটি উল্লেখযোগ্য রকমের ঘটনা। ধর্মবিপ্লব তখন বাধাহীনভাবে সারা জার্মানীতে ছড়িয়ে পড়েছে, এর ফলে পুরাতন রোমান ক্যাথলিক গির্জার পাশাপাশিই প্রোটেস্টাণ্ট বা ইভানজেলিকাল গির্জার প্রতিষ্ঠা হয়।

এই ধর্মবিপ্লবের পরিণতিরূপে স্বল্পকালের মধ্যেই দেখা দিল কৃষক-বিদ্রোহ। কৃষকেরা অনিশ্চিত রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার দরুণ অনেক দুর্দশা ভোগ করে আসছিল। আঞ্চলিক শাসকদের সর্বময় ক্ষমতা ও মঠ-কেন্দ্রিক অর্থনীতির ফলে সব সম্পদ এসে জড়ো হচ্ছিল শহরে। কৃষকেরা রাজন্যবর্গের পীড়নের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্য ব্যাকুল হয়, কোনো আইনের অধিকার থেকেও তারা ছিল বঞ্চিত। তাদের "বারো দফা দাবী" ১৩২৫ সালে প্রস্তুত করা হয়, দক্ষিণ-জার্মানী থেকে আমরা তা উদ্ধার করতে পেরেছি। কৃষকেরা মাঝারি রকমের দাবীর কথা এখানে বলেন, ঐ দাবীর সূত্রে তারা ঈশ্বরের বাণীর প্রসঙ্গও উত্থাপন করে।

কৃষকদের বারো দফা প্রতিবেদন

সুইজারল্যাণ্ডে যেমন ঘটেছিল ইউরোপের অন্যান্য দেশেও তেমনি দুর্দশা থেকে মুক্ত করে কৃষকদের মর্যাদা বৃদ্ধির আকাঙ্ক্ষা ছড়িয়ে পড়ে। এই উচ্চাশার সবচেয়ে সোচ্চার দলিল সম্ভবত তথাকথিত "সোয়াবিয়ান আর্টিকেল্‌সে" অনেকে



মনে করেন মেমিংজেনে এই দলিলের উদ্ভব, এবং সেবাস্টিয়ান লোৎসার নামক একজন ভ্রমণকারী এটি রচনা করেন, লেখালেখির কাজে এঁর দক্ষতা ছিল, এবং ক্রিস্টফ স্ক্যাপেলার নামক একজন ধর্মযাজকের কাছে তিনি এ কাজে সাহায্য পান। এগুলি পাঠ করলে বোঝা যায় যে, ভীতসন্ত্রস্ত কতকগুলি সামান্য মানুষ অবিচলভাবে উৎকণ্ঠিত আলাপ-আলোচনা চালায়, এবং অবশেষে তারা একত্র হয় এবং এক চরম মুহূর্তে তারা কার্যকর পন্থা গ্রহণ করে। আশ্চর্য সরলতার সঙ্গে খ্রীষ্টীয় স্বাধীনতার মর্মকথাটি এ'তে স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে।

প্রথমত, আমরা আমাদের এই বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি ও ইচ্ছা প্রকাশ করছি, সেইসঙ্গে আমাদের সকলের অভিমত ও সংকল্প নিবেদন করছি যে, এখন থেকে আমরা এই ক্ষমতা ও অধিকার চাই যার দ্বারা আমরা সম্প্রদায়গতভাবে আমাদের নিজেদের পুরোহিত আমরা মনোনয়ন ও নির্বাচন করতে পারব, এবং তিনি যদি অসংগত আচরণ করেন তাহলে তাঁকে বরখাস্তও করতে পারব। তিনি আমাদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ থেকে সরল ও নির্ভুলভাবে পাঠ দেবেন, এর মধ্যে কোনো মানুষের দ্বারা প্রক্ষিপ্ত তত্ত্ব বা তাঁর নিজস্ব মতবাদ বা নিয়মকানুন অনুপ্রবেশ করানো চলবে না।

তৃতীয়ত, আমাদেরকে সমাজের সবচেয়ে নিচুতলার মানুষ হিসেবে, নগণ্য চাষী রূপেই গণ্য করা একটা সামাজিক রীতি হয়ে আছে, এ ব্যাপারটা দুঃখজনক। কেননা, যিশু তাঁর পবিত্র রক্তধারা দান করে সকলকেই পরিত্রাণ করেছেন, সবচেয়ে নগণ্য রাখাল থেকে আরম্ভ করে সমাজের সবচেয়ে মর্যাদাবান—সকলের জন্যেই তিনি এ কাজ করেছেন, কাউকে ইতরবিশেষ জ্ঞান করেন নি। সেখানে এই রকম ব্যবহার দুঃখজনক ছাড়া আর কী। সুতরাং ধর্মগ্রন্থ-মতে আমরা স্বাধীন, এবং সেই স্বাধীনতা আমরা চাই। এর অর্থ এই নয় যে, আমরা সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন হতে চাই এবং কোনো ক্ষমতাকেই স্বীকার করতে চাইনে। ঈশ্বরের অভিপ্রায়ও তেমন না। ঈশ্বরের অনুশাসন মান্য করেই আমরা জীবনধারণ করতে চাই, রক্তমাংসের শরীর নিয়ে যথেচ্ছভাবে বাঁচতে চাইনে, আমরা আমাদের প্রভু রূপে ঈশ্বরকে ভালোবাসতে চাই, আমাদের প্রতিবেশীর মধ্যে তাঁকে দেখতে চাই, প্রতিবেশীর কাছ থেকে যে ব্যবহার আমরা প্রত্যাশা করি তাদের প্রতি সেই রকম ব্যবহার করতে চাই।—আমাদের প্রতি ঈশ্বরের আদেশও এইরকম।

চতুর্থত, দীর্ঘকাল ধ'রে এই প্রথা চলে আসছে যে, কোনো গরীব মানুষের শিকার করার অধিকার নেই, মুরগী ধরার অধিকার নেই, স্রোতের জল থেকে মাছ ধরার অধিকার নেই। এ ব্যাপারটি আমাদের কাছে খুবই অন্যায় ও অভ্রাতৃসুলভ ব'লে এবং স্বার্থপরতার চরম দৃষ্টান্ত বলে মনে হয়, এবং ঈশ্বরের অভিপ্রায়ের বিরোধী বলেও মনে হয়। ার উপর, যাঁরা ক্ষমতাসীন আছেন তাঁরা তাঁদের শিকার এমন জায়গায় রাখেন যে, মনে হয়, আমাদের উপর আক্রোশবশতই এবং আমাদের ক্ষতি করার জন্য যেন সে শিকার ঐ জায়গায় রাখা হয়েছে; কেননা এ-ভাবে শিকারের ফলে আমাদের অনেক সম্পদের ক্ষতি হয়, মানুষের কল্যাণের জন্যেই কিন্তু ঈশ্বরের এই সম্পদ সৃষ্টি; কিন্তু জন্তুজানোয়ারেরা তা উদরসাৎ করে নেয়। এবং আমাদের বলা হয় যে, এসব ব্যাপারে আমরা যেন উচ্চবাচ্য না করি। এ তো ঈশ্বরেরই এবং আমাদের প্রতিবেশীরই ইচ্ছার বিরোধী।

পঞ্চমত, আমরা কাঠের ব্যাপারেও বেশ ক্ষুব্ধ আছি। আমাদের শাসকেরা সব বনভূমি নিজেদের দখলে নিয়ে নিয়েছেন। কোনো গরীব লোকের কাঠ দরকার হলে তা ডবল দামে কিনে নিতে হয়। আমাদের অভিমত এই যে, যে বনাঞ্চল কোনো যাজক বা পাদ্রী কিনে না নিয়েও ভোগদখল করছেন, তা সমস্ত সম্প্রদায়ের দখলে আসুক।

ষষ্ঠত, চাকুরির ক্ষেত্রেও আমাদের পথ একেবারে বন্ধ করে রাখা হয়েছে, এই অবরোধ দিন-দিন বেড়েই চলেছে। আমরা এর প্রতিবিধান চাই, এ ভাবে আমাদের পথরোধ ক'রে রাখা ঠিক হবে না, আমাদের পূর্বপুরুষেরা এ ব্যাপারে যেরকম সুযোগ সুবিধা পেয়েছেন আমরা সেইরকম চাই—এ'ও ঈশ্বরেরই অভিপ্রায় বলে স্বীকার করতে হবে।

সপ্তমত, আমরা জমিদারদের দ্বারা আর শোষিত হতে ইচ্ছে করিনে, ন্যায্য শর্তে আমরা জমির ইজারা চাই, জমিদারের ও চাষীর মধ্যে যে শর্ত আছে, সেই শর্ত আমাদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হোক—এই আমাদের দাবি। জমিদারেরা যেন কৃষকদের উপর জোরজবর না করতে পারে, চাপ না দিতে পারে, তাদের দিয়ে ব্যাগার খাটিয়ে নিতে না পারে; কৃষকেরা বিনা বাধায় জমির উৎপাদন ভোগ করতে এবং শান্তিতে বাস করতে চায়। কিন্তু জমিদারেরা তাদের দিয়ে যদি কাজ করিয়ে নিতে চান তবে তারাই সর্বপ্রথম তার জন্যে এগিয়ে যাবে, তাদের বাধ্য হয়ে কাজ করবে। কিন্তু সেই

কাজের সময় এমন হওয়া চাই যেন তার জন্যে তাদের নিজেদের কাজে বিঘ্ন না ঘটে, এবং কাজের জন্যে ন্যায্য মজুরি দেওয়া হয়।

অষ্টমত, আমরা এবং রায়তি স্বত্ব যাদের আছে এমন অনেকেই অন্য ব্যাপারেও ক্ষুব্ধ আছি। যে জমির উৎপাদন থেকে খাজনার টাকাই ওঠে না, সেই জমি রায়তদের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হয়, এবং এর ফলে রায়তেরা প্রাণেই মারা পড়ে। এই জন্যে আমরা চাই যে, সৎ লোককে দিয়ে জমি জরিপ করিয়ে দেখা হোক কোন্ জমির পক্ষে কতটা খাজনা ধার্য হতে পারে। এ'তে কৃষকদের অকারণে জমিতে চাষ করতে হবে না, কেননা সব শ্রমিকই তার পরিশ্রমের দাম পেতে অধিকারী।

দশমত, যে জলাভূমিতে বা ক্ষেতে সমস্ত সম্প্রদায়ের যৌথ অধিকার, অনেক ক্ষেত্রে তা অনেকেই নিজের দখলে নিয়ে নিয়েছেন। এইসব যদি ন্যায্য দামে কিনে নেওয়া না হয় তাহলে আমরা চাই যে, সম্প্রদায়ের যৌথ অধিকারে সেগুলি আবার ফিরে আসুক। কিন্তু যদি কিনে নেওয়া না হয়, তাহলে উভয়পক্ষ নিজেদের মধ্যে ন্যায্য উপায়ে এবং ভ্রাতৃসুলভ মনোবৃত্তি নিয়ে একটা রফায় আসুক।

একাদশত, মৃত্যু-কর নামে যে প্রথা চলে আসছে আমরা তার বিলোপ চাই। আমরা নিজেরা ক্ষতিগ্রস্ত হতে চাইনে, এবং বিধবাদের বা মাতৃ-পিতৃহীনদের সম্পত্তি এ রকম ঘৃণ্য উপায়ে কেড়ে নেবার বা চুরি করার আমরা বিরোধী। এ রকম কাজ নানাভাবে নানা জায়গায় করা হচ্ছে। এটা যেমন ঈশ্বরের অভিপ্রায়ের বিপরীত কাজ, এটা তেমনি মর্যাদাহানিকরও বটে।

দ্বাদশত, আমাদের দৃঢ় ও চরম অভিমত এই যে, আমরা যে সব দাবি বা অধিকারের কথা এখানে বললাম, তার একটি বা একাধিক কোনো-কোনোটি যদি ঈশ্বরের বাণীর সঙ্গে না মিলে থাকে, তাহলে যেখানে-যেখানে এই অমিল আছে তা আমাদের কাছে প্রমাণ করে দিলে, ধর্মগ্রন্থের অনুশাসনের পরিপন্থী বলে আমাদের বুঝিয়ে দিতে পারলে আমরা আমাদের সব দাবি প্রত্যাহার করে নেব।

(ফেব্রুয়ারি-মার্চ ১৩২৫)

রাজন্যবর্গ রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে এই অভ্যুত্থান দমন করে দেওয়ার পর কৃষকদের জীবনধারণের উপায় আরও কঠিন ও ক্রমে আরও খারাপ হয়ে উঠল। ধর্মীয় দ্বন্দ্বকে সামাজিক ও রাজনৈতিক স্বতপার্থক্যের সঙ্গে একাকার করে দেওয়া

হল। ১৫৫৫ খ্রীষ্টাব্দে জার্মানীতে ধর্মীয় দ্বন্দ্বে রত দুই দলকেই স্বীকৃতি দেওয়া হয়, কিন্তু এর ফলে রাজনৈতিক দলের মধ্যে ভাঙন দেখা দিল, অনেক উপদলের সৃষ্টি হল। সারা ইউরোপে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ল, এবং তার পরিণতি হল ত্রিশ-বছরের-লড়াই (১৬১৮-১৬৪৮), এই যুদ্ধে জার্মানীর বিস্তৃত এলাকা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হল, এবং জার্মান জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশের মৃত্যু ঘটল।

তবুও এই সময়েই দেখা নূতন জার্মান সাহিত্য, যা নাকি প্রকৃতই সাহিত্যপদবাচ্য। এর পূর্ববর্তী ষোড়শ শতকে ধর্মীয় প্যাম্ফ্‌লেট ও ল্যাটিনে লিখিত রোমক ও গ্রীক সংস্কৃতির কথা ছাড়াও আর যা রচিত হয়েছিল তা কেবল কিছু কিছু সর্বজনবোধ্য হালকা লেখা মাত্র। সপ্তদশ শতকে জার্মান সাহিত্য কেবল ইহলোক ও পরলোক—এই দুই অবস্থার মধ্যে নিজেকে দোদুল্যমান রেখেছিল। যুদ্ধের ভয়াবহতা পার্থিব বিষয়বস্তুর অসারতার কথাই মনে করিয়ে দেয়। তবুও মানুষ বাঁচতে চেয়েছে, জীবনের প্রতি তার আকর্ষণ অব্যাহত থেকেছে। মধ্যযুগীয় ভক্তিবাদ ও পরলোকের প্রতি উৎকণ্ঠিত ভাবে চেয়ে থাকার মনোভাব আর বজায় রাখা সম্ভব হল না। মানুষ যে তার ভাগ্যের উত্থানপতনের সঙ্গে সংগ্রাম করতে পারে, নিজের জীবন নিজে নির্মাণ করতে পারে, নিজের শক্তি দিয়ে সব বাধাবিপত্তি হটিয়ে দিতে পারে—এর জন্যেই মানুষ তার মহত্ত্বের স্বীকৃতি পেল। এইসব উত্তেজনার চরম পরিণতি ঘটল অষ্টাদশ শতকে, মানবিক যুক্তিবাদ জয়ী হল। আমরা এই বিষয় বা এই মনোভাবের পরিচয় পেয়েছি এই নভেলে:

হান্‌স্ জেকব ক্রিস্টোফেল ফন গ্রিমেলশাউসেন

সিম্‌প্লিসিয়াস সিম্‌প্লিসিসিমাস

এই বইতে এক রাখাল বালকের কথা বলা হয়েছে। সিম্‌প্লিসিয়াস যখন শিশু, তখন সে তার বাপ-মায়ের গোলবাড়িতে লুঠতরাজ দেখে। এক ধর্মপ্রাণ সন্ন্যাসী তাকে লালনপালন ক'রে মানুষ করে তোলেন, ঐ সন্ন্যাসীর মৃত্যুর পরে সে জীবনসংগ্রামে ঝাঁপ দেয়, এবং অল্পকালের মধ্যেই অর্থলোলুপ হয়ে ওঠে এবং যুদ্ধের ভয়াবহতার মধ্যে নিজেকে জড়িয়ে ফেলে। অনেক দেশ ঘুরে বেড়ায় সে, মানুষের জীবনের দুটি দিকই সে দেখে, তার জাঁকজমকের জীবন

এবং তার ধূর্ততার ও শঠতার জীবন। এই সব অভিজ্ঞতা নিয়ে তার বিপুল জীবনতৃষ্ণা জেগে ওঠে। অবশেষে সে নিজেই হয়ে যায় সন্ন্যাসী, প্রকৃতির নিভৃতে বসে সে দীনভাবে ঈশ্বর-উপাসনায় রত হয়। পৃথিবীর এবং পৃথিবীর মানুষের কাছ থেকে নিজেকে সরিয়ে এনে সিম্‌প্লিসিয়াস নিজেকেও যেন সরিয়ে নিল ঈশ্বরের কাছ থেকে, কিন্তু পৃথিবী সম্বন্ধে যে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সে সঞ্চয় করেছে অবশেষে তাই তার পক্ষে কল্যাণকর হল, সে নিজেকে চিনতে পারল, সেইসঙ্গে ঈশ্বরকেও চিনতে পারল। ত্রিশ-বছরের-লড়াইয়ের ঐতিহাসিক পটভূমিকায় এই কাহিনীর ভিত্তি—এ'তে পৃথিবীর অনিশ্চয়তারই ইঙ্গিত আছে। বেশ স্পষ্টভাবে এবং বাস্তবিকভাবে এই নভেলে এই অনিশ্চয়তার চিত্র ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এখানে যে অংশ উদ্ধৃত হচ্ছে তা সিম্‌প্লিসিয়াসের একটি স্বপ্নের বৃত্তান্ত, সন্ন্যাসীর মৃত্যুর পরে তার বাহির-বিশ্বে আগমন এবং কিভাবে একজন সৈনিক তাকে অভ্যর্থনা করল তারই কথা :

সিম্‌প্লিসিয়াস পৃথিবীর পথে ঝাঁপ দিল, কিন্তু এখানে সে সৌভাগ্যের দেখা বিশেষ পেল না।

ঐ বুড়ো গাধাটার অনুযোগ আর অভিযোগ আমি আর শুনতে চাইনে, আমি বুঝতে পেরেছি তার যা প্রাপ্য তা সে পেয়েছে—ঐ অসহায় সেপাইদের সে এমনভাবে পিটছিল যেন কুত্তাদের পিটছে। সেইজন্যে আমি চোখ ফেরালাম গাছেদের দিকে, সেখানে অজস্র গাছ ছিল, তাদের দিকে তাকালাম। আমি দেখলাম তারা নড়ে বেড়াচ্ছে, পরস্পরের মধ্যে ধাক্কাধাক্কি করছে, এমন মানুষেরা হুটপাট করতে-করতে মাটিতে গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ছে। একটু আগেই আমি তাদের জীবন্ত দেখেছি, লাথালাথি করতে দেখেছি। এখন দেখছি, একজন খোয়াল তার হাত, আর-একজন পা, এবং তৃতীয় জন এমনকি তার মাথা। এসব আমি যখন লক্ষ্য করছি তখন আমার মনে হল গাছেরা যেন আলাদা-আলাদা কেউ নয়, সব-কয়টা মিলে যেন একটা গাছ। মনে হল রণদেবতা যেন বসে আছেন ওর চূড়ায় এবং তাঁর শাখা-প্রশাখা দিয়ে সমস্ত ইউরোপটাই আচ্ছন্ন করে ফেলেছেন। এমনও হতে পারে সারা বিশ্বটাই তিনি আচ্ছন্ন করে ফেলেছেন, অন্তত আমার তাই মনে হল। কিন্তু হিংসা দ্বেষ ঘৃণা ঊদ্ধত্য গর্ব ধনলিপ্সা ইত্যাদি যাবতীয় হীনতা যেন গাছেদের উপর দিয়ে প্রখর উত্তুরে হাওয়ার মতন বয়ে চলেছে বলে আমার মনে হতে লাগল।

মনে হল সব গাছ যেন সরু আর পাতলা হয়ে গেছে, সব যেন কেমন স্বচ্ছ হয়ে গেছে, কেউ একজন যেন ঐ গাছের কাণ্ডের ওপর এই পদ্য লিখেছে :

নিষ্ঠুর বাতাসের ধাক্কায় ওলটায় ওলটায় ওলটায়
শত বলশালী ওক-বৃক্ষও হয়ে যায় আগাছার তুল্য :
তেমনি ভ্রাতৃঘাতী সমরে গৃহযুদ্ধের বর্বরতায়
বিশ্বও ওলটায়, জীবনের যায় সব মূল আর মূল্য।

জঘন্য বাতাসের ঐ গজরানিতে আর গাছেদের ঐ আত্মঘাতী লড়াইতে আমার ঘুম ভেঙে গেল। জেগে দেখি, আমি আমার কুঁড়ের মধ্যে একা পড়ে আছি। এখন আমি আবার ভাবতে লাগলাম, নিজেকে এখন আমি কী করব। এই অরণ্যে বাস করা অসম্ভব হয়ে উঠেছে, আমার যা-কিছু সবই চুরি হয়ে গেছে, নিজের ভরণপোষণের জন্যে কিছুই নেই। একেবারেই নিঃস্ব হয়ে গিয়েছি, সবই গেছে, কিন্তু কয়েকটা মাত্র বই চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে আছে। দুই চোখে জল নিয়ে আমি একে-একে সেগুলি কুড়িয়ে নিচ্ছি, এবং ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করছি কোন্ পথে আমি যাব তার নির্দেশের জন্যে, সেই সন্ন্যাসী তাঁর জীবৎকালে ছোট একটা চিঠি লিখে রেখে গিয়েছিলেন, হঠাৎ সেই চিঠিটা আমি পেয়ে গেলাম : "প্রিয় সিম্প্লিসিয়াস, এই চিঠি পাওয়ামাত্র এই বন ছেড়ে চলে যাবে। নিজেকে আর পাদ্রীটিকে রক্ষা কোরো। ঐ পাদ্রী আমার অনেক উপকার করেছে। যে ঈশ্বর সর্বদা তোমার সম্মুখে আছেন, যাঁর উদ্দেশে তুমি প্রার্থনারত সর্বদাই থাকবে, তিনি তোমার উপযুক্ত স্থানের সন্ধান বলে দেবেন। সর্বদা তাঁকে মনে রেখো, এবং আমার সঙ্গে এখনও যেন এই বনে আছ এই ভেবে তাঁর সেবা কোরো। তোমার উদ্দেশে সর্বশেষ যে কথা বলেছিলাম তা মনে রেখো এবং তদনুসারে চলো। এতে তুমি রক্ষা পেয়ে যাবে।"

আমি সেই চিঠিটা এবং সন্ন্যাসীর কবরটি অজস্রবার চুম্বন করলাম। তারপর আমি লোকজনের সন্ধানে বের হলাম। দুই দিন ধরে আমি সটান সোজা হেঁটে চললাম। রাত্রি নেমে এলে আশ্রয়ের আশায় আমি গাছের ফোঁকল খোঁজ করতে লাগলাম। পথের থেকে কুড়িয়ে পাওয়া বীচ-ফলই আমার একমাত্র খাদ্য হল। তৃতীয় দিনে, গেল্ন্‌হাউসেনে'র থেকে বেশি দূরে নয়, এমন এক জায়গায় আমি সমভূমি পেয়ে গেলাম। এখানে আমি এমন খাদ্য পেলাম যা নাকি আমার কাছে বিবাহের ভোজের মতন মনে হল,

কেননা এখানে গমের আঁটি চারদিকে ছড়ানো ছিল, নর্ডলিঙ্গেনের প্রচণ্ড লড়াইয়ের পরে কৃষকেরা এখান থেকে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছে, ঐসব আঁটি তারা ঘরে তুলতেই পারেনি। এর একটা আঁটি হল আমার বিছানা, তখন খুব ঠাণ্ডা, এমন বিছানা আমার দরকার ছিল। আমি দুই হাতে ঘষে-ঘষে গমের দানা খেতে লাগলাম। অনেক দিন এমন খানা আমি খাইনি।

কি ভাবে সিম্‌প্লিসিয়াস হানাউ'কে এবং হানাউ সিম্‌প্লিসিয়াস'কে জয় করল

ভোরের দিকে আমি আবার গমের দানা খেলাম। এবং প্রথমেই রওনা হলাম গেলন্‌হাউসেন'এর দিকে। শহরের সব ফটক দেখলাম খোলা। এর কোনো-কোনোটা পুড়ে গেছে, এবং অন্যগুলো সার দিয়ে আধাআধি বন্ধ করা। আমি ভিতরে ঢুকলাম, কিন্তু একটিও জীবিত প্রাণী দেখতে পেলাম না। রাস্তাগুলো মৃতদেহ দিয়ে ভরতি, কোনোটা অর্ধ উলঙ্গ কোনোটা সম্পূর্ণ উলঙ্গ। অনুমান করা সোজা যে, এই ভয়ংকর দৃশ্যে আমি কতটা অভিভূত হয়ে গেলাম। আমি আমার সরল মন নিয়ে ঠিক বুঝতে পারলাম না, কি রকম বিপর্যয়ে এই জায়গার এমন দুর্দশা হল। একটু পরেই আমি জানতে পারলাম যে, রাজকীয় বাহিনী প্রিন্স অব ওয়েমার'এর সেপাইদের অনেককে অভিভূত করে ফেলেছে। আমি সামান্যই ঢুকলাম শহরের মধ্যে, তাতেই আমি যথেষ্ট ব্যাপার দেখতে পেলাম। সেইজন্যে আমি ফিরলাম। তৃণভূমির ভিতর দিয়ে চললাম, তারপর এসে পড়লাম বড় রাস্তায়, এই রাস্তা ধরে আমি এগিয়ে গিয়ে পৌঁছলাম বিশাল হানাউ দুর্গে। প্রথম রক্ষীকে দেখলাম, আমি তার পাশ কাটিয়ে যাবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু দুজন বন্দুকধারী সেপাই আমাকে পাকড়াও করল, এবং আমাকে নিয়ে চলল সদর দপ্তরে ··

আমার দিকে এক দৃষ্টে সবাই তাকাতে লাগল, আমি যেন একটি সামুদ্রিক দানব। তারা সকলেই আমাকে দেখতে লাগল, এবং প্রত্যেকেই আমার সম্বন্ধে এক-একটা কাহিনী খাড়া করল। কেউ-কেউ ভাবল, আমি একজন গোয়েন্দা, কেউ ভাবল আমি পাগোল, আরও কেউ-কেউ ভাবল আমি একটি বনমানুষ, কেউ ভাবল আমি ভূত বা প্রেত, কিংবা আরও অদ্ভুত কিছু। অন্য কয়েকজন ভাবল আমি একটা বোকা লোক, তাদের এ অনুমান প্রায় ঠিক-ঠিকই হত, যদি-না আমি ঈশ্বরকে জানতাম।

১৭০০-১৭৯০

উপক্রমণিকা

আঠারো শতকের প্রথমার্ধে জার্মানীতে বুদ্ধিজীবিদের জীবন সম্পূর্ণভাবে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের দ্বারা পরিচালিত হয়। তাঁদের জীবনদর্শন ছিল এই যে, সারা বিশ্বে কেবলমাত্র মানবজাতিরই প্রবল অগ্রগতি ঘটছে। সেই সময়ে, মানুষ-মাত্রেরই মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হয় যে, পৃথিবীতে মানুষই একমাত্র প্রাণী যার বিচারশক্তি আছে, এবং এই শক্তি প্রয়োগ করে তার পক্ষে স্থির করা সম্ভব যে সত্য কোন্‌টি, কোনো ঐতিহ্যের বা পরম্পরার মুখাপেক্ষী না হয়ে সে নিজেই নিজের দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারে। এর ফলে, তার যুক্তিবাদের সঙ্গে যা-কিছুর মিল না হত, তার প্রতিই তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে তার দোষগুণ বিচার করা হত। যেসব ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব একটি মতবাদ ছিল, যেসব রাষ্ট্রের তেমন কোনো কর্তাব্যক্তি ছিল না কিংবা সমাজপতির দ্বারা পরিচালিত হত যেসব সম্প্রদায়, তাদের প্রতিই বিশেষ ক'রে এই দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করা হত। কোনো ঐতিহাসিক ব্যাপারের উপর গুরুত্ব দেওয়া হত না, কেননা সে তো অতীত। এর কারণ হল এই যে, নিজের বিচারবোধের উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস থাকায় বর্তমান কালের ও ভবিষ্যৎকালের অগ্রগতির নিশ্চয়তা সম্বন্ধে এদের মনে যা জমে উঠেছিল তা হল আশাবাদ। এই বিচারবোধ স্বভাবতই মানুষকে কেবলমাত্র তার চারদিকের পৃথিবীকে ভালো করে চিনতে ও বুঝতে এবং তার সত্যকে উপলব্ধি করতেই সাহায্য করে না, সেইসঙ্গে নিজেকে চিনতেও তাকে সাহায্য করে—কোন্‌টা প্রকৃত সত্য ও কোন্‌টা সর্বাঙ্গসুন্দর তার বিবেক এ নির্দেশও তাকে দিয়ে থাকে। তার চিন্তার মধ্যে তার মর্যাদাবোধ কতটা, লক্ষ্যে পৌঁছবার আকাঙ্ক্ষা কতটা তাও সে ধরতে পারে। এর দ্বারাই হয় সত্যের অনুসন্ধান। এবং প্রকৃত যে নৈতিক ভিত্তির উপর তার আচার-আচরণ গড়ে উঠেছে তাও সে চিনতে ও বুঝতে পারে, এবং এর জন্যে কোনো গির্জার অনুশাসন বা নির্দেশের উপরে তাকে নির্ভর করতে হয় না।

জার্মানীতে এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের উদ্‌গাতা ও প্রচারক হচ্ছে মধ্যবিত্ত শ্রেণী। সেই সময়ে এই মধ্যবিত্ত শ্রেণী ক্রমশ গড়ে উঠে সমাজে স্থান করে নিতে আরম্ভ

করেছে। এই শ্রেণীটিই এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ অতি অল্প সময়ের মধ্যে আত্মস্থ করে নেয় এবং চতুর্দিকে তা ছড়াতে আরম্ভ করে। যুক্তির উপর ভিত্তি করে যে মানসিক নীতিবোধ এ সময়ে দেখা দেয় তা অচিরেই এবং অতি সহজেই মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে উদ্‌বুদ্ধ ক'রে তোলে, এবং নিজেই নিজের বুদ্ধি ও বোধের দ্বারা নিজেকে পরিচালিত করতে পারার এই যে চেতনা চারদিকে সঞ্চারিত হল তার ফলে যুক্তিবাদই বেশ একটি পাকা ভিত রচনা করে নিল।

যাই হোক, জার্মানীতে বুদ্ধিজীবিদের উপর এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের অপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রভাব আঠারো শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত মাত্র ছিল। তার উপর গির্জার অনুশাসনের উপর এই স্বাতন্ত্র্যবাদীদের প্রবল আক্রমণের ফলে একটি নূতন 'ব্যক্তিগত' ধর্মবোধের উদ্‌ভব হল, যার নাম পায়েটিজ্‌ম্। এর অনুগামীরা নিজ-নিজ বোধের উপর নির্ভর করে তদনুযায়ী নিজস্ব এই ধর্ম গড়ে নিলেন। মানসিক আবেগ ও ধর্মীয় বোধ—এই দুইয়ের উপর এ রকম গুরুত্ব দেওয়ার প্রতিক্রিয়াও দেখা দিল। ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদীদের সাহিত্যের বিরুদ্ধেই হল এই প্রতিক্রিয়া, এর মুখপাত্র হলেন কবি ক্লপস্টক (১৭২৪-১৮০৩)। নূতন ভাবে সাহিত্য কি ক'রে সৃষ্টি করা যায় তার কিছুটা নির্দেশ পাওয়া গেল জোহান গটফ্রায়েড হারডারের কাছ থেকে। কিন্তু যুগপৎ দুটি কাজ হতে লাগল। এই নূতন আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গেই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীরা পৌঁছে গেছেন তাঁদের চরম উৎকর্ষে ও চরম পূর্ণতায়। এর প্রমাণ লেসিং এবং কান্ট্। এই ভাবেই আঠারো শতকের দ্বিতীয়ার্ধ পরবর্তীকালের প্রস্তুতিকাল বলে চিহ্নিত হল। এই পরবর্তীকালের সৃষ্টিই হচ্ছে ধ্রুপদী সাহিত্য, যা নাকি অনেকগুলি সাহিত্যিক চেতনার ও ধারার সমন্বয়।

জার্মানীতে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীদের মধ্যে কান্ট্‌এর পরেই যাঁর নাম করতে হয় তিনি হলেন গটথোল্ড্ ইফ্রাইম লেসিং (১৭২৯-১৭৮১); ইনি একাধারে ছিলেন নাট্যকার সাহিত্য-সমালোচক ও ধর্মীয় দার্শনিক, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীদের মধ্যে ইনিই সবচেয়ে প্রভাবশালী ও প্রখ্যাত। তাঁর জীবনের বেশির ভাগই কাটে উত্তর-জার্মানীতে, এই সময় অনেক রকম কাজ করেন, যথা—সম্পাদক, প্রাইভেট সেক্রেটারি, থিয়েটরের ম্যানেজার ও লাইব্রেরিয়ান। কিন্তু সেই সঙ্গে তিনি নিজের লেখার কাজ নিয়মিত ভাবে করে যান।

জার্মান সাহিত্যের উন্নতির মূলে লেসিংএর নাটক ('মিনা ফন বার্নহেল্‌ম্' 'এমিলিয়া গালোট্টি' 'নাথান দি ওয়াইজ') যেমন বিশেষ কাজ করেছে, তেমনি

কাজ করেছে তাঁর সাহিত্য-সমালোচনা—এর বেশির ভাগই অবশ্য চল্‌তি বিষয় নিয়ে লেখা, এতে তিনি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্বন্ধে নিজের অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের একজন প্রবল প্রবক্তা হলেও তিনি এই যুক্তি-বাদের সম্বন্ধে অগভীর বা হাল্‌কা মনোবৃত্তির পরিচয় কখনো দেননি। তিনি বিশেষভাবে দার্শনিক পদ্ধতিতে কাজ করে মর্যাদাসম্পন্ন নৈতিক আচরণের উপরেই জোর দিয়েছেন। ব্যক্তিগত ভাবে তিনি কোনো অন্ধ সংস্কারের এবং তাঁর সময়ের কোনো মতবাদের অনমনীয় মনোবৃত্তির বিরুদ্ধে দুঃসাহসী ও নির্ভীক যোদ্ধা ছিলেন। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যখনই কোনো বিতর্ক আরম্ভ হত তখনই তিনি সে বিষয়ে তাঁর নিজস্ব অভিমত ব্যক্ত করতেন, তার থেকেই দেখা যায় তাঁর লিখিত সমালোচনা সব সময়ই গঠনমূলক মনোভাব নিয়ে লেখা। ধর্ম সম্বন্ধীয় ব্যাপারে তিমি ভাসা-ভাসা কোনো সমাধানের ধার ধারতেন না, স্পষ্টভাবেই তাঁর অভিমত ব্যক্ত করতেন। তাঁর এই স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীন মনোভাবের দরুন কোনো দলই তাঁকে তাদের একজন অনুগামী বলে দাবি করতে পারত না, তাঁকে বেঁধে রাখতে পারত না।

মনুষ্যজাতির শিক্ষা

"দি এডুকেশন অব দি হিউম্যান রেস" (মনুষ্যজাতির শিক্ষা) হচ্ছে লেসিং-এর সর্বশেষ গুরুত্বপূর্ণ কাজ। তাঁর মৃত্যুর এক বছর আগে ১৭৮০ সালে তিনি এই বই লেখেন। লেসিং-এর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের যে মূল সুর, এই বইতে ইতিহাসের ও ধর্মের সেই দার্শনিক তত্ত্বের সারকথা লিপিবদ্ধ আছে। এ বইয়ের উদ্দেশ্য হচ্ছে এটা প্রমাণ করা যে, সারা পৃথিবীতে বিভিন্ন ধর্ম যা প্রকাশ ও প্রসার করতে চায় তার লক্ষ্য একই, তা হচ্ছে: 'মানুষের যুক্তিবাদ সর্বত্রই অগ্রগতি লাভ করেছে, এবং তা আরও এগিয়ে যাবে।' এই ঐতিহাসিক অগ্রগতির মধ্যে লেসিং তিনটি স্তর লক্ষ্য করেছেন। প্রথম স্তরটি হচ্ছে শিশুশিক্ষার সঙ্গে তুলনীয়, ইহুদী জাতির মধ্যেই এটি লক্ষণীয়, ওল্ড টেস্টামেন্টে এই ইতিহাস ও বিশ্বাসের কথা লিপিবদ্ধ আছে। এখানে দেখানো হয়েছে যে, মঙ্গল কাজ করা হয় কেবলমাত্র পুরস্কার লাভের আশায়। দ্বিতীয় স্তরের আরম্ভ যিশুখ্রীষ্ট থেকে, মানবজাতির এই কৈশোরকালের পাঠ্যপুস্তক

হচ্ছে নিউ টেস্টামেণ্ট—মৃত্যুর পরেও আবার জীবন আছে—এই বিশ্বাস মানুষকে মঙ্গল কাজ করায় পরজন্মে পুরস্কার লাভের প্রত্যাশায়। তৃতীয় স্তর হচ্ছে আরও পূর্ণতা ও পরিণতির স্তর—শিক্ষার উদ্দেশ্য কি এবং মানবজাতির ঐতিহাসিক অগ্রগতি কতটা হল তা স্থির হয় এই স্তরে, তখনও মানবজাতি ঠিক যেন সম্পূর্ণ আলোকপ্রাপ্ত হয় নি। মানুষ 'মঙ্গল কাজ করবে কেননা কাজটি মঙ্গলজনক', কোনোরকম লাভের আশায় এ কাজ সে করবে না। মানব-জাতি যদি এটি বোঝে, সে যদি মানবিকতা কল্যাণময়তা ও সত্য কেবলমাত্র যুক্তির দ্বারা অনুধাবন করতে পারে তাহলে কোনো রকম ধর্মের সহায়তা তার দরকার হবে না।

এখানে যা উদ্‌ধৃত হচ্ছে তা দ্বিতীয় স্তরের বিবরণ থেকে নেওয়া, অর্থাৎ খ্রীষ্টিয় ধর্ম থেকে গৃহীত :

৫৪

শিক্ষার অখণ্ড একটি পরিকল্পনার মধ্যে মানবজাতির যে অংশকে অন্তর্ভুক্ত অভিপ্রায় ঈশ্বরের ছিল, সেই অংশ শিক্ষার দ্বিতীয় স্তরে এই পরিকল্পনার উপযোগী হয়ে ওঠে। এর মধ্যে ঈশ্বর কেবল মাত্র তাদেরই নিতে চেয়েছিলেন যারা নাকি ভাষায় আচরণে গভর্নমেণ্ট গঠনে এবং অন্যান্য রাজনৈতিক ও প্রাকৃতিক সম্পর্কের দ্বারা একত্র ও একতাবদ্ধ হয়েছে।

৫৫

এর অর্থ হল এই যে, মানবজাতির এই অংশটি অন্তত তার যুক্তি প্রয়োগের ক্ষেত্রে ইতিমধ্যে এতটা অগ্রসর হয়েছে যাতে নাকি কেবলমাত্র এর আগের স্তরের মত কোনো পার্থিব পুরস্কার বা শাস্তির দিকে লক্ষ্য না রাখে, এবং মহত্তর ও মঙ্গলজনক কাজেই উদ্বুদ্ধ হতে পারে। শিশু এখন যৌবনপ্রাপ্ত হয়েছে। মেঠাই আর খেলনায় এখন তার মন নেই, এখন তার বড়ভাইয়ের মত তার মনে স্বাধীন হবার সম্মানিত হবার ও সুখী হবার আকাঙ্ক্ষা জেগে উঠতে আরম্ভ করেছে।

৫৬

অনেক কাল যাবতই মানবজাতির মধ্যের সর্বোত্তম ব্যক্তিরা (যাদের বড়ভাই বলা হয়েছে) মহত্তর অভিপ্রায়ের প্রেরণাতেই কাজ করায় নিজেদের অভ্যস্ত করেছিলেন। গ্রীক ও রোমান জাতি মৃত্যুর পরেও জীবিত থাকার

জন্যে যৎপরোনাস্তি চেষ্টা করেছেন—অন্তত মানুষের স্মরণেও যাতে জীবিত থাকতে পারেন তার জন্যে চেষ্টা করেছেন।

৫৭

বর্তমান জীবনের পরেও প্রকৃতই আর-একটি জীবন পাওয়ার প্রত্যাশা তাকে ইহজীবনে তার কর্মধারাকে পরিচালিত ও প্রভাবান্বিত করবে।

৫৮

এর থেকেই বোঝা যায় যে, যিশুখ্রীষ্টই নিশ্চিতরূপে প্রথম প্রকৃত শিক্ষক যিনি আত্মার অবিনশ্বরতার বিষয় জানিয়েছিলেন।

৫৯

প্রথম নিশ্চিত শিক্ষক। যে ভবিষ্যৎবাণী তিনি উচ্চারণ করেন তা প্রমাণিত হয়, এই কারণে তিনি নিশ্চিত; যে অলৌকিক ঘটনা তিনি ঘটিয়েছেন তার জন্যে নিশ্চিত; মৃত্যুর পর পুনর্জীবন-লাভের দ্বারা তিনি প্রতিষ্ঠিত করেছেন নিজের মতবাদ, এ জন্যে তিনি নিশ্চিত। এই পুনর্জীবনলাভ বা ঐসব অলৌকিক ঘটনা আমরা প্রমাণ করতে পারি কিনা, সে হল পৃথক কথা। যিশু ব্যক্তিটি কে ছিলেন, সে কথাও এখন থাক্। তাঁর মতবাদ গ্রহণ করা যাতে হয় সেজন্যে হয়তো সেকালে ঐসব ব্যাপারের উপর খুবই জোর দেওয়া হত; কিন্তু তাঁর মতবাদের মধ্যে সত্য কতটা আছে তার স্বীকৃতির জন্যে একালে ওসব ব্যাপারে আর গুরুত্ব নেই।

৬০

প্রথম প্রকৃত শিক্ষক। দার্শনিক অভিপ্রায় দ্বারা আত্মার অবিনশ্বরতা সম্বন্ধে অনুমান করা, ইচ্ছা প্রকাশ করা, এবং বিশ্বাস করা এক জিনিস, কিন্তু অন্তর থেকে ও বাহির থেকে এই প্রত্যয় নিয়ে কাজ করা অন্য।

৬১

অন্তত এই শিক্ষাই সর্বপ্রথম দিয়েছিলেন যিশুখ্রীষ্ট। তাঁর আগেই অবশ্য এ কথা অনেক জাতির মধ্যে প্রচারিত হয়েছিল, কিন্তু ইহজীবনের পাপের জন্যে কোনো শাস্তির বিধান ছিল না। সামাজিক কোনো ব্যাপারে অন্যায় করলে সামাজিক ভাবে সাজা দেওয়া অবশ্য হত। কিন্তু পুনর্জীবনের কথা ভেবে ইহজীবনে হৃদয়ের পবিত্রতা সংরক্ষণের কথা সর্বপ্রথম যিনি বলেন, তিনি যিশুখ্রীষ্ট।

৬২

তাঁর শিষ্যেরা বিশ্বস্ততার সঙ্গে তাঁর এই মতবাদ প্রচার করেছেন। এঁদের যদি আর কোনো গুণ নাও থাকে, তবুও যিশুখ্রীষ্ট যে মহাসত্য কেবলমাত্র ইহুদীদের জন্যেই বিতরণ করেছেন, সেই মতবাদ সারা বিশ্বের বিভিন্ন জাতির মধ্যে প্রচার করে মানবজাতির যে কল্যাণ তাঁরা করেছেন, তার জন্যেই তাঁরা মানবজাতির উপকারী বন্ধু বলে চিহ্নিত হবেন।

৬৩

তাঁরা এই মহাসত্যটির সঙ্গে যদি অন্য কোনো মতবাদ মিশিয়েও ফেলে থাকেন, যে মতবাদের মধ্যে সত্যের মাত্রা হয়তো কম বা যা নাকি তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়, তবুও আমরা তাঁদের দোষ দিতে পারিনে, আমাদের বেশ ভালো করে বিচার করে দেখতে হবে এইরকম মিশ্রণের ফলেও মানবজাতির মধ্যে যুক্তিপ্রয়োগের নূতন পথ পাওয়া গিয়েছে কিনা।

৬৪

অন্তত অভিজ্ঞতা থেকে বোঝা গিয়েছে যে, কিছুকাল পরে এই মিশ্রিত মতবাদ নিউ টেস্টামেণ্ট ধর্মগ্রন্থে স্থান পেয়ে সে সময়ও যেমন এখনও তেমনি মানব-জাতির কাছে দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ শিক্ষণীয় গ্রন্থরূপেই স্বীকৃতি পেয়েছে।

৬৫

গত সতেরো শ বছর ধরে অন্য কোনো গ্রন্থের চেয়ে এই গ্রন্থ যুক্তিপ্রয়োগে মানবজাতির সহায়তা করেছে; এই যুক্তিবোধকে আরও জাগ্রত করেছে; মানুষের বুদ্ধির আলোকপাতেই এই গ্রন্থের তাৎপর্য আরও বৃদ্ধি পেয়েছে।

৬৬

বিভিন্ন জাতির মধ্যে অন্য কোনো বইয়ের এত কদর হওয়া অসম্ভব হত। কদর যে পেয়েছে তার কারণ নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, পরস্পরবিরোধী নানা প্রকার মত ও মতবাদ এই একটি মাত্র বইতেই স্থান পেয়েছে। প্রত্যেক জাতি যদি নিজ নিজ মতবাদ সম্বলিত পৃথক পৃথক গ্রন্থ নিয়ে তাদের জীবনের পাঠ গ্রহণ করত, তাহলে তাদের মধ্যে বিচারবোধ জেগে ওঠার সুযোগই আসত না। সব রকম মতবাদ একত্র পরিবেশন করে এই গ্রন্থ সে সুযোগ দিয়েছে বলেই এর এত জনপ্রিয়তা।

৬৭

এটাও অবশ্য খুবই দরকার ছিল যে, কিছুকালের জন্যে প্রত্যেকের কাছেই এই বইটি তার জ্ঞান-অর্জনের ক্ষেত্রে খুবই বিভ্রান্তির সৃষ্টি করবে। কেননা, প্রত্যেক যুবক বুঝে নেবার চেষ্টা করবে যে, এ বই তার পঠনীয় হওয়া উচিত কিনা। এরকম বিবেচনা করে দেখার প্রয়োজন এইজন্যে যে, যে জ্ঞান অর্জনের উপযোগী মনের ভিৎই তৈরি হয় নি, অধৈর্য হয়ে তাড়াহুড়ো ক'রে বইটি পড়ে শেষ করে ফেলার চেষ্টা এতে করা যাবে না।

৬৮

এবং এখনও একটা ব্যাপারের বিশেষ গুরুত্ব আছে। যাঁরা বুঝদার, যাঁরা সম্যকভাবে উপলব্ধি করায় সমর্থ তাঁদের প্রতি সাবধান-বাণী উচ্চারণ করি—গ্রন্থটির শেষ পাতায় পৌঁছে তাঁরা যেন ধৈর্য হারিয়ে তাঁদের আবেগ প্রকাশ করে না ফেলেন। কেননা, যে জিনিস তাঁরা অল্প-অল্প বুঝতে পেরেছেন কিংবা যে জিনিস কিছুটা মাত্র তাঁরা বুঝতে আরম্ভ করেছেন, তাঁদের ঐ আচরণ দেখে অল্পমেধাবীরা অনুরূপ আচরণ করবেন, তার ফলে কখনোই তাঁদের কিছুই বোঝা হবে না।

৬৯

অল্পমেধাবী যাঁদের বলা হল যতক্ষণ-না তাঁরা সম্যকভাবে উপলব্ধি করার স্তরে পৌঁছতে পারছেন, ততক্ষণ মেধাবীরা যেন এই গ্রন্থের পাতা উল্টে আবার প্রথম থেকে পড়া আরম্ভ করেন। এবং বিচার করে দেখার চেষ্টা করেন যে, তাঁরা যে পদ্ধতি প্রয়োগ করে অপরকে শিক্ষাদান করছিলেন তা সুবিধাজনক বলে গ্রাহ্য একটা সাময়িক ব্যবস্থা ছাড়া কিছু না।

মহাজ্ঞানী নাথান

লেসিং-এর নাটক 'নাথান দি ওয়াইজ' ১৭৭৯ সালে লেখা। মানবতাবাদের প্রতি লেসিং-এর আকর্ষণ যে প্রবল তার স্পষ্ট স্বীকৃতি এই নাটকে আছে। কাব্যিক মেজাজে লেখা এই নাটক। বিশেষ কোনো ধর্মের অনুপ্রেরণায় চালিত না হয়ে ভালো কাজ করার জন্যেই ভালো করার প্রতি তাঁর বিশ্বাসও এই নাটকে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ধর্ম যুদ্ধের সময়ের প্রাচ্যের পটভূমিকায় লেখা এই নাটক। নাটকটির প্লট গুরুত্বপূর্ণ নয়, একটু হালকা মেজাজের। বিভিন্ন অঞ্চলের প্রতিনিধিরা এখানে মিলিত হয়েছেন। বৃদ্ধ ইহুদি নাথান তাঁদের

ধর্মগুরু হয়ে গিয়েছেন, এবং শেষ পর্যন্ত তিনি সকলকে একতাবদ্ধ করেছেন মানবতাবোধের সাধারণ ধর্মমতের দ্বারা। নাটকটির সারকথা একটি আংটির নীতিগল্পের মধ্য দিয়ে বলা হয়ে, গল্পটির মূল অংশ এখানে মুদ্রিত হল। মুসলমান সুলতান সালাদিন নাথানের কাছে জানতে চায় কোন্ ধর্ম সঠিক ধর্ম। নাথান এর উত্তর দেন রূপকের দ্বারা। তিনটি আংটির গল্প দিয়ে, যে তিনটির মধ্য থেকে আসল আংটি বেছে ‹ার করা গেল না—এ যেন পৃথিবীর তিনটি বড়-বড় ধর্ম, যার মধ্যে থেকে প্রকৃত ধর্মটি বেছে নেওয়া কঠিন, অথচ প্রত্যেকেরই দাবি সেই প্রকৃত ধর্ম। এই সমস্যা সমাধানের একমাত্র উপায় হচ্ছে, ধর্মে-ধর্মে এই সংঘর্ষকে মানবিক নীতিবোধের প্রতিযোগিতায় রূপান্তরিত করা। তার মতবাদ দিয়ে বা বাহ্যিক চেহারা দিয়ে ধর্মের বিচার নয়, ঘটনাচক্রে বা ঐতিহাসিক কারণে এ সবের উৎপত্তি। কিন্তু প্রকৃত আংটিটি যেমন মানুষের মনে সহৃদয়তা এনে দেয়, প্রকৃত ধর্মও তাই করে। এই নীতি-গল্পের শেষে এই কথা বলা আছে: 'কোনো রকম পক্ষপাতিত্ব না ক'রে ভালোবাসা' 'নম্রতা' 'আন্তরিক ভাবে সহনশীলতা' 'দয়া দাক্ষিণ্য' 'ঈশ্বরের প্রতি প্রগাঢ় আস্থা'।

অঙ্ক ৩, দৃশ্য ৭

নাথান ॥ পুরাকালে প্রাচ্যে এক ব্যক্তি ছিলেন, যিনি তাঁর প্রিয়পাত্রের কাছ থেকে এক মহামূল্যবান আংটি পেয়েছিলেন। এর পাথরটি ছিল মাণিক্য, অজস্র রকমের রং তা থেকে বিচ্ছুরিত হত; এই আংটি যে শ্রদ্ধার সঙ্গে প'রে থাকত ঈশ্বরের ও মানুষের প্রীতি সে লাভ করত। প্রাচ্যদেশের সেই মানুষটি কখনো এই আংটিটি তাঁর হাত ছাড়া করেননি, এবং চিরকাল এটি তাঁর ঘরে রাখবারই যে বন্দোবস্ত করেছিলেন--এতে আর আশ্চর্য হবার কী আছে। এই ভাবে সে এই আংটিটি তাঁর ঘরে রাখার ব্যবস্থা করেন। তিনি তাঁর সবচেয়ে প্রিয় পুত্রটিকে দিয়ে যান এবং এই রকম আদেশ করে যান যে, সেও যেন এটি তার সবচেয়ে প্রিয় পুত্রকে দিয়ে যায়। এবং তারপর থেকে আংটিটি দিতে বলা হয় সবচেয়ে প্রিয়জনকে, কোন্ বংশে তার জন্ম সে বিচার না ক'রেই। আংটিটি যার হাতে যাবে আংটি-ধারণের গৌরবেই সে হবে গৃহের কর্তা। আমার কথা বুঝতে পারলে, সুলতান?

সালাদিন ॥ ঠিক বুঝতে পেরেছি। তারপর ?

নাথান ॥ এই ভাবে পুত্র-পরম্পরায় আংটিটি দেওয়া হতে লাগল, অবশেষে এমন-এক পিতার হাতে সেটি এল যাঁর তিনটি পুত্র, এবং তিনটি পুত্রই তাঁর সমান বাধ্য ; এই জন্যে পুত্র তিনটিকে ঠিক সমান ভালোই বাসতেন। এই তিনটি পুত্রের মধ্যে যে পুত্রটি যখনই তাঁর সঙ্গে একা থাকত তাকেই তাঁর সবচেয়ে যোগ্য মনে হত, এবং মনে হত অন্য দুটি বিশেষ নির্ভর-যোগ্য নয়। সুতরাং ঐ পুত্রটিই আংটি পাবার অধিকারী। এবং তাঁর মনের দুর্বলতার দরুন বিভিন্ন সময়ে তিনটি পুত্রকেই এই আংটি দেবেন বলে অঙ্গীকার করেন। এইভাবে সময় কেটে চলেছে। ক্রমে তাঁর মৃত্যু যখন প্রায় ঘনিয়ে এসেছে তখন তিনি বিচলিত হয়ে উঠলেন। তিন পুত্রের কাছেই তাঁর প্রতিজ্ঞা, এদের মধ্যের যে-কোনো একজনকে আংটিটি দিলে অন্য-দুজন মর্মাহত হবে—এই তাঁর চিন্তা। এ অবস্থায় কী করা যায় ? তিনি খুব গোপনে এক মণিকারকে ডেকে আনলেন, তাকে তিনি ফরমাশ করলেন এই আংটিটি অবিকল অনুরূপ আরও দুটি আংটি তৈরি করে দিতে হবে। এর জন্যে সব শক্তি ব্যয় করতে হবে, খরচ যা পড়বে তার জন্যে ভাবতে হবে না। মণিকার একাজ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। অবিকল ঐ রকম আরও দুটি আংটি তিনি তৈরি করে আনলেন। এমন নিখুঁত হয়েছিল তাঁর কাজ যে, বৃদ্ধ লোকটি নিজেই ধরতে পারলেন না, কোন্‌টা আসল আংটি, কোন্ দুটিই-বা নকল। তিনি এবার নিশ্চিন্ত মনে তাঁর পুত্রদের ডাকলেন, প্রত্যেককে আলাদা-আলাদা ভাবে। প্রত্যেককে তিনি তাঁর শুভাশীর্বাদ জানালেন, প্রত্যেককেই তিনি দিলেন আংটি। তারপর তিনি মারা গেলেন। আপনি শুনছেন তো সুলতান ?

দুটি উপকথা

উপকথার মাধ্যমেও সাহিত্য কি ভাবে হতে পারে সে সম্বন্ধে লেসিং এইরূপ অভিমত প্রকাশ করেছেন : "সাধারণ একটি নীতিকথা যদি বিশেষ ক্ষেত্রে প্রয়োগের উপযোগী ক'রে নেওয়া হয়, আর, এই বিশেষ ক্ষেত্রটি যদি বাস্তব কোনো ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করে নিয়ে তার চারদিকে একটি কাহিনীর কাঠামো গড়ে তোলা যায়, এবং সেই কাহিনীই যদি সাধারণ ঐ নীতিকথাকে পরিষ্কার ভাবে পরিস্ফুট ক'রে তুলতে পারে, তবে তাকেই বলে

উপকথা।” বেশির ভাগ উপকথাই জন্তু জানোয়ারদের নিয়ে, এরা যেন মানুষের মতই যুক্তির ও বুদ্ধির অধিকারী এবং মানুষের মতনই কথা বলে, এর থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে, উপকথার বাস্তবসম্মত উপায় হচ্ছে এইসব জীবজন্তুদের নিয়ে লেখা। লেসিং-এর এই ব্যাখ্যা দিয়েছেন যে, “জীবজন্তুর মধ্যেও মানুষের মতন চিরাচরিত চরিত্র” আছে ; এবং তিনি সম্যক্ ভাবেই দেখিয়ে দিয়েছেন যে, নানাবিধ জন্তুর মধ্যে বিশেষ ধরণের চরিত্র আরোপ করা হয়ে থাকে এইজন্যেই। তা যে হয়ে থাকে তার প্রমাণ এই-যে, এই উপকথা পাঠ করে পাঠকদের পক্ষে সহজেই একটা নীতিগত উপসংহারে পৌঁছনো সম্ভব হয়। এইসব উপকথার একটা শিক্ষণীয় বক্তব্য থাকে, এই কারণে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে এর এত জনপ্রিয়তা হয়েছিল। লেসিং কিরকম সুচারু ভাবে তাঁর বক্তব্য উপস্থাপিত করতে পারতেন নীচের দুটি উপকথা থেকেই তার প্রমাণ পাওয়া যাবে, এবং সামান্য ত্রুটিও তিনি উপেক্ষা না করে কিভাবে তার নিন্দা করেছেন, এর থেকে তাও বোঝা যাবে :

নিজেদের মর্যাদা নিয়ে পশুদের বচসা

১

কার মর্যাদা বেশি এই নিয়ে পশুদের মধ্যে বেশ বিবাদ বাধে। এ ব্যাপারের একটা মীমাংসার কথা ভেবে ঘোড়া বলল, “আচ্ছা, আমরা মানুষের পরামর্শ নিই, এসো। এ বিষয়ে সে প্রতিদ্বন্দ্বী নয়, এই কারণে এই বিবাদে মানুষই নিরপেক্ষ হতে পারবে।”

এ কথা শুনে ছুঁচো বলে উঠল, “কিন্তু তার মাথায় ঘীলু আছে তো— এ রকম বিচারের কাজ করতে গেলে ঐ জিনিসের দরকার হয়। আমাদের মধ্যে যে সব গুণ আছে তা আবিষ্কার করতে হলে একেবারে নির্ভেজাল ঘীলু দরকার, কেননা আমাদের গুণ তো অনেক সময় ঢাকা চাপা থাকে।”

“বেশ বুদ্ধিমানের মতন কথা বটে।” মন্তব্য করল শশক-জাতীয় একটি প্রাণী।

“ঠিক, ঠিক।” শজারু বলে উঠল, “মানুষের যে যথেষ্ট জ্ঞান ও বিচক্ষণতা আছে—এ কথা আমি বিশ্বাস করিনে।”

আদেশ করার মতন করে বলল ঘোড়া, “চুপ, চুপ। কোনো চ্যাচামেচি নয়। আমরা এ কথা বেশ ভালোভাবেই জানি যে, আমাদের মধ্যের যারা

নিজ নিজ যোগ্যতা ও মর্যাদা সম্বন্ধে বিশেষ নিশ্চিত নয়, তারাই বিচারকের যোগ্যতা সম্বন্ধে সব প্রথম সন্দেহ প্রকাশ করেছেন।"

২

মানুষই বিচারক নির্বাচিত হল। "কিন্তু একটা কথা" রাজসিক গলায় বলে উঠল সিংহ, "তুমি রায় দেবার আগে একটা কথা জেনে নিতে চাই। আমাদের যোগ্যতা যে তুমি বিচার করবে তার নিয়মই বা কি হবে, আর মাপকাঠিই বা কী হবে ?

"কোন্ নিয়মে ?" মানুষ বলল, "সোজা নিয়ম। তোমাদের মধ্যের যারা আমার কাজে লাগবে বা যেমন যেমন আমার কাজে আসবে—তদনুযায়ী বিচার হবে।"

"বা বা বা, চমৎকার কথা !" একটু দুঃখিত হয়ে উত্তর দিল সিংহ, "তাহলে, ঐ রকমের বিচারে, আমি গাধার থেকে কত ধাপ নিচে থাকব ? না না না, হে মানুষ মশায়, তুমি আমাদের বিচারক হতে পারবে না। এ সভা এখনই ছেড়ে যাও।

৩

সভা ছেড়ে গেল মানুষ। অবজ্ঞার সঙ্গে ছুঁচো বলে উঠল "ওহে ঘোড়া, এবার শুনলে তো ? সিংহও বলছে যে, মানুষ বিচারক হতে পারবে না। আমরা যেমন বুঝেছি সিংহও তাই বুঝেছে।"—এ মন্তব্যে সম্মতি জানাল শজারু ও শশক।

ওদের দিকে ঘৃণাপূর্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে সিংহ বলল, "কিন্তু তোমাদের চেয়ে অনেক ভালো যুক্তি দেখিয়ে, হে !"

৪

সিংহ বলতে লাগল, "খুব ভেবে দেখতে গেলে, মর্যাদা নিয়ে বিবাদ করা আমাদের সাজে না। আমাকে সবার উত্তম বা সবার অধম যাই মনে করা হোক না, তাতে আমার কিছু যায়-আসে না। আমি যে আমাকে চিনি—এই যথেষ্ট।" সভা ছেড়ে চলে গেল সিংহ।

তার সঙ্গেসঙ্গে সভা ছেড়ে গেল বিচক্ষণ হাতি, সাহসী বাঘ, নম্র ভালুক, চতুর শেয়াল, এবং সম্ভ্রান্ত ঘোড়া। সংক্ষেপে বলা যায়, যারা নিজেদের মূল্য বোঝে বা বুঝতে পারে বলে বিশ্বাস করে তারা সভা ছেড়ে গেল।

সবচেয়ে শেষে যারা গেল, এবং সভা পণ্ড হবার জন্যে যারা খুব বেশি গজগজ করতে লাগল তারা হল—বাঁদর আর গাধা।

বালক ও সর্প

একটি নিরীহ সাপ নিয়ে খেলা করছিল একটি ছেলে। খেলতে-খেলতে সে বলল, "শোনো ভাই আমার পোষ-মান সাপ, তোমার বিষ ওরা তুলে না নিলে আমি তোমার এত অন্তরঙ্গ হতে পারতাম না। তোমরা সাপেরা সবচেয়ে দুষ্ট প্রকৃতির আর সব চেয়ে অকৃতজ্ঞ। তোমাদের মতনই একজন এক গরীব চাষীকে কি করেছিল আমি তা পড়েছি। তোমারই পূর্বপুরুষ হবে হয়তো সে সাপটি, হিমে আধমরা হয়ে সে পড়েছিল এক বেড়ার ফাঁকে, তাকে দেখে দয়া হল চাষীর, তাকে সে তুলে নিয়ে এল, বুকে চেপে ধরে তার শরীর গরম করে তুলল। ঐ দুষ্ট প্রাণীটি পুরো সুস্থ বোধ হয় তখনও হয় নি, তখনই সে কামড় দিল তার উপকারী বন্ধুটিকে। লোকটি মারা গেল।

"তোমার কথা শুনে আমি আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি। উত্তর দিল সাপ, "তোমাদের কাহিনীকাররা কেমন একপেশে মত দেন। এ ঘটনার যে বিবরণ আমরা জানি তা অন্যরকম। তোমাদের গল্পের ঐ লোকটি ভেবেছিল যে, সাপটি হিমে ঠাণ্ডা হয়ে একেবারে মরে গেছে। সাপটা ছিল রং-বেরঙের। এই জন্য ঐ লোকটা তাকে কুড়িয়ে নেয়। বাড়িতে গিয়ে ওর চামড়া ছাড়িয়ে নেবে এই ছিল তার মতলব। বলো, এটা কি ভালো কাজ?"

"খুব হয়েছে, চুপ করো।" বালকটি বলল, "অকৃতজ্ঞরা এরকম অজুহাত সব সময়ই বানিয়ে নেয়।"

ঐ ছেলেটির বাবা এদের কথোপকথন শুনছিলেন, তিনি তাঁর ছেলের উদ্দেশ্যে বলে উঠলেন, "তুমি ঠিক কথাই বলেছ। কিন্তু যখনই তুমি এরকম ভয়ংকর ধরণের অকৃতজ্ঞতার কথা শুনবে, তখনই তোমার উচিত সব ব্যাপারটার খুঁটিনাটি খবর জেনে নেওয়া। তার আগে কাউকেই দোষী বলে সাব্যস্ত করা ঠিক না। প্রকৃত উপকারী লোকও অকৃতজ্ঞ ব্যক্তির কোনো কল্যাণ করেছেন বলে জানিনে, মনে হয়, কখনোই করেন নি। মানবজাতির সম্মানের খাতিরেই একথা বলতে হল। নিজের স্বার্থসিদ্ধির মতলব নিয়ে যাঁরা উপকার করতে যান কোনো রকম সাধুবাদের বদলে অকৃতজ্ঞতাই তাঁদের প্রাপ্য।"

সাতটি চিঠি

তাঁর ভ্রাতা কার্ল গোথেল্‌ফ ও শেক্সপীয়রের অনুবাদক জোহান জোয়াকিম এসেনবুর্গকে লেখা লেসিং-এর চিঠি একটি সময়ের সহৃদয়তার দলিল স্বরূপ। এর অল্প কিছুকাল আগে লেসিং-এর বিয়ে হয়েছে, জন্মের পর-পরই তার শিশুসন্তানের এবং কয়েকদিন পরেই তাঁর স্ত্রীর মৃত্যু ঘটল। যুক্তিবাদী লেসিং-এর এই চিঠিগুলি কেবল তাঁর গভীর বেদনাই প্রকাশ করেনি, এতে তাঁর নিবিড় বিষাদও প্রকাশ পেয়েছে, এবং তাঁর জীবনের এই বিরাট ক্ষতির দরুণ তাঁর মনে তিক্ততারও সঞ্চার হয়েছে। এবং যা অসৎ তার প্রতিও তাঁর মনের ঝোঁক দেখা দিয়েছে। তিনি যদিও বিপর্যস্ত হয়ে গিয়েছিলেন, তবুও তিনি যুক্তির সান্ত্বনাবাণী যাকে বলা যায় সে বাণী যেন কান পেতে শুনেছেন, এবং যে অবস্থার মধ্যে তাঁকে পড়তে হয়েছে তার কোন একটি অর্থ উদ্ভাবনের চেষ্টা তিনি করেছেন।

জোহান জোয়াকিম এসেনবুর্গকে লিখিত

ভলফেনবিউটেল

৩১ ডিসেম্বর ১৭৭৭

প্রিয় এসেনবুর্গ,

আমার স্ত্রী এখন সম্পূর্ণ সংজ্ঞাহীন হয়ে শুয়ে আছেন, এই অবসরে আমি তোমার সহৃদয়তা ও সহানুভূতির জন্যে তোমার কথা স্মরণ করছি। আমাদের জীবনের সুখ ক্ষণস্থায়ী। আমাদের সন্তানটির মৃত্যু আমাকে যেন সব ব্যাপারে বীতশ্রদ্ধ করে তুলেছে। সে এমন বুদ্ধি নিয়ে এসেছিল, এত বুদ্ধি নিয়ে! কিন্তু মনে করো না, কয়েক ঘণ্টার পিতৃত্ব আমার মত এক পিতাকে একেবারে বেকুব বানিয়ে দিয়েছিল। আমি কিসের কথা বলছি তা আমি জানি। এই পৃথিবীতে প্রবেশ করতে সে এমন বাধার সৃষ্টি করেছিল যে লোহার সাঁড়াশি দিয়ে টেনে তাকে পৃথিবীতে আনতে হল—এটা কি তার বুদ্ধির প্রমান নয়, এটা কি তার প্রজ্ঞা নয়? অত অল্প সময়ের মধ্যেই সে এই পৃথিবীর পচনের ঘ্রাণ পেয়েছিল? সে যে প্রথম সুযোগেই আবার এখান থেকে যাত্রা করল—এটা কি তার প্রজ্ঞার লক্ষণ নয়? আরও দেখ, ঐ ক্ষুদে জীবনটি তার মাকেও সঙ্গে করে নিয়ে যাবার জন্যে টানাটানি

আরম্ভ করেছে। ওর মাকে যে বাঁচাতে পারব তার আশা কম। অন্য পাঁচজনের মতন আমিও সুখী হতে চেয়েছিলাম, কিন্তু এ ব্যাপারে আমার ভাগ্য বড় মন্দ।

লেসিং

৩ জানুয়ারি ১৭৭৮

প্রিয় এসেনবুর্গ

আবার আমার মনে একটু আশা এসেছে। গতকাল থেকে ডাক্তার বলছেন যে, এ যাত্রা আমি নাকি আমার স্ত্রীকে বাঁচাতে পারব। এর ফলে আমার মন কেমন শান্ত হয়ে গিয়েছে তা নিশ্চয় বুঝতে পারছ ধর্মতাত্ত্বিক লড়াই আবার আরম্ভ করার জন্যে আমার তোড়জোড় দেখে। ঐ বিশেষ গেজেট যদি আবার পাঠিয়ে দাও তাহলে খুব কৃতজ্ঞ হব।

লেসিং

কার্ল গোথেল্‌ফ লেসিংকে লিখিত

ভলফেনবিউটেল

৭ জানুয়ারী ১৭৭৮

প্রিয় ভ্রাতা,

আমাকে একটু সহানুভূতি জানিয়ো। তুমি যে সময়ে আমার সৎ ছেলেটির প্রতি এত দয়া ও দাক্ষিণ্য দেখিয়ে চলেছ, সেই সময়ে আমি যে তোমাকে চিঠিপত্র দিতে পারিনি তার যথেষ্ট সংগত কারণ এবার ঘটেছে। আমার জীবনে একটি মর্মান্তিক পক্ষকাল কেটে গেল। আমার স্ত্রীকে আমি প্রায় হারাতে বসেছিলাম। যদি হারাতে হত তাহলে আমার বাকী জীবনটা চরম বেদনাময় হয়ে উঠত। একটা টুকটুকে ছেলে হল তার, যেমন জীবন্ত তেমনি স্বাস্থ্যবান হয়েছিল ছেলেটি। কিন্তু মাত্র চব্বিশটি ঘণ্টা সে ঐ রকম ছিল। কিন্তু যে নিষ্ঠুর উপায়ে তাকে এই পৃথিবীতে টেনে আনা হল, সে তারই বলি হয়ে পড়ল। যে রকম ভয়ংকরভাবে তাকে এই পৃথিবীতে আমন্ত্রণ করে আনা হল, তার থেকে সে বেশি কিছু প্রত্যাশা করেনি বলেই হয়তো নিজেকে আবার চুপিচুপি এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে গেল? অল্প কথায় বলতে গেলে, আমি বুঝতেই পারলাম না যে, আমি পিতা হয়েছিলাম। আমার সুখ

হল ক্ষণস্থায়ী ; কিন্তু আমার মনের এই বিষণ্ণতা প্রবল উদ্বেগে চাপা পড়ে গেল। কেননা, নয়-দশ দিন ধরে তার মা একেবারে সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে রইল ; প্রত্যহ দিনের বেলা ও রাত্রে তার বিছানার কাছে থেকে বারকয়েক আমাকে টেনে সরিয়ে আনা হল, এবং আমাকে বলা হল যে, তার বিছানার পাশে আমি থাকলে তার জীবনের শেষলগ্ন আমি দুর্বিষহই করে তুলব। তার মন আচ্ছন্ন থাকলেও সে আমাকে চিনতে পারছিল। তার পর হঠাৎ অসুখের মোড় ঘুরল, গত তিন দিন ধরে আমাকে বেশ স্পষ্ট করেই বলা হচ্ছে যে, এ যাত্রা আমি তাকে বাঁচাতে পারব। তার এই অবস্থাতেও তার সঙ্গ ক্রমশই আমার কাছে অপরিহার্য হয়ে উঠছে।

গত পনেরো দিন যাবৎ তোমাকে চিঠি না লেখার জন্যে তুমি আমাকে ক্ষমা করবে, এবং এখনও যে বেশি কিছু লিখতে পারছিনে তার জন্যেও নিশ্চয় ক্ষমা করবে। আমাদের সৎ ছেলেটি তোমার বিরক্তির কারণ হয়েছে এ কথা ভাবতে আমি ইচ্ছুক নই। আমি যে অবস্থায় পড়েছি অনুরূপ অবস্থায় পড়লে ঈশ্বর যেন তোমাকে অনেক শাস্তিতে বাঁচতে দেন—এই প্রার্থনা করি।

গথোল্ড্

জোহান জোয়াকিম এসেনবুর্গকে লিখিত

ভলফেনবিউটেল

৭ জানুয়ারি ১৭৭৮

প্রিয় এসেনবুর্গ,

যে "মর্মান্তিক চিঠি" আমি নাকি তোমাকে লিখেছি, আমি তার কথা মনে করতে পারছিনে। যাই হোক, সে চিঠিতে হতাশাব্যঞ্জন কোনো ছত্র থেকে থাকে, আমি তার জন্যে দুঃখিত। প্রকৃত কথা এই যে, বিষাদের চেয়ে চপলতাই আমার বেশি ত্রুটি, অনেক সময় এ'তে তিক্ততা ও মনুষ্যবিদ্বেষ থেকে থাকতে পারে। আমি যেমন আমার বন্ধুরা যেন আমাকে ঠিক সেইভাবেই গ্রহণ করে।

গত কয়েকদিনের মধ্যে আমার স্ত্রীর উন্নতির লক্ষণ একেবারে ধুয়ে-মুছে গিয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, এখন আমার একমাত্র আশা এই যে, আমি যেন আবার আশা করতে পারি।

ঐ নিবন্ধটির অনুলিপির জন্যে তোমাকে ধন্যবাদ। এইগুলিই এখন একমাত্র জিনিস যা নাকি আমাকে অন্যমনস্ক রাখতে পারে।

তোমার অনুরক্ত বন্ধু
লেসিং

ভলফেনবিউটেল
১০ জানুয়ারি ১৭৭৮

প্রিয় এসেনবুর্গ,

আমার স্ত্রীর মৃত্যু হয়েছে; অবশেষে আমার এ অভিজ্ঞতাও হল। কিন্তু আমি এ কথা ভেবেই খুশি যে, এ ধরণের আর কোনো অভিজ্ঞতা লাভের সম্ভাবনা আমার জীবনে আর রইল না। এ জন্যে আমি মনে-মনে বেশ হালকা বোধ করছি। আরও একটা কথা ভেবে আরাম পাচ্ছি যে, আমি অবশ্যই তোমার ও ব্রান্‌স্‌উইকের আমাদের বন্ধুদের সহানুভূতি পাব।

তোমাদের
লেসিং

কার্ল গোথেল্ফ লেসিংকে লিখিত

ভলফেনবিউটেল
১২ জানুয়ারি ১৭৭৮

প্রিয় ভ্রাতা

আমার সৎপুত্রটির এবং আমার মধ্যে তোমাকে কি রকম দুঃখের দূত হয়ে দাঁড়াতে হল! আমি জানি তোমার ভ্রাতৃত্বপূর্ণ হৃদয়টি এই সংবাদটির জন্যে কিছু প্রস্তুতি প্রত্যাশা করে। পুত্রটির প্রিয় মাতা--আমার স্ত্রী—মারা গিয়েছেন। তুমি যদি তাঁকে জানতে আর চিনতে! কিন্তু অনেকে বলেন স্ত্রীর প্রশংসা আত্মপ্রশংসারই তুল্য। বেশ, তাঁর সম্বন্ধে আমি আর একটি কথাও বলব না। কিন্তু, তবু মনে হয় তুমি যদি তাঁকে চিনতে! আমার মনে হচ্ছে আমাদের বন্ধু মোজেস (মেনডেলসন) আমাকে যেমন দেখেছে সেরকম তোমরা আর আমাকে দেখবে না -অমন শান্ত, নিজের গৃহটি নিয়ে অমন পরিতৃপ্ত! ঐ বালকটিকে আগে যতটা পার প্রস্তুত করে

না নিয়ে অনুগ্রহ করে সঙ্গের চিঠিটি তাকে দিয়ো না। যতক্ষণ সে শান্ত না হয় ততক্ষণ চোখে-চোখে রেখো। তার মা'কে সে আর দেখতে পাবে না, কারণ আজ সকালেই তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়েছে। তার যদি টাকার দরকার হয়, অনুগ্রহ করে তাকে দিয়ো। ফেরত ডাকে তুমি ঐ টাকা নগদেই পেয়ে যাবে, সেই সঙ্গে পেয়ে যাবে এর আগে তুমি যা খরচ করেছ তাও—এটা দেওয়া হয়নি বলে আমি লজ্জিত। আজ আসি। আমার ও আমার স্ত্রীর চিঠি একসঙ্গে তোমাদের কাছে পাঠাব ভেবেছিলাম, কিন্তু তা আর হবার নয়। তুমি ও তোমার স্ত্রীর চিঠি যেন পাই।

গথোল্ড্

জোহান জোয়াকিম এসেনবুর্গ'কে লিখিত

ভলফেনবিউটেল
১৪ জানুয়ারি, ১৭৭৮

প্রিয় এসেনবুর্গ,

গতকাল সকালে আমি আমার স্ত্রীকে শেষ দেখা দেখলাম। আমার বাকি জীবনের অর্ধেকের বিনিময়ে আমি যদি জীবনের অপর অর্ধ আমার স্ত্রীর সঙ্গে আনন্দে বাস করার জন্যে ক্রয় করতে পারতাম! তা যদি সম্ভব হত তাহলে কত খুশির সঙ্গে আমি সে কাজ করতাম! কিন্তু তা তো সম্ভব নয়। এখন আমাকে জীবনকে নতুনভাবে সাজিয়ে নিয়ে নতুন ভাবে যাত্রা করতে হবে। সাহিত্যিক ও ধর্মতাত্ত্বিক ব্যাপারের প্রচুর জোগান আমার কাছে মাদকদ্রব্যের মত কাজ করবে, আমাকে অন্যমনস্ক রাখবে এবং প্রতিটি দিন আমাকে যুক্তিসঙ্গতভাবে বাঁচিয়ে রাখবে। এ ব্যাপারে আমি তোমার সহায়তা চাই। বৃহদাকার 'জনসন' (ইংরেজি ভাষার অভিধান) থেকে 'এভিডেন্স' সম্বন্ধে সব রেফারেন্সসহ পুরো প্রবন্ধটি কপি করিয়ে আমাকে পাঠাবার জন্যে তোমাকে অনুরোধ করছি। আমি ওই অভিধানে এ বিষয়ে কিছু পড়েছিলাম বলে মনে হচ্ছে, কিন্তু সব কথা মনে করতে পারছিনে। এর আগের নিবন্ধটি যাকে দিয়ে কপি করিয়েছিলে, এটিও তাকে দিয়েই করিও। ব্রান্সউইকে আমি যখন যাব তখন দুটি লেখার অনুলিপি করার দক্ষিণা দিয়ে দেব।

তোমাদের
লেসিং

জর্জ ক্রিস্টফ লিসটেনবের্গ

সংক্ষিপ্ত সূত্র : প্রবাদ

জর্জ ক্রিস্টফ লিসটেনবের্গ (১৭৪২-১৭৯৯) একজন পদার্থবিজ্ঞানী ও লেখক ছিলেন। একজন বৈজ্ঞানিকরূপে তিনি ছোট ছোট নিবন্ধের মাধ্যমে কুসংস্কারের বিরুদ্ধে অনেক অভিমত জানিয়েছেন, এবং যুক্তিবাদ সম্বন্ধেও অনেক কাজ করেছেন। তিনি তাঁর সংক্ষিপ্ত লেখায় বা দ্রুত লিখিত বক্তব্যের মধ্য দিয়ে অনেক সূত্রের সন্ধান দিয়ে গিয়েছেন। এগুলি যেমন নিখুঁত তেমনি তীক্ষ্ণ। তাঁর খ্যাতি এইগুলির জন্যই। বহুকাল আচরিত যেসব অভ্যাসের দ্বারা মানুষের জীবন নিয়ন্ত্রিত হয়ে আসছে সূক্ষ্ম বিচারের দ্বারা তিনি সেসবের প্রতি নির্দয় মন্তব্য করেছেন। এবং এমন অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় তিনি দিয়ে গিয়েছেন যা একালেও সাধারণ মানুষের চেতনায় যেন ঠিক পৌঁছয় নি।

স্পেন এককালে যেমন গর্ব করে বলত, কোনো রাজকীয় রাজতন্ত্রের ভূমিতে সূর্য অস্ত যায় না। অস্ত যায় কি না-যায় তাতে কিছু যায়-আসে না। কিন্তু সূর্য যখন মাথার উপরে থাকে তখন তার আলোতে কতটুকু কি দেখা যায়, সেইটেই হল আসল কথা।

কোনো-একটা দূর দ্বীপে যদি এমন-এক জাতি পাওয়া যায়, যেখানে সব বাড়ির দেয়ালে-দেয়ালে গুলী-ভরা পিস্তল ঝোলানো, যেখানে সকলে সারারাত পাহারায় নিযুক্ত—সেখানে কোনো পরিব্রাজক গিয়ে যদি হাজির হয় তাহলে তার কি মনে হবে না যে সারা দ্বীপটাই দস্যুরা অধিকার করে নিয়েছে? ইউরোপের জাতিরা যা করছে তার থেকে কি এ অবস্থার কোনো পার্থক্য আছে? এর থেকেই বোঝা যায় যে, মানুষের উপরে ধর্মের প্রভাব কত কম, তারা অন্য কোনো আইনকেই যেন স্বীকার করে না, এর থেকে আরও বোঝা যায় যে, আমরা ধর্মের কাছ থেকে কত দূরে সরে এসেছি।

আমি জানাতে চাই যে, যেসব কাজ আমাদের স্বদেশের বা পিতৃভূমির জন্যে করা হয়েছে বলা হয় প্রকৃতপক্ষে সেসব কাজ কাদের জন্যে করা হয়েছে।

একজন খুনীকে আমরা যখন পীড়নযন্ত্রে চাপাই তখন মনে প্রশ্ন জাগে যে, আমরা কি একটি শিশুর মতনই ভুল করি না, যে নাকি যে-দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে চেয়ার ফিরে আসে সেই দেয়ালেই তা ধাক্কা মারে।

তুমি যখন কোনো দাগী অপরাধীর কাহিনী পাঠ করো, তখন তাকে দোষী বলে সাব্যস্ত করার আগে সবসময় ভেবো এটা ঈশ্বরেরই পরম বদান্যতা যে তিনি সততা দিয়ে আচ্ছাদিত ঐ মুখ সমেত তোমাকে অনুরূপ অবস্থার বেড়াজালে নিক্ষেপ করেন নি।

দ্বিতীয় ফ্রায়েডরিখ

অ্যান্টি-মেকিয়াভেল

ফ্রায়েডরিখ দ্বিতীয়, 'দি গ্রেট' (১৭১২-১৭৮৬, ১৭৪০ সাল থেকে প্রাশিয়ার রাজা) তাঁর বিচারবোধ ও যুক্তিবাদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে রাজ্যশাসনের জন্যে তাঁর সমসাময়িকদের দ্বারা বিশেষ ভাবে প্রশংসিত হয়েছেন। তাঁর রাজনৈতিক দক্ষতায় এবং কয়েকটি যুদ্ধে বিজয়ী হওয়ায় তিনি ইউরোপীয় শক্তিসমূহের মধ্যে প্রাশিয়ায় একটি বিশিষ্ট স্থান করে নিয়েছিলেন। তাঁর দেশে তিনি অনেক সংস্কারের কাজ করেন—এর ফলে কৃষিক্ষেত্রে ব্যবসায়ে ও বাণিজ্যে প্রাশিয়া অনেক এগিয়ে যায়। সর্বশক্তিমান সম্রাটরূপেই তিনি দেশ শাসন করেছেন, কিন্তু কোনো ভগবদ্-অধিকারে অধিকারীরূপে শাসন করেন নি ; তিনি শাসন করেছেন দেশের 'প্রধান সেবকরূপে'।

সিংহাসনে আরোহণের এক বছর আগে, ১৭৩৯ সালে, তিনি লেখেন তাঁর পুস্তিকা "অ্যান্টি-মেকিয়াভেল"। নিকোলো মেকিয়াভেলির "দি প্রিন্স" প্রকাশিত হয় ১৩১৩ সালে। মেকিয়াভেলি (১৩৬৯-১৩২৭) একজন রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন এবং সেই ইতালীর নবজাগরণের ইতিহাস রচনা করেন, তাঁর এই বইটির প্রতিপাদ্য বিষয় নাকি এই যে, কোনো শাসন তাঁর রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যে যে কোনো পন্থা—এমনকি নৈতিক পন্থার বিরোধী পন্থাও—গ্রহণ করতে পারেন। কিন্তু ফ্রায়েডরিখের পুস্তিকাটির বিচারবোধ ও মানবিক আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েই রচিত। মেকিয়াভেলির বক্তব্যের তিনি তীব্র প্রতিবাদ করেছেন বটে, কিন্তু মেকিয়াভেলির কাল সম্বন্ধে তিনি সচেতন

ছিলেন এবং সেই কালের অনেক ঘটনার প্রশংসাও করেছেন, তিনি নিজের কালের ব্যাপারেও বিশেষ সচেতন ছিলেন। তাঁর যৌবনকালে লেখা এই পুস্তিকাটিতে প্রকাশিত তাঁর অভিমত তিনি সব সময় অনুসরণ করেন নি, সিংহাসনে আরোহণের পরই তিনি কেবল ক্ষমতার লোভেই অনেক যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছেন। এসব সত্ত্বেও তাঁর দেশের আভ্যন্তরীণ নীতি ও তাঁর মনের মহত্ত্ব ও উদারতা তাঁকে একজন যুক্তিবাদী সম্রাটের আদর্শ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

তৃতীয় অধ্যায়

পঞ্চদশ শতকের মানুষ মেকিয়াভেলি। এই শতকটি বর্বরতা নিয়েই মেতে ছিল। সেই সময়ে বিজেতাদের অনেক খ্যাতি—যার জন্যে নাকি মনে খেদের উদ্রেক করে, এবং তাঁদের অনেক বিশিষ্ট কাজ তাঁদের সম্মানের অনেক উচ্চ আসনে বসিয়েছে। কিন্তু তাঁরা যে ভাবে কাজ করে গিয়েছেন তার মধ্যে ভদ্রতাবোধ ন্যায়বোধ নম্রতা বা অন্যান্য অনেক বিশেষ গুণ তেমন আমোল পায় নি। কিন্তু এখন আমি দেখছি যে, একজন বিজেতার অন্যান্য গুণের চেয়েও তাঁর সুনামটি বেশি অভিপ্রেত। এখন জনসাধারণ আর তেমন বেকুব নেই যে, তারা নিষ্ঠুরতার জন্যে উত্তেজিত করে তুলবে, এবং যার ফলে পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে।

আমার খুব জানার ইচ্ছে নিজেকে একজন বড়দরের মানুষ করে তোলার জন্যে মানুষ প্রেরণা পায় কোথা থেকে। এবং কি কারণে অন্য মানুষের দুঃখকষ্ট এবং সর্বনাশের বনিয়াদের উপর নিজের শক্তিমত্তা গড়ে তুলতে চায় মানুষ। অন্য মানুষের দুঃখের ও বেদনার কারণ হয়ে নিজেকে কী করে খ্যাতিমান করে তুলতে চায়। কোনো নৃপতির নূতন-নূতন যুদ্ধজয় তার নিজের রাষ্ট্রকে তার যুদ্ধজয়ের আগের অবস্থা অধিক ধনবান বা ঐশ্বর্যবান করে তোলে না। আর প্রজারা এর থেকে কিছুই লাভ করে না, তিনি যদি মনে করে থাকেন যে, তাঁর প্রজাদের মধ্য দিয়েই তিনি আরও সুখী হয়ে উঠবেন, তবে সেটা তাঁর মস্ত ভুল। সেনাপতিরা যে-যে অঞ্চল জয় করে এসেছেন এমন ক'টা অঞ্চল কবে কোন নৃপতি দেখেছেন? এসব জয় তাহলে কাল্পনিক জয়, যেসব নৃপতি এই জয়গৌরব লাভ করেছেন তা তাহলে কিছু বাস্তব ব্যাপার নয়। যে লোকের কখনো বিশেষ পরিচিত হবারই যোগ্যতা নেই সেই রকম

একটি সাধারণ মানুষের একটা মর্জি চরিতার্থ করার জন্যে হাজার-হাজার মানুষের দুর্গতি হচ্ছে যুদ্ধ।

কিন্তু ধরে নেওয়া যাক যে, বিজেতা সারা বিশ্বটাই তাঁর তাঁবে নিয়ে এলেন, তখন তিনি কি সেই বিজিত বিশ্বটা শাসন করতে পারবেন? যত বড় নৃপতিই তিনি হোন-না কেন, তাঁরও সবকিছুরই একটা সীমা আছে। তাঁর বিজিত সব দেশের নামই তিনি মনে রাখতে পারবেন না, তিনি যে এক বিরাট পুরুষ হয়ে উঠেছেন সেইটেই প্রমাণ করবে তিনি প্রকৃতপক্ষে কত ক্ষুদ্র।

যে দেশ তিনি শাসন করছেন তার আয়তনই তাঁর মর্যাদার মাপকাঠি নয়, পৃথিবীর আরো কয়েকটি মাইলই তাঁকে খ্যাতিমান করে না। তা যদি হত তাহলে যে যত বেশি একর জমির মালিক হত তার খ্যাতি হত তত বেশি।

বিজেতাদের খ্যাতি সম্বন্ধে তিনি যা বলেছেন সেটা মেকিয়াভেলির একটা মস্ত ভুল কথা; তাঁর কালে এটা হয়তো সর্বজনস্বীকৃত ছিল, কিন্তু তিনি যে বিদ্বেষ প্রচার করেছেন তা নিশ্চয় সর্বজনগ্রাহ্য ছিল না। যে ভূমি জয় করা হয়েছে তা করতলগত রাখার জন্যে তিনি যেসব উপায়ের কথা বলেছেন তা ভয়ংকর ব্যাপার।

যদি খুঁটিনাটি করে এসবের বিচার করা যায় তাহলে দেখা যাবে এর একটিও যুক্তিপূর্ণ নয়, ন্যায্যও নয়। এই বিদ্বেষপূর্ণ মানুষটি বলেছেন, তুমি জয় করার আগে ঐসব দেশে যেসব নৃপতি শাসন করতেন তাঁদের একেবারে ধুয়ে-মুছে সাফ করে দিতে হবে। এসব নিয়মের কথা পড়তে গেলে কি ঘৃণায় ও অবজ্ঞায় শরীর শিউরে ওঠে না? এর অর্থই হচ্ছে এই যে, পৃথিবীতে যা-কিছু পবিত্র জিনিস আছে তা সবই পদদলিত করে দাও, এবং নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্যে সব রকম হীনতার ও পাপের দুয়ার খুলে দাও। এর অর্থ কী দাঁড়াল? একজন উচ্চাভিলাষী ব্যক্তি যদি কোনো নৃপতির ভূমি আত্মসাৎ করে নেয়, তাহলে বিষ খাইয়ে বা হত্যা করে তাকে একেবারে মুছে ফেলার অধিকারও কি সে পেয়ে গেল? এই বিজেতাটি যে নিয়ম অনুসরণ করে চলবেন তার পরিণাম আর কিছু না, তার পরিণাম তাঁর নিজেরই সর্বনাশ। অন্য এক ব্যক্তি যদি আসেন যাঁর উচ্চাশা আরও বেশি, যিনি আরও বেশি দক্ষ, তিনি কি এ'কে পরিত্রাণ দেবেন, তিনি এর উপরে ঝাঁপিয়ে পড়বেন, একে শাস্তি দেবেন, এবং এর পূর্বতন ব্যক্তিকে সে যেভাবে আঘাত করেছে তার চেয়েও নিষ্ঠুরভাবে কি একে আঘাত করবেন না? মেকিয়াভেলির কাল

আমাদের এই ধরণের অনেক দৃষ্টান্ত উপহার দিয়েছে। এটা কি কেউ লক্ষ করল না যে, পোপ, ষষ্ঠ আলেকজাণ্ডার গতিচ্যুত হতে হতে বেঁচেছেন তাঁদের পাপের জন্যে ? সেই বিদ্রোহী জারজ সন্তানটি—সিসেয়ার বরগিয়া—তার সমস্ত বিজিত ভূমি থেকে উচ্ছেদ হয়ে শোচনীয় ভাবে মারা গেল ; গ্যালিয়াৎসো স্ফরৎসা মিলানে গির্জার মধ্যে নিহত হল ; লুডোভিকো স্ফরৎসা বলপূর্বক অধিকার করেছিল অনেক ক্ষমতা, ফ্রান্সে লোহার খাঁচায় তার মৃত্যু হল ; ইয়র্ক ও ল্যাংকাস্টারের দুই রাজকুমার কিভাবে নিজেদের বিনষ্ট করল ; গ্রীক নৃপতিরা একে অন্যকে খতম করতে লাগলেন, অবশেষে তুর্কীরা এইসব নৃপতির হীনপন্থা অবলম্বন করেই তাঁদের সমস্ত ক্ষমতার ইতি করে দিলেন ? খ্রীষ্টানদের মধ্যে যদি একালে আর তেমন বিদ্রোহ দেখা না গিয়ে থাকে তাহলে তার কারণ হচ্ছে সুস্থনীতিবোধের আদর্শ তাদের মধ্যে ব্যাপ্ত হয়ে পড়তে আরম্ভ করেছে। মানুষ এখন তার বুদ্ধির ও বোধের চর্চা করছে ; বুনোভাব তাই তাদের কমেছে ; এর জন্যে আমরা হয়তো সেইসব বিচক্ষণ ব্যক্তির কাছে ঋণী যাঁরা ইউরোপকে মার্জিত করে তুলেছেন।

মেকিয়াভেলির দ্বিতীয় অনুশাসন হচ্ছে এই : বিজিতা সব সময় নূতন রাজ্যে তাঁর বসতি স্থাপন করবেন। এটা নিষ্ঠুর কাজ নয়, কোনো ক্ষেত্রে এমনকি এটি বেশ ভালো কাজ বলেই মনে হয়। কিন্তু এটা মনে রাখতে হবে, বড়-বড় নৃপতির রাজ্য এমনভাবে বিস্তৃত যে, তাঁরা অন্য সারা রাজ্যের উপর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি না করে কেন্দ্র পরিত্যাগ করতে পারেন না। এইজন্যে রাজ্যের দূর দূর অঞ্চলকে দুর্বল না করে তাঁদের পক্ষে কেন্দ্র ত্যাগ করা সম্ভব না।

তৃতীয় অনুশাসন বলছে : নূতন ভাবে অধিকৃত এলাকায় উপনিবেশ স্থাপন করতে হবে, এর দ্বারা আনুগত্য লাভ নিশ্চিত হবে। লেখক এই সূত্রে রোমকদের রীতিনীতির উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তিনি এটা বিবেচনা করে দেখেননি তাঁরা যদি তাঁদের উপনিবেশে সেনাদল না পাঠাতেন তা হলে অধিকৃত ভূমি তাঁদের হাতছাড়া হয়ে যেত। লেখক আরো ভেবে দেখেননি যে, রোমকরা জানতেন কিভাবে এইসব উপনিবেশে গভর্নমেণ্টের সমর্থক গোষ্ঠী গড়ে নিতে হয়। রোমক সাম্রাজ্যের গৌরবময় সময়ে তাঁরা ছিলেন সবচেয়ে বুদ্ধিমান লুণ্ঠনকারী যাঁরা নাকি পৃথিবীকে প্রায় রসাতলে পাঠিয়েছিলেন। অসৎ উপায়ে তাঁরা যা অর্জন করতেন বুদ্ধির কৌশলে তাঁরা তা রক্ষণাবেক্ষণ

করতেন। অবশেষে, বিজেতাদের পরিণাম যা হয় এই সাম্রাজ্যেরও তাই হল, এটি ধ্বংস হয়ে গেল।

এখন আমরা বিচার-বিবেচনা করে দেখতে পারি, এইসব উপনিবেশের জন্যে মেকিয়াভেলি যেসব অবিচার করার জন্যে নৃপতিদের উস্কানি দিয়েছেন, ও কার্যকর বলে অভিমত দিয়েছেন, প্রকৃতপক্ষে সেগুলি তাই কি না। হয়, নূতন অধিকৃত ভূমিতে বলিষ্ঠ উপনিবেশ পত্তন কর, অথবা দুর্বল উপনিবেশ। যদি বেশ শক্ত কাঠামোর উপনিবেশ গড়তে চাও তাহলে তোমার রাজ্যের থেকে জনবল বেশ কমে যাবে। সেইসঙ্গে তোমার নূতন প্রজাদেরও বিতাড়িত করা হয়ে যাবে, যার ফলে তোমার শক্তি কমবে, তুমি দুর্বল হবে। শক্তি দুর্বল হলে অধিকৃত ভূমি সংরক্ষণও ভালোভাবে হবে না। এই ফল দাঁড়াবে এই যে, যাদের বিতাড়িত করেছ তাদের মধ্যে অসন্তোষই ছড়ানো হল, কিন্তু এতে তোমার কোনো লাভ হল না।

তাহলেই নূতন অধিকৃত ভূমিতে সেনাবাহিনী পাঠাতে পার, যারা তাদের সামরিক শিক্ষার ফলেই প্রজাদের উপর পীড়ন করবে না এবং যেসব শহরে তারা থাকবে সেখানে কাউকে হয়রান করবে না।

এই পলিসিটাই অনেক ভালো। কিন্তু মেকিয়াভেলির আমলে এটা জানা ছিল না। সে আমলের নৃপতিরা শক্তিশালী সেনাদল রাখতেন না। যেসব সেপাই তাঁদের ছিল তারা বেশির ভাগই ছিল দস্যু-জাতীয়, বলপ্রয়োগ ও লুণ্ঠন করাই যাদের ছিল কাজ। তখন জানাই ছিল না, শান্তির সময়েও সেনাবাহিনীকে প্রস্তুত রাখতে হয়, তাদের রক্ষণাবেক্ষণ করতে হয়। তখন জানাই ছিলনা যে, সেনাদের রসদ জোগান দেবার জন্যে ডিপো রাখতে হয়, ব্যারাক রাখতে হয়, এবং হাজার রকমের উপকরণ রাখতে হয়, যাতে নাকি শান্তির সময়েও প্রতিবেশী রাষ্ট্রের পাশে নিরাপদে থাকা যায়। এসবের জন্যে অনেক টাকা ব্যয় হবেই, এবং তা মেনেও নিতে হবে।

"বড়-দরের নৃপতি তাঁর প্রতিবেশী ছোট-ছোট নৃপতিদের আকর্ষণ করে নিয়ে আসবেন, তাদের রক্ষা করবেন। তাদের মধ্যে বিরোধের বীজ ছড়াবেন, যার দ্বারা তাঁর খুশি মত তিনি ওদের বসাতে বা খসাতে পারেন।" মেকিয়াভেলির চতুর্থ নির্দেশ এই। এই নির্দেশ অনুসারেই কাজ করেছিলেন সেই বর্বর রাজা ক্লডউইগ, যিনি পরে খ্রীষ্টান হন। এবং তাঁর মতনই নিষ্ঠুর আরও অনেক নরপতি। কিন্তু এই অত্যাচারী রাজাদের ও একজন সৎ লোকের

মধ্যে কত তফাত। সৎ ব্যক্তি ছোট-ছোট নৃপতির মধ্যের বিরোধ মিটিয়ে দিতেন একজন মধ্যস্থ হয়ে, আপসে তাঁদের মতভেদ চুকিয়ে দিতেন, তাঁর সততার জন্যে নৃপতিদের আস্থাভাজন হতেন ঐ সৎ ব্যক্তি তাঁর নিরপেক্ষতার নীতিতে এবং তাঁর স্বার্থত্যাগের জন্যে। তাঁর এই বোধ ও বুদ্ধির জন্যে তিনি প্রতিবেশীদের কাছে জনকরূপে স্বীকৃত হতেন, তাঁর ক্ষমতার দ্বারা তিনি রক্ষা করতেন, সর্বনাশ করতেন না।

এটাও সত্য যে, যেসব নৃপতি বলপ্রয়োগ করে অন্য নৃপতিদের উচ্চ আসনে বসাবার চেষ্টা করেছেন তাঁরা নিজেরাই নিজের পতন ঘটিয়েছেন। বর্তমান শতক এ ব্যাপারে আমাদের দুটি দৃষ্টান্ত দেখিয়েছে, এর একটি দ্বাদশ চার্লস—ইনি পোলাণ্ডের সিংহাসনে বসাতে চেয়েছিলেন স্ট্যানিসলাউসকে, আর একটি দৃষ্টান্ত আরও হাল আমলের।

পরিশেষে আমি এই কথা বলতে চাই যে, একজন বিজেতা তাঁর খ্যাতির জন্যে লালায়িত হবেন না। মানবজাতির কাছে হত্যা করা কাজটা ঘৃণ্য বলে স্বীকৃত হবে। যেসব নৃপতি তাঁদের নূতন প্রজার উপর উৎপীড়ন ও অবিচার করেন, প্রজাদের শ্রদ্ধা না পেয়ে অশ্রদ্ধাই তাঁরা পাবেন; অপরাধকে কখনো সমর্থন করা যায় না, যাঁরা এসব সমর্থন করতে চেষ্টা করবেন তাঁরা মেকিয়াভেলির মতই ভুল পথে যাবেন।

মানুষের কল্যাণের বিরুদ্ধে কাউকে উত্তেজিত করা কিংবা চাপ দিয়ে কাজ করানো হচ্ছে অনেকটা যেন সেই তরবারি দিয়ে নিজেকে জখম করা যে তরবারি আমাদের দেওয়া হয়েছিল আত্মরক্ষার জন্য।

অ্যাডল্‌ফ ফ্রেইহের ফন ক্লিগ

পরস্পরের মধ্যে মানুষের ব্যবহার সম্পর্কে

অ্যাডল্‌ফ্‌ ফ্রেইহের ফন ক্লিগ (১৭৫২-১৭৯৬) অনেকগুলি বই লিখেছিলেন, কিন্তু আমাদের কালে তাঁর একটি বই এখনো বেশ পরিচিত। বইটি প্রকাশিত হয় ১৭৮৮ সালে, তার নাম "অন্‌ দি ইনটারকোর্স উইথ পিপ্‌ল"। বইটির নাম জানা মাত্র এর খুব চাহিদা হয় এবং জার্মানীর ঘরে-ঘরে বইটির নাম ছড়িয়ে পড়ে।

বইটির প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে সব রকম স্তরের মানুষের মধ্যের সম্পর্ক—

পারিবারিক পরিবেশ থেকে আরম্ভ ক'রে সমাজের উঁচুতলার মানুষ অবধি সকলের সম্পর্কে; নানারকম অবস্থার মধ্যে কি কি করণীয় সে সম্বন্ধে অনেক উপদেশ এতে আছে। সাধারণ মন্তব্য থেকে আরম্ভ করে আচার আচরণের বিশেষ নিয়ম, এবং পার্থিব জ্ঞান ও নৈতিক বোধ, সব মিলে বইটি হচ্ছে কুসংস্কার-পরিত্যাগের যুগের একটি জনপ্রিয় উপায়ের দলিল স্বরূপ। ক্লিগ-এর সাধারণ ভাবে যেসব অভিমত প্রকাশ করেছেন তার বেশির ভাগই ধনী ও সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর ব্যক্তিদের কঠোর সমালোচনা—যাঁরা নাকি সমাজের উচ্চ আসনে বসার সুযোগ পেয়ে নৈতিক ভাবে ভ্রষ্ট হয়ে যান। সমাজকে বিভিন্ন স্তরে অসম ভাবে বিভক্ত করার বিরুদ্ধে প্রবল আক্রমণ আছে এই বইতে, এর দ্বারা জন্মসূত্রে কেউ-বা পেয়েছে বিশেষ সুবিধা, কারও ভাগ্যে জুটেছে এর বিপরীত অবস্থা—কার কি যোগ্যতা বা কর্ম-ক্ষমতা এর দ্বারা তা করা হয় না। ঐশ্বরিক কোনো বদান্যতা জাতীয় সর্বপ্রকার সংস্কার পরিবারের কথা জোর ভাষায় এতে বলা হয়েছে। জনসাধারণের সর্বময় ক্ষমতার কথা এত পরিষ্কার ভাবে বলা হয়েছে যে, আমরা অতি সহজে পরিষ্কার ভাবে গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক পদ্ধতির বিষয়টি বুঝতে পারি—যার অর্থ হল জনগণের প্রতিনিধির দ্বারা শাসন-পরিচালনা।

পৃথিবীর ক্ষমতাবানেদের সঙ্গে—নৃপতি, সম্ভ্রান্তজন এবং ধনবান—সম্পর্ক :

এ কথা বলা ভুল যে সব নৃপতির সব সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির ও সব ধনীর সাধারণভাবে একই রকমের দোষ, যার দরুণ তাঁরা অসামাজিক হয়েছেন, ব্যবহারে নিষ্প্রাণ হয়েছেন, এবং প্রকৃত বন্ধুতার অনুপযোগী হয়েছেন, এবং যার জন্যে তাদের সঙ্গে ওঠা-বসা বড় কঠিন। কিন্তু কেউ যদি বলেন যে, বেশির ভাগই এ-দোষে দোষী, তাহলে তিনি ভুল করবেন না। এদের কোনো শিক্ষা দেওয়া হয় নি, তোষামোদের দ্বারা শিশুকাল থেকেই তাদের নষ্ট করা হয়েছে, নিজেরাও নিজেদের বেশি কদর দিয়েছেন তাঁরা, অন্যেরাও তাঁদের অযথা আদর দিয়েছে। তাঁরা যে পরিবেশের মধ্যে মানুষ তাতে তাঁরা অভাব বা অনটন বলে কিছু জানেন না, সুতরাং কোনো দুর্দশায় বা অসুবিধায় তাঁদের পড়তে হয় না, এইজন্যে তাঁরা জানেনই না মানুষের প্রয়োজন কি-কি এবং কতটা; তাঁরা জানেন না পৃথিবীর অনেক দুর্ভোগ একা-একা বহন করা

কতটা কঠিন ; তাঁরা জানেন না সমব্যথীর সান্ত্বনাবাক্য লাভ করা কত মধুর ; অন্যের জন্যে কিছু করা কতটা দরকার, প্রয়োজন হলে একদিন তার আশ্রয় নিতে হতে পারে—এ সবও তাঁরা জানেন না।

তাঁরা নিজেদেরও চেনেন না, এর কারণ, ভয়ে বা আশায়, কেউ তাঁদের বুঝতে দেন না যে, তাঁদের ত্রুটিপূর্ণ কাজের জন্যে বা দোষের জন্যে কি রকম প্রতিকূল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। তাঁরা নিজেদের খুব উচ্চমানের মানুষ বলে মনে করেন, শাসন করা ও শোষণ করার জন্যেই যেন প্রকৃতি তাঁদের এই সুবিধাজনক অবস্থায় বসিয়ে দিয়েছেন, যারা নিম্নস্তরের লোক তারা যেন তাঁদের আত্মম্ভরিতার স্তুতি করার জন্যেই, তাঁদের গর্বে ইন্ধন দেবার জন্যে, তাঁদের খেয়ালখুশি সহ্য করার জন্যে এবং তাঁদের পছন্দকে তারিফ করার জন্যেই জন্ম নিয়েছে।

যাঁরা বিত্তবান ও শক্তিমান তাঁদের বেশির ভাগই যখন এই বিবরণের সঙ্গে মিলে যাচ্ছেন, তখন তাঁদের সঙ্গে ব্যবহারের সময় প্রত্যেকের আচরণের ভিত্তি হওয়া উচিত এই রকমই। ভাবতে বেশ ভালো লাগে যে, এই ধরণের মানুষদের মধ্যে এমন একজনের সঙ্গে দেখা হল যিনি তাঁর সম্ভ্রান্ততার গৌরবের সঙ্গে নিজস্ব কোনো গুণ মিশ্রণ করে নিতে পেরেছেন, যাঁর রুচি বেশ মার্জিত, যিনি বেশ সহৃদয় এবং সংস্কৃতিবান্--এ রকম নিশ্চয়ই হতে পারে, উপযুক্ত ও ভদ্র শিক্ষা দিলে এ রকম না হবার কথা নয়। আবার বলি : এমনকি নৃপতিদের মধ্যেও এমন লোক আছেন, কিন্তু তাঁদের সংখ্যা বড় নগণ্য, এবং তাঁরা তাঁদের সুনাম আমাদের বিশেষ জানতে দেন না। এ ব্যাপারে বিশেষ গুরুত্ব দিতে আমি বলিনে, এবং সাংবাদিকদের ভেরীনিনাদে কান দিতেও বলিনে। বড় দুঃখের সঙ্গেই বলছি, সর্বজনমান্য এরকম শ্রদ্ধার পুত্তলি ও জনগণের প্রিয়পাত্র আমি দেখেছি, মানবজাতির পৃষ্ঠপোষক, যা-কিছু সৎ যা-কিছু সুন্দর ও মহৎ তাঁরা তারই পূজারী বলে অনেক জয়ঢাকও বাজানো হয়েছে, কিন্তু কাছের দেখে তাঁদের দেখে বোঝা গিয়েছে—কত অসহায় কত ক্ষুদ্র কত হতভাগ্য তাঁরা। প্রশংসাই হোক বা নিন্দাই হোক—যেসব নৃপতি সম্বন্ধে খুব কম বলা হয় তাঁরাই সবচেয়ে ভালো নৃপতি না হতে পারেন। তাঁদের নষ্ট করায় বা নীতিভ্রষ্ট করায় কোনো অংশ নিয়ো না, বিশেষ ক'রে তাঁদের সন্তানদের। তাঁদের খোশামোদ কোরো না, তাঁদের গর্ব অহংকার এবং তাঁদের ফাঁকা ইন্দ্রিয়পরায়ণ কোনো ফুর্তিতে উৎসাহ দিয়ো না। জন্মগত

গুণাবলীর জন্যে তাঁরা যে বিরাট হয়ে উঠেছেন, রাজসিক অধিকার পেয়ে গিয়েছেন—এ রকম অসম্ভব দাবি সমর্থন কোরো না, এ ব্যাপারে তাদের তেল দিয়ো না। কখনো কপট হবে না। সত্য কখনো গোপন করবে না, সত্য যদি অপ্রিয় হয়, তবুও না। কোনো রকম অসৌজন্য না দেখিয়ে খোলাখুলি ভাবে কথা বলবে—শুধু লক্ষ রাখবে তাতে নিজের যেন কোনো ক্ষতি না হয়। কোনো মহৎ ব্যাপারের নিন্দা করা হলে, কোনো পুণ্যাত্মার অপযশ করা হলে, কিংবা আদালতের চক্রান্তে কোনো মান্যব্যক্তির সুনাম কলুষিত করা হলে এসবের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে। কিন্তু সাবধানে এ কাজ করবে, তাদের শত্রুদের মধ্যে তিক্ততা না বাড়িয়ে এবং নিজের অবস্থা বিবেচনা করে এ কাজ করবে। যারা দীনদরিদ্র, যারা ভিতু ও নম্র, বেশ হতাশাচ্ছন্ন ও অবিচারে পীড়িত, যারা সমাজের এতই অধস্তন যেন রাজপ্রাসাদে যেতে ভয় পায়, তখন নিজের বিচারকেই কাজে লাগিয়ে তাদের ইচ্ছা তাদের সুনাম ও তাদের অনুরোধ সমর্থন করবে। এ কথা বিশ্বাস করা কঠিন যে, একজন সম্মানিত ও যুক্তিবাদী মানুষের পরামর্শ একজন শক্তিমানের উপর কতটা প্রভাব বিস্তার করতে পারে। নিজের আত্মশ্লাঘা চরিতার্থ হলেই কত সহজে সেই পরামর্শের তাঁরা একটা অর্থ করে নেন, এর ফলে তাদের কী প্রবল একটা ধারণা জন্মে যায়, যদি এর ফল তখনই হাতে নাতে পাওয়া যায় না।

একজন দুর্বল মান্যব্যক্তির সুনজর লাভ করা ভীষণ দুর্ভাগ্য, এ রকম কি হতে চাও? কখনো ভেবোনা যে, এই সুখ ক্ষণস্থায়ী, ভেবোনা যে কোন স্তাবক এসে তোমাকে তোমার স্থান থেকে সরিয়ে দেবে; কেবল তোমার সুলতানকে জানিয়ে দাও যে, তুমি তাঁর দাক্ষিণ্যের উপরেই পুরো নির্ভর কর না; এবং স্বজনদের বুঝিয়ে দাও যে এই সামান্য সুবিধাকে কত তুচ্ছ মনে কর; এবং জানিয়ে যাও যে তোমার নৈতিক অস্তিত্বের পক্ষে এই যৎপরোনাস্তি সামান্য ও আকস্মিক সৌভাগ্য কত অপ্রয়োজনীয়। তার পর যখন তুমি গভীর দুর্ভাগ্যের মধ্যে পড়ে যাবে তখন স্বজনেরা হয়তো তোমাকে ধ্বংসপ্রাপ্ত নিঃস্ব মানুষ মনে করে পরিত্যাগ করবে না; কিন্তু অকৃতজ্ঞ ও অনাচারী মানুষেরা মনে করবে তাকে ছাড়াই চলতে পারে এমন অনেক মানুষ আছে। শক্তিমানের বন্ধুত্বের একাগ্রতার ও আনুগত্যের উপর কখনো নির্ভর করবেন না। যতক্ষণ তাদের দরকার ততক্ষণই তারা তোমার কদর দেয়। তাঁরা চপলমতি,

অন্যের ভালোর চেয়ে মন্দ চিন্তা করতেই তারা অভ্যস্ত, এবং সবচেয়ে, শেষে এসে যে কিছু বলে যায় তার কথাই বিশ্বাস করে।

কিন্তু যতক্ষণ তার সুনজরে আছে ততক্ষণ তাদের ন্যায়নিষ্ঠ হবার, অনুগত হবার ও সত্যবাদী হবার এবং সঙ্গীসাথীদের ভালোবাসবার জন্য তাদের উৎসাহ দেবে। তাদের কখনো ভুলতে দিয়ো না যে, তারা যা হয়েছে ও যা পেয়েছে তা কেবলমাত্র জনসাধারণের সম্মতিতেই লাভ করেছে; যদি জনসাধারণের অকল্যাণ তারা করে তাহলে এ সবই হাতছাড়া হবে। তাদের ভুলতে দিয়ো না যে, আমাদের অধিকারে যা আছে এবং আমাদের এই-যে অস্তিত্ব—এসব তাদের সমাপ্তি নয়—কিন্তু তাদের যা আছে তা সবই আমাদের সম্পত্তি, কেননা আমরাই তো তাদের ও তাদের পরিবারের চাহিদা মেটাই, আমরাই তাদের পদমর্যাদা দিই, সম্মান দিই, নিরাপত্তা দিই, তাদের বংশীবাদকদের ও বেহালাবাদকদের বেতন দিই আমরাই। তাদের আরও ভুলতে দিয়ো না, এই সংস্কারমুক্ত আলোকপ্রাপ্ত যুগে এ কথা বিশ্বাস করার মতন আর একজনও কেউ থাকবে না যে, একটি মাত্র ব্যক্তি যে নাকি সম্ভবত সবচেয়ে দুর্বল ও অপদার্থ, সেই হাজার হাজার বুদ্ধিমান ও যোগ্য লোকের উপর লাঠি ঘোরাবে। এ সত্ত্বেও তারা শান্তিতে ঘুমাক, কোনো শান্ত্রী বা সেপাইয়ের পাহারা ছাড়াই তারা নিশ্চিন্ত থাকুক। এ ভাবে তারা ঘুমাতে পারবে যদি কৃতজ্ঞ দেশবাসী—যাদের নাকি সে সেবক—তাকে ভালোবাসে ও ঈশ্বরের কাছে তার জন্যে শুভাশিস প্রার্থনা করে।

এ কথা ঠিক যে এই সাচ্চা কথাগুলি একটু রেখে-ঢেকে বলতে হবে, তাহলেই হয়তো ঐ সম্ভ্রান্ত ও শক্তিশালী মানুষদের বিগড়ে-যাওয়া কানে একটু সুরেলা ধ্বনির মতন বাজবে।

জোহান গটফ্রায়েড হারডার

প্রথম দিকে তিনি যেসব সমালোচনা মূলক প্রবন্ধাদি লেখেন তার জন্যই জোহান গটফ্রায়েড হারডার (১৭৪৪-১৮০৩) কুসংস্কর-মুক্তি-আন্দোলনের প্রত্যক্ষ প্রতিনিধি-রূপে স্বীকৃত। তাঁর রচনায় তিনি যে-সব মতবাদ প্রকাশ করেছেন তার দ্বারা কুসংস্কার-মুক্তি সম্পর্কিত যে দার্শনিক তত্ত্ব তা আরও প্রসারিত ও প্রচারিত হয়েছে। মানুষের মধ্যে মানবিকতা-বোধের যে অগ্রগতি ঘটেছে তার জন্যে ইতিহাসের ভূমিকা সম্বন্ধে তাঁর ধারণা এর মধ্যে

অন্যতম। সমস্ত প্রকার সভ্যতার জন্য ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর যে তাৎপর্য আছে—এ বিষয়ে তাঁর অভিমত ছিল কিছুটা বিপরীত, এবং কবিতা সম্বন্ধে তাঁর যা ধারণা তারও একটু বৈশিষ্ট্য আছে। তিনি বেশ জোর দিয়ে যে কথা বলতে চেয়েছিলেন তা হচ্ছে: কেবল মাত্র চেতনাহীন যুক্তিই সব কথা নয়, সবচেয়ে বেশি যা প্রয়োজন তা হচ্ছে হৃদয়ের উত্তাপ ও ভাবাবেগের শক্তি। হারডারের মতে কবিতার উৎপত্তি হচ্ছে প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সংযোগ থেকে; এটা একেবারে মৌলিক জিনিস, কোনো বিশেষ ভড়ং বা কাঠামো এর জন্যে একেবারেই দরকার নেই। এই জন্যেই হারডার লোকগীতির প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, নানা জাতির ও নানা সময়ের অনেক পল্লীগীতি তিনি নিজেই সংগ্রহ করেছিলেন।

কবিতা সম্বন্ধে এবং ভাষা সম্বন্ধে তাঁর ধারণা তিনি প্রকাশ করেছেন তাঁর "এ ট্রু পোয়েট মাস্ট রাইট ইন হিজ ওন্ লাঙ্গুয়েজ" রচনায়। ভাষা, কবিতা এবং চিন্তাধারা স্বাভাবিকভাবে একই সঙ্গে যুক্ত থাকবে, এদের কখনোই পৃথক করা যাবে না। ভাষা কেবলমাত্র যোগাযোগ রক্ষার বা ভাব প্রকাশের মাধ্যম নয়—যদিও এ কাজগুলি ভাষারই করণীয়; মাতৃভাষারূপে এই ভাষাই মানুষের চিন্তার ও ভাবাবেগ প্রকাশের শক্তি জোগায়। কেবলমাত্র পরিষ্কার করে প্রকাশ করায় বা সংক্ষেপে বক্তব্য ব্যাখ্যা করাই ভাষার ঐশ্বর্য নয়, ভাষার ঐশ্বর্য হচ্ছে অনুপ্রাণিত করার শক্তিতে এবং প্রকৃতির সঙ্গে নিবিড় সংযোগ রক্ষার ক্ষমতায়। এখানে হারডারের যে রচনার অংশবিশেষ উদ্ধৃত হচ্ছে তার থেকেই দেখা যাবে যে, তিনি পরিষ্কার ধারণার বশবর্তী হয়ে দার্শনিক ভাষা ব্যবহার করেন নি, তিনি কল্পনার ও কাব্যিক ভাবাবেগের বশবর্তী হয়েই তার বক্তব্য প্রকাশ করেছেন। তাঁর দুটি সংক্ষিপ্ত রচনা "দি ইটারন্যাল বারডেন" ও "দি আফ্রিকান জাজমেণ্ট" আকার প্রকারের দিক থেকে লেসিং-এর উপকথার সঙ্গে তুলনীয়। এটা লক্ষণীয় যে রচনা দুটির পটভূমিকা হচ্ছে বিদেশ, কিন্তু ভিন্ন পরিবেশের ইউরোপের প্রতি এতে অঙ্গুলি-নির্দেশ করা হয়েছে।

প্রকৃত কবি নিজের ভাষায় কবিতা লিখবে

আমি আরও এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে বলব যে, কবিতায় চিন্তা ও প্রকাশভঙ্গি যদি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত তাহলে আমি সেই ভাষায় কবিতা লিখব, যে ভাষার প্রতিটি শব্দের ওজন ও তাৎপর্য আমি নিখুঁতভাবে বিচার করে

দেখতে পারব, যে ভাষার উপর পরিপূর্ণ দখল আমার আছে, সে ভাষার সম্বন্ধে আমার ধারণা পরিষ্কার, অন্তত যে ভাষার কোনো বক্তব্য প্রকাশ করায় ধৃষ্টতা কখনোই স্বেচ্ছাচারিতা বলে মনে হবে না বলে আমায় দৃঢ় বিশ্বাস আছে, এবং নিঃসন্দেহে বলতে পারি, সে ভাষা আমার মাতৃভাষা। এইটেই প্রথম ভাষা আমাদের উপরে যা নাকি আরোপিত হয়, আমাদের শিশুকালে এই ভাষার শব্দের মধ্য দিয়েই আমরা পৃথিবীর রূপ ও রূপকের সঙ্গে পরিচিত হই, তাই এই ভাষাই কবির পক্ষে ঐশ্বর্যের আধার। কবি তাই তার মাতৃভাষার মধ্য দিয়েই অতি সহজে ও সাবলীলভাবে তার মনের ভাব প্রকাশ করতে পারবে, এবং কবিতার যা প্রধান সম্পদ সেই প্রতীক ও বর্ণালী এই ভাষাতেই ব্যক্ত করতে পারবে কবি। ঈশ্বরের প্রতিভূ রূপে অশনি-নিপাতের ধ্বনি ও বিদ্যুতের চমক সে এই ভাষাতেই বাজিয়ে ও জ্বালিয়ে তুলতে পারবে। আমাদের চিন্তার ধরণ এই ভাষার মধ্যেই যেন নিহিত। আমাদের আত্মা, আমাদের কান, আমাদের জিহ্বা এই ভাষার সঙ্গে জড়ানো। আমাদের মাতৃভাষা ছাড়া অন্য কোন্ ভাষায় আমর তাহলে আমাদের বক্তব ভালোভাবে প্রকাশ করতে পারব? আমার স্বদেশ যেমন আমাদের কাছে সকল দেশের সেরা, সেই রকম এই ভাষাও প্রত্যেক মানুষের কাছে সবচেয়ে বেশি রমনীয়—এই ভাষার বুকেই সে মানুষ, এই ভাষার স্তন্যপান করে সে পেয়েছে জীবন, এই ভাষার অভিভাবকত্বেই সে পেয়েছে জীবনের প্রথম পাঠ। পরিণত বয়সে এই ভাষাই হয়েছে তার জীবনের আনন্দ, শেষ-জীবনে এই ভাষাই হবে তার আশা ও গৌরব।

যে বিশ্বাস যে ধারণা এবং যে প্রতীক একটি শিশুর মনে রেখাপাত করে আছে, সেই যখন নূতন প্রতীকের ও ধারণার সাক্ষাৎ পায় তখন সে এই উভয়ের মধ্যে তুলনা করতে আরম্ভ করে, ঠিক সেই ভাবেই অন্য অনেক ভাষা সে মাতৃভাষার সঙ্গে মিশিয়ে নেয়। প্রথম ঐ ভাষা যেন থাকে তার জিভের ডগায়, তারপর ধীরে ধীরে ঐ ভাষার পার্থক্যটুকু তার মনের মধ্যে গেঁথে যায়। এসব সে মনে রেখে দেয়। তারপর যখন নিজের ভাষার মধ্যের কোনো অভাব বা দৈন্য বুঝতে পারে, এবং বিদেশী ভাষার প্রাচুর্য ও ঐশ্বর্য ধরতে পারে, তখন নিজের ভাষার সম্পদ নিয়ে তার যেমন গর্ব বোধ করে, সেইসঙ্গে পরদেশী ভাষার সম্পদ গ্রহণ করে নিজের ভাষার ত্রুটি শুধরে নেয়। মাতৃভাষাই, বলতে গেলে, পথপ্রদর্শক। এর সাহায্য ছাড়া বহু বিদেশী ভাষার গোলকধাঁধায় আমাদের

পথ হারিয়ে যাবে। মাতৃভাষা যেন একটি জাহাজ, ঐ সব ভাষার সমুদ্রে ডুবে যাওয়ার হাত থেকে এর জন্যেই আমরা রক্ষা পাই। অন্য অজস্র ভাষার বৈচিত্র্যের মধ্যে মাতৃভাষাই এনে দেয় একতা। নিজের ভাষা ভুলে যাবার জন্যে আমি বিদেশী ভাষা শিক্ষা করিনে; নিজের দেশীয় আচার-আচরণ ভুলে যাবার জন্যে আমি বিদেশে ভ্রমণ করতে যাইনে, অন্য দেশের নাগরিকত্ব নিয়ে আমি আমার দেশের নাগরিক অধিকার হারাতে চাইনে, কেননা এ'তে লাভের বদলে ক্ষতিই বেশি। আমি বিদেশের বাগানে ঘুরে বেড়াই ফুল আহরণের জন্যে—আমার ভাষাকে সজ্জিত করার অভিপ্রায়ে, এ যেন আমার চিন্তার এক প্রেয়সী মাত্র। আমি বিদেশী ধরণধারণ শিখে নিতে চাই, এ যেন অনেকটা বিদেশী আকাশের সূর্যতাপে পেকে উঠেছে যে ফল তা আমাদের স্বদেশের প্রতিভার পাদপদ্মে উপহার দেবার জন্যে।

এ কথা অতি সত্য যে, যে কবি তার ভাবপ্রকাশের উপর বলিষ্ঠ দখল চায়, দেশের মাটির প্রতি তার অকুণ্ঠ বিশ্বাস থাকা চাই। নিজের দেশ সে চেনে বলেই সে সবচেয়ে লাগসই শব্দটা বেছে নিতে পারবে। এখানে সে পুষ্প চয়ন করতে পারে, কেননা এ মাটি তার। এখানে গভীর অগাধে যেতে পারে এবং স্বর্ণসন্ধান করতে পারে, এখানে সে চূর্ণ করতে পারে পাহাড়, নদীর গতিপথ বদলে দিতে পারে—কারণ এ দেশের সে সম্রাট। যে কোনো মুহূর্তের প্রকৃত মনোভাব নিজের ভাষাতেই প্রকাশ করা সম্ভব। আমি আমার দুর্বলতা কবুল করতে সঙ্কোচবোধ করছি, এবং অকপটে স্বীকার করছি যে, একটি মাত্র ভাষা ছাড়া অন্য কোনো ভাষা সম্পূর্ণভাবে বুঝবার যোগ্যতা আমার নেই। সম্পূর্ণভাবে কথাটার দ্বারা আমি এই কথা বলতে চাই যে, আমাদের সামনে তিনজন ভদ্রলোক আছেন, তাঁরা ফরাসী ইতালীয় ও ইংরেজী কথা বলছেন, এবং তিনজন স্কুলমাস্টার আছেন ল্যাটিন গ্রীক ও কপটিক ভাষায় যাঁরা পারদর্শী—তাঁরা কেউ আমার কথার প্রতিবাদ করতে পারবেন না। তাঁদের মধ্যের যে-কোনো একজন যদি তিন ভাষায় বলতে পারেন তাঁর আগে অন্যেরা কি-কি কথা বলেছেন, এবং কে সবচেয়ে ভালো-ভাবে মনোভাব প্রকাশ করতে পেরেছেন এবং তাঁর পরে কে কোন্ কথা পুনরায় বলতে পারেন, তাহলে আমি তাঁকে অভিনন্দন জানাব। কিন্তু তাঁদের কথা থাক্। আমি সক্রেটিসের মৃত আত্মাকে আহ্বান করে এ ব্যাপারে তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করব, যিনি ভান করতেন যে তিনি অজ্ঞ। তাঁকে জিজ্ঞাসা

করব হোমরের মতন কেউ কি একাধিক ভাষার মতন অমন পারদর্শী আছেন, এবং মৃত্যভাষায় কেউ কি পিণ্ডার বা হোরেস হতে পেরেছেন, নিজের ভাষায় কি কেউ শেক্সপীয়রের মতন দক্ষ হতে পেরেছেন? তার পর আমি ব্রুটশের মতন পড়ে গিয়ে আলিঙ্গন করব মাটিকে, যে মাটি আমার জননী, এবং তাঁরই ভাষা হবে আমার কবিতার ঈশ্বরী।

চিরন্তন বোঝা

খলিফ হাক্কাম জাঁকজমক খুব ভালো বাসতেন। তিনি তাঁর প্রাসাদের বাগান আরও সাজিয়ে তুলতে ও বড় বড় করে তুলতে ইচ্ছা করেন। তিনি আশপাশের সব জমি কিনে নিলেন, মালিকরা যা দাম চাইলেন তাই দিলেন। কাছেই থাকতেন দরিদ্র এক বিধবা মহিলা। তিনি উত্তরাধিকার সূত্রে তাঁর পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে যা পেয়েছেন তার মনের পবিত্রবোধের বশবর্তী হয়ে কিছুতেই সে জমি হাতছাড়া করতে চাইলেন না। এই মহিলার এই মনোবল দেখে রাজপ্রাসাদের তত্ত্বাবধায়কের খুব রাগ হল। সে জোর করে এই বিধবার সামান্য সম্পত্তি নিয়ে নিল। এই দরিদ্র মহিলাটি তখন কাঁদতে-কাঁদতে বিচারপতির কাছে এসে হাজির হলেন।

সেই সময় ইব্‌ন্ বেশ্‌শির ছিলেন জেলার বিচারক। তিনি মামলাটা শুনলেন, এবং বুঝলেন যে, এর মধ্যে বেশ কলকৌশল আছে। আইনের চোখে বিধবার পক্ষেই রায় যাবার কথা, কিন্তু ঐ নৃপতিকে সামাল দেওয়া কঠিন হল, কেননা সে তার মর্জি-মাফিক কাজ করতেই চায়, সে আসল বিচার চায় না; পুরনো আইনকে স্বেচ্ছায় গ্রাহ্য করতেও নারাজ।

এ ক্ষেত্রে একজন খাঁটি বিচারক কী করবে? সে একটা খচ্চরের পিঠে জিন লাগালো, তার গলায় মস্ত একটা থলে ঝুলিয়ে দিল, এবং তৎক্ষণাৎ রাজবাগানের দিকে যাত্রা করল। বিধবার জমিতে সে যে সুন্দর দালানটি বানানো হয়েছে ঘটনাচক্রে খলিফ তখন সেখানে।

খচ্চরের গলায় থলে ঝুলিয়ে তার পিঠে চেপে বিচারকের আগমন দেখে খলিফ একটু আশ্চর্য হল। কিন্তু ইব্‌ন্ বেশশির যখন তার পায়ের উপর লুটিয়ে পড়ল তখন সে আরও আশ্চর্য হয়ে গেল, ইব্‌ন বলল, "হুজুর, এই জমি থেকে মাটি নিয়ে ঐ থলি ভরতি করে নিতে অনুমতি করুন।" হাক্কাম এতে রাজি হল। থলি ভরতি হলে হাক্কামকে ইব্‌ন্ অনুরোধ করল খচ্চরের পিঠে এটি

তুলে দেবার জন্যে সাহায্য করতে। এ অনুরোধে আরও আশ্চর্য হল হাক্কাম। কিন্তু লোকটার মতলব বুঝবার জন্যে হাক্কাম হাত লাগাল। কিন্তু থলিটা তোলা গেল না, তখন থলিফ বলল, "এটা বড্ড ভারি, তোলা কষ্ট, বিচারপতি।" মৃদু গলায় ইব্‌ন্‌ বলল, "হুজুর, এটা খুব ভারি মনে হচ্ছে আপনার। কিন্তু বিধবার যে জমি আপনি অন্যায়ভাবে অধিকার করেছেন, এতে তো আছে তার মাত্র একটি সামান্য অংশ। তাহলে পুরো জমিটার ভার আপনি সইবেন কী করে। শেষবিচারের দিনে বিশ্বের বিচারক যদি সবটা জমি আপনার ঘাড়ে চাপিয়ে দেন ?" এ কথা শুনে খলিফ হতবুদ্ধি হয়ে গেল। বিচারকের বুদ্ধির ও সাহসের তারিফ করল। এবং ঐ জমিতে যে দালান তোলা হয়েছে সে সবশুদ্ধ ঐ জমি প্রত্যর্পণ করল বিধবাকে।

আফ্রিকা দেশীয় বিচার

মাসিডোনিয়ার আলেকজাণ্ডার একদা আফ্রিকার একটি দূর-অঞ্চলে এসে উপস্থিত হন। জায়গাটা সোনায় ভরা। স্থানীয় অধিবাসীরা তাঁর কাছে গেল এবং সোনার ফলে ভরা অনেকগুলি পাত্র তাঁকে দিল। আলেকজাণ্ডার বললেন, "তোমরা কি বাড়িতে নিজেরা এই ফল খাও। আমি তোমাদের ঐশ্বর্য দেখতে আসিনি, আমি এসেছি তোমাদের আচার-আচরণ জানতে।" এ কথা শুনে তারা আলেকজাণ্ডারকে নিয়ে গেল বাজারে, এখানে তখন রাজা বসে আছেন বিচারকের আসনে।

সেই সময় স্থানীয় একটি লোক এগিয়ে গিয়ে, বলল, "রাজা-মশায়, এই লোকটার কাছ থেকে এক বস্তাভরতি ভূষি কিনি তার পর এর মধ্যে দেখি অনেক সোনা। ভূষি আমার, কিন্তু সোনা আমার নয়। কিন্তু লোকটা কিছুতেই তা ফিরিয়ে নিতে চাচ্ছে না। রাজা-মশায়, ওকে একবার বলুন—এ সোনা ওর।"

এর প্রতিপক্ষ লোকটিও এখানকারই অধিবাসী, সে বলল, "অন্যায় ভাবে তুমি কিছু রাখতে ভয় পাচ্ছ। আমি কিন্তু তোমার কাছ থেকে এটি ফিরিয়ে নিতে ভয় পাব না। আমি তোমাকে থলেটা বিক্রি করি এর মধ্যে যা আছে তার সবসুদ্ধ। তোমার যা তা তুমি রাখো। ওকে বলুন রাজা-মশায়।"

প্রথম-জনকে রাজা জিজ্ঞাসা করলেন তার কোনো ছেলে আছে কিনা

জবাবে সে বলল, "হ্যাঁ, আছে।" অপর-জনকে রাজা জিজ্ঞাসা করলেন তার মেয়ে আছে কিনা। তার উত্তরে সে বলল "হ্যাঁ, আছে।"

রাজা বললেন, "বেশ। তোমরা দুজনেই খোলামেলা মানুষ। তোমাদের ছেলে-মেয়ের বিয়ে দিয়ে দাও। আর, এতে যে সোনা আছে তা ওদের দিয়ে দাও বিয়ের উপহার হিসেবে। এই হচ্ছে আমার রায়।"

এই রায় শুনে আলেকজাণ্ডার আশ্চর্য হয়ে গেলেন।

রাজা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, "আমি কি ভুল রায় দিলাম? তুমি চমকে গেলে যে!"

"ভুল রায় হবে কেন।" আলেকজাণ্ডার বললেন, "কিন্তু আমাদের দেশে আমরা অন্যভাবে বিচার করতাম।"

"কি ভাবে?" আফ্রিকার রাজা জানতে চাইলেন।

আলেকজাণ্ডার বললেন, "দুজনেই মামলাবাজ। সুতরাং দুজনেরই মাথা কাটা হত। আর, ঐ সোনা যেত রাজার ভাণ্ডারে।"

দুই হাতে তালি বাজিয়ে রাজা বললেন, "তোমরা যেখানে বাস করো সেখানে কি সূর্য আলো দেয়, এবং আকাশ থেকে কি সেখানে বৃষ্টি ঝরে?"

আলেকজাণ্ডার বললেন, "হ্যাঁ।"

একথা শুনে রাজা বললেন, "তাহলে নিশ্চয়ই সেখানে বেকুব কতকগুলো জন্তুর বাস। এ রকম জায়গায় সূর্য ওঠাও উচিত না, বৃষ্টি পড়াও ঠিক না।"

ইমানুয়েল কাণ্ট্

ইমানুয়েল কাণ্ট্ (১৭২৪-১৮০৪) তাঁর সারাটা জীবনই পূর্ব-প্রুশিয়ার কোনিগবার্গে অতিবাহিত করেন। এখানে তিনি ইতিহাসের অধ্যাপক রূপে কাজ করতেন। পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ দার্শনিক রূপে তিনি সংস্কার-মুক্তির নীতিগত আরও দৃঢ় করে তোলেন, এমনকি এই নীতিবোধকে আরও এগিয়ে নিয়ে যান। তাঁর প্রধান দার্শনিক গ্রন্থগুলির মধ্যে আছে "ক্রিটিক অব্ পিওর রিজন" (১৭৮১), "অব্ প্রাকটিক্যাল রিজন্" (১৭৮৮), এবং "ক্রিটিক অব জাজমেণ্ট" (১৭৯০)। আমরা এখানে তাঁর যে রচনাংশ উদ্ধৃত করছি তাতে দর্শনের মূল ঝোঁক কোন্ দিকে তার ইঙ্গিত পাওয়া যাবে। তাঁর "আন্সার টু দি কোশ্চেন: হোয়াট ইজ এনলাইটেনমেণ্ট?" (১৭৮৪) রচনায় সংস্কার মুক্তির পূর্ণ ও বিখ্যাত ব্যাখ্যাটি পাওয়া যাবে—বিভিন্ন নৈতিক ক্ষেত্রে এর

পরিবেশ ও সম্ভাবনা সম্বন্ধে তিনি এই রচনায় যেন অনুসন্ধানের কাজ করেছেন। এখানে, কাণ্ট্ দেখিয়েছেন যে, সংস্কারমুক্তি হচ্ছে মানবজাতির চিরকালের কর্তব্য কাজ। লেসিং-এর মত তিনিও এই অভিমতই ব্যক্ত করেছেন যে, যুক্তিবাদের দিকে অবিরল ভাবে এগিয়ে যাওয়াই মনুষ্যধর্ম। এই ভাবেই সংস্কারমুক্তি কথাটার একটা পরিপূর্ণ অর্থ দেওয়া হয়েছে। অষ্টাদশ শতকের জার্মানীর সেই আধ্যাত্মিক আন্দোলনই এর দ্বারা বোঝাচ্ছে না, সাধারণভাবে মানুষের আধ্যাত্মিক পন্থাটাই বোঝাচ্ছে, আধুনিককালে যা ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠছে, এবং ভবিষ্যৎকাল পর্যন্ত যা প্রসারিত।

আমাদের রচনাংশ "টু থিংস ফিল মাই মাইণ্ড" (দুটি জিনিস আমার মন ভরে রেখেছে) হচ্ছে তাঁর "অব্ প্র্যাকটিকাল রিজন্" গ্রন্থের উপসংহার, এতে তিনি আঠারো শতকের সংস্কারমুক্তির তত্ত্বকেও ছাড়িয়ে গিয়েছেন, যেখানে বলা হয়েছিল মানুষের যুক্তিবাদী মন প্রত্যেক পদার্থের প্রকৃত রূপ ধরতে অক্ষম। কিন্তু এই প্রকৃত রূপ ধরার পক্ষে মানুষের মনের এই সীমিত শক্তি তার আভ্যন্তরীণ জীবন সম্বন্ধে প্রযোজ্য নয়। তার যুক্তি তাকে এই শক্তি দিয়েছে যার দ্বারা সে তার অন্তঃস্থ 'নৈতিক কানুন' ঠিক বুঝতে পারে, এবং যুক্তিবাদী একটি প্রাণী হওয়াই যে তার জীবনের লক্ষ্য তার নিশ্চিত হদিশ মেলে। 'নৈতিক কানুন' সম্বন্ধে কাণ্ট্ বলেন, "এমন ভাবে কাজ করতে হবে যাতে তোমার মনের প্রবল ইচ্ছার মূলসূত্রটিই এক সময়ে একটা সাধারণ নিয়মের রূপ নিতে পারে।" তাহলেই বোঝা যাচ্ছে যে, কাণ্ট্ ধর্মকেও পৃথিবীর মধ্যে নৈতিক ভাবে একটি সঠিক আচরণ বলে মনে করছেন। এই ধর্মের নিয়মকানুন—বা যাকে বলা যায় আইডিয়া—তাও মানুষের যুক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতে পারে। আইডিয়া সম্বন্ধে কাণ্ট্ যে পদ্ধতি প্রবর্তন করেন তার থেকে পরবর্তীকালের জার্মান আদর্শবাদ বেড়ে ওঠে। বড় বড় কবিদের মধ্যে বিশেষ ক'রে শিলারই কাণ্টের দর্শনের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন।

দুটো জিনিস আমার মন ভরে রেখেছে

দুটো জিনিস আমার মন ভরে রেখেছে। এদের সম্বন্ধে ক্রমশই আমার শ্রদ্ধা যেমন বেড়ে চলেছে, বিস্ময়ও বেড়ে চলেছে তেমনি। স্থিরভাবে যতই আমি এদের কথা ভাবি ততই এই শ্রদ্ধা ও বিস্ময় বাড়তে থাকে। এ দুটি হচ্ছে: মাথার উপরের ঐ নক্ষত্রখচিত আকাশ, আর, আমার নিজের মধ্যের

এই নৈতিক কানুন। আমাকে এদের অনুসন্ধান করতে হয় না, কিন্তু এদের সম্বন্ধে অনুমান করতে হয় না, এরা যেন অন্ধকারে সংগোপনে আছে, চক্ষুগোচর ও জ্ঞানগোচর ঐ যে দূর-দিগন্ত, এরা যেন তারও বাইরে। এদের আমি আমার চোখের সামনেই দেখতে পাই, এবং আমার অস্তিত্বের যে বোধ, তার সঙ্গে যেন এদের সংযুক্ত করতে পারি। এর প্রথমটির আরম্ভ হচ্ছে সেই জায়গা থেকে যেখানে আমি বাহির বিশ্বের চেতনা নিয়ে বসে আছি, এবং এটি প্রসারিত করে দিয়েছে সেই সংযোগসূত্রগুলিকে যার এক সীমাহীন বিস্তারের মধ্যে আমি দাঁড়িয়ে আছি—বিশ্বের উপরে বিশ্ব, পরিক্রমণের পর পরিক্রমণ, তারও ওপরে আহ্নিক গতির ও বার্ষিক গতির এক সংখ্যাহীন সময়, এদের আরম্ভ এবং এদের ধারাবাহিকতা। দ্বিতীয়টির সূচনা আমারই অদৃশ্য সত্তা থেকে, সেটি আমার ব্যক্তিত্ব। যে বিশ্বের কোনো সীমা নেই তার মধ্যেই আমার এই ব্যক্তিত্বের অবস্থিতি, এবং সেই জন্যে কেবল বোধের দ্বারাই এর উপলব্ধি সম্ভব; এর দ্বারাই আমি বুঝতে পারি যে, আমি আকস্মিকভাবে সার্বিকভাবে এবং বিশেষ প্রয়োজনীয় ভাবে সব ব্যাপারের সঙ্গে যুক্ত নই—প্রথমটির ক্ষেত্রে যেটা নাকি প্রযোজ্য। (কেননা পরিদৃশ্যমান সমস্ত জগতের সঙ্গেই আমার যোগ)। অসংখ্য বিশ্ব নাকি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে যায়, একজন প্রাণী হিসাবে এর মধ্যে আমার মূল্য কী। যে অসীম শক্তি নিয়ে এই শরীরের জন্ম (এ শক্তি কোথা এল কে জানে), তার উপাদান ওই গ্রহসমূহকে জোগান দেওয়াতেই এর মূল্য। অপর পক্ষে, দ্বিতীয়টি আমার ব্যক্তিত্বের মধ্য দিয়ে আমার বুদ্ধি ও বোধকে ভীষণভাবে বাড়িয়ে তুলে আমার মূল্য বৃদ্ধি করে; এই ব্যক্তিত্বই আমার কাছে নৈতিক কানুন উদ্ঘাটিত করে দেয়—তখনই বুঝতে পারা যায় যে প্রাণীজগতের প্রকৃতি ও আচার-আচরণের থেকে আমি ভিন্ন, এমনকি সমস্ত বিশ্বের বোধ থেকেও আমি আলাদা। এই কানুন অনুসারে আমার অস্তিত্বের গন্তব্য স্থান যেখানে নির্দিষ্ট হয়েছে তা কেবলমাত্র ইহজীবন নয়, এই জীবনের নীতি ও নিষেধের মধ্যেই তা সীমাবদ্ধ নয়, এব প্রসার কিন্তু অর্থহীন কাল পর্যন্ত।

সংস্কারমুক্তি কী? এই প্রশ্নের উত্তর

সংস্কারমুক্তি হচ্ছে স্ব-আরোপিত এক অভিভাবকত্বের হাত থেকে মানুষের নিষ্কৃতি লাভ। অপরের নির্দেশ ছাড়া, নিজের বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করার

অক্ষমতার নামই এই অভিভাবকত্ব। এ'কে স্ব-আরোপিত বলা হয় তখনই যখন যুক্তির অভাব নয়, যুক্তিপ্রয়োগের দৃঢ়তা ও সাহসের অভাব যখন থাকে, এবং অন্যের নির্দেশ ছাড়া যখন চলার অক্ষমতা দেখা যায়। সবাই শোনো: "নিজের যুক্তিপ্রয়োগের জন্যে সাহস অবলম্বন করো"—এইটেই হচ্ছে সংস্কার-মুক্তির মূলকথা।

কুড়েমি ও কাপুরুষতা হচ্ছে মানবজাতির এক বৃহৎ অংশের অভিভাবক-নিয়োগের মূল কারণ। প্রকৃতি যখন তাকে বাহ্যিক কোনো নির্দেশের হাত থেকে রেহাই দিয়েছে তখনও তারা অভিভাবক-নিয়োগের এই সহজ পথটাই বেছে নেয়। নাবালক থাকাটা বড় সোজা কাজ। আমার যদি এমন-একটা বই থাকে যা আমার হয়ে সব বুঝে নেবে, একজন ধর্মযাজক থাকে যে আমার বিবেক হয়ে কাজ করবে, একজন ডাক্তার থাকে যে আমার খাদ্যতালিকা বানিয়ে দেবে, এবং এইরকম আরও অনেক-কিছু আমার থাকে, তাহলে কোনো ব্যাপারেই আর আমার কিছু করার থাকে না। আমাকে চিন্তা করতে হবে, আমি মাইনে গুণে অন্যকে দিয়ে চিন্তা করিয়ে নেব—পয়সার জন্যে এই বিরক্তিজনক কাজও অনেকে নেবে। মানবজাতির বেশির ভাগই (এবং সমগ্র নারীজাতি) যোগ্যতা-অর্জনের কাজটাকে সাংঘাতিক কাজ বলে মনে করে শ্রমশীল তো হতে চায়ই না—অভিভাবকের দলকে দেখা যায় এদের মাতব্বর হবার দায়টা তারা নিয়েছে। এই অভিভাবকেরা তাদের এই গার্হস্থ গাভীর দলকে প্রথমে বোবা করে রাখে, তারপর নিশ্চিত হয়ে নেয় যে এইসব শান্ত জীবেরা গাড়ির সঙ্গে তাদের জুতে না দিলে এক পা এগোতে সাহস করবে না, তারপর তাদের জানিয়ে দেয় যে, একা-একা এগোতে গেলে বিপদ কতটা। প্রকৃতপক্ষে এই বিপদ বিশেষ-কিছু নয়, কেননা কয়েকবার পড়ে গেলেই তারা একা-একা হাঁটতে শিখবে। কিন্তু একবার পড়ে গেলেই তারা ভয় পেয়ে যায়, এবং আবার ঐ ভাবে চলার কথা ভাবলেই আতঙ্কিত হয়ে ওঠে। এই ভাবেই অভিভাবক ভিন্ন কোনো কাজ করা প্রত্যেকের পক্ষেই কঠিন হয়ে উঠেছে। ক্রমেই এ ব্যবস্থা তার ভালো লাগতে আরম্ভ করেছে, এই জন্যেই সে তার যুক্তি প্রয়োগে অপারগ হয়ে উঠেছে, এর কারণ—কেউ তাকে একবার পরীক্ষা করে দেখতেও বলেনি। প্রকৃতির কাছ থেকে স্বাভাবিকভাবে যে ক্ষমতা সে পেয়েছে তা তাকে প্রয়োগ করতে দেওয়া হয় না, এইভাবে সে অভিভাবকত্বের বন্ধনে চিরকালের মত বাঁধা পড়ে গিয়েছে। যে-কেউ এই বাঁধন ছুঁড়ে ফেলে,

সে কেবলমাত্র একটা সরু নালা পার হবার জন্যে অনিশ্চিত লম্ফ দেয়, এর কারণ এরকম স্বাধীন কাজ করায় সে অভ্যস্ত নয়। এইভাবে সামান্যই কিছু মানুষ নিজের মনের জোর দেখিয়ে এই অযোগ্যতার কবল থেকে রেহাই পেয়েছে, এবং ক্রমেই তাদের অগ্রগতি ঘটেছে।

জনসাধারণ যদি নিজেদেরই যুক্তিবাদী করে নিতে পারে তবেই মঙ্গল। প্রকৃতপক্ষে, জনসাধারণ যদি পরিপূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করে তাহলে সংস্কারমুক্তি সহজেই ঘটবে। স্বাধীন ভাবে চিন্তা করতে পারবে এমন মানুষ দরকার। এমনকি ঐ অভিভাবকদের মধ্যেও ঐ স্বাধীন চিন্তা দরকার। নিজেদের কাঁধ থেকে অভিভাবকত্বের জোয়াল ফেলে দিয়ে যুক্তির দ্বারা নিজেদের চালিত করা দরকার, এবং প্রত্যেক মানুষকেই যার-যার নিজের মতন চিন্তা করতে দেওয়া দরকার। কিন্তু এ কথা মনে রাখা দরকার যে, সর্বপ্রথম অভিভাবকরাই যে এই জোয়ালে বেঁধেছে সেই জনগণই তাদের এর সঙ্গে আবদ্ধ থাকতে চাপ দিয়েছে। কিন্তু অভিভাবকদের মধ্যে যারা একটু যুক্তিবাদী তারাও এ কাজে জনসাধারণকে মদত দিয়েছে। অন্যের ক্ষতি করার কাজে উত্তেজিত করা যে কতটা মারাত্মক তার প্রমাণ হল—এরাই আবার প্রতিশোধ নিয়েছে তাদের বংশধরদের উপর। জনগণ এইভাবে ধীরে ধীরে যুক্তিবাদী হয়ে উঠেছে। বিপ্লবের দ্বারা হয়তো ব্যক্তিগত স্বেচ্ছাচারিতা, লোভ বা অত্যাচার কমানো যেতে পারে, কিন্তু চিন্তার ক্ষেত্রে এর দ্বারা কোন রকম সংস্কার সম্ভব নয়। যে জনতা চিন্তা করতে জানেন না তারাই বরঞ্চ পুরাতন প্রবৃত্তির সঙ্গে ক্ষতি সাধনের নূতন প্রবৃত্তি একত্র করে আরও ক্ষতিকর হয়ে উঠবে।

এই সংস্কার মুক্তির জন্যে আর কিছুরই দরকার নেই। দরকার কেবল স্বাধীনতার। এবং সব জিনিসের মধ্যে এই স্বাধীনতাই হচ্ছে সবচেয়ে নির্দোষ। জনগণকে সব বিষয়ে যুক্তি প্রয়োগ করতে দেওয়াই হচ্ছে এই স্বাধীনতা। কিন্তু চারদিক থেকেই আমি শুনতে পাই, "তর্ক কোরো না।" অফিসার বলেন, "তর্ক কোরো না, ড্রিল করো।" ট্যাক্স-আদায়কারী বলেন, "তর্ক কোরো না, টাকা দিয়ে দাও।" ধর্মযাজক বলেন, "তর্ক কোরো না, বিশ্বাস করো।" (পৃথিবীর একমাত্র রাজা বলে থাকেন, "যত ইচ্ছে তর্ক করো, যে-কোনো বিষয়ে খুশি তাই নিয়ে তর্ক করো, কিন্তু সেই সঙ্গে একটা কাজ কোরো—মান্য কোরো!") সর্বত্রই স্বাধীনতার পথে নিষেধ। এর মধ্যে কোন্ নিষেধটি সংস্কার মুক্তির পথে বাধা, কোন্ নিষেধটি সংস্কার মুক্তির পথের নির্দেশ-

এর উত্তরে আমি বলি : জনসাধারণের প্রত্যেককে তার যুক্তি প্রয়োগের পূর্ণ স্বাধীনতা দিতে হবে, এবং এটা দিলে তবেই জনসাধারণের মধ্যে সংস্কারমুক্তি আসবে। গোপনে বা ব্যক্তিগত কোনো ব্যাপারে, অপর পক্ষে, যুক্তি প্রয়োগে অল্পবিস্তর নিষেধ আরোপ করা যেতে পারে, কিন্তু দেখতে হবে—এর দ্বারা সংস্কার মুক্তির ব্যাপারে বাধা সৃষ্টি করা হচ্ছে না। কিন্তু খোলাখুলি ভাবে যুক্তি প্রয়োগের অর্থ আমি এই মনে করি, যেখানে কোনো ব্যক্তি বিশেষজ্ঞ রূপে সমগ্র পাঠকদের জন্যে তাঁর অভিমত জাহির করছেন। গোপনে বা ব্যক্তিগত ব্যাপারে যুক্তিপ্রয়োগের পথ হল, যেখানে কোনো দপ্তরের ভার যাঁর উপরে সেখানে তাঁর অভিমত ব্যক্ত করা। সম্প্রদায়গত ভাবে সকলের কল্যাণের জন্যে অনেক কাজ করা হয়ে থাকে, এই কাজ পরিচালনার জন্য কর্মীরা তথাকথিত একমত হয়ে কাজ করেন, এ ক্ষেত্রে গবর্নমেণ্ট তাঁদের কাজের নির্দেশ দেবেন যাতে জণগণের কল্যাণমূলক কাজ হতে পারে, অন্তত তাদের ক্ষতি যেন না হয়। এখানে কোনো তর্ক নিশ্চয় চলবে না, এখানে সবাইকে নির্দেশ মেনে চলতে হবে। কিন্তু যখন কোনো ব্যক্তি নিজে এই গবর্নমেণ্টের আঁওতার, সেইসঙ্গে নিজেকে যিনি এই সম্প্রদায়ের বা বিশ্বনাগরিক-সমাজের একজন সভ্য বলে মনে করেন, তখন একজন স্কলার হিসেবে নিজের লেখার মধ্যে দিয়ে জনসাধারণকে কিছু বলার অধিকার তাঁর থাকে ; গবর্নমেণ্ট পরিচালনার কোনো ক্ষতি না ক'রে তিনি অবশ্যই তাঁর অভিমত জানাতে পারেন, কেননা এ গবর্নমেণ্টও তো তাঁরই, তিনিও তো এই গবর্নমেণ্টেরই নিষ্ক্রিয় সদস্য। কিন্তু সরকারী কর্মী যদি তাঁর উচ্চতন অফিসারের নির্দেশ পালন না ক'রে, সেই নির্দেশের উপযোগিতা ও প্রয়োজনীয়তা নিয়ে তর্ক করেন, তা হলে তা হবে ভয়ংকর ক্ষতিজনক , এখানে তাঁর কর্তব্য হচ্ছে—মান্য করা। কিন্তু সামরিক কাজে কোনো ত্রুটি ঘটলে জনসাধারণকে সে সম্বন্ধে অবগত করার ও তাদের বিচারের জন্যে সব ব্যাপার মানানোর অধিকার আছে স্কলারের। এ অধিকার থেকে তাকে বঞ্চিত করা যাবে না। যে কর তার উপর ধার্য হয়েছে তা দিতে কোনো নাগরিক অস্বীকার করতে পারেন না। বস্তুত পক্ষে এ সম্বন্ধে নির্লজ্জ বা উদ্ধত কোনো নালিশ তিনি করলে তাঁর শাস্তি হতে পারে এই অভিযোগে যে তিনি কুৎসা রটনা করছেন (কেন না এর ফলে জনসাধারণের মধ্যে অবাধ্যতা সঞ্চারিত করার সম্ভাবনা)। কিন্তু একজন স্কলার রূপে তিনিই তাঁর অভিমত জানাতে পারেন। এ'তে

নাগরিক হিসাবে তাঁর কর্তব্যের বিপরীত কিছু করবেন না। তিনি প্রকাশ্যেই ঐ কর-ধার্যের অনুপযোগিতা ও অন্যায্যতা তাঁর অভিমত জানাতে পারেন। অনুরূপ ভাবেই একজন ধর্মযাজক তাঁর ছাত্রবৃন্দকে প্রশ্নোত্তরমালার মধ্য দিয়ে উপদেশ দিতে পারেন, কারণ তাঁর ধর্মসভাটি গির্জার অনুশাসনেই চলবে, এবং তিনি সেই অনুশাসন স্বীকার করেই এই কাজ গ্রহণ করেছেন। কিন্তু স্কলার হিসেবে এইসবের সমালোচনা করার পূর্ণ অধিকার তাঁর আছে, এই অনুশাসনে এবং এই ধর্মশিক্ষার মধ্যে ত্রুটি কোথায় গলদ কোথায় তা তিনি জনসাধারণকে জানাতে পারেন, এবং সাজানো গুছানো ঐ সব বাণী কতটা ভুল তাও দেখিয়ে দিতে পারেন, ধর্মীয় যে প্রতিনিধি সভা আছে তার এবং গির্জার সুষ্ঠুতর সংগঠন গঠনেরও প্রস্তাব তিনি দিতে পারেন। এ কাজ করলে তাঁর বিবেকের বিরুদ্ধে কিছু করা হবে না। কিন্তু গির্জার প্রতিনিধি হিসাবে তিনি যা শিক্ষা দেন তা গির্জারই শিক্ষা, নিজের বোধ ও বুদ্ধি অনুসারে শিক্ষা দেওয়ার কোনো স্বাধীনতা তাঁর নেই। কেননা, অন্যের দ্বারা নিযুক্ত হয়ে ও অন্যের দ্বারা আদিষ্ট হয়ে তিনি এ কাজ করছেন! তিনি বলবেন, "আমাদের গীর্জা এইটি বা ঐটি শিক্ষা দেয়। এগুলি যে উৎকৃষ্ট এই তার যথেষ্ট প্রমাণ।" গির্জার যে অনুশাসন বা নির্দেশ তিনি হয়তো সম্পূর্ণ ভাবে মানেন না, কিন্তু ধর্মসভায় তিনিই ধর্মগ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে এই ধর্মসভার উপযোগিতা সম্বন্ধে জোরালো ভাষায় বক্তৃতা দেবেন, কিন্তু ঐ উদ্ধৃতির সঙ্গে তিনি হয়তো বা কিছুটা একমত, কারণ ওরই মধ্যে প্রকৃত সত্য নিহিত থাকা অসম্ভব নয়, এবং অন্তরস্থ ধর্মের সঙ্গে এই ধর্মমতের বিশেষ বিরোধ না থাকতেও পারে। যদি তাঁর মনে হত যে এর মধ্যে কোনো সত্যই নেই, এবং নিজস্ব অভিমতের সঙ্গে এর ঘোরতর বিরোধ তাহলে তিনি তাঁর এই কাজ মনোনিবেশ করে করতেই পারতেন না। তাঁকে তাহলে এ কাজ ছেড়ে দিতে হত। নিয়োগ প্রাপ্ত একজন শিক্ষক যে যুক্তি এই রকম সভায় দেখান তাকে অবশ্যই গোপন বা নিভৃত সভা বলা যায়—কেন না এই জমায়েত একেবারেই গার্হস্থ্য, এখানে লোকসংখ্যা যত বেশিই হোক-না কেন তবু এটা সাধারণ সভা নয়, এখানে যাজক হিসাবে তিনি স্বাধীন নন্, তিনি স্বাধীন হতেও পারেন না, কেননা, এখানে তিনি অন্যের আদেশ পালন করে চলছেন। কিন্তু স্কলার রূপে যাঁর লেখা সর্বসাধারণের কাছে পৌঁছবার কথা, বিশ্বের সর্বত্র পৌঁছবার কথা, ঐ যাজকই সর্বসমক্ষে তাঁর যুক্তি পৌঁছে দেবার

অফুরন্ত অধিকার ভোগ করবেন, এবং নিজের হয়ে কথা বলতে পারবেন। তাহলেই বোঝা যাচ্ছে যে, জনগণের অভিভাবকেরা (আধ্যাত্মিক ব্যাপারে) নিজেরা সর্বদাই যে অযোগ্য—এটা একটা অসম্ভব ব্যাপার, তাহলে এর অর্থ দাঁড়ায় এই যে, অসম্ভবতাই একটা শাশ্বত জিনিস।

কিন্তু ধর্মযাজকদের সমাজ, গির্জার সংঘ কিংবা ভক্তিভাজন গির্জা-প্রতিনিধিগণেরা (দিনেমারেরা যেমন বলে থাকেন) কি নিজেদের বরাবরের জন্যে একটি অপরিবর্তনীয় মতবাদেই বেঁধে রাখাটা সংগত বলে মনে করবেন, যার দ্বারা তাঁরা ঐসব সংঘের প্রত্যেকটি সদস্যের উপর নিজেদের অভিভাবকত্ব চালিয়ে যেতে পারবেন এবং যার দ্বারা সমগ্রভাবে যাবতীয় মানুষের উপরেই এই আধিপত্য বজায় থাকবে, এবং এই ব্যবস্থা চিরকালের জন্যে চলবে ? এর উত্তরে আমি বলি যে, এটা অসম্ভব। মানবজাতির কাছে যাবতীয় সংস্কার-মুক্তির পথ একেবারে বন্ধ করে রাখার জন্যে তাঁদের এই-যে চুক্তি যদি সর্বময় কর্তা কর্তৃকও অনুমোদিত হয়, যদি পার্লামেণ্ট বা কোনো শান্তির সনদ এটি অনুমোদন করে থাকেন তবুও সে চুক্তি বাতিল। কোনো একটা কাল নিজেকে এভাবে বাঁধতে পারে না, পরবর্তী কালকে এমন অবস্থায় আটকে রাখতে পারে না যার জন্যে সে এর জ্ঞানবিস্তারে (খুব সাময়িক হলেও), এর ত্রুটি সংশোধনে, আরও বেশি সংস্কারের পথে এগিয়ে যেতে অক্ষম হবে। মানুষের স্বভাব বা প্রকৃতির বিরুদ্ধে এটা হবে মস্ত অপরাধ, মানুষের স্বাভাবিক লক্ষ্যই হচ্ছে উন্নতির দিকে অগ্রগমনের দিকে, তাকে রোধ করা অন্যায়। ভাবীকাল এইসব যুক্তিহীন ও বিদ্বেষপূর্ণ উপায়ে প্রস্তুত সব আইন বাতিল করে দিলে তা সংগত কাজই হবে। জনগণের জন্যে আইন বলে ঘোষিত যেসব ব্যবস্থা তার মূল প্রশ্নই হল জনগণ নিজেরা এই ব্যবস্থা নিজেদের উপর আরোপ করেছে কিনা। এ রকম একটু চুক্তি এক নির্দিষ্ট ও সীমিত সময়ের জন্যে হলেও হতে পারে, যাতে এর পর এর পরিবর্তন ও পরিশোধন হবার আশা থাকে। প্রত্যেক নাগরিককে, বিশেষ করে প্রত্যেক ধর্মযাজককে, একজন স্কলার রূপে স্বাধীনভাবে তাঁর অভিমত ব্যক্ত করতে দেওয়া হোক, সর্বসমক্ষে সেই অভিমত জানান, অর্থাৎ লিখিত ভাবে জানান, বর্তমান ধর্মপ্রতিষ্ঠানের ত্রুটি কোথায়। এই নূতন ব্যবস্থা যদি হয় তবে তার মেয়াদ হবে ততদিনই যতদিনে এই ব্যবস্থার একেবারে অভ্যন্তরে প্রবেশের পর সাধারণভাবে এবং ব্যাপকভাবে এর অনুমোদন পাওয়া যায় ; সকলে একত্র হয়ে ও একমত হয়ে

(সর্ববাদীসম্মত না হলেও হবে) রাজার কাছে এমন প্রস্তাব আনতে পারেন যে, উৎকৃষ্টতর চিন্তাধারার ফলে তাঁরা সম্মিলিত হয়ে একটা পরিবর্তিত ধর্মীয় সংস্থা স্থাপন করেছেন, যাঁরা পুরাতন ব্যবস্থায় বিশ্বাসী তাঁরা সেই ব্যবস্থার অধীনেই অবশ্য থাকতে পারবেন, তাঁদের বাধা দেওয়া হবেনা। এবং এই নূতন ব্যবস্থায় রাজার আশ্রয় প্রার্থনা করে তাঁর আশ্রয় প্রার্থনা করতে পারেন। কিন্তু একটা চিরস্থায়ী ধর্মীয় সংস্থা স্থাপনের জন্যে সকলের সংঘবদ্ধ হওয়া ব্যাপারটাই জনসাধারণের কাছে সন্দেহের জিনিস হবে, এমনকি একজন মানুষের জীবৎকালেই তা সন্দেহের ব্যাপার হতে পারে, কেননা এমন সময়ের সীমা না বেঁধে এমন কাজ করলে মানুষের উন্নতিসাধনের পথে বিঘ্ন এসে যায়, এবং ভবিষ্যৎকালের কাছে বিশেষ অসুবিধাজনক হয়ে পড়ে—সুতরাং এমন কাজ নৈব নৈব চ। মাত্র একজনের পক্ষে এবং সংক্ষিপ্ত কিছু সময়ের জন্যে যদি এমন ব্যবস্থা হয় তাহলে সেই মানুষ কিছুকালের জন্যে না হয় তার সংস্কার-মুক্তি স্থগিত রাখতে পারে। কিন্তু তার কাছ থেকে, এবং তার চেয়েও বড় কথা, ভবিষ্যৎকালের কাছ থেকে এটা যদি সরিয়ে রাখা হয় তবে তা হচ্ছে মানুষের অধিকার জখম করা, এবং তা পদদলিত করা। জনগণ নিজেদের উপর যে আদেশ জারি করতে না-পারে, জনগণের জন্যে সেই রকম আদেশ জারি করা আরও শক্ত। কেননা জনমত গঠন করে এবং তার সম্মতি নিয়ে তাঁর আইনবিদেরা তাঁর হয়ে আইন তৈরি করতে পারেন। রাজা যদি দেখেন যে অসামরিক ব্যবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে প্রকৃত সবপ্রকার উন্নতিই বজায় আছে, তখন রাজা জনগণের উপরেই ভার দিয়ে দিতে পারেন তাঁরা তাঁদের আধ্যাত্মিক কল্যাণের জন্যে যা করার করুন। এ কাজ রাজার কাজ নয়। কিন্তু রাজার কাজ হচ্ছে, কেউ যেন বলপ্রয়োগ করে কেউ যেন এই কল্যাণ-কাজে বাধা সৃষ্টি না করে, তা দেখা। এসব ব্যাপারে নাক গলালে রাজসিক মর্যাদারই হানি ঘটবে। লিখিতভাবে তাঁর প্রজারা যখন তাঁর কাছে তাদের মনোভাব জানিয়ে দিয়েছে তখন তার ভিত্তিতেই তাঁকে শাসনকাজ চালাতে হবে। তিনি এভাবে কাজ করতে পারেন, যখন অবশ্য খুব বুঝেসুঝেও তিনি নিজের প্রতি এই ভৎ´সনা আরোপ করতে পারেন। সিজার নিজে সম্পূর্ণরূপে যুক্তিবাদী নন। তার চেয়ে বেশি তিনি ক্ষুণ্ণ করবেন তাঁর রাজসিক মহিমা, যখন তিনি তাঁর রাজ্যের অন্যান্য প্রজার উপরে কয়েকজন অত্যাচারীর ধর্মীয় অনাচার সমর্থন করবেন।

আমাদের যদি কেউ জিজ্ঞাসা করেন, "আমরা কি একটি সংস্কারমুক্ত যুগে বাস করছিনে?" এর উত্তর হচ্ছে, "না।" কিন্তু আমরা এমন একটা যুগে বাস করছি যখন সংস্কারমুক্তির কাজ চলেছে। এমন অবস্থাটা এই যে, এখনো অনেক অসুবিধে আছে, এই অসুবিধাগুলি মানুষকে সহজে ও ত্রুটিহীন ভাবে ধর্মের ব্যাপারে যুক্তিপ্রয়োগে বাধা সৃষ্টি করছে, এখনো বাইরের নির্দেশ দেওয়া চলেছে। অপরপক্ষে, এ ব্যাপারটিও এখন পরিষ্কার যে, এখন মানুষের স্বাধীনভাবে মত প্রকাশের ভূমি তৈরি হয়ে গিয়েছে, এবং সংস্কারমুক্তির পথের বাধা অনেক কমেছে, স্ব-আরোপিত অভিভাবকত্বের প্রভাবও এখন হ্রাস পেতে আরম্ভ করেছে। এই দিক থেকে এ যুগটি একটা যুগ যখন সংস্কার মুক্তি চলেছে, কিংবা বলা এটা ফ্রেডেরিকের শতক।

কোনো নৃপতি এই কথাটি ঘোষণা করতে অগৌরব মনে না করেন যে, ধর্মের ব্যাপারে কাউকে কোনো নির্দেশ দেওয়া তিনি তাঁর কর্তব্য বলে মনে করেন না, এবং এ ব্যাপারে সকলকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়ে দেন, সহনশীলতার মত মস্ত কথাটিকে তিনি যদি নিন্দা করেন তাহলে বলতে হবে যে, তিনি সংস্কারমুক্ত। তাঁর এই কাজের জন্যে কৃতজ্ঞ পৃথিবীর কাছ থেকে সম্মান ও শ্রদ্ধা লাভ করবেন, ভবিষ্যৎকালও তাঁর যশ গাইবে এই কাল যে, তিনি প্রথম, অন্তত গভর্নমেণ্টের তরফ থেকে প্রথম, যিনি অভিভাবকত্বের হাত থেকে মানবজাতিকে রক্ষা করেছেন, এবং নিজের নিজের বিবেকের নির্দেশ অনুসারে নিজের যুক্তি প্রয়োগের স্বাধীনতা দিয়েছেন মানবজাতিকে। এই রকম একজন নৃপতির অধীনে শ্রদ্ধেয় যাজকেরা তাদের গির্জার কাজের কোনো ত্রুটি না ঘটিয়ে স্কলার হিসেবে তাঁদের অভিমত প্রকাশের স্বাধীনতা যেন পান, গির্জায় যেসব অনুশাসনের নির্দেশ চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ছে সেসব সম্বন্ধে যাজকেরা যেন অকুণ্ঠ অভিমত ব্যক্ত করতে পারেন। এবং যাঁরা কোনো অফিসিয়াল কর্তব্যের নাগপাশে শৃঙ্খলিত নন তাঁরা যেন আরও বেশি করে স্বাধীন মত প্রকাশের অবকাশ পান। এমন-একটি রাজ্য থেকে স্বাধীনতার এই চেতনা যেন এর সীমানা ডিঙিয়ে অন্যত্র ছড়িয়ে পড়ে, এবং এমন রাজ্যেও প্রভাব বিস্তার করে যেখানকার গবর্নমেণ্ট নিজের স্বার্থ সম্বন্ধে বিশেষ সচেতন নন এবং তদ্দরুন সেখানকার মানুষের উপর নানাবিধ বাধার প্রাচীর তুলে রেখেছে। কিন্তু একটি দৃষ্টান্ত পেলেই অনেকের চোখ খুলে যায়, এমন একটি দৃষ্টান্ত যদি দেখানো যায় যে, জনসাধারণকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিলে শান্তি

বিঘ্নিত হয় না, গবর্নমেণ্টও স্থায়ী হতে পারে, তাহলে সেইটেই বেশ বড় ব্যাপার। বর্বরতার যুগ পেরিয়ে এগিয়ে যাবার জন্যে মানুষ নিয়ত কাজ করে চলেছে, তাদের উপর যদি মতলববাজদের দ্বারা সৃষ্ট বাধা না থাকে তাহলে মানুষ স্বচ্ছন্দে সব রকম বর্বরতা ডিঙিয়ে যেতে পারবে।

সংস্কারমুক্তি সংক্রান্ত বিশেষ-বিশেষ কথাগুলি আমি উপস্থাপিত করেছি, বিশেষভাবে ধর্মের ব্যাপারে অভিভাবকত্বের নাগপাশ থেকে মানুষের মুক্তির কথা বলেছি। কেবল ধর্মের বিষয়ে বলেছি এই জন্যে যে, আমাদের শাসকেরা সাহিত্য ও শিল্প ব্যাপারে অভিভাবকত্বের ভূমিকা নিতে কোনো মজা পান না, সুতরাং এ দুই বিষয়ের কথা ওঠে না। ধর্মের ক্ষেত্রে অযোগ্যতা কেবল যে খুবই ক্ষতিকারক এমন নয়, এটা সবচেয়ে বেশি মর্যাদাহানিকর। এই জন্যেই ধর্মের প্রসঙ্গ বলা। কিন্তু যে নৃপতি ধর্মের ক্ষেত্রে সংস্কারমুক্তি পছন্দ করেন তাঁর চিন্তাধারার সুদূরপ্রসারী ক্রিয়া আছে, তিনি বুঝতে পেরেছেন যে তাঁর রাজ্যের জনগণকে প্রকাশ্যে নিজ-নিজ যুক্তি অনুযায়ী অভিমত ব্যক্ত করতে দিলে, এবং তা লিখিত ভাবে প্রকাশ করতে দিলে, এবং দেশের আইনের সমালোচনা করতে দিলে, কোনো রকম বিপদেরই সম্ভাবনা নেই। এ বিষয়ে আমাদের সামনে একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আছে, তা হচ্ছে এই যে, সেই সম্রাটই সমস্ত সম্রাটের সেরা যিনি আমাদের শ্রদ্ধা ও সম্মান পান।

কিন্তু একজন সম্রাট্‌, যিনি নাকি স্বয়ংই সংস্কারমুক্ত, তিনি কোনো ছায়া দেখে ভয় পান না, সুশিক্ষিত বৃহৎ এক সেনাবাহিনী তাঁর আছে, তারাই দেশের শান্তি বজায় রাখবে, এমন সম্রাট্‌ই বলতে পারেন: "যত ইচ্ছে তর্ক করো, যে-কোনো বিষয়ে খুশি তাই নিয়ে তর্ক করো, কিন্তু সেই সঙ্গে একটা কাজ কোরো—মান্য কোরো।" এমন কথা কোনো প্রজাতন্ত্রের পক্ষে বলা সম্ভব ছিল না। এখানে আমরা মানবিক ব্যাপারে একটা অদ্ভুত ও আকস্মিক ঝোঁক দেখতে পাচ্ছি, দেখতে পাচ্ছি আপাতদৃষ্টিতে যা অসম্ভব বলে মনে হচ্ছে তা সত্যেই পরিণত হয়ে যাচ্ছে। বেশি মাত্রায় স্বাধীনতা দিলে মনে হয় তা যেন মানুষের মনের প্রসারে বিশেষ সহায়ক হবে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এতে মানুষের মনের উপর কিছু বাধাও যেন আরোপ করা হয়; কিন্তু স্বাধীনতার মাত্রা একটু কমলে প্রত্যেক মানুষ তার মন সম্পূর্ণভাবে প্রসারিত করতে পারে। প্রকৃতি যেন অনেক চেষ্টা ক'রে এবং অনেক কষ্টে মাটির স্তর ভেঙে ভেঙে মুক্ত করেছে বীজ—যার প্রতি সবচেয়ে বেশি মমতা, সেইরকম স্বাধীনভাবে

চিন্তা করার ইচ্ছা ও প্রবণতা দিয়েই স্বাধীনতা খুঁজে ও টেনে বার করতে হবে। ধীরে-ধীরে এ'তেই গড়ে উঠবে চরিত্র, এবং স্বাধীনতা-রক্ষার উপযোগী হয়ে উঠবে মন। এর পরিণামে গবর্ণমেণ্টের নীতি সংশোধিত হবে, গবর্ণমেণ্ট বুঝতে পারবে যে মানুষেরা আর মেশিন নেই, এবং গবর্ণমেণ্ট নিজের স্বার্থেই মানুষের যোগ্য মর্যাদা দিতে থাকবে।

᠒᠑᠑᠐-᠒᠔᠘᠐

উপক্রমণিকা

১৭৭০ সাল নাগাদ সংস্কারমুক্তির বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হয়। জীবনের প্রতি ও সাহিত্যের প্রতি নতুন দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায় হারডারের রচনাবলীতে: কিন্তু এই নতুন দৃষ্টিভঙ্গির যেন আর বিশেষ মূল্য রইল না, যুক্তির ধার কেউ ধারতে চাইলেন না,—সবই ভাবাবেগে পরিচালিত হতে চাইলেন, যুক্তির বাইরে যা-কিছু তাই যেন সত্য হয়ে দাঁড়াল। সাহিত্য হচ্ছে মৌলিক জিনিস, তা একেবারে ব্যক্তিগত ব্যাপার, সাহিত্যের স্রষ্টা যিনি তিনি একজন "প্রতিভা" তিনি কোনো আইন মানেন না, কোনো নিয়মেরও তাঁর কোনো প্রয়োজন নেই, তিনি কেবল নিজের আবেগের দ্বারা পরিচালিত হবেন, তাঁর নিজস্ব প্রকৃতির দ্বারা চালিত হবেন। সহজাত প্রবৃত্তির প্রতি এই আকর্ষণ ক্রমশই সভ্যতার অবদানের প্রতি অবিশ্বাস এনে দিতে লাগল, ইতিহাস যেন ক্রমিক উন্নতির দলিল নয়, সে যেন বিপরীত, ক্রমশই সে মানবসভ্যতার অবনতি ঘটেছে ইতিহাস তার বিবরণ বলে গ্রাহ্য হতে লাগল, প্রকৃতির কাছে ক্রমশ যেন দূরে সরে যাবার ইতিবৃত্ত, এ যেন কৃত্রিমতা, এ যেন অধঃপতনের কাহিনী, এবং নীতিভ্রষ্টতার বিবরণ। এই মতবাদের সূচনা ফরাসী দার্শনিক জাঁ-জ্যাকাস-রুশো-র (১৭১২-১৭৭৮) আমল থেকে। জার্মানীর ছোট-ছোট রাষ্ট্রের রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার উপর তীব্র আক্রমণ আরম্ভ হল তখন থেকে; বিভিন্ন শ্রেণীতে জার্মান সমাজের বিভক্তি, শাসকদের স্বেচ্ছাচারিতা, সমাজের উচ্চশ্রেণীর মধ্যে নৈতিক অবনতি ইত্যাদি বিষয়ে ভীষণ ভাবে সমালোচনা ক'রে এইটেই দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে যে প্রাকৃতিক উপায়ে সমাজবিন্যাসই শ্রেয়। এই ব্যাপারে সংস্কারমুক্তি আন্দোলনের সমর্থকেরা ইতিপূর্বে যেসব যুক্তি দেখিয়েছেন, এখন তা আরও বলিষ্ঠতার সঙ্গে এবং আরও যুক্তিপূর্ণভাবে দেখাতে লাগলেন। সংস্কারমুক্তির সমর্থকেরা বলে এসেছেন যে, মানুষের আত্ম-প্রতিষ্ঠা বা আত্ম-নির্ভরতাই হচ্ছে তাঁদের একমাত্র কাম্য—অর্থাৎ ঐতিহ্য বা বহুকাল-প্রচলিত প্রথার হাত থেকে মানুষের মুক্তিই তাঁদের অভিপ্রেত; কিন্তু ধর্মের ক্ষেত্রে সংস্কারমুক্তিকামীদের যুক্তির থেকে আবেগের উপরেই জোর ছিল, যার নাকি প্রকৃতির মধ্যেই ঈশ্বরের সন্ধান। মানুষের অস্বাভাবিক অবস্থার সমালোচনা এবং স্বভাব-নির্ভর মানুষের গৌরব

ঘোষণা একটি নাটকে বেশ পরিস্ফুট হয়। এই নাটক রচনা করে ফ্রায়েডরিখ ম্যাক্সিমিলান ক্লিংগার। নাটকের নামটাই এমন যে, ১৭৭০ থেকে ১৭৮৫ পর্যন্ত এই নামটিই এই আন্দোলনের পরিচয় হয়ে ওঠে। নাটকটির নাম স্টার্ম উণ্ড ড্রাং, যার অর্থ হচ্ছে: ঝড় ও ঝোঁক। গ্যেটে ও শিলারের প্রথম দিকের রচনা এই স্টার্ম উণ্ড ড্রাং-এরই আংশিক প্রতিধ্বনি। কিন্তু এই দুই কবি এই আন্দোলনকে অতিক্রম করে এগিয়ে যান, এবং ১৭৮৫ সাল থেকে আরম্ভ করে জার্মান সাহিত্যে নূতন ব্যঞ্জনা আনেন, তাঁরা জার্মানীর ধ্রুপদী সাহিত্যের পত্তন করেন—যেটা হল সাংস্কৃতিক ও সাহিত্যিক কৃতিত্বের চরম পরিণতি।

সংস্কারমুক্তিবাদের পরিচ্ছন্ন যুক্তির উপরে ভিত্তি করেই উদ্ভব হল এই ধ্রুপদী রচনাবলীর, এবং যুক্তিবাদের সঙ্গে ঐ নূতন আবেগবাদ মিশ্রিত হল, যুক্তি ও আবেগ—এই দুইয়ের সমন্বয়সাধনই হল ধ্রুপদী রচনার লক্ষ্য। জার্মান আদর্শবাদের যে দর্শন কাণ্ট্ প্রতিষ্ঠা করে গিয়েছেন, এই যুগের দৃষ্টিভঙ্গি সেই দর্শনের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। মানুষের উপরেও যার স্থান তা হচ্ছে ধরা-যায়-না ছোঁয়া-যায়-না এমন নৈতিক কানুন, সততার সত্যের ও সৌন্দর্যের আদর্শ—আত্ম-নির্ভর হয়ে নিজের চেষ্টায় যেখানে নাকি পৌঁছবার জন্যে মানুষের মধ্যে ব্যাকুলতা আছে। এই ব্যাকুলতাই মানুষকে পৌঁছে দেবে মানবিকতা-বোধে, প্রত্যেক মানুষের কল্যাণের জন্যে মানবজাতির প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসার, সামাজিক শৃঙ্খলা, সমাজের গঠন ও সমাজের মিতাচারিতা প্রত্যেকটির একটা মূল্যবোধ আছে। জার্মান ধ্রুপদী নাটক সম্মিলিত একটি সুষম আঙ্গিকে মৌলিক তাৎপর্যপূর্ণ সমস্যা নিয়ে গঠিত, জীবনের মূল্যবোধের সর্বজনীন যাথার্থ্য এর মধ্যে প্রতিধ্বনিত হয়ে ওঠে।

এই সময়কার তাৎপর্যপূর্ণ রাজনৈতিক ঘটনা হল ১৭৮৯-এর ফরাসী বিপ্লব, তার পরেরই কয়েকটি বিপ্লবী সংগ্রাম, এবং নেপোলিয়নের উত্থান, জার্মানীর রাষ্ট্রসমূহের মধ্য দিয়ে যাঁর সেনাবাহিনী বিজয়োল্লাসে যুদ্ধযাত্রা করেছে। জার্মানীর এই ধ্রুপদী যুগের দুই অগ্রগণ্য নেতা গ্যেটে ও শিলার এই ঘটনায় বিচলিত হয়েছিলেন, কিন্তু তাঁরা দুজনেই তখন দার্শনিক চিন্তায় আত্মসমাহিত। সেই সময়কার জাতীয় ও রাজনৈতিক বিষয়ের চেয়ে তাঁরা আধ্যাত্মিক চর্চা মানুষের নৈতিক শিক্ষা ও সার্বজনীন মানবিকতা-বোধ ইত্যাদিকেই বেশি গুরুত্ব দিয়েছিলেন।

অষ্টাদশ শতকের একেবারে শেষের দিকে, যখন শ্রেষ্ঠ ক্লাসিকাল রচনাবলী লেখা বাকি, সেই সময়ে জীবন ও সাহিত্য সম্বন্ধে নূতন এক মনোভাবের প্রসার আরম্ভ হল, একে বলা যেতে পারে ভাবপ্রবণতার মনোভাব—রোমাণ্টিক আন্দোলন। সংস্কারমুক্তির ক্ষেত্রে স্টার্ম উণ্ড ড্রাং যেমন করেছিল, ক্লাসিকাল যুগের চিন্তার স্বচ্ছতা ও পবিত্রতার বিরুদ্ধে এটি অবশ্য তেমন নয়। এই ভাবপ্রবণবাদ যদিও স্টার্ম উণ্ড ড্রাং-এর অনেক উপাদান ব্যবহার করেছে, সেইসঙ্গে সংস্কারমুক্তিবাদীদের অনেক যুক্তিও এরা ব্যবহার করেছে; অর্থাৎ পরবর্তীকালের জার্মান আদর্শবাদই এদের উপজীব্য ছিল; যে আদর্শবাদ বাহ্যিক নীতিবোধের উপর গুরুত্ব না দিয়ে মানুষের আন্তরিক নীতিবোধের উপর গুরুত্ব দিয়েছে—এবং এ'কেই বিশেষ ঐশ্বর্য বলে মনে করেছে। জীবনের প্রতি এই ভাবপ্রবণতার উৎপত্তি হচ্ছে মানুষের মনের কতকগুলি আধ্যাত্মিক ব্যাপার, যেমন—আবেগ, অমঙ্গলের আশঙ্কা, স্বপ্ন, এবং অসীমের জন্যে লালসা ও উৎকণ্ঠা। এর ফলে উদ্‌ভব হল রহস্য—ভীষণ ও অদ্ভুত রস। একদিকে অসীমের প্রতি তাদের অস্বাভাবিক আকর্ষণ, অন্যদিকে পূর্ণ স্বাধীনতার প্রতি তাদের সচেতনতা—এই দুই মিলে যাঁদের চিন্তাধারা প্রবাহিত হল, সেই রোমাণ্টিক কবিরা নিজেদের কোনো-একটি গড়নে গড়ে তুলতে চাইলেন না। ক্লাসিকাল লেখকদের বিপরীত ব্যাপার ঘটল তাঁদের রচনায়, তাঁদের রচনা যেন আকার পেল না, তাঁদের রচনা অখণ্ড কোনো রূপ পেল না; অনেক ধরণের কবিতা এক সঙ্গে মিশিয়ে ফেলা হল। মাঝে-মাঝে কবিরা নিজেরাই নিজেদের সমালোচনা করতে লাগলেন, নিজের কবিতা যে প্রভাব সৃষ্টি করেছিল তা বাতিল করে দিতে চাইলেন কেবলমাত্র অনবরত যে চিন্তার বদল হয়ে চলেছে তাই প্রমাণ করার জন্য। তাঁদের ভাবপ্রবণ মন এবং তাঁদের মনের মৌলিকতা তাঁদের অনুপ্রাণিত করল লোকগীতি-সংগ্রহে, বিশেষ ক'রে গান ও রূপকথা সংগ্রহে। যেমন এই রকম কাজ করেছিলেন হারডার। রোমাণ্টিক কবিরা তাঁদের নিজের রচনাতেও লোকগীতির সহজ ও সরল রচনারীতিই বেশি অনুসরণ করার আগ্রহ দেখিয়েছেন। এই রোমাণ্টিক অনুভূতি চিত্রকলা ও গানের মধ্যে দিয়েও নিজেকে প্রকাশ করতে চেয়েছে, জীবনের সর্বক্ষেত্রে পরিব্যাপ্ত হতে চেয়েছে, এমনকি উপাখ্যান ও বাস্তবতা এবং কলা ও বিজ্ঞান—এ সবের মধ্যের ব্যবধানও মুছে ফেলতে চেয়েছে। সুকুমারকলার প্রতি সর্বজনিক আশ্রয়ের ফলে সারা বিশ্বের সাহিত্যের প্রতি

সকলে আকৃষ্ট হল, এরই পরিণামে অনুবাদের ভিতর দিয়ে বিদেশী সাহিত্য জার্মান পাঠকদের কাছে এসে উপস্থিত হল। রোমাণ্টিক যুগের (১৮৩০) পর রচনায় ভাবপ্রবণতার ও সরলতার লক্ষণ দেখা দিতেলাগল, এবং এ ধরণের রচনায় যাঁরা হাত দিলেন তাঁরা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লেখক।

সে সময়কার যেসব রাজনৈতিক ঘটনার প্রভাব জার্মানীর উপর খুব বেশী করে পড়েছিল তার প্রতিক্রিয়া ক্লাসিকাল লে'কদের উপর যতটা হয়েছে তার অনেক বেশি হয়েছে রোমাণ্টিক লেখকদের উপর। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য নেপোলিয়নের প্রুশিয়া-জয় (১৮০৬-১৮০৭) ও তার পরবর্তী মুক্তিসংগ্রাম (১৮১৩-১৮১৫), এর প্রতিধ্বনি বেজে উঠেছিল কবিতায় বক্তৃতায় ও প্যামফ্লেটে। রোমাণ্টিক যাঁরা তাঁদেরই স্বদেশপ্রীতির জন্যে এসব হয়েছিল, অতীতের প্রতি তাঁদের মমতা এবং নিজের জাতির শক্তি ও সততার প্রতি তাঁদের শ্রদ্ধাই তাঁদের দিয়ে এ কাজ করিয়েছে।

ফ্রায়েডরিখ ম্যাক্‌সিমিলিয়ান ক্লিংগার

শয়তানের উক্তি

ফ্রায়েডরিখ ম্যাক্সিমিলিয়ান ক্লিংগার (১৭৫২-১৮৩১) এক দরিদ্র কৃষকের পুত্র ছিলেন। তাঁর পড়াশুনার জন্যে গ্যেটে অনেক অর্থসাহায্য করেছিলেন। কিছুকাল ক্লিংগার একটি নাটকের দলের সভ্য ছিলেন। তার পরে সামরিক কাজ করেন, এবং অবশেষে রাশিয়ায় জেনারেলের পদে উন্নীত হন। তাঁর প্রথম-দিকের রচনাকালে তিনি বিশেষভাবে পরিচিত হন 'স্টার্ম উণ্ড ড্রাং'-এর রচয়িতা হিসেবে। এর পরে ১৭৯০ থেকে ১৮০০ সালের মধ্যে তিনি লেখেন উপন্যাস। এসব রচনার ভিত্তি কিছুটা ছিল দার্শনিক, এবং পৃথিবীর প্রতি অনেক সমালোচনামূলক মনোভাবই এসব রচনায় ছিল, এ'তে ছিল অনেক সন্দেহ ও অবিশ্বাসের মনোভাব। 'শয়তানের উক্তি' রচনাটি তাঁর "দি লাইফ অব ফাউস্ট : তার কাজ ও তার নরকে গমন" (১৭৯১) উপন্যাসের একটি অংশ। ফাউস্ট হচ্ছে মানুষেরই একটি প্রতীক মাত্র, ক্ষমতার প্রতি লালসা ও জ্ঞানার্জনের স্পৃহা তাকে শয়তানের সঙ্গে একটা রফা করায়—মধ্যযুগের পর থেকে এই বিষয়টি সাহিত্যের উপকরণরূপে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। ফাউস্টকে ক্লিংগার মুদ্রণের আবিষ্কারক হিসেবে দাঁড় করিয়েছেন। উপন্যাসটির প্লটে বিশেষ বাঁধুনি নেই, এতে ফাউস্টকে শয়তান পৃথিবী দেখিয়ে বেড়াচ্ছে, তার

মারফতেই মানবসমাজের যাবতীয় সমালোচনা করা হয়েছে, যে সমাজ নাকি নীতিজ্ঞানহীন এবং তার সংস্কৃতির ও সভ্যতার চরম উৎকর্ষের দরুণ একেবারেই কলুষিত : এখানে রুশোর প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

ফাউস্টকে নরকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্যে শয়তান এই বক্তৃতা দিয়েছে। এই উক্তির মধ্যে আধুনিক যুগ সম্বন্ধে নিদারুণ ক্রূর দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া গিয়েছে তা শয়তানের চোখ দিয়ে দেখা একটু বিকৃত রূপই বটে, কিন্তু এটা ক্লিংগারের ইতিহাস-গত অভিজ্ঞতা থেকে অর্জন করা নিজেরই উক্তি :

হে রাজন্যবর্গ, হে শক্তিমানেরা, অবিনশ্বর আত্মাসমূহ, তোমাদের সকলকে স্বাগত জানাই। তোমাদের মত সংখ্যাহীন বীরদের দিকে তাকালে আমার শরীরের ভিতর দিয়ে ভয়ংকর আনন্দের শিহরণ খেলে যায়। একদা আমরা এই তলহীন গহ্বরে প্রথম সংজ্ঞালাভ করি এবং সকলে একত্র হই তখনও আমরা যা ছিলাম, এখনও তাই আছি। কেবলমাত্র এখানেই একটিমাত্র উপলব্ধি জেগে থাকে, সেটি হল এই-যে কেবলমাত্র নরকেই একতাবোধ আছে, কেবল এখানেই একটি মাত্র উদ্দেশ্য নিয়ে সকলে কাজ করে। তোমার উপরে যে ছড়ি ঘোরায় সে সহজেই স্বর্গের একঘেয়ে দীপ্তির কথা ভুলে যায়। আমি স্বীকার করি যে, আমরা অনেক কষ্ট ভোগ করেছি, এবং এখনও করছি ; এর কারণ, ক্ষমতা-প্রয়োগের অধিকার সেই নিজের হাতে রেখে দিয়েছে, কেননা আমরা তাকে যতটা ভয় করি তার চেয়ে সে আমাদের বেশি ভয় করে। কিন্তু এই কষ্টভোগের প্রতিশোধ আমরা নিতে পারি, ধূলির সন্তানেরা এবং তাদের দুর্বল প্রিয়পাত্রেরা যেসব পাগলের কাণ্ড করে ও জঘন্য ভাষা ব্যবহার ক'রে ক্ষমতাবাণের উদ্দেশ্য বানচাল করে তার বিরুদ্ধে প্রতিহিংসা আমরা গ্রহণ করতে পারি। আমার এই কথায় যাদের মন উত্তেজিত হয়ে উঠছে তাদের সকলকে অভ্যর্থনা জানাই।

আপনাদের সঙ্গে যে আনন্দের আসরে মেতে উঠতে ইচ্ছে করেছি তার কারণ শুনুন। ফাউস্ট হচ্ছে আমাদেরই মতন একজন মানুষ যে সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের সঙ্গে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়েছিল, এবং তার মনোবলই তাকে একদিন আমাদের সঙ্গে নরকে বাস করার অধিকার দেবে। একটি বইকে হাজার-হাজার সংখ্যায় কি করে বাড়িয়ে যেতে পারা যায় সে সেই পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছিল। বইয়ের কথা বলছি, বই—মানুষের সেই মারাত্মক খেলনা, মিথ্যার উন্মত্ততার

ভ্রান্তির আর ভীষণতার যা প্রচারক অহংকার দম্ভ ও সন্দেহের যা নাকি উৎস। এখনও এ জিনিস ভারি দুর্লভ, কেবল বিত্তবানদেরই তা আয়ত্তে; এ জিনিস তাদের অহংকারে ফাঁপিয়ে তুলছে, ভগবান তাদের হৃদয়ের মধ্যে যেটুকু সরলতা ও বিনয় তাদের সৌভাগ্যবশত দিয়ে দিয়েছিলেন যার কল্যাণে সেসব গুণও তাদের কাছ থেকে পালাচ্ছে। জয়ধ্বনি করো, অল্পকালের মধ্যেই জ্ঞানের মতন ও জানার আকাঙ্খার মতন মারাত্মক বিষ সর্বশ্রেণীর আয়ত্তে এসে যাবে। উন্মত্ততা, অবিশ্বাস ও অশান্তি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়বে, এই লোভনীয় বিষের দ্বারা যারা নিজেদের জর্জরিত করবে, আমার সন্দেহ হচ্ছে আমার এই বিশাল রাজত্বে তাদের সকলের স্থানসংকুলান হবে কিনা। কিন্তু এটা হবে একটা ক্ষুদ্র জয় মাত্র। বহু দূরকালের দিকে আমার দৃষ্টি নিবদ্ধ, যে সময়টা আমাদের কাছে ঘড়ির কাঁটার একটা পাক মাত্র। ফাউস্ট-এর এই আবিষ্কারের কল্যাণে, দুঃসাহসী প্রবর্তকদের আইডিয়া ও অভিমত চতুর্দিকে অচিরেই ছড়িয়ে পড়বে প্লেগের মত। স্বর্গের ও মর্তের তথাকথিত সংস্কারকেরা মেতে উঠবেন, এবং মত-প্রচারের এত সহজ পন্থার সুযোগ নেবেন, তাঁরা যা শিক্ষা দিতে চাইবেন তা গিয়ে পৌছবে এমনকি ভিখারীর কুড়েঘর পর্যন্ত। তারা মনে করবে যে তারা বেশ কল্যাণকাজ করছে, পরিত্রাণের আর আশার পথ তারা অনেক নোংরামির হাত থেকে রক্ষা করছে, তা পবিত্র করে তুলছে। কিন্তু কথা হচ্ছে এই—কল্যাণকাজে মানুষ কবে সফল হয়েছে, এবং এই ধরণের কাজ করায় সে নিজেকে কতদিন নিযুক্ত রাখতে পেরেছে? মানুষের মহৎ প্রচেষ্টার অপব্যবহার এবং তার অশুভ পরিণাম মানুষের এমন নিকটের বস্তু যে, মনে হয়, পাপও বুঝি মানুষের অমন কাছের জিনিস নয়। ঈশ্বর যে মানুষদের খুব ভালোবেসেছিলেন আর নরকের কবল থেকে তাদের বিশেষ জাদু-বলে রক্ষা করতে চেয়েছিলেন, সেই মানুষেরাই এমন-সব অভিমত নিয়ে রক্তক্ষয়ী লড়াইয়ে লিপ্ত হবে যেসব অভিমতের কোনো মানে হয়, না, এবং শেষে বন্যজন্তুদের মতন পরস্পর পরস্পরকে ছিঁড়ে টুকরো-টুকরো করে ফেলবে। মানবজাতির আদিকাল থেকে যেরকম উন্মত্ততা কখনো দেখা যায়নি, সেইরকম উন্মত্ততার ভীষণতা সমস্ত ইউরোপকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করবে।

আমি যে আশা প্রকাশ করছি তা যেন একটু বাড়াবাড়ি রকমের বলে তোমরা মনে করছ— তোমাদের চোখ-মুখের ভাব দেখেই তা বুঝতে পারছি। তবে শোনো। এই-যে নূতন উন্মত্ততা—মানবজাতির যাবতীয় বলাৎকারের ও

উন্মাদনার দীর্ঘ ইতিহাসে-এর তুল্য কোনো ঘটনা নেই। একে বলে ধর্মের লড়াই। ঘৃণা ও কুসংস্কারের সন্তান হচ্ছে ধর্মান্ধতা, মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির যে নিবিড় সংযোগ, এই প্রথম এই ধর্মান্ধতা সেই যোগ ছিন্ন করবে। এই মারাত্মক অন্ধতাকে মদত দেওয়ার জন্য পুত্র পিতাকে হত্যা করবে, পিতা হত্যা করবে পুত্রকে। রাজারা আনন্দের সঙ্গে তাঁদের প্রজাদের রক্তে হাত ডোবাবেন, ধর্মান্ধদের হাতে তরবারি তুলে দেবেন যাতে ঐ অস্ত্র দিয়ে তারা তাদের ভায়েদের হাজারে হাজারে খুন করতে পারে, কেননা ঐ ভ্রাতারা ভিন্ন মত পোষণ করেন। তখন নদীর ধারা হয়ে উঠবে রক্তবন্যা, এবং নিহতদের আর্তনাদ নরককেও কাঁপিয়ে তুলবে। আমরা দেখতে পাব কাতারে কাতারে অপরাধীরা আমাদের কাছে আসছে ঘোরতর নষ্টামিতে সারা অঙ্গ কলুষিত করে, কিন্তু তাদের সাজা দেবার কোনো সুযোগই আমাদের নেই। আমি মর্মচোখে দেখতে পাচ্ছি তারা ধর্মের পীঠস্থান আক্রমণ করছে, চতুরতা দিয়ে কৌশল দিয়ে যে নড়বড়ে পীঠস্থানটি গড়া, এবং যেটা পাপের ও বিলাসিতার রাজত্ব। ধর্মের স্তম্ভগুলি—যা নাকি আমাদের পক্ষে মারাত্মক, তা—ধসে পড়বে, যদি নূতন কোনো জাদুমন্ত্রে এই দালান রক্ষা করার জন্যে ঈশ্বর ছুটে না আসেন তাহলে পৃথিবী থেকে এর অস্তিত্ব মুছে যাবে; এবং পুনরায় আমরা মন্দিরে-গির্জায় উপাস্য দেবতার মতন নিজেদের দীপ্তিতে উজ্জ্বল হয়ে বিরাজ করব। মানুষ যাকে উপাস্য ও পবিত্র পীঠস্থান বলে মনে করেছে সেখানে যদি সে নিজেই সমুজ্জ্বল হয়ে উঠতে পারে তাহলে মানুষের সেই চিরন্তন আত্মাকে রুখবে কে? যে অত্যাচারীকে দেখে গতকাল সে ভয়ে কাঁপত, আজ সে তার কবরের উপর নৃত্য করবে, সেই বেদী সে ধ্বংস করে ফেলবে যার উপরে তাকে আত্মাহুতি দিতে হয়েছে। একবার যদি সে নিজের অভিপ্রায়-অনুসারে স্বর্গের সোপান দেখতে পায়, তবে এইরকম কাজই সে করবে। হাজার-হাজার বছর ধ'রে মানুষের অস্থির আত্মাকে শৃঙ্খলিত ক'রে রাখতে পারবে কে। যিনি সকলকে সৃষ্টি করেছেন তিনি কি তাদের মধ্যে থেকে মাত্র একজনকে বেছে নিয়ে তাকে এমন অধিকার দিতে পারেন যে, সে আমাদের রাজত্বের চেয়ে সহস্রগুণ বেশি ক'রে নিজেকে নিজের রাজত্বের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ করে বাঁধতে পারে? মানুষ সব জিনিসের অপব্যবহার করে—তার নিজের আত্মার ও দেহের শক্তির, যা-কিছু সে দেখে, শোনে, স্পর্শ করে, অনুভব করে, চিন্তা করে; যা-কিছু নিয়ে সে খেলা করে, যা-কিছু নিয়ে নিজেকে বিভোর

রাখে—মানুষ তার সব-কিছুই অপব্যবহার করে। দুই হাত দিয়ে যা ধরতে পারে তা গুঁড়ো করে ফেলেও তার আকাঙ্ক্ষা মেটে না, সে তার কল্পনায় ভর ক'রে অজানা পৃথিবীর দিকে উড্ডীন হয়, এবং কল্পনায় তা ধ্বংস করে। স্বাধীনতার মতন যে অমূল্য জিনিস, যা অর্জনের জন্যে রক্তগঙ্গা বইয়ে দিতে হয়েছে, সেই স্বাধীনতার স্বাদ নেবার আগেই তারা টাকার বিনিময়ে, আনন্দের লোভে, বা উন্মত্ততার বশবর্তী হয়ে বিক্রি করে দিতে পারে। কল্যাণ করার অক্ষমতার দরুণ অকল্যাণ দেখে তারা ভয়ে কাঁপে, এর হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে আতঙ্কের উপর আতঙ্ক স্তূপ করে তোলে, তারপর নিজের হাতের কাজকে একেবারে নষ্ট করে ফেলে।

রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পর হত্যালীলায় ক্লান্ত হয়ে তারা একটু বিশ্রাম নেয়, এবং তার পর মনের ভিতরের বিষাক্ত বিদ্বেষ তাদের নিযুক্ত করে চৌর্যে ও বিশ্বাসঘাতকতায়। এদের কেউ কেউ এই বিদ্বেষকে সুবিচারের উপর বিশ্বাসের প্রমাণ রূপে কাজে লাগায়, তাদের মতের সঙ্গে যাদের মত মেলেনা তাদের চিতা সাজায় কিংবা জীবন্ত কবর দেয় তাদের। অন্যরা এমন-সব কাজের জন্যে ব্যস্ত হবেন যারা কোনো ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না, কেউ-কেউ বা রত হবেন জটিল রহস্য-উদ্ধারে, আবার যাঁরা অন্ধকারেই জন্মেছেন তাঁরা আলোকের জন্য আন্তরিক সংগ্রাম করতে থাকবেন। কল্পনা উদ্দীপ্ত হয়ে উঠবে, এবং তার ফলে হাজার রকমের প্রয়োজন দেখা দেবে। তারা সত্যকে সরলতাকে ও ধর্মকে পদ-দলিত করবে, একটি বই লেখার জন্য, যার ফলে তাদের নাম হয় ও তারা টাকা করতে পারে। বই-লেখা কাজটা সকলের মধ্যে এমন জড়িয়ে যাবে যে, যারা প্রতিভাবান এবং যারা ছেঁড়া-লোক সকলেই এর দ্বারা যশ ও প্রতিপত্তি চাইবে, স্বজনদের মনে তারা বিভ্রান্তি সৃষ্টি করছে কি না, যারা একেবারে নিরীহ তাদের হৃদয় দগ্ধ করে দেওয়া হচ্ছে কিনা, তার দিকে তারা ভ্রূক্ষেপও করবে না। তারা অনুভব করতে চাইবে, পরিমাপ করতে চাইবে, এমন কি হয়তো আয়ত্তও করতে চাইবে এই পৃথিবী ও ঐ স্বর্গ, সেই ভয়ংকর ও অবিনশ্বর, প্রকৃতির অজ্ঞাত রহস্য, এর অন্ধকারের কারণ, যে শক্তি গ্রহদের ঘুরিয়ে বেড়ায় এবং অন্তহীন শূন্যের মধ্যে দিয়ে ধূমকেতুকে উৎক্ষেপ করে, ধারণাতীত সময়, যা-কিছু দেখা যায় বা যা-কিছু দেখা যায় না—সবই তারা নিজেদের যেন জ্ঞানের মধ্যে এনে নেবে। যে জিনিস মনের আয়ত্তের বাইরে, তারা তাও কব্জা

করতে চাইবে ; তারা নানা পদ্ধতি ও প্রণালী উদ্ভাবন করে তা স্তূপীকৃত করে তুলবে যতক্ষণ-না বিশ্ব অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে যায়, সেই অন্ধকারের মধ্যে মানুষের মনের সন্দেহ বিদ্যুৎচমকের মত জ্বলে-জ্বলে উঠবে, আলেয়া যেমন পথচারীকে একেবারে জলা-ভূমির মধ্যে নিয়ে গিয়ে ফেলে, এও অনেকটা সেইরকম। একমাত্র তখনই তারা বুঝবে যে তারা এবার স্পষ্ট দেখতে পেয়েছে, এবং তাদের সেই অবস্থার জন্য আমি তাদের অপেক্ষায় থাকব ! নরকের ফটক একেবারে উদারভাবে খুলে দাও, মানবজাতি যেন এখানে বেশ ভালোভাবে প্রবেশ করতে পারে। এর প্রথম ধাপ নেওয়া হয়ে গেছে, দ্বিতীয় ধাপও আর দূরে নেই। পৃথিবীর সম্মুখে এখন এক ভয়ংকর বিদ্রোহ আসন্ন। আমি এ বিষয়ে খুব দ্রুত ভাবে কিছু বলব। পুরাতন পৃথিবীর মানুষেরা অচিরেই পৃথিবীর নূতন এলাকা আবিষ্কারে যাত্রা করবে—যে এলাকা এখনো তাদের অজ্ঞাত। সেখানে তারা ধর্মীয় ক্রোধে হাজার-হাজার মানুষকে গলা টিপে মারবে, যে স্বর্ণখনি সেখানে আছে তারা তার খোঁজ নেয়নি বলে এই ক্রোধ। এই নূতন পৃথিবী তারা তাদের পাপ দিয়ে আচ্ছন্ন করবে, এমন পুরাতন পৃথিবীকে আরও নৃশংস করে তোলার জন্যে নূতন অস্ত্র আনবে। অজ্ঞতা ও নিরীহতা যে জাতিকে এতকাল রক্ষা করে এসেছিল, এবার তারাই হবে আমাদের শিকার। শত শত বছর ধরে এক ভয়ংকর সত্তার নাম করে তারা পৃথিবীর রক্ত শোষণ করবে। এই ভাবে স্বর্গের যারা প্রিয়জন তাদের দিয়েই নরক তার উপর আধিপত্য বিস্তার করবে, যে আমাদের নিয়ে এসে ফেলেছে এই তলহীন গহ্বরে।

হে শক্তিমানবৃন্দ, এই আমার বার্তা। এই বার্তাই তোমাদের জানাতে চেয়েছিলাম। এখন আমার সঙ্গে তোমরা এই গৌরবময় উৎসবে মেতে যাও। যে জয় তোমাদের হবেই বলে জানিয়েছি, সে জয়ের আনন্দ আগাম ভোগ করো। আমি মানুষদের চিনি বলেই আমার একথা বলা। ফাউস্ট দীর্ঘজীবী হোক।

হাইনরিখ লিওপোল্ড ভাগনার

শিশু-হন্তারক

হাইনরিখ লিওপোল্ড ভাগনার (১৭৪১-১৭৭৯) যদিও ক্লিংগার এবং লেনৎস-এর চেয়ে কম নামকরা লেখক ছিলেন, কিন্তু তিনি স্টার্ম উণ্ড ড্রাং’

মেজাজের নাট্যকার বলে খ্যাত ছিলেন। তাঁর সবচেয়ে প্রসিদ্ধ নাটক হচ্ছে—"দি ইনফ্যানটিসাইড" (১৭৭৬) অর্থাৎ 'শিশু-হন্তারক'। এর বিষয়বস্তু হচ্ছে এই যে, একটি মেয়েকে প্রলুব্ধ করে নিয়ে যাওয়া হয়, এবং সে তার অবৈধ সন্তানকে হত্যা করে। ক্লিংগার-এর সমসাময়িক অনেক লেখক এই বিষয়বস্তু নিয়ে লিখেছেন, এমনকি গ্যেটেও তাঁর মর্মস্পর্শী গল্পে এই বিষয়বস্তু ব্যবহার করেছেন। আলোচ্য নাটকে এভশেন নাম্নী এক সাধারণ-ঘরের মেয়েকে প্রলোভন দেখিয়ে নিয়ে যান অভিজাত বংশের লেফন্যান্ট ফন গ্রনিংসেক; এই ঘটনাটি ঘটার আগে যাঁর বিবেক জাগ্রত হয় না। এর পর এভশেনের জন্যে তিনি একটা ব্যবস্থা করে দিতে চান, এবং এ কাজ করার জন্যেই তিনি একটি কাজ নিয়ে বিদেশযাত্রা করেন। এখানে যে অংশ উদ্ধৃত হচ্ছে তা ঐ যাত্রার পূর্বের বিদায়-দৃশ্য। তিনি যখন ফিরে এলেন, তখন বড় দেরি হয়ে গিয়েছে। ইতিমধ্যে এক নিভৃতে এভশেন তার সন্তানের জন্ম দিয়েছে এবং তাকে হত্যা করেছে। তার এমন কাজ করার কারণ হচ্ছে এই যে, সে মনে করেছিল গ্রনিংসেক তাকে পরিত্যাগ করেছে, এবং সে তার মধ্যবিত্ত-সমাজের লোকেদের দ্বারা ধিক্কৃত হবে—এই ভয়। অতি নিখুঁত বাস্তবতার সঙ্গে খুঁটিনাটি ঘটনার বিবরণ দিয়ে ভাগনার সমস্ত ব্যাপারটি উপস্থাপিত করেছেন, নানারকম সামাজিক ঘটনার পশ্চাতপটে তিনি এই নাটক স্থাপন করেছেন। এতে সমাজের প্রতি তীক্ষ্ণ কটাক্ষ করার ঝোঁক দেখা যায়। যে অভিজাত অফিসারটি একটি সাধারণ-ঘরের মেয়ের প্রতি এরকম ব্যবহার করেছে তার একগুঁয়েমি ও তার নিস্পৃহতার জন্যে তাকে অভিযুক্ত করা হয়েছে; এবং সেই সঙ্গে এই "অধঃপতিত মেয়েটির" অবস্থা বিবেচনা না করায় ও তার প্রতি অনুকম্পা না দেখানোর জন্যে মধ্যবিত্ত-সমাজের অতিরিক্ত নীতিবোধের জন্যও তাদের তিরস্কার করা হয়েছে।

এভশেন॥ কবে তুমি ফিরতে পারবে বলে আশা করছ?

ফন গ্রনিংসেক॥ আশা করছি মাস-দুয়েকের মধ্যে ফিরতে পারব।

এভশেন॥ দুই মাস! আমার বুক তাহলে কাঁপতে থাকবে—কেননা, যা ঘটার ঘটেছে, এটা আমার মেনে নিতে হবে। তুমি যদি তাড়া মনে না করে থাক, আমি তোমাকে তাড়া দিতে চাইনে। বুঝতে পারছি, আমারই সর্বনাশ হয়েছে।

ফন গ্রনিংসেক ॥ সত্যি, আমি খুবই তাড়া বোধ করছি।

এভশেন ॥ এখন তাড়া বোধ করছ, গ্রনিংসেক! হ্যাঁ, আমি তোমাকে বিশ্বাস করি, তোমার সততাতেও আমার বিশ্বাস আছে। কিন্তু ভবিষ্যতে কি ঘটবে, কে বলতে পারে? কেউ বলতে পারে না। এমনকি তুমিও পার না। ভাগ্যের কপালে কি লেখা আছে তা আমরা কেউ পড়তে পারিনে। কিন্তু আমার অন্তর্যামী বলছেন, বার বার আমি তাঁর কথা বন্ধ করে দেবার চেষ্টা করা সত্ত্বেও তিনি বলছেন—আমার ভবিষ্যৎ রক্তের অক্ষরে লেখা।

ফন গ্রনিংসেক ॥ এভশেন, তুমি এমন কথা বলতে পারছ কী করে?

এভশেন ॥ কী করে বলতে পারছি? পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে সহজ একটা কথা ভাবো, ধরো, তুমি তোমার কথা রাখলে না।

ফন গ্রনিংসেক ॥ কিন্তু এ যে একেবারে অসম্ভব কথা!

এভশেন ॥ যথাসময়েই তার প্রমাণ হবে! কিন্তু শোনো! মনে কর তুমি তোমার কথা রাখলে না, মনে কর তুমি আমাকে আমার ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দিলে—ছেড়ে দিলে আমাকে অসম্মান ও অপমানের হাতে, আমার আত্মীয়-স্বজনের ক্রোধের মুখে, আমার বাবার কোপের মুখে। তুমি কি মনে কর আমি এসব সহ্য করতে পারব, এসবের জন্যে অপেক্ষা করে বসে থাকতে পারব? কিছুতেই না। আমি সবচেয়ে নির্মম নির্জনতা বেছে নেব—যার কাছে-ভিতে কোথাও লোকালয় নেই, ঘন বনের মধ্যে নিজেকে লুকিয়ে রাখব, যাতে আমার কোনো ছায়া দেখতে না পাই, কোনো ঝরনার জলেও যাতে আমার এই অশুচি শরীরের ছায়া পড়তে না পারে, সেজন্য আকাশ থেকে বৃষ্টির যে জল পড়বে আমি তাই পান করব। কিন্তু ঈশ্বর যদি অসম্ভব কোনো কাণ্ড করে বসেন, যদি আমাকে আর পিতা থাকা সত্ত্বেও ঐ পিতৃহীন অসহায় প্রাণীটিকে যদি বাঁচিয়ে দেন, তাহলে সেই প্রাণীটি কোনো শব্দ করা মাত্রই আমি তার কানের মধ্যে তার বাবার ও মায়ের কাহিনী চীৎকার করে জানাব, তারা কোন্ কোন্ কলঙ্কজনক ও মিথ্যা শপথ করেছিল তা তাকে জানাতে থাকব, যতক্ষণ এই কথাগুলি সে পুনরাবৃত্তি করতে না পারে ততক্ষণ বলতে থাকব। এবং তারপর? তারপর তার অভিশাপ আমাকে আমাদের এই শোচনীয় দুঃখের হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্যে প্রেরণা দেবে। বলো, গ্রনিংসেক, এতে কি রক্তের চিহ্ন নেই?

ফন গ্রনিংসেক ॥ অবশ্যই আছে। এ কথা শুনে আমার চুল খাড়া হয়ে উঠছে। আমি একজন সৈনিক। অল্পবয়সেই আমি যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়েছি। আমার অনেক বীভৎস দৃশ্য দেখেছি। কিন্তু তুমি যা বলছ—

এভশেন ॥ যা বলেছি তা ঘটা না-ঘটা নির্ভর করছে তোমার উপরে।

ফন গ্রনিংসেক ॥ ভগবান তোমাকে এমন অবস্থা থেকে রক্ষা করুন—এই প্রার্থনা করি। তুমি যা বললে তা ভাবতেই আমার শরীর কেঁপে উঠছে। দোহাই, এভশান, এসব দুঃস্বপ্ন ছেড়ে দাও। মন থেকে ওসব দুশ্চিন্তা দূর করে ফেল। আমার উপর নির্ভর কর, আমার কথার মর্যাদার উপর ভরসা রাখ, আমার মধ্যে যে অনুভূতি আছে, যে সততা আছে, তার উপর বিশ্বাস রাখ। যা বললে তার সম্ভাবনা যদি-বা একটা স্ফুলিঙ্গের মতন থেকেও থাকে, তুমি সে সম্ভাবনার কথা ভেবে যেন অগ্নিকাণ্ড ঘটালে!

এভশেন ॥ বেশ, ভালো কথা, গ্রনিংসেক। তুমি যা বলছ তাই হোক। আমি প্রতিজ্ঞা করছি অমন কথা আর ভাবব না।

ফন গ্রনিংসেক ॥ কিন্তু আমার ফিরে আসা পর্যন্ত তুমি শান্তভাবে অপেক্ষা করবে, আমার উপর বিশ্বাস রাখবে, এ প্রতিজ্ঞা কর।

এভশেন ॥ (একটু ভেবে) এমন প্রতিজ্ঞা করতে চাইনে যা রাখতে পারব না।

ফন গ্রনিংসেক ॥ আমাকে যদি একজন মান্য ব্যক্তি বলে তুমি বিশ্বাস কর, তবে প্রতিজ্ঞা রাখতে পারবে না কেন।

এভশেন ॥ নিজেকে প্রবঞ্চনা করতে যদি না চাই, বাবা-মাকে এ ব্যাপারে ঘুণাক্ষরেও যদি জানতে দিতে না চাই, তাহলে তোমাকে বিশ্বাস করা ছাড়া গতি কি। তুমি জান না, তুমি কতভাবে এ ব্যাপারে আমাকে চাপ দিয়েছ, কত জুলুম করেছ। এ ঘটনার কথা এই গোপন ব্যাপারটির কথা কতবার আমি তোমায় বলেছি, কিন্তু ভয়—

ফন গ্রনিংসেক ॥ আমি তোমাকে অনুনয় করে বলছি—কথাটা গোপন রাখ। তোমার যাবার কথা ভাবলেই আমি ভয়ে শিউরে উঠি। খুব চেষ্টা করবে, সব শক্তি একত্র করবে, যাতে কারো মনে কোনো সন্দেহ না জাগে। কেউ যেন কোনোরকম কিছু সন্দেহ করতে না পারে।

এভশেন ॥ আমার সেই খুড়তুতো ভাইকেও না? যে রকম তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সে আমাকে দেখে তাতে কয়েকবারই আমি নিজেকে সামাল দিয়ে যেন উঠতে পারিনে। কাল তাকে যে চিঠি পাঠিয়েছ তাতে কিছু কাজ হয়েছে

বলে মনে হয়। তার তাকাবার ধরণ দেখেই তা বুঝেছি; কিন্তু এমন ভান করেছি যে, ওসবের মধ্যে আমি নেই।

ফন গ্রনিংসেক ॥ তোমার কোনো ক্ষতি কি সে করতে পারে?

এভশেন ॥ না, কোনো ক্ষতিই করতে পারবে না, গ্রনিংসেক। সে আমার ভালো ছাড়া মন্দ চায় না। যতটা বুঝতে পেরেছি, আমার দিকে তার টান আছে, মনে হয় এ ব্যাপারে আমার মায়েরও যোগ আছে। এসব লোকে ধর্মযাজকের পদপ্রার্থী হয়েও নিজেদের জন্যে পাত্রী নির্বাচন করায় বেশ অভ্যস্ত। দশ-পনেরো বছর পরে এরা যদি কোনো গ্রাম পায় ধর্মযাজনার উদ্দেশ্যে, তাহলে একজন স্ত্রী সংগ্রহ করা তাদের পক্ষে কঠিন হবে না।

ফন গ্রনিংসেক ॥ অতদিনের মধ্যে আমরা নিশ্চয় তার জন্যে আমাদের একটি মেয়ে দিতে পারব।

এভশেন ॥ সে মেয়ে যেন তার মায়ের জন্যে লজ্জায় না পড়ে সে সম্বন্ধে হুশিয়ার থেকো। এবার তুমি তবে যাও। এত রাত পর্যন্ত আমার ঘরে আলো দেখায় আমার পড়শীরা অভ্যস্ত নয়।

ফন গ্রনিংসেক ॥ তুমি ওদের দেখেও ভয় কর বুঝি?

এভশেন। (নিজের বুকের দিকে নির্দেশ করে) হৃদয়ে যখন কোনো শান্তি থাকে না, তখন নিজের ছায়া দেখেও ভয় পাই। এবার তবে যাও। আগামী কাল আমার মায়ের সঙ্গে আমার দেখা পাবে। তাঁর কাছ থেকেও বিদায় নিও কিন্তু।

ফন গ্রনিংসেক ॥ কেবল তোমার দেখাই পাব, তোমার সঙ্গে কথা বলতে পারব না বুঝি?

এভশেন ॥ তোমার চোখের ভাষাই আমি বুঝতে পারব। (ওরা দরজার কাছে গেল) দুই মাস, দুই মাসের কথাই তো বললে?

ফন গ্রনিংসেক ॥ খুব বেশি হলে দুমাস। আমি আবার শপথ করছি, আকাশের ও তারাদের আর ঐ চাঁদকে সাক্ষী রেখে শপথ করছি। কাল যখন গাড়িতে উঠব তখন আমার চোখের চাউনি এই শপথই আবার জানাবে। শান্ত হয়ে থেকো লক্ষীটি। (এভশেনের হাতে চাপ দিয়ে সে বিদায় নিল। এভশেন দরজাটা অর্ধেক খুলল, মাথাটা বাইরে দিয়ে চাপা গলায় বলল)—

এভশেন ॥ আর একটা কথা, গ্রনিংসেক! (গ্রনিংসেক একটু ফিরে এল, এভশেন কথা বলতে-বলতেই তাকে চুম্বন করল) কাল তোমার রওনা হবার সময় এটা দিতে পারব না। (গ্রনিংসেককে বাইরে রেখে সে দরজাটা বন্ধ করে দিল)।

জোহান ভল্‌ফ্‌গ্যাং ফন গোটে

জোহান ভল্‌ফ্‌গ্যাং ফন গোটে ফ্র্যাঙ্কফুর্ট-অন-মেইন-এ জন্মগ্রহণ করেন। যৌবনকালে তিনি 'স্টার্ম উণ্ড ড্রাং'এর প্রভাবান্বিত ছিলেন। ১৭৭৫ সালে ডিউক কার্ল অগষ্ট গ্যেটেকে তাঁর ভাইমারের রাজসভায় আহ্বান করেন, এখানে গোটে রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক কাজের দায়িত্ব গ্রহণ ক'রে জীবনের বেশির ভাগ সময় অতিবাহিত করেন। ১৭৮৬-১৭৮৮ সালে তিনি যখন ইতালি-পরিভ্রমণে বের হন, তখন পুরাতন শিল্পকলার গঠনর্নৈপুণ্য দেখে তাঁর জীবনের চিরায়ত যে ধ্রুপদী যুগ আরম্ভ হয়, এর ফলে তিনি রচনা করেন অপূর্ব সৌন্দর্য ও সুষমায় মণ্ডিত দুটি নাটক —"ইফিজেনিয়া ইন্ টরিস" এবং "টরকোয়াটো ট্যাস্‌সো"; তিনি তাঁর বন্ধু শিলারের কাছ থেকেও অনুপ্রেরণা লাভ করেন। ১৭৯৪ সাল থেকে এঁরা দুজন পরস্পরের মধ্যে অভিমত বিনিময় করে চলেছিলেন। তাঁর সরকারি কাজ থেকে অব্যাহতি পাবার পর গোটে ভাইমার কোর্ট থিয়েটার পরিচালনায় এবং বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থাদি পাঠে আত্মনিয়োগ করেন। জীবনে প্রচুর অভিজ্ঞতা অর্জন করার পর এবং ঈশ্বর-অনুসন্ধানে মানুষের যাত্রার অগ্রগতি বিষয়ক বিখ্যাত রূপক নাটক "ফাউস্ট" রচনা সমাপ্ত করার পর পরিণত বয়সে ১৮৩২ সালে গ্যেটে পরলোকগমন করেন।

বৃদ্ধ বয়সে গ্যেটে তাঁর রচনার স্টাইলের মধ্যে রোমান্টিক উপকরণ ব্যবহার করেন, এবং উনিশ শতকের শেষের দিকে সমাজের ঝোঁক কোন্ দিকে যেতে পারে তা অনুমান ক'রেই অনেক সামাজিক সমস্যা নিয়েও আলোচনা করেন। কবি হিসাবে গ্যেটে তাঁর সর্ববিধ রচনায় পরম উৎকর্ষ লাভ করেন, এবং তাঁর দর্শন-বিষয়ক রচনা আধুনিক ইউরোপীয় সাহিত্যের ও চিন্তাধারার উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছে।

তরুণ ভারথারের বেদনা

"দি সরোজ্ অব ইয়ং ভারথার" (১৭৭৪) উপন্যাসটি তরুণ গ্যেটের রচনা। এই উপন্যাসে গ্যেটের জীবনের নিজেরই অভিজ্ঞতার ছায়াপাত ঘটেছে, এবং জীবন সম্বন্ধে তাঁর কি ধারণা ছিল তাও ধরা পড়েছে। এই উপন্যাসের বেশি অংশই ভারথারের লেখা চিঠির উপর ভিত্তি ক'রে লেখা ; তীব্র ভাবাবেগ ও তদনুসারে আধ্যাত্মিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল ভারথারের, প্রকৃতির ও সৌন্দর্যের প্রতি ছিল তার নিবিড় আকর্ষণ। কিন্তু তার মনের এই ভাবনার সঙ্গে সংঘর্ষ বাধা জীবনের কঠিন বাস্তবতার। সমাজের মধ্যে এবং বিবিধ ব্যক্তির সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত সম্বন্ধের মধ্যে সে দেখতে পেল অনেক বাধা, সে যেন নিগড়ে বাঁধা পড়ে যেতে লাগল, এর ফলে ক্রমশ তার মন ও মেজাজ অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে এল। এক প্রণয়ঘটিত ব্যাপারে সে সফল হতে পারবে না দেখে সে আত্মহত্যা করল। এখানে উক্ত উপন্যাসের শেষাংশ থেকে উদ্ধৃত করা হল। এই অংশ ঐ "চিঠি"গুলি সম্বন্ধে তথাকথিত "সম্পাদকে"র বিবৃতি, এ'তে ভারথারের প্রণয়িনী লোটির সঙ্গে ভারথারের শেষ মিলনের কথা বলা হয়েছে—যে মেয়েটি নাকি ইতিমধ্যে অ্যালবার্ট নামক একটি ছেলেকে বিয়ে করে ফেলেছে। এই উপন্যাসটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বিপুল সাফল্যলাভ করে। এই বইয়ের নায়কের অপরিসীম ভাবাবেগ এবং নতিস্বীকার না করার মতন এক পরম প্রতিভার তুল্য চরিত্র ও সময়ের জীবনধারার লক্ষণেই লক্ষণাক্রান্ত।

যেদিন ভারথার তার বন্ধুকে চিঠি লিখেছিল সেইদিনই সে লোটির কাছে যায় এবং তার দেখাও পায়। দিনটা ছিল ক্রিস্টমাসের আগের রবিবার। ক্রিস্টমাস উপলক্ষে তার ভাই ও বোনেদের জন্যে লোটি যেসব খেলনা তৈরি করেছিল, সেগুলি তখন সে গোছাচ্ছিল। বাচ্চারা কত মজা পাবে ভারথার সে কথা বলল, এবং বলল সেই দিনের কথা যখন অকস্মাৎ খুলে যাবে দরজা, এবং মোমবাতি দিয়ে আপেল দিয়ে ও মিষ্টান্ন দিয়ে সাজানো ক্রিস্টমাস-বৃক্ষটি সকলের মনে স্বর্গের আনন্দ বহন করে নিয়ে আসবে। লোটি তার বিব্রত-ভাবটি চাপা দেবার চেষ্টা করল সামান্য একটু হাসি দিয়ে। "তোমার জন্যেও একটা উপহার থাকবে", লোটি বলল, "তুমি যদি বেশ লক্ষ্মীটি হও। খুব সুন্দর একটা মোম-দানী এবং আরও অনেককিছু।"

"লক্ষ্মীটি হওয়া কাকে বলো তুমি ?" বেশ চেঁচিয়ে বলে উঠল ভারথার, "বলো লোটি, কী করে লক্ষ্মী হতে পারি ?"

"বিষ্যুদবারের বিকেল হচ্ছে ক্রিস্টমাস ইভ্। বাচ্চারা তখন আসছে; বাবাও আসছেন। সকলেই তখন উপহার নেবেন। তখন তুমিও এসো, এই আমার অনুরোধ, কিন্তু তার আগে এসো না।"

ভারথার বিচলিত হয়ে উঠল।

লোটি বলে যেতে লাগল, "এ কথা যদি শোনো, তবেই তোমাকে লক্ষ্মী বলব। আমার মনের শান্তির জন্যেই আমার এ অনুনয়, এভাবে জীবন চলতে পারে না। কখনোই পারে না।"

ভারথার রওনা হল, লোটির কাছ থেকে সে চলে যেতে লাগল, তার চলার গতি দ্রুত করতে লাগল, মনে-মনে উচ্চারণ করতে লাগল ঐ কথা, "এ ভাবে জীবন চলতে পারে না।" তার কথা কোথায় গিয়ে ঘা দিয়েছে লোটি তা বুঝতে পেরেছে, সেজন্যে নানা রকম প্রশ্ন করে সে ভারথারের মন অন্য দিকে টানবার চেষ্টা করতে লাগল, কিন্তু তাতে কোনো কাজ হল না। সে বলল, "না লোটি, তোমার সঙ্গে আর দেখা হবে না।"

"কিন্তু কেন।" লোটি বেশ জোরের সঙ্গেই জিজ্ঞাসা করল, বলল, "ভারথার, তুমি আসতে পার···তোমাকেই আসতেই হবে আবার, একটু শান্ত হবার জন্যেই আসতে হবে। বলো, কেন তুমি অতটা উগ্রতা নিয়ে, এমন অদম্য আবেগ নিয়ে জন্মেছিলে ? যা-কিছু তোমার নাগালে আসবে তার প্রতিই কেন তোমার এমন ব্যাকুল আকর্ষণ ? আমার অনুনয় রাখো," ভারথারের দুই হাত ধরে সে বলতে লাগল, "নিজেকে একটু সংযত করো। তোমার মন, তোমার বিদ্যাবুদ্ধি, তোমার প্রতিভা তোমাকে সব আনন্দই দিতে পারে। পুরুষের মতন হও। তোমাকে যে করুণা করে এমন একটি মেয়ের প্রতি তোমার অনুরাগ তুমি ফিরিয়ে নাও।"

দাঁতে দাঁত রাখল ভারথার, লোটির দিকে নিস্পৃহভাবে সে তাকাল। লোটি তখনও ভারথারের হাত দৃঢ়ভাবে ধরে আছে।

লোটি বলল, "ধীরভাবে ভেবে দেখ ভারথার। একটি মুহূর্ত অন্তত ভাবো। তুমি কি বুঝতে পারছনা যে অকারণে নিজেকে তুমি বঞ্চনা করছ, নিজেকে নষ্ট করে ফেলছ ? আমাকে নিয়ে কেন তোমার এত যন্ত্রণা। এত লোক থাকতে আমাকে নিয়ে কেন ? আমি যে অন্যের। এ কেনর উত্তর

আমি জানি। আমাকে পাওয়া তোমার পক্ষে অসম্ভব, তবু আমাকে পেতেই হবে, তোমার এই প্রবল ইচ্ছাই তোমাকে এমন প্রচণ্ড করে তুলেছে।"

লোটির মুঠি থেকে নিজের হাত ছাড়িয়ে নিল ভারথার, এবং লোটির দিকে নিষ্প্রাণ দৃষ্টিতে ঘৃণার চোখে তাকাল।

"বেশ চালাক হয়েছ। বেশ চালাকী শিখেছ। মনে হচ্ছে এসব কথা অ্যালবার্টের? খুব কৌশল শিখেছ যা হোক, বেশ চতুরতাও শিখেছ।" ভারথার বলল।

"যে-কোনো লোক এমন কথা বলতে পারে।" ভারথারকে বাধা দিয়ে লোটি বলল, "এই বিশাল পৃথিবীতে কি এমন কোনো মেয়ে নেই যে তোমার মনের সব ইচ্ছা পূর্ণ করতে পারে? তাকে খুঁজে বের করার জন্যে নিজেকে তৈরি করো। আমি বিশ্বাস করি তুমি তাকে পাবে। তোমার জন্যে ও আমাদের সবার জন্যেই কতদিন ধ'রে আমি উৎকণ্ঠাবোধ করছি, নিজেকে তুমি যেরকম অক্ষমতা দিয়ে জড়িয়ে ফেলেছ তার জন্যেই এই উৎকণ্ঠা। নিজেকে চালনা করার শক্তি সংগ্রহ করো। যদি কোথাও বেড়াতে যাও তবে তোমার মন অন্যদিকে যেতে পারে, অন্য কথা ভাবতে পারে। নিশ্চয়ই এতে কাজ হবে। তোমার স্নেহমমতা পেতে পারে এমন একটি যোগ্য বস্তু খুঁজে বের করে নাও, তারপর ফিরে এসো। তখন আমরা অকৃত্রিম বন্ধুত্বের আনন্দ উপভোগ করব।"

গোয়েটৎস ফন বারলিশিনজেন

"গোয়েটৎস ফন বারলিশিনজেন" (লৌহ হস্তের গোয়েটৎস) ১৭৭৩ সালে লেখা। গ্যেটের এই নাটকটির মেজাজ অবিকল স্টার্ম উণ্ড ড্রাং-এর মেজাজের মত। ষোড়শ শতাব্দীর জার্মানীর ঐতিহাসিক আন্দোলনের বিশাল পশ্চাৎপটের উপর এই নাটকের নায়ককে স্থাপন করা হয়েছে। রাজনৈতিক আলোড়নে পুরাতন প্রথার বিলোপ হয়ে নতুন প্রথার উদ্ভব ঘটেছে—অনেক ছোট ছোট শাসকগোষ্ঠীর মধ্যে এসেছে পরিবর্তন। এই রকম একটি ক্ষুদ্র রাষ্ট্রতন্ত্রের স্বেচ্ছাচারী ও স্বার্থপর শাসকের অধীনস্থ এলাকায় নাইট্ গোয়েটৎস তার অধিকার ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতা রক্ষার জন্যে চেষ্টা করছে। সে হচ্ছে ব্যক্তিত্ববাদী একজন সৎ লোক, সে সাহসী, সে তেজস্বী, কেবলমাত্র সম্রাটের কাছেই আনুগত্য স্বীকারে সে রাজি। অনেকবার সে প্রতারিত হয়েছে, বঞ্চিত হয়েছে। অবশেষে সে হয়ে উঠল কৃষক-আন্দোলনের নেতা। শেষে

সে বন্দী হল, তার মৃত্যু ঘটল। কিন্তু তার ভাবমূর্তি জেগে রইল, তার সময়কার অনাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রামের নিঃসঙ্গ সৈনিকের সেই ভাবমূর্তি। উদ্ধৃতাংশ হচ্ছে বিচারালয়ের দৃশ্যের একটি অংশ, এখানে গোয়েটৎস-এর মনোভাবের এবং তার বিরুদ্ধবাদীদের চক্রান্তের কথা কিছু জানা যাবে।

কেরানি ॥ আমি, গোয়েটৎস ফন বারলিশিনজেন, এতদ্বারা স্বীকার করছি যে, যেহেতু আমি সম্প্রতি সম্রাটের ও সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে এমনভাবে বিদ্রোহ করেছি যে—

গোয়েটৎস ॥ এ কথা ঠিক নয়, সত্য নয়। আমি বিদ্রোহী নই, আমি মহামান্য সম্রাটের বিরুদ্ধে কোনো অন্যায় করিনি, সম্রাটকে এ ব্যাপারে জড়ানো যায় না।

কাউন্সিলার ॥ চুপ করো, আরো শোনো।

গোয়েটৎস ॥ আমি আর শুনতে চাইনে। যে কোনো ব্যক্তি আসুক, পরখ করে দেখুক আমি সম্রাটের বিরুদ্ধে বা অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে কোনো কাজ করেছি কিনা। আমি কি সর্বদা আমার কাজের দ্বারা দেখাইনি যে, এমনকি এমন অনেকের চেয়ে ভালোভাবে দেখাইনি যে, রাজপ্রতিনিধিদের উপর জার্মানী কতটা নির্ভরশীল, বিশেষ ক'রে যাঁদের গুরুত্ব আরও কম, সেই সামরিক সম্মানে ভূষিত ব্যক্তিদের ও সাধারণ মানুষের উপর সম্রাট কতটা নির্ভরশীল। আমাকে যদি ঐ ঘোষণায় স্বাক্ষর করতে চাপ দেওয়া হয় এবং সেই চাপে আমি নতি স্বীকার করি তাহলে আমার মত জঘন্য লোক আর কে আছে!

কাউন্সিলার ॥ তা হোক, কিন্তু আমাদের উপর পরিষ্কার হুকুম আছে যে, তুমি যদি ভালো কথায় রাজি না হও, তাহলে দরকার মতন ঐ কেল্লার মধ্যে আমরা তোমাকে ছুঁড়ে ফেলব।

গোয়েটৎস ॥ ঐ কেল্লায়! আমাকে?

কাউন্সিলার ॥ এবং ঐ জায়গায় থেকে তুমি তোমার ভাগ্যের বিচার প্রত্যাশা করতে পার। দয়াবতারের কাছ থেকে যদি বিচার না চাও তাহলে তোমার ঐ দশা হবে।

গোয়েটৎস ॥ ঐ কেল্লায়! তোমরা রাজসিক ক্ষমতার অপব্যবহার করছ। ঐ কেল্লায়! এটা তাঁর আদেশ নয়। ব্যাপার কি! তোমরা

বিশ্বাসঘাতক। প্রথমে আমার সামনে একটা ফাঁদ পাতা হচ্ছে, তাতে লাগানো হচ্ছে ঐ শপথবাক্য, আমাকে সম্মানজনক ভাবে বন্দী করার কথা বলা হচ্ছে, আর, তার পরেই ভেঙে ফেলা হচ্ছে সেই প্রতিজ্ঞা!

কাউন্সিলার ॥ অপরাধীর কাছে আমাদের কোনো আনুগত্য নেই।

গোয়েটৎস ॥ যে সম্রাটকে আমি সম্মান করি, তুমি তাঁরই প্রতিভূ হয়ে এসেছ, তাঁরই কলঙ্কিত প্রতিরূপ হওয়া সত্বেও আমার সম্মান অটুট আছে। তুমি "অপরাধী" কথাটা তুলে নাও, প্রত্যাহার করো। আমি এক সম্মানজনক বিরোধে লিপ্ত আছি। যে কাজের জন্যে আমি এখানে বন্দীরূপে আটক আছি, তোমার জীবনে তুমি যদি এমন কাজ করতে পারতে তাহলে পৃথিবীর চোখে তুমি এক বিরাট পুরুষরূপে গণ্য হতে পারতে, এবং ঈশ্বরের কাছে এজন্যে কৃতজ্ঞতা জানাতে।

কাউন্সিলার ॥ (সেনেটরকে কি যেন ইঙ্গিত করলেন, সেনেটর ঘণ্টা বাজালেন)।

গোয়েটৎস ॥ ঘৃণাজনক কোনো লাভের জন্যে বা নিরস্ত্র ও অসহায় জমিদারদের কাছ থেকে তাদের প্রজা ও ভূমি অপহরণ করার জন্যে আমি কোনো কাজে হাত দিইনি। আমি যা করেছি তা আমার সন্তানকে মুক্ত করার জন্যে করেছি, আত্মরক্ষার জন্যে করেছি। এতে কোনো অন্যায় তোমরা দেখতে পাচ্ছ? সম্রাট এমন তাঁর সাম্রাজ্যে আরামে বাস ক'রে আমাদের অভাব বুঝতে পারেননি। ভগবানকে ধন্যবাদ, একটা হাত এখনো আমার আছে, সে হাত ব্যবহার করে আমি ভালোই করেছি।

নগরবাসীবৃন্দ ॥ (হাতে লাঠি নিয়ে এবং অস্ত্রাদি-সজ্জিত হয়ে প্রবেশ)

গোয়েটৎস ॥ ব্যাপার কি!

কাউন্সিলার ॥ তুমি কথা শুনছনা। এ'কে নিয়ে যাও।

গোয়েটৎস ॥ এর অর্থ বুঝি এই? স্পেনদেশীয় ষাঁড় যে নও সে আমার দিকে এগিয়ো না। যে আমার কাছে আসবে সে উপযুক্ত দাওয়াই পাবে। আসবার এই ডান হাত দিয়ে তার কানের উপর এমন প্রচণ্ড ঘুষি দেব যে সে তার মাথা-ধরা দাঁত-ব্যথা ইত্যাদি যাবতীয় ব্যথার হাত থেকে একেবারে নিরাময় হয়ে যাবে। (ওরা তার কাছে আসতে লাগল, একজনকে গোয়েটৎস ঘুষি মেরে ফেলে দিল, আর-একজনের কাছ থেকে

অস্ত্রশস্ত্র কেড়ে নিল, তারা সরে গেল) এগিয়ে এসো, এগিয়ে এসো, তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে সাহসী কে তা আমার জানার বড় ইচ্ছে।

কাউন্সিলার ॥ নতি স্বীকার করো।

গোয়েটৎস ॥ এই দেখ হাতে এই তরবারী। জেনে রাখো, আমি এদের পিটাতে-পিটাতে পথ করে নেব, আব আমাকে মুক্ত করে নেব। কিন্তু কিভাবে শপথ রাখতে হয় তা তোমাদের শেখাব। তোমরা আমাকে সম্মানজনক কারাবাসের শপথ করেছিলে, তোমরা কথা রাখলে আমি তরবারী ফেলে দেব, এবং আগের মতই তোমাদের কাছে বন্দী হব।

কাউন্সিলার ॥ হাতে তলোয়ার নিয়ে তুমি সম্রাট-এর সঙ্গে মামলা করতে চাও ?

গোয়েটৎস ॥ সম্রাটের সঙ্গে নয়, ঈশ্বর করুন, তা যেন না করি। তোমাদের সঙ্গে এবং তোমাদের মাননীয় সঙ্গীসাথিদের সঙ্গে। আপনারা সজ্জন, আপনারা চলে যান। আপনারা যে সময় এখানে খরচ করছেন তার জন্যে কিছুই পাবেন না, এখানে যা পাবেন তা বোধ হয় কিছু আঘাত মাত্র।

কাউন্সিলার ॥ ওকে পাকড়াও। সম্রাটের প্রতি তোমার ভক্তি তোমাকে সাহস জোগাতে পারেনি ?

গোয়েটৎস ॥ তাদের সাহস দেখাতে গিয়ে তারা আহত বলে সেই ক্ষতস্থান বাঁধবার জন্যে ব্যাণ্ডেজ দেওয়া ছাড়া সম্রাট আর-কিছু দেন না।

এগমণ্ট

গ্যেটে তাঁর "এগমণ্ট" নাটকটি লিখতে আরম্ভ করেন ১৭৭৫ সালে এবং এটি লেখা শেষ করেন ১৭৮৭ সালে। এ'তে তাঁর যৌবনকালের সৃষ্টিধর্মী অনেক উপাদান আছে। ষোড়শ শতকে স্পেনের দখলদার সেনাবাহিনীর কবল থেকে মুক্ত হবার জন্যে নেদারল্যাণ্ড যে-যুদ্ধে লিপ্ত হয় এই নাটকের ঘটনা সেই সময়কে কেন্দ্র করেই। কিন্তু ঐতিহাসিক ঐ ঘটনা এ নাটকের প্রধান উপজীব্য নয়, এগমণ্টের ব্যক্তিত্বই এর উপজীব্য। এই মহাপ্রাণ মানুষটি স্বাধীনতা-আন্দোলনের নেতা ছিলেন এবং জনতার কাছে ছিলেন এক আদর্শ-পুরুষ। ভাগ্যের উপর এর বিশ্বাস ছিল অসীম, নিজের আন্তরিকতার দ্বারা ও নিজের বাউণ্ডুলে চরিত্রের দ্বারাই ইনি চালিত হতেন, এবং তার ফলে পৃথিবীর বাস্তবতার দিকে তিনি ভ্রূক্ষেপ করতেন না। তাঁর বন্ধু অরেঞ্জ তাঁকে

অনেকবার সতর্ক করে দিয়েছেন, কিন্তু তাতে তিনি কান দেননি। অরেঞ্জ ছিলেন শান্তপ্রকৃতির মানুষ, তিনি ধীর-স্থির হয়ে বুদ্ধিবিবেচনা করে কাজ করতেন। স্পেনদেশীয়রা যে ফাঁদ পেতেছিল তাতে ধরা পড়লেন এগমণ্ট। এখানে উদ্‌ধৃত অংশটি হচ্ছে স্পেনদেশীয় কমাণ্ডার ডিউক অব্ আলবা'র সঙ্গে এগমণ্টের কথোপকথন। তাঁদের উভয়ের অভিমতের সংঘর্ষ এখানে দেখা যাবে। এই দৃশ্যের পরেই এগমণ্ট বন্দী হন, কারারুদ্ধ হন, তারপর প্রকাশ্যে তাঁর প্রাণদণ্ড হয়।

অঙ্ক ৪, দৃশ্য ২

এগমণ্ট॥ এই যে স্বেচ্ছাচারী পরিবর্তন, সবচেয়ে বেশি ক্ষমতাসম্পন্ন যিনি তাঁর এই অপ্রতিরোধ্য হস্তক্ষেপ—এসব কি প্রমাণ করে না যে, হাজার হাজার মানুষ যে কাজ করায় রাজি না, একজনের ইচ্ছায় তা করতে হবে? তিনি কেবল নিজের স্বাধীনতাই চান, যাতে তিনি তাঁর প্রত্যেকটি ইচ্ছে প্রত্যেকটি চিন্তা স্বাধীন ভাবে প্রয়োগ করতে পারেন। ধরে নেওয়া যাক, তিনি একজন বিজ্ঞ ও সৎ রাজা বলে আমরা তাঁর উপর আস্থা রাখলাম, কিন্তু তাঁর উত্তরাধিকারীদের সম্বন্ধে আমাদের কাছে কি তিনি জবাবদিহি দেবেন? তিনি কি এ কথা জোর দিয়ে বলতে পারেন যে, সেইসব উত্তরাধিকারীদের কেউ অত্যাচারী হবে না, নিষ্ঠুরভাবে শাসন করবে না? তাহলে ভয়ংকর স্বেচ্ছাচারী খামখেয়ালিপণার হাত থেকে কে আমাদের রক্ষা করবে? তিনি যদি তাঁর এমন কোনো কর্মচারীদের বা এমন-কোনো প্রিয়পাত্রদের পাঠালেন দেশের ও দশের অভাব-অভিযোগ সম্বন্ধে যাঁদের কোনো ধারণা নেই, যেমন খুশি সেইভাবে শাসন করতে লাগলেন, কোনো বাধা মানলেন না, কারণ তাঁরা জানেন যে, কারও কাছেই তাঁদের কোনো দায়িত্ব নেই?

আলবা॥ (এতক্ষণ চারদিকে তাকাচ্ছিল) রাজা নিজেই শাসন করবেন, এর চেয়ে সহজ ব্যাপার আর হতে পারে না, আর, যারা তাঁকে ভালো বোঝে বা বুঝতে চেষ্টা করে, যারা তাঁর আদেশ অক্ষরে-অক্ষরে পালন করে, তাদেরকেই রাজা বেছে নেবেন তাঁর আদেশ অনুযায়ী কাজ করার জন্যে।

এগমণ্ট॥ এবং এটাও অনুরূপই একটা সহজ ব্যাপার যে, দেশের লোকও

চাইবে তার দ্বারাই শাসিত হতে যে নাকি রাজার ঘরে জন্মেছে, এবং সেখানেই মানুষ হয়েছে ; ন্যায় ও অন্যায় সম্বন্ধে যার ধারণাও সেই সঙ্গে বদ্ধমূল হয়েছে, এবং যাকে ভ্রাতা রূপে তিনি গণ্য করেন।

আলবা॥ নিজের ভ্রাতাদের মধ্যেই আভিজাত্যের অনেক ইতরবিশেষ ঘটে গিয়েছে।

এগমণ্ট॥ শতসহস্র বছর আগে ওসব ঘটেছে। এখন তা সহজেই সকলে গ্রহণ করেছে। কিন্তু, যাদের দিয়ে কোনো দরকার নেই তাদের যদি পাঠানো হয়; এবং একটা জাতির স্বার্থ হানি ক'রে তারা যদি নিজেদের বরণীয় করে তোলার চেষ্টা করে, নিজেদের সম্পদশালী করতে চায়, দেশবাসী যদি দেখে যে বিনা বাধায় নিঃসংকোচে তাদের শোষণ করা হচ্ছে, তাহলে এর ফলে অবশেষে যে সংঘর্ষ ও অশান্তি বেধে উঠবে তা সহজে দমন করা যাবে না।

আলবা॥ তুমি যা বলছ আমার তা শোনা উচিত না। আমিও এদেশে একজন বিদেশী।

এগমণ্ট॥ এ কথা তোমার সামনে বলছি এতেই প্রমাণ হচ্ছে যে, এ কথা তোমাকে বলছিনে।

আলবা॥ তা হলেও, এ কথা তোমার কাছ থেকে আমার না-শোনাই ভালো। রাজা আমাকে এখানে পাঠিয়েছেন এই আশা নিয়ে যে, আমি অভিজাতদের কাছ থেকে সমর্থন পাব। রাজার যা ইচ্ছে তা রাজারই ইচ্ছে। অনেক গভীর আলোচনার পর রাজা বুঝতে পেরেছেন দেশবাসীর কল্যাণ কিসে ; এতদিন যে ভাবে চলে এসেছে সেভাবে বরাবর চলতে পারে না। রাজার এখন অভিপ্রায় এই যে, জনগণের কল্যাণের জন্যেই জনগণের উপর কিছু বাধানিষেধ আরোপ করা। দরকার হলে, জোর ক'রেই তাদের কল্যাণ তাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া। যারা ক্ষতিকারক তাদের বিনাশ ক'রেই অবশিষ্ট মানুষকে শান্তিতে বাস করার ব্যবস্থা করা, যাতে তারা এক বিজ্ঞ গবর্নমেণ্টের অধীনে সুখে বাস করতে পারে। এই তাঁর সিদ্ধান্ত। তাঁর এই সিদ্ধান্তের কথাই অভিজাত-মহলে ঘোষণা করার আদেশ তিনি আমাকে দিয়েছেন। তাঁর হয়ে যে পরামর্শ আমি চাই তা হচ্ছে এই যে, রাজ-অভিপ্রায় কিভাবে কার্যকর করা যেতে পারে, তিনি ইচ্ছে করেছেন বলেই তা কার্যকর করতে আমি আদিষ্ট হইনি।

এগমণ্ট ॥ হায়, তোমার কথাই জনসাধারণের মনের ভীতি প্রমাণ করছে, এই ভীতি সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। তিনি যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, কোনো রাজার তেমন সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত না। তাঁর দেশবাসীর শক্তি, তাদের মনোবল, নিজেদের সম্বন্ধে তাদের নিজেদের বোধ—এতে সবই পদদলিত হবে। সবই ছারখার হয়ে যাবে, এবং তিনি সহজেই এদের উপর আধিপত্য করতে পারবেন। তিনি জনগণের আত্মবোধ কলুষিত করে দিতে চান, কেননা তিনি তাদের সুখী করতে চান। তিনি তাদের একেবারে লোপ করে দিতে চান যাতে তারা অন্য-কিছু হয়ে দাঁড়ায়, এমন-কিছু তাদের করে দিতে চান তা তাদের বর্তমানের চেহারা থেকে একেবারে আলাদা রকম। তাঁর অভিপ্রায় যদি সত্যি মঙ্গলজনক তাহলে বলতে হয় যে, তিনি ভ্রান্ত! রাজকীয় ক্ষমতাকে কখনো বাধা দেওয়া হয় না, দেওয়া হয় সেই রাজাকে যিনি ভুল পথ ধরে চলার জন্য প্রথম একটা অস্বাভাবিক পদক্ষেপ করছেন।

আলবা ॥ এসব তোমার মত। এসবের সঙ্গে আমাদের একমত হবার চেষ্টা বৃথা। তুমি রাজার সম্বন্ধে গভীর চিন্তা কর না, আর যদি মনে ক'রে থাক যে, তুমি যা-যা বললে সে সব বিষয় ভাবা হয়নি, বিবেচনা করা হয়নি, বিচার করা হয়নি, তাহলে রাজার পরামর্শ দাতাদের উপর তোমার কিছুটা ঘৃণাই প্রকাশ পাচ্ছে। এসব তর্কের ভালোমন্দ বিবেচনার ভার আমাকে দেওয়া হয়নি। জনগণের কাছে আমার যা দাবি তা হচ্ছে বিশ্বস্ততা, বাধ্যতা। আর, তোমাকে যারা তাদের আদর্শ-পুরুষ বলে মনে করে, সেই তোমার কাছে, এবং জমিদারবর্গের কাছে আমি পরামর্শ চাই ও কাজ চাই। আমার এই দাবি যে, এই কর্তব্য-কাজ বিনাশর্তে করার দায়িত্ব তুমি নেবে।

এগমণ্ট ॥ আমাদের মাথা দাবি করছ, এখনি তা নাও। এরকম জোয়ালের কাছে আমরা সকলে আমাদের কাঁধ পেতে দেব কি না, এরকম দাবির কাছে আমরা নতি স্বীকার করব কিনা—মহাপ্রাণ ব্যক্তির কাছে সবই এক। এত সময় নিয়ে এতক্ষণ আমি এতকথা অযথাই বললাম। আমি কেবল মাত্র হাওয়াকেই আলোড়িত করেছি, এর বেশি কিছু করতে পারিনি।

ভিলহেল্‌ম্ মেইস্টার

"ভিলহেল্‌ম্ মেইস্টার" (১৭৯৫-১৭৯৬) উপন্যাসটিতে গ্যেটে দেখিয়েছেন মানুষের চরিত্র কিভাবে গঠিত হতে পারে, এ'তে গ্যেটের নিজের জীবনের ধ্রুপদী দৃষ্টিভঙ্গিরওপ্রতিফলন আছে। লেখকের নিজের কালেরই কাহিনী এটি। এক বণিকের পুত্র তরুণ ভিলহেল্‌ম্ মেইস্ট'র পরিভ্রমণে বের হয়ে অনেক সংঘাতের মধ্যে পড়ে বিবিধ অভিজ্ঞতা অর্জন করে, এবং তার দ্বারা পার্থিব ব্যাপারের বহু জ্ঞান ও শিক্ষা লাভ করে। তার নিজের স্বভাব এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রভাব একত্র হয়ে তার জীবনে কল্যাণকর পরিণামই ঘটে। একদিকে অহম্ ভাব এবং অন্য দিকে পার্থিব ঘটনা—এই দুইয়ের সংমিশ্রণে, এবং ব্যক্তি ও সম্প্রদায়—এই দুইয়ের মিলন যে সংঘর্ষ ঘটিয়ে তোলে, "ভারথার"এ বর্ণিত সংঘর্ষের তা বিপরীত। প্রথম অবস্থায় ভিলহেল্‌ম্ মেইস্টার মধ্যবিত্ত-সমাজের সংকীর্ণতার হাত থেকে রেহাই পাবার জন্যে তার পৈতৃক বাসভবন থেকে পালাবার জন্যে ব্যাকুল হয়, মনে করে সে নিজের ইচ্ছে-মতন নিজেকে গড়ে তুলতে পারবে এবং এই ইচ্ছা পূরণের জন্যেই তার এই ব্যাকুলতা। কিন্তু জীবনের অভিজ্ঞতা দ্বারা এবং পরিণতবুদ্ধি বন্ধুদের অপ্রত্যক্ষ শিক্ষাদানে ও পরিচালনায় সে বুঝতে পারে যে সমাজে স্বকীয় একটি স্থান করে নেওয়ার মধ্যেই জীবনের লক্ষ্য লাভ ও উদ্দেশ্য সিদ্ধি, এবং স্বজনদের প্রতি কর্তব্য সম্পাদনের দায়িত্বগ্রহণের মধ্য দিয়েই নিজেকে উন্নত ক'রে তোলা সম্ভব। পরবর্তী উপন্যাস "ভিলহেল্‌ম্ মেইস্টার'স ওয়াণ্ডারিংস" (ভিলহেলম্ মেইস্টারের পরিভ্রমণ) এই কথাই আরও বিশদভাবে বিবৃত হয়েছে, এখানে ভিলহেল্‌ম্ হয়েছে ডাক্তার।

এখানে যে অংশ উদ্ধৃত হচ্ছে সেখানে মধ্যবিত্ত পরিবেশে ভিলহেল্‌মের ও তার বন্ধু ভারনারের পিতাকে দেখা যাচ্ছে। গ্যেটে মধ্যবিত্ত-সমাজের যে চিত্র এখানে এঁকেছেন, সেখানে ঐ সমাজের এক অংশ বেশ পরিচ্ছন্ন ও নিয়মানুগ জীবন কাটাচ্ছে, কেউ-কেউ মর্যাদাসম্পন্ন ও স্বচ্ছন্দ জীবন অতিবাহিত করছে নীরবে ও নিভৃতে, অন্যেরা জীবন কাটাচ্ছে সকলের সঙ্গে বেশ মিলেমিশে ও পার্থিব সুখসুবিধা ভোগ ক'রে। ভিলহেল্‌মের কল্পনাপ্রিয় মনের উপর এইরকম জীবন প্রথমে একঘেয়ে ও কৃত্রিম মনে হয়েছে, এই কারণেই সে নিশ্চয় তার জীবনের অন্যবিধ পরিকল্পনার কথা ভাবতে থাকে। কিন্তু

শেষের দিকে জীবনের "শিক্ষানবিশী"র শেষে সে বিয়ে করে এবং মধ্যবিত্ত সমাজের আর পাঁচজনের সঙ্গে এই জীবনের মর্যাদার পথটি বেছে নেয়।

প্রথম অধ্যায় থেকে উদ্ধৃত

ভিলহেলমের বাবা ও ভারনারের বাবা সম্বন্ধে এখন আমাদের কিছু জেনে নেবার সময় হয়েছে। এঁদের চিন্তাধারা একেবারে বিপরীত, কিন্তু একটা বিষয়ে তাঁরা একমত। বাণিজ্যই যে সবচেয়ে মহৎ কাজ এটা তাঁরা দুজনেই মেনে নিয়েছেন, যে-কোনো রকম ঝুঁকি নিয়ে ব্যবসা করা যে সবচেয়ে বেশি সুবিধাজনক কাজ এ বিষয়ে উভয়ের চিন্তা বেশি জোরালো। বৃদ্ধ মেইস্টারের পিতার মৃত্যুর পর তিনি তাঁর পিতার সব চিত্রাবলী ড্রয়িং কপারপ্লেট ও প্রাচীন-কালের দুষ্প্রাপ্য দ্রব্যাদির মূল্যবান সংগ্রহ বেচে দিয়ে সব কাঁচা টাকা করে রাখেন; তিনি সমস্ত বাড়িটা ভেঙে তা হালফ্যাশানে নতুন করে গড়ে তোলেন; এবং পুরনো সম্পত্তি থেকে যতটা লাভ করার তা করেন। এই টাকার এক বড় অংশ তিনি বৃদ্ধ ভারনারের পরামর্শ-অনুসারে ব্যবসায়ে লাগান। বৃদ্ধ ভারনারের নাম ছিল একজন পাকা বণিক হিসেবে, ব্যবসায়ে তিনি যা ঝুঁকি নিয়েছেন তাঁর ভাগ্য-বশত সবেতেই বেশ লাভ হয়েছে। যে সব গুণ থেকে বৃদ্ধ মেইস্টার একেবারেই বঞ্চিত ছিলেন সেইসব গুণ ও যোগ্যতা যাতে তাঁর পুত্র পেতে পারে, এর চেয়ে বড় আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধ মেইস্টারের ছিল না; যে সব সুযোগ সুবিধাকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলে তিনি মনে করেন তাঁর সন্তানরা সে সব পাক্—এও তাঁর ইচ্ছা। এই সঙ্গে আর একটি কথাও উল্লেখযোগ্য—খুব জাঁকজমকের দিকে তাঁর খুব ঝোঁক ছিল; যা-কিছু তাঁর চোখে তা যদি টেঁকসই হয় এবং তদনুযায়ী তার দাম হয় তাহলে সেটি তাঁর চাইই। তাঁর বাড়ির সব জিনিসই বেশ ভারি ও বেশ বড়সড়; তাঁর ভাঁড়ার বেশ দামী জিনিসে ও প্রচুর জিনিসে পূর্ণ হওয়া চাই; তাঁর সব থালা-বাসন ভারী-সারী হওয়া চাই, তাঁর আসবাবপত্র ও টেবিল দামী হওয়া চাই। কিন্তু অতিথিদের বিশেষ আমন্ত্রণ করা হত না। তাঁর আহারের ব্যবস্থাই ছিল একটা এলাহি ব্যাপার—ভোজসভার মত; খরচের দিক বা ব্যবস্থাদি করার দিক বিবেচনা করলে এ ব্যাপার রোজ-রোজ করা সম্ভব না। তাঁর বাড়ির মিতব্যয়িতা বেশ নিয়মমত একই ভাবে চলতে লাগল। এখানে কখনো কোনো অনুষ্ঠান যদি-বা হত তাতে কেউ বিশেষ কিছু আনন্দ পেত না।

বৃদ্ধ ভারনার তাঁর পুরাতন ও অন্ধকার গৃহে অন্যরকম জীবন যাপন করতেন। তাঁর প্রাচীন ডেস্কের সামনে বসে দিনের লেন-দেনের হিসেব সেরে তিনি বেশ ভালো খানা খেতেন, এবং সম্ভব হলে বেশ ভালো মদ্যও পান করতেন। তিনি একা-একা ভালো জিনিস খানা-পিনা করতে পারতেন না। তাঁর খাবার টেবিলে পরিবারের সকলের সঙ্গে কিছু বন্ধুও তাঁর চাই। তাঁর পরিবারের সঙ্গে সামান্য যোগ আছে এমন লোক হলেও খাবার টেবিলে তাঁকে ডাকা চাই। তাঁর ঘরের চেয়ারগুলো খুব প্রাচীন ধরনের, সেগুলি কবেকার সে কথা বলা যাবে না। কিন্তু এইসব চেয়ারে বসার জন্যে রোজ কাউকে-না-কাউকে তিনি নিমন্ত্রণ করবেনই। সুস্বাদু খাদ্য ও পানীয় তাঁর অতিথিদের বেশ আনন্দ দিত, কেউ কখনো বলতে পারত না যে, সাধারণ কোনো বাসনপত্রে তাদের খানা দেওয়া হয়েছে। তাঁর ভূগর্ভস্থ মদ্যভাণ্ডারে প্রচুর মদ মজুত থাকত না; কিন্তু যখন যে কুলুঙ্গিটি খালি হত তখনই সেটা আরও উচ্চশ্রেণীর মদ দিয়ে ভরে রাখা হত।

এইভাবে বাস করতেন দুই পিতা। উভয়েরই স্বার্থ আছে এমন ব্যাপারে পরামর্শের জন্যে তাঁরা মাঝে মাঝে মিলিত হতেন। এমনি একটা দিনের কথা বলছি যখন কোনো বাণিজ্য সংক্রান্ত কাজে ভিলহেল্‌ম্‌কে বিদেশে পাঠানোর কথা হচ্ছে।

মেইস্টার বললেন, "সে পৃথিবী দেখুক, সেই সঙ্গে নিজেকেও চিনুক। সেই সঙ্গে দূরদেশে আমাদের ব্যবসাও ছড়িয়ে দিক্। তাদের জীবনের ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার জন্যে তাদের অল্পবয়সেই তাদের উদ্‌বুদ্ধ করার চেয়ে কল্যাণ কাজ আর কিছু নেই। তোমার ছেলে তার প্রথম অভিযান থেকে কেমন খুশি হয়ে ফিরে এল, কেমন বুদ্ধিমানের মত সব লেন-দেন করে এল; এইসব দেখেই আমার ছেলেটি কী করে তা দেখার জন্যে আমার বেশ কৌতূহল জেগেছে। তোমার ছেলে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে আমার মনে হয়, তা যথেষ্ট মূল্য পায়নি।"

তাঁর ছেলের যোগ্যতা ও ক্ষমতা সম্বন্ধে বেশ উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন বৃদ্ধ মেইস্টার। এ কথা তিনি প্রকাশই করলেন এই কথা মনে করে যে তাঁর বন্ধু এর প্রতিবাদ করবেন; এবং তাঁর পুত্রটি তার সওদাগরীতে কি-কি অমূল্য উপহার নিয়ে এসেছে তা দেখাবেন ভেবে। কিন্তু তিনি দেখলেন যে তিনি বোকা বনেছেন। বৃদ্ধ ভারনার কাজের মানুষ, বিশ্বস্ত

বলে নিজেকে প্রমাণিত করেছেন এমন লোক ছাড়া কাউকে তিনি বিশ্বাস করবেন না। তিনি মৃদুস্বরে বললেন, "সকলের উচিত সব বুঝে নেওয়া, পরখ করে দেখা। একই দিকে আমরা ওকে পাঠাতে পারি—একই অভিযানে, নিজেকে পরিচালনা করার জন্যে একটি কাগজে নির্দেশ পত্রও লিখে দিতে পারি। যেখানে যা পাওনা আছে তা আদায়-উশুল করা আছে, পুরনো লোকেদের সঙ্গে যোগাযোগ করা আছে, নূতন খরিদ্দার জোগাড় করা আছে। নতুন যে কারবারের কথা কিছুদিন আগে আমি বলছিলাম সে সেগুলি করে দেখতে পারে। উপস্থিত বুদ্ধিটা কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করাটাই আসল কাজ, এটা না হলে কিছুই হবে না।"

অদ্ভুত তরুণ প্রতিবেশী

গ্যেটের "দি স্ট্রেঞ্জ ইয়ং নেবার্স্" তাঁর "ভালভারভান্ড্‌স্টফটেন" (বাছাই-করা জ্ঞাতি, ১৮০৯) উপন্যাসটির একটি অংশ, এবং সে কথা মনে রেখে এর রস গ্রহণ করতে হবে। উপন্যাসটিতে সমাজের নিয়ম ও বিবাহের সঙ্গে ভালোবাসার বিরোধ দেখানো হয়েছে; ভাবাবেগ ও ন্যায়নীতিকে অসংগত দুঃখের পরিণতি বলা হয়েছে। তাঁর এই পরিণত বয়সেও গ্যেটে এই দুয়ের আপসরফায় যেন রাজি নন্; কেবল এর বিকল্প পরিণতির কথাই বলেছেন, যা হচ্ছে আত্মত্যাগ অথবা ধ্বংস। উপন্যাসেও যা বলা হয়েছে, এই গল্পটির প্রতিপাদ্য বিষয়ও তাই, কিন্তু একটু বিপরীত ভাবে তা বলা। এখানে দেখানে হয়েছে, ভালোবাসা যে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে তা ক্ষণস্থায়ী এবং স্পষ্টই বটে; এবং শেষে কোনোরূপ দোষত্রুটি না করেই বিবাহের মধ্যে ও সমাজের মধ্যে এ বেশ হাসিখুশি ভাবেই মিশে যায়। উপন্যাসটির বিশুদ্ধ সামাজিক আদবকায়দার কাছে গল্পটির শান্ত ও মিশুক ভাব এবং প্রকৃতির সঙ্গে এর চরিত্রগুলির নিবিড় সম্পর্ক রূপকথার মতন মনে হবে, এবং মনে হবে উপন্যাসটির মেজাজ থেকে এ যেন একটু আলাদা। এ'তে সুখের পরিণতির সম্ভাবনা একটু যেন কম বলেই দেখানো হয়েছে, এবং আসল উপন্যাসটিতেও তাই হয়েছে—সেখানে অবশ্য পরিণতি দেখানো হয়েছে দুঃখময়। যাই হোক, গল্পটি দেখিয়েছে যে, সমস্যার সুখময় সমাধান সম্ভব।

পাশাপাশি দুই সম্ভ্রান্ত পরিবারের দুটি ছেলে-মেয়ে। তাদের বয়স এমন যে, ভবিষ্যতে তারা স্বামী-স্ত্রী হতে পারে। এই সম্ভাবনার কথা জেনেই

তাদের লালন-পালন ক'রে বড় ক'রে তোলা হতে লাগল। দুজনেরই বাবা-মা তাদের দুজনের বিয়ের জন্যে বেশ আনন্দের সঙ্গেই দিন গুনতে লাগলেন। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই তারা যা লক্ষ্য করলেন তাতে তাঁদের মনে হল যে তাঁদের মনের ইচ্ছা বুঝি পূর্ণ হবার নয়। কেননা, এই দুটি সুন্দর প্রাণীর পরস্পরের মধ্যে বেশ যেন ঘৃণার ভাব দেখা দিতে আরম্ভ করেছে। সম্ভবত দুজনের মনোভাবই ছিল একই রকম। তারা কি চায় সে সম্বন্ধে তাদের ধারণা ছিল বেশ পরিষ্কার, তাদের অভিপ্রায় সম্বন্ধে তারা ছিল দৃঢ়, দুজনকেই তাদের সঙ্গীরা ভালোবাসত; কিন্তু তারা দুজন একত্র হলেই তারা যেন হয়ে উঠত প্রতিদ্বন্দ্বী, আলাদা-আলাদা ভাবে তারা ছিল বেশ গঠনপন্থী, কিন্তু একত্র হলেই তারা বিপরীতপন্থী হয়ে উঠত; বন্ধুসুলভ মনোভাব নিয়ে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হত না তারা, কিন্তু সব সময়ই একটা উদ্দেশ নিয়ে পরস্পরের সঙ্গে সংঘর্ষ বাধাত। এরা দুজনেই কিন্তু বেশ স্নেহপ্রবণ ছিল, ব্যবহারও ছিল ভালো। কিন্তু পরস্পরের প্রতি এদের ছিল ঘৃণা ও বিদ্বেষ।

তাদের এই অদ্ভুত সম্পর্কটা তাদের ছেলেবেলার খেলাধুলার মধ্যেও লক্ষ্য করা যেত, এবং তাদের বয়স বাড়ার সঙ্গেও এই রকম সম্পর্কই রয়ে গেল। ছেলেরা যেমন যুদ্ধ-যুদ্ধ খেলা খেলে, দুই দলে ভাগ হয়ে গিয়ে নিজেদের মধ্যে লড়াই করতে থাকে, এই একগুঁয়ে ও সাহসী মেয়েটি অবিকল সেইভাবে একদিন একটি দলের পুরোভাগে এসে দাঁড়াল, এবং এমন ভীষণভাবে প্রতিপক্ষ দলের সঙ্গে লড়াই করল যে, প্রতিপক্ষের একজন যদি তাকে বলিষ্ঠ হাতে না রুখত; এবং তাকে নিরস্ত করে তাকে বন্দী না করত তা হলে প্রতিপক্ষের দলকে-দল একেবারে লাজলজ্জা ত্যাগ করে ছুটে পালাত। কিন্তু তবুও মেয়েটি এমন ক্ষিপ্ত ভাবে বাধা দিতে লাগল যে ছেলেটি বাধ্য হয়ে তার সিল্‌কের রুমালটি গলা থেকে খুলে মেয়েটির হাত বাঁধল, মেয়েটি যাতে তার চোখে আঘাত করতে না পারে, এবং মেয়েটিরও যাতে কোনো আঘাত না লাগে, সেইজন্যেই তাকে এমন করতে হল।

ছেলেটিকে ক্ষমা করতে পারল না মেয়েটি। ক্ষমা তো করলই না, উপরন্তু তলে-তলে সে এমন-সব ব্যবস্থা করতে লাগল যাতে ছেলেটির বেশ ক্ষতি হয়। ওদের বাবা-মায়েরা অনেকদিন থেকেই ওদের দুজনের এই অদ্ভুত সম্পর্ক লক্ষ্য করে আসছেন, এবার তারা এসব ব্যাপার দেখে নিজেদের মধ্যেই একটা রফায় এলেন। এই দুই শত্রুভাবাপন্ন ছেলে-মেয়েকে আলাদা

ভাবে রাখার ব্যবস্থা করলেন, এদের দুজনের মধ্যের সেই মধুর মিলনের আশা তাঁরা ত্যাগ করলেন।

ছেলেটি নতুন পরিবেশে পড়ে নিজেকে বেশ উন্নত ও বিশিষ্ট করে তুলল। যেসব উপদেশ ও নির্দেশ সে পেতে লাগল তার বেশ সুফল ফলতে লাগল। তার নিজের ঝোঁক ও তার শুভকাঙ্ক্ষীদের ইচ্ছা একত্র হল, সে যোগ দিল সেনাবাহিনীতে। যেখানেই সে গেল সেখানেই ভালোবাসা পেতে লাগল, জনপ্রিয় হতে লাগল, সম্মান পেতে লাগল। তার মনের বলিষ্ঠতা অন্যদের উপর বেশ ভালো প্রভাব ফেলল, সে নিজেও এজন্যে বেশ তৃপ্তি বোধ করতে লাগল। একবারও কিন্তু সে ভাবল না যে, স্বাভাবিক ভাবেই তার জন্যে যে বিরোধীটি তৈরি হয়ে গিয়েছিল, এবার সেটি সে হারিয়েছে।

ওদিকে মেয়েটি হঠাৎই একটা ভিন্ন অবস্থার মধ্যে গিয়ে পড়ল। তার বয়সের সঙ্গে তার রুচিও মার্জিত হয়ে উঠতে লাগল, এবং তারও উপর তার মনের নিভৃতে একপ্রকার আবেগও বেড়ে উঠতে লাগল, যার ফলে তার সেই ছেলেদের সঙ্গে একত্র হয়ে মারাত্মক সব খেলা খেলার দিকে তার আর ঝোঁক রইল না। সব মিলে বলা যায় এই যে, তার যেন মনে হতে লাগল কি-যেন তার নেই। তার ঘৃণার উদ্রেক করতে পারে এমন কিছুই এখন তার ধারে-কাছে নেই।

মেয়ের আগের সেই প্রতিবেশী ও বিরোধীর চেয়ে বয়সে কিছু বড় একটি যুবক এবার মেয়েটির দিকে তার মনোযোগ নিবদ্ধ করল। এই যুবকটি উচ্চ বংশের, অর্থবান্ ও চরিত্রবান্, সমাজে যেমন সে প্রিয়, মেয়েমহলেও তেমনি প্রিয়। মেয়েটি এই প্রথম গেল একজন স্তুতিকারক একজন বন্ধু এবং একজন সেবক যে কিনা তার প্রতি আসক্ত। যারা বয়সে বড়, শিক্ষায় যারা অনেক অগ্রসর, যারা অনেক দীপ্তিতে উজ্জ্বল, আত্মবোধে যারা প্রদীপ্ত—এমন অনেককে বাদ দিয়ে মেয়েটির প্রতি তার পক্ষপাত মেয়েটিকে বেশ খুশি করে তুলল। মেয়েটির প্রতি তাঁর নিরবচ্ছিন্ন মনোযোগ, যার মধ্যে নাকি কোনো বাড়াবাড়ি নেই, অনেক কিম্ভুত পরিস্থিতিতে মেয়েটিকে সানুগত সমর্থন, মেয়েটির বাবা-মার প্রতি তার এমন খোলামেলা ব্যবহার যার থেকে আশারই উদ্রেক হতে পারে, আশা—কেন না, মেয়েটি বয়সের দিক থেকে এখনো কিশোরীই প্রায়।—এইসব মিলে মেয়েটি আকৃষ্ট হল এই যুবকের প্রতি, এবং এ ব্যাপারে প্রচলিত রীতিনীতি দ্বারা ও অন্যান্য সকলের এ ব্যাপারটিকে

স্বীকার করে নেওয়া তাদের মনে আরও ভরসা এল। অনেক সময় তার সম্বন্ধে বলা হত যে, সে বাগ্‌দত্তা, এর ফলে মেয়েটিও অবশেষে এই রকমই ভাবতে আরম্ভ করল। সে নিজেও ও অন্যান্য সকলেও বুঝতে পারল যে, এ জিনিস ঘটেই গেছে, আর পরখ করে দেখার কিছু নেই। তখন সে আংটি-বদল করল, এবং যুবকটিকে বাগ্‌দত্ত পুরুষ বলেই মনে ক'রে নিল।

সমস্ত ব্যাপারটা বেশ শান্ত ভাবে ঘটে গেল, এর জন্যে এদের প্রণয়-অঙ্গীকারটির কোনো সরকারী ঘোষণা দরকার হল না। উভয় পক্ষই এ বিষয়ে একমত হলেন যে, ব্যাপারটি আগের মতনই চলতে থাকুক। তারা একত্র বাস করার আনন্দ লাভ করল, এবং বছরের মধ্যে সবচেয়ে মনোরম যে সময়টা সেই বসন্তকালটা তারা একত্রে কাটাতে ইচ্ছে করল। ভবিষ্যতের যথার্থ জীবনযাপনের জন্যে এটা হবে তাদের প্রস্তুতি।

ইতিমধ্যে সেই তরুণটি তার দেশ থেকে অনেক দূরে বেশ সন্তোষজনক-ভাবে উন্নতি করেছে, এবং তার উপযুক্ত পদে উন্নীত হয়েছে। এমন সময়ে ছুটি নিয়ে সে তার বাবা-মা'র সঙ্গে দেখা করতে এল। সে তার সেই সুন্দরী তরুণী প্রতিবেশিনীর মুখোমুখি হল, বেশ স্বাভাবিক ভাবেই এ দেখা, কিন্তু যেন এক অদ্ভুত পরিবেশে। ইদানীং মেয়েটি এক বন্ধুভাবাপন্ন বৈবাহিক সম্পর্কে আবদ্ধ এমন লোকেরই পারিবারিক ব্যাপারের প্রতি আকর্ষণ দেখছে, এবং তার পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গেই নিজেকে মানিয়ে নিতে পেরেছে। নিজেকে সে সুখী বলে মনে করে, এবং একদিক থেকে সুখীও বটে। কিন্তু এখন, অনেক দিন পরে এমন-একজন তার মুখোমুখি হল যে তার বিরোধী; ঘৃণা করা যাবে এমন-কিছু অবশ্য নয়। এখন সে ঘৃণা করতে আর পারে না, সে ক্ষমতা তার গেছে; বস্তুতপক্ষে ঐ শিশুসুলভ ঘৃণা যা ছিল আভ্যন্তরীণ মূল্যবোধের দুর্বোধ্য স্বীকৃতি মাত্র, এখন তাই হয়ে উঠেছে এক রমনীয় বিস্ময়, কমনীয় কৌতূহল, এবং মৃদু আত্মসমর্পণ; এবং কাছে আসবার আধো-ইচ্ছুক আধো-অনিচ্ছুক ইচ্ছা—এসবই অবশ্য উভয় পক্ষেই। বহুদিনের এই দূরে-থাকাটা তাদের জুগিয়েছে সুদীর্ঘ কথোপকথনের অজস্র উপকরণ। এখন তারা বড় হয়েছে, তাদের বুদ্ধি হয়েছে, তারা অনেক সংস্কার থেকে মুক্ত হয়েছে, এখন তাদের শৈশবের সেই যুক্তিহীন আচরণ তাদের কাছে মনোরম স্মৃতি হয়েই দেখা দিয়েছে; এখন যেন তাদের ইচ্ছে করে বন্ধুত্বের দ্বারা, মনোযোগী আচরণ ইত্যাদি দিয়ে তারা তাদের সেই বিরক্তিকর শত্রুতা'র

ক্ষতিপূরণ করে। তখন যে ভয়ংকর অবিবেচনা ও অবিচার হয়ে গিয়েছে তা আর থাকতে পারে না, এখন মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করে পরস্পরের গুণ উভয়কে স্বীকার করে নিতে হবে।

ছেলেটির পক্ষে সব বিষয়টাই ছিল যুক্তিযুক্ত, তার ইচ্ছাও ছিল সমীচীন। সমাজে তার প্রতিষ্ঠা, তার পদমর্যাদা, এবং তার উচ্চাশা তাকে এমন ভাবে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল যে, সে সহজেই সব মেনে নিতে পেরেছিল। এই বাগদত্তা মেয়েটির বন্ধুত্ব তার কাছে আনন্দকর অতিরিক্ত একটা উপহারের মতনই মনে হয়েছে, তার সঙ্গে বিশেষ কোনো সম্পর্কের জন্যে সে লালায়িত বলে নিজেকে সে মনে করেনি, তার বাগদত্ত পুরুষ সম্বন্ধে মেয়েটিকে সে বিদ্বিষ্ট করতেও চায় না ; এই সূত্রে বলা যায় যে সেই যুবকটির সঙ্গে তার সম্পর্কও বেশ মধুর।

কিন্তু মেয়েটির ক্ষেত্রে ব্যাপারটি ছিল অন্য রকম। তার মনে হতে লাগল সে যেন এক স্বপ্নের ঘোর থেকে জেগে উঠেছে। তার ঐ তরুণ প্রতিবেশীর সঙ্গে লড়াই করাই ছিল তার জীবনের প্রথম ভাবাবেগ। এবং সেই ভয়ংকর সংঘর্ষ সত্যিই ছিল বেশ ভয়ংকর। ভিতরে-ভিতরে যে নিবিড় আকর্ষণ ছিল বাইরে তারই প্রকাশ ঘটেছে প্রবল প্রতিরোধে। তার উপর, সে সময়ের কথা যখনই সে মনে করে তখনই তার মনে হয় সে খুবই ভালোবাসত ছেলেটিকে। হাতে অস্ত্র নিয়ে সে যে ভাবে তাকে খোঁজ করেছিল সে কথা মনে করলে তার হাসি পায়। ছেলেটি যখন তাকে নিরস্ত্র করে তখনকার সেই মধুরতম অনুভূতিটা সে এখন স্মরণ করতে চায়। ছেলেটি যখন তার হাত বাঁধছিল সেই সময়কার পরম সুখানুভূতির কথা সে কল্পনা করে দেখতে চায়। তাকে বিরক্ত করার জন্যে এবং তার ক্ষতি করার জন্যে যা-কিছু সে করেছিল তা সবই তার প্রতি ছেলেটির মনোযোগ আকর্ষণ করার নির্বোধ উপায়।

তার মনের যে ভাব সে নিজের মধ্যে চেপে রেখেছিল, যদি কেউ এসে তা প্রকাশ করে দিত, তাকে আরো স্পষ্ট করে তুলত এবং তার সঙ্গে এই মনোভাব ভাগাভাগি করে নিত, তাহলে তাকে সে তিরস্কার করত না। দুজনকে একসঙ্গে দেখলে এই প্রতিবেশীর কাছে তার বাগ্‌দত্ত পুরুষটি দাঁড়াতেই পারে না তুলনায়। একজনের উপর যদি কিছুটা বিশ্বাস রাখা যায়, অন্যজনের উপর রাখা যায় পরিপূর্ণ আস্থা। একজনের সঙ্গ যদি আনন্দের সঙ্গে পেতে পারা যায়, অন্যজনকে পেতে ইচ্ছে করে অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসেবে।

একজন যদি অতি উচ্চাঙ্গের সমবেদনার কথা ভাবছে এবং অস্বাভাবিক পরিস্থিতির কথা ভাবছে, তখন তার প্রতি একটু সন্দেহ এসে যায়, কিন্তু অন্য জন সম্বন্ধে একটা স্থির নিশ্চয়তা জেগে ওঠে। এ রকম সম্পর্ক সম্বন্ধে মেয়েদের বিশেষ একটি সহজাত প্রবৃত্তি বিচার করতে পারে; এই প্রবৃত্তির চর্চা করে এ'কে আরও কার্যকর করার মতন যুক্তিযুক্ত সুযোগ মেয়েদের আছে।

গোপনে-গোপনে বাগ্‌দত্তা মেয়েটি যতই এইসব কথা চিন্তা করতে লাগল, অন্যেরা ততই কম বুঝতে পারল যে বাগদত্ত্‌ পুরুষটির পক্ষে কোন্‌টা ভালো হবে, এবং কি উপদেশ বা পরামর্শ তাকে দেওয়া সংগত বা সমীচীন। প্রকৃত-পক্ষে সব ব্যাপারটা প্রত্যাহার করে নেওয়াই যেন বেশ জরুরি বলে সকলের মনে হল। মেয়েটির মন যতই একজনের প্রতি ঝুঁকতে লাগল ততই এইসব কথা সকলের মনে হতে লাগল। একদিকে মেয়েটি সমাজের দ্বারা, তার পরিবারের দ্বারা, বাগ্‌দত্ত পুরুষটির দ্বারা, এবং তার সম্মতির দ্বারা একেবারে বাঁধা; অন্যদিকে উচ্চাভিলাষী ছেলেটি তার অভিমত এবং তার জীবনের প্ল্যান ও পরিকল্পনা কিছুই গোপন রাখল না, এবং নিজেকে বিশ্বস্ত কিন্তু বিশেষ অনুরক্ত নয় এমন এক ভ্রাতা রূপে মেয়েটির কাছে নিজেকে পরিচিত করল, এবং তখন এমনও শোনা যেতে লাগল যে, এবার সে কার্যক্ষেত্রে চলে যাবে। তখন মনে হতে লাগল যে মেয়েটিব মধ্যে আবার সেই তার শিশুকালের চতুরতা নৃশংসতা নূতন ক'রে সবই যেন জেগে উঠছে, এবং জীবনের বিচক্ষণতা লাভের পরেও আরও ভীষণ ও আরো ভয়ংকর ও তাৎপর্যপূর্ণ উপায়ে কাজ করতে যেন সে বদ্ধপরিকর! সে তার মন ঠিক করে ফেলল, ঐ ছেলেটিকে শাস্তি দেবার জন্যে সে আত্মহত্যা করবে বলে ঠিক করে ফেলল। একদিন যাকে সে ঘৃণা করত, এবং এখন যাকে ভীষণভাবে ভালোবাসে, তার এই উদাসীনতায় এবং চিরকালের মত অন্যকে বিবাহ করার জন্যেই তার এই শাস্তি। তার মৃতদেহটি চিরকালের জন্যে ছেলেটির মনে মূর্ত হয়ে থাকবে, তাকে স্বীকার ক'রে না নিয়ে, তার ব্যক্তিত্বের প্রতি এতটুকু সম্ভ্রম না জানিয়ে ছেলেটি যে ভুল করে তার জন্যে চিরটা কাল তার নিজেকেই ভৎ'সনা করতে হবে।

তাঁর এই উন্মাদনা, এই অদ্ভুত মনের ভাবটি, সর্বত্রই তার সঙ্গী হয়ে আছে। নানা ভাবে নিজের মনের ভাব সে গোপন করার চেষ্টা করেছে। সকলেই

যদিও লক্ষ্য করত যে তার আচরণের মধ্যে একটু অস্বাভাবিকতা আছে, কিন্তু তার মনের প্রকৃত রহস্যটি জানতে না পেরে কেউই বিশেষ সতর্ক হয়নি।

এদিকে বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজন ও পরিচিত সকলে নানারকম আমোদ-আহ্লাদের বন্দোবস্ত করার জন্যে বেশ ব্যস্ত হয়ে আছে। প্রায় প্রত্যেক-দিনই একটা-না-একটা নতুন আমোদের ব্যবস্থা হচ্ছেই। মনোরম সব জায়গায়ই বেশ সাজিয়ে-গুছিয়ে রাখা হচ্ছে, আমুদে অতিথিরা যাতে সেখানে বসে আনন্দ উপভোগ করতে পারে। আমাদের তরুণ বন্ধুটি বিদেশে চলে যাবার আগে নিজের তরফ থেকে একটু আনন্দের ব্যবস্থা করেন। তিনি বাগদত্ত দুজনকে নিমন্ত্রণ করেন এবং তার সঙ্গে নিকট-আত্মীয়দেরও ডাকেন, একটি নৌ-বিহারে যোগ দেবার জন্যে। মস্তবড় অতি সুন্দর একটি জাহাজে তাঁরা উঠলেন। এটা এমনি একটা জাহাজ যার মধ্যে আরামে বসবার উপযোগী আলাদা জায়গা আছে, ছোট-ছোট কামরা আছে; মাটির পৃথিবীর শুক্‌নো আবহাওয়া থেকে এসে নদীর আর্দ্রতা উপভোগের জন্যে চমৎকার ব্যবস্থা আছে জাহাজটিতে।

বিশাল নদীটির কিনার বরাবর তারা চলল; সঙ্গে সঙ্গে গান-বাজনা চলতে লাগল। দিনের বেলায় বেশ তাপ ছিল বলে তারা নীচের তলার ঘরে বসে বুদ্ধির খেলায় ও ধাঁধার উত্তর বের করায় ব্যাপৃত হল। অতিথি-বৎসল তরুণ ব্যক্তিটি কখনোই চুপ করে বসে থাকতে পারে না, জাহাজের ক্যাপ্টেন তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়েছে দেখে সে গিয়ে হাল ধরল। জাহাজটি যখন এমন জায়গায় পৌঁছল যেখানে দুইটি দ্বীপ কাছাকাছি থাকায় নদীপথ খুব সংকীর্ণ হয়ে এসেছে, এবং নদীর বুকের নুড়িগুলি একবার এদিকে একবার ওদিকে জেগে উঠেছে, তার উপর দিয়ে ভয়ংকর তোড়ে বয়ে চলেছে নদীর জল। তখন এই তরুণটি তার সব কলাকৌশল দেখাবার দায়িত্ব নিয়ে নিল। একবার সে ঘুমন্ত ক্যাপ্টেনকে ডেকে তুলবার জন্যে প্রায় তৈরি হয়েছিল, কিন্তু নিজের উপরে একটু বিশ্বাস এসে গেল, সে ধীরে-ধীরে জাহাজটি সংকীর্ণ জায়গাটায় নিয়ে আসতে পারল। এমন সময় তার সেই সুন্দরী শত্রুটি ডেক্‌এ এসে হাজির হল, তার মাথায় চুলে গোঁজা ফুলের গুচ্ছ। সেই ফুলের গুচ্ছটি সে ছুঁড়ে দিল জাহাজের কর্ণধারটির দিকে। সে বলে উঠল, "স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে এটা নাও।" উত্তরে ছেলেটি বলল, "আমাকে বিরক্ত কোরো না" সে ফুলের গুচ্ছটি ধ'রেই বলতে লাগল, "এখন আমার সব শক্তি ও মনোযোগ এক করতে

হবে।" মেয়েটি বলল, "তোমাকে আর বিরক্ত করব না। তুমি আর আমাকে দেখতে পাবে না।" এই কথা বলেই সে জাহাজের মুখের দিকে চলে গেল এবং সেখান থেকে ঝাঁপ দিল নদীর জলে। কয়েকজন চেঁচিয়ে উঠল, "ও ডুবে যাচ্ছে, ওকে উদ্ধার করো।" ছেলেটি ভীষণ সমস্যায় পড়ল। চেঁচামেচিতে ক্যাপ্টেনের ঘুম ভেঙে গেল, ছেলেটি হাল অন্য হাতে দেবার জন্যে তৈরি ছিল, ক্যাপ্টেন হাল ধরতে এল ; কিন্তু ইতিমধ্যেই জাহাজ গিয়ে ঠেলে উঠল পাড়ে। ছেলেটি তৎক্ষণাৎ তার জবরজং পোশাক খুলে ফেলে জলে ঝাঁপ দিল, এবং মেয়েটির দিকে সাঁতার দিয়ে চলতে লাগল।

জল তাদেরই বন্ধু যারা এর সঙ্গে পরিচিত, এবং এর সঙ্গে ভালোমত ব্যবহার করতে পারে। জলের স্রোত ছেলেটিকে টেনে নিয়ে চলল, কিন্তু সে সাঁতার জানত বলে ভেসে গেল না। তার কাছ থেকে যে ছিন্ন হয়ে দূরে চলে গিয়েছিল সেই সুন্দরী মেয়েটি তার নাগালের মধ্যে এল। সে তাকে জাপটে ধরল। জল থেকে তাকে তুলে ধরতে পারল। জলের স্রোত তাদের দুজনকে ভীষণ বেগে টেনে নিয়ে যেতে লাগল, দ্বীপ দুটি পার হয়ে গেল তারা, ক্ষুদে-ক্ষুদে অন্য কয়েকটি দ্বীপও পার হয়ে গেল, নদী আবার প্রশস্ত হয়ে এসেছে সেখানে, এখানে স্রোত আর তেমন তীব্র নয়। প্রথমে সে একেবারে যন্ত্র-চালিতের মতন কাজ করেছে, কিছু না ভেবেই সে একটা জরুরি অবস্থার সম্মুখীন হয়েছিল, কিন্তু এখন তার মনে বল এল। জল থেকে মাথা উঁচু করে সে তার সব শক্তি দিয়ে সাঁতার দিতে লাগল, ক্রমশ সে এসে পৌঁছল ঝোঁপ-ঝাড়ে-ভরা এক সমতল ভুখণ্ডের কাছে, এই ভূখণ্ডটি বেশ স্বচ্ছন্দেই যেন এসে মিশেছে নদীর জলের সঙ্গে। এখানে সে তার সুন্দরী শিকারটিকে শুক্‌নো ডাঙায় এনে ফেলল, কিন্তু সে দেখল জীবনের কোনো সাড়া নেই তার দেহে। ছেলেটি নিজেকে বিপন্ন বোধ করল। তার চোখে পড়ল ছোট-ছোট গাছ-গাছড়ার মধ্য দিয়ে সম্মুখে চলে গিয়েছে একটা পথ। তার এই প্রিয় বস্তুটিকে সে আবার তুলে নিল, এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই একটা কুটীর পেয়ে গেল। এখানে পেয়ে গেল অনেক সহায়, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে এক তরুণ দম্পতি। সমস্ত বিপাকের ও বিপদের কথা বুঝিয়ে বলতে খুব সময় নিল না। কি-কি তার প্রয়োজন তা জেনে ওরা দুজন তার সব ব্যবস্থাই করল। বেশ তেজি আগুন জ্বেলে দিল তারা, উলের কম্বল পেতে দিল, পালকের আবরণ চামড়ার আচ্ছাদন বা যা-কিছু শরীর গরম করতে পারে তার সবই তারা

আনল। অন্য কোনো চিন্তার আগে এ'কে বাঁচিয়ে তোলার চিন্তাই হয়ে উঠল সবার বড়। এই সুন্দর শক্ত ও নগ্ন শরীরে জীবনের স্পন্দন জাগিয়ে তোলার জন্যে সবরকম চেষ্টাই করা হল। এসব চেষ্টা বিফলে গেল না। মেয়েটি তার চোখ খুলল, তার বন্ধুকে দেখল, এবং তার অপরূপ দুটি বাহু দিয়ে জড়িয়ে ধরল ছেলেটির গলা। অনেকক্ষণ সে এইভাবে রইল। তার চোখ দিয়ে জলের ধারা নামতে লাগল, এবং এতেই বুঝি সে তাজা হয়ে উঠল। মেয়েটি বলল, "তুমি আমাকে ছেড়ে চলে যেতে চাও? তোমাকে আবার এমন ভাবে আমি পেয়েছি।" ছেলেটি বলল, "না, কখনো না।" এর মানে যে কি তা না ভেবেই হয়তো এ কথা সে বলল। ছেলেটি আরও বলল, "নিজেকে বাঁচিয়ে তোলো। নিজেকে বাঁচিয়ে তোলো। নিজের জন্যেই নিজের কথা ভাবো, আর আমার জন্যেও।"

মেয়েটি নিজের কথা চিন্তা করল, এতক্ষণে লক্ষ্য করল সে কিরকম দশায় আছে। নিজের প্রিয়জনের ও পরিত্রাতার কাছে তার কোনো লজ্জা নেই। কিন্তু তার আলিঙ্গন থেকে ছেলেটিকে এবার সে মুক্ত করল, ছেলেটির সর্বাঙ্গ জলে ভেজা, নিজের দিকে যাতে সে দৃষ্টি দিতে পারে তার জন্যেই তাকে এবার ছেড়ে দিল মেয়েটি।

তরুণ দম্পতি নিজেদের মধ্যে আলোচনা করল। তারা এদের দিতে চাইল বিবাহের পোশাক, এখনো এই কুটিরেই সেই পোশাক টাঙানো আছে; এদের দুজনকে আপাদমস্তক আচ্ছাদিত করার সব উপকরণই ওতে আছে। অল্পক্ষণের মধ্যেই উদ্যোগী এই নারী-পুরুষ কেবল পোশাকই পরে নিল না, তারা অপরূপ সাজে সজ্জিত হয়ে উঠল। তাদের দুজনকে অপূর্ব দেখাতে লাগল, দুজন দুজনের দিকে তাকাতে লাগল বিস্ময়ের চোখে, এবং নির্বাধ আবেগে দুজন আলিঙ্গনাবদ্ধ হল। কিন্তু এই ফ্যান্সি পোশাক পরার জন্যে দুজনে একটু একটু হাসতে লাগল। যৌবনের প্রেম এবং বিক্রম তাদের অল্পক্ষণের মধ্যেই স্বাভাবিক করে তুলল। সব ঠিক ছিল। কিন্তু তাদের দুজনকে নাচে উদ্‌বুদ্ধ করতে এমন গানের ব্যবস্থা ছিল না।

জল থেকে উঠে এসে তারা ডাঙার জীবন পেয়েছে, মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এসে পেয়েছে জীবন, পারিবারিক পরিবেশ থেকে এসে পেয়েছে এই নির্জনতা, হতাশার থেকে আশা, উদাসীনতা থেকে ভালোবাসা—সবই সামান্য সময়ের মধ্যে। কিন্তু সব ব্যাপারটা এভাবে গ্রহণ করতে পারছে না যেন তাদের বোধ

ও বুদ্ধি, সব কেমন জড়িয়ে যাচ্ছে। এ রকম অবস্থা সহ্য করার জন্যে হৃদয়কে শক্ত হতে হবে, স্বাভাবিক ভাবে তাকে কাজ করতে হবে।

নিজেদের নিয়েই তারা এমন বিভোর ছিল যে, জাহাজে যাদের তারা ফেলে এসেছে তাদের উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার কথা তারা এতক্ষণ ভাবতেই পারে নি। তারা আবার কিভাবে মিলিত হতে পারবে এ উদ্বেগও তাদের এতক্ষণ হয় নি। ছেলেটি বলল, "আমরা কি পালিয়ে যাব? আমরা কি লুকিয়ে থাকব?" এর উত্তরে মেয়েটি ছেলেটির গায়ের সঙ্গে এঁটে দাঁড়িয়ে বলল, "চলো, আমরা একসঙ্গে থাকি।"

একটি কৃষক চরে আটকে যাওয়া এই জাহাজের খবর পেয়েই কাউকে কোনো প্রশ্ন না করে নদীর কিনারের দিকে যাত্রা করেছিল। অনেক চেষ্টায় ইতিমধ্যে জাহাজটিকে আলগা করা হয়েছে, আবার স্বচ্ছন্দেই তা ভেসে চলেছে। যাদের তারা হারিয়েছে তাদের ফিরে পাবার অনিশ্চিত আশা নিয়েই চলেছে জাহাজের যাত্রীরা। কৃষকটি যখন চীৎকার করে ও হাত নেড়ে জাহাজের যাত্রীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে লাগল, এবং জাহাজ ভিড়ানো যেতে পারে এমন একটা জায়গায় ছুটে গিয়ে অনবরত চীৎকার করতে লাগল ও হাত নাড়তে লাগল, তখন জাহাজটি কিনারের দিকে আসতে লাগল, এবং তারা যখন নামল তখনকার দৃশ্যটি দেখার মত। বাগ্‌দত্ত যুবক-যুবতীর বাবা-মা সব প্রথম নেমে পড়লেন, বাগ্‌দত্ত যুবকটি তার সংজ্ঞা প্রায় হারিয়ে ফেলেছে। যখন তাঁরা জানলেন যে তাঁদের ছেলে-মেয়েরা নিরাপদে আছে, তখনই ঝোঁপের আড়াল থেকে অদ্ভুত ছদ্মবেশে বেরিয়ে এল ওরা দুজন। মা চেঁচিয়ে উঠলেন, "এরা কারা?" বাবা বলে উঠল, "এ কাদের দেখছি?" এরা দুজন এঁদের পায়ের কাছে এসে পড়ল। তারা বলল, "আমরা তোমাদেরই সন্তান— আমরা দুজন সুখী দম্পতি।" মেয়েটি বলল, "আমাদের ক্ষমা করো।" ছেলেটি বলল, "আমাদের আশীর্বাদ করো।" তারপর দুজনে একসঙ্গে বলে উঠল, "আমাদের আশীর্বাদ করো।" সকলে স্তম্ভিত হয়ে গেল, হতবাক্ হয়ে গেল। তৃতীয় বার শোনা গেল ঐ কথা—"আশীর্বাদ করো।" তাদের এ অনুরোধ অগ্রাহ্য করতে পারে কে!

অনুবাদকের কাজ সম্বন্ধে কয়েকটি কথা

১৮২৮ সালে লিখিত গ্যেটের "কনসিডারেশন্স অন্ দি ওয়ার্ক অব্ এ ট্র্যানস্লেটার" রচনাটি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁর ধারণার ও

মূল্যবোধের অভিব্যক্তি। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সাহিত্যে একই প্রকার মানুষ ও মানবিকতার চিত্র পাওয়া যায়, এর মধ্যে পার্থক্য যেটুকু তা হচ্ছে জাতীয়-বৈশিষ্ট্য। পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ এবং সহনশীলতার এবং বিশ্বব্যাপী মানবিকতার নিদর্শন মেলে এই সব সাহিত্যে। গ্যেটে জোর দিয়ে বলেছেন যে, সংস্কৃতির ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক আদান-প্রদানের ব্যবস্থা একটা জরুরি জিনিস।

এটা স্পষ্টই লক্ষ্য করা গিয়েছে যে, সমস্ত দেশের প্রথম শ্রেণীর কবি ও সৃজনশীল লেখকরা বহুদিন থেকেই যা-কিছু বিশ্বব্যাপী মানবিকতা তারই চর্চা করে চলেছেন। যে-কোনো বিষয়ই হোক, ঐতিহাসিক হোক পৌরাণিক হোক কাল্পনিক হোক কিংবা অল্পবিস্তর খামখেয়ালে লেখা হোক—সব ধরণের রচনার মধ্যেই জাতীয় বৈশিষ্ট্য বা ব্যক্তিত্বের প্রকাশ ছাপিয়ে যা ক্রমশই উজ্জ্বলতরভাবে প্রকাশিত হয়ে উঠছে তা হচ্ছে বিশ্বজনীন একটা মূর্তি।

ব্যবহারিক জীবনে সর্বত্র একই অবস্থার উদ্ভব হয়ে থাকে, এবং পৃথিবীর যাবতীয় রিপু যেন সর্বত্রই জড়িত দেখা যায়। বর্বরতা বলো বন্যতা বলো, নিষ্ঠুরতা মিথ্যাচারিতা স্বার্থপরতা তঞ্চকতা—সর্বত্রই সব আছে ; এবং এসবের উপশমের জন্যে সকলেরই চেষ্টাও আছে। এর থেকে এ কথা মনে করা ভুল যে, এর দ্বারা বিশ্বময় শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে ; তা অবশ্য হবে না। কিন্তু এর ফলে ভয়ংকরতা ক্রমশই কিছুটা কমবে, যুদ্ধও তেমন ভয়াবহ হবে না, বিজয়ের মধ্যেও তেমনি তেমন একগুয়েমি থাকবে না।

সব জাতির সাহিত্যে যা আছে তা হচ্ছে এইসব অসৎ আচরণের প্রতি অঙ্গুলিসংকেত ; এই গুণই সকলকে গ্রহণ করতে হবে। সব জাতির বৈশিষ্ট্য আমাদের জানতে হবে, আমাদের তা মেনে নিতে হবে, এবং এইভাবেই সেইসব জাতির সঙ্গে আমরা একাত্ম হতে পারি। কোনো জাতির নিজস্ব আচার-আচরণ তার ভাষার মত তার মুদ্রার মত—এর দ্বারাই সেই জাতির সঙ্গে আদান-প্রদান সম্ভব, প্রকৃত পক্ষে এর সাহায্যেই সেই জাতির সঙ্গে আমাদের যোগ স্থাপন করা সম্ভব।

বিশ্বজনীন সহনশীলতা লাভ করা যাবে যদি আমরা বিশেষ ব্যক্তির ও বিশেষ জাতির বৈশিষ্ট্য ভালোভাবে স্বীকার করে নিতে পারি, সেইসঙ্গে এই বোধও রাখি যে, প্রকৃতই যিনি গুণী তিনিই সর্বজনের প্রতিনিধি তুল্য ব্যক্তি।

বহুদিন থেকেই জার্মান জাতি এই মনোভাব গ্রহণ করেছে, এবং পারস্পারিক স্বীকৃতি জানিয়ে এসেছে। জার্মান ভাষা যে জানে এবং এই ভাষা যে অধ্যয়ন করে তারা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছে যে, সব জাতির পণ্যই এখানে আছে ; এর দ্বারা জার্মান ভাষা যেমন দোভাষীর কাজ করেছে তেমনি নিজেকেও সমৃদ্ধ করেছে।

সেইজন্যেই সব অনুবাদককেই বিশ্বজনীন আধ্যাত্মিক কারবারের এজেণ্ট বলে মনে করতে হবে, যে নাকি বিনিময় ব্যবস্থাকে আরও জোরদার করার জন্যে অক্লান্ত পরিশ্রম করেই যাবে। অনুবাদ যথেষ্টভাবে হচ্ছে না, এমন কথা অনেকে বলতে পারেন, তবুও এ কথা স্বীকার করে নিতেই হবে যে, বিশ্বজনীন যোগাযোগের ব্যাপারে এই কাজটা হচ্ছে অন্যতম প্রধান কাজ এবং সম্মানজনক একটি পেশা।

কোরান বলেছে : "খোদা সব জাতিকেই তার নিজের ভাষার একজন পয়গম্বর দিয়েছে।" তাহলেই প্রত্যেক অনুবাদক তার নিজ জাতির একজন পয়গম্বর।

একারমানের সঙ্গে কথোপকথন

গ্যেটের পরিণত-বয়সের প্রজ্ঞার এবং তাঁর দীর্ঘ কর্মময় জীবনের অনেক অভিজ্ঞতার বিষয় আমরা জানতে পেরেছি তাঁর সেক্রেটারি একারমানের সঙ্গে তাঁর কথোপকথনের মধ্য দিয়ে। একারমানই তা লিপিবদ্ধ করে রেখে গিয়েছেন। এখানে যা উদ্ধৃত হচ্ছে তা হচ্ছে গ্যেটের ১৮২৪ সালের কথোপকথনের অংশ। বিপ্লবের প্রকৃতি সম্বন্ধে গ্যেটের নিখুঁত ইতিহাস বোধ এতে স্পষ্ট। ১৭৮৯ সালের ফরাসী বিদ্রোহের প্রয়োজনীয়তা গ্যেটে যেমন স্বীকার করেছেন, তেমনি সাধারণভাবে বিপ্লবের প্রয়োজনীয়তা তিনি স্বীকার করেন বটে, এবং তার প্রত্যক্ষ উপকারিতাও স্বীকার করেন বটে, কিন্তু এর আনুষঙ্গিক অনেক জটিলতার জন্যে এ সম্বন্ধে তাঁর মনে একটু বিরূপ ভাব ছিল। রাজনীতি ব্যাপারে পুরো রক্ষণশীল মনোভাব তাঁর ছিল না ; কিন্তু পৃথিবীর বিষয়ে তাঁর পরিমিত ও মাত্রাজ্ঞান-সম্পন্ন মনোভাব হচ্ছে—চরম বা নরম নয়, মধ্যপন্থা অবলম্বন করে মধ্যস্থতার মাধ্যমে সব বোঝাপড়া করা।

৪ জানুয়ারি ১৮২৪

এ কথা সত্য যে ফরাসী বিপ্লব আমি তেমন ভাবে মেনে নিতে পারিনি, এর কারণ এর বীভৎসতা আমার একেবারে গায়ের কাছে এসে পৌঁছেছিল, এবং আমাকে প্রত্যহ প্রতি ঘণ্টায় ক্রুদ্ধ করে তুলত; তখন এর হিতকর পরিণামের কথা তেমন বোঝা যায়নি। ফ্রান্সে যা ঘটেছিল একটা পরম প্রয়োজনের জন্য, জার্মানীর জনগণ বিপ্লবের একটা ভান করে অনুরূপ ঘটনা ঘটাবার জন্য যখন চেষ্টা করতে থাকে, তখন আমি উদাসীন থাকতে পারিনি।

উদ্ধত কোনো ভঙ্গিকে আমি সমর্থন করতে পারিনে। এ বিষয়ে আমার দৃঢ় প্রত্যয় এই ছিল যে, জনগণের দোষে কোনো বড়-দরের বিপ্লব হয় না, তা হয় কেবল গভর্নমেণ্টের দোষেই। গভর্নমেণ্ট যদি সততায় অবিচল থাকে, সর্বদা সচেতন থাকে তাহলে বিপ্লব অসম্ভব। সময়মত উন্নতি-সাধন করে মাঝপথে যদি গভর্নমেণ্ট জনগণের সঙ্গে যুক্ত হয় তবে বিপ্লব হবে না। কিন্তু নীচ থেকে চাপ দিয়ে পরিবর্তন না আনা পর্যন্ত যদি কেবলই বাধা সৃষ্টি করতে থাকে, তবেই হয় বিপ্লব।

বিপ্লব আমি ঘৃণা করতাম, আসবে তাই স্থিতাবস্থার সুহৃৎ বলা হত। কিন্তু এ খেতাবটা বড় ঝাপসা-রকমের, এতে তাই আমার আপত্তি। স্থিতাবস্থার যদি সবই হয় চমৎকার, উৎকৃষ্ট ও ন্যায়সঙ্গত, তা হলে তার বিরুদ্ধে আমার কিছু বলার নেই। কিন্তু অনেক ভালোর সঙ্গে অনেক মন্দও মেশানো থাকে, অনেক অন্যায়ও থাকে অনেক অসংগতিও থাকে। এরকম স্থিতাবস্থার সুহৃৎ বলার অর্থই হচ্ছে যা-কিছু ঝরঝরে হয়ে গেছে এবং যা-কিছু মন্দ তারই সুহৃৎ বলা।

সময় কিন্তু বয়ে চলেছে নিরবধি কালের দিকে, প্রতি পঞ্চাশ বছর অন্তর মানুষের আদবকায়দার বদল হয়ে চলেছে, তাহলেই ১৮০০ সালে যে প্রতিষ্ঠানটি ছিল ত্রুটিহীন, ১৮৫০ সালে সেই প্রতিষ্ঠানটিই হয়ে যেতে পারে অযোগ্যতার আড়ৎ।

ফ্রায়েডরিখ শিলার

ফ্রায়েডরিখ শিলার (১৭৫৯-১৮০৫) জন্মগ্রহণ করেন উর্টেমবার্গের মারবাশে। স্টুটগার্টে অবস্থিত ডিউক কার্ল ইউজেনের মিলিটারি কলেজের শিক্ষার্থী থাকা-কালে শিলার উপলব্ধি করেন একনায়কতন্ত্রী রাষ্ট্রে ব্যক্তি স্বাধীনতা

কতটা সীমিত। তিনি উর্টেমবার্গ থেকে পলায়ন করেন, এবং অনেক হতাশা ও কষ্টের মধ্যে দিনপাত করেন। সমাজ সম্বন্ধে তাঁর সমালোচনা অনেক নাটকেই প্রকাশিত হয়েছে, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে "দি রবার্স" (ডাই রাউবার)-এর পরেই "লুই মিলেরিন" (কাবালে উণ্ড লাইবি)—এটি সেকালের একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বই। তাঁর "ডন কারলোস" (১৭৮৭) হচ্ছে শিলারের ক্লাসিকাল ও আদর্শবাদী নাটকে প্রবেশের দৃষ্টান্ত। ১৭৮৭ সালে শিলার ভেইমারে চলে আসেন, এই স্থানটি তখন থেকেই জার্মান বুদ্ধিজীবীদের ধ্রুপদী কেন্দ্রে পরিণত হয়, বিশেষ করে গ্যেটের সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধুত্বের জন্যেই এটি ঘটে। ১৭৮৬ পর্যন্ত শিলার অনেক সাহিত্যিক ও দার্শনিক প্রবন্ধ লেখেন, শিলারের রচনাদির রসাস্বাদনের পক্ষে এই প্রবন্ধগুলি খুব সহায়ক। পৃথিবীকে আদর্শবাদী দৃষ্টিতে দেখার উদাহরণও এইসব রচনা, এতে যে দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি আছে তা কাণ্ট্-এর আমলের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, যদিও অবশ্য কতকগুলি বিশেষ-বিশেষ ক্ষেত্রে কাণ্ট্-এর দর্শনের থেকে এর পার্থক্য আছে। ১৭৯৯ থেকে ১৮০৫ সালে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত শিলার রোগভোগ করে গিয়েছেন, তবুও এই সময়ে তাঁর মনের ও প্রজ্ঞার জোরে তিনি মহৎ নাটকগুলি রচনা করেছেন, অল্পদিনের ব্যবধানেই সেগুলি প্রকাশিত হয়েছে, সেগুলি হচ্ছেঃ "ভালেনস্টাইন" "মারিয়া স্টুয়ার্ট" "জোয়ান অব আর্ক" "দি ব্রাইড ফ্রম মেসিনা" "উইলিয়ম টেল্"। প্রভুত্বের আইন দিয়ে পরিচালিত পৃথিবীর মতপার্থক্যের পটভূমিতে এই নাটকের ঘটনা সংঘটিত হয়েছে, যদিও আদর্শ ও বাস্তবের মধ্যের ব্যবধান সম্বন্ধে শিলার সচেতন ছিলেন। গ্যেটে পৃথিবীর ও প্রকৃতির সমন্বয়ের মধ্যে একটি শৃঙ্খলাপূর্ণ জীবন অতিবাহিত করতে চাইতেন, কিন্তু শিলার চাইতেন তার বিপরীত পথ। আদর্শবাদীর সংগ্রামকে শিলার বর্ণনা করেছেন বাস্তবের সঙ্গে তার সংঘর্ষ রূপে, তার পরিণতি হচ্ছে দুঃখের, কিন্তু তার অন্তরস্থ স্বাধীনতার দ্বারা সে অর্জন করছে তার ভাগ্য—এইটেই হচ্ছে তার আদর্শের জয়।

দি রবার্স

শিলারের প্রথম নাটক "দি রবার্স" (১৭৮১) বক্তব্যের দিক থেকে গ্যেটের "গোয়েটৎস"-এর মতই স্টার্ম উণ্ড ড্রাং-এর অনুরূপ। যদিও এর পটভূমি অতীতকালের, কিন্তু এর ভিতরের বাণী শিলারের নিজের সময়কে উদ্দেশ্য

করেই বলা। এর নায়ক কার্ল মূর স্বাধীনতা ন্যায়পরায়ণতা ও বলিষ্ঠ কর্ম-প্রেরণার জন্য লালায়িত। এক দল ডাকাতের নেতারূপে তিনি সেই সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে উঠলেন, যে সমাজের ত্রুটির ও অবিচারের তিনি শিকার হয়েছেন। শিলারের পরবর্তীকালীন আদর্শবাদী নাটকের ঘটনার মতন এই নাটকের শেষের দিকে মনোভাবের কিছুটা পরিবর্তন দেখা যায়—সর্বজনীন নৈতিক নিয়ম লংঘনের জন্য কার্ল মূর নিজেকে দোষী বলে মনে করলেন, এবং কর্তৃপক্ষের কাছে গিয়ে ধরা দিলেন। তাঁর ভাই ফ্রান্‌ৎস মূর একটু বিপরীত চরিত্রের লোক, তিনি ছিলেন বিষয়াসক্ত ও শূন্যতাবাদী—মানুষের প্রতি ঘৃণা ও অবজ্ঞা প্রকাশের মধ্য দিয়ে তিনি হয়ে ওঠেন একজন দুরাত্মা। নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্যে সে কিভাবে চক্রান্ত করে তার বাবার মৃত্যু ঘটাবে উদ্ধৃতাংশে তাই সে প্রকাশ করছে।

এই নাটকটি একটি আক্রমণাত্মক বিদ্রোহ বলে গণ্য করা হয়, প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে এটি সাফল্য অর্জন করে, এবং শিলারের শাসক ডিউক শিলারকে লেখা বন্ধ করার আদেশ দেন।

অঙ্ক ২, দৃশ্য ১

ফ্রান্সিস ডি মূর ॥ (তাঁর ঘরে একা বসে চিন্তা করছেন) আমার সব ধৈর্য শেষ হয়েছে—ডাক্তার বলছেন তিনি আবার সেরে উঠছেন। একজন বুড়ো মানুষের জীবন বুঝি এমনি চিরজীবী। আমার রাস্তা হত উন্মুক্ত ও মসৃণ। যদি-না ঐ ক্লান্তিকর মাংসপিণ্ড আমার ঐশ্বর্যের পথে এমন বিঘ্ন হয়ে না থাকত, এ-যেন ভূতের গল্পের সেই নরকের কুকুরটার মত।

আমার সব প্ল্যান কি এই কলাকৌশলের লোহার আগলে বাধা পেয়ে থাকবে। আমার মহৎ আকাঙ্ক্ষা কি পার্থিব ব্যাপারের এই শম্বুক-গতির সঙ্গে ধীরে ধীরে এগোবে? শেষে কিছু জ্বালানির উপর নির্ভর করে জ্বলছে যে শিখা, তা নিবিয়ে দিতে হবে। কিন্তু এ কাজ আমি নিজে হাতে করব না। তাহলে লোকে অনেক কথা বলাবলি করবে। তাঁকে মেরে ফেলতে চাইনে, মরে যাক তাই চাই। আমি বেশ চতুর একজন ডাক্তারের মতন কাজ করতে চাই। কিন্তু একটু অন্যভাবে করতে চাই। প্রকৃতির চাকায় আর-কোনো দণ্ড বা পাকি জুড়ে দিয়ে না, চাকাটাকে গড়িয়ে যেতে সাহায্য করে।

জীবনকে যদি আমরা লম্বা করার জন্যে চেষ্টা করতে পারি, তবে তাকে ছোট করার চেষ্টাই বা করতে পারবনা কেন।

দার্শনিকেরা ও চিকিৎসকেরা আমাদের শিখিয়েছেন যন্ত্রের গতির সঙ্গে আত্মার গতিকে কিভাবে সমগতিতে বাঁধা যায়। আত্মা কমজোরী হয়ে গেলে যন্ত্রের সাহায্যে তার স্পন্দন বাড়ানো যায়—আমাদের প্রকৃত প্রাণশক্তির উপর ভাবাবেগ তার দাঁত বসিয়ে দেয়, মনের উপর খুব চাপ পড়লে সে মাটিতে হুমড়ি খেয়ে পড়ে। তবেই দেখ! জীবনের দুর্গে প্রবেশের জন্যে মৃত্যুর নতুন সড়ক যদি কেউ নির্মাণ করতে পারে, মনের পন্থা ধ'রে যদি জীবনকে নাশ করা যায়; বা, চমৎকার! এটা একটা নতুন আবিষ্কার—এটা কেউ করতে পারলে সে নতুন কিছু করেছে বলে স্বীকৃতি পাবে। মূর, বিষয়টা একটু ভেবে দেখো। এটা এমন একটা আর্ট তুমি যার আবিষ্কর্তা হতে পার। প্রকৃতির রহস্য উদ্‌ঘাটনের জন্যে বৈজ্ঞানিক উৎকর্ষের চরমে পৌঁছে কি বিষ ব্যবহার করা হয়নি? যার দ্বারা বহু বছর আগেই আমরা আগাম হৃদয়ের স্পন্দন শুনতে পেয়েছি, নাড়ি চিনতে শিখেছি। ব্যস, এই পর্যন্তই, আর না। এক্ষেত্রে কেন কেউ তার শক্তির পরীক্ষা করতে পারবে না?

এখন আমি এখন কী করে দেহ ও আত্মা এই দুয়ের মধ্যের শান্ত ও মধুর সমন্বয়টি ভেঙে দিতে পারি? কোন্ ধরণের মনের আবেগ আমাকে বেছে নিতে হবে? জীবনের সূত্রটি ছিন্ন করার জন্যে কোন্ বিশেষ শক্তিটি প্রয়োগ করা দরকার? ক্রোধ? না। ঐ হিংস্র নেকড়ে তার খাদ্য বড় তাড়াতাড়ি খেয়ে নেয়। দুঃখ? ওটা একটা পোকা, শরীরের মধ্যে অনেকক্ষণ সময় নষ্ট করে। বেদনা? ঐ সাপ বড় ধীরে ধীরে চলে। ভয়? না। আশা সেই বর্শার মুখ ভোঁতা ক'রে দেয়। কি হল? এরা কি সকলে আমাদের আদেশ পালনের এক-একজন দাস? মৃত্যুর অস্ত্রাগার কি একেবারে নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে? (গভীর ভাবে চিন্তা ক'রে) এখন কী করা? কিছুই না। বা, বা! (উত্তেজিত হয়ে) এবার পেয়েছি। আতঙ্ক! এই জিনিস কী না করতে পারে! এর হিম আলিঙ্গন থেকে কোনো যুক্তির বা কোনো ধর্মের রেহাই নেই। কিন্তু যদি এই ঝাপটাও সে সহ্য করতে পারে, তারপর কী হবে? হে দুঃসহ যন্ত্রণা, হে অনুতাপ! তোমরা আমার সহায় হও—আত্মার বাস করার জন্যে হে ক্ষুদ্র গহ্বর, তোমরা বিষাক্ত খাদ্য রোমন্থন করে থাক, নিজ দেহের গলিত আবর্জনা নিজেই গোগ্রাসে গিলে থাক—তোমরা নিজের

গরলের চিরকালের উদ্‌ভাবক চিরকালের সংহারক। এবং তুমিও, হে বেদনার্ত মনস্তাপ, তুমি নিজের উত্তরাধিকার বিসর্জন দিয়ে নিজের পায়ের মাংস ভক্ষণ করেই বেঁচে থাক। এবং এসো, তোমরাও এসো, তোমরা সকলে এসো। তোমাদের মনোলোভা মূর্তি নিয়ে এসো, হে অতীত! শস্যে-ফুলে শ্রীমণ্ডিত তোমার অজস্র শৃঙ্গশোভা নিয়ে এসো হে ভবিষ্যৎ! তোমাদের আরশিতে ওকে দেখাও স্বর্গের সুষমা, তোমাদের দ্রুতগতির দরুণ তোমাদের যেন ধরতে না পারে ওর মুষ্টি। এইভাবে আমি মৃত্যুর বাজনা বাজাই, ঐ মুমূর্ষু আত্মার উপর আঘাতের পর আঘাত ক'রে। যতক্ষণ আমার উন্মাদনার শেষ সৈন্যদল না আসে···হতাশা নিয়ে আসবে তাদের। আমার প্ল্যান প্রস্তুত। গভীরভাবে শিল্পসম্মতভাবে নির্ভরযোগ্যভাবে নিরাপদে (বিদ্রূপ করে) এই এই শবব্যবচ্ছেদের ছুরি আঘাতের কোনো চিহ্ন রাখবে না, কোনো বিষের চিহ্ন রাখবে না। (দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে) এবার কাজে নামো! (হারমানের প্রবেশ), হা, **Deus ex machina**—হারমান।

অপরাধীর হৃত সম্মান

শিলারের ছোটগল্প "দি ক্রিমিন্যাল আউট অব লস্ট অনার" (১৭৮৫) থেকে এখানে সংক্ষিপ্ত আকারে কিছুটা উদ্ধৃত করা হল, গল্পটি সত্যঘটনার উপর ভিত্তি করে লেখা। শিলার এখানে একজন কর্তব্যবিমুখ ব্যক্তির মানসিক অবস্থা বিশ্লেষণ করে এই অভিমতে পৌঁছেছেন যে, সমাজের উপরেই দোষারোপ করতে হবে, কেননা যে অন্যায় করেছে এবং সে অন্যায়ের শাস্তিও পেয়ে গিয়েছে, তাকে সমাজ আর সম্মান করে না কেন। তার এই অসম্মানের জন্যে তার মধ্যে যে হতাশা আসে তাতে সে আরও অন্যায় করে, এবং ক্রমশ জঘন্য থেকে জঘন্যতর কাজ করে ; যে ভাবে শাস্তি দেওয়া হয় তার জন্যে তার মনে আসে হতাশা। ক্রিশ্চিয়ান উলফের চরিত্র স্বাভাবিকভাবেই বদ নয়, কেননা সে তার মর্যাদা সম্বন্ধে সচেতন। সে যে অন্যায় করেছে তা তার পরিবেশের প্রতিক্রিয়ার ফলেই করেছে, এবং সমাজের আচরণ তাকে ক্রমশ আরো কঠোর ও কঠিন করে তুলেছে। এখানে শিলার এমন এক সমস্যার গভীরে দৃষ্টিপাত করেছেন, যে সমস্যা একালে এখনও আমাদের মধ্যে আছে, এবং আমাদের শতকেই যে সমস্যা নিয়ে অনেক উপন্যাসও লেখা হয়েছে।

ক্রিশ্চিয়ান উল্‌ফ কোনো-এক শহরের সরাইখানার মালিকের ছেলে। জায়গাটার নাম উল্লেখ করা হল বিশেষ কারণে, যে কারণ একটু বাদেই জানা যাবে। কুড়ি বছর বয়স পর্যন্ত সে ঐ সরাইখানা-চালানোয় তার মাকে সাহায্য করেছে, কারণ তার বাবা মারা গিয়েছিলেন। ব্যবসা ভালো চলছিল না, সেজন্যে উল্‌ফের অনেক অবসর ছিল। স্কুলেও সে দাগী চরিত্রের ছেলে বলে পরিচিত ছিল। বয়স্ক মেয়েরা তার ধৃষ্টতা নিয়ে নালিশ করত, কিন্তু শহরের ছোকরারা তার উদ্ভাবক-শক্তির জন্যে তাকে তারিফ করত। ভগবানও তাকে তৈরী করেছেন একটু অদ্ভুত ভাবেই, বেঁটে-খাটো শরীর, চেহারার মধ্যেও কোনো সামঞ্জস্য নেই, মাথা বিশ্রীরকম কালো এলোমেলো চুল, চ্যাপ্টা নাক, উপর-ঠোঁট মোটা—যা নাকি আবার ঘোড়ার চাট খেয়ে আরও বিকট হয়ে গিয়েছে—এসব মিলে তার আকৃতি এমন বীভৎস দেখাত যে মেয়েরা তাকে দেখে ভয় পেত, এবং তার সঙ্গীরা তাকে নিয়ে মজা করার অনেক উপকরণ পেয়ে যেত।

প্রকৃতির কাছ থেকে সে যা পায়নি সেইসব আহরণ করার জন্যে তার অদম্য চেষ্টা ছিল। সুখপ্রদ চেহারা তার ছিল না, তাই সে সকলকে খুশি করার চেষ্টা করত। সে একটু কামুক প্রকৃতির ছিল, এবং সে বিশ্বাস করে ফেলেছিল যে, সে প্রেমে পড়েছে। যে মেয়েটিকে সে এ ব্যাপারে বেছে নিয়েছিল সে তার সঙ্গে বেশ দুর্ব্যবহারই করে, এতে তার মনে হল যে, তার প্রতিদ্বন্দ্বীদের ভাগ্য বেশ প্রসন্ন। মেয়েটা গরিব ছিল, যে হৃদয়টি তার অনুনয়ের কাছে অবরুদ্ধ রইল, কোনো উপহার পেলে সে হৃদয় খুলে যেতে পারে। কিন্তু ছেলেটির নিজের অর্থবল ছিল না; তার বাহ্যিক চেহারার একটু জৌলুস আনার জন্যেই তাদের সরাইখানার খারাপ কারবারের মধ্যে থেকে যেটুকু লাভ হত তা খরচ হয়ে যেত। খুবই অলস ছিল সে, কোনো ঝুঁকি নিয়ে তাদের ঘরের অবস্থার উন্নতি করার মত বুদ্ধি তার ছিল না, তার উপর একটু দম্ভও ছিল, সরাইখানার মালিক হয়ে যে গৌরব বোধ সে করেছে, তা থেকে সরে গিয়ে কোনো কাজ জোগাড় করে সে নেয় নি, কেননা স্বাধীনতার দাম তার কাছে খুব বেশি ছিল, সেইজন্যে একটা পথই তার কাছে খোলা ছিল—যে পথ তার আগে আর পরে হাজার হাজার লোক বেশ সাফল্যের সঙ্গেই গ্রহণ করেছে। তার শহরটা ছিল একটা বনের কিনারে, বনটার মালিক ছিল শাসক রাজার; সেই বন থেকে সে জন্তু চুরি করতে লাগল, এতে তার যে লাভ হল তা গিয়ে পৌঁছল তার প্রেয়সীর হাতে।

হ্যানশেনের প্রেমিকদের মধ্যে একজন ছিল তার নাম রবার্ট। সে ঐ বনের রক্ষী দ্বারা বনের পশুপাখি দেখাশোনার কাজে নিযুক্ত ছিল। অল্পদিনের মধ্যেই রবার্ট লক্ষ্য করল তার প্রতিদ্বন্দ্বী তার হাত সাফাইয়ের জন্যে কি ভাবে তার উপর টেক্কা দিচ্ছে। তখন সে তার প্রতিদ্বন্দ্বীর অবস্থার পরিবর্তন কি করে এল তার অনুসন্ধান করতে লাগল। সে প্রায় তার প্রতিদ্বন্দ্বীর সরাইখানায় গিয়ে তত্ত্ব তালাস করতে লাগল। সরাইখানাটির নাম সান্। তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি তার হিংসায় আরও ধারালো হয়ে উঠেছে, এবং অল্পদিনের মধ্যেই সে বুঝতে পারল কোথা থেকে এই টাকা আসছে। অল্পদিনের মধ্যে জন্তু চুরির ব্যাপারে নতুন করে রাজাজ্ঞা জারি হল, অপরাধীকে কঠিন কায়িক পরিশ্রম করতে হবে এমন হুকুম হল। রবার্ট তার শত্রুটির গোপন গতিবিধির উপর নজর রাখল। অবশেষে সে তাকে হাতে-নাতেই ধরে ফেলল। উল্‌ফ বন্দী হল। কিন্তু যেটুকু যে হাতে রাখতে পেরেছিল জরিমানা হিসেবে তা দিয়ে সে কারাবাসের হাত থেকে রেহাই পেল।

রবার্টের জয় হল। তার পথ থেকে তার প্রতিদ্বন্দ্বীকে সরিয়ে ফেলা গিয়েছে, এখন তার ভিখারী দশা, হ্যানশেনের কাছ থেকে কোনো অনুগ্রহই এখন সে পাচ্ছে না। উল্‌ফ তার শত্রু কে তা বুঝেছে। এই লোকটি এখন জোহানিকে পেয়েছে। তার আহত দম্ভের সঙ্গে তার নিজের দৈন্য একত্র হয়ে তাকে আরও মনমরা করে তুলল। অভাব ও হিংসা একত্র হয়ে তার মনের ভাবকে আরও তীব্র বিক্ষোভে পরিণত করল। ক্ষুধা তাকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াতে লাগল, প্রতিহিংসা ও তার ইন্দ্রিয়চেতনা তাকে জাপটে ধরল। দ্বিতীয়বার সে পুনরায় জন্তু-চোর হল। এবারও রবার্টের দ্বিগুণিত নজর তাকে বেকুব বানাল। এবার সে আইনের সব কড়া নিয়মের মধ্যে পড়ল। কেননা, কিছু দেবার মত সাধ্য এখন তার নেই; সুতরাং কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই তাকে যেতে হল রেসিডেন্সি জেলে।

এক বছরের কারাবাস তার শেষ হল। এই ব্যবধান তার ইন্দ্রিয়কে আরো তেজি করে তুলেছে, দুর্ভাগ্যের চাপে তার ক্ষোভও বেড়ে উঠেছে। জেল থেকে ছাড়া পাওয়া মাত্রই সে ছুটে গেল তার জন্মভূমিতে জোহানের সামনে একবার দাঁড়াবার জন্যে। তাকে দেখে সকলে পালিয়ে যেতে লাগল। গুরুতর অভাবে চূর্ণ হল তার দম্ভ, সে তার ধনী প্রতিবেশীর কাছে দিন-মজুরের কাজ চাইল। কৃষকেরা যারা নাকি অন্যের উপকার করে থাকে তারা এই দুর্বল

জীবটিকে দেখে কেবল অবজ্ঞায় কাঁধ ঝাঁকি দিল, এবং শক্তসমর্থদের কাজ দিল। আর একটি শেষ চেষ্টা সে করল। একটা কাজ এখনো খালি আছে, একজন মানী ব্যক্তির পক্ষে অবনতির এটা শেষ ধাপ। সে সহরের শূকর-পালকের কাজটা চাইল। কিন্তু একটা অপদার্থের হাতে শূকর ছেড়ে দিতে রাজি হল না কৃষকেরা। সব জায়গায় হতাশ হয়ে, সর্বত নস্যাৎ হয়ে, তৃতীয়-বার সে হল জন্তু চোর। তৃতীয় বারও সেই দুর্ভাগ্যের মুখেই তাকে পড়তে হল, সে তার সদাজাগ্রত শত্রুর হাতে ধরা পড়ল।

দ্বিতীয় বারের এই পুনরাবৃত্তি তার অপরাধকে খুব বড় করে তুলল। বিচারকেরা আইনের বই ঘাঁটতে লাগলেন; এঁদের একজনও এই অপরাধীর মনের অবস্থার কথা বিবেচনা করলেন না। জন্তু-চুরির অপরাধের এমন শাস্তি দিতে হবে যাতে অন্যদের পক্ষেও তা সতর্কবাণীর মত হয়, এবং উলফ-এর এমন সাজা হল যে এর পরেই তার ফাঁসি হতে পারে, কিন্তু দুর্গের কারাগারে এবার তিন বছর তাকে কঠিন শ্রম করতে হবে।

এই তিনটি বছরও কেটে গেল। সে কারার বাইরে এল। কিন্তু একেবারে নতুন মানুষ হয়ে সে কারাবাস থেকে মুক্তি পেল। কারাগারে ঢোকার সময় সে যে মানুষ ছিল, এখন যেন তার থেকে আলাদা। এই সময় তার জীবনে নূতন অধ্যায় আরম্ভ হল। আমরা তার নিজের কথাই এবার শুনি, যে কথা সে তার আধ্যাত্মিক উপদেষ্টাদের ও আদালতকে বলেছিল এবার শোনা যাক সেই কথা। সে বলল, আমি জেলে গিয়েছিলাম বিপথগামী হয়ে। ছাড়া পেলাম এক নষ্ট চরিত্র হয়ে। পৃথিবীতে এখনও আমার প্রিয় জিনিস কিছু আছে। আমার সব অহংকার হয়ে গেছে আমার লজ্জা। জেলে যখন আমাকে আনা হল তখন আমি তেইশ জন বন্দীর সঙ্গে একত্র ছিলাম, এর মধ্যে দু জন ছিল খুনী আর বাদবাকি সকলে ছিল নামকরা চোর ও বাউণ্ডুলে। আমি ঈশ্বরের নাম করলেই তারা আমাকে বিদ্রূপ করত; আর সেই পবিত্রতা সম্বন্ধে লজ্জাজনক উক্তি করার জন্যে আমার উপর চাপ দিত। তারা আমার সামনে বেশ্যাদের গান গাইত, আমি নির্বান্ধব একটি লোক, আমি ঘৃণায় ও লজ্জায় মরে যেতাম। কিন্তু চাক্ষুষ আমি যা দেখলাম তাতে আমার চক্ষুস্থির। এমন একটা দিন কাটত না যখন জঘন্য কোনো কাহিনী তারা না বলত, আর বীভৎস সব পরিকল্পনা না করত। প্রথমে আমি এদের কথাবার্তা যাতে শুনতে না হয় তার

জন্যে পালিয়ে যেতাম যতটা দূরে সম্ভব। আমি একটু সঙ্গ চেয়েছিলাম, কিন্তু জেলরক্ষীরা আমাকে তা থেকে বঞ্চিত করে। আমার শরীর রুগ্‌ণ, আমাকে কঠিন কাজ দেওয়া হত। আমি একটু সমর্থন চেয়েছিলাম, খুলেই বলি, আমি একটু অনুকম্পা চেয়েছিলাম। আমার বিবেকের সব-কিছু দিয়ে আমাকে তা ক্রয় করতে হয়। এইভাবে অবশেষে আমি অনেক ভীষণ-ভীষণ কাজে অভ্যস্ত হয়ে পড়ি। বছরের শেষের দিকে আমি হয়ে উঠি গুরু-মারা চেলা।

"সেই থেকে আমি যেমন মুক্তিলাভের জন্যে অধীর হয়ে উঠি। সেই রকম প্রতিহিংসা-গ্রহণের জন্যেও ব্যকুল হয়ে উঠি। প্রত্যেকে আমাকে অপমান করেছে, এর কারণ তারা সকলেই ছিল আমার চেয়ে স্বচ্ছল আর আমার চেয়ে সুখী। আমি নিজেকে সাধারণ ন্যায়েরও শহীদ করে তুলি, এবং আইনের শিকার হয়ে দাঁড়াই। কারাগারের পাহাড়ের পিছন থেকে যখন সূর্য উঠত আমি তখন দাঁতে দাঁত ঘষতাম, আর আমার শিকল আছড়াতাম; চওড়া বীথি হচ্ছে কয়েদবাসীর পক্ষে দু-রকমের নরক। আমাদের ঘরের ঘুলঘুলি দিয়ে যে বাতাস শিস দিয়ে ঢুকত, এবং জানালার গরাদে এসে বসত যে চড়াই পাখিটা, মনে হত তারা তাদের স্বাধীনতা নিয়ে আমাকে বিদ্রূপ করেছে। এ'তে আমার কারাজীবন আরও দুর্বিষহ হয়ে উঠত। সেই সময় আমি ক্ষমাহীনতার সঙ্গে শপথ নিয়েছিলাম, মানুষের আকারের যাবতীয় প্রাণীর প্রতি তীব্র ঘৃণা পোষণ করব—আমি সে শপথ রাখতে পেরেছি।"

ভ্যালেনস্টাইন

"ভ্যালেনষ্টাইন 'স ডেথ" (১৭৯৯) হচ্ছে শিলারের তিন খণ্ডে সমাপ্ত নাটকের শেষ খণ্ড। ঐতিহাসিক পুরুষ ভ্যালেনস্টাইনকে নিয়ে এই নাটক। ইনি ত্রিশ-বছরের-যুদ্ধে (১৩১৮-১৩৪৮) ছিলেন রাজকীয় জেনারেল। বাইরে থেকে দেখতে গেলে নাটক যথাযথভাবে ঐতিহাসিক ঘটনারই অনুসরণ করেছে, কিন্তু শিলার এতে তার বাইরের কথাও বলেছেন। তিনি ক্ষমতার এবং তদনুযায়ী কাজের জন্য মানুষের যে সমস্যা ঘটে তার কথাও বলেছেন। রাজনীতির দিক থেকে ভ্যালেনস্টাইন নিজের কাজই করেছেন, তাঁর অনেক উচ্চাভিলাষী পরিকল্পনা ছিল, নিজের আরও ক্ষমতার জন্য তিনি ছিলেন লালায়িত। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যে তিনি গোপনে অনেক কাজের জন্যে

তৈরি হচ্ছিলেন; তিনি এমনভাবে এগোচ্ছিলেন যাতে ঘটনাই তাঁর অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে, প্রকাশ্যে কোনো কাজ করে তিনি নিজেকে জড়িত করতে চান নি। এত সাবধানতা এবং এত সংযম সত্ত্বেও, বস্তুত পক্ষে ঐসব কারণেই তাঁর বিনাশ ঘটে। ইতিহাস তার চক্রে এঁকে পিষ্ট করেছে; অনেক চক্রান্তের তিনি শিকার হলেন, এবং শেষে তিনি নিহত হলেন।

যে স্বগত ভাষণটি আমরা বেছে নিয়েছি তার থেকেই বোঝা যাবে ভ্যালেনস্টাইনের পতন হল কেন। তিনি এমন অবস্থায় পড়েছিলেন যখন দরকার ছিল কাজের ও সিদ্ধান্তের। তিনি জল্পনায়-কল্পনায় অনেক সময় খরচ করেছেন। যে কাজ শেষে এসে তাঁর উপর চাপল তা এত দেরিতে এল যে তা আর নিয়ন্ত্রণ করা গেল না, এবং তাই তাঁর বিরুদ্ধে চলে গেল। এই ঘটনাচক্র থেকে নিজেকে বাঁচাবার জন্যে তিনি চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু তা বিফল হল। ইতিহাসের অপ্রতিরোধ্য গতিই তার নিজের বেগে তাকে পরাস্ত করল। ভ্যালেনস্টাইন ছিলেন এমন মানুষ যিনি পৃথিবীর বাস্তবতাকে স্বীকার করেই চলতে চাইতেন, তাঁর পাশে ছিলেন ম্যাক্স পিকোলোমিনি যিনি রাজনৈতিক ব্যাপারেও নৈতিক আইন মান্য করে তাঁর বিবেকের নির্দেশেই চলতেন। কিন্তু এভাবে চলা অসম্ভব, সুতরাং তিনিও শেষ হলেন।

ভ্যালেনস্টাইন ॥ (নিজের মনেই বলছেন)

এটা কি সম্ভব? আমি আমার আকাঙ্ক্ষা-অনুসারে
আর কি পারি না কার্যে অগ্রসর হতে? পিছু হটা
যদি ইচ্ছা করে থাকি, তাও নয় কিছুতে সম্ভব।
আমি কি এখন করব সেই কাজ, যেহেতু ভেবেছি অনুরূপ,
যেহেতু পারিনি পরিত্যাগ করতে তীব্র প্রলোভন?
স্বপ্ন দিয়ে পূর্ণ করে তুলেছি আমার এই হৃদয় ও মন,
অনিশ্চিত সম্ভাবনা জেনেও হইনি কার্যরত।
উন্মুক্ত রেখেছি পথ সেই অনিশ্চয়তার দিকেই কেবল।
সর্বশক্তিমান, আমি অকপটে করি তা স্বীকার
তোমার নামেই এই স্বীকারোক্তি করি, হে ঈশ্বর,
এমন ভাবিনি আমি, যা ভেবেছি করিনি তেমন।
কেবল চিন্তায় মগ্ন আমি রেখেছিলাম আমাকে।

যোগ্যতা ও স্বাধীনতা আমাকে বিভোর রেখেছিল কল্পনায়।
এটা কি অন্যায়, যদি রাজকীয় বাসনায় সুখ পেয়ে থাকি ?
আমার ইচ্ছা কি এই বুকের নিভৃতে নয় সম্পূর্ণ স্বাধীন ?
যে পথ সত্যই ছিল নিরাপদ, আর পার্শ্বে যার
ছিল পন্থা নিরাপদে প্রত্যাবর্তনের ?
অথচ সহসা এই ভ্রান্তি বলো কে এসে ঘটাল।
পিছনে কোনোই পথ নেই দেখি—উন্মুক্ত প্রান্তর,
এবং আমারি অট্টালিকার কিনারে দেখি উত্তুঙ্গ প্রাচীর
আমার ফেরার পথে হয়ে গেছে কী প্রতিবন্ধক।

(চুপ ক'রে, চিন্তায় মগ্ন হয়ে)

আমি অপরাধী, আমি অস্বীকার করি তা কী করে ?
অদৃষ্টে যা থাক্ তবু সব দোষ নেব মাথা পেতে।
জীবনের দ্বিধা ভাব—সেই তো আমার অপরাধ।
যদিও প্রকৃত কর্মে রত আছি, নির্ভুল হয়েছে যদি কাজ—
তথাপি—তথাপি লোকে ভুল বোঝে আমাকে, এবং
সন্দেহ জানায় যেন আমি ভ্রান্ত পথেই চলেছি।
ওরা আমাকে মনে করে আমি বিশ্বাসঘাতক
প্রকৃতই আমি কী তা ? আমি হাস্যমুখেই থাকতাম
প্রসন্ন দৃষ্টিতে চেয়ে থাকতাম, রাখতাম সংগোপন সব,
কখনো বলিনি রূঢ় কথা। সব সময় জানতাম
আমার সদিচ্ছা ছিল কত স্বচ্ছ কত অনাবিল,
হয়তো কখনো বেশ উত্তপ্তই হয়েছে মেজাজ
বলিষ্ঠ কণ্ঠে কথা বলেছি, যেহেতু কাজ বলিষ্ঠ ছিল না।
কোনো পরিকল্পনার পন্থা অবলম্বন না করে
চলেছি, পেয়েছি তার ফল। আজ সকলে আমাকে
আমার আনন্দময় মূর্তি আর আমার উষ্মার কথা ভেবে
অবশ্যই বলবে আমি কোনো পরিকল্পনা করি নি,
অনেক কৌশলে তারা ধরবে ত্রুটিবিচ্যুতি আমার

সহজে প্রমাণ করবে—আমি অপরাধী। তাই হোক,
নীরবে সে অভিযোগ নেব মাথা পেতে।
নিজেকে জড়িয়ে ফেলতে, নিয়ে আসতে নিজ সর্বনাশ
নিজের হাতেই বুনে তুলেছি যে জাল, সেই জালে
এখন পড়েছি ধরা। একে ছিন্ন করা দায়, ছিন্ন শুধু করা যায়
বাহুবলে কিংবা ঘোর সংঘর্ষে কেবল।

(পুনরায় স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে)

কেমন বদলেছি আমি। যে সাহস একদা আমাকে
দুঃসাহসী কত কাজে উদ্‌বুদ্ধ করেছে সেই সাহস কোথায় ?
নিজেকে বিপদ্‌মুক্ত করতে আত্মরক্ষা করতে হয়েছি অক্ষম ?
সে সাহস জাগে না এখন ! আজ কেন এ বদল !
সে এক ভীষণ বস্তু—যার নাম প্রয়োজন। সেই প্রয়োজনের জন্যেই
নির্ভয়ে মানুষ ঝাঁপ দেয় তার নিয়তির রহস্য অতলে।
আমার হৃদয়-মধ্যে যতদিন আবদ্ধ ছিল তা
ততদিনই সর্বকর্ম ছিল করায়ত্ত। কিন্তু আজ এই ক্ষণে
হৃদয়ের সব ইচ্ছা হৃদয়ের নিভৃত নিবাস
পরিত্যাগ করে ব্যাপ্ত হয়ে গেছে অচেনা জীবনে
চলে গেছে সব শক্তি সুচতুর শক্তিমান প্রভুদের হাতে
যাদের বিশ্বাস করা সমীচীন কেউ মনে করে না কখনো।

(ঘরের মধ্যে দ্রুত পদচারণা ক'রে পুনরায় স্থির ভাবে দাঁড়িয়ে চিন্তা)

এখন নূতন কোন্ অভিযান করবে ভেবে দেখ।
ভেবে দেখ যা ভেবেছ সব ঠিক সংগত চিন্তা কি !
নিশ্চিন্তে ক্ষমতা ভোগ করছে যারা তাদের উচ্ছেদ
করতে ইচ্ছা ? বহু বর্ষ ধরে যারা সিংহাসনে আসীন, এবং
প্রথার প্রসাদে যারা যুগ-যুগ রাজ্য লাভ করে,
সমস্ত জাতির বদ্ধমূল স্থির বিশ্বাসে নির্ভর
ক'রে যারা রাজা হয়, তাদের উচ্ছেদ
করতে ইচ্ছা ? যদি হত এ-সংগ্রাম কেবল শক্তির

যদি হত ক্ষমতার সঙ্গে পাঞ্জা শুধু ক্ষমতার
তবে সে সংগ্রামে ভীত নই। আমি চাই সে সংগ্রাম
যে-কোনো শত্রুর সঙ্গে, যার চোখে রেখে দুই চোখ
সম্পূর্ণ সাহসে ভর ক'রে রত হতে পারি রণে ;
শত্রুও অবশ্য পারে খর্ব করতে আমার বিক্রম।
কিন্তু যার দেখা নেই—অদৃশ্য যে—সেই শত্রু নিতান্ত ভয়ের।
মানুষের মনে মনে আছে যারা, যারা মাত্র বিরোধী আমার।
কাপুরুষ তারা, তারা ঘোরতর ভয়াবহ তাই।
জীবনের পূর্ণ তেজে, জীবনের উদ্যমে-বিক্রমে
পরিপূর্ণ রূপে যারা হয় না বাহির
তারাই সংকেত সর্বকালে ভয়াবহ বিপদের।
এ সবই নীরস আর নির্বিকার, গতকাল এরা চিরকালীন, যা-কিছু
পুরাতন তাই রোজ দেখা দেয় নূতনের সাজসজ্জা প'রে।
অদ্য যা প্রকৃত সত্য ব'লে আছে স্বীকৃত, তা সবই
আগামীকল্যও ঠিক অবিকল সত্যও থাকে কি ?
একঘেয়ে উপাদানে তৈরি হয়ে জন্মেছে মানুষ—
লালন পালন করে তাকে ধাত্রী যত্নে-মমতায়,
সে-ধাত্রীর পরিচয় কিছু নেই, সে হল—অভ্যাস।
বৃদ্ধ অপদার্থদের—যারা পূর্বপুরুষের সম্পদের ভাগী—
ধিক তাকে। বার্ধক্যই যেন মাত্র সম্মানজনক।
বয়সের বিচারেই তাঁরা জ্ঞানী তাঁরা মানী তাঁরা মাননীয়।
সব অধিকার করো, দেখবে তুমি সত্যি অধিকারী,
সমস্ত জনতা এসে সানন্দে জানাবে স্বাগতম্—
দাঁড়াবে প্রহরী হয়ে।

নেদারল্যাণ্ডের বিদ্রোহ

শিলারের ইতিহাস-মূলক "দি রিভোল্ট অব্ দি নেদারল্যাণ্ডস" (১৭৮৮) গ্রন্থে ষোড়শ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে স্পেনের অধিকার থেকে তাঁর দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের কথা বিবৃত আছে। এখানে যে উদ্ধৃতি দেওয়া হচ্ছে তাতে দুটি বিপরীত চরিত্র দেখানো হচ্ছে—এগমণ্ট ও অরেঞ্জ, এঁরা দুজনেই

অভিজাত বংশের নেতা। গোটে তাঁর "এগমণ্ট" নাটকেও এরকম দেখিয়েছেন। অনেকটা এই রকম কিন্তু আরো ব্যাপকভাবে শিলার তাঁর "হিস্টরি অব্ দি থারটি ইয়ার্স" গ্রন্থে বিবরণ দিয়েছেন। এটা অনেকটা ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি দেখা, কিন্তু এই বিষয় নিয়েই শিলার পরে তাঁর ভ্যালেনস্টাইন সংক্রান্ত নাটকে তাঁর কবিসুলভ সার্বজনীন আবেদন প্রকাশ করেছেন।

"অরেঞ্জ অ্যাণ্ড এগমণ্ট" প্রথম খণ্ড থেকে

এগমণ্ট নীতি থেকে বেশি বিশ্বাসী ছিলেন বিবেকের প্রতি। নিজের থেকে তিনি তাঁর মনের কোনো নীতি নির্ধারণ করে নেন্‌নি, নীতি যেন তাঁর মনের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। এইজন্যে কোনো বিশেষ কাজের কথা উঠলেই তিনি সেই কাজ করা থেকে নিজেকে বিরত রাখতেন। তিনি মনে করতেন, মানুষ দু প্রকারের—ভালো ও মন্দ। ভালোমন্দ মিশিয়ে মানুষ হতে পারে না বলে তিনি জানতেন। তাঁর নৈতিক দর্শনে দোষ ও গুণ একত্রে যেতে পারে না, তারা যেন সমান্তরালবর্তী দুটি জিনিস। সুতরাং কোনো বিশেষ একটা গুণ দেখেই তিনি মানুষের বিচার করে ফেলতেন। এগমণ্টের মধ্যে ব্যক্তিত্বের বিবিধ গুণের এমন সমাবেশ ছিল যার জন্যে মানুষ নায়ক হয়। অরেঞ্জ-এর থেকে তিনি ভালো সৈনিক ছিলেন। কিন্তু রাজনীতিজ্ঞ হিসাবে তিনি ছিলেন অরেঞ্জ-এর চেয়ে অনেক নীচে। পৃথিবীটা যেমন অরেঞ্জ তাকে ঠিক তেমনি দেখতেন; কিন্তু এগমণ্ট দেখতেন তাঁর কল্পনার জাদু দিয়ে আচ্ছাদিত আরশির ছায়ার মধ্যে। যেসব মানুষ কেবল ভাগ্যের ফলে আশার অতিরিক্ত ফল পেয়ে যায় এবং কাজের পরিণাম সম্বন্ধে যারা বিশেষ বিচার-বিবেচনা করে না, তারা কার্যকারণ সম্পর্ক সম্বন্ধে কোনো যুক্তির ধার ধারে না। এবং তারা বিশ্বাস করে যে সর্বশক্তিমানের আশ্চর্য ক্ষমতার উপর নির্বাধে নির্ভর করলেই সব ঘটে, এই কথা ভেবে তারা ভুল করেই প্রাকৃতিক ব্যাপারের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে থাকে। যেমন সিজার নির্ভর করেছিলেন তাঁর ভাগ্যের উপর। এগমণ্ট এই ধরণের মানুষ ছিলেন। কৃতজ্ঞতা-প্রকাশের সময় তাঁর গুণের কথা অতিরঞ্জিত করে বলাতে তিনি সেই স্তুতিবাদে বুঁদ হয়ে এমন চলতেন যেন স্বপ্নের ঘোরে চলেছেন। নিজে যে তিনি জনপ্রিয় তা তিনি জানতেন, এইজন্যে কিছুকেই তিনি ভয় করতেন না। ভাগ্য তাঁকে

দিয়েছে এই জনপ্রিয়তা। তিনি খুশি ছিলেন, এবং এইজন্যেই ন্যায়পরায়ণতার উপর তাঁর বিশ্বাস ছিল। এমনকি স্পেনীয়দের সেই মিথ্যা অঙ্গীকারের ভয়ংকর অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও তাঁর মনের এই প্রত্যয়ের কোনো হেরফের হল না, এবং যে মঞ্চে তিনি বসে আছেন সেখানে থেকে তাঁর একমাত্র ভরসা হচ্ছে—আশা। তাঁর পারিবারিক কোনো ব্যাপারে সামান্য আশঙ্কার দরুন তাঁর স্বদেশানুরাগ-জনিত যে বিক্রম, তা যথোপযুক্তভাবে প্রয়োগ না ক'রে তিনি ছোট-ছোট কাজে নিজেকে নিযুক্ত রাখলেন। তাঁর জীবন এবং তাঁর সম্পত্তি সম্বন্ধে একটু ভয়ের কারণ ঘটেছিল; এই জন্যে নিজের দেশের সম্বন্ধে বেশি চিন্তা বা কাজ তিনি করতে সাহস পেলেন না। তাঁর আত্মমর্যাদায় আঘাত করেছিল স্বৈরাচারী শাসনতন্ত্র, সেইজন্যে উইলিয়ম অব্ অরেঞ্জ রাজার সঙ্গে সব সম্পর্ক ত্যাগ করলেন। কিন্তু এগমণ্ট ছিলেন অপদার্থ, তাই রাজার করুণার উপর নির্ভর ক'রে তিনি সম্পত্তি বাড়িয়ে চললেন। অরেঞ্জ হচ্ছেন সারা বিশ্বের একজন ব্যক্তি, আর এগমণ্ট ছিলেন ফ্লেমিঙের চেয়ে ঘৃণ্য —অর্থাৎ দেশের মানুষ হয়েও তিনি যেন বাস করছিলেন বিদেশের মাটিতে।

সৌন্দর্যতত্ত্ব সম্বন্ধে মানুষের শিক্ষা বিষয়ে

"দি এসথেটিক এডুকেশন অব্ ম্যান" হচ্ছে সৌন্দর্যতত্ত্ব সম্বন্ধে শিলারের একটি প্রবন্ধ। এটি লেখা হয় চিঠির আকারে ১৭৯৫ সালে। সংস্কারমুক্ত-বিষয়ে এটা একটি দার্শনিক রচনা, এবং মানুষের অগ্রগতি ও শিক্ষা বিষয়ে শিলারের অভিমত। শিলার মনে করতেন, মানুষ যে আদর্শের জন্যে চেষ্টা করবে তা হচ্ছে মানুষের মনের ঝোঁক যেদিকে তার প্রতি নৈতিক বোধের সমন্বয়। এ আদর্শে পৌঁছবার একমাত্র উপায় হচ্ছে সৌন্দর্যচর্চা, কেননা এতে বস্তুর ও গঠনের সমাবেশ ঘটেছে, এতে ইন্দ্রিয়গত ও আত্মিক ভাবের মিলন ঘটেছে, এবং এরই ফলে লক্ষ্যেও যেন পৌছে গিয়েছে। যে অংশ উদ্ধৃত হচ্ছে তাতে মূল যুক্তিটি দেখানো হয়েছে, এবং রচনাটির সারকথা এ'তে আছে। এই রচনাটির বিশেষ তাৎপর্য এই-যে, সাময়িক রাজনীতি-মূলক সমস্যার (এ ক্ষেত্রে ফরাসী বিপ্লব) সঙ্গে বাস্তবিক ঘটনার মূল্যবোধ ও প্রয়োজনায়তা বিষয়ে শিলারের যেমন শ্রদ্ধা তেমনি শ্রদ্ধা আদর্শবাদী শিল্পকলার সৌন্দর্যের প্রতি—এ'তে তা স্পষ্ট হয়েছে।

দ্বিতীয় চিঠি

তুমি আমাকে যে স্বাধীনতা দিয়েছ তা কি আমি আরও ভালোভাবে ব্যবহার করব না, না, তার চেয়ে বেশি ক'রে স্বকুমার শিল্পের দৃশ্যাবলীর দিকে তোমার দৃষ্টি আকর্ষণ করব? পৃথিবীর সৌন্দর্য শিক্ষার নিয়ম সম্বন্ধে নূতন একটি বই লেখার সময় কি এখন গত হয়নি? এখন পৃথিবীর অনেক আশু সমস্যাই আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে রেখেছে। এবং এ যুগের জরুরি অবস্থা আমাদের দার্শনিক চিন্তাধারাকে এমন ভাবে জড়িত করে রেখেছে যে, সেইটেই কি সবচেয়ে নিখুঁত শিল্পকলার গ্রন্থ হয়ে ওঠেনি? এখন যে রাজনৈতিক স্বাধীনতা গড়ে তোলার সময়।

আমি অন্য কোনো শতকে গিয়ে বাঁচতে চাইনে, অন্য কারও হয়ে কাজ করতে চাইনে। একজন মানুষ যেমন একটা রাষ্ট্রের নাগরিক, তেমনি সে একটা যুগেরও নাগরিক। যদি দেখা যায় যে কাউকে দেখা যাচ্ছে যে, সে যে-পরিবেশে বাস করছে তার আচার-আচরণ ও অভ্যাসের সঙ্গে সে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারছেনা কিংবা সেই পরিবেশ থেকে তাকে আলাদা করে রাখা হচ্ছে, তাহলে সেই সময়ের প্রয়োজন ও রুচি সম্বন্ধে তাকে কিছু বলতে দেওয়া অসংগত বলে বিবেচিত হবে কেন।

এই যে নিষেধ, এটা কোনো রকমেই শিল্পকলার অনুকূলে যেতে পারে না, অন্তত যে শিল্পকলা সম্বন্ধে আমি অনবরত চিন্তা করছি তার অনুকূলে তো নয়ই। ঘটনা যা ঘটছে তাতে প্রতিভাবানদের এমন ভাবে পথ দেখানো হচ্ছে যা শিল্প-কলা আদর্শের থেকে অনেক দূরে সরে যাবারই পথ। এই শিল্পকলা বাস্তবকে পরিহার করবে এবং উপযুক্ত সাহসের সঙ্গে নিজেকে প্রয়োজনের ঊর্ধ্বে তুলে ধরবে। কেননা শিল্প হচ্ছে স্বাধীনতার তনয়া। তার অভিপ্রায় হচ্ছে আধ্যাত্মিক অনুপ্রেরণা থেকে নির্দেশ গ্রহণ করা, বস্তুবাদী জগতের প্রয়োজনের কাছ থেকে নির্দেশ গ্রহণ নয়। কিন্তু এখন প্রয়োজনের দামই বেশি, এবং মানবজাতি এরই নির্মম জোয়ালে কাঁধ পেতে দিতে শিখেছে। ইউটিলিটি (অর্থাৎ কার্যকারিতা) হচ্ছে এ যুগের আদর্শ, এর কাছে সমস্ত শক্তি দাসখৎ লিখে দিয়েছে, এবং এ'কেই মান্য করতে হবে। এইরকম স্থূল ব্যাপারের কাছে আধ্যাত্মিক সব গুণ তার ওজন হারিয়ে ফেলেছে, সব উৎসাহ এর গিয়েছে, এবং এ শতকের বাজারী হট্টগোলের মধ্য থেকে এ অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে। ধীরে-ধীরে দার্শনিক চিন্তাধারাও কল্পনাপ্রবণতার কাছ থেকে

সরে যাচ্ছে, শিল্পকলার সীমা ক্রমে ততই সংকীর্ণ হয়ে আসছে বিজ্ঞান যতই প্রসারিত করছে তার বাহু।

দার্শনিকের এবং অন্যান্য সকলেরও চোখের দৃষ্টি রাজনৈতিক ব্যাপারের দিকে এঁটে লেগে আছে; তারা মনে করছে ঐখানেই মানুষের পরম অদৃষ্টের সব লিখন লেখা হয়ে যাচ্ছে। এসব ব্যাপার থেকে উদাসীন থাকলে সমাজের ভালো করার দিকে মনোযোগ নেই বলে কি তাকে দোষী সাব্যস্ত করা হবে না? নিজেকে মানুষ বলে মনে করে এমন সকলেরই এসব ঘটনার বিষয়বস্তু ও তার ফলাফলের দিকে মনোনিবেশ করা দরকার; কেননা যারা স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে পারে তারা প্রত্যেকেই দেখতে চায় কি ভাবে ব্যাপারটির ফয়শালা করা হচ্ছে। এর আগে ক্ষমতাবানের শক্তি দিয়েই যে প্রশ্নের জবাব দেওয়া হয়েছিল, এখন মনে হচ্ছে যুক্তির কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে তার বিচার করা হবে; এর মধ্যে যে কেউ নিজেকে বিষয়টির মাঝখানে স্থাপন করতে পারবেন এবং 'নিজের বৈশিষ্ট দিয়ে নিজেকে বিশিষ্টতম ক'রে তুলতে পারবেন তিনিই বিবেচিত হবেন বিশ্বের নাগরিক রূপে, এবং সেইসঙ্গে সাফল্যও তাঁর লাভ হবে। এই বৃহৎ আইন-গত ব্যাপারে যে সিদ্ধান্ত হবে সেটা অবশ্য তাঁর ব্যক্তিগত বিষয় নয়। আইন-অনুসারেই তাকে প্রকাশ করতে হবে অভিমত, কিন্তু একজন যুক্তিবাদী মানুষ হিসাবে তিনিই উপযুক্ত ব্যক্তি ব'লে বিবেচিত হবেন, এবং সকলকে পরিচালনার জন্যেই তিনি লাভ করবেন ক্ষমতা।

এই রকম একটা বিষয় নিয়ে আমার অনুসন্ধিৎসা আমার পক্ষে কতটা আনন্দদায়ক হবে, এবং ঐ রকম একজন স্বাস্থ্যোজ্জ্বল মানুষ সম্বন্ধে ভাবতে কতটা আরাম পাব তা অনুমান করা কঠিন নয়। তিনি একজন উদার-মতাবলম্বী বিশ্বনাগরিক, এবং তিনি যে সিদ্ধান্ত নেবেন তা বিপুল উৎসাহের সঙ্গে সমস্ত মানবজাতিই তার কল্যাণের জন্যে গ্রহণ করবে। মনোভাবের এতটা পার্থক্য সত্বেও এবং পৃথিবীর ঘটনাচক্রে এ রকম একজন ব্যক্তির থেকে অনেক দূরে বাস করলেও এ রকম একজন ব্যক্তির কথা চিন্তা করার মধ্যেও অনেক আরাম আছে। আমি যে এই লোভনীয় প্রলোভন ত্যাগ ক'রে স্বাধীনতার আগে সৌন্দর্যকে বসাতে চাচ্ছি তার কারণ আমার পক্ষপাত নয়, আমার নীতি। আমি আশা করি তুমি নিশ্চয় বুঝতে পারবে যে, প্রয়োজনের ক্ষেত্রে এর তেমন দাম না থাকলেও এ যুগের রুচির ক্ষেত্রে এর মূল্য অনেক।

রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান করা তো দরকারই, কিন্তু সৌন্দর্যবোধের দ্বারা চালিত হয়েই ঐ সমস্যার সমাধান করা কর্তব্য। এর কারণ সৌন্দর্যের মধ্য দিয়েই স্বাধীনতায় পৌঁছনো যায়। কিন্তু এ কথা উল্লেখ না করলে আমার কথা ঠিক প্রমাণ করা যাবে না, তোমাকে মনে করে দিতে চাই যে, সব রকম রাজনৈতিক আইন-প্রণয়নের ক্ষেত্রে যুক্তি প্রয়োগ করতে হবে বিশেষ-বিশেষ নীতির উপর নির্ভর করেই।

একটি চিঠি

১৭৯৩ সালের একটি চিঠিতে, কাণ্টের মতই শিলার বলতে চেয়েছেন যে সংস্কারমুক্তির জন্য মানুষকে বরাবর কাজ করে যেতে হবে। কিন্তু কাণ্টের বক্তব্যের সঙ্গে তাঁর বক্তব্যের পার্থক্য এই যে, শিলার বলছেন, সংস্কারমুক্তির কাজ পুরোপুরিভাবে না-হবার কারণ কেবল মানুষের "অসুস্থতা" ও "কাপুরুষতা" নয়; এর অন্যতম কারণ মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের চাহিদা। এইজন্যেই শিলার জোর দিয়ে বলেছেন যে, সব প্রথম মানুষের প্রাত্যাহিক প্রয়োজন মেটানো দরকার, তার পরেই মানুষ আধ্যাত্মিক ও নৈতিক শিক্ষার দিকে মন দিতে পারে—এই অভিমত জার্মান সাহিত্যে অনেক বার প্রকাশিত হয়েছে, অবশেষে বারটোল্‌ট্‌ ব্রেখ্‌ট তাঁর "থ্রিপেনি অপেরা" নাটকে কথাটা এইভাবে বলেছেন—"আগে দাও খাদ্যসামগ্রী, নীতিকথা পরে হবে।"

একটি জাতিকে কিভাবে সংস্কারমুক্ত করা যায়

মানবজাতির বেশির ভাগ লোকই তার জীবনধারণের উপযোগী রসদ জোগানোর জন্যে কঠিন পরিশ্রম করতে করতে এমনই ক্লান্ত ও শ্রান্ত হয়ে পড়েছে যে, কোনো কাল্পনিক ব্যাপার নিয়ে চিন্তা করার সময়ই তার নেই। মানুষের মধ্যে যতটা শক্তি থাকতে পারে তা তার প্রাত্যহিক প্রয়োজন মেটাবার উদ্বেগেই খরচ হয়ে যায়; অনেক পরিশ্রম ক'রে সে যদি তার চাহিদা কিছুটা পূরণ করতে পারল, তখন আর কোনো মানসিক কাজ করা তার পক্ষে সম্ভব নয়, তখন তার যা প্রয়োজন তা হচ্ছে বিশ্রাম। তার নিজের পক্ষে চিন্তা করা সম্ভব নয়, এ কথা জেনেই সে স্বেচ্ছায় তার হয়ে চিন্তা করার দায় অন্যকে দিয়ে দেয়। এই ভাবে চোখ বুজে অন্যের বুদ্ধির উপর সব ছেড়ে দিয়ে সে নিশ্চিন্ত থাকে, এমনকি তাঁদের বিচার কিরকম হল তা পরখ করে

দেখার প্রয়োজনও তার কাছে রুচিকর মনে হয় না। যদি তার মাথায় বা মনে কোনো উচ্চচাহিদার কথা এসে যায় তখন রাষ্ট্র বা পাদ্রীরা তাদের জন্যে যে ফরমূলা তৈরি রেখেছেন তারা সেই অভিমতই অন্ধবিশ্বাসে মেনে নেয়। এবং এই মনোভাব দিয়েই পুরাকাল থেকে তাঁদের জ্ঞাতিকুলের মধ্যে স্বাধীনতার প্রেরণা তারা দিয়ে চলেছে।

সকলেই অবশ্য লক্ষ্য করেছে যে, সবচেয়ে নিপীড়িত যে মানুষ সে'ই সবচেয়ে অজ্ঞ। সুতরাং একটি জাতিকে সংস্কারমুক্ত করতে হলে তার জীবনধারণের মান উন্নয়ন করতে হবে। প্রথমত, প্রয়োজনের জোয়াল থেকে তাকে মুক্ত করতে হবে, তার পর তাকে নিয়ে আসতে হবে যুক্তিপ্রয়োগের স্বাধীনতায়। এই জন্যেই রাষ্ট্রের সর্বপ্রধান কর্তব্য হচ্ছে দেশবাসীর জীবনে স্বাচ্ছন্দ্য আনয়ন করা। তার জীবনধারণের স্বাচ্ছন্দ্যের উপরেই যদি মানুষের মনের পরিণত অবস্থা নির্ভর না করত, তা হলে এ দিকে মনোযোগ দেবার কোনো দরকারই হত না। অনেক মানুষ পেট ভ'রে খেয়ে ও আরামে বাস ক'রেও সামান্য মানুষ হয়েই আছে, কিন্তু মানুষকে পেট ভ'রে খাইয়ে যেতে হবে এবং আরামে বাস করতে দিতে হবে—তাহলেই তার ভিতরে যে সংগুণ আছে তার বিকাশ ঘটতে পারবে।

(প্রিন্স ফ্রায়েডরিখ ক্রিশ্চিয়ান ফন হল্স্টেইন-সোণ্ডারবার্গ-অগস্টেনবার্গকে ১১ নভেম্বর ১৭৯৩ তারিখে লেখা চিঠি থেকে)

জর্জ ফর্স্টার

ফরাসী বিপ্লব সম্বন্ধে কয়েকটি চিঠি

জর্জ ফর্স্টার (১৭৫৪-১৭৯৪) ছিলেন একজন ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক ও গ্রন্থাগারিক। তিনি প্রাণীতাত্ত্বিক, ও মানবজাতিতাত্ত্বিক রূপে অনেক দেশ ভ্রমণ করেছেন, এবং অনেক ভ্রমণকাহিনীতে তিনি তাঁর অভিজ্ঞতার কথা লিখে গিয়েছেন। বিভিন্ন স্থানের তুলনামূলক বিবরণ ও মানবজাতিতত্ত্ব ছাড়াও তাঁর লেখা শিল্পের ইতিহাস সংক্রান্ত বইও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ফরাসী বিপ্লব সম্বন্ধে তাঁর বেশ উৎসাহ ছিল, মেইনৎস শহরের রিপাবলিকান পার্টির সহকারী হিসাবে তিনি ১৭৯৩ সালে প্যারিসে যান ফ্রান্সের রাজনৈতিক

একীকরণের প্রস্তাব নিয়ে। এর ফলে জার্মানীতে প্রবেশ তাঁর নিষিদ্ধ হয়; এবং এক বছর পরে তিনি সঙ্গীহীন ভাবে ও শোচনীয় ভাবে প্যারিসে মারা যান।

১৭৮৯ সালে লেখা তাঁর চিঠিপত্র অর্থাৎ বিপ্লবের প্রথম দিকে লেখা চিঠি ও ১৭৯০ সালে লেখা চিঠি থেকে তাঁর অদম্য উত্মমের পরিচয় পাওয়া যায়। ১৭৯৩ সালে ফর্স্টার যখন প্যারিসে ছিলেন এবং খুব নিকট থেকে সব ঘটনা প্রত্যক্ষ করছিলেন, তিনি তখনই বিপ্লবের অসাফল্য ও তার আনুষঙ্গিক প্রতিক্রিয়া কি হতে পারে তা বুঝতে পেরেছিলেন, তিনি এও উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন এর ফলে ডিক্টেটরশিপের পত্তন হবে; কিন্তু তবুও তিনি এই বিপ্লবের ঐতিহাসিক গুরুত্ব স্বীকার করেছেন, যদিও তিনি জানতেন যে এর দ্বারা জনসাধারণের আশু কোনো কল্যাণ হবে না। তাঁর শেষ চিঠিতে ফর্স্টার বুঝিয়ে দিতে চেয়েছেন যে, নৈতিক শিক্ষা রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের জন্য প্রথম-প্রয়োজন, এবং ঐ স্বাধীনতার ফলও নৈতিক শিক্ষা। এবং এমনকি (এটা জার্মানীর পক্ষে প্রযোজ্য) দরকার হলে স্বাধীনতার পরিবর্তেও এর প্রয়োজন আছে।

মেইনৎস থেকে
হেইনে' কে

মেইনৎস, ৩০ জুলাই ১৭৮৯

ফ্রান্সের এই বিপ্লব সম্বন্ধে তুমি কী ভাবছ? ইংলণ্ড এ ব্যাপার বেশ স্বচ্ছন্দে ঘটতে দিচ্ছে, এটা যেমন আনাড়ির মতন মনে হচ্ছে, তেমনি মনে হচ্ছে, এ'তে রাজনীতি যেন নেই। তুই কোটি দশ লক্ষ লোক নিয়ে রিপাবলিক ইংলণ্ডের যতটা ক্ষতি করতে পারবে, স্বেচ্ছাচারী রাজা তাঁর সমস্ত প্রজা নিয়েও ততটা ক্ষতি করতে পারবেন না। কিন্তু দেখতে বেশ মজাই লাগছে যে, যে চিন্তা মাথায় গজালো এবং তার ফলে রাষ্ট্রে কাজ হতে লাগল তদনুযায়ী, যার নাকি কোনো দৃষ্টান্তই খুঁজে পাওয়া যাবে না—সেই সম্পূর্ণ রূপান্তরকরণের ঘটনায় কত সামান্য রক্তপাত হল ও ক্ষতিসাধন হল। তাহলেই বোঝা যাচ্ছে মানুষকে তাদের প্রকৃত সুবিধা ও অধিকার সম্বন্ধে সচেতন করাই হচ্ছে সবচেয়ে জরুরি কাজ; এর পরেই স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে বাদবাকি কাজ হতে থাকবে।

হেইনে' কে মেইনৎস, ১৩ জুলাই ১৭৯০

ফ্রান্সের মধ্য দিয়ে দ্রুত ঘুরিয়ে বেড়িয়ে অন্তত এ বিষয়ে আমাকে আমি নিশ্চিত হতে পেরেছি যে, কোনো রকম প্রতি-বিপ্লবের কথা ভাবাই যায় না। সব শান্ত আছে, নূতন ইন্সটিটিশনের যে সাফল্য ঘটবেই সব দেখে তাই মনে হয়। সাধারণ মানুষের মধ্যে যে উদ্যম দেখছি তা অপূর্ব। বিশেষ করে শ্যাম্প দ্য মার্‌স' এর কিনারে—এখানে বিরাটাকারে জাতীয় উৎসবের তোড়জোড় চলেছে। ব্যক্তিবিশেষের সুখ-সুবিধার দিকে দৃষ্টি না দিয়ে সমস্ত শ্রেণীর মানুষ এত সহজ ও সরল ভাবে এমন ভাবে কাজ করছে যাতে সকলের সমান কল্যাণ হতে পারে। অনেকেই এসে আমাকে বলছে যে আমাদের অনেক কষ্ট স্বীকার করতে হচ্ছে, আমরা এখন অনেক অসুবিধা নিয়ে লড়াই করছি। এমন কি আমাদের সম্পত্তির পরিমাণও অনেক কমিয়ে দেওয়া হবে; কিন্তু আমরা জানি এজন্যে আমাদের সন্তান সন্ততিরা আমাদের ধন্যবাদ দেবে, কেননা এ সবের জন্য তারাই সুবিধা পাবে। এতে আত্মত্যাগই বলা যাক, এর মধ্যে সত্যকার নীতিপথ অনুসরণ করা থেকে বঞ্চিত হওয়াও আছে, তা যাই হোক, এর পরিণামে একটা উৎকৃষ্টতর ভবিষ্যৎই দেখা দেবে।

ফ্রান্স থেকে
নিউস্খাটেল-এ স্ত্রীর কাছে প্যারিস, ৫ এপ্রিল ১৭৯৩

আমি আগে যা বলেছি এখনো তাই বলি—এই বিপ্লবকে সেই মানুষের সুখ বা দুঃখের সঙ্গে জড়িয়ে যেন বিচার না করে। কিন্তু এ'কে যেন মনে করে মানবজাতির মধ্যে পরিবর্তন আনার এ হচ্ছে ভাগ্যের পরীক্ষা মাত্র। আমি ফ্রেঞ্চদের চরিত্র নিয়ে যেমন খুশি না, তাদের শত্রুদের চরিত্র নিয়েও না, পাশাপাশি ওদের দোষ ও ত্রুটি লক্ষ্য করে, আমি বুঝতে পারছি ওদের ভালো গুণ কী আছে। কোনো একটি জাতিকে আমি আদর্শ ব'লে মনে করি নে। সকলকে একত্র করলেই সর্বশ্রেণীর একটা জনতা তৈরি হয়। ফরাসিদের উপর এখন ভার পড়েছে—এ ভার হয়তো তাদের শাস্তিই—এই বিপ্লব চালিয়ে যাবার জন্যে, এবং এই বিপ্লব ভবিষ্যতের জন্যে যা-কিছু কল্যাণ করতে পারবে তার জন্যে এখন শহীদ জোগান দিতে হচ্ছে তাদের। লুথারের আমলে অনেকটা এইভাবেই সর্বজনের কল্যাণের খাতিরে জার্মানরা শহীদ হয়েছিল,

কেননা তারা রিফরমেশন (সংস্কারসাধন কাজ) গ্রহণ করেছিল, এবং তা রক্ষা করার জন্য রক্তদান করেছিল।

প্যারিস, ১৩ এপ্রিল ১৭৯৩

এখানকার চক্রান্তের গোপন রহস্য যতই কেউ জানতে পারবে, কিংবা আর একটু বিশদভাবে বলা যেতে পারে, যতই কেউ এখানকার ঘৃণ্য গোলক-ধাঁধার সঙ্গে পরিচিত হবে ততই সে দেখবে সব জিনিস এখানে কীভাবে ওলটপালট হচ্ছে ডিগবাজি খাচ্ছে, এবং ততই তাকে নির্বিকার ও নির্লিপ্ত হয়ে যেতে হবে, কেননা এরকম না হলে যাকে বলা হচ্ছে ভারচু বা মহৎ গুণ সেসব দেখে হতাশ হতে হবে এবং শান্তভাবে ঈশ্বরের বিচারের উপর নির্ভর করে কল্যাণকর পরিণতির জন্যে অপেক্ষা করতে হবে। সম্প্রতি আমি বেশ ঘা খেয়েছি। যেটুকু বাকি ছিল তাও হল। আমি একটা অসম্ভবের হাতে আমার সমস্ত শক্তি অর্পণ করেছি, যে কাজ কেউ সৎ ব'লে মনে করেনা আমি সততার উদ্যম নিয়েই তার জন্যে কাজ করেছি, এটা নাকি উন্মাদনার আতিশয্যের একটা মুখোশ মাত্র—এই অপরাধে আমি অপরাধী বলে সাব্যস্ত হয়েছি। এর থেকেই প্রমাণ হচ্ছে যে, আজকাল পরার্থপরতা ও স্বাধীনতার প্রতি অনুরাগ হচ্ছে কেবলমাত্র শিশুদের হাতের ঝুমঝুমি, কেবলমাত্র ফাঁকা আওয়াজ—যাঁরা জাতির ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করছেন, এসব হচ্ছে তাদের মুখের কপট অভিসন্ধিরই বুকনি। বোঝা যাচ্ছে যে, যেখানে লোকে আশা করেছিল আত্মোৎসর্গ সেখানে দেখা দিয়েছে আত্মগরিমা। এ কথা সত্য যে প্রতারক ও প্রতারিত—এই দুইয়ের মধ্যে কোনো তৃতীয় ব্যক্তি পাওয়া যাবে না যার উপর একটু নির্ভর করা যেতে পারে, কিন্তু যার সঙ্গে কেউ নিজেকে যুক্ত করতে পারে। আমাদের যে প্রচণ্ড চাপ এসে পড়েছে তা সহ্য করার জন্যে উপযুক্ত সাহস দরকার, প্রত্যেকের চেতনার মধ্যেই যা লুকানো আছে, এবং যার দরুণ মানবজাতির প্রতি ও তার প্রজ্ঞার প্রতি বিশ্বাস নষ্ট হয় না।

প্যারিস, ১১ মে ১৭৯৩

মানবজাতির ভাগ্যচক্র নিয়ন্ত্রণের পক্ষে এই বিপ্লবের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আমি এখন নিশ্চিত। আমি বিশ্বাস করি এটা ঘটা কেবল দরকারই ছিল না, এর ফলে আত্মোন্নয়নের ক্ষমতা সঞ্চারিতও হবে, নূতন ধারণার উদ্ভবও হবে।

সাধারণ বা সহজ পন্থা ছেড়ে দিয়ে ফরাসী জনসাধারণ নূতন ধরণের কর্মোদ্যমে নিজেদের নিয়োগ করেছেন। মানবিক কোনো ব্যাপারে যাঁরা বিশেষ মাথা ঘামান নি, এবং যাকে সুখ বলে এর দ্বারা তেমন কোনো জিনিসের সাক্ষাৎ তাঁরা পেয়েছেন কিনা—এ সম্বন্ধে যাঁদের কোনো অভিজ্ঞতা নেই, তাঁরা প্রশ্ন করতে পারেন, এই নূতন কর্মোদ্যম ভালো কি না। মানুষ যেমন কর্ম করে তেমনই ফল পায়, কখনো পায় আনন্দ, কখনো বা বেদনা। ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার ঘাত প্রতিঘাত বয়ে চলেছে অনবরত, আবেগ ও ভাবাবেগ নানাভাবে পরস্পরের মিলন বিচ্ছেদ ঘটিয়ে চলেছে, এই ভাবেই গড়ে উঠছে আমাদের অস্তিত্ব—এ ধরণের অস্তিত্ব আমরা চাই কি না-চাই আমাদের তা জিজ্ঞাসা করা হয় না। আমরা যা-কিছু করব তার মধ্যে নীতিবোধ আনাই যেন আমাদের কাজ, এবং এর ফলে ভুগব বিবেকের দংশনে। এই নীতিগত কাজটি ব্যক্তিবিশেষের করণীয়, যার প্রতিক্রিয়া তার নিজের উপরেই হয়। এইজন্যে আমি সেই সজ্জন স্বপ্নবিলাসীদের স্বপ্নের কথা শুনে হাসি, তাঁরা এমন সুখরাজ্যের স্বপ্ন দেখেন যেখানে কেবল সৎ বুদ্ধিমান ও সুখী মানুষেরই বাস, কেননা সেখানে একটা স্বাধীন শাসনতন্ত্র আছে। একথা সত্য যে, স্বাধীনতাই মানুষকে তার শক্তির সদ্ব্যবহারে সাহায্য করে, কিন্তু এ সত্ত্বেও এ ব্যাপারটা কখনো-কখনো আবার এক-তরফা হয়ে যায়। খুব বেশি বললে বলা চলে যে, একটা ত্রুটিপূর্ণ শাসনতন্ত্রের চেয়ে উৎকৃষ্ট শাসনতন্ত্রের অধীনে যে কাজ করা যায় বা যে দুঃখ ভোগ করা হয় তার পরিণামে একটা নৈতিক মূল্যবোধের দিকেই অগ্রসর হওয়া সম্ভব। কিন্তু নূতন তন্ত্রের কথা উঠল কেন এ প্রশ্নের প্রথম উত্তর এই যে আগেরটি অকেজো ও অচল হয়ে গিয়েছে, এর ফলে ক্ষমতা প্রয়োগে দ্বিধা এসে যাচ্ছে, এবং সব জিনিসের মধ্যে নতুন ক'রে একটা গতি এনে দেবার জন্যে একটা প্রবল ধাক্কা দেবার দরকার হয়েছে। ফ্রান্সের লোকেদের ভাগ্যে এখন থেকে অনেক দিন পর্যন্ত তথাকথিত সুখও আসবে না, তারা শান্তির দেখাও পাবে না ব'লে আমার মনে হয়। যারা অন্য ব্যাপারের উপর খুব বেশি নির্ভর করে ছিল তারা এখন বুঝবে যে, পুনরায় আরও স্বাধীনভাবে বাঁচাটা একেবারে বাহিরের জিনিস, কেবলমাত্র শক্তির উপভোগ মাত্র, তারা বুঝবে যে, কোনো জিনিসই চিরস্থায়ী নয়। অনেক দিন ধ'রে ইউরোপ এই উত্তেজনা ঠাণ্ডা করে দেওয়ার জন্যেই কাজ করে যাবে।

প্যারিস, ৪ জুন ১৭৯৩

এখানে সব শান্ত···আমার মনে হচ্ছে একটি প্রজাতন্ত্রে যা-কিছু উন্মাদনা, বিশেষ করে যা-কিছু উত্তেজনা তার সবকিছুই কিছুকালের মধ্যে ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। এ কথা সকলে উপলব্ধি করার আগে যদি কোনো এক-নায়কত্বের আবির্ভাব ঘটে, আমি তাতে বিস্মিত হব না। কিন্তু এসব জিনিস কবে বিলীন হয়ে যাবে শূন্যে! এটা এখন অসম্ভব বলে মনে হচ্ছে না যে, কোনো বিদেশী শক্তি ফ্রান্সে এসে ঢুকতে পারে, গত বছরের চেয়ে অনেক বেশি অভ্যন্তরে ঢুকে যেতে পারে, তবুও সেজন্যে এই প্রজাতন্ত্রের পতন ঘটবে না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এর ফলে বিপরীত ব্যাপারই হবে, এতে ফ্রান্স আরও শক্ত হয়ে দাঁড়াবে এবং স্থায়িত্ব অর্জন করবে। কতদিন এ অবস্থা থাকবে তা সেনাবাহিনীর অগ্রগমনের উপরেও যেমন নির্ভর করছে না তেমনি ন্যাশনাল কনভেনশনের উপরেও নির্ভর করছে না।

প্যারিস, ২৩ জুন ১৭৯৩

তিন মাস এখানে দর্শক হিসাবে থাকার পর এখানে কি ঘটছে সে সম্বন্ধে উৎসাহের সঙ্গে কিছু বলা বা চিন্তা করা সম্ভব নয়। অনেক জোরালো বক্তৃতার পিছন থেকে উঁকি দিচ্ছে আত্মস্বার্থ। সর্বত্রই এটা ঘটছে। এর ব্যতিক্রমও অবশ্য আছে। অল্প যে কয়েকজন আন্তরিক ভাবেই অন্যের মঙ্গলের কথা ভাবছে তারা, কিন্তু ক্ষমতার তৃষ্ণা যাদের প্রবল তারা এদের ঘৃণা করছে। যারা বন্দী হয়েছে তাদের মধ্যে প্রকৃত সৎ ব্যক্তি নাকি অনেক আছে। এই বিপ্লবের একটি লজ্জাজনক ব্যাপার আছে, সেটা হচ্ছে ফাঁসির আদালত। এ সম্বন্ধে আমার ভাবতেও ভালো লাগে না। এসব ঘটনা যখন অতীতের হয়ে যাবে তখন অনেকে ইতিহাস খুঁজে হয়তো পাবেন যে, এতে বেশ শুভফল ঘটেছিল। কিছু শুভ অবশ্যই ঘটেছে, কিন্তু এ শুভকাজ ওরা কেউ করে নি, এটা ঘটে থাকলে ঘটেছে ঘটনাচক্রে অনুষ্ঠিত ঐ বিপ্লবের জন্যেই। কিন্তু এখন যা দেখছি তা মর্মভেদী, এবং সমকালীন লোকের কাছে এ দৃশ্য কেমন নগ্ন। এ সম্বন্ধে আমরা সম্ভবত শান্তির সময়ে কথা বলতে পারব।

প্যারিস, ২৬ জুন ১৭৯৩

···রাজনৈতিক স্বাধীনতা পেয়ে মানুষ যা হতে চায়, আমরা তো এখন তা আছি, অনেক দিন থেকেই এমন আছি, এবং ক্রমশ আমরা আরও বেশি করে

তা'ই হচ্ছি। অর্থাৎ নৈতিক ভাবে আমরা মুক্ত। মানুষকে স্বাধীনতা দেওয়া, কিংবা তাকে স্বাধীনতা দেবার কথা ভাবা হচ্ছে একটা মস্ত পাগলামো। যদি এ জিনিস দিয়েও তাদের বুনো ক'রে রাখা হয়, এবং নৈতিক উৎকর্ষ লাভের জন্যে তাদের শক্তিকে নিয়োগ করতে দেওয়া না-হয়। কেবল এইজন্যেই রাজনৈতিক স্বাধীনতা দরকার। আমি মনে করি যে, একটা স্বাধীন রাষ্ট্রেই মহৎগুণ ব্যাপকভাবে বিস্তৃত হয়ে পড়তে পারে। কিন্তু ব্যক্তিবিশেষের কথা ধরতে গেলে, যে অবস্থার মধ্যে আমরা জন্মেছি অথবা পৃথিবীতে বাস করছি তাতে আমাদের সুবিধাভোগী কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে, যারা স্বাধীন শাসনতন্ত্র ছাড়াই কিংবা অস্বাধীন শাসনতন্ত্রের সাহায্যেই সেই লক্ষ্যে পৌঁছবার চেষ্টা করে চলেছে। শৃঙ্গলিত অবস্থায় আমরা স্বাধীন, অন্ধকারাচ্ছন্ন কারাগারে আমাদের এ স্বাধীনতা, এইজন্যে রাজনৈতিক স্বাধীনতা না পেয়েও আমরা তাদের মতন অনুযোগ করব না যারা আমাদের মতন নয়। আমাদের কাছে এ অবস্থা বেশ শ্রদ্ধেয় বলে মনে হচ্ছে, এর কারণ আমাদের দেশবাসীর তাতে কল্যাণ হবে। রাজনৈতিক স্বাধীনতা সবচেয়ে কাম্যবস্তু বলে দৃঢ়প্রত্যয় থাকা সত্ত্বেও তারা তা অর্জন করতে পারছে না দেখে আমরা বেদনাবোধ করি। নিজেদের দাবি জানাবার জন্যে যখন তারা শক্তি প্রয়োগ করতে পারে না তখনই দুর্বৃত্তেরা এসে তা হরণ করে নেয়। কিন্তু এজন্যে দুঃখ করলে কোনো ফল ফলবে না, এবং সোজাসুজিভাবে আমরা যদি এজন্যে প্রয়াস করে চলি তাতেও কাজের কাজ কিছু হবে না। সোজাসুজিভাবেই, নির্ভুল ধারণা সকলের মধ্যে ব্যাপ্ত ক'রে দেওয়া, উপকার বর্তাতেপারে এমনজ্ঞান সর্বত্র ছড়িয়ে দেওয়া, প্রত্যেকের চিন্তার পথ প্রশস্ত করে দেওয়া, এবং চেতনা জাগ্রত করে দেওয়া—এসব যদি করিতে পারা যায় তখনই আরম্ভ করা যাবে কার্যকর পন্থা অগ্রসর হওয়া—এইটেই জার্মানীর পক্ষে নিশ্চিতভাবে সবচেয়ে নিরাপদ পথ।

ঝাঁ পাউল

ঝাঁ পাউল—পুরো নাম জোহান পাউল ফ্রায়েডরিখ রিচার (১৭৬৩-১৮২৫), তাঁর বিবরণমূলক রচনার জন্য একজন প্রায় অদ্বিতীয় লেখক রূপে গণ্য হয়েছেন। তাঁকে কোনো বুদ্ধিবাদী বা সাহিত্যিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত লেখক হিসেবে ধরা যায় না, কিন্তু তিনি এ রকম সব আন্দোলনেই যোগ

দিয়েছিলেন। তাঁর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে—বিষয়-নির্বাচনে তাঁর বল্‌গাহীন কল্পনার দৌড়, এবং তাঁর লিখনভঙ্গিও তদ্রূপ। একটু রসাত্মক ভাব, কিছুটা অদ্ভুত কিংবা একেবারেই সাদাসিধে কাহিনী—সবই তিনি বেশ রসিকতার মেজাজে ও সহানুভূতির সঙ্গে রচনা করেছেন। কিন্তু তিনি জীবনের সামান্য কোনো ব্যাপারে তেমন আগ্রহী ছিলেন না; বিশেষ ক'রে তাঁর বড়-বড় উপন্যাসে তিনি অনেক গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার উপর আলোকপাত করেছেন, যদিও এ আলোক সর্বত্র তেমন উজ্জ্বল নয়, যেমন বাস্তবতা থেকে আদর্শকে তিনি অনেক দূরে সরিয়ে ফেলেছেন, মানুষের প্রকৃত শিক্ষা ও তার লক্ষ্যস্থল কিংবা বিশ্বাসের কার্যকারিতা।

মৃত যিশুখ্রীষ্টের প্রদত্ত বক্তৃতা

"স্পীচ ডেলিভার্ড বাই দি ডেড ক্রাইস্ট ফ্রম দি ওয়ার্লড বীলডিং সেইং ছ্যাট দেয়ার ইজ নো গড" (১৭৯৬) রচনাটি দেখাচ্ছে নিজের মৃত্যুর অনিশ্চয়তার দ্বারা তিনি কতটা যন্ত্রণা ভোগ করেছেন এবং ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে তাঁর সন্দেহ ছিল কতটা। তাঁর হতাশা ও মনের বিশ্বাসের অভাব বোঝাবার জন্যে এই স্বপ্নের মধ্যের বক্তৃতার পরিকল্পনা তাঁর নয়; কিন্তু শেষের সে ভয়ংকর দিনের বর্ণনা দিয়ে মানুষের ধর্ম-বিশ্বাস সমর্থন করার জন্যই এই বক্তৃতার পরিকল্পনা। ঝাঁ পাউল তাঁর এই স্বপ্নে তাঁর কল্পনাকে একেবারে বল্‌গাহীনভাবে ফুটিয়ে দিয়েছেন, এবং জোরালো ভাষায় শেষের দিনে পুনর্জীবন-লাভের ভয়াবহতার চেহারা দেখিয়েছেন। ঈশ্বরের অস্তিত্বেরই প্রতীক হলেন যিশুখ্রীষ্ট; অথচ তিনিই ঘোষণা করছেন যে, ঈশ্বর ব'লে কিছু নেই। যখন ভয়াবহতা চরমে পৌছেছে এবং অসহনীয় হয়ে উঠেছে, তখন ঘুম ভেঙে গেল স্বপ্নাতুরের এবং তিনি তখন আনন্দে চীৎকার করে উঠলেন, শান্তিময় পৃথিবীতে ঈশ্বরে তাঁর বিশ্বাস ফিরে এল। কিন্তু তাঁর অবিশ্বাসের ইতি হলনা, কেননা চরম পরিণতি সম্বন্ধে কোনো পরম নিশ্চয়তাই নেই। এর পরে মনে যে পরিচ্ছন্ন চিন্তাটি এল, তা হচ্ছে এই যে, সম্ভবত ঈশ্বরের অস্তিত্ব হচ্ছে মানুষের মনে, সেখানেই তিনি আছেন, মানুষ যখন একাকী নির্জনে বসে জীবনের শান্তির সাধনা করে তখনই পায় ঈশ্বরকে।

পৃথিবীর পান্থশালা থেকে মৃত যিশুর ঘোষণা—ঈশ্বর নেই।*

মুখবন্ধ

এই গল্পটির উদ্দেশ্যই হচ্ছে ঔদ্ধত্যের কৈফিয়ত দেওয়া। মানুষ ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করে সেই সামান্য আবেগটুকু দিয়েই যেটুকু আবেগ তাদের সম্বল। আমাদের চিন্তা করার যে সুন্দর পদ্ধতিটি আছে, সেই পদ্ধতি প্রয়োগ করে আমরা করি কী? আমরা কতকগুলো শব্দ সংগ্রহ করতে থাকি, কখনো-বা বেশ ভারি-ভারি শব্দ—বড় বড় মেডেলের মত যার আকার। লোভী মুদ্রা-সংগ্রাহকের মতন আমরা এই কাজ করি; তার পর মুদ্রা ভাঙিয়ে যেন ক্রয় করি আনন্দ। মানুষ বিশ বছর ধরে আত্মার অবিনশ্বরতায় বিশ্বাস করতে পারে, কিন্তু একুশ-তম বর্ষে তার মনে হয় একটা মহৎ মুহূর্ত এসে গিয়েছে, তখন সে চমকিত হয়ে ওঠে, তার বিশ্বাসের মধ্যে এতখানি মূল্যবান ঐশ্বর্য আছে তা বুঝেই তার বুঝি এই চমক, যেন একটা কেরোসিন-ডিবের শিখা থেকে বিচ্ছুরিত তাপে তার মেজাজ বেশ উষ্ণ হয়ে ওঠে।

ঠিক ঐ ভাবেই এক বিষাক্ত বাষ্প দেখে আমি ভয়ার্ত হয়ে উঠেছিলাম, এই বাষ্প মানুষের শ্বাস প্রায় রুদ্ধ করে দেয় এবং সেই অবস্থায় সে জীবনে সব প্রথম গিয়ে প্রবেশ করে নাস্তিকার মতবাদে পূর্ণ এক বিশাল অট্টালিকায়। ঈশ্বরকে অবিশ্বাস করে আমি যতটা কষ্ট পাব তার চেয়ে অনেক কম কষ্ট পাব অমরতাকে অস্বীকার করে। অমরতাকে অস্বীকার করলে আমার বিশেষ ক্ষতি হবে না, পৃথিবীকে কেবল দেখব কুজ্ঝটিকাময়; কিন্তু ঈশ্বরকে অবিশ্বাস করলে আমি ইহজগৎকেই হারাব, অর্থাৎ কিনা ঐ সূর্যকে। নিরীশ্বরবাদীদের হাতে সমস্ত আধ্যাত্মিক সৌরজগৎই ভেঙে খানখান হয়ে অণু-পরিমাণ অগণ্য বিন্দুতে ও অহম্-এ পরিণত হয়, তারা ঝকমক করতে থাকে, ছুটোছুটি করতে থাকে, একত্র হয়ে ঘুরতে থাকে, আবার পৃথক্-পৃথক্ হয়ে যায়; তাদের মধ্যে একতাবদ্ধতা নেই স্থায়িত্ব নেই। এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে

---

* কখনো যদি আমার হৃদয় বিষাদে পূর্ণ হয়ে ওঠে এবং এর কোনো চেতনা না থাকে, এবং তার ফলে আমার সমস্ত বোধ যদি সিঃসাড় হয়ে যায়, আর তখন যদি আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব একেবারে নষ্ট করে ফেলা হয়েছে, তাহলে আমি আমার এই প্রবন্ধ দিয়ে আমাকে সচকিত করে তুলব—এ'তে আমার সব যন্ত্রণার উপশম হবে, এবং আমি আমার চেতনা ফিরে পাব।

নাস্তিকদের মত নিঃসঙ্গ আর কেউ নয়; যে তার পরম পিতাকে হারিয়েছে এমনি এক পিতৃহীনের মত সে ক্রন্দন করে, এই বিশ্বপ্রকৃতির পরিমাপবিহীন মৃতদেহের পাশে দাঁড়িয়ে সে শোক করতে থাকে; কিন্তু তার এই রোদনে প্রকৃতির চেতনা ফিরে আসে না, অবশেষে সেই গোরস্থানের পাশেই ধীরে ধীরে সে ক্ষয় হয়ে যায়। বিরাট সৌরজগৎটি তার সম্মুখে মিশরের প্রস্তর-নির্মিত নারীমস্তক-ও-সিংহদেহ-বিশিষ্ট বিরাট স্ফিংক্স্-এর মত দাঁড়িয়ে থাকে, বালুকার মধ্যে যার অর্ধেকটি বসে গিয়েছে; বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তার কাছে আকার-বিহীন অনন্তকালের একটি ঠাণ্ডা লৌহময় মুখোশ মাত্র।

এই কাহিনীর মধ্যে দিয়ে আমি কয়েকজন ইউনিভার্সিটি-লেকচারারের মনে ভীতি সঞ্চার করতে চাই। তারা যেন দিনমজুর, তারা যেন নর্দমা-খোঁড়ার কাজে নিযুক্ত, এবং বিতর্কমূলক এক দার্শনিক চিন্তাধারার দালান তৈরির বনিয়াদ রচনায় তাঁরা যেন ব্যাপৃত। এঁরা এমন নিরুত্তাপ ও নির্বিকার মেজাজ নিয়ে ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে গবেষণা করেন যে, মনে হয় তাঁরা যেন সমুদ্রসর্পের বা গল্পে-বর্ণিত শিংওলা ঘোড়ার অস্তিত্ব নিয়ে গবেষণা করছেন।

যাঁরা ইউনিভার্সিটির লেকচারার হবার মত যোগ্যতা অর্জন করতে পারেনি, তাঁদের অবগতির জন্যে আমি বলতে চাই যে, নিরীশ্বরবাদে বিশ্বাস রেখেও অবিনশ্বরতায় বিশ্বাস রাখা যায়—এতে কোনো বিরোধ নেই। যার জন্যে আজ অহম্-এর উজ্জ্বল শিশিরবিন্দুটি গির্জার প্রান্তরে একটি ফুলের অঞ্জলিতে পড়তে পারে এবং এই জীবনের সূর্যালোকে পড়তে পারে, পরদিনও তা ঠিক অনুরূপভাবেই পড়তে পারে, এবং প্রকৃত পক্ষে প্রথমবারের চেয়ে দ্বিতীয়বারই হয়তো সেটি একটি দৈহিক আকার নিতে পারে। আমাদের শিশুকালে নিশুতি রাতে যখন আমাদের চোখে ঘুম জড়িয়ে এসেছে, তখন আমাদের গল্প বলা হয় যে, মৃতরা তাদের কবর থেকে উঠে এসে গির্জায় গির্জায় জীবিতদের প্রার্থনা-ধ্বনির অনুরূপ শব্দ করছে, তাদের অনুকরণ করছে; এই মৃতদের কথা শুনেই মৃত্যু সম্বন্ধে আমাদের মনে ভীতি আসে, এবং সেই গভীর রাত্রে আমরা গির্জার লম্বা লম্বা জানালার দিকে তাকাতে ভয় পাই, সেখান থেকে যে-আলো ছিটকে আসছে সেটা চাঁদের জ্যোৎস্না কিনা তাও দেখতে চাইনে।

শিশুকালের আনন্দের চেয়ে এই আতঙ্কই ডানা মেলে উড়তে থাকে, এবং স্বপ্নের মধ্যে জ্বলজ্বল করে ওঠে, এবং রাত্রের গভীর নিস্তব্ধতার মধ্যে জোনাকির

মতন উড়তে থাকে। এইসব উড়ন্ত বিন্দুগুলিকে বিনাশ কোরোনা। আধো-অন্ধকারের মত এইসব আতঙ্ককর স্বপ্নগুলি যেন আমাদের আরামপ্রদ জীবনে বাস্তবের ছোঁয়া আনতে পারে। স্বপ্নের মত এমন আর কী আছে যা নাকি আমাদের শিশুকালের গভীর অতল থেকে উতুঙ্গ উচ্চতায় নিয়ে যেতে পারে, যেখানে পর্বতের সংকীর্ণ মালভূমিতে আকাশের আরশির মতন জীবননদী আমাদের ধীরে টেনে নিয়ে যেতে পারে অতলস্পর্শ খদ থেকে দূরে ?

এক গ্রীষ্মকালের দুপুরে আমি পাহাড়ের সানুদেশে রোদের মধ্যে শুয়ে থাকতে থাকতে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। আমি স্বপ্ন দেখলাম যে, আমি এক কবরখানার পাশে জেগে উঠেছি। গির্জার ঘুরন্ত চাকায় ঢং ঢং করে এগারোটা বাজল। ঐ শব্দে আমার ঘুম সত্যিই ভাঙল। শূন্য আকাশে আমি খুঁজতে লাগলাম সূর্য, আমার মনে হয়েছিল যে, চন্দ্র এসে সূর্যকে আড়াল করে সূর্যগ্রহণ সৃষ্টি করেছিল। আমার মনে হচ্ছিল সমস্ত কবর যেন খুলে গিয়েছে, আর মৃতদেহ রাখার ঘরটির লোহার দরোজা যেন কার অদৃশ্য হাতের চাপে ওঠা-নামা করছে। যে ছায়া কেউ পাত করেনি এমনি ছায়া যেন ছুটে চলেছে, এবং অন্য ছায়ারা শূন্যের দিকে যেন হেঁটে উঠে যাচ্ছে। শিশুরা ছাড়া শবাধারে আর কেউ ঘুমিয়ে ছিল না। আকাশের উপরে বিশাল ছায়া দিয়ে তৈরি জালের মত ধূসর রঙের চাপ-চাপ কুয়াশা ঝুলছিল, চাপ যেন ক্রমেই আরো ভারি হয়ে উঠছিল, চার দিক ক্রমেই আরও গুমট ও গরম হয়ে উঠছিল। উপরের দিক থেকে তুষারখণ্ডের পতনের শব্দ পাচ্ছিলাম, নীচের দিক থেকে পাচ্ছিলাম ভূমিকম্পের প্রথম ধাক্কা। গির্জাটি উপর-নীচ হয়ে দুলতে লাগল, দুটো বেতালা ধরণের সুরের মধ্যের একটানা সংঘর্ষে যেন গির্জার অমন অবস্থা, ঐ বেতালা সুর দুটি বৃথাই নিজেদের মধ্যে সুরের একটা সংগতি আনার চেষ্টা করছে। মাঝে-মাঝেই গির্জায় জানালায় ঝিকমিক করে আলো জ্বলে উঠছে। এবং ঐ ঝিকমিক আলোর নীচে শিশে ও লোহা গলে-গলে নীচে গড়িয়ে যাচ্ছে। কুয়াশার ঐ জাল এবং উত্তাল এই পৃথিবী আমাকে তুলে নিয়ে গেল ঐ মন্দিরের মধ্যে ; তার দরকার সম্মুখে বিষাক্ত ঝোঁপের মধ্যে দুইটি বিষধর সাপ চুপ করে শুয়ে তাদের চোখের প্রখর দৃষ্টি চতুর্দিকে বিচ্ছুরিত করছে। এই আশ্চর্য ছায়ার ভিতর দিয়ে আমি হাঁটতে লাগলাম—এখানে যেন সমস্ত শতাব্দী সমবেত হয়েছে। সব রকমের ছায়াই বেদীর চারদিকে দাঁড়াল, এবং তারা সকলেই কাঁপছিল এবং তাদের হৃদয় না চাপড়িয়ে চাপড়াচ্ছিল তাদের বুক।

কেবল মাত্র একটি মৃত মানুষ, যাতে এই গির্জায় প্রথম কবর দেওয়া হয়েছিল, স্থির হয়ে তার বালিশে শুয়ে ছিল, তার বুক ওঠা-নামা করছিল না, এবং তার সহাস্য মুখের উপরে একটা সুখী স্বপ্ন বিরাজ করছিল। কিন্তু যখন একজন জীবিত মানুষ প্রবেশ করল তখন সে জেগে উঠল এবং তার মুখের হাসি মিলিয়ে গেল। তার ভারী চোখের পাতা সে বেশ কষ্ট করেই খুলল, কিন্তু দেখা গেল ওর নীচে কোনো চোখ নেই, এবং তার তুলস্থ বুকের নীচে দেখা গেল হৃদয়ের বদলে একটা ক্ষত। সে তার দুই হাত তুলল, এবং তার দুই হাত জোড়া করল, কিন্তু তার হাত-দুটি প্রসারিত হয়েই আলাদা হয়ে গেল, এবং তার জোড় হাত খুলে পড়ে গেল। গির্জার খিলান-দেওয়া ছাদের উপরে অনন্তকাল-নির্দেশক একটা ঘড়ির ডালা দেখা গেল, এর উপরে কোনো সংখ্যা লেখা নেই, যেটা নাকি ছিল নিজেই নিজের কাঁটা। একটি কালো আঙুল তার দিকে প্রসারিত, এবং ঐ মৃত ব্যক্তিটি দেখতে চাইল, এখন সময় কত, ক'টা বেজেছে।

বেশ লম্বা এমনি একটি মহৎ মূর্তি চোখে অনন্ত বেদনার চিহ্ন নিয়ে উপর থেকে ঐ বেদীর মূলে নেমে এল। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত মৃতেরা চেঁচিয়ে উঠল, "যিশুখ্রীষ্ট, বলো, কোথাও কি ঈশ্বর নেই?"

তিনি উত্তর দিলেন, "না, নেই।"

সমস্ত মৃতের ছায়া এক সঙ্গে কেঁপে উঠল, এই কম্পনে কেবল তাদের বুকই নয়, একে-একে প্রত্যেকেই টুকরো-টুকরো হয়ে গেল।

খ্রীষ্ট বলে চললেন, "আমি বিশ্বভুবন ঘুরলাম। আমি সূর্য পর্যন্ত উঠে গিয়েছিলাম, আমি আকাশের অনন্ত ভেদ করে নক্ষত্রপুঞ্জ ও ছায়াপথের ভিতর দিয়ে ঘুরে এলাম। কিন্তু ঈশ্বরকে পেলাম না, তিনি নেই। আমি নেমে গেলাম তত অতলে যত নীচে কোনো জীব তার ছায়া নিক্ষেপ করতে পারে, এবং গভীর খদ তন্নতন্ন করে খুঁজে, চীৎকার করে উঠলাম, 'পিতা, তুমি কোথায়?' কিন্তু আমি কেবল শুনতে পেলাম সেই চিরকালীন ঝড়ের শব্দ, যার উপর কারও কোনো কর্তৃত্ব নেই; দেখলাম ঝিকমিকে রামধনু অতলস্পর্শ গভীরের উপর খিলানের মত ঝুলছে, কিন্তু যার কল্যাণে এই রামধনুর সৃষ্টি সেই সূর্যেরই দেখা নেই। যখন আমি সীমাহীন অসীম আকাশের দিকে সেই স্বর্গীয় চক্ষুর সন্ধানে তাকালাম, আমি দেখলাম আমার দিকে তাকিয়ে আছে শূন্য ও ফাঁকা সুগভীর এক চক্ষুকোটর; এই দুর্দৈবের উপর শয়ান হয়ে আছে

সেই শাশ্বত চিরকাল এবং এগুলির দিকে সে বিষম বিদ্বেষের দৃষ্টিতে চেয়ে এগুলি চর্বণ করছে এমন ভাবে যেন জাবর কাটছে। কাৎরাতে থাকো তোমরা, হে বেসুরো সুরজাল, তোমাদের আর্তনাদ দিয়ে চূর্ণ করে ফেলো ঐ ছায়ামূর্তিগুলি। কারণ তিনি নেই।"

বর্ণহীন ছায়াগুলি কেঁপে উঠেই মিলিয়ে গেল। গরম নিশ্বাসে তুষার গলে যাবার দরুন সাদা বাষ্প সৃষ্টি হওয়ায় অপসারিত হল ঐ ছায়া, এবং চারদিক হয়ে গেল ফাঁকা। তখন যে শিশুরা তাদের কবরের মধ্যে জেগে উঠেছিল তারা তাদের হৃদয়ের বেদনা নিয়ে উপাসনাগারে প্রবেশ করল, এবং বেদীর পাদমূলে সেই দীর্ঘদেহী মূর্তিটির সম্মুখে এসে বলল, "যিশু, আমাদের কি কোনো পিতা নেই?" এর উত্তরে তিনি অশ্রুপাত করতে-করতে বললেন, "আমরা পিতৃহীন। আমি তুমি সকলে। আমাদের পিতা নেই।"

তখন বেসুরো ধ্বনি সম্মিলিত হয়ে বিকটভাবে চীৎকার করতে লাগল, উপাসনাগারটির দেয়াল দুলতে-দুলতে একেবারে আলাদা হয়ে যেতে লাগল, সঙ্গে সঙ্গে গির্জাটি ও শিশুরা ডুবে গেল। তাদের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত পৃথিবী ও সূর্য ডুবে গেল। এবং বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তার বিপুল আয়তন সমেত—আমাদের সামনেই ডুবে গেল, এবং সীমাহীন প্রকৃতির শীর্ষে দাঁড়িয়ে যিশু হাজার-হাজার সূর্য সমেত একটি ব্রহ্মাণ্ডের রসাতল-গমন-দেখতে লাগলেন, এইসব কাণ্ডের ফলে চিরস্থায়ী অমানিশার অন্ধকার যেন মন্থিত হয়ে উঠতে লাগল, এই অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে সূর্যেরা চলতে লাগল খনিকর্মীদের আলোর মত, এবং নক্ষত্রপুঞ্জ জ্বলতে লাগল রুপার শিরার মত।

যিশু যখন পৃথিবীর এই জটলার মধ্যে পরস্পরের ধাক্কাধাক্কি দেখতে লাগলেন, এবং স্বর্গীয় আলেয়ার আলোর নৃত্য লক্ষ্য করতে লাগলেন, যখন তিনি দেখতে লাগলেন কিভাবে এক-একটা গ্রহ তাদের আত্মার সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করে মৃতদের মহাসমুদ্রে বিলীন হয়ে যাচ্ছে—যেভাবে ঢেউয়ের উপর আলো বিকিরণ ক'রে জলের গোলক ভেঙে ভেঙে যায়; তখন এ দীর্ঘদেহী মানবের মধ্যের দীর্ঘতম পুরুষটি মহাশূন্যের দিকে চেয়ে বললেন, "অনড় অপদার্থ মহাশূন্য! চিরকালীন প্রয়োজন হে হিম অনুভূতি। হে উন্মাদ মহানুযোগ! তোমাদের মধ্যের দুজন কি জান, তোমাদের দুজনের মধ্যে কী ঘটছে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের এই কাঠামোকে এবং আমাকে কখন তুমি ধ্বংস করে ফেলতে চাও? হে মহাদুর্দৈব, তুমি নিজেই জান প্রবল ঝঞ্ঝা সৃষ্টি করে কখন তুমি

তারকাদের তুষারঝঞ্ঝা পার হয়ে যাবে, একটা সূর্যের পর অন্য সূর্যটিকে নেভাতে থাকবে, তোমার চলার পথে কখন গ্রহদের থেকে উৎক্ষিপ্ত উজ্জ্বল শিশিরবিন্দু শেষবারের মত ঝলমল করে উঠবে? এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডে আমরা কত একা ও নিঃসঙ্গ! আমি ছাড়া আমার পাশে আর কেউ নেই, হে পিতঃ। হে পিতঃ, তোমার সেই বিশাল বক্ষটি কোথায় যেখানে আমি একটু বিশ্রাম নিতে পারি? যদি প্রত্যেকের অহম্‌ই হয় তার জনক এবং তার সৃষ্টিকর্তা, তাহলে সেই অহম্‌ই কেন তার সংহারক দেবদূত হবে না?

"আমার পাশে কি এখনও কোনো মানুষ আছে? তোমরা সকলেই অসহায় জীব। তোমাদের ছোট ছোট জীবন হচ্ছে প্রকৃতির দীর্ঘনিশ্বাস কিংবা তার প্রতিধ্বনি—একটি কনকেভ বা অবতল আয়না তার থেকে রশ্মি বাইরের দিকে নিক্ষেপ করে, পৃথিবীর মৃতদের ভস্ম দিয়ে তৈরি হয়েছে যে মেঘপুঞ্জ, ঐ আয়না তার উপরে আলো বিচ্ছুরিত করছে, তখনই তোমার একটা অস্পষ্ট ও দোদুল্যমান মূর্তি জেগে উঠছে। যে গভীর খদের উপর দিয়ে ঐ ভস্মের মেঘ চলে যাচ্ছে সেই অতলের দিকে তাকাও। কুয়াশা যেন অজস্র পৃথিবী দ্বারা পূর্ণ হয়ে গিয়েছে এবং তা উঠে আসছে মৃতদের মহাসমুদ্র থেকে, যে কুয়াশা এখন ঝরে পড়ছে তাই হচ্ছে বর্তমান কাল। তোমরা কি নিজের পৃথিবীকে চিনতে পারছ?"

এবার খ্রীষ্ট তাঁর দৃষ্টি নত করলেন, তাঁর চোখ জলে ভরে উঠল, তিনি বলতে লাগলেন, "আহা! একসময় আমি ঐ পৃথিবীতে ছিলাম। সে সময় আমার অবিনশ্বর পিতা ছিলেন, সে সময় কত আনন্দের সঙ্গে পাহাড়ের উপর থেকে সীমাহীন আকাশের দিকে তাকাতাম, আমার বেদনার্থ হৃদয় ঐ মূর্তির সম্মুখীন হয়ে কত সান্ত্বনা পেত, আমার মৃত্যুকালের সেই কঠিন সময়েও বলেছিলাম, 'পিতা, তোমার নিজের এই সন্তানটিকে এই রক্তঝরা নরক থেকে তুলে নিয়ে তোমার বুকে স্থান দাও।' হে পৃথিবীর সুখী সন্তানেরা, এখনো তাঁর উপরে তোমাদের বিশ্বাস আছে। তোমাদের সূর্য হয়তো এখন অস্ত যাচ্ছে, তোমাদের আনন্দ ও বেদনার মধ্যেই তোমরা এখন নত হয়ে বসবে, এবং দুই হাত তুলে চোখে আনন্দের অশ্রুধারা নিয়ে ঐ প্রকাশিত স্বর্গের দিকে চেয়ে বলবে, 'হে স্বর্গীয় মূর্তি, আমাকেও তুমি চেনো। আমার ক্ষত কত তাও জান। আমার মৃত্যুর পর তুমি আমাকে গ্রহণ করে আমার সব ক্ষত নিরাময় করে দেবে।' হে অসুখী মানুষের দল, শোনো, তোমাদের মৃত্যুর

পর তোমাদের ক্ষতের কোনো শান্তি হবে না। কোনো হতভাগ্য যদি তার পিঠে ক্ষত নিয়ে শুয়ে থাকে, এবং আশা করতে থাকে যে, একটি সুন্দর সকাল সত্যে আনন্দে ও পুণ্যে পরিপূর্ণ হয়ে দেখা দেবে তবে সে ভুল করবে। সে জেগে দেখবে চারদিকে বিপর্যয় এবং অনন্ত রাত্রি তার সম্মুখে, কোনো সকাল এসে দেখা দেবে না, ক্ষত-নিরাময়ের জন্যে কোনো হাতের স্নেহ আসবে না, এবং আসবেনা কোনো পরম পিতা। নশ্বর মানুষের দল, তোমরা যদি এখনো বেঁচে থেকে থাক তাহলে তাঁর কাছে অন্যভাবে প্রার্থনা জানাও। তা না হলে চিরতরে তাঁকে হারাবে।”

আমি পড়ে গেলাম, আমি সৌরজগতের আলোকিত কাঠামোর দিকে তাকাতে লাগলাম, দেখতে পেলাম অনাদিকালের বিশালাকৃতি সাপ বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডকে জড়িয়ে ধরেছে, এক পাকে জড়িয়ে ছিল, আবার তার উপর দ্বিতীয় পাক দিল। তার পর সাপটি সমস্ত প্রকৃতিকে বেষ্টন করল হাজার-হাজার পাকে, যাবতীয় পৃথিবীকে একত্রে চাপ দিতে লাগল, অফুরন্ত উপাসনাগারকে ভেঙে দিয়ে একটি কবরখানায় তা রূপান্তরিত করল। সমস্ত-কিছুই সংকীর্ণ হয়ে এল, বিষাদময় হল, ভয়াবহ হয়ে উঠল, এবং কল্পনাতীত বড় ও বিস্তৃত ঘণ্টাবাজাবার একটি হাতুড়ি সময়ের শেষ ঘণ্টা বাজাবার জন্যে উদ্যত, এবং পৃথিবীর কাঠামো চূর্ণ করার জন্যে যখন প্রস্তুত, তখন আমার ঘুম ভাঙল।

ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে পেরেছি বলে আমার অন্তরাত্মা আনন্দে কেঁদে উঠল, এই বিশ্বাসই হচ্ছে প্রার্থনা। আমি যখন উঠলাম তখন সূর্য তার শেষ আলো শস্যক্ষেত্রের উপর ছড়িয়ে দিচ্ছে, এবং তার সান্ধ্য আলোকের ছটা শুভ্র চন্দ্রটির দিকে প্রসারিত করছে—এই চাঁদটি কোনো আলো না নিয়ে সকালের দিকে উদিত হয়েছিল। ঐ স্বর্গ আর এই বিশ্বের মধ্যে একটি আনন্দময় ও ক্ষণস্থায়ী পৃথিবী তার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাখা বিস্তার করতে লাগল এবং জীবিত হয়ে উঠল আমারই মত, ঐ অবিনশ্বর পিতার সম্মুখে। এবং আমার চারদিকের সমস্ত প্রকৃতি দূর থেকে আগত সন্ধ্যাকালীন ঘণ্টাধ্বনির মত অতি প্রশান্ত স্বরধ্বনি চারদিকে প্রসারিত করতে লাগল।

(সিয়েবেনকাস থেকে)

শিকার থেকে ফিরে একজন রাজা কিভাবে প্রজাদের অতিথিবাৎসল্য দেখান

সংবাদপত্রের একটি কাল্পনিক রিপোর্টের সঙ্গে নিজের মন্তব্য যোগ করে ঝাঁ পাউল জার্মানীর অনেক ছোট ছোট জমিদারি ব্যবস্থার ত্রুটির উপর আক্রমণ করেছেন। তাঁদের শাসকদের স্বৈরাচার থেকে নিজেদের বাঁচাবার জন্যে যে প্রজাদের কোনো শাসনতান্ত্রিক ভাবে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করা হয়নি, এখানে তিনি সেই প্রজাদের- দুর্দশার প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, এবং সৈন্যদের শোচনীয় অবস্থার কথাও বলেছেন। 'স্টার্ম উণ্ড ড্রাং'এর পদ্ধতিও তিনি গ্রহণ করেননি, এবং সংস্কার মুক্তির যুগে যে দার্শনিক যুক্তি প্রয়োগ করা হত তাঁর এ সমালোচনা সে পন্থাও গ্রহণ করেনি। তাঁর এ সমালোচনা রসিকতার দ্বারা লঘু করা হয়েছে, এবং শাসকদের প্রশংসার মধ্যেই একটু পরিহাস লুকানো আছে। পাঠকেরা যদিও বুঝতে পারবেন যে, ঝাঁ পাউল যা বলছেন তিনি তার বিপরীত মতই পোষণ করেন ; তাঁর এ আক্রমণে বিশেষ ধার নেই, এবং সমালোচনার যে ধারাটি তিনি গ্রহণ করেছেন তাও যেন নিপুণ নয়, এর প্রধান কারণ তাঁর বক্তব্যের মধ্যে অস্বাভাবিক অতিরঞ্জন।

মানবজাতির প্রতি ভালোবাসা এবং সাধারণ মানুষের প্রতি প্রীতি এবং সব রকমের মহৎ মনোবৃত্তি অনেক রাজসিংহাসনের উত্তুঙ্গ শিকারভূমি-পত্তনের মূল কথা। এই সব মনোবৃত্তি প্রকাশের ধরণও বিশেষ অলৌকিক নয়। প্রায় সব সময় (এমনকি বেশির ভাগ সময়ই) শাসকেরা বড় বড় কাজ করে থাকেন। এজন্যে সমগ্র মানুষের উচিত একত্র জমায়েত হওয়া, এবং প্রত্যেকের উচিত বিশেষ ধ্বনির মধ্য দিয়ে তাঁর প্রশংসা করা। বিশেষ ক'রে সংবাদ-পত্রের লেখকদের এবিষয়ে উদ্যোগী হওয়া দরকার, কেননা পৃথিবীর ইতিহাসের একটা পাতাই তাঁদের কাছে পুরো একটা পৃথিবী। যদি আমাকে কেউ একটা স্বর্ণমুদ্রা উপহার দেয়, কিংবা আমি একজন গাইয়ে হলে এরকম দুশোটা স্বর্ণমুদ্রা দেয়, তাহলে আমি তাকে অবশ্যই একটা মহৎ কাজ বলব। বিশেষ-ভাবে মনকে তৈরি করে নিয়ে শনিবারের খবরের কাগজ থেকে এক মহৎ কীর্তির কাহিনী পড়া যাক—

আমাদের দয়াবতার শাসক-মহাশয় এ বছর শরৎকালে তাঁর এবং ভিন্ন দেশের রাজপ্রতিনিধির আনন্দবর্ধনের জন্যে যে শিকারের আয়োজন করেছিলেন তাতে কৃষকদের সেই শিকারে অংশ গ্রহণে অনুমতি দিয়েছিলেন। অনেক আবেদন-নিবেদনের পর তাদের দাবি গ্রাহ্য হওয়ায় কৃষকেরা খুবই খুশি হয়, কিন্তু পরে তারা বুঝতে পারে এ খুশির দাম কত। সারা রাত ধ'রে শিকার ধাওয়া করে বেড়ানোর কষ্টকর কাজে তারা এতই মশগুল হয়ে ছিল যে, তারা বুঝতেই পারেনি শিকারীদের অতি উৎসাহের ফলে কখন তারা তাদের হাত বা পা ভেঙেছে। তারা নিজের বাড়িতে ফিরে এসে বুঝতে পারল যে, তারা উঠে দাঁড়াতে পারছে না। যাই হোক, আমাদের মহানুভব নৃপতি এটা চাইলেন না যে, এই শিকারের ফলে প্রজাদের জমির শস্য যেভাবে গোগ্রাসে গিলে খাওয়া হয়ে গিয়েছে, বা পদদলিত হয়ে গিয়েছে, তার জন্যে তাদের এই শিকারে যোগ দেবার অনুমতিই যথেষ্ট ক্ষতিপূরণ। এইজন্যে এই দয়াবতার নৃপতি এক আদেশ জারি করলেন যে, তাঁর নিজের খরচে প্রতি গ্রামে প্রচুর খাদ্য জোগান দেবার জন্যে যত খরচই লাগবে তার জন্যে রাজভাণ্ডার যেন যথেষ্ট টাকা আগাম দেয়। গ্রামবাসীদের সাধারণ গ্রাম্য খানা দেওয়া হবে না, তাঁদের আনন্দ পুরোদস্তুর জাগিয়ে তোলার জন্যে এবং নৃপতি যে দরিদ্র প্রজাদের সঙ্গে তাঁর প্রতিদিনের সঙ্গীদের মতনই ব্যবহার করছেন তা প্রমাণ করার জন্যে খুব শৌখিন পাত্রে খানা পরিবেশের ব্যবস্থা করলেন। এইভাবে, যা ভাবা গিয়েছিল, কোনোরকম খরচই সাশ্রয় ক'রে করা হল না। সব রকমের শৌখিন পাত্রই আনা হল। অনেক মনমাতানো ছবি খোদাই-করা পোরশিলেনের কাঁচের ও মোমের পাত্র লালরঙে রঞ্জিত লম্বা টেবিলের উপর রাখা হল। কৃষকেরা দুই সারিতে বসে ঐ দৃশ্য উপভোগ করতে লাগল। সব রকম ডিশের মধ্যে একটি মোমের ডিশ তাদের সবচেয়ে বেশি ভালো লাগল—তাদের শস্যক্ষেত শিকারীদের ও শিকারের পদদলিত হওয়ায় সেই ক্ষেতের কি দশা হয়েছে তারই একটা মডেল ঐ ডিশে আঁকা ছিল।

সাধারণের উল্লাস চরমে উঠল তখন, যখন অতিথিরা এইসব সুস্বাদু ও পুষ্টিকর খাদ্যে পেট পূর্তি করেছেন এবং শহুরে লোকেরা যেসব খাদ্য

বিক্রির জন্যে নিয়ে এসেছেন সেগুলি কিনবার জন্যে তাদের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। নৃপতির সদাশয় অনুমতিতে অনেক শিকারও বেশ সহজেই তারা কিনতে পারছিল, যার যেমন সংগতি। এসব জিনিস এমন প্রচুর পরিমাণে এসেছিল, যে সেই স্তূপ উঁচু হয়ে প্রায় আকাশ ছুঁয়েছিল। কৃষকরা যা কিনতে পারল না সেগুলি শিকারী কুত্তারাও খেয়ে উঠতে পারল না। আমাদের সদাশয় নৃপতি (তাঁর সহধর্মিনীও অবশ্য) সব সময় চাইতেন যে, এই সাধারণ মানুষরা অসাধারণ হাসিখুশি হোক, সেইজন্যে তাদের আভাস দেওয়া হল যে, এই রকম আরো শিকার হবে বলে তারা আশা করতে পারে এবং এমনি খানার ব্যবস্থাও।

আরও জানা গেল যে, তিনি এইসব শৌখিন পাত্রের আরও সদ্ব্যবহার করতে চান, কেননা এগুলির ব্যবহারে পেট একটু বিশ্রাম পায় ও হজম করার সুযোগ পায়। এইজন্যে কৃষকদের সুখ কৃত্রিম উপায়ে আরো বড় করা হতে লাগল, এবং প্রত্যেকটি বেতনের দিনে সৈন্যদের খুব বড় আকারের একটা রুটি টেনে-টেনে নিয়ে গিয়ে একের পর এক প্রত্যেক সেনাবাহিনীকে দেখানো হবে, কিন্তু এ রুটি কাউকে বিলি করা হবে না, কেননা এ রুটি হজম করা শক্ত। নৃপতি তাঁর মহানুভবতা প্রমাণ করার জন্যেই, তাঁর মিতব্যয়িতা প্রমাণের জন্য নয়, এই রুটি গম দিয়ে তৈরি করে সেঁকে নেওয়ার ব্যবস্থা করেন নি, এ রুটি তৈরি করিয়েছেন খাঁটি ও তাজা কাদা দিয়ে। মাটি দিয়ে তৈরি এক রুটি সৈন্যদের ক্ষুধা নিবৃত্তি করতে না পারায় সেপাইরা গ্রামে-গ্রামে ভিক্ষে করতে বেরিয়ে পড়ল, এবং কখনো-কখনো কোনো দরিদ্র সেপাইয়ের খাদ্যদ্রব্যও চুরি করতে আরম্ভ করল।

সংবাদপত্রের এই রিপোর্ট সম্বন্ধে আমি দুটি মাত্র কথা বলতে চাই। প্রত্যেক কৃষককে এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে, নৃপতি তাদের মধ্যে ও তাঁর সেই মহামূল্য শিকারের মধ্যে একটু পার্থক্য রাখেনই। কৃষকদের তিনি গুলী করেন না। শিকারের সময়ের কড়া ঠাণ্ডার মধ্যে তিনি তাদের আহার ও বাসস্থান দেন না! দ্বিতীয়ত, সেনারা নিজেদের বাঁচাবার জন্যে সবচেয়ে বেশি-যেটা কামনা করে তা হল তাদের সাহস, খাদ্য নয়। কেবল শান্তির সময়ে ও যুদ্ধের সময় তাদের খাদ্য দরকার; কিন্তু সাহস দরকার যখন তারা

প্রকৃতপক্ষে যুদ্ধে নিযুক্ত। প্রত্যেক সমর বিভাগের এ বিষয়ে খুব বেশি করে মনোযোগ দেওয়া উচিত যে, মিতব্যয়িতার জন্যে যেমন অস্ত্রশস্ত্রাদির ও সেপাইদের পোশাকের বাহুল্য বর্জন করার নীতি তাঁরা গ্রহণ করেন, সেইভাবে সেনাদের পেটও তাঁদের সংকুচিত করার ব্যবস্থা করা দরকার। একজন সাধারণ শরীরেই তার মৃত্যু পর্যন্ত সৈন্য কতটা উপোস সহ্য করতে পারে তার হিসেব রাখা জরুরি দরকার। তখন সেইসব সৈনিকদের "আদর্শ অনশনক্ষম" বলে ঘোষণা করা যাবে। এবং তার পেটের মাপই অন্য সেপাইদের আদর্শ বলে গণ্য করা যাবে। একজন যদি এরকম উপোস সহ্য করতে না পেরে অক্কা পায় তাহলে তার দলের অন্য কাউকে এ কাজে লাগানো যেতে পারে। এজন্যে এ সেপাইকে যদি কিছু টাকা দিতে হয় তাহলেও ক্ষতি নেই ; কেননা তাকে এই পরীক্ষায় নিয়োগ করলে যে খাদ্যবস্তু বাঁচবে তার দামেই ওটা পুষিয়ে যাবে। (এ সঙ্গে এ কথাও মনে রাখতে হবে যে, একজন স্বাস্থ্যবান্ সেপাই প্রায় সেই পরিমাণ খাদ্য পায় যতটা একজন দুর্বল সেপাইকে দেওয়া হয়)। ছয় মাস অন্তর সেপাইদের তাদের বাড়িতেও পাঠাতে হবে না এই উপোসের ধাক্কা থেকে আরোগ্যলাভের জন্যে, কেননা ব্যারাকেই তারা উপোস করে থাকতে পারবে। সেপাইরা হয়তো দুর্বলতার জন্যে নিজেদের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে একটু অসুবিধে ভোগ করবে, এ বিষয়ে নিশ্চিত হয়ে রাজারা একটা ব্যবস্থা করে নিতে পারেন। যুদ্ধের সময় যেমন অন্যান্য অনেক প্রথা মানা হয়ে থাকে, যেমন শত্রুপক্ষের কোনো সেপাইয়ের ক্ষতে যেন সিসার বুলেট বিষাক্ত অবস্থায় বিদ্ধ করা না হয়, সেই রকম যুদ্ধরত দুই পক্ষ একটা শর্ত করে নিতে পারেন। উভয়পক্ষই তাঁদের সেনাবাহিনীকে ৩৬৫ দিন অনশনের আদেশ দিতে পারেন, এবং পেট-ভরে-খায় এমন কোনো লোককে সৈন্য-বাহিনীতে নেওয়া হবে না বলে সাব্যস্ত করে নিতে পারেন। তাহলেই এক পক্ষের যে সেনা ক্ষিদেয় প্রায় অচৈতন্য হয়ে আসছে সে অপর পক্ষের অনুরূপ সেনার প্রতিই গুলী নিক্ষেপ করবে। এ'তেই সব-কিছুর চূড়ান্ত মীমাংসা হয়ে যাবে।

নোভালিস

খ্রীষ্টীয় রাজ্য বা ইউরোপ

ফ্রায়েডরিখ ফন হারডেনবার্গ (১৭৭২-১৮০১) নিজেকে নোভালিস নামেই পরিচিত করেন। প্রথম আমলের রোমান্টিক্ যুগের তিনি সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য

কবি ছিলেন। তিনি অল্পই লিখেছেন, কিন্তু তাঁর এইসব রচনাই এমন কল্পনা প্রবণতায় পরিপূর্ণ যে তাঁর একটা জাদুকরী প্রভাব পৃথিবীর মতিগতি যেন পালটে দেয়, এবং গভীর ও তীব্র আধ্যাত্মিকতায় মৃত্যুর প্রতি লালসা জন্মায়—তাঁর মনের এই প্রবণতা আরও বেড়ে যায় পঞ্চদশী তাঁর প্রণয়িণীর মৃত্যুতে এবং নিজের অসুস্থতার জন্য। তাঁর "ক্রিশ্চেনডম অর ইউরোপ" প্রবন্ধ ১৭৯৯ সালে লেখা। প্রবন্ধটি ইতিহাসের প্রতি তাঁর অভিনব দৃষ্টিভঙ্গির একটি অপূর্ব নিদর্শন, জার্মানীর কল্পনা-বিলাসীদের উপর এর একটা চূড়ান্ত প্রভাব পড়েছিল, তা হচ্ছে—মধ্যযুগকে গৌরবময় যুগ বলে মনে করা যে সময়ে ঈশ্বর পৃথিবী ও মানুষ—এই তিনের মধ্যে একটা সামঞ্জস্যপূর্ণ মিলন ঘটেছিল। এই জন্যেই সংস্কারসাধন ব্যাপারটাই হচ্ছে অনেকটা অনুপ্রবেশের মত কারণ পাদ্রীদের বিবাদের ফলে সেই একত্বের বিনাশ। তাঁদের মতে আধুনিক বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি সব রহস্যের ও অলৌকিকত্বের ইতি ঘটিয়েছে। এর পরাকাষ্ঠা হচ্ছে সংস্কারমুক্তি আন্দোলন, যার ফলে নোভালিসের জীবদ্দশাতেই ঘটেছিল ফরাসী বিপ্লব। এর মধ্যে নোভালিস দেখলেন, সব যেন নূতন গতি নিতে চায়, তাই দ্বিতীয় একটি সংস্কারেরর জন্যে দাবি জানাতে লাগলেন যার দ্বারা শান্তির ও নূতন বিশ্বাসের পত্তন হতে পারে। মধ্যযুগের পর থেকে মানুষ যা আবিষ্কার করেছে তা তিনি পরিত্যাগ করতে চাননি, কিন্তু সেই আবিষ্কার যেন নূতন বিশ্বাসের প্রতি "প্রকৃত স্বাধীনতা" দেয়, এই তিনি চেয়েছিলেন। ইউরোপের ইতিহাসের উদ্দেশ্য কেবল যুক্তি নির্ভর রাজনৈতিক একতা ছিল বলে নোভালিস মনে করেন নি, তিনি মনে করেছেন এর মতলব ছিল ধর্মীয় ঐতিহ্যকে জাগিয়ে তোলা।

এবার আমাদের সময়কার রাজনৈতিক নাটকের দিকে একবার তাকানো যাক। নূতন পৃথিবী ও পুরাতন পৃথিবী এখানে এক সংঘর্ষে আটকে পড়েছে। এর আগের সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলির অযোগ্যতা ও অনটন এখন ভয়ংকর আকারে নানাভাবে প্রকাশ হয়ে পড়ছে। বিজ্ঞানের ব্যাপারে যেমন তেমনি ইউরোপীয় রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে পারস্পরিক সংযোগ যদি যুদ্ধের ঐতিহাসিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্যেই ঘটে থাকে, যদি ঘুমন্ত ইউরোপ নূতন উদ্যমে জেগে ঐ ব্যাপারেই আত্মনিয়োগ করে, সকল রাষ্ট্রের রাষ্ট্র যাকে বলা হয় সেই ইউরোপ যদি নবজাগ্রত হয় এবং একটা রাজনৈতিক বুদ্ধি যদি পেয়ে যায়,

তবে কী হবে ? তখন কি বাহ্যিক দিক থেকে এক প্রকারের চেহারা বিশিষ্ট রাষ্ট্রসমূহে যাজকতন্ত্র কায়েম ক'রে তাকেই রাজনৈতিক অহম্-বাদের নীতি হিসেবে রাষ্ট্রগুলির সমন্বয় সাধন করা হবে যুক্তি ও বুদ্ধির একটা ভাবমূর্তি দিয়ে ? পৃথিবীর কোনো শক্তির সাধ্য নেই যে তারা নিজেদের মধ্যে একটা ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করেন, এর জন্যে তৃতীয় একটি উপকরণ ? দরকার, সেটি হচ্ছে ইহলৌকিক এবং একই সঙ্গে পারলৌকিক, এবং এর দ্বারাই এই সমস্যার সমাধান হতে পারে। বিবদমান শক্তির মধ্যে কোনো শান্তি স্থাপিত হতে পারে না। সব শান্তিই চোখের ধাঁধা, সব শান্তিই যুদ্ধবিরতি। মন্ত্রিসভার সদস্যদের দিক থেকেও বলা যায়—একই রকম বিবেকবুদ্ধির দ্বারা চালিত হয়ে কোনো সিদ্ধান্তের কথা ভাবা যায় না। দুই পক্ষেরই বেশ বড় ও জোরদার দাবি আছে, পৃথিবীর ও মানবজাতির মেজাজের প্রেরণায় চালিত হয়ে, উভয় পক্ষেই নিজ দাবি অনুসারে কাজ করতে চাইবে। দু পক্ষই মানবাত্মার অবিনশ্বর শক্তি। একদিকে আছে প্রাচীনের প্রতি শ্রদ্ধা, ঐতিহ্যের প্রতি আকর্ষণ, পূর্বপুরুষদের স্মৃতিস্তম্ভের প্রতি ভালোবাসা, রাষ্ট্রের গৌরবজনক পুরাতন বংশের প্রতি মমতা, এবং সকলকে মান্য করে চলার মধ্যে আনন্দলাভ ; অন্যদিকে স্বাধীনভাবে চলার মধ্যে আনন্দের আবেগ, ক্ষমতাবানদের দলের মধ্যে নানারকম কাজ করার শর্তহীন আকাঙ্খা, যা-কিছু নূতন ও অভিনব তা দেখেই আনন্দ, রাষ্ট্রের সব নাগরিকের সঙ্গে নির্বাধ যোগাযোগের সুযোগ, প্রত্যেক মানুষের সমান অধিকার নিয়ে গর্ব, ব্যক্তি স্বাধীনতার জন্য, জনগণের সম্পত্তির জন্য, এবং তীব্র নাগরিকতা বোধের জন্য সুখলাভ। এর কেউ যেন অন্যকে খর্ব করতে বা নষ্ট করতে না চায়, কোনো প্রকার জয়ই এখানে অর্থহীন। কেননা যে কোনো এলাকার অন্তরস্থ রাজধানী পৃথিবীর প্রাচীরের আড়ালে বসানো নয়, এবং হঠাৎ আক্রমণ করে তা ধ্বংস করা যায় না।

কে বলতে পারে যে, যত যুদ্ধ হয়ে গেছে তাই যথেষ্ট কি না। কিন্তু এ যুদ্ধের কখনো বিরতি হবে না যতক্ষণ না উভয়পক্ষে পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত না হয়। আধ্যাত্মিক শক্তিই কেবল এ কাজ করতে পারে। এই উন্মত্ত পাগলামোর বিষয় যতদিন ইউরোপ সচেতন না হচ্ছে ততদিন ইউরোপের সব জাতি রক্তস্নান করতে থাকবে ; এই উন্মাদনা ইউরোপীয় জাতিদের চক্রাকারে ঘোরাচ্ছে। যতদিন না এক পবিত্র মধুর সংগীতে এরা বশীভূত হয়ে ও শান্ত হয়ে সকলে ঐ বেদীসমূহে সমবেত হয় এবং শান্তির ব্রত নিয়ে প্রেমের

এক মহাযজ্ঞ অনুষ্ঠিত করে ধূমায়িত যুদ্ধক্ষেত্রের উপর দাঁড়িয়ে উত্তপ্ত অশ্রুধারায় স্নান ক'রে—ততদিন যুদ্ধের অবসান নেই। ধর্মই কেবল ইউরোপকে নূতন চেতনায় জাগ্রত করতে পারে, এবং সমস্ত জাতিকে নিরাপদ করতে পারে। এবং পৃথিবীর শান্তি অনুষ্ঠানের এই পীঠস্থানে গৌরবজনক এক খ্রীষ্টীয় রাজ্য স্থাপন করতে পারে।

হাইনরিখ ফন ক্লাইস্ট

হাইনরিখ ফন ক্লাইস্ট (১৭৭৭-১৮১১) ছিলেন জার্মানীর অন্যতম প্রধান নাট্যকার। বিষয়ের দিক থেকে তাঁর নাটকের অনেক মিল ছিল রোমাণ্টিকদের সঙ্গে, বিশেষ ক'রে ঝাঁ পাউলের রচনার সঙ্গে, কিন্তু এ সবই ছিল তাঁর সম্পূর্ণ মৌলিক রচনা। ক্লাইস্ট এ বিষয়ে বেশ জোরদার দাবি জানিয়ে দেন। তিনি কারও সঙ্গে তেমন মানিয়ে চলতে পারেন নি, তাঁর জীবনে তাই একের পর এক সংকট দেখা দিয়েছে বিফলতার পর বিফলতা। সামরিক সার্ভিসে তিনি আনন্দ পেলেন না, লেখাপড়ায় কৃষিকাজে সরকারি প্রতিষ্ঠানে বা সাংবাদিকতায় —কোনো কাজেই তিনি স্বাদ পেলেন না। জীবনে দাঁড়াবার একটা শক্ত জায়গায়ই তিনি পেলেন না তাঁর রচনা কাজের পক্ষে এইটেই হল সমস্যা। জীবনে প্রতিষ্ঠার অভাবেই তিনি কোনো কাজে স্থির সিদ্ধান্ত নিতে বা কোনো বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা ক'রে নিতে অসুবিধা ভোগ করেছেন। মানুষের ধারণার শক্তি সম্বন্ধে কাণ্টের সমালোচনামূলক প্রবন্ধ ক্লাইস্টকে জাগিয়ে তোলে। ক্লাইস্ট এ বিষয়ে স্থির নিশ্চয় হন যে মানুষের নিরাপত্তার একমাত্র সম্বল হল মানুষের আত্মশক্তি, তাঁর মনের আভ্যন্তরীণ ভাবাবেগ। তাঁর নাটকে এবং গল্পে তিনি দেখিয়েছেন জীবনের উপর মানুষের দাবি, তার ভাবাবেগের জয়, এবং সেইসঙ্গে তিনি সংগতিহীন বাস্তবতার সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারেন নি, তার ফলেই তাঁর হতাশা এবং বিনাশ। তাঁর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য নাটক হচ্ছে ; "অ্যাম্ফিট্রায়ণ" (১৮০৭), "পেনথেসিলিয়া" (১৮০৮), "দি প্রিন্স অব হমবুর্গ" (১৮১১)।

মাইকেল কোহ্‌লহাস

তাঁর "মাইকেল কোহ্‌লহাস" গল্পের আরম্ভেই তিনি তাঁর নায়কের পরিচয় দিয়েছেন এইভাবে: "একজন অন্যতম সর্বশ্রেষ্ঠ ন্যায় পরায়ণ, এবং সেইসঙ্গে

তার সময়ের একজন সাংঘাতিক লোক"। ন্যায় পরায়ণতা সম্বন্ধে তার আপস-রফায় যেতে না চাওয়ার যে মনোভাব তার জন্যেই সে শেষ পর্যন্ত হয়ে দাঁড়াল "একজন ডাকাত ও খুনী"। ঐতিহাসিক পটভূমিতে ফেলে এই গল্পের পরিণতি স্থির করা হয়েছে। এক অভিজাত জমিদার ঘোড়ার কারবারী কোহ্‌লহাসের কাছ থেকে বে-আইনি ভাবে এক জোড়া ঘোড়া নিয়ে যায়। এ ব্যাপারে সহজভাবেই সে ন্যায়বিচার চায়, কিন্তু তার আর্জি শোনা হয় না। যখন সে তার চূড়ান্ত আবেদন পেশ করতে যাচ্ছে তখন তার সঙ্গী তার স্ত্রী মারাত্মক ভাবে জখম হয়, এবং তার মৃত্যু হয়। এবার সে আইন নিজের হাতে নেবে বলে ঠিক করল। তার অনুচরদের নেতা রূপে সে সারাদেশ ঘুরে বেড়াতে থাকে—আগুন লাগিয়ে দাঙ্গা করে খুন করে সে ত্রাস সঞ্চার করতে থাকে। গল্পটি চূড়ান্ত অবস্থায় পৌঁছল এবং তার মোড় ঘুরল যখন মার্টিন লুথার এসে ব্যাপারটিতে হস্তক্ষেপ করলেন, তিনি একটি আদেশনামা প্রচার করে কোহ্‌লহাসকে প্রকাশ্যে আসতে বললেন, এবং পরে তাঁর সঙ্গে কোহ্‌লহাসের আলাপ-আলোচনা হল (উদ্‌ধৃতাংশ দ্রষ্টব্য)। লুথার ন্যায়বিচারের মূলসূত্রটি ক্ষমার উপর স্থাপন করতে চেয়েছেন, কোহ্‌লহাসের মাত্রাহীন কার্যাবলী এবং তার উদ্ধত হিংস্রতার জন্য তাকে অপরাধী বলেছেন। পরিশেষে কোহ্‌লহাস ন্যায়বিচার পেল : তাকে ফিরে দেওয়া হল তার ঘোড়া, কিন্তু তার অনুষ্ঠিত কাজের জন্য তার হল মৃত্যুদণ্ড।

লুথারের ঘোষণা :

"কোহ্‌লহাস, তুমি অভিযোগ করছ যে ন্যায়বিচার পাওনি বলে তুমি ন্যায়বিচার করার জন্যে তরবারি ধারণ করেছ ; কিন্তু তুমি কী করার চেষ্টা করছ ? তুমি দাম্ভিক হয়ে উঠেছ, তুমি একগুঁয়ে হয়ে উঠেছ, তোমার নিরেট অন্ধ আবেগের বশবর্তী হয়ে যা করছ তা কি তোমার মাথা থেকে তোমার পা পর্যন্ত সবটাই ন্যায় বিচার ? এই দেশের যিনি অধিপতি, তুমি যাঁর প্রজা তিনি তোমাকে অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছেন, তোমার ঐ মূল্যহীন সম্পত্তির উপরে তোমার অধিকার নিয়ে মামলায় তুমি বিচার পাওনি বলে হে মূঢ়, তুমি নিজের হাতে আইন নিয়েছ, সে আইন হচ্ছে অগ্নি আর তরবারি, এবং নেকড়ে বাঘ যেমন করে মরুভূমি থেকে এসে হাজির হয়, সেইভাবে শান্ত মানুষদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ছ! কেবলমাত্র প্রতারণা ও

মিথ্যা দিয়ে তুমি মানুষদের প্ররোচিত করছ। তুমি পাপী, তুমি কি চিন্তা করে দেখেছ যে ভবিষ্যতের কোনো দিনে, যে দিন প্রত্যেক মানুষের হৃদয় বিভায় উজ্জ্বল হয়ে উঠবে, সেই দিন তোমার কৃতকর্মের জন্য তুমি পার পেয়ে যাবে? তুমি কী করে বলতে পার যে তোমাকে তোমার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে, তুমি তোমার ক্রোধান্ধ মনের উত্তেজনা প্রতিহিংসা-পরায়ণতা দিয়ে বাড়িয়ে নিয়েছ, এবং তোমার একটা বেপরোয়া কাজ সফল না হলেও তুমি কি সে কাজ পুনরায় করা থেকে বিরত হয়েছ? যদি একটি আদালতের বিচারকেরা এবং কনস্টেবলেরা যারা মাঝপথে ধরে ফেলে তোমার একটা চিঠি এখানে নিয়ে এসেছে, আর যে সংবাদ তাদের দেবার কথা তা এখানে দিচ্ছে না—সেটা কি তোমার গবর্ণমেণ্ট? ঈশ্বর তোমাকে পরিত্যাগ করেছেন, আমি তোমাকে জানিয়ে দিচ্ছি যে, তোমার গবর্ণমেণ্ট তোমার মামলা সম্বন্ধে কিছুই জানে না। আমার কথার মানে বুঝতে পেরেছ তো? আমি বলতে চাই যে প্রভুর বিরুদ্ধে তুমি বিদ্রোহী হয়ে উঠেছ তিনি তোমার নামও জানেন না। তুমি যখন ভবিষ্যতে ঈশ্বরের দরবারে যাবে এবং তাঁর বিরুদ্ধেই দোষারোপ করতে চাইবে, তখন তিনি নির্বিকার মুখে বলতে পারবেন: এই লোকটার প্রতি আমি কোনো অবিচার করিনি, কেননা এর অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমার কিছুই জানা নেই, আমি এ'কে একেবারে চিনিনে। তুমি জেনে রেখো, যে তরবারি তুমি ধারণ করেছ সে তরবারি হচ্ছে লুণ্ঠকের ও রক্তপিপাসুর। তুমি একজন বিদ্রোহী, ঈশ্বরের রাজত্বের কোনো যুদ্ধবাজই ন্যায়পরায়ণ নয়। পৃথিবীতে তোমার প্রাপ্য হচ্ছে মৃত্যুদণ্ড, পরজীবনে তোমার এই পাপের ও ঈশ্বর-নির্ভরতার অভাবের জন্য ধার্য রইল নরকবাস।

উইটেনবার্গ ইত্যাদি·· ··· "মার্টিন লুথার।"

লুথার বসলেন, বললেন: কি চাও তুমি? উত্তরে কোহ্‌লহাস বলল, আমার সম্বন্ধে তুমি যে অভিমত দিয়েছ তা খারিজ করতে চাই, আমি অসৎ নই। তুমি তোমার ঘোষণাকালে বলেছ যে, আমার গবর্নমেণ্ট আমার মামলা সম্বন্ধে কিছুই জানেন না। ভালো কথা। আমার নিরাপদ স্বভাব ফিরিয়ে দাও তাহলে আমি ড্রেসডেনে গিয়ে সব কথা তাঁদের বলব। লুথার চেঁচিয়ে উঠলেন, "অপবিত্র ও অনাচারী।" এই কথায় হকচকিয়ে গেল ও চুপ করে গেল কোহ্‌লহাস। লুথার বলতে লাগলেন, "ট্রোংকার জমিদারকে আক্রমণ করার অধিকার কে তোমাকে দিয়েছিল, এ যেন স্বৈরাচারী ব্যবস্থার আইন

অনুসারে তুমি করেছিলে। তুমি যখন প্রাসাদে তাঁকে পেলে না, তখন তুমি আগুন নিয়ে ও তরবারি নিয়ে তাদেরই আক্রমণ করলে যারা তাঁকে আশ্রয় দিয়েছিল?" উত্তরে কোহ্‌লহাস বললে, মাননীয় মহাশয়, এখন থেকে আর কাউকে নয়। ড্রেসডেন থেকে আমি এক টুকরো খবর পাই, তাই আমাকে ভুল পথে নিয়ে গিয়েছিল। মানুষের একটা সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমি যে যুদ্ধে রত হয়েছিলাম, সেটা সত্যিই অন্যায়। যতক্ষণ আমি সে সম্প্রদায় থেকে বিতাড়িত না হই, আপনি ঠিক কথাই বলেছেন, আমি তাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারিনে। বিতাড়িত! লুথার উচ্চ কণ্ঠে বলে উঠলেন, তার দিকে তাকালেন। বললেন, কী উন্মাদনার কবলে তুমি পড়েছিলে? যে রাষ্ট্রে তুমি বাস কর তারই এক সম্প্রদায় থেকে কে তোমাকে বিতাড়িত করতে পারে? যতক্ষণ একটা রাষ্ট্র আছে, তখন সে যে-ই হোক না কেন, তোমাকে সম্প্রদায় থেকে বিতাড়িত করতে পারে কে? বিতাড়ন? হাতের মুঠি শক্ত ক'রে কোহ্‌লহাস উত্তর দিল, সে এমন লোক যাকে আইনের রক্ষাকবচ থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। আমার শান্তিপূর্ণ জীবনযাপনের জন্যে আমি এই রক্ষাকবচ চাই। এরই জন্যে আমি সঙ্গী হিসেবে যাদের পেয়েছি তাদের নিয়েই এই সম্প্রদায়ের মধ্যে গিয়ে পৌঁছই। যে কেউ আমাকে এই রক্ষাকবচ থেকে বঞ্চিত করে সে'ই আমাকে মরুভূমির হিংস্র জন্তুদের মধ্যে পাঠিয়ে দেয়। আমার হাতে আমারই আত্মরক্ষার জন্যে সে দিয়ে দেয় গদা। লুথার বললেন, আইনের রক্ষাকবচ থেকে কে তোমাকে বঞ্চিত করেছে? তোমাকে কি আমি বলিনি যে, যে অভিযোগপত্রটি তুমি যাঁকে দিয়েছিলে সেই প্রভু এ সম্বন্ধে কিছুই জানেন না? রাষ্ট্রের যারা সেবক তারা যদি তাঁর অজ্ঞাতে কোনো বিষয়ে হস্তক্ষেপ করে, কিংবা অন্য কোনো ভাবে তাঁর অজানিতেই তাঁর নাম কলঙ্কিত করে, তাহলে ঈশ্বর ছাড়া এ কাজের জবাবদিহি চাইবার অধিকার আর কার? তুমি অভিশপ্ত, তুমি ঈশ্বরের অভিসম্পাত পেয়েছ, তুমি তাঁকে বিচার করার অধিকার পেয়ে গিয়েছ? কোহ্‌লহাস উত্তরে বলল, বেশ, যদি আমার দেশের প্রভু আমাকে বিতাড়িত না করেন তাহলে যিনি যে সম্প্রদায়কে রক্ষা করে থাকেন আমি তার মধ্যে ফিরে যাব। আমি অনুনয় করছি, ড্রেসডেনে আমি যাতে যেতে পারি তার নিরাপদ ব্যবস্থা করুন। তা'হলে আমি যে লোকদের লুটৎসেনের প্রাসাদে জমায়েত করেছি তাদের ছত্রভঙ্গ হয়ে যেতে বলতে পারি। আমার যে নালিশের জন্যে আমি বিতাড়িত হয়েছিলাম

পুনরায় দেশের আদালতে আবার আমি তা পেশ করতে পারি। লুথার বিরক্ত হলেন, ডেস্কের উপরের সব কাগজ ছুঁড়ে ফেলে দিলেন, এবং চুপ করে গেলেন। এই অদ্ভুত লোকটি যে রকম উদ্ধতভাবে এই রাষ্ট্রে বাস করছিল তাতে তিনি খুব বিরক্ত। এবং কোহ্‌লহাসেনব্রুক থেকে কোহ্‌লহাস জমিদারের কাছে আইনগত যে সিদ্ধান্তটি পাঠিয়েছে সেটার সম্বন্ধে একটু ভেবে বললেন, ড্রেসডেনের ট্রাইবিউনালের কাছ থেকে তখন কি দাবি সে করেছিলো? কোহ্‌লহাস উত্তর দিল: আইন অনুসারে জমিদারের সাজা, ঘোড়া ফিরিয়ে দেওয়া, আর আমাদের উপর হামলার দরুণ আমার ও আমার সঙ্গী হের্স—মুলবার্গের কাছে যার পতন ঘটে—যে আহত হয়েছিলাম তার জন্যে ক্ষতিপূরণ। লুথার জোর গলায় বলে উঠলেন: আহত হবার জন্যে ক্ষতিপূরণ! তুমি কি ইহুদীদের কাছ থেকে বা খ্রীষ্টানদের কাছ থেকে হাজার হাজার পাউণ্ড কর্জ করেছ তোমার এই ভীষণ প্রতিহিংসার খরচ জোগাবার জন্যে? তুমি, যাদের আক্রমণ ক'রে অনেক ক্ষতিসাধন করেছ তার ক্ষতিপূরণ তুমি দেবে, যদি তা দাবি করা যায়? কোহ্‌লহাস বলল, যে ঘরবাড়ি বা সম্পত্তি আমার ছিল তা ফিরে চাইনে। আমার স্ত্রীকে কবর দেবার খরচও না। হের্স-এর মা তাঁর ছেলের চিকিৎসার ব্যয়ের হিসাব দেবেন, এবং ট্রোংকা প্রাসাদে তাঁর ছেলের কি কি খোয়া গিয়েছে তাও তিনি জানাবেন। ঘোড়া বিক্রি বন্ধ হবার জন্যে আমার কতটা ক্ষতি হয়েছে তার হিসেব গবর্নমেণ্ট কোনো বিশেষজ্ঞ লাগিয়ে ঠিক করে নিতে পারেন। লুথার বললেন: অসম্ভব প্রলাপ বকছ, তুমি একটা সাংঘাতিক লোক, তরবারি দিয়ে জমিদারের উপর তুমি এমন প্রতিহিংসা নিয়েছ যা কল্পনা করা যায় না। এখন তুমি ন্যায়বিচারের দাবি করছ, যদি-বা তেমন বিচার হয় তাহলে তার পরিণাম যে সাজা হবে তোমার প্রতিহিংসার তুলনায় তা কতটুকু? কোহ্‌লহাসের চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে নামল, সে বলল, হে পূজনীয় মহাশয়, আমাকে আমার স্ত্রী হারাতে হয়েছে, বিশ্ববাসীকে কোহ্‌লহাস জানাতে চায় যে অন্যায্য দাবিতে তার স্ত্রীর মৃত্যু হয়নি। আপাতত এই কয়টি বিষয়ের নিষ্পত্তি করুক আদালত, অন্যান্য যে বিষয় সম্বন্ধে এখনো বিপদ আছে, আমি তার তালিকা পরে দাখিল করব।

চিঠিপত্র

ক্লাইস্ট-এর চিঠিপত্র পড়লেই বোঝা যায় যে, তাঁর নাটক এবং তাঁর অন্য গদ্য রচনা সব কিছুই তাঁর ব্যক্তিগত সমস্যা নিয়ে, যে সমস্যা তিনি সামাল দিতে পারছিলেন না, এবং যার ফলে তাঁকে আত্মহত্যা করতে হয়। ১৮০৩ সালের ২৬শে অক্টোবর তারিখে তাঁর এক ভগ্নিকে লেখা চিঠিতেই তাঁর প্রথম আত্মহত্যার চেষ্টার কথা জানা যায়। ক্লাইস্ট কখনো কোনো বেসামরিক সরকারি চাকরি'তে কোনো আনন্দ পাননি, তাঁর নাটক "রবার্ট গুইসকার্ড" দিয়ে তিনি বিষাদান্তক নাট্যরচনার শীর্ষে নিজেকে স্থাপন করার উচ্চআশা পোষণ করেছিলেন। কিন্তু যতটা উচ্চমানের হবে বলে ক্লাইস্ট ভেবেছিলেন, নাটকটি তেমন ভাবে স্বীকৃত হল না দেখে প্যারিসে ক্লাইস্ট তাঁর নাটকের পাণ্ডুলিপি পুড়িয়ে ফেললেন। ফরাসীরা যেমন ইংলণ্ড অভিযানের পরিকল্পনা পরিত্যাগ করে, ক্লাইস্ট তাঁর চিঠিতে লিখছেন যে, তিনি তেমনি তাঁর অভিপ্রায় পূরণ করতে পারলেন না। এ'তে তিনি ভেঙে পড়েন, এবং দীর্ঘকাল অসুস্থ হয়ে পড়ে থাকেন।

১৮১১ সালের ২১ নভেম্বর তার আত্মহত্যার দিনে তাঁর ভগ্নিকে লেখা অন্য একটি চিঠিতে ক্লাইস্ট তাঁর জীবনের সারকথা বলেছেন : "আসল কথাটি এই যে, এই পৃথিবীর সঙ্গে আমি ঠিক খাপ খেলাম না।" আর-একটি বিদায়-লিপিতে তিনি তাঁর জীবন সম্বন্ধে বলেছেন "এমন ভীষণ যন্ত্রণাদায়ক জীবন আগে কোনো মানুষ কাটায়নি।" কিন্তু তাঁর জীবনে হতাশা ছিল না, ছিল স্থির আত্মপ্রত্যয়।

উলক্রাইন ফন ক্লাইস্ট'কে

প্রিয় উলক্রাইন, (কেটে দিয়ে : শক্তমেয়ে)

আমি তোমাকে যা লিখতে যাচ্ছি, তা পড়ে হয়তো তুমি জীবন-বিসর্জন দেবে। কিন্তু আমি যা ভেবেছি আমি তা লিখবই, লিখবই, লিখবই। প্যারিসে আমি আমার রচনাটি যতটা লেখা হয়েছিল তা পড়ে দেখেছি, সেটা বাতিল করেছি, পুড়িয়ে ফেলেছি। এখন সব শেষ। স্বর্গের কাম্য নয় যে, আমি যশস্বী হই—পার্থিব সব জিনিসের মধ্যে যশই তো সর্বশ্রেষ্ঠ। অন্য সব কিছুই আমি একটা মাথা-গরম ছেলের মত দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিই। তোমার বন্ধুত্ব পাবার উপযুক্ত করে আমি আমাকে তৈরি করতে পারলাম না, কিন্তু

এই বন্ধুত্ব ছাড়া আমি তো বাঁচতে পারিনে। আমি এবার মৃত্যুর মধ্যে ঝাঁপ দিচ্ছি। লক্ষ্মী মেয়ে, শান্ত হও! আমি যুদ্ধক্ষেত্রের মৃত্যুর মত সুন্দর মৃত্যু-বরণ করব। আমি দেশের রাজধানী ত্যাগ করেছি. আমি এর উত্তরের সমুদ্রকিনারে ঘুরছি; আমি ফরাসীদের অধীনে সামরিক কাজ নেব; অল্প-দিনের মধ্যেই এই সেনাবাহিনী সমুদ্র পার হয়ে ইংলণ্ড পৌঁছবে; সমুদ্রের উপরেই আমাদের সকলের মৃত্যু অপেক্ষা করে আছে। আমিও এই সুন্দরতম সমাধির জন্যে অপেক্ষা করে আছি। লক্ষ্মী মেয়ে তুমিই হবে আমার শেষ মুহূর্তের চিন্তা!

সেণ্ট ওমের, ২৬ অক্টোবর ১৮০৩ — হাইনরিখ ফন ক্লাইস্ট

উলক্রাইন ফন ক্লাইস্ট'কে

ওডার নদীর উপকূলস্থ ফ্র্যাঙ্কফুর্টের মাননীয়া কুমারী উলক্রাইন ফন ক্লাইস্ট,

আমি খুবই পরিতৃপ্ত ও খুবই খুশি, কিন্তু সমস্ত পৃথিবীর সঙ্গে সব বিরোধের মীমাংসা না ক'রে, এবং সবার উপরে, আমার প্রিয়তম উলক্রাইন, তোমার সঙ্গে, সব ঝগড়ার নিষ্পত্তি না করে আমি মরতে পারিনে। ক্লাইস্টদের কাছে লেখা আমার চিঠিতে যেসব কড়া মন্তব্য আছে সেগুলি আমি প্রত্যাহার ক'রে নিতে চাই; আমাকে প্রত্যাহার করতে দাও। আমার জন্যে তুমি সাধ্যানুসারে সব করেছ, আমাকে বাঁচাবার জন্যে। এ কাজ তুমি করেছ আমার ভগ্নি হিসেবে—এ কথা আমি বলছি, তুমি যা করেছ তা একজন মানুষ হিসেবেই করেছ। কিন্তু আসল কথা এই—পৃথিবীর সঙ্গে আমি নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারলাম না। এবার বিদায়, ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি তোমার মৃত্যুও যেন এই রকমই হয়—এর অর্ধেক আনন্দ ও সুখের মৃত্যু। এর চেয়ে বেশি আন্তরিক ইচ্ছা আর কী প্রকাশ করব?

তারিখ: আমার মৃত্যুর দিন সকাল (২১. ১১. ১৮১১) — তোমাদের হাইনরিখ

লোকার্নো'র ভিখারিণী

ক্লাইস্ট-এর গল্পের মধ্যে "দি বেগার উওম্যান অব্ লোকার্নো" একটি বিশেষ কারণে উল্লেখযোগ্য, সেটি হল সংক্ষেপে অনেক কথা বলা। এই গল্পের বিষয়বস্তু একটি সামান্য অপরাধের এক ভয়াবহ পরিণতি একটু অস্বাভাবিক মনে হয়, সেইরকম এর অনেক ঘটনার অবাস্তবতা, মনে হয় রোমান্টিক ঝোঁকের

ফলেই এটা ঘটেছে। এইসব অদ্ভুত ব্যাপারের কোন ব্যাখ্যা নেই; সেগুলি অন্ধকারাচ্ছন্নই রয়ে গেল এবং তার তল পাওয়াও কঠিন।

উচ্চ-ইতালীর লোকার্নোর কাছে একটি বিশাল পুরাতন প্রাসাদ ছিল, এর মালিক ছিলেন মার্শেসে বা গণ্যমান্য ব্যক্তি। কেউ যদি সেণ্ট গট্‌হার্ডের দিক থেকে আসেন তবে দেখতে পাবেন, প্রাসাদটি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। প্রাসাদটি বেশ উঁচু ছাদের মস্ত মস্ত ঘর। এরই একটি ঘরে এক বৃদ্ধা রুগণা মহিলা আছেন, ইনি একদিন এখানে ভিক্ষে করতে এসেছিলেন। বাড়ির মালিকানি এঁকে দেখে দয়া পরবশ হন এবং মেঝেতে খড় পেতে তার শোবার ব্যবস্থা করে দেন। বাড়ির মালিক সেই মান্যগণ্য ব্যক্তিটি শিকার থেকে ফিরে এখানে তিনি তাঁর রাইফেল রাখবেন বলে এই ঘরে হঠাৎ ঢুকে পড়লেন। এখানে ঐ ভিখারিণীকে দেখে তিনি তাকে ঘরের ঐ কোণ থেকে উঠে গিয়ে উনুনের ওপাশে চলে যেতে আদেশ করলেন। ভিখারিণীটি উঠতে গিয়েই মসৃণ মেঝেতে তাঁর লাঠি পিছলে গেল এবং তার ফলে তাঁর পিঠে এমন চোট লাগল যে তিনি অনেক কষ্টে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারলেন, এবং মালিকের নির্দেশ অনুসারে ঘরের অন্য দিকে যেতে লাগলেন। কিন্তু উনুনের ওপাশে আবার পড়ে গিয়ে গোঁঙরাতে ও কাৎরাতে লাগলেন। তিনি মারা গেলেন।

এর কয়েক বছর পরে সেই মালিক ব্যক্তিটি যখন যুদ্ধের দরুণ ও ভালো চাষবাস না হবার দরুণ দারুণ অর্থকষ্টে পড়লেন তখন ফ্লোরেন্স থেকে আগত একজন রাজপ্রতিনিধি তাঁর সঙ্গে দেখা করলেন, এবং প্রাসাদটি এমন অপরূপ জায়গায় বসানো দেখে এটি তিনি কিনতে চাইলেন। গণ্যমান্য ব্যক্তিটি প্রাসাদটি বিক্রি করার জন্যেই ব্যগ্র হলেন, এবং তাঁর স্ত্রীকে বললেন এই আগন্তুকের থাকার ব্যবস্থা করার জন্যে। ঠিক ঐ ঘরটিতেই ওর থাকার ব্যবস্থা হল, ঘরটি অবশ্য অপরূপ ভাবে সাজানো গোছানো হয়েছে। কিন্তু মাঝরাতে যখন সেই রাজদূত ফ্যাকাশে মুখে ভয়ার্ত চেহারা নিয়ে উপস্থিত হলেন তখন স্বামী-স্ত্রী দুজনেরই কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থা। তিনি শপথ করেই বললেন যে, ঐ ঘরে ভূত আছে, যা দেখা যায় না এমনি একটা চেহারা ঘরের কোণে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছেন, মনে হচ্ছিল সে যেন খড়ের বিছানায় শুয়ে আছে, বেশ শব্দ করেই সে ধীরে-ধীরে হেঁটে চলে বেড়াচ্ছিল সারা

ঘরময়, এবং উনুনের ওপারে গোংরাতে গোংরাতে ও আর্তনাদ করতে করতে পড়ে গেছে।

এই ঘটনার কথা শুনে চারদিকে বেশ আলোড়ন আরম্ভ হয়ে গেল, এবং বাড়ির মালিকদের অত্যন্ত বেদনা দিয়েই অনেক খরিদ্দার ফিরে গেল। তার পর থেকেই অদ্ভুতভাবে একটা গুজব ছড়িয়ে গেল বাড়ির ভৃত্যদের মধ্যেও যে, মাঝরাতে ঘরময় ঘুরে বেড়ায় একটা ভূত। এই গুজব অঙ্কুরেই বিনাশ করার জন্যে সেই মানগন্য ব্যক্তিটি ঠিক করলেন যে পরদিন রাত্রে তিনি এ ব্যাপারে পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান করবেন। তদনুসারে, সন্ধ্যা হতেই তিনি ঐ ঘরে তাঁর বিছানা পাতলেন, এবং জেগে-জেগে মাঝরাতের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলেন। কিন্তু তিনি সচকিত হয়ে উঠলেন, মাঝরাতের ঘণ্টাধ্বনি হওয়ামাত্র তিনি সত্যিসত্যিই শুনতে পেলেন এক রহস্যজনক শব্দ। মনে হল, কে যেন নিজেকে খড়ের বিছানা থেকে তুলে নিচ্ছে, খসখস শব্দ হচ্ছে খড়ের, তার পর ঘরময় ঘুরছে, তার পর উনুনের ওপাশে গিয়ে ধুপ করে সে পড়ে গেল, দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল, এবং মৃত্যুর আর্তনাদ করল। পরদিন সকালে তিনি উঠে এলে তাঁর স্ত্রী জানতে চাইলেন অনুসন্ধান কেমন হল। তিনি চারদিকে তাকালেন ভয়ার্ত দৃষ্টিতে, দরজায় খিল দিলেন, তারপর বললেন যে ভূতের ব্যাপারটি সত্যি। জীবনে এমন আতঙ্কিত কখনো হননি তাঁর স্ত্রী, স্বামী আর কোনো কথা বলার আগেই তিনি প্রস্তাব করলেন যে তাঁর সম্মুখে আবার এই অনুসন্ধান করা হোক, খুব শান্তভাবে এবং খুব নিখুঁত ভাবে! পরদিন রাত্রে একজন বিশ্বস্ত ভৃত্য নিয়ে তাঁরা গেলেন, এবং আশ্চর্য, সেই রহস্যময় ভৌতিক শব্দ তাঁরা শুনতে পেলেন। কিন্তু যে-কোনো দামে প্রাসাদটি বিক্রি করে দেবার প্রবল ইচ্ছায়, তাঁদের ভৃত্যের সম্মুখেই তাঁরা যতটা ভয় পেয়েছেন সে সব ভয় চেপে রাখলেন। এবং প্রচার করতে লাগলেন যে, যা ঘটেছে তা যেমন গুরুত্বপূর্ণ কিছু নয়, এবং এর কারণ অল্প দিনের মধ্যে খুঁজে বের করা যাবেই। তৃতীয় দিন রাত্রে স্বামী-স্ত্রী দুজনে যখন দুরু-দুরু বুকে আবার ঐ সিঁড়ি ভাঙতে-ভাঙতে সেই ঘরটির দিকেই যেতে লাগলেন, ব্যাপারটার রহস্য ভালো করে জেনে নেবার জন্যে, তখন বাড়ির কুকুরটিকে কে ছেড়ে রেখেছিল কে জানে, কুকুরটি এসে দরজায় দাঁড়াল। টেবিলের উপর তাঁরা দুটি মোমবাতি জ্বেলে রাখলেন, স্ত্রীর তখন সাজপোশাক পরা, স্বামীর হাতে তরবারি ও পিস্তল, স্বামী স্ত্রী দুজনেই তাঁদের বিছানায়

গিয়ে বসলেন। রাত তখন এগারোটা। দুজনে নিজেদের মধ্যে কথা বলে নিজেদের খুব ব্যস্ত রাখার চেষ্টা করতে লাগলেন, কুকুরটি কুণ্ডলী পাকিয়ে ঘরের মাঝখানে শুয়ে পড়ল, তার পর ঘুমাতে লাগল। তারপর, মাঝরাতের ঘণ্টা বাজার সঙ্গে সঙ্গে সেই ভীষণ শব্দটি শোনা গেল। দেখা যাচ্ছে না এমনি একজন তার লাঠিতে ভর দিয়ে ঘরের কোণে উঠে দাঁড়াল। তার পায়ের নীচে খড়ের খসখস শব্দ তারা শুনতে পেল, এবং তার প্রথম পায়ের শব্দেই কুকুরটার ঘুম ভেঙে গেল, সে উঠে দাঁড়াল, কান খাড়া করল, এবং কোনো মানুষ তার দিকে যেন আসছে বলে সে চীৎকার করতে লাগল, এবং উনুনের ওপাশে ছুটে গেল! ব্যাপার দেখে বাড়ির মালিকানির চুল খাড়া হয়ে উঠেছে, তিনি ছুটে ঘরের বাইরে চলে গেলেন; পরে ভদ্রলোকটি তরবারি শক্ত ক'রে চেপে ধ'রে চেঁচিয়ে উঠলেন, "ওখানে কে?" এর কোনো উত্তর না পেয়ে তিনি পাগলের মত ঘরের চারদিকে শূন্যে তরবারি চালনা করতে লাগলেন। তাঁর স্ত্রী ইতিমধ্যে গাড়ি জুতিয়ে নিয়েছেন, এক্ষুনি শহরে চলে যাবার জন্যে তিনি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। কিন্তু কয়েকটি জিনিস গুছিয়ে নিয়ে তারপর তাঁর ফটক পার হবার আগেই তিনি দেখতে পেলেন, প্রাসাদটির চারদিকে আগুন লেগে গিয়েছে। ভদ্রলোকটি অত্যন্ত ভয় পেয়ে এবং জীবন সম্বন্ধে বিতৃষ্ণ হয়ে মোমবাতি নিয়ে ঘরে চারদিকে আগুন লাগিয়ে দিয়েছেন, দেয়ালগুলি সবই ছিল কাঠ দিয়ে মোড়া। ঐ হতভাগ্য লোকটিকে বাঁচাবার জন্যে অযথাই তাঁর স্ত্রী লোকজন পাঠালেন। শোচনীয় ভাবে তিনি ইতিমধ্যেই শেষ হয়ে গিয়েছেন। আজ পর্যন্ত সাদা রঙের হাড়—যা তাঁর শুভানুধ্যায়ীরা জড়ো করে রেখেছিল—সেই ঘরের কোণায় পড়ে আছে, যে ঘর থেকে লোকার্নোর ভিখারিণীকে উঠে দাঁড়াতে বাধ্য করা হয়েছিল।

কার্ল ফিলিপ মরিটৎস

অ্যানটন রেইজার

দার্শনিক ও নন্দতাত্ত্বিক কার্ল ফিলিপ মরিটৎস (১৭৫৬-১৭৯৩) তাঁর উপন্যাস "অ্যানটন রেইজার" (১৭৮৫-১৭৯০) রচনা করেই একজন লেখক-রূপে চিহ্নিত হন। তাঁর এই উপন্যাসে অনেক আত্ম-জীবনী-মূলক উপাদান আছে, এটি অনেকটা গ্যেটের "ভিলহেল্‌ম্ মেইস্টার"-এরই অনুরূপ, কিন্তু একটি যুবকের ক্রম পরিণতির কথা একটু অন্যভাবে বলা হয়েছে। প্রতিভাদীপ্ত

অ্যানটন রেইজার তার পিতামাতার কাছ থেকে বিশেষ-কোনো সাহায্য পায়নি। একটি সামান্য আত্মমর্যাদা-হানিকর হাতের-কাজের ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানে শিক্ষানবিশির কাজ নেয়। অবশেষে সে তার বাবার মতিগতি অগ্রাহ্য করেই হাইস্কুলে ভর্তি হয়, এবং যে শিক্ষা সে পেতে চায় তার পথে অনবরত বাধা ও বিরোধিতা পেতে থাকে। অবশেষে সে এই ঝঞ্ঝাট ছেড়ে দিয়ে অভিনেতা হিসেবে যোগ দেয় রঙ্গমঞ্চে' এখানেও অনবরতই সে হতাশা ও অসাফল্যের মুখোমুখি হতে থাকে। এই ভাবে এই ছেলেটির চরিত্র গঠনে তার পরিবেশ ও পরিস্থিতি তার কখনো সহায় হয়নি, তার সমাজের তার পিতামাতার এবং তার শিক্ষকদের অমনোযোগ ও ভুল-বোঝাই তার পথে প্রবল বাধা হয়ে দেখা দিয়েছে। যাই হোক, এই কাহিনীটি দেখিয়েছে যে, অ্যানটন রেইজারে নিজস্ব চরিত্রটিই ছিল সমস্যাসংকুল, এবং অনেক বাধা পাবার ফলে এ-জীবনটি বিশেষ প্রশংসনীয় হয়ে ওঠেনি। এই চরিত্রটির সংক্ষিপ্তভাবে যে মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করা হয়েছে তা সম্পূর্ণ আধুনিক, এবং এটি অত আগে লেখা হলেও এটি উনিশ শতকেরই যেন বই। এখানে যে অংশ উদ্‌ধৃত হচ্ছে সেটি অ্যানটন রেইজারের লোহেনস্টাইনের সেই টুপী তৈরি'র কারখানায় শিক্ষানবিশির আমল।

এ রকম কথা ছিল যে, ব্রান্‌স্‌উইকের এই টুপী-প্রস্তুতকারক অ্যানটনের প্রতি একটু সদয় ব্যবহার করবেন, এবং তাকে তার উপযোগী হালকা ধরণের কাজ দেবেন, যেমন—হিসেব রাখা, খবরাখবর দেওয়া এবং ঐ ধরণের অন্য কাজ। যে দুই বছর সে এই কাজে পাকাপাকি ভাবে নিযুক্ত না হচ্ছে সেই দুই বছর সে স্কুলেও যেতে পারবে, এবং তারপর সে কি করবে সে বিষয়ে সে মন স্থির করে নিতে পারবে এমন কথাও ছিল। এসব কথা অ্যানটনের খুব ভালো লেগেছিল, বিশেষ করে ঐ স্কুলে যাওয়ার বিষয়টি। কারণ সে মনে করেছিল যে, এমন যদি হয় তাহলে নিজেকে যথেষ্ট ভাবে তৈরি করে নিতে পারবেই, এবং এর ফলে ভবিষ্যতে সে তার জন্যে একটা পথ করে নিতে পারবে। সে তার বাবার সঙ্গেই এই টুপী-প্রস্তুতকারক লোহেনস্টাইনকে চিঠি লেখে, এই লোকটিকে তার খুব ভালোও লাগে, এবং এঁর সঙ্গে কাজ করার সুযোগের কথা ভেবে খুব আনন্দও পায়।

জায়গা-বদলের এই সুযোগটাও তার কাছে খুবই চমৎকার ব'লে বোধ

হল। হ্যানোভারের এই জীবন, এখানকার সব বাড়িঘরের ও রাস্তাঘাটের একঘেয়ে দৃশ্য তার কাছে অসহ্য হয়ে উঠছিল। তার চোখের সামনে নূতন প্রাসাদের মিনারের ফটকের এবং গড়ের চারদিকের মাটির ঢিবির দৃশ্য তার চোখের সামনে ভেসে উঠল, একটা ছবির পর একটা ছবি যেন সে দেখতে পেল। একটু চঞ্চল হয়ে উঠল সে, এবং কবে সে রওনা হবে তার জন্যে ঘণ্টা-মিনিট গুনতে লাগল।

অবশেষে এসে গেল সেই দীর্ঘপ্রতীক্ষিত দিন। অ্যানটন মার কাছ থেকে ও দুই ভায়ের কাছ থেকে বিদায় নিল। এই দুই ভাইয়ের বড় জনের নাম ক্রিশ্চিয়ান, তার বয়স হবে পাঁচ; ছোটজন সিমন—তার নাম রাখা হয়েছিল ঐ টুপী-প্রস্তুত কারক লোহেনস্টাইনের নামের অনুসরণে, তার বয়স প্রায় এক বছর।

তার বাবা তার সঙ্গে গেলেন, অর্ধেকটা পথ তারা গেল হেঁটে, বাকিটা হাওয়া গাড়িতে যাবার সুযোগ ঘটে গেল।

তার জীবনে এই প্রথম অ্যানটন পায়ে হেঁটে যাবার এই অভিযানের আনন্দ পেল, ভবিষ্যতে এ সুযোগ তার অনেক আসবে এবং তা কাজে লাগাবে সে। ব্রানসউইকের যতই তারা কাছে আসতে লাগল অ্যানটন ততই ব্যগ্র হয়ে উঠতে লাগল। সেণ্ট অ্যান্‌ড্রু্জ কেল্লার মাথার উপরের লাল গম্বুজটা আকাশের বুকে জ্বলজ্বল করে উঠেছে। সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে। দূরে দুর্গ-প্রাকারের ঢিবির উপর এদিক-ওদিক পায়চারি করছে প্রহরী, সে দেখতে পেল। হাজার রকমের চিন্তা তার মাথায় এসে ভিড় করল: যিনি তার এতটা উপকার করলেন তাঁকে দেখতে কেমন, তাঁর বয়স কত, কিভাবে তিনি হাঁটেন, তাঁর মুখচোখ কেমন? সে তাঁর সম্বন্ধে এমন একটা কল্পনা করে নিল যে, সে তাঁকে আগাম ভালোই বেসে ফেলল। তার ছেলেবেলার একটা অভ্যাসই এই যে, নামের শব্দের উপর নির্ভর করে সে কোনো ব্যক্তির বা কোনো জায়গার একটা অদ্ভুত ছবি এঁকে ফেলত এবং একটা অদ্ভুত ধারণা করে নিত। এইসব নামের স্বর-ধ্বনির উঁচু ও নীচুভাবের পরিমাণই তার এইসব ছবি আঁকার উপাদান ছিল। এই ভাবে হ্যানোভার কথাটা তার কাছে সব সময় বেশ একটা সুন্দর ধ্বনি এনে দিত, এবং একে শহর রূপে দেখার আগেই সে বড়-বড় বাড়ি ও মিনার সম্বলিত একটা চমৎকার শহর বলে এর ছবি এঁকে ফেলেছিল! ব্রানসউইককে বহুদিন সে অনেক বড় ও অন্ধকার

জায়গা বলে ভেবে রেখেছে, প্যারিস নামটা থেকে কোন্ এক অস্পষ্ট ধারণার বশে এটাকে সে বেশ উজ্জ্বল শ্বেত অট্টালিকার স্তূপ বলে মনে করে রেখেছে।

এটা স্বাভাবিক। কোনো জিনিসের নাম ছাড়া যখন আর কিছু জানা থাকে না তখন মানুষের মন এর একটা মূর্তি মনে-মনে গড়ে নেয়, শেষ পর্যন্ত আসলের সঙ্গে তা হয়তো মেলে না। এর সাদৃশ্যের অন্য কোনো উপকরণ হাতের কাছে না থাকলে বাধ্য হয়ে ঐ নাম, তার শব্দ, শব্দের কঠিনতা ও কোমলতা, উচ্চতা বা নীচতা, স্পষ্টতা বা অস্পষ্টতা ইত্যাদির উপর নির্ভর করতে হয়, এবং আসলের সঙ্গে এই ধারণার মধ্যে একটা সাদৃশ্যের কল্পনা করে নিতে হয়। অনেক সময় দৈবক্রমে তা মিলেও যায় বটে। লোহেনস্টাইন নামটা থেকে অ্যানটন ধারণা করে নিয়েছিল যে, মানুষটা হবেন বেশ লম্বা, মুখটা হবে একজন সৎ জার্মানের মত, এবং কপাল হবে প্রশস্ত। কিন্তু এ ক্ষেত্রে তার কল্পনার সঙ্গে আসলের একেবারেই মিল হল না।

অন্ধকার নেমে এল। অ্যানটন তার বাবার সঙ্গে সাঁকো পার হয়ে ফটকের খিলানের তলা দিয়ে প্রবেশ করল শহরে। অনেক রাস্তা অতিক্রম করে তারা চলল। দুর্গ পার হল তারা। অবশেষে পার হল একটা লম্বা সাঁকো। তারপর এসে পৌঁছল একটা নোংরা রাস্তায়। এখানেই একটা সরকারী বিল্ডিং-এর বিপরীতে বাস করে টুপী-প্রস্তুতকারী লোহেনস্টাইন।

বাড়িটার সম্মুখে তারা দাঁড়াল। বাড়ির বাইরেটা কালো রঙের, খুব বড় একটা কালো দরজার গায়ে ঘন-ঘন করে অনেক পেরেক পোঁতা। এর উপরে একটা সাইনবোর্ড, তার উপরে টুপী আঁকা এবং লোহেনস্টাইনের নাম লেখা। একজন বৃদ্ধ স্ত্রীলোক দরজা খুলে দিল, এ হচ্ছে গৃহকর্ত্রী। স্ত্রীলোকটি তাদের ডান দিকে নিয়ে একটা মস্ত ঘরে পৌঁছল, এই ঘরটা গাঢ় রং করা অনেক নামের তালিকায় ভরা, এর একটার পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের বিবরণ অনেক কষ্টে পড়া গেল, কেননা লেখাগুলো অর্ধেক মুছে গেছে। এখানে গৃহকর্তা তাদের অভ্যর্থনা করলেন। একজন মাঝবয়সী লোক, লম্বা তো নয়ই—বেঁটেই বলা চলে, মুখখানা ফ্যাকাশে ও ম্লান কিন্তু তাতে তারুণ্যের ছাপ আছে; ঐ মুখে কদাচিৎ অনেক কষ্টে হাসি ফোটে: মাথার চুল কালো, চোখ-দুটো কল্পনায় ভরা, কথাবার্তা মার্জিত, এবং চলন-বলন এমন যা নাকি শ্রমজীবীদের মধ্যে বড়-একটা দেখা যায় না। তাঁর কথাগুলো খাঁটিই, কিন্তু

বড় ধীরে ও বড় ফেনিয়ে কথা বলেন, বিশেষ কথা গুলো আরও লম্বা হয়ে যায় যখন কোনো ধর্মীয় বিষয়ে কথা বলেন। যখন তিনি মানুষের শঠতার ও নষ্টামির কথা বলেন তখন তিনি যেন অসহিষ্ণু হয়ে ওঠেন, তাঁর চোখের কালো ভুরু তখন কুঁচকে ওঠে। এ রকম হয় বিশেষ ক'রে তাঁর প্রতিবেশীদের বা নিজের ঘরসংসারের কথা বলার সময়।

অ্যানটন যখন এঁকে প্রথম দেখল তখন তাঁর মাথায় পালকের সবুজ টুপী, গায়ে নীল ওয়েস্টকোট, গোলাপি ফতুয়া ও তার উপরে একটা কালো এপ্রন। এই রকম পোশাকই তিনি বাড়িতে পরেন। প্রথম দর্শনেই অ্যানটনের মনে হল যে, সে একজন বন্ধু বা উপকারীর বদলে পেয়ে গেল একজন কড়া মাস্টার। আগের থেকেই লোকটার উপর যে প্রীতি তার মনে জেগে উঠেছিল, তা যেন নিভে গেল। জল যেমন ক'রে নিভিয়ে দেয় আগুন। যাঁকে সে তার উপকারী বন্ধু বলে মনে করেছিল তাঁর কাছে শেষ পর্যন্ত একজন শিক্ষানবিশ ছাড়া আর কিছুই হতে পারবে না।

যে কয়দিন তার বাবা তার সঙ্গে রয়ে গেল সেই ক'টা দিন অ্যানটনের প্রতি কিছুটা সদয় ব্যবহার করা হয়। কিন্তু তার বাবা চলে যাওয়া মাত্র অন্যান্য শিক্ষানবিশের মতনই তাকে কারখানায় কাজ করতে হল। অতি নীচুস্তরের কাজেই তাকে লাগানো হল,—কাঠ চেলা করা, জল টানা, দোকানে ঝাঁট দেওয়া। সে হতাশ হল বটে, কিন্তু তার মনের দুঃখ কিছুটা কমল এই নতুনত্বের মোহে। কাঠ-চেলাই ঘর-ঝাড় ও জল-টানা ইত্যাদি কাজে সে এক রকমের আনন্দই পেতে লাগল।

তার কল্পনাপ্রবণতা সব জিনিসকেই রঙিন করে তুলত, এটাই ছিল তার পক্ষে কিছুটা বাঁচোয়া। মস্ত ঐ কারখানা ঘরের কালো কালো দেয়াল ও তার এই ভীষণ অন্ধকার কোনো আলোর শিখায় যখন দিনের বেলায় বা রাত্রে ঝলমল করে উঠত তখন সে মনে করত সে যেন এক উপাসনাগারে রয়েছে এবং সেখানে সে সর্বেসর্বা। সকাল বেলা সে মস্ত উনুনটার নীচে ঢুকে তাতে আগুন জ্বালত, এই আগুন সারাদিন সকলকে ব্যস্ত রাখত, এমন সব কর্মী কাজ করে যেত। এই জন্যে সে তার এই কাজকে বেশ দায়িত্বপূর্ণ বলে মনে করত, এবং সেজন্যে মর্যাদাবোধও করত।

কারখানার ঠিক পাশেই বয়ে চলেছে ওকার। এর উপরে অনেক পাটাতন ফেলা আছে যাতে জল টেনে তোলা যায়। এ সবই যেন তারই

এক্তিয়ারের—এই রকম মনে করত সে। যখন তার দোকান সাফ করা হয়ে গিয়েছে, মস্ত বয়লারটি ভরা হয়েছে, তার দেয়াল ঠিক করা হয়েছে, এবং তার নীচে আগুন ধরানো হয়েছে, তখন সে এসব কাজের জন্যে বেশ তৃপ্তি বোধ করত, সব কাজ ঠিক মত করা হয়েছে বলে সে আনন্দ পেত। তার কল্পনার জোরে সে তার চারদিকের প্রাণহীন জিনিসগুলোকেও অনেক সময় মনে করত জীবন্ত প্রাণী—এদের সঙ্গেই সে বাস করত এবং এদের সঙ্গেই কথা বলত। তার উপর সব কাজের মধ্যে যে নিয়মানুবর্তিতা সে দেখত তাতেও সে মনে মনে বেশ আনন্দ বোধ করত। যে যন্ত্রটি বেশ নিয়ম মতনই প্রত্যহ ঘুরে চলেছে সে হতে পেরেছে তারই একটা চাকা। তার বাড়িতে এমন জিনিস সে দেখেনি। টুপী প্রস্তুতকারীটি তাঁর আদেশের বলে সব জিনিসই ঠিক ঠিক মতন চালিয়ে চলেছেন, ঘড়ির কাঁটায়-কাঁটায় সব চলেছে: কাজ খাওয়া ঘুম—সব ঘড়ি ধ'রে। এর ব্যতিক্রম যদি কিছু হত, তা হলে তা কেবল ঘুম নিয়ে; রাত্রির কাজ থাকলে ঘুম বাদ দিতে হত, এবং সপ্তাহে একটা দিন এরকম হতই। দুপুরের খাওয়া বেলা ঠিক বারোটায়, সকালের খাওয়া ও রাত্রের খাওয়া এ-বেলা ও-বেলা ঘড়ি ধ'রে ঠিক আটটায়। তারা কাজ করতে করতে এইসব সময়ের নিয়ম মেনে চলত। সেই সময়ে অ্যানটনের দিন কাটত এই ভাবে—সকাল ছয়টা থেকে কাজ আরম্ভ, তখন থেকেই সে মনে মনে সকালের আহারটি চেখে দেখত, তারপর যখন সে তা সত্যিই পেত তখন সে একজন স্বাস্থ্যবান মানুষেরই ক্ষিদে নিয়ে তা খেয়ে নিত; এ সময় সে পেত একটু কফি একটু দুধ ও একটু রুটি ছাড়া কিছু না। তারপর সে লেগে যেত আবার কাজে, এবং দুপুরে খাবার আশায় তার কাজে প্রেরণা জোগাত, এ'তেই কাজের ক্লান্তিকর একঘেয়েমি অনেকটা কমে যেত তার।

জোসেফ ফন আইকেনডরফ

তাঁর গদ্য ও পদ্য রচনায় জোসেফ ফন আইকেনডরফ (১৭৮৮-১৮৫৭) জার্মানীর রোমান্টিক সাহিত্যের শেষের দিকের প্রতিনিধি-রূপে নিজেকে চিহ্নিত করেছেন। নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে মুক্তিযুদ্ধে একজন লেফন্যান্ট হিসাবে লড়াই করেন। তাঁর কবিতা প্রকৃতির প্রতি গভীর অনুরাগের ও আধ্যাত্মিক মেজাজের পরিচয় দেয়। তাঁর রচনায় রোমান্টিক কবিদের মতন পরস্পর বিরোধী মতবাদ নেই।

জার্মান অভিজাত সম্প্রদায়ের জীবন

জার্মান অভিজাত সম্প্রদায় সম্বন্ধে আইকেনডরফের বিবরণ "দি অ্যারিস্টক্রাসি অ্যাণ্ড দি রেভলিউশন" এই প্রমাণই দেয় যে, তিনি আর যা কিছুই হোন, তিনি গজদন্তমিনারে বসে স্বপ্ন দেখেননি। প্রকৃতপক্ষে তাঁর দৃষ্টি ছিল বেশ স্বচ্ছ। আমরা এখানে যে লেখা থেকে উদ্ধৃত করছি সেটি সংক্ষিপ্ত ও পরিচ্ছন্ন ভাবে জার্মান অভিজাতদের পদমর্যাদা সম্বন্ধে লিখিত ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ। তিনি এই কথাই বলতে চেয়েছেন যে, এ ধরণের জীবন প্রণালী অচল এবং ভেঙে যাবার মুখে। লেখকের জীবনের ঠিক আগের কালের অভিজাত সম্প্রদায় সম্বন্ধে তাঁর এই অত্যাশ্চর্য বর্ণনা ফরাসী বিপ্লবের এবং তার পরিণামে সে দেশে সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অভিজাতদের কর্মকাণ্ডের অবসানের কথাই আমাদের মনে করিয়ে দেয়।

যাঁরা খুব বৃদ্ধ হয়ে গিয়েছেন হয়তো এখনো তাঁরা সেকালের তথাকথিত সেই সুন্দর দিনগুলির কথা মনে করতে পারবেন। আসল কথা এই, সেসব দিন ভালোও ছিল না, পুরাতনও ছিল না, যা ছিল যা-ভালো এবং যা-পুরাতন তারই একটা ব্যঙ্গ মাত্র। তরবারি ছিল মাত্র পোশাকের একটা বাহার, শিরস্ত্রাণ হয়েছিল শূকরের লেজের মত লাঙ্গুল লাগানো একটা শিরোভূষণ, প্রাসাদের যিনি অধিপতি ছিলেন তিনি ডাকাতদলের একজন অবসরপ্রাপ্ত সর্দার, এই পথ দিয়ে যে সব বণিকেরা যেতেন তাঁর পূর্বপুরুষেরা তাঁদের ধন-সম্পত্তি লুঠ করতেন, এখন সেই প্রাসাদ নিরানন্দ, এখন সেখানে তাঁরা অবরুদ্ধ এবং শিল্পপতিদের দ্বারা ক্রমেই আরও কোনঠাসা হয়ে পড়ছেন। সে কালটা ছিল এমনই যখন শিভালরি জিনিসটাই ভেঙে পড়েছে, নিষ্প্রভ হয়ে গিয়েছে। সাদা চুলে তখন চলেছে কেবল কলপ লাগানো। ব্যাপারটা তুলনা করা চলে একজন বৃদ্ধ বিলাসপ্রিয় ব্যক্তির সঙ্গে, এখনও যে রমণীদের পরিচ্ছন্ন সমাবেশের সম্মুখে নানাবিধ অঙ্গভঙ্গি করে নাচ দেখাতে পারে, এবং বুঝতেই পারে না যে, পৃথিবীর কেউই আর তাকে তেমন যুবক বলে মনে করে না, বুঝতে তো পারেই না বরঞ্চ এ ব্যাপারে তারা বেশ স্পর্শকাতর। তার আগের কালের অভিজাতরা ছিল একবারেই মধ্যযুগীয় একটি ব্যাপার। তাঁরা এমন জীবন যাপন করতেন যেন তাঁরা সৌরজগৎ সৃষ্টি করেছেন ; সেই রাজকীয় গৃহের মধ্যমণি ছিল যে সূর্য তার চারদিকে ঘুরত প্রিন্স কাউণ্ট ইত্যাদি, আবার

ওঁদের চারদিকে ঘুরত চাঁদেরা ও অন্যান্য গ্রহ-উপগ্রহেরা। প্রভু ও প্রজার মধ্যে ধর্মীয় আনুগত্যের যে বাঁধনটি ছিল, তাই ছিল পৃথিবীর যাবতীয় ঘটনা ঘটাবার প্রধান শক্তি, এবং তাই ছিল জগতের যাবতীয় ঐতিহাসিক ক্ষমতার উৎস ও অভিজাত সম্প্রদায়ের জাগতিক তাৎপর্য। কিন্তু মধ্যযুগের সেই মর্মান্তিক ঘটনা—সেই ত্রিশ বছরের যুদ্ধ—অভিজাতদের একেবারে গুঁড়িয়ে শেষ করে ফেলেছে, যা নাকি ইতিমধ্যে বংশের ধর্মে পঙ্গু হয়েই পড়েছিল। কেন্দ্রে বা সবার মাথার উপরে থাকবেন একজন নৃপতি—এই আইডিয়া সরিয়ে ফেলার ফলেই শক্ত কাঠামোয় তৈরি দালানটাই যেন নড়বড়ে হয়ে উঠেছে। আনুগত্যের যে আদর্শ এতকাল আঁকড়ে ধরা ছিল এখন তার জায়গা দখল করেছে বস্তুবাদী জগতের প্রয়োজন, তা হচ্ছে অর্থ। প্রজাদের মধ্যে যারা একটু ক্ষমতাশালী ছিল তারা হয়ে গেল ডাকাত; যারা ছোটখাট লোক তারা এই গোলমাল বুঝতেই পারল না তাদের খুঁটি কার সঙ্গে বাঁধা, তারাই পেয়ে গেল বেশি সুযোগ ও বেশি মাইনে। যখন জোয়ারের জল নেমে গেল তখন বিস্মিত অভিজাতেরা অনেক দেরিতে বুঝলেন যে রাষ্ট্রের জাহাজ থেকে তাঁদের নামিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং তাঁরা এসে দাঁড়িয়েছেন সেই বালুকার উপর যা পায়ের নীচ থেকে অনবরত নেমে যাচ্ছে। যেসব অভিজাত জায়গীর পেয়েছিলেন তাঁরা ক্রমে আদালতে চাকরি নিয়ে ফেললেন, কেউ-বা যোগ দিলেন সেনাবাহিনীতে।

এই ভাবেই, বিশেষ ক'রে যাঁরা নাইট খেতাবধারী ছিলেন, তাঁরা প্রায় প্রত্যেকেই শেষপর্যন্ত আধুনিক কালের অফিসার বাহিনীতে কাজ নিলেন। এটা নিশ্চিত যে সাত বছরের লড়াই এইসব ঘটনার উপর একটু উজ্জ্বল রশ্মিপাত করে। গৌরবান্বিত হবার আকাঙ্ক্ষা, অভিযানে যোগ দেবার জন্যে বীরত্বের আনন্দ, সাহস, আনুগত্য পালনের জন্যে আত্মত্যাগ, এবং এই ধরণের অন্যান্য যে সব গুণ মধ্যযুগকে মহৎ করেছিল, সেইসব গুণ যেন আবার ফিরে আসতে লাগল। এসব সত্ত্বেও পুরাতন কালের নাইট খেতাবের মোহ এখনো কাটল না। কিন্তু কোনো কোনো বিশেষ ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব তাঁদের নিজেদেরই গৌরব বাড়াল এবং অমরত্বও হয়তো দিল, কিন্তু এ'তে সামগ্রিক ভাবে মনোভাবের পরিবর্তন হল না। এখানেও দেখা যায় সেই সাজপোশাক—যা নাকি প্রকৃতও নয়, আকস্মিকও নয়—তাই হল নতুন নাইটদের চরিত্র বোঝাবার সংকেত। লোহার বর্ম ধীরে ধীরে খর্ব হতে হতে হয়ে দাঁড়াল

বুক ও পিঠের আচ্ছাদন বিশেষ, এই আচ্ছাদনও ক্রমে হয়ে গেল বুকের উপর সামান্য একটা পাত, এই পাত ক্রমে হয়ে দাঁড়াল এক হাত চওড়া টিনের একটা ঢাকনা, এই ঢাকনাটি গলার একটু নীচ থেকে পরা হত যেন সেকালের সেই লোহার বর্মটির স্মৃতিরক্ষার জন্যে। তাঁর ডান হাতটি আগে থাকত পরিচ্ছন্ন ভাবে আবৃত, এবং একটি স্পেনদেশীয় রাজকীয় যষ্টির উপর তা থাকত স্থাপিত, মাথার দুই পাশ বৃদ্ধ শকুনের পাখার বদলে চুল জড়িয়ে করা থাকত দুটি কুণ্ডলী, এবং শূকরের লেজের মত শালর ঝুলত পিছনে। একজন নাইটের যদি শূকরের লেজ না থাকে তাহলে এই ঘাটতির কথাটা যেন ভাবা যায় না, যেসব ভাস্কর সাত বছরের লড়াইয়ের বীরপুরুষদের মূর্তি গড়েছেন তাঁরা এই অভাবটা বোধ করেছেন বড়ই বেদনার সঙ্গে। শূকরের ঐ লেজটা ছিল পরিবর্তিত সময়ের দুর্বোধ্য একটা প্রতীক ; যা কিছু স্বাভাবিক তাই যেন ফালতু এবং বর্জনযোগ্য মনে ক'রে সেসব বাদ দিয়ে করা হল মমির ফ্যাশানে একেবারে আঁটো পোশাক, এতেই অনেকটা বোঝা যেত তারা কোন বংশের সন্তান, এবং সে সময়কাব সেনাবাহিনীর শক্তিটা যে ছিল যাকে বলে কেন্দ্রাভিমুখী সেই রকম।

সে আমলের তরুণ অভিজাতরা কাজকর্ম করত যুদ্ধে নামবার জন্যে নয়, মেয়েদের সামনে জাঁক দেখিয়ে তাদের মোহিত করার জন্যে যতদিন অবশ্য তারা নিজের জমিদারির শাসনকার্যে রত না হত ; কিন্তু এমন কাজ যারা পেত না, তারা তাদের ঐ জাঁকজমকপূর্ণ সাজের ঘটা দেখিয়ে বেশ সুন্দরী বা কদাকার এমন মেয়েদের হাত করত যারা ওদের হাজার রকমের দেনা মিটিয়ে দিতে রাজি হত। নাইট সম্প্রদায় ভুক্তেরা উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছেন কিছু স্মৃতিচিহ্ন, নিজেদের পছন্দমতন ক'রে তা তাঁরা সাজিয়ে নিয়েছেন। সে আমলে মহিলাদের প্রতি যে সৌজন্য ও শালীনতা দেখানো হত তা এখন তাঁরা করে নিয়েছেন নিম্নস্তরের প্রেমাভিনয় ; যা ছিল সেকালীন জার্মানদের মর্যাদাবোধ এখন তা হয়ে দাঁড়িয়েছে ফরাসী পদ্ধতির সামান্য সম্মান জ্ঞান ; জায়গীরদারদের মধ্যে যে পারস্পরিক যোগ ছিল এখন তা সম্প্রদায়গত আত্মশ্লাঘায় পর্যবসিত। এঁদের এই চরিত্রের কিছু আঁচ পাওয়া যেতে পারে ফুকের নভেলের নায়কদের দেখলে।

সে আমলের অভিজাতেরা সাধারণভাবে তিনটি প্রধান ভাগে বিভক্ত ছিলেন। এর একটি ছিল সংখ্যায় খুব বেশি, স্বাস্থ্যেও খুব তেজী, এবং

এঁরা অনেকের কাছেই বেশ পছন্দসই ছিলেন ; এঁরা ছিলেন ছোট ছোট এস্টেটের মালিক, বড় বড় শহর থেকে অনেক দূরে ক্ষুদ্র জায়গায় এঁরা ছিলেন একেবারে বিচ্ছিন্নভাবে। এখন অবশ্য এরকম নেই। এখন বড় বড় সড়ক ও রেল লাইন সব দেশকে ও দেশের মানুষকে অনেক কাছে এনে একসঙ্গে বেঁধেছে, এবং হাজার হাজার সাময়িক পত্রিকা সভ্যতার ফুলের রেণু যেন বিশ্বময় জোনাকির মতন উড়ে বেড়াচ্ছে। এ অবস্থায় এখন সে আমলের অবস্থার কথা ভাবাই যায় না। সম্মুখের অরণ্যের গাছের মাথার উপর দিয়ে দূরের নীলবর্ণের পর্বতমালা সত্যিই এক অনবদ্য দৃশ্য ছিল, কৌতূহলও উদ্রেক করত সেগুলি। এখনকার পত্র-পত্রিকায় সেই বিশ্বের যে বর্ণনা এখনো মাঝে মাঝে ছাপা হয় তা যেন অবিশ্বাস্য মনে হয়, মনের সে সব যেন রূপকথার কাহিনী। তখনকার সেই একঘেয়ে জীবনে মাঝে মাঝে বৈচিত্র্যের ছেদ পড়ত যখন শিকারীরা বের হতেন শিকারে ; তাঁদের সেই হট্টগোল, শিকারের মহোৎসব, এবং শিকারীর মুখের লম্বা-লম্বা কথা দিয়েই সব শেষ হত, এবং তখন নিকটতম কোনো শহরের কোনো মেলায় যাওয়া হত দল বেঁধে। এই রকমভাবে মেলায় যাত্রাটা তখন একটা এলোমেলো ও অদ্ভুত ব্যাপার বলেই হয়তো মনে হত, কিন্তু এ আমলে কোনো আনন্দোৎসবে এ জিনিসটা বেশ মনোমুগ্ধকর বলেই মনে হবে। সবার সম্মুখে যেতেন মহিলার দল, তাঁদের পরনে থাকত সর্বশ্রেষ্ঠ রবিবারের সাজ, খুব নিরাপদ ছিল না এই যাত্রা, জীবনের ও শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ঝুঁকিও নিতে হত, রাস্তার অবস্থা ছিল শোচনীয়, সেই রাস্তা দিয়ে চলত পুরণো আমলের গাড়ি—অনবরত চাবুক কষে-কষে চালানো হত গাড়িটা, একবার সেটা যেত রাস্তার এ ধারে, একবার যেত ওধারে। আর, তার পিছন পিছন ভদ্রমহোদয়েরা যেতেন অন্যভাবে, একটা বেশ লম্বা টিনের বাকল যেন সাজানো হয়েছে, তার মধ্যে গাদাগাদি করে তাঁরা বসতেন, দুই পা দু'পাশে ফাঁক করে পিছন পিছন বসে যেতেন, এবং সবার কাঁধের উপর দিয়ে সম্মুখে চেয়ে থাকতেন।

শীতকালে এঁদের প্রতিবেশীরা তাঁদের বরফে ঘেরা আবাসে যখন এঁদের ডাকতেন, সেই মিলনসভায় এঁরাই হয়ে উঠতেন প্রীতির ও আনন্দের প্রতিমূর্তি এইসব দেখলেই বোঝা যেত যে, একটু আমোদ-আহ্লাদ করতে সামান্য উপকরণই দরকার হয়, সব ক্ষেত্রেই এই নগণ্য উপকরণেই কাজ চলে যেত। আজকাল একটা আনন্দোৎসবকে এই রকম সাফল্যমণ্ডিত

করার জন্যে বিরাট চেষ্টা ও ব্যবস্থার ফলে সেই উৎসবটিই মার খেয়ে যায়।

মস্তবড় বৈঠকখানা ঘরটা ঝটপট করে খালি করে ফেলা হত, তার মেঝের পাটাতন অনেক সময়ই নড় বড় করত, সেই ঘরটা ঠিক করা হত নাচের জন্যে, স্কুলের মাষ্টারমশাই ও তাঁর ছাত্রের দল হতেন বাদ্যকারের দল, এখানে ওখানে এলোমেলো ক'রে রাখা মোমদানিতে জ্বালিয়ে দেওয়া হত মোম, এর থেকে চারদিকে অস্পষ্ট আলো ছড়িয়ে পড়ত, সব মাথা একত্র ক'রে জমিদারের ও অরণরক্ষীর বৌয়েরা দল বেঁধে দাঁড়িয়ে পাশের দরজা দিয়ে বেশ সম্ভ্রমের সঙ্গে দেখত এই নাচ—তাদের উপরেও গিয়ে পড়ত ঐ আলো। কিন্তু সবচেয়ে উজ্জ্বল হয়ে যা জ্বলত তা হচ্ছে গ্রাম্যবালিকাদের চোখ, তারা সব সময়ই ফিসফিস করার হাসার ও পরস্পরকে বিরক্ত করার কী যেন উপাদান পেয়ে যেত এখান থেকে। তাদের এই সবল ও সহজ রসিকতা এখনো তাদের স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দকে দমন করার কৌশল শেখেনি, যা নাকি অনেকটাই হচ্ছে নৈতিক প্রবৃত্তিকে দমন করার চেষ্টা। অনেকেই এই দৃশ্যের তুলনা করতে চাইবে—সূর্যালোকে ক্রীড়ারত বেড়ালছানাদের সঙ্গে, যারা নিজের খুশিতেই লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়ায়। দুই-একজন ছাড়া এদের বেশির ভাগই বেশ সুশ্রী ও সুন্দরী, যে দুই একজনের কথা বলা হল তারা একটু রক্তিমাভ, খুব আঁটো জামা পরা, এক বোঁটায় দুটো কুঁড়ি হয় সেই জাতের ফুলের মত তাদের শরীর থেকে প্রচুর স্বাস্থ্য উপচে পড়ছে। নাচ আরম্ভ হত শরীরের একটা অদ্ভুত মোচড় দিয়ে এবং শেষ হত প্রচণ্ড গতিতে প্রস্থান ক'রে। সপ্রশংসা দৃষ্টিতে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা দর্শকদের মাঝখানে বেশ ভালো দুজন নাচিয়ে হয়তো দেখাত কসাক-নাচ: এদের একজন পুরুষ, একজন নারী। এরা একটুও এদিকে-ওদিকে না ঘুরে মুখোমুখি হয়ে নাচত, মেয়েটি মৃদু ভঙ্গিতে নাচত, পুরুষটি বীভৎস সাহসিকতা দেখিয়ে। এ কথা সত্যি যে, তখন যারা নাচত তারা শরীর আর মন একত্র করেই নাচত, এদের কিছুটা আত্মোৎসর্গ থাকত, একাগ্রতা থাকত; এর সঙ্গে তুলনা করা যায় আজ-কালকার নাচ—এর মধ্যে আছে প্রচুর অবহেলা ও গড়িমসিভাব, যার ফলে এ-নাচ হয়ে ওঠে ক্লান্তিকর একঘেয়েমি। পাশের ঘরে বেজে চলত বেহালা তার শাণিত সুরধ্বনি তুলে, ঢোলক বাজতে থাকত, এবং গ্লাসে-গ্লাসে অনবরতই চলত ঠোকাঠুকি। এই পানীয় ও সংগীত যদি বেশ জোরদার হয়ে উঠত,

তখন, এমনকি বৃদ্ধেরাও তাদের স্ত্রীদের বিরক্ত লক্ষ্য করেও দ্রুতবেগে গিয়ে যোগ দিত ঐ নাচে। এ আনন্দ ছিল যেন সংক্রামক। সব শেষে ঐ রাত্রির গভীরতা ভেদ ক'রে গৃহ-অভিমুখে যাত্রার সময় শীতের সেই তারাখচিত আকাশের নীচে এই নিবিড় নিস্তব্ধতার মধ্যে কেবল জেগে উঠত আধো-স্বপ্নের মতন ঐ সুন্দরীদের মুখ।

বেশির ভাগ সময়ই এই সুখী মানুষেরা সামান্য স্বাচ্ছন্দ্য নিয়েই বাস করত তাদের সাধারণ গৃহে (একে তারা বলত 'জমিদারি'), চারদিকের গ্রামীণ সৌন্দর্যের মাঝখানে তাদের এই গৃহ নিজের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করার জন্যে মনোরম বীথির প্রয়োজন বোধ করেনি, কেবল নিজেদের ঘরের জানালা দিয়ে তাদের খামার ও পশুশালা যাতে দেখা যায় তারই ছিল ব্যবস্থা। প্রত্যেক ব্যক্তির লক্ষ্য ছিল ভালো চাষী হয়ে ওঠার, এবং প্রত্যেক সুগৃহিনী রূপে প্রশংসা পেলে প্রত্যেক মহিলা হতেন গর্বিত। প্রকৃতির সৌন্দর্য নিয়ে মাথা ঘামাবার মত মাথাও তাদের ছিল না, তেমন সময়ও ছিল না; তারা নিজেরাই ছিল প্রকৃতিরই সৃষ্টি।

জীবনে কবিতা ব'লে তাদের কিছু ছিল না, যেটুকু-বা ছিল তা বিলাসিতা বলেই গণ্য হত। অল্পবয়সী মেয়েরা তাদের অবসর সময়ে সস্তা পিয়ানো বাজিয়ে সেকেলে গান গাইত একক গলায়, কিংবা সমবেত ভাবে, অথবা বাড়ির পিছনের অজস্র ফুলের অরণ্যের মধ্যে সবজির বাগান করার চেষ্টা করত। সকাল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ির ভিতরে ও বাইরে ভীষণ হট্টগোল আরম্ভ হয়ে যেত, মনে হত এর মুখোমুখি হলে মার খেতে হবে তাই আগন্তুকেরা সবজির বাগানে পালিয়ে যেত। সর্বত্রই বেশ শব্দ ক'রে দরজা খোলা হত বন্ধ করা হত। ঝগড়া-ঝাঁটি করতে-করতেও চেঁচামেচি করতে করতেই ঝাড়ুর কাজ, দুধ-দোয়ার কাজ ও মাখন-তোলার কাজ চলতে থাকত। চড়াই পাখিরা মনে করত এইসব কাজের মধ্যে তাদের কিছু করার আছে, তারা এই হট্টগোলকে কেন্দ্র করে বেশ খুশি মনে উপরে-উপরে উড়ে বেড়াত। খোলা জানালার মধ্য দিয়ে সূর্যের আলো এসে ছড়িয়ে পড়ত সারা বাড়িতে, হলুদ-হয়ে যাওয়া পারিবারিক ছবিতে, এবং আসবাবপত্রের উপরের পিতলের কারুকার্যের উপরে, যে কারুকাজ এ আমলেও বেশ উচ্চাঙ্গের শিল্প বলেই গ্রাহ্য হবে। গরমের দিনের বিকেলবেলা পাশের গ্রাম থেকে অনেকে এসে যেতেন। বেশ চেঁচিয়ে তাদের অভ্যর্থনা করা হত, শুভকামনা

জানানো হত, এবং তাঁদের স্বাস্থ্যের বিষয় অনুসন্ধানাদি করা হত। অনেকেই ভাঙা গ্রীষ্মাবাসটির ছাদে চলে যেতেন, সেই ছাদে বেশ রংচং-করা কামদেবের কাঠের মূর্তিটির হাতের তীর আর ধনুক কবে খোয়া গেছে। এখানে আলাপ-আলোচনার বিষয় ছিল মহিলাদের নিয়ে এবং তাঁদের ঠাট্টাবিদ্রূপ করায়, প্রচুর-পরিমাণে কফি-পান চলত, সেইসঙ্গে চলত ধূমপান ; এর পর আলোচনা আরম্ভ হত শস্যাদির দর-দাম নিয়ে, চাষ-আবাদের উপযোগী কিরকম আবহাওয়া সবাই আশা করছে তা নিয়ে, মামলা নিয়ে, করের বোঝা নিয়ে, এবং এই জমিদারির ছোট-ছোট দুষ্টু ছেলেরা চেরি-গাছের নীচে বসে চেরি-ফলের বীচি ছুঁড়ে-ছুঁড়ে মারত তাদের বোনেদের গায়ে, যে বোনেরা বাগানের বেড়ার ওপারের দৃশ্যের দিকে এক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকতে-থাকতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে; দূরের ঐ মাঠের ওপারের সেনাবাস থেকে কখন পাখির পালকের টুপী মাথায় অশ্বারোহী সেনা-অফিসার আর্বিভূত হবেন, এই জন্যে যাদের প্রতীক্ষা। এবং সমস্তটা সময় গোলাবাড়ির প্রাঙ্গণ থেকে চড়ুই পাখিদের একটানা কিচিরমিচির বাজতেই থাকত, বড়-বড় পাখিরা গোগ্রাসে খেয়ে চলত দানা, শস্য ঝাড়ার একঘেয়ে শব্দ, এবং গ্রাম্যজীবনের আরও যত রকমের সংগীতময় ধ্বনি থাকতে পারে সবই দূরদেশী মানুষকে হঠাৎ গৃহগতপ্রাণ করে বিষণ্ণ করে তুলত। শস্যক্ষেতের নীচে সবুজ প্রান্তরের উপর দিয়ে মৃদু বাতাস বয়ে সেখানে ঢেউ জাগাত, চারদিকে নিস্তব্ধতার কেমন থমথমে ভাব। কেউ লক্ষ্য করত না, কিংবা কেউ হয়তো সেদিকে মনোযোগও দিত না, কিন্তু পশ্চিম-আকাশে যে জমে উঠেছে ঝড়ের সংকেত, এবং বিদ্যুতের চমক এই দিকেই আসছে—একটু আগেই এর সম্ভাবনার কথা তারা বলাবলি করেছিল, বিদ্যুতের আলো ঐ অন্ধকার বনমালার উপরে চমকে-চমকে উঠছে।

একালে এরকম চমক আর নেই, এখন সবাই বেশী জ্ঞানী, হঠাৎ যখন ফ্রান্সের টাইম-বোমা ফেটে যায় তখন সেই হঠাৎ-শব্দে চারদিকে সবাই হয়ে যায় হতভম্ব।

এক অপদার্থের সংক্ষিপ্ত জীবন কথা

আইকেনডরফের গল্প "মেময়ার অব এ গুড-ফর নাথিং" (১৮২৬) হচ্ছে জীবন সম্বন্ধে রোমান্টিক যুগের শেষের দিকের বিশেষ ধরণের মনোভাবেরই প্রতিরূপ। দূরদেশে যাবার জন্যে জন্যে যার বহুদিনের আকাঙ্ক্ষা এ এক কল-

চালকের এমনি এক ছেলে গেল বিশাল বিশ্বের পথে। অনেক রকম অলৌকিক অভিযানের পর অবশেষে সে বিয়ে করল। গল্পটায় প্রেমের ছড়াছড়ি, প্রকৃতি এবং সংগীত সম্বন্ধে অনেক ভাবাবেগের কথা বেশ প্রশান্তির ও মাত্রানুরূপের সঙ্গে এতে বলা হয়েছে। গল্পটির মাঝে-মাঝেই আছে কবিতা,এর বর্ণনা খুব সহজ কিন্তু আবহাওয়া গড়ে তোলার পক্ষে বেশ সহায়ক।

সপ্তম অধ্যায়

বেশ দ্রুত গতিতে রাত্রিদিন ধরে এগিয়ে চলতে লাগলাম, কেননা আমার কানের মধ্যে সব সময় একটা শব্দ বাজত, মনে হত ঐ দুর্গ থেকে লোকজন চীৎকার করতে-করতে হাতে মশাল ও ছুরি নিয়ে পাগলের মতন যেন আমার দিকে আসছে। পথে, কৃষকদের কাছ থেকে জানতে পারি যে, আমি এখন রোমের থেকে মাত্র কয়েক মাইল দূরে আছি। এ কথা শুনে আনন্দে আমার শরীর যেন কেঁপে উঠল। কেননা, বাড়িতে থাকার সময়, যখন বেশ ছোটই ছিলাম, তখন রোমের গৌরবের অনেক গাথা আমি শুনেছি। রবিবারের বিকেলবেলায় যখন ঘাসের উপরে শুয়ে থাকতাম আমার বাবার কলের কাছে, তখন আমি মনে মনে কল্পনা করেছি, আমার মাথার উপর ঐ চলন্ত মেঘের মধ্যে যেন ভেসে চলেছে সেই শহর তার আশ্চর্য পাহাড় নিয়ে দাঁড়িয়ে এবং তার পিছনে গাঢ় নীল সমুদ্র, তার সোনালি ফটক, উঁচু উঁচু ঝলমলে মিনার— যেখান থেকে সোনার সাজ পরে স্বর্ণদূতেরা তাদের স্তবের গান গাইত— কল্পনায় আমি এইসব দেখতাম। কখন রাত্রি নেমে যেত জানিনে, উজ্জ্বল আলো নিয়ে উঠে আসত চাঁদ, আমি তখন বন থেকে বেরিয়ে এসে দাঁড়াতাম যেন পাহাড়ের উপর, যার অনেক দূরে ছিল সেই চির-আকাঙ্ক্ষিত শহর। বহুদূরে সমুদ্রের বিস্তার, অগণ্য তারায় ভরা আকাশের ঝিকমিক আমাদের সমস্ত চেতনা দিয়েও আঁকড়ে ধরতে পারতাম না, এই সবের অন্তরালে ছিল সেই পবিত্র শহর, মনে হত সেটা যেন একখণ্ড মেঘ, কিন্তু পৃথিবীর উপরে সেটি ঘুমন্ত সিংহের মত, এবং চারদিকের পাহাড়গুলো যেন দৈত্যের মতন দাঁড়িয়ে তার পাহারায় রত।

প্রথমে আমি এসে পৌঁছালাম এক নির্জনে পরিত্যক্ত প্রান্তরে, এখানে সবই জীর্ণ, এবং শ্মশানভূমির মতই লোকালয়হীন। এখানে ওখানে মাত্র কয়েকটি

প্রাচীরের ধ্বংসাবশেষ, এবং শুকনো ঝোঁপ, মাঝে মাঝেই নিশাচর পাখির পাখা ঝাপটানির শব্দ বাতাসে-বাতাসে বেজে উঠছে, এবং এই নিস্তব্ধতার মধ্যে আমারই নিজের ছায়া কখনো লম্বা হয়ে কখনো বা খাটো হয়ে আমাকে অনুসরণ করে চলেছে। কথিত আছে যে সময়ের মতনই প্রাচীন একটি শহর এইখানে আছে মাটির নীচে, এবং তার মধ্যেই আছেন রোমের সেই সৌন্দর্য ও প্রেমের দেবী ভেনাস, এবং মাঝে-মাঝেই পুরাতনকালের পৌত্তলিকেরা তাঁদের কবর থেকে উঠে এসে পথিকদের বিপথে চালনা করেন। আমার প্রত্যেক পদক্ষেপের সঙ্গে শহরটি বেশ স্পষ্টভাবে তার জাঁকজমক নিয়ে জেগে উঠতে লাগল; এবং সুউচ্চ পর্বতমালা, মিনার, সোনার গম্বুজ চাঁদের আলোয় এখন ঝলমল করে উঠল যাতে মনে হল দেবদূতেরা তাদের সোনার সাজ প'রে ঐ ছাদের সমতলে দাঁড়িয়ে সত্যিই গান করছে এই নিস্তব্ধ রাত্রিতে।

আমি এগিয়ে গেলাম, প্রথমে কয়েকটা ছোট-ছোট বাড়ির পাশ দিয়ে তারপর বেশ মনোরম একটা ফটক-পথ পার হয়ে আমি প্রবেশ করলাম সেই বিখ্যাত শহর রোমে। দুটি প্রাসাদের মাঝখান দিয়ে চাঁদের জ্যোৎস্না এমন ভাবে ছড়িয়ে পড়েছে যে, মনে হচ্ছে—এটা যেন দিনের বেলা। কিন্তু রাস্তাগুলো সবই ফাঁকা, কিন্তু শ্বেত-পাথরের কতকগুলি সিঁড়ির একপাশে এই মৃদু রজনীর নিস্তব্ধতার মধ্যে মৃতের মত শুয়ে ঘুমচ্ছে জীর্ণ পরিধান পরিহিত একটা লোক। নিঃশব্দ প্রাঙ্গণে ফোয়ারার ধারা উঠছে উপরে, এবং রাস্তার পাশের বাগানে সেই জল পড়ার শব্দ হচ্ছে, এতে বাতাস যেন ভরে যাচ্ছে আনকোরা সুবাসে।

আমি এগিয়ে যেতে লাগলাম, আনন্দ জ্যোৎস্না বা মধুর সুবাসের কথা ভাবলাম না, ভাবতে লাগলাম কোথায় এবার যাব। এই কথা ভাবছি এমন সময়ে বাগানের ভিতর থেকে গিটারের শব্দ এল। আমি ভাবলাম, "হা ভগবান। লম্বা ওভারকোট প'রে একটা ছেলে চুপচাপ আমার পিছন পিছন আসছে!" কিন্তু গিটারের ঐ ধ্বনির সঙ্গে ভেসে এল একটি নারীকণ্ঠ, বেশ মিষ্টি গলায় তিনি গান গাইছেন। আমি মন্ত্রমুগ্ধের মত দাঁড়িয়ে গেলাম, কেননা ঐ গলার স্বর আমারই সুন্দরী প্রিয়সখীর, এমন ঐ গান সেই ইটালীর সংগীত যেটি সে খোলা জানালায় দাঁড়িয়ে আমাদের দেশে গাইত।

তখন সেই পরমপ্রিয় পুরাতন দিনগুলো আমার বুকের ওপরে এমন

প্রবল ভাবে এসে পড়ল যে, আমার মনে হল ভীষণ করুণভাবে আমার কাঁদা উচিত; ভাবতে লাগলাম সকালবেলার সেই প্রাসাদের সম্মুখের বাগানটির কথা, কিরকম আনন্দের সঙ্গে আমি দাঁড়িয়ে ছিলাম সেই লতাগুল্মের মধ্যে যখন ঐ বেকুব মাছিটা এসে ঢুকল আমার নাকে। আমি আর সহ্য করতে পারলাম না, এবং গিলটি করা দরকার খাঁজে পা দিয়ে আমি সেই বাগানে গিয়ে পড়লাম যেখান থেকে ভেসে আসছিল ঐ গান। তখন আমি দেখতে পেলাম একটু দূরে পপলার গাছের নীচে একটা শুভ্র ও মোলায়েম শরীর দাঁড়িয়ে আছে। আমি যখন ঐ দরজা ডিঙাচ্ছিলাম তখন থেকে অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে আছে, কিন্তু হঠাৎ সেই শরীরটি অন্ধকার বাগান পার হয়ে ঐ বাড়িটির দিকে এমন ভাবে ছুটে গেল যে, চাঁদের আলোয় তার দ্রুত পদক্ষেপ দেখতেই পেলাম না। আমি চেঁচিয়ে উঠলাম, "এ সেই অবশ্যই!" এবং আবার বুক আনন্দে আন্দোলিত হয়ে উঠল যখন আমি তার ছোট ছোট দ্রুতধাবমান পা দুটো চিনতে পারলাম। বাগানের ফটক থেকে ঝাঁপ দিয়ে পড়ার সময় আমার পায়ে বেশ টান ধরে গিয়েছিল, ঐ বাড়িতে ছুটে যাবার আগে কিছুক্ষণ আমাকে পা টেনে টেনে চলতে হয়েছিল; ইতিমধ্যেই বাড়িটার দরজা-জানালা আঁট ক'রে বন্ধ ক'রে দেওয়া হয়েছিল। আমি আস্তে আস্তে দরজায় ঘা দিলাম, কান পেতে রইলাম, আবার ঘা দিলাম। আমি কান পেতে আছি, আর কল্পনা করছি আমি বেশ সুন্দর ধ্বনি শুনতে পাচ্ছি, যেন চাপা ফিসফাস শব্দ, আমার মনে হল আবার যেন দরজার ফাঁক দিয়ে এই চাঁদের আলোর মধ্যেও দেখতে পাচ্ছি দুটি উজ্জ্বল চোখ। এরপর সব আবার চুপচাপ হয়ে গেল।

"ও কি বুঝতে পারছে না যে, এ আমিই?" আমি মনে মনে ভাবতে লাগলাম, ও আমার সঙ্গী বেহালাটি হাতে নিয়ে ঐ বাড়ির পাশের রাস্তায় বাজাতে লাগলাম বেহালাটি এবং সঙ্গে সঙ্গে "সুন্দরী ললনা" গানটি গাইতে লাগলাম এবং বেশ আনন্দের সঙ্গে আরও অনেক গান গাইতে লাগলাম, ঠিক যেভাবে এই রকম গান গাইতাম প্রাসাদ-উদ্যানে সুন্দর-সুন্দর রাত্রিতে কিংবা সমুদ্র-সৈকতে, যাতে আমার গান গিয়ে পৌঁছত ঐ প্রাসাদের গবাক্ষে। কিন্তু সবই বৃথা হল, ঐ বাড়ির কোনো মানুষেরই মনে একটু সাড়া জাগল না। তখন আমি বেদনার সঙ্গে আমার বাজনা থামিয়ে, দরজার সম্মুখের সিঁড়িতে শুয়ে পড়লাম। আমার এই দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় আমি খুব ক্লান্ত

হয়ে পড়েছিলাম। রাত্রিটা ছিল ঈষৎ উষ্ণ, এবং বাড়ির বাগান থেকে ফুলের সুন্দর গন্ধ আসছিল, এবং সুসজ্জিত ঐ ফোয়ারা গভীর অন্ধকার থেকে যে শব্দ ছড়াচ্ছিল এই সুগন্ধের সঙ্গে তা মিশে শব্দটা লাগছিল বেশ মনোরম। আমি স্বপ্নের ঘোরের মধ্যে যেন দেখতে পাচ্ছিলাম অপূর্ব নীল ফুল, গভীর সবুজ সুন্দর তৃণাচ্ছাদিত ভূমি—যেখানে ঝর্ণা ঝরে পড়ছিল, নদী ছুটে চলেছিল, উৎফুল্ল পাখিরা মধুর গান গাইছিল। এই স্বপ্ন দেখতে দেখতে আমি ঘুমিয়ে পড়লাম।

যখন জেগে উঠলাম তখন আমি আপাদমস্তক সকালের ঐ সতেজ শান্তি উপলব্ধি করলাম। আমার জাগার আগেই জেগে উঠেছিল পাখিরা, এবং গাছে গাছে তারা কিচির-মিচির করে উড়ে বেড়াচ্ছিল, মনে হচ্ছিল আমার খুশিতেই বুঝি তারাও খুশি। আমি লাফিয়ে উঠে পড়লাম, এবং চারদিকে তাকাতে লাগলাম। বাগানের ফোয়ারা থেকে এখনো জলের ধারা উপচে উঠছে, কিন্তু সারা বাড়িতে এ ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই। আমি জানালার সবুজ খড়খড়ির মধ্য দিয়ে ভিতরে উঁকি দিলাম; আমি দেখতে পেলাম একটা সোফা এবং মস্ত একটা গোলটেবিল ধূসর রঙের আচ্ছাদন বস্ত্র দিয়ে ঢাকা, চেয়ারগুলো দেয়ালের গায়ে বেশ সাজিয়ে রাখা, বাইরে সব জানালা বেশ ভালো ক'রে বন্ধ করা, এখানে যেন বহু বছর হল কেউ বাস করে না। এই নির্জন বাড়িতে ও বাগানে হঠাৎ আমি চমকে উঠলাম, চমকে উঠলাম গত সন্ধ্যার সেই পলায়নপর শুভ্র মূর্তিটি দেখে; আর কিছু না ভেবেই সেই ছায়াচ্ছন্ন পথ ধরে আমি দৌড় দিলাম, এবং ছুটে গিয়ে উঠে পড়লাম সেই ফটকে। কিন্তু সেখানে আমি বসে রইলাম মন্ত্রমুগ্ধের মত, আমি সেই উঁচুতে বসে গৌরবময় শহরটিকে দেখতে লাগলাম। সকালের সূর্য তার রোদ ছড়িয়ে দিয়েছে ছাদে ছাদে, দীর্ঘ নির্জন রাস্তায়, আমি মনের উল্লাসে চেঁচিয়ে উঠলাম, এবং নূতন জীবনী শক্তি পেয়েই যেন সেখান থেকে লাফ দিলাম।

কিন্তু এই বৃহৎ ও অত্যাশ্চর্য শহরের কোথায় আমি যাব? রাত্রের সেই অদ্ভুত অভিযান এবং সুন্দরী ললনাটির সেই মধুর গান আমার মাথার মধ্যে ঘুরতে লাগল। আমি ঝরণার ধারের একটা পাথরে গিয়ে বসলাম—এই খোলা জায়গাটির মাঝখানেই বসানো ছিল পাথরটা। পরিষ্কার জলে আমি আমার চোখ ধুয়ে নিলাম, এবং গাইতে লাগলাম—

“আমি যদি হইতাম বনের ছোট পাখি
জানি জানি তবে আমি কী গান গাইতাম,
পাখা দুটি হত যদি আমারই কেবল
জানি জানি তবে উড়ে কোথায় যেতাম।”

“বা, বা! সূর্যের প্রথম আলো পেয়েই তুমি তো বেশ ভরত পাখির মত গান গাইছ!” একটা জোয়ান বয়সী ছেলে হঠাৎ বলে উঠল, কখন সে নিঃশব্দে এই ঝরণার ধারে এসে পড়েছে তা টের পাইনি। কিন্তু আমার কানে হঠাৎ অপ্রত্যাশিত এই জার্মান কথা যেন আমার নিজের গ্রামের রবিবারের গির্জার সেই ঘণ্টা ধ্বনির মত বেজে উঠল। সেই পাথরের পাটাতন থেকে লাফিয়ে উঠে আমি বলে উঠলাম, “হে আমার প্রিয় স্বদেশবাসী, আপনাকে অভ্যর্থনা জানাই। জোয়ান লোকটি আমার মাথা থেকে পা পর্যন্ত চোখ বুলিয়ে বলল, “কিন্তু এখন তুমি এই রোম নগরীতে কী করছ?” এর ঠিক উত্তরটা কি হবে তা আমি তখনই জানতাম, কিন্তু আমি যে সুন্দরী কাউন্টেসের সন্ধানে এখানে এসেছি সে কথা বলার ইচ্ছে হল না। সেইজন্যে বললাম যে, পৃথিবীটা দেখার জন্যে আমি একটু ঘুরে বেড়াচ্ছি। ছেলেটি হেসে বলল, “বা, বেশ। আমরা দুজনে তবে একই কাজে আছি। আমিও প্রায় ঐ অভিপ্রায়েই ঘুরছি, যাতে পৃথিবীটা দেখে তার কিছুটা অন্তত ক্যানভাসে এঁকে তুলতে পারি।” তবে তুমি বুঝি একজন শিল্পী, একজন চিত্রকর?” আমি আনন্দের সঙ্গেই তাকে বললাম, কারণ আমার তখন মনে পড়ল দু'জনের কথা—লেনার্ড ও গুইডো। কিন্তু আমার এই নতুন বন্ধুটি আমাকে কথা বলার সুযোগ দিল না। সে বলল, “আমার ইচ্ছে তুমি আমার সঙ্গে গিয়ে আমার সঙ্গে প্রাতরাশ সারবে, তখন আমি তোমার এমন ছবি এঁকে দেব যে, অনেকে তা দেখে ভাল বলবে।” আমি তখনই রাজি হয়ে গেলাম, এবং ফাঁকা রাস্তা ধ'রে শিল্পী বন্ধুটির সঙ্গে চললাম, রাস্তার দু পাশে যখন দু-একটা জানালা সবে খোলা হচ্ছে, তখন দেখা যাচ্ছে দুটি শ্বেত বাহু এবং ঘুম জড়ানো মুখ।

সে আমাকে অনেক সরু ও অন্ধকার আঁকাবাঁকা গলি দিয়ে নিয়ে চলল, অবশেষে আমরা পেঁছিলাম ধোঁয়াটে রঙের একটা বাড়িতে। সেখানে আমরা ধাপে ধাপে সিঁড়ি ভেঙে চললাম, মনে হত লাগল আমরা যেন স্বর্গে পৌঁছতে চাই; কিন্তু আমরা একটা ছাদের নীচে একটা দরজায় এসে

দাঁড়ালাম, তখন শিল্পী বন্ধুটি তার প্রত্যেকটি পকেট তড়বড় করে কী যেন খুঁজতে লাগল। শেষ পর্যন্ত সে মনে করতে পারল যে, সে বের হবার সময় চাপ তালার চাবিটা ঘরের মধ্যেই রেখে এসেছে; সকাল হবার আগেই সে সূর্যোদয়টা মনোযোগ দিয়ে দেখার জন্যে বেরিয়ে পড়েছে। যাই হোক, সে তাঁর কাঁধ ঝাঁকি দিল, এবং বেশ শান্তভাবে দরজায় একটা লাথি দিয়ে খুলে ফেলল দরজা।

ঘরটা বিরাট বড়, লম্বায় চওড়ায় এমন যে এখানে বল্‌নাচের ব্যবস্থা করা যায়, যদি অবশ্য মেঝেটা সাফ করা হয়। মেঝেময় বুট জুতো কাগজ জামা-কাপড় ও উলটে পড়া রঙের বাক্স সব একাকার হয়ে আছে, আর মাঝখানে এমন একটা জিনিস দাঁড় করানো যা দিয়ে গ্রামের লোকেরা গাছ থেকে ফল পাড়ে—অর্থাৎ সেটা যেন একটা আঁকশি, আর, দেয়ালে দেয়ালে বড় বড় সব ছবি। কাঠের একটা লম্বা টেবিলে একটা প্লেট, এবং একটা চিত্রাঙ্কণের খসড়ার পাশে পড়ে আছে রুটি ও মাখন, এবং তার খুব কাছেই একটা মদের বোতল।

শিল্পী বলে উঠলেন, "এবার এসো আমার স্বদেশবাসী, একটু পানাহার করো। আমি রুটির স্লাইসের উপর মাখন মাখাব বলে তৈরি হয়েছি, কিন্তু দেখলাম, ছুরি নেই। টেবিলের কাগজপত্রের মধ্যে অনেক খোঁজ করে অবশেষে একটা মোড়কের তলা থেকে পাওয়া গেল ছুরি। সকালের বাতাস যাতে ঘরে ঢুকতে পারে সেজন্যে তখন শিল্পী খুলে দিলেন জানালা। আমি চমৎকার দৃশ্য দেখতে লাগলাম, এই শহরের উপর দিয়ে ঐ পাহাড় পেরিয়ে যেখানে সকালের সূর্যের আলো সাদা সাদা বাড়ির উপরে ও আঙুরের ক্ষেতে ছড়িয়ে পড়েছে সেই দৃশ্য। শিল্পী আনন্দে চেঁচিয়ে উঠল, "কী আনন্দ, কী আনন্দ! ঐ দূরে ঐ পাহাড় শ্রেণীর পিছনে আমাদের শান্ত সুন্দর জার্মানী।" বোতলে সে চুমুক দিয়ে আমার দিকে এগিয়ে ধরল। নম্রভাবে আমি তাকে ধন্যবাদ দিলাম, এবং বহু দূরের ঐ সুন্দর ভূমিকে হাজার বার আমার হৃদয়ের অভিনন্দন জানালাম।

ইতিমধ্যে শিল্পী একটা কাঠের ফ্রেম জানালার কাছে ঠেলে নিয়ে গিয়েছে এবং তার উপরে বেশ বড় কাগজ মেলে নিয়েছে। সেই কাগজে একটা জীর্ণ কুঁড়ে ঘর কেবল কালো কালিতে বেশ সুন্দর ক'রে আঁকা, এবং তার মধ্যে যিশু-মাতার অতি সুন্দর অথচ বিষণ্ণ মুখ। তাঁর পায়ের কাছে,

একগুচ্ছ খড়ের মধ্যে, শিশু যিশু শুয়ে বেশ মিষ্টি হাসি হাসছে, কিন্তু চোখ দুটো বেশ বড় ও আন্তরিকতাপূর্ণ তার দৃষ্টি। কুঁড়ের বাইরে ধাপের উপরে দুটি রাখাল বালক হাঁটু গেড়ে তাদের লাঠি ও থলে নিয়ে বসা। শিল্পী বলল, "শোনো ঐ রাখাল বালক দুটির একজনের ঘাড়ের উপর আমি বসাতে চাই তোমার মাথা, এতে পৃথিবীর মানুষের কাছে পরিচিত হবে তোমার মুখ, এবং ঈশ্বরও খুশি হবেন। আমরা দু'জন যখন ম'রে যাব শেষ হয়ে যাব তারও পরে এ'তে সকলের আনন্দই হবে বহুদিন ধ'রে। আর, আমরা তো ঐ দুটি ভাগ্যবান ছেলের মতই ঐ ভাগ্যবতী মাতা ও তাঁর পুত্রের কাছে হাঁটু গেড়েই আছি।" এই কথা বলে সে একটা পুরণো চেয়ার নিল, এবং সেটা যেই তুলতে গিয়েছে অমনি তার অর্ধেকটা তার হাতেই থেকে গেল। তৎক্ষণাৎ সে সেটা জায়গা মত রেখে মেঝের উপর জোরে ঠুকল যাতে এটা এঁটে যায়, এবং ঐ ফ্রেমের দিকে সেটা ঠেলে দিয়ে আমাকে বসতে বলল, এবং আমার মুখটা তার দিক থেকে একটু ফিরিয়ে রাখতে বলল। ঐ ভাবে, একটুও নড়াচড়া না করে আমি কিছুক্ষণ বসে রইলাম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমি এ অবস্থাটা সহ্য করতে কেন পারলাম না তা আমি ঠিক জানিনে। আমার মনে হত লাগল আমি যেন ডান দিকে ও বাঁ দিকে সরে যাচ্ছি। আমার ঠিক সামনেই একটা আয়না ঝুলছিল, আমি একদৃষ্টে সেইদিকে চেয়ে ছিলাম, আর, বলতে দোষ নেই, কেবল সময় কাটাবার জন্যেই আমি আমার ছায়াকে মুখ-ভেংচি কাটছিলাম। শিল্পী এ সবই লক্ষ্য করছিল, অবশেষে সে হাসি আর চাপতে পারল না, এবং আমাকে ইশারায় জানাল যে আমি উঠতে পারি। ইতিমধ্যে রাখাল বালকের ঘাড়ের উপরে আমার মুখ আঁকা হয়ে গিয়েছে, আমার মুখ এমন অবিকল আমারই মুখের মতন দেখে আমি আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠলাম।

সে এঁকেই যেতে লাগল, গুনগুন করে গান গাইতে লাগল, এবং জানালা দিয়ে বাইরে চেয়ে মাঝে মাঝে দেখতে লাগল দূরের অপরূপ দৃশ্য; আর, আমি রুটি মাখন খেলাম, ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে করতে ছবিগুলো দেখতে লাগলাম। হিসেব ক'রে দুটো ছবি আমার খুব ভালো লাগল। জিজ্ঞাসা করলাম, "এ দুটোও কি তোমার আঁকা?" সে বলল, "হা ঈশ্বর! ও দুটো যাঁরা এঁকেছেন তাঁরা দুই মহৎ ও বিরাট শিল্পী। তাঁরা হলেন লেনার্দো দ্য ভিন্‌সি ও গুইডো রেনি। কিন্তু এসব তুমি কিছু জান না।" তার

শেষ মন্তব্য শুনে আমি ক্ষুণ্ণ হলাম, কিন্তু শান্ত ও সহজ ভাবে বললাম, "আমি ঐ মহৎ শিল্পীদের চিনি, আমার সংগতি কতটা তাও জানি।"

সে পিছনে সরে এসে দুই চোখ বড় বড় করে আমার দিকে তাকাল, বলল, "এ কথার মানে কী হল ?"

"কেন, আমি কি দিন রাত্রি ক'রে ঘোড়ার পিঠে চড়ে, গাড়ির মাথায় বসে তাঁদের সঙ্গে ঘুরিনি ? আমার টুপীর কিনার দিয়ে কি তখন শিস দিয়ে বয়ে যায়নি বাতাস ? তারপর কি একটা সরাইখানায় আমি তাদের হারিয়ে ফেলিনি ? তারপর তাদের গাড়িতে চেপে একা একা আমি কি আবার ধাওয়া করিনি, যখন বোমার মতন কী একটা জিনিস এসে গাড়ির চাকায় ঘা দিল একটা বিরাট বড় পাথরের উপর, আর—"

"ও হো হো !" আমি যেন পাগল এইভাবে আমার দিকে চেয়ে শিল্পীটি ওইরকম শব্দ করে উঠল, তারপর ভীষণ হাসিতে ফেটে পড়ে সে বলল, "বাস্, বাস্, আর বোলো না। আমি বুঝতে পেরেছি। গুইডো ও লেনার্ড নামের দুই শিল্পীর সঙ্গে তুমি বেড়িয়েছিলে।" তার এ কথায় আমি সম্মতি জানাবা-মাত্র সে লাফিয়ে উঠল, এবং তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার আপাদমস্তকে তাকাল। সে ঐ ভাবেই আমার দিকে চেয়ে বলল, "আমার মনে হয়, অবশেষে আমরা দুজন—তুমি বেহালা বাজাতে পার ?" আমি আমার পকেটে থাবা দিলাম যাতে পকেটস্থ বাদ্যযন্ত্রটি একটু বেজে উঠে এর জবাব দেয়। সে বলতে লাগল, "শোনো এই রোমেই একজন তরুণী জার্মান কাউণ্টেস আছেন, তিনি ঐ দুই শিল্পীর জন্য তন্নতন্ন করে সর্বত্র খোঁজ করছেন। এবং তার সঙ্গে খোঁজ করছেন একজন তরুণ বেহালা বাদকের।" মহা উল্লাসে আমি বলে উঠলাম, "জার্মানীর এক তরুণী কাউণ্টেস ! তুমি কি জান তার সঙ্গে কোনো পোর্টারও এসেছে কিনা ?" শিল্পীটি হেসেই উত্তর দিল, বলল, "আমি খুঁটিনাটি কিছু জানিনে। আমার এক বান্ধবীর বাড়িতে আমি তাকে দু-তিনবার মাত্র দেখেছি, আমার সেই বান্ধবীটি অবশ্য শহরে বাস করেন না। তুমি তাকে চেনো ?" বলেই সে হঠাৎ দেয়ালের কোণে রাখা একটা ছবির ঢাকনা তুলে ধরল।

একটা গাঢ় অন্ধকারাচ্ছন্ন ঘরের একটা জানালা খুলে দেওয়ামাত্র হঠাৎ সূর্যের আলো চোখে পড়লে যেমন অবস্থা হয় আমার যেন সেই অবস্থা হল। কেননা—এ যে হচ্ছে সেই সুন্দরী স্বয়ং। কালো মখমলের পোশাক পরে সে

দাঁড়িয়ে আছে একটা বাগানে, এক হাত দিয়ে তার মুখের উপরের ওড়না সরিয়ে রেখেছে, এবং এক অপরূপ দৃশ্যের দিকে শান্ত ভাবে চেয়ে আছে। যতই আমি ওই দিকে চেয়ে রইলাম, ততই আমার মনে হতে লাগল যে, ঐ বাগান সেই প্রাসাদেরই বাগান—ফুল ও পাতারা যেখানে বাতাসে একটু একটু দোল খায়। এবং দূরে ঐ ছবির গভীরে দেখতে পেলাম আমার সেই ঘণ্টাঘর, সবুজ মাঠের মধ্যে দিয়ে এঁকে-বেঁকে চলে যাওয়া সেই রাজপথ, সেই ড্যানিউব নদী, এবং দূরের নীল পর্বতশ্রেণী।

আমি চেঁচিয়ে উঠলাম, "এ সেই। এ সেই।" আমার টুপী চেপে ধ'রে দরজার দিকে ছুটে গেলাম, তারপর সিঁড়ি ভাঙতে-ভাঙতে নীচে নামতে লাগলাম। কেবল শুনতে লাগলাম বিচলিত ও বিস্মিত আমার শিল্পী বন্ধুটি পিছন থেকে বলে চলেছেন আমি যেন বিকেলের দিকে অতি অবশ্যই আসি, এবং তাহলে আমরা আরও অনেক-কিছুই জানতে পারব।

লাডউইগ উলানট

রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচন প্রসঙ্গে

লাডউইগ উলানট (১৭৮৭-১৮৬২) একজন কবি স্কলার ও রাজনীতিবিদ্ ছিলেন। জনপ্রিয় স্টাইলে লেখা তাঁর কবিতা; রোমান্টিক আন্দোলনের অবসানের সময়কার তিনি অন্যতম শেষ প্রতিনিধিরূপে গণ্য। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকরূপে এবং পরে টিউবিনগেনে একজন বেসরকারী স্কলার হিসেবে তিনি পুরাতন জার্মান ভাষা ও কাব্য পাঠ করেন। তাঁর রাজনৈতিক কার্যকলাপের জন্যে এবং একটানা উদারমতাবলম্বী হওয়ার জন্য তিনি তাঁর জীবিকার পথে অনেক বাধা পান। ১৮৪৮ সালের জার্মান বিপ্লবের পর তিনি ফ্রাঙ্কফুট ন্যাশনাল অ্যাসেমব্লির সদস্য হন। এই অ্যাসেমব্লির কাজ ছিল সারা জার্মানীর জন্য একটি গঠনতন্ত্র রচনা করা; এর উদ্দেশ্য ছিল গণতন্ত্র-সম্মত প্রতিনিধিত্বের মারফত জনসাধারণকে রাজনৈতিক স্বাধীনতা দেওয়া, এবং জার্মানীর সবগুলি রাষ্ট্রকে এতদিন যা শিথিলভাবে একত্র হয়ে ছিল সেগুলিকে একতাবদ্ধ করে জার্মান সাম্রাজ্যের অন্তর্গত করা। উলানট 'গ্রেটার জার্মান পার্টি'র সদস্য ছিলেন, এই পার্টির লক্ষ্য ছিল সমগ্র অষ্ট্রিয়াও এই সঙ্গে এনে বৃহত্তর জার্মান সাম্রাজ্য

প্রতিষ্ঠিত হয়। যাই হোক, বিপ্লবের দ্বারা কোনো আশু ফল ফলল না; ন্যাশনাল অ্যাসেমব্লি যখন আলোচনা করে চলেছে তখন ছোট-ছোট জার্মান জায়গীর পুরাতন অবস্থাতেই ফিরে এল। ফ্রাঙ্কফুর্ট অ্যাসেমব্লিতে উলানট যে বক্তৃতা দেন এখানে সেটি তুলে দেওয়া হচ্ছে, গণতান্ত্রিক ও উদার মতবাদ সম্বন্ধে উলানটের অভিমতের এটি একটি দলিল :

ভদ্রমহোদয়গণ, আমি ঘোষণা করছি, আমি এইরূপ অভিমত পোষণ করি যে, নির্দিষ্ট সময় অন্তর জনসাধারণের প্রতিনিধিরাই রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচন করবেন। গত অধিবেশনে আমি এই পদের যোগ্যতার প্রশ্নে একটি ব্যাপক ক্ষেত্রের জন্যে আমার অভিমত জানাই—কিন্তু আমার সে দাবি গ্রাহ্য হয় না। কেবলমাত্র শাসক নৃপতিদের মধ্যে থেকেই রাষ্ট্রপ্রধান হতে পারবেন, আমি এই ধারার ঘোরতর বিরোধী। যাই হোক প্রস্তাবটি যখন তার মৌলিক অবস্থাতেই গৃহীত হয়ে গিয়েছে তখন আমার বর্তমানে যা করণীয় তা হচ্ছে যাতে ঐ পদটি বংশগত বা উত্তরাধিকারসূত্রে হবার বিরুদ্ধে ভোট দেওয়া—কেননা, ও রকম যদি হয় তাহলে জার্মানীর বিশেষ একটি রাষ্ট্রকে ও বিশেষ লোককেই সুবিধা দেওয়া হয়ে যায়; অস্ট্রিয়াকে বাইরে রাখার বিরুদ্ধেও ভোট দেওয়া; এবং প্রতি ছয় বছর অন্তর রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচনের পক্ষে ভোট দেওয়া।

আমি লম্বা বক্তৃতা করব না। আজকাল আমরা যুবসম্প্রদায়ের স্বপ্নের কথা খুব বলছি। আমার কথা বলতে পারি এই যে, একটা স্বপ্নই কেবল আমার পিছনে লেগে আছে, সেটি হচ্ছে ১৮৪৮ সালের বসন্তকালের স্বপ্ন। বংশগত গুণ সম্বন্ধে সেই প্রস্তাব, এবং তার আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা যে রাজতন্ত্র জার্মানীর প্রতিটি রাষ্ট্রে পৃথক-পৃথক ভাবে প্রচলিত আছে, জার্মানীর রাষ্ট্র-প্রধানের নূতন পদটির পক্ষেও সেই ব্যবস্থা প্রচলন করার প্রস্তাবটি সেইরকম যুক্তিহীন ভিত্তির উপরেই স্থাপন। এই যুক্তিহীনতা এই যে, বংশগতভাবে রাজা হওয়াটা হচ্ছে একটি বিশেষ ব্যক্তির, তার সাজপোষাকের ও রাষ্ট্রের উপর তার ছেদহীন প্রতিপত্তিরই ধারণা। রূপকের দ্বারা এ'কে বলা চলে, এটা হচ্ছে একটা উপন্যাস বিশেষ যার মধ্যে শাসন করার কথা লেখা আছে, কিন্তু এর মধ্যে সত্য বিশেষ নেই, অর্থাৎ শাসন নেই। তাঁর নিজের ব্যক্তিগত গুণের শক্তিতে এ পদে তিনি বাহাল হচ্ছেন না, উত্তরাধিকারসূত্রে এই পদে অভিষিক্ত

হচ্ছেন, সুতরাং ক্ষমতার সদ্ব্যবহারের জন্যে দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন উপদেষ্টাবর্গ তাঁর রাখা চাই। এই রকম অভিভাবকবর্গের তত্ত্বাবধানে থাকলে স্বাধীন একটা চরিত্র গড়ে ওঠে না ; এবং এই ধরণের চরিত্র যদি নিজের মত প্রতিষ্ঠা করতে চায়, এই রকম কিম্ভূত একটা পরিবেশ যদি ভেঙে দিয়ে একটা সজীব মূকাভিনয়ের আসর থেকে বেরিয়ে আসতে চায় তাহলে শাসনতান্ত্রিক কাঠামোর সঙ্গে তার দ্বন্দ্ব অনিবার্য। শাসনতান্ত্রিক রাজতন্ত্র ইংলণ্ডে গড়ে উঠেছে যে ভাবে তার ইতিহাস আছে, এবং অন্য দেশে রপ্তানি করা হয়েছে, এবং ঘোষণা করা হয়েছে এই রীতিটা সর্বকালেরই উপযোগী। এটা আসলে জার্মানীর জিনিসই নয়। জার্মানীর নির্বাচিত রাজারা অন্য ধরনের রাজা— ততদিনই এটা বংশগত যতদিন সেই বংশ নিজেদের যোগ্য বলে প্রমাণিত করতে পারবে। এটা হচ্ছে রক্তমাংসের মানুষের দীর্ঘ একটি ধারা, খুব শক্তিমান, উজ্জ্বল চোখ তাঁদের, ভালো ও মন্দ উভয়বিধ কাজেই খুব পারদর্শী, কিন্তু যে ব্যবস্থা রাজপ্রতিনিধিদের মহৎ উদ্দেশ্যসাধনে বাধা দেয়, সেই ব্যবস্থাই এখন আমাদের সামনে তুলে ধরা হচ্ছে সমগ্র জার্মানীর আদর্শরূপে।

একটা জোতদার গণ-আন্দোলনই এমন-একটা ব্যবস্থার পত্তন করতে পারে যা জনগণের মনের চাহিদার সঙ্গে খাপ খায়। সম্প্রতি এ রকম বলাবলি আরম্ভ হয়েছে, শাখায়-শাখায় যদি রাজতন্ত্র থেকে যেতে পারে তবে গাছের ডগায় তা বাতিল করাটা একটা অসংগত ব্যাপার হবে। কিন্তু আমি তবে আর একটি অসংগতির কথা বলি। বর্তমান জার্মানীর জাতীয় জীবনে আমাদের রাজনৈতিক সংস্কার কি আরম্ভ হয়েছে রাজতন্ত্রগত বংশগত বা অভিজাতসম্প্রদায়-গত কোনো ব্যবস্থা থেকে ? না। নিঃসন্দেহে এটি আরম্ভ হয়েছে গণতান্ত্রিক অংশ থেকে। মূলই তাহলে গণতান্ত্রিক ; গাছের ডগা শাখা থেকে তৈরি হয়ে ওঠে না, তৈরি হয়ে ওঠে মূল থেকে। জার্মান ওক-গাছ স্বাভাবিকভাবে বাড়তে পারবে না, আমরা যদি বংশগত রাজকীয় ঈগল তার মাথায় কলম ক'রে লাগিয়ে দিই। আজকালকার থিয়োরি ও স্লোগান শুনে মনে হয় গবর্ণমেণ্টের পদ্ধতি বুঝি ঠিকভাবে চলছে না, কিন্তু আমার মনে হয় কথাটা পুরোপুরি ঠিক নয়। এই ভাবেই জার্মানীর পৃথক পৃথক রাষ্ট্রের গঠনতন্ত্র আধুনিক যুগের প্রয়োজন অনুসারে গণতন্ত্রের চাহিদার কাছাকাছি এসে যাবে—যদি অবশ্য আমরা রাজনীতি-ক্ষেত্রে শ্রেণীবিশেষের বিশেষ সুবিধা-

ভোগের রেওয়াজ বাতিল করতে পারি, এবং নির্বাচনী আইনে উদারপন্থার প্রবর্তন করতে পারি।

আমি স্বীকার করি যে, আমি এক-সময় এরকম স্বপ্ন দেখেছিলাম যে, জার্মান জাতি জেগে উঠলে অনেক বিখ্যাত রাজনীতিবিদ্ পুরোভাগে এসে দাঁড়াবেন। এবং তখন থেকে সব সেরা মানুষেরাই জার্মান রাষ্ট্রের শীর্ষে স্থান পাবেন। কিন্তু এটা নির্বাচনের দ্বারাই সম্ভব, বংশগত ধারাবাহিকতার দ্বারা সম্ভব নয়। এখনই এর জন্যে প্রশস্ত ব্যবস্থা আছে, এবং প্রকৃত সাহসিক চিন্তার এই হচ্ছে সময়। এবং আমি আশা করি জার্মান জাতি এই চিন্তা ভালোভাবেই গ্রহণ করতে পারবে। আপনারা প্রশ্ন করতে পারেন: বংশগত গৌরব ও ক্ষমতা ছাড়া একজন লোকের কী করা সম্ভব? কিন্তু ভদ্রমহোদয়গণ, সে আসলে যখন জার্মান জাতি আমাদের মদত দিচ্ছিল, রাজনীতিবিদেরা জনগণেরই প্রতিনিধি বলে নিজেদের অস্বীকার যখন করেনি, সেই সময় আমরা যদি এমন লোককে নির্বাচন করতে পারতাম যিনি একজন সাধারণ নাগরিকের মত অত্যন্ত সরল ও যাঁর মন উদার ও মহৎ, তাহলে তিনি জঘন্য হিংসা ও বর্বরতাকে বশ করে সেই শক্তি কাজের কাজে লাগাতে পারতেন, এবং তার ফলে সমস্ত জার্মান জনগণই হয়ে যেত তাঁর "বংশ", অর্থাৎ ডাইনাস্টি।

চিরকালের জন্যে ঐ যে একবার নির্বাচন, যার দ্বারা রাষ্ট্রপ্রধান তাঁর গদিটা উইল করে রেখে যাবেন, সুতরাং প্রথম নির্বাচনটাই শেষ নির্বাচন, এবং এর দ্বারা ভোট-দানের অধিকারকেই অস্বীকার করা হচ্ছে। ভদ্রমহোদয়গণ, আমি আশা করি, আপনারা এটা মেনে নেবেন না। আপনাদের এখানে যে জন্যে ডেকে আনা হয়েছে এ ব্যাপারটাই তার পরিপন্থী। এক দিকে বিপ্লব, অন্যদিকে বংশগত অধিকারে সম্রাট—এ যেন যুবকের মাথায় পাকা চুলের মত অবস্থা।

আমি আবার সেই পুরাতন গভীর ক্ষতটির প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি—সেটি হল অস্ট্রিয়াকে অন্তর্ভুক্ত না করার ক্ষত। অন্তর্ভুক্ত না করা: এটি হচ্ছে খাঁটি সংজ্ঞা। একবার যদি বংশগত ব্যবস্থাটাই জার্মান সাম্রাজ্যে গৃহীত হয়ে যায় তাহলে কোনো দিনই অস্ট্রিয়াকে জার্মান রাষ্ট্রের অন্তর্গত করা সম্ভব হবে না। আমি আপনাদের মনে করে দিই এখানে আমাদের প্রথম-দিনের এই সভার কথা! তখন কে মনে করতে পেরেছিল

যে অস্ট্রিয়াকে আমরা বাদ দিয়ে দেব? হাতে জার্মান পতাকা নিয়ে অস্ট্রিয়ার প্রতিনিধিরা যখন এই অ্যাসেম্‌ব্লিতে তাঁদের স্বাধীনতা-সংগ্রামের হাতিয়ার সহ ঢুকলেন, এবং তাঁদের বিপুলভাবে অভিনন্দন জানানো হল, তখন কে ভাবতে পেরেছিল যে সেই প্রতিনিধিরাই নিঃশব্দে এই আসর ছেড়ে আবার চলে যাবেন? জার্মানীর ঐক্য প্রতিষ্ঠা করতেই হবে; কিন্তু এই ঐক্য সংখ্যা দিয়ে নির্ণয় করা হবে না। এ ভাবে এগোলে পেঁয়াজের খোসা ছাড়ানোর মত এক-একটা স্তর ভুলতে ভুলতে অবশেষে দেখা যাবে যে, জার্মানীকে গ্রাস করে ফেলেছে লিশটেনস্টাইন। প্রকৃত ঐক্য হচ্ছে সমস্ত জার্মান ভূমিকে একতাবদ্ধ করা। এর এক-তৃতীয়াংশ বর্জন করা হচ্ছে ঐক্য-আনার জুয়াখেলা। অস্ট্রিয়ার প্রতিনিধিরা যখন এই হল্‌-এ বক্তৃতা দিয়েছিলেন, তখন যদি তাঁরা আমার এই অভিমতের বিরুদ্ধে ঘুণাক্ষরেও কিছু বলে থাকেন, তখন আমার মনে হয়েছে আমি যেন টাইরল পর্বতমালা থেকে কিংবা অ্যাড্রিয়াটিক সাগরের তরঙ্গভঙ্গ থেকে যেন কার কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছি। অস্ট্রিয়াকে বাদ দেওয়া আমাদের দৃষ্টির সংকীর্ণতারই পরিচয়। পশ্চিম দিকের পর্বতশ্রেণী সরে গেল; যে ড্যানিউব নদী বহুদূর বিস্তৃত তার জলে জার্মান তটভূমির ছায়া পড়বে না। রাজনৈতিক পরিকল্পনা তৈরি করা ও মানচিত্র মেপে দেখাই যথেষ্ট নয়। দেশের মানুষের মনের চাহিদা ও মেজাজ বুঝে নিতে হবে; জার্মান অস্ট্রিয়ার জীবনী শক্তি আঁচ করে দেখার উপযোগী মনের প্রসারতা আনতে হবে। কতটা এলাকা আমরা হারাব, কতটা শক্তি আমরা হারাব, এবং জনসংখ্যাই বা কতটা হারাব—এ সম্বন্ধে যথেষ্ট হিসাব-নিকাশ করা হয়েছে। আমি এর সঙ্গে এইটুকু মাত্র যোগ করতে পারি: জার্মান জাতির জনবল আশি লক্ষ, এই বিপুল সংখ্যক মানুষ তার সমস্ত আবেগ উত্তেজনা ও আত্মিক শক্তি হারিয়ে দীন হয়ে যাবে।

ভদ্রমহোদয়গণ, আমরা যা চাই তা'হচ্ছে একটা গীর্জা গড়ে তোলা। প্রাচীন কালে আমাদের নমস্য যে সব সংগঠক বিপুলাকৃতি গীর্জা গড়ার কাজে হাত দিয়েছিলেন তখন তাঁরা নিশ্চিত ভাবে জানতেন না কাজটা তাঁরা সম্পূর্ণ করে যেতে পারবেন কিনা, এজন্যে তাঁরা সুউচ্চ মিনার গড়ে তুলেছেন, এবং তার পাশেই পরের মিনারের জন্যে বনিয়াদ গড়ে রেখেছেন—এখন প্রাশিয়া নামক উচ্চ মিনার আকাশচুম্বী হয়ে উঠেছে;

আমরাও আজ সেই রকম একটি স্থান নির্দিষ্ট করে রাখি আর একটি মিনারের জন্যে—অস্ট্রিয়ার জন্যে। শেষ বারের মত বলি: ভদ্রমহোদয়গণ, বংশগত অধিকারের দাবী খণ্ডন করে দিন ; জনগণ-বিরোধী রাষ্ট্র গঠন করবেন না, অস্ট্রিয়াকে বাইরে রাখবেন না ; ভোট-দানের অধিকার বাঁচিয়ে রাখবেন—মানুষের এ এক অমূল্য অধিকার, রাষ্ট্রে নূতন ক্ষমতার অভ্যুদয়ের পক্ষে এটি হচ্ছে মৌলিক উৎসের সর্ব্বশেষ প্রতীক। আমাকে বিশ্বাস করুন, ভদ্রমহোদয়গণ, যে মাথা গণতন্ত্রের স্নেহপদার্থ দ্বারা তৈলাক্ত করা হবে না এমন কোনো মাথাই জার্মানীর উপর আলোক বিকিরণ করতে পারবে না।

ঊনবিংশ শতক

উপক্রমণিকা

আদর্শপ্রাণ ক্লাসিকাল-রোমান্টিক যুগ এর স্বভাব ও প্রকৃতির দিক থেকে আঠারো শতকেও বিরাজ করেছে। বাইরে থেকে দেখতে গেলে এর অবসান ঘটে ১৮৩২ সালে গ্যেটের মৃত্যুর সঙ্গেই।

ঊনবিংশ শতকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে সব কিছু বিচার করার প্রবণতা খুব দ্রুত বেড়ে যায়, এর ফলে যে-জীবন দর্শন কেবলমাত্র আদর্শ নির্ভর ছিল তা ছত্রখান হয়ে যেতে থাকে এবং তা অস্বীকার করাও হতে থাকে। এর পর দার্শনিকেরা প্রত্যেক ব্যক্তির ব্যক্তিগত সত্তার বিষয়েই বিশেষ মনোযোগী হলেন, এর ফলে ইতিহাসের বস্তুবাদী-তত্ত্বের বনিয়াদই যেন প্রতিষ্ঠা করা হতে লাগল, এর পরিণামে মার্কসিজম্-এর রূপে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এর প্রভাব হয়ে উঠল অসাধারণ। বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির প্রথম ফল হল শিল্প বিদ্যার প্রসার এবং সমস্ত সম্পদের শিল্পে নিয়োগ, এর ফলে সমাজের কাঠামো বদলাল, এবং এর উপরে নূতন ধরণের চাপ পড়ল। এবার সময় এসে গেল দার্শনিকদের বৈজ্ঞানিকদের ও রাজনীতিকদের—এরাই স্থির করতে লাগলেন এই শতকের মেজাজ কেমন হবে। ক্লাসিকাল যুগের মতন কবিদের আর কিছু করণীয় রইল না। লেখকেরা যদিও এই বস্তুবাদী ঝোঁকের সঙ্গে তাল রাখার চেষ্টা করতে লাগলেন, কিন্তু এই নূতন কালের সমস্যার প্রকৃত সমাধান সম্বন্ধে তাঁরা বিশেষ কিছু করতে পারলেন না।

১৮৪৮ সালের সেই সাধারণ বিপ্লবের আগেও ছোটখাট অনেক প্রতিবাদ ও বিদ্রোহ ঘটেছে। মধ্যবিত্তশ্রেণীর বেশির ভাগই এবং যে সব লেখক বিগত যুগের প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারেন নি তাঁরা বেশির ভাগ সময়ই এ ব্যাপার থেকে নিজেদের তফাতে সরিয়ে রেখেছিলেন, ব্যক্তিগত সামাজিক ও রাজনৈতিক উত্তেজনা ও সমস্যার সঙ্গে তারা জড়িত হতে চাননি। "ইয়ং জার্মানী" নামে চিহ্নিত হয়ে একদল লেখক এইসব পালাতক লেখকদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালেন, রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া এতে বেশ মদত দেওয়া হল। তাঁরা রাজনীতির ও সমাজের সমালোচনা ক'রে প্রচার পুস্তিকা প্রকাশ করে জার্মানীর এই পরিবর্তিত অবস্থার প্রভাব বিস্তারের জন্য প্রয়াসী হলেন। এঁদের আদর্শ হল ফ্রান্সের জুলাই-বিপ্লব (১৮৩০), যে বিপ্লব ১৭৮৯

বিপ্লবের পরে রাজতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা চ্যালেঞ্জ করেছিল। জার্মানীতে এই অন্দোলনের লক্ষ্য ছিল রাজনৈতিক স্বাধীনতা সম্বন্ধে শাসনতন্ত্রে স্পষ্টভাবে গ্যারাণ্টি, মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের হাতে রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তান্তর, এবং জার্মানীর একীকরণ। "ইয়ং জার্মানী" গোষ্ঠীর প্রতি যে সব লেখক ও সাংবাদিকের সহানুভূতি ছিল তাঁদের অনেককে হয়রাণ করা হয়েছিল, গ্রেপ্তার করা হয়েছিল অথবা অনেককেই দেশ থেকে পালিয়ে যেতে হয়েছিল।

কার্ল মার্কস এবং ফ্রায়েডরিখ এঞ্জেলসের "কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো" ১৮৪৮ সালে প্রকাশিত হয়—এই বছরই জার্মানীতে মধ্যবিত্তশ্রেণীর বিপ্লব ঘটে; কিন্তু এই ম্যানিফেস্টো যাঁদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছিল তাঁরা হচ্ছেন নূতন-জাগরিত "চতুর্থ শ্রেণী" অর্থাৎ শ্রমিক শ্রেণী, মধ্যবিত্তশ্রেণীর শোষণের বিরুদ্ধে এঁদের বিদ্রোহের আহ্বান দেওয়া হয়েছিল। যাঁরা স্বচ্ছল মধ্যবিত্তশ্রেণীর ছিলেন তাঁরা প্রকৃতপক্ষেই শিল্প-প্রসারের কল্যাণে ক্রমশই প্রভূত পরিমাণ অর্থ সঞ্চয় করে চলেছিলেন, এবং দেশের অর্থনীতি পরিচালনা করেছিলেন তাঁরাই ও দিকে শ্রমিকেরা, যারা হাতের-কাজ করে, ও ক্ষেতখামারে কাজ করে তারা ক্রমেই দরিদ্র হয়ে চলেছে, দেনার বোঝায় চাপা পড়ে যাচ্ছে, এবং অসহনীয় অবস্থার মধ্যে তাদের কাজ করে যেতে হচ্ছে। কমিউনিস্ট-লক্ষ্য ছিল বিপ্লবের দ্বারা সমাজব্যবস্থার ওলট-পালট করা, আর সমাজসংস্কারকরা চেয়েছিলেন নিম্ন শ্রেণীর মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতিসাধন করে, সব-ব্যবস্থার মধ্যে একটা মীমাংসা করে দেওয়া।

উনবিংশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে যে সব উচ্চস্তরের সাহিত্য-সৃষ্টি হয়েছে—যার বেশির ভাগই উপন্যাস ও গল্প—সেগুলিকে "বাস্তব সাহিত্য" আখ্যা দেওয়া হত, কিন্তু এতে বাস্তবতা অল্প পরিমাণেই থাকত। প্রকৃতপক্ষে, ইন্দ্রিয়ের অতীত বস্তুবাদী মনোভাব কিংবা জীবনের সঙ্গে তার সম্পর্কের ব্যাখ্যান এ-সাহিত্য। এ সাহিত্য বলতে গেলে বর্জনই করেছিল, তার উপর, এ-সাহিত্য সে আমলের সবচেয়ে জরুরি সমস্যা নিয়েও সামান্যই আলোচনা করেছে, সেই জরুরি সমস্যাটি হচ্ছে সমাজের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব। কেবলমাত্র ব্যক্তি-বিশেষের সমস্যা নিয়েই তা বিভোর ছিল, সম্প্রদায়ের জীবন বেশ বড় করে এবং তাতে আদর্শের আলো ফেলে খুব স্পষ্ট করে দেখানোরই চেষ্টা হয়েছে, কিন্তু বাস্তবের সঙ্গে তার কোনো মিল নেই। বোধ হয় একমাত্র লেখক নির্দ্বিধায় যাঁকে বাস্তববাদী লেখক বলে স্বীকার করা যায় তিনি থিয়োডোর ফনটেন।

হেনরিখ হাইনে

হেনরিখ হাইনে (১৭৯৭-১৮৫৬)—তাঁর চিন্তার ধারা লক্ষ্য করলে জার্মানীর প্রধান লেখকদের মধ্যে এঁকেই বলা যায় যে একমাত্র ইনিই "ইয়ং জার্মানী" আন্দোলনের সামিল ছিলেন। ইনি আইন অধ্যয়ন করেছিলেন, এবং অনেক রাজনৈতিক পত্রিকায় প্রবন্ধ দিতেন। তাঁর কবিতায় ব্যঙ্গবিদ্রূপ ক্রমশই প্রখর হয়ে ওঠা সত্ত্বেও বলতে হয় যে সে-কবিতার মূল ছিল রোমান্টিক আন্দোলনের মধ্যেই প্রোথিত। ১৮৩১ সাল থেকে তিনি প্যারিসে বাস করতে থাকেন, এবং সেখান থেকেই তিনি জার্মানীর অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে থাকেন। তাঁর লেখা ক্রমশই সাংবাদিক রচনার দিকে বেশী করে ঝোঁকে, এবং সমসাময়িক রাজনৈতিক বিষয় নিয়েই তিনি বেশি লেখেন। এইসব রচনা থেকে হাইনের প্রখর পর্যবেক্ষণ-শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়, ভাষার উপর তাঁর দখল কতটা অসাধারণ তাও বোঝা যায়; সমালোচনাতেও তাঁর ব্যজস্তুতি ছিল মারাত্মক-রকম তীক্ষ্ণ এবং সেই স্তুতির সঙ্গে বিদ্রূপও থাকত প্রচ্ছন্ন। ১৮৩৫ সালে তাঁর রচনার ওপর জার্মানীতে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়।

১৮৩০ সালের প্যারিস জুলাই বিপ্লব সম্বন্ধে হাইনের মন্তব্য তাঁর ব্যক্তিগত অনুভূতির ও এই ব্যাপারে তাঁর উৎসাহেরই অভিব্যক্তি। সে সময়ে দশম কিং চার্লস্ তৎকালীন প্রচলিত শাসনতন্ত্রের বিরোধিতা ক'রে সর্বময় কর্তৃত্ব-গ্রহণের ও স্বাধীনতা-দমনের দিকে ঝুঁকে পড়েন, এবং শেষ পর্যন্ত তাঁকে সিংহাসন ত্যাগ করতে হয়। ১৭৮৯-এর বিপ্লবের পর যে রকম হিংসাত্মক কাজের ব্যাপকতা ও খুনজখম ঘটেছিল, এই বিপ্লবে ততটা কিছু হয় না।

তাঁর "বুক অব ট্রাভেলস"এ হাইনে দেখিয়েছেন যে, এই বিপ্লব সম্বন্ধে তাঁর উৎসাহ-উদ্দীপনা সমগ্র বিশ্বের ইতিহাস সম্বন্ধে তাঁর চেতনার উপরেই প্রতিষ্ঠিত। শাসকশ্রেণীর শক্তিকে দমন করার জন্য বৈপ্লবিক শক্তি প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা তিনি স্বীকার করে নিয়েছেন।

জুলাই বিপ্লব

হেলিগোল্যাণ্ড, ৬ আগস্ট

যখন তাঁর সৈন্যবাহিনী লঙ্গোবার্ডদের সঙ্গে লড়াই করে চলেছে তখন হেরুলিয়নসের রাজা খুব আরামে তাঁর তাঁবুতে বসে দাবা খেলছেন। যে কেউ

তাঁর কাছে পরাজয়ের খবর নিয়ে এলে তিনি তাঁকে হত্যা করবেন বলে শাসিয়েছেন। যে প্রহরীটি গাছের উপরে ব'সে যুদ্ধটার উপর নজর রাখছিল, অনবরত সে চেঁচিয়ে চলেছেঃ "আমরা জিতেছি! আমরা জিতেছি!" অবশেষে সে বলে উঠল; "হতভাগ্য রাজা! হেরুলিয়নসের মানুষেরা হতভাগ্য।" তখন রাজা দেখলেন যে যুদ্ধে পরাজয় ঘটেছে; কিন্তু বড় দেরিতে তিনি তা বুঝলেন। কেননা, সেই মুহূর্তেই লঙ্গোবার্ডরা তাঁর তাঁবুতে হুটপাট ক'রে ঢুকে পড়ে, এবং তাঁর বুকে ছোরা বসিয়ে দেয়।

পাউল ভারনেফ্রিড-এর বই থেকে আমি এই কাহিনীটা পড়ছিলাম, তখন মূল ভূখণ্ড থেকে খবরের কাগজের ভারি ভারি বাণ্ডিল এই তর-তাজা বার্তা নিয়ে এসে পৌঁছল। এগুলো সূর্যেরই রশ্মির মতন, কেবলমাত্র খবরের কাগজে জড়ানো, এবং এরা আমার সমস্ত হৃদয়ে দাবানল জ্বেলে দিল। আমার মনে হতে লাগল আমার মনের এই উদ্দীপনার আগুন দিয়ে এবং আমার মনে প্রবল আনন্দের যে দীপ্তি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে তা দিয়ে আমি উত্তর মেরু পর্যন্ত সমস্ত মহাসমুদ্রে অগ্নিকাণ্ড ঘটিয়ে দিতে পারি। আমি এখন বুঝতে পারছি কেন এখন সমস্ত সমুদ্র জুড়ে এই কেক'এর গন্ধ। সিইন নদী এই শুভবার্তা বয়ে নিয়ে গিয়েছে সমুদ্র পর্যন্ত, এবং সেখানে জলপরীরা তাদের স্ফটিকনির্মিত প্রাসাদে এই বিরাট ঘটনাটি স্মরণীয় করার জন্যে এক মহোৎসবের আয়োজন করেছে, তারা যে বীরত্বের পূজারী চিরকালই। এই মহোৎসবের জন্যেই সারা সমুদ্র জুড়ে এই কেক-এর গন্ধ।

হে ফরাসী দেশের অধিবাসীবৃন্দ, তোমরা স্বাধীনতা লাভ করার যোগ্য, কেননা তোমাদের সকলের হৃদয়েই স্বাধীনতার সনদ। এই স্বাধীনতার দ্বারা তোমরা তোমাদের হতভাগ্য পূর্বপুরুষদের চেয়েও গৌরবান্বিত হলে, তারা শত-শত বর্ষে দাসত্বের নাগপাশ থেকে নিজেদের মুক্ত করেছিলেন বটে, কিন্তু তাঁদের বীরত্বপূর্ণ কার্যের সঙ্গে তাঁরা উন্মাদের মত অনেক নৃশংস কাজও করে বসেছিলেন, যে দৃশ্য দেখে মনুষ্যজাতির বিবেক তার মুখ ঢেকেছিল। এবার আত্মরক্ষার জন্যে যুদ্ধের তাণ্ডবের মধ্যেই তাদের হাত রক্তময় হয়েছে, কিন্তু যুদ্ধের পরে নয়। সমস্ত জাতি তার শত্রুর ক্ষত বেঁধে দিয়েছে, এবং যখন তাদের কর্তব্য শেষ হয়েছে তখন তারা নীরবে নিজের নিজের দৈনন্দিন কাজে গিয়ে আবার আত্মনিয়োগ করেছে, তাদের এই মহৎ কাজের জন্যে কোনো পুরস্কারই তারা চায় নি।

লাফায়েতি, ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকা, মার্সাই······

শান্তির জন্য আমার দুঃসহ প্রতীক্ষা এখন গত। এখন আমি আবার জেনেছি আমি কী চাই, কী আবার চাওয়া উচিত, কী আমাকে চাইতেই হবে। আমি বিপ্লবের সন্তান, সে অস্ত্র স্পর্শ করে আমার মা আমাকে তাঁর জাদুকরী আশীর্বাদ করেছিলেন এখন আবার আমি সেই মোহন অস্ত্রটি আঁকড়ে ধরেছি। ফুল! ফুল! অজস্র ফুল! এই মানবীয় সংঘর্ষের জন্যে আমি মাথায় মুকুট পরব। এবং আমার বীণা, আমার হাতে দাও বীণা, যাতে আমি গাইতে পারি একটি রণসংগীত।···শব্দগুলো হচ্ছে জ্বলন্ত তারকা, ঐ তারা ছুটে গেলে তা ঐ উর্ধ্বলোক থেকে বেগে নেমে আসে, প্রাসাদ পুড়িয়ে দেয়, কুটিরে কুটিরে আলো জ্বালে।···শব্দ হচ্ছে চকচকে জ্যাভেলিনের মত, সপ্তম সর্গে তা উঠে যায় এবং যে কপটেরা স্বর্গের স্বর্গে পালিয়ে গিয়েছে সেই সাধু-বেশী কপটদের আঘাত করে···আমি আনন্দে ও গানে আত্মহারা, আমি তরবারিতে ও অগ্নিশিখায় আত্মমগ্ন।

মনে হচ্ছে আমিও যেন বদ্ধ পাগল হয়ে গিয়েছি।···ঐ খবরের কাগজের ভাঁজের মধ্যে জমানো সূর্যরশ্মির স্তূপ থেকে একটি রশ্মি এসে ঢুকেছে আমার মাথায়, আর, আমার সমস্ত চিন্তায় আগুন লেগে গিয়েছে। বৃথাই আমি সমুদ্রে আমার মাথা ডোবাচ্ছি। এই গ্রীসীয় আগুন নেভাতে পারবে না কোনো জল। কিন্তু অন্য কোনো মানুষই আমার চেয়ে সুখে নেই। এমনকি ঝরণার কিনারে আগত অতিথিরা পারস্যদেশীয় সর্দিগর্মিতে আক্রান্ত হয়; এমনকি যে বার্লিনবাসীরা এ বছর এখানে বিপুল সংখ্যায় এসেছে তারা নৌকো চেপে একটা দ্বীপ থেকে আর-একটা দ্বীপে অনবরত যাতায়াত করছে যাতে সবাই বলে যে পুরো নর্থ সী বার্লিনবাসীতে ভরে গেছে। এমনকি দীন হেলিগোল্যাণ্ডবাসীরা উল্লাসে উন্মত্ত হয়ে উঠেছে, এই ঘটনা তারা কেবলমাত্র উপলব্ধি করছে তাদের সহজাত প্রবৃত্তিরবশেই। যে লোকেরা গতকাল আমাকে যেখানে লোকেরা স্নান করে সেই ছোট দ্বীপটায় নিয়ে গিয়েছিল আমাকে দেখে হাসল ও বলল, "হতভাগ্য মানুষরা জিতেছে। আমরা আমাদের যাবতীয় জ্ঞান একত্র করেও যা উপলব্ধি করি, এই সামান্য লোকেরা তাদের প্রবৃত্তি দিয়েই তার চেয়ে বেশি বুঝতে পারে। ফ্রাউ ফন ভার্নহাগেন এক দিন আমাকে বলেছিলেন যে লিপজিগ যুদ্ধের ফলাফল যখন জানাই যায়

নি তখন তাঁর গৃহের দাসী তাঁর ঘরে এসে ছুটে চীৎকার ক'রে বলে ওঠে: "নোব্‌ল্‌দের জয় হয়েছে।"

আমি একেবারেই আর ঘুমোতে পারিনে। রাত্রিকালীন কিম্ভূতকিমাকার দৃশ্য আমার অতি উত্তেজিত মনের সম্মুখে এসে দাঁড়ায়। জাগ্রত অবস্থার স্বপ্নগুলি একে অন্যের উপরে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে, এবং তারা এমন অদ্ভুতভাবে মিশে যায় যে, মনে হয় একটা ছায়াবাজি চলেছে—কখনো ছায়ারা ছোট হয়ে যায় বামনের মত, কখনো বা বড় হয়ে ওঠে দৈত্যের মত; এ ব্যাপারটা আমাকে পাগল করে তুলেছে। আমার অনেক সময় মনে হয় আমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গই যেন ঐ ভাবে অদ্ভুত আকারে বড় হয়ে যাচ্ছে, এবং আমি যেন কল্পনাতীত দীর্ঘ পা ফেলে জার্মানী থেকে দৌড় দিচ্ছি ফ্রান্সে, এবং আবার ফিরে আসছি। হ্যাঁ, আমার মনে পড়ছে, গত রাত্রে আমি জার্মানীর সমস্ত রাষ্ট্রের ভিতর দিয়ে এইভাবে ছুটোছুটি করেছি, এবং আমার বন্ধুদের দরজায়-দরজায় ঘা দিয়ে সেই শান্ত মানুষদের ঘুম ভাঙিয়ে দিয়েছি···অনেক সময় তারা আমার দিকে বিস্ময়ে-ভরা উজ্জ্বল চোখ মেলে একদৃষ্টে চেয়ে রয়েছে, এ'তে আমি ভয় পেয়েছি, এবং ঠিক সেই মুহূর্তে নিজেই বুঝতে পারিনি আমি সত্যিই কী চাই, এদের জাগিয়ে দিই বা কেন! বীভৎস রকমের মোটা লোকেরা ভীষণভাবে নাক ডাকাচ্ছিল, আমি তাদের পাঁজরে খোঁচা দিই, হাই তুলে তারা জিজ্ঞাসা করল, "এখন ক'টা বাজে?" হে আমার প্রিয় বন্ধু প্যারিসে এখন মুরগী ডেকে উঠেছে, এর বেশি আমি কিছু জানি নে।

প্যারিসের পবিত্র জুলাইয়ের দিবসগুলি! মানুষ যে মূলত মহৎ, যা নাকি কখনো পুরো নষ্ট করা যায় না, তোমরা তার শাশ্বত প্রমাণ দেবেই। যে, জেনেছে যে, কবরখানার উপর তুমি আর অশ্রুপাত করে রোদন করবে না, সে এখন বেশ আনন্দের সঙ্গেই বিশ্বাস করতে শিখেছে যে, সমস্ত জাতির পুনর্জন্ম হবেই। হে পবিত্র জুলাইয়ের দিবসগুলি! সূর্যটা কী সুন্দর ছিল, প্যারিসের মানুষগুলো ছিল কত বিশালহৃদয়! স্বর্গ থেকে যে দেবতারা এই যুদ্ধ দেখেছেন, তাঁরা বিস্ময়ে হতবাক্ হয়েছেন, এবং তাঁরা নিজ ইচ্ছায় তাঁদের স্বর্ণাসন থেকে উঠে আপন ইচ্ছায়ই ধরায় নেমে আসবেন কেবলমাত্র প্যারিস-নগরীর নাগরিক হবার জন্যে। কিন্তু তাঁরা উৎকণ্ঠিতও বটে ঈর্ষাপরায়ণও বটে, তাই শেষ পর্যন্ত তাঁরা ভয় পেয়ে গেলেন; মানুষ হয়তো অতি উচ্চ পর্যন্ত প্রস্ফুটিত হয়ে উঠতে পারে, এবং হয়ে উঠতে পারে আশ্চর্যরকম সুন্দর, এবং

তাদের উৎসুক পুরোহিতের মারফত তারা ইচ্ছা প্রকাশ করতে পারে "ঐ দীপ্তিকে নিভিয়ে দিতে হবে, এবং মহান্‌কে টেনে নাকি ধূসরিত করতে হবে ধূলায়;" এবং তারা বেলজিয়ান বিপ্লবের উস্কানি দিয়েছিল—এই হীন কৌশল গ্রহণ করেছিলেন দ্য পোতার। স্বাধীনতার বৃক্ষ যাতে স্বর্গ পর্যন্ত মাথা উঁচু করতে না পারে, তার জন্যে সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে।

মুক্তি

লম্বার্ড ও টাসকান প্রজাতন্ত্রের, স্প্যানিশ কমিউনের এবং জার্মানীর ফ্রী সিটির এবং অন্যান্য দেশের ইতিহাসে যে পুরাতন প্রচেষ্টার কথা জানতে পারি, তার কোনোটাকেই জনগণের অভ্যুত্থানের গৌরব দেওয়া যায় না। সেগুলি মুক্তিলাভের প্রয়াস নয়, সেগুলো নেহাতই যথেচ্ছ আন্দোলন। অধিকার অর্জনের সংগ্রাম সেগুলি ছিল না, তা ছিল বিশেষ সুবিধা আদায়ের লড়াই। করপোরেশনের কয়েকটি সুবিধা আদায়ের জন্যে লড়াই করেছে, কিন্তু এর সবই করপোরেশনের চার দেয়ালের মধ্যে আটক রইল এবং করপোরেশনের নিজস্ব বিধিবিধানের মধ্যেই এর অস্তিত্ব।

ইউরোপে ধর্মবিপ্লবের আগে পর্যন্ত এইসব সংগ্রাম সর্ব-সাধারণের কল্যাণের কাজে ততটা লাগেনি। স্বাধীনতার দাবি ঐতিহ্যগত অধিকার হিসেবে নয়, মৌলিক অধিকার হিসেবে; অর্জন করে নেবার জন্যে নয়, জন্মগত অধিকার হিসেবে। মূলনীতি ছাড়া অন্য কোনো কারণে পুরাকালীন সূক্তি উদ্‌ধৃত হত না। জার্মানীর কৃষকেরা ও ইংলণ্ডের খ্রীষ্টপ্রাণ ব্যক্তিরা যিশুর সুসমাচার উদ্‌ধৃত করতেন যার বক্তব্য আমাদের একালীন যুক্তির মতই প্রামাণিক—বস্তুতপক্ষে তার চেয়েও বেশি বিশ্বাসযোগ্য কেননা এ'কে ঈশ্বরের ইচ্ছারই প্রকাশ বলে স্বীকার করা হত। তখন বেশ গুছিয়ে এমন কথা বলা হত যে, সব মানুষই সমান মহৎ, রগচটা বা অহংকারীদের নিন্দা করা হত, বলা হত ঐশ্বর্য হচ্ছে পাপ; বলা হত যে দীনতম দীনও সর্ব মানবের পিতা ঈশ্বরের সুন্দর উদ্যানের সৌন্দর্য উপভোগের অধিকারী।

এক হাতে বাইবেল নিয়ে, অন্য হাতে তরবারি ধারণ ক'রে কৃষকেরা দক্ষিণ জার্মানীর ভিতর দিয়ে মার্চ করে যায়, এবং তারা নুরেমবার্গের বড় বড় প্রাসাদের অধিবাসী শহুরে লোকদের কাছে বার্তা পাঠায়, যে ভবিষ্যতে এমন কোনো বাড়ি এই সাম্রাজ্যে থাকতে পারবে না, যে বাড়ি কৃষকদের কুটিরের

চেয়ে অন্য রকম দেখতে। এর থেকেই বোঝা যায় তারা সাম্য বা সমতা সম্বন্ধে ধারণা বেশ ভালোভাবেই করে নিয়েছিল। একালেও আমরা ফ্যাঙ্কোনিয়ায় ও সোয়াবিয়ায় এই সাম্যের মতবাদের কিছু কিছু আঁচ পাই। কোনো পরিব্রাজক ঐ পথে গেলে তিনি এর সাক্ষ্যপ্রমাণ দেখে বিস্ময়ে হতবাক্ হবেন, চাঁদের আলোয় তিনি দেখতে পাবেন, প্রাসাদের অন্ধকার ভগ্নাবশেষ পড়ে আছে, কিষাণ-যুদ্ধের পর থেকে এই ধ্বংসস্তূপ ঐ ভাবেই পড়ে আছে। সেই শান্ত প্রকৃতির মানুষকে সুখীই বলতে হবে যিনি এর বেশী আর কিছু দেখেন না। কিন্তু তুমি যদি একটু অনুসন্ধানী হও—প্রত্যেক ইতিহাসের ছাত্রই একটু অনুসন্ধানী—তাহলে তুমি জার্মান অভিজাতদের বিরাট শিকারের চিহ্ন দেখতে পারে, এই অভিজাতদের মত নিষ্ঠুর প্রাণী পৃথিবীতে আর নেই। তুমি দেখতে পাবে কিভাবে হাজার হাজার নিরস্ত্র লোককে লাঠি দিয়ে পিটিয়ে, পীড়ন ক'রে, তাড়না ক'রে, অত্যাচার ক'রে হত্যা করা হয়েছে। তুমি তাদের দেখতে পাবে শস্যক্ষেত্রে, সেই কৃষকদের রক্তাক্ত মাথা কি রকম রহস্যজনক ভাবে আন্দোলিত হচ্ছে ঐ শস্যক্ষেত্রে; ঐ ক্ষেতের উপরে তুমি শুনতে পাবে এক ভয়ংকর ভরতপাখির আর্তনাদ, প্রতিহিংসার জন্যে সে তীক্ষ্ণ স্বরে কাৎরাচ্ছে।

ইংলণ্ডে ও স্কটল্যাণ্ডে এদের ভ্রাতারা এদের চেয়ে ভাগ্যবান ছিল; তারাও পরাস্ত হয়েছিল বটে, কিন্তু তাদের পরাজয় অতটা লজ্জাকর ও সাফল্যহীন ছিল না। তাদের হাতে অধিকার যে এসেছিল তার চিহ্ন এখনও দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু এটা তারা রক্ষা করতে পারে নি; সেই সুপুরুষ অশ্বারোহীরা আগের মতই আবার ক্ষমতায় এসে গিয়েছে, এখনও তারা তাদের বীর যোদ্ধাদের কাহিনী নিয়ে বেশ মেজাজে আছে, যেসব যোদ্ধা নিহত হয়েছিল তাদের বীরগাথা রচনা করেছে চারণ কবিরা, এইসব বীরত্বব্যঞ্জক গান শুনেই এখন তারা তাদের অবসরবিনোদন করে। গ্রেট ব্রিটেনে কোনো সামাজিক বিপ্লব ঘটেনি, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান সমূহের কাঠামো আগের মতই অটুট আছে; জাতি ও সমাজ ব্যবস্থা এখনো টিকে আছে, সভ্যতার আলো-বাতাস কিছু কিছু ঢুকে পড়া সত্ত্বেও ইংলণ্ড এখনো সেই মধ্যযুগের অবস্থাতেই আছে অর্থাৎ সেই যুগের বিলাসব্যসন নিয়েই আছে। যেটুকু উদারতা এখন সেখানে দেখা দিয়েছে তা মধ্যযুগীয় অনমনীয়তার কাজ থেকে অনেক কষ্টে আদায় করা। আধুনিক কোনো

আন্দোলনই নীতির দ্বারা চালিত হয়ে হচ্ছে না, তা হচ্ছে জীবনের প্রয়োজনের তাগিদে। এই আধা-ব্যবস্থাটা প্রয়োজনের তাগিদেই আবার নূতন সংকট নিয়ে আসছে, এবং তার ফলে নানা রকম মারাত্মক সংঘর্ষ ঘটছে, যার পরিণাম হচ্ছে নূতন সংকট। ইংলণ্ডের ধর্মীয় সংস্কারও থেমে আছে মাঝপথে, ইংলণ্ডের গির্জার বিশপ-কর্তৃক শাসনের চার দেয়ালের মধ্যে যে অবস্থা তা তুলনামূলক ভাবে রোমক গির্জার মনোরম কারুকাজ সম্বলিত নরম গদি বিশিষ্ট অন্ধকারাচ্ছন্ন আধ্যাত্মিক পরিবেশের চেয়ে অনেক শোচনীয়। রাজনৈতিক সংস্কারের কাজও তেমন ভালোভাবে হয় নি ; জন প্রতিনিধিত্ব যতটা গলদপূর্ণ হতে পারে তাই ; এখন যদিও পোশাক-পরিচ্ছদ দেখে শ্রেণী বিন্যাস করা হয় না, কিন্তু বিভিন্ন প্রকার পদ মর্যাদা দিয়ে তাদের ভাগ করা হয়ে থাকে, কে কতটা পৃষ্ঠপোষকতা পাচ্ছে, আদালতে কাকে কতটা স্বীকার করে নেওয়া হচ্ছে, বিশেষ সুবিধা কে কতটা পাচ্ছে, চির-চরিত রীতি অনুসারে কার কতটা সুবিধা পাবার কথা, এবং এই রকম আরও মারাত্মক সব নীতি এখন অনুসৃত হয়ে থাকে। আভিজাতিক ক্রিয়াকৌশলের উপর এখন মানুষের ও তার সম্পত্তির অবস্থা যদিও নির্ভর করে না, এখন তা নির্ভর করে আইনের উপরে—কিন্তু এই আইন বিভিন্ন প্রকার দাঁতের পাটি ছাড়া কিছু না ; এই দাঁতের কোনো পাটি দিয়ে অভিজাত ঘরের শাবকেরা হয়তো তার শিকার কামড়ে ধরে, এবং অন্য পাটি দিয়ে বিশ্বাসঘাতকের মত তারা ছুরি বসায় মানুষের বুকে। ইংলণ্ডের মানুষ আইন অনুসারে যে রকম কর দিতে বাধ্য হয়, সারা কনটিনেণ্টে কোনো অত্যাচারী নিজের ইচ্ছায় তার প্রজার কাছ থেকে অতটা কর নিংড়ে নেয় না। এবং কোনো অত্যাচারীই ইংরেজদের মতন এমন নিষ্ঠুর নয়, সেখানে একটা শিলিং-এর জন্যেও খুন করা হয়ে থাকে, এবং ঠাণ্ডা মাথায় চিঠি লিখেও এমন কাজ করা হয়ে থাকে। ইংলণ্ডের এই রকম মর্মভেদী কাণ্ড-কারখানার ব্যাপারে কিছুটা উন্নতিসাধন অবশ্য করা হয়েছে, যদিও পার্থিব এবং যাজকীয় ব্যাপারে ধনলিপ্সা কিছুটা সীমাবদ্ধ করা হয়েছে ; যদিও জন-প্রতিনিধিত্বের বিরাট ধাপ্পা এখন কিছুটা কমেছে, 'গলা-পচা নির্বাচনকেন্দ্র' থেকে ভোটদানের বাতিল অধিকার বড় বড় শিল্প-নগরীতে স্থানান্তরিত করা হয়েছে ; যদিও সহনশীলতার নাম গন্ধ যেখানে ছিল না, সেখানকার সেই নিদারুণ পরিবেশ এখন অন্য সম্প্রদায়ের মধ্যে কিছুটা সুযোগ-সুবিধা বিতরণ করে একটু শান্ত করা হয়েছে—কিন্তু এ সবই

হচ্ছে তাপ্পি মারার মতন কাজ, এ বেশিদিন টিকবে না ; ইংলণ্ডের সবচেয়ে মূর্খ দর্জিও বেশ বুঝতে পারছে যে, আজ হোক কাল হোক, এই রাষ্ট্রের পুরাতন পরিচ্ছদ শতচ্ছিন্ন হয়ে পরিণত হবে কেবলমাত্র ন্যাকড়ায়।

"পুরাতন পরিচ্ছদের গায়ে কেউ নূতন কাপড়ের টুকরো লাগায় না। এর কারণ নূতন কাপড়টি পুরাতন কাপড়ের অংশ টেনে নেয়, এবং তাতে ছেঁড়া জায়গা আরও বড় হয়ে যায়। ঠিক এই ভাবেই কোনো মানুষ পুরাতন বোতলে নূতন মদ ঢালে না ; কেননা এ'তে বোতল ভেঙে যেতে পারে এবং মদ গড়িয়ে পড়ে যেতে পারে, এবং এতে বোতলই নষ্ট হয়, নূতন বোতলে নূতন মদই রাখা হয়, এতে মদ ও বোতল দুইই রক্ষা পায়।"

গভীরতম ভালোবাসা থেকেই গভীরতম সত্য উদ্‌ঘাটিত হয়, এ'তেই সেই মাউন্ট থেকে যিনি শিক্ষাদান করেছিলেন তাঁর শিক্ষার একটা সুসংগতি লাভ করা যায়, তিনি জেরুজালেমের আভিজাত্যের বিরুদ্ধেই বলেছিলেন, এর পরবর্তী শিক্ষকেরা যাঁরা উচ্চভূমি থেকে শিক্ষা বিতরণ করেছেন, অর্থাৎ প্যারিস ন্যাশনাল কনভেনশনের শীর্ষ থেকে বলেছেন, তাঁরা একটা ত্রিবর্ণ বাণী প্রচার করেন, এই বাণীতে কেবলমাত্র রাষ্ট্রের গঠনই নয় সামাজিক সর্বপ্রকার গঠনেরই পরিবর্তনের কথা বলা হয়। কেবলমাত্র জোড়াতালি দিয়ে নয়, নূতন ভাবে গঠন ক'রে, নূতন ভাবে প্রতিষ্ঠা করে এ'কে নবজীবন দেওয়ার কথা বলা হয়েছে।

আমি ফরাসী বিপ্লবের কথা বলছি। পৃথিবীর সেই একটা স্মরণীয় যুগ যখন স্বাধীনতার ও সাম্যের মতবাদ এমন বিজয়োল্লাসে মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে, যাকে আমরা যুক্তি বলি সেই সমীচীন বোধের ভিত্তির উপরেই যার প্রতিষ্ঠা, এবং যা ক্রমান্বয়ে সকলের বুদ্ধিকে উদ্‌ঘাটিত করতে থাকে, এবং জ্ঞানের ভিত্তি স্থাপন করে দেয়। কেবলমাত্র সামান্য জনা-কয়েকের মধ্যে বুদ্ধির সঞ্চার ও জনগণের বিশ্বাসের মধ্যেই যার অস্তিত্ববোধের এমন সংকীর্ণ উদ্‌ঘাটনের চেয়ে ওটি অনেকের কাছেই পছন্দসই। এই দ্বিতীয় প্রকারের উদ্‌ঘাটন হচ্ছে একটু অভিজাত স্বভাবের—এর আয়ু বেশি না, এর ক্ষয় আরম্ভ হয়ে গিয়েছে ; কেননা বিশেষ অধিকারের উপরেই এর নির্ভর, কিন্তু যুক্তি নির্ভর ব্যবস্থার বনিয়াদ হচ্ছে গণতান্ত্রিক স্বভাবের। বিপ্লবের ইতিহাস হচ্ছে সেই আন্দোলনেরই ইতিহাস যার সঙ্গে আমরা সকলে অল্প বিস্তর যোগ দিয়েছি। এটা হচ্ছে জীবন মরণ সংগ্রাম।

শত্রুর তরবারি যদিও প্রত্যহই ভোঁতা হয়ে যাচ্ছে, আমরা যদিও সবচেয়ে ভালো ঘাঁটি দখল করেছি, তবুও কাজ সম্পূর্ণ শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমরা বিজয়ের গান গাইতে পারিনে। যুদ্ধ বিরতির সময় রাত্রিকালে আমরা যুদ্ধক্ষেত্রের বাইরে লণ্ঠন জ্বালিয়ে যেতে পারি কেবলমাত্র মৃতদের সমাধিস্থ করার জন্য। সমাধিক্ষেত্রে সংক্ষিপ্ত বাণী পাঠের কী প্রয়োজন! অপবাদ, নির্লজ্জ প্রেতাত্মা—সবই এই পবিত্র সমাধিতে এক হয়ে যায়।

হায়, যারা সত্যের পরম শত্রু তাদের বিরুদ্ধেও লড়াই করতে হল, যারা তাদের বিপক্ষের সব সুনাম খুব চতুরতার সঙ্গে বিষাক্ত করে দিতে পারে, এবং যারা সেই মাউন্টের প্রথম শিক্ষকেরও দুর্নাম করতে ছাড়েনি—যিনি ছিলেন মুক্তির সবচেয়ে সাচ্চা বীর। তারা যখন প্রমাণ করতে পারল না যে তিনি ছিলেন মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, তখন তাঁরা দেবতাদের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট বানাল। যাজকদের সঙ্গে যারা লড়াই করতে চায় তারা আগে তাঁর সুনামটি নষ্ট করবে, এবং মোক্ষম মিথ্যা দিয়ে তাঁকে কদর্য করে আঁকবে। কিন্তু যুদ্ধের সময় যে পতাকা বুলেটে শতচ্ছিদ্র হয়ে যায় এবং বারুদের ধোঁয়ায় কালো হয়ে যায় তার দামই আনকোরা ঝকমকে পতাকার চেয়ে বেশি; এবং ঐ জীর্ণ পতাকাই জাতীয়-স্মারকরূপে গির্জায় প্রদর্শিত হয়ে থাকে। ঠিক সেইভাবেই আমাদের যে বীরদের প্রতি মিথ্যা অপবাদ দিয়ে তাদের চরিত্রহনন করা হয়েছে, তারাই স্বাধীনতার পবিত্র গির্জায় অধিক উৎসাহের সঙ্গে সম্মান লাভ করবে।

এই বীরদের মতই, এই বিপ্লবেরও অনেক দুর্নাম করা হয়েছে। অনেক প্যাম্‌ফ্লেটে একে বলা হয়েছে শাসকদের প্রতি ত্রাস, এবং প্রজাদের কাছে যেন কাক-তাড়ুয়া। এই বিপ্লবের অনেক তথাকথিত নৃশংসতার কাহিনী স্কুলের বাচ্চাদের মুখস্ত করানো হচ্ছে। এবং কিছুকাল ধরে সব মেলাতেই গিলোটিনের বীভৎস ছবি ছাড়া আর কিছু দেখানো হত না। এ কথা অবশ্য অস্বীকার করা যায় না যে, এই যন্ত্রটি আবিষ্কার করেছিলেন একজন ফরাসী চিকিৎসক ও অস্থিবিশেষজ্ঞ, যাঁর নাম এম. গিলোটিন; এই যন্ত্রের সাহায্যে অতি সহজেই শরীর থেকে মাথা আলাদা করা যায়, এটি বড়ই ঘন-ঘন ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু দুরারোগ্য ব্যাধির ক্ষেত্রে যেমন বিশ্বাসঘাতকতা, মিথ্যাচারিতা, দুষ্কৃতকারিতা ইত্যাদির সময় রোগীদের বেশিক্ষণ যন্ত্রণা দেওয়া হত না, তাদের পীড়ন করাও হত না। কিন্তু আমাদের সেই পুরাতন আমলে হাজার-হাজার মানুষকে কত অসীম যন্ত্রণা দেওয়া হয়েছে। এটা একটা

ভয়ংকর ব্যাপার যে, ফরাসীরা তাদের রাষ্ট্রপ্রধানেরও মুণ্ডচ্ছেদ করেছে এই যন্ত্র দিয়ে। এ কথা বলা মুশকিল যে, এজন্যে তাদের ভ্রাতৃঘাতী বলা হবে, না, আত্মঘাতী বলা হবে। কিন্তু সমস্ত অবস্থা ও পরিবেশ বিবেচনা করে বলা যায় যে, ফ্রান্সের লুই উত্তেজনার চেয়ে ঘটনাচক্রেরই বলি হয়েছিলেন ; এবং এও বলা যায় যে, যারা জনগণকে চাপ দিয়েছিল লুইয়ের প্রাণনাশের জন্যে, তারা নিজেরাই সর্বকালে এবং হয়তো আরো বেশি মাত্রায় রাজন্যদের রক্তপাত ঘটিয়েছে ; তাদের পক্ষে এত কলরব পরায়ণ অভিযোক্তা হওয়া সাজে না। দুই জন রাজা—দু জনেই জনসাধারণের চেয়ে অভিজাতেরই রাজা, দু জনকেই শেষ করে দেয় জনসাধারণ। শান্তির সময়ে নয়, হীন অভিসন্ধি চরিতার্থ করার জন্যও নয়, কিন্তু যুদ্ধের তাণ্ডবের মধ্যে, যখন জনগণ দেখল যে তারা প্রতারিত, যখন তারা নিজের রক্ত এতটুকু খরচ করল না। কিন্তু লোভের বশবর্তী হয়ে বা হীন স্বার্থে হত্যা করা হয়েছে অতি হীন চক্রান্তের দ্বারা হাজার-হাজার নৃপতিকে অবশ্যই—ছোরা দিয়ে, তরবারি দিয়ে, এবং অভিজাতদের ও যাজকদের বিষ দিয়ে। সত্যিই মনে হয় যে, এরা রাজহত্যাকে নিজের সুবিধা বলে মনে করত, এবং এইজন্যেই ষোড়শ লুই ও প্রথম চার্লস-এর মৃত্যুতে স্বার্থপরের মতই তারা বিলাপ করেছে। হায়, এই রাজারা যদি বুঝতেন যে প্রজাবৃন্দের রাজা হয়েই তাঁরা আইনের রক্ষণাবেক্ষণে নিরাপদে বাঁচতে পারতেন, অভিজাত গুপ্ত-হত্যাকারীর পাহারায় থাকা তাঁদের পক্ষে নিরাপদ নয়—তবে বুঝি তাঁদের পক্ষে ভালো হত।

তবুও কেবল যে বিপ্লবের বীরদের ও বিপ্লবেরই বিরুদ্ধে কুৎসা প্রচার করা হয়েছে, এমন নয় ; সমস্ত যুগটার বিরুদ্ধেই দুর্নাম রটনা করা হয়েছে। আমাদের সবচেয়ে বড় আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত কাজকে বিদ্রূপ করা হয়েছে অতি জঘন্য ও তুলনাহীন শঠতার দ্বারা। হে আমাদের হীন নিন্দুকের দল, তোমরা যখন এসব কাহিনী পড়বে বা শুনবে তখন জনসাধারণকে বলা হবে তুচ্ছজাতের মানুষ, স্বাধীনতাকে বলা হবে ঔদ্ধত্য, এবং স্বর্গের দিকে চোখ রেখে এবং সাধুত্বের দীর্ঘশ্বাস ফেলে ক্লেশ প্রকাশ করে আক্ষেপ করে বলা হবে যে, আমরা চপলমতি, এবং হায়, আমাদের কোনো ধর্ম নেই। বকধার্মিক কপটের দল চুপে-চুপে চম্পট দিতে থাকবে, তাদের গোপন পাপের বোঝায় তাদের পিঠ বেঁকেছে তারা কিনা এমন একটা যুগের কুৎসা করতে পারে, যে যুগ কিনা তার আগের ও পরের কালের মধ্যে সবচেয়ে পবিত্র। সেই যুগ

যে-যুগ অতীতের পাপের জন্যে নিজে প্রায়শ্চিত্ত করছে, যে-যুগ ভবিষ্যতের সুখের জন্যে আত্মত্যাগ করছে। শত শতাব্দীর মধ্যে যিনি একজন ত্রাণকর্তা— যিনি কণ্টকমুকুট ধারণ করতে পারতেন না, এবং ক্রুশচিহ্নের ভারি বোঝাও বহন করতে পারতেন না, যদি-না চারদিক মুখরিত হয়ে উঠত ব্যঙ্গবিদ্রূপের সঙ্গীতে, এবং আমাদের সময়কার বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসের প্রতি প্রয়োগ করা না হত কৌতুক। ওইসব ব্যঙ্গবিদ্রূপ আর কৌতুক প্রয়োগ করা না হলে এই দুঃসহ বেদনা সহ্য করা অসম্ভব হত। হাস্য যদি আগে-আগে চলে তাহলে নিষ্ঠা আরও দৃঢ়ভাবে দাঁড়াতে পারে। আগের যুগটা এ দিক দিয়ে এ যুগের কয়েকজন ফরাসী-সন্তানদের সঙ্গে মেলে। তাঁরা বেশ মজাদার ও হালকা মেজাজের বই লিখেছেন, কিন্তু যেখানে কঠোর ও কঠিন হওয়া দরকার সেখানে সেরকম হতে পারেন। যেমন ধরা যাক দুজনের কথা—দু ক্লস অথবা লুভেত দ্য কাউভ্রে, এঁরা দুজনেই দরকার হলে শহীদের সাহস ও একাগ্রতা নিয়ে স্বাধীনতার জন্যে লড়তে পারেন, আবার এঁরাই বই লিখেছেন বেশ লঘুচেতার মতন এবং বেশ বেপরোয়াভাবে, দুঃখের বিষয়, এঁদের কোনো ধর্ম ছিল না।

স্বাধীনতা যেন অন্য ধর্মের মতন অত ভালো ধর্ম নয়। এবং যেহেতু এই স্বাধীনতার ধর্ম আমাদের ধর্ম, আমরা তাই এর নিন্দুকদের চপলমতি ও অধর্মী বলতে পারি।

বেশ, যে কথা দিয়ে এই কথা আরম্ভ করেছি সেই কথার পুনরুক্তি করি। মুক্তিমন্ত্র হচ্ছে নতুন ধর্ম, এটা আমাদের কালের ধর্ম। এমনকি যিশু যদি সেই ধর্মের ঈশ্বর না হন, তবুও ইনি এই ধর্মের একজন উচ্চাঙ্গের যাজক, এবং তাঁর শিষ্যদের হৃদয়ে তাঁর নাম শান্ত কিরণে উজ্জ্বল ভাবে বিরাজিত। কিন্তু এই ধর্মের ছাঁকা মানুষ হচ্ছে ফরাসীরা, এঁদেরই ভাষায় এর প্রথম মতবাদ নূতন করে লিপিবদ্ধ হয়েছে। প্যারিস হচ্ছে নতুন জেরুজালেম, রাইন হচ্ছে জরডন নদী—যে নদী স্বাধীনতার এই পবিত্র ভূমিকে অবিশ্বাসী ও ইতরজনের থেকে পৃথক্ করেছে।

('এ বুক অব ট্রাভেল্‌স্‌', ৪র্থ খণ্ড থেকে)

লাডউইগ বোর্ন

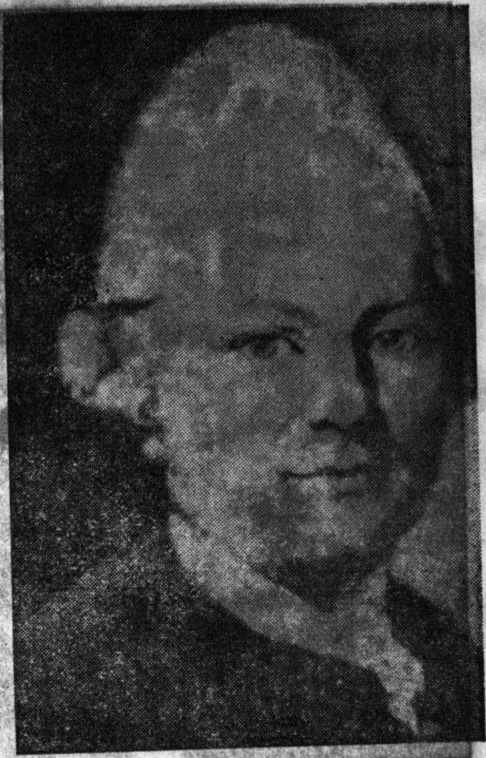
লাডউইগ বোর্ন (১৭৮৬-১৮৩৭) একজন রাজনীতি বিষয়ক লেখক ও সাংবাদিক রূপে গণতন্ত্রকে বিপুল উৎসাহের সঙ্গে সমর্থন করে গিয়েছেন, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক স্বাধীনতার জন্যে গণতন্ত্র যে প্রথম-প্রয়োজনে, এ কথা তিনি জানতেন ও মানতেন। ১৮৩০ সালের পর থেকে তিনি প্যারিসে বাস করতেন, তাঁর-মতের সঙ্গে যাঁরা একমত ছিলেন এমন অনেকেও তখন বাস করতেন প্যারিসে। তাঁর তেজস্বী-রচনা "রিচ অ্যাণ্ড পুয়োর" সেই ধারণা ও কল্পনারই রূপ, পরে কার্ল মার্কস্ পরিপূর্ণ পদ্ধতিতে যার চিন্তাশীল ব্যখ্যান লিপিবদ্ধ করেন। সামাজিক-অর্থনৈতিক অবস্থার সঙ্গে রাজনৈতিক অবস্থার সম্পর্ক কি, বোর্ন তার নির্দেশ দিয়ে যান। সমাজের উপর-তলা যাঁদের বলা হয়—অর্থাৎ ধনীরা—রাজনীতিতে প্রধান ভূমিকাই গ্রহণ করেন, এবং এর দ্বারা তাঁর দরিদ্র নিম্নশ্রেণীকে অনেক সুবিধা থেকে বঞ্চিত রাখেন, এবং তাদের দলিতও করেন, এবং আপাত-দৃষ্টিতে আইনসম্মত অথচ যা ঘোরতর অপরাধ সেই উপায়ে তাঁরা নিজেদের ঐশ্বর্য বাড়িয়েই চলতে থাকেন। বোর্ন-এর মতে এ ব্যাপার ফ্রান্সেও বিশেষ ভাবেই প্রযোজ্য, সেখানকার বিপ্লব সত্ত্বেও সেখানে প্রকৃত গণতন্ত্র-প্রতিষ্ঠা সুদূরপরাহত।

তাঁর "লেটার্স ফ্রম প্যারিস" জার্মানীতে নিষিদ্ধ ছিল, এতে তিনি ফ্রান্সের জুলাই বিপ্লব থেকে এই সিদ্ধান্তেই আসেন যে, জার্মানীতেও বিপ্লব দরকার হয়ে পড়েছে। যে চিঠি আমারা এখানে বেছে নিয়েছি তাতে এই অভিযোগ করা হয়েছে যে, জার্মানীতে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা কম —গবর্নমেণ্ট এ-স্বাধীনতা দিতে যে অস্বীকার করছেন তার কারণ জনসাধারণের সমালোচনার ভয়ই কেবল নয়, এর কারণ হচ্ছে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা জিনিসটা কি, সে সম্বন্ধে তাঁদের সম্পূর্ণ অজ্ঞতা।

ধনী ও দরিদ্র

ধনীর বিরুদ্ধে দরিদ্রের প্রচণ্ড সংগ্রাম আমার চোখের সামনে এমন স্পষ্ট ভাবে জেগে আছে যে, মনে হচ্ছে আমি যেন সেই লড়াইয়ের মধ্যেই



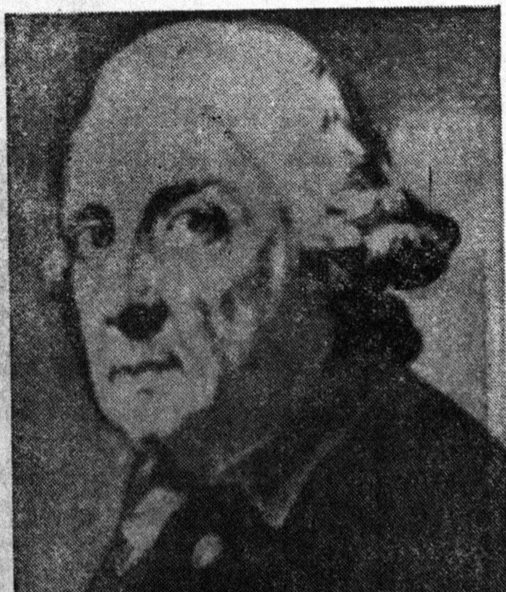


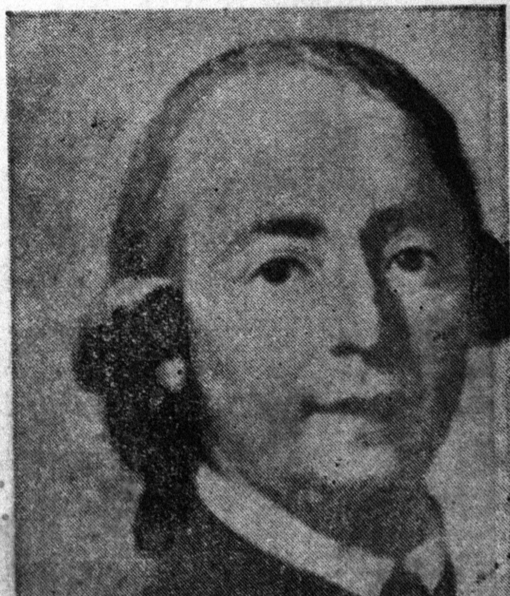
মার্টিন লুথার
(১৩৪৩-১৩৪৬)

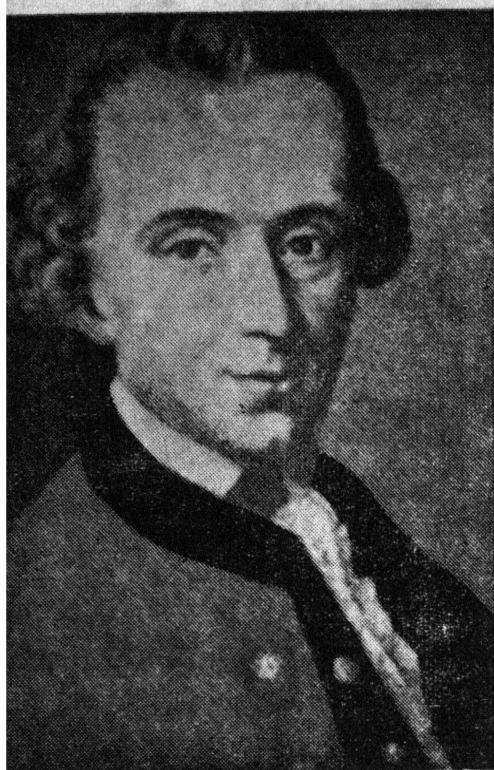
গটথোল্ড ইফ্রাইম লেসিং
(১৭২৯-১৭৮১)

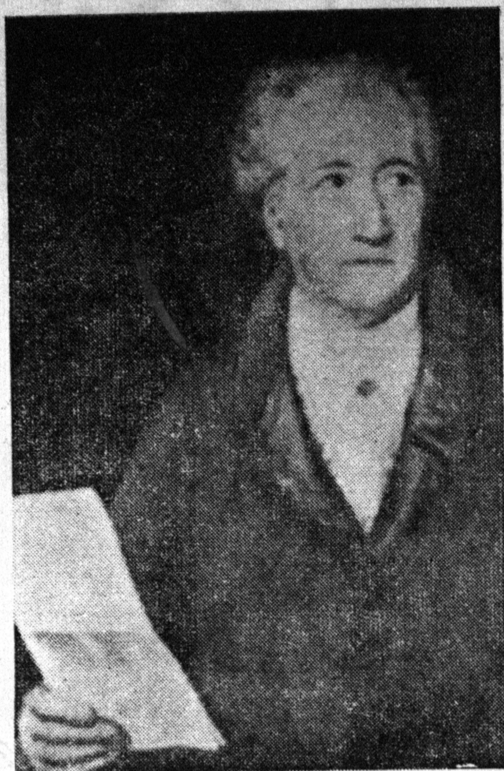
দ্বিতীয় ফ্রায়েডরিখ
(১৭১২-১৭৮৬)

জোহান গটফ্রায়েড হারডার
(১৭৪৪-১৮০৩)







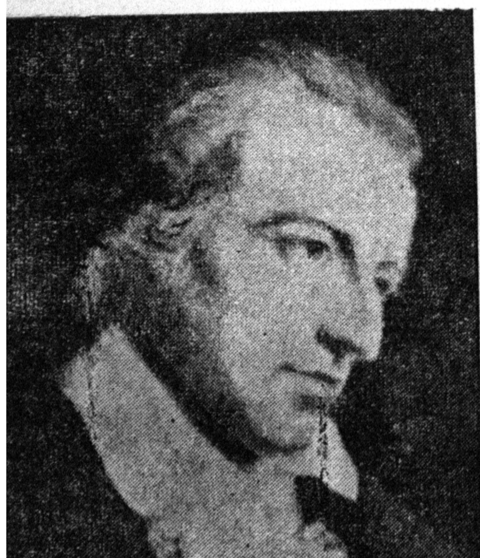


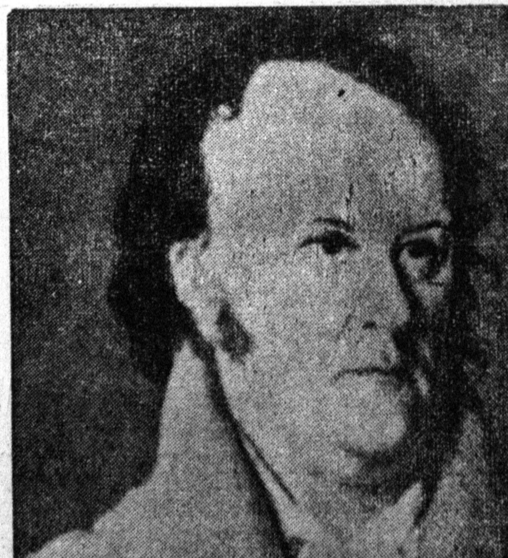
ইমানুয়েল কাণ্ট
(১৭২৪-১৮০৪)

জোহান ভল্‌ফগ্যাং ফন গ্যেটে
(১৭৪৯-১৮৩২)

ফ্রায়েডরিখ শিলার
(১৭৫৯-১৮০৫)

ঝাঁ পাউল
(১৭৬৩-১৮২৫)





বাস করছি; এ লড়াই আটকানো যেত এবং পৃথিবীতে শান্তিও অবশ্যই আনা যেত; কিন্তু সমস্ত গবর্নমেণ্ট একযোগে এমনভাবে কাজ করছে যাতে ধ্বংস অনিবার্য। একটা অন্যায়ের সম্মুখে দাঁড়িয়ে রাজনীতিবিদেরা যখন ভয়ে থরহরি কম্পমান হন তখন তাঁরা মনে করেন যে তাঁরা তাঁদের যথাসাধ্য করলেন। ফ্রান্সের মন্ত্রণাসভায় দরিদ্রের কোনো প্রতিনিধি নেই। ফ্রান্সের সর্বশেষ সংবিধানে সেই পুরাতন পাগলামো, সেই পুরাতন অবিচার, সেই পুরাতন ও শোচনীয় মূর্খের রাজনীতি—সবই বহাল রাখা হয়েছে; সম্পত্তির উপর ভিত্তি করে ভোটাধিকার দেওয়া হয়েছে; এবং যাদের সম্পত্তি নেই তাদের মর্যাদাও নেই—এই ব্যবস্থাই করা হয়েছে। ইংলণ্ডের রিফর্ম বিল কেবলমাত্র মধ্যবিত্তশ্রেণীর অবস্থার একটু উন্নতি ঘটিয়েছে, এবং নিম্নশ্রেণীর লোকেরা যে ক্রীতদাসের মত সেইটেই নূতন করে যেন বলেছে। পার্লামেণ্টে এবং চেম্বার অব ডেপুটিজ'এও সেখানে যাঁরা বসেন তাঁরা কেবলমাত্র ধনী সম্পত্তির অধিকারীরা, বিত্তবানেরা এবং ফ্যাক্টারির মালিকেরা। এরা সকলেই নিজের-নিজের সুযোগ-সুবিধার ধান্দায় থাকেন যেটা কিনা মেহনতী মানুষের সুযোগ-সুবিধার একেবারেই বিপরীত ব্যবস্থা। যাকে বলা যায় পাকা-দাড়ির বুদ্ধি, রাষ্ট্রের সেই নায়কদের বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের বুদ্ধি হয়েছে শিশুসুলভ, কোনো সজ্জন ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন লোকেরা যদি এই রকম অভিপ্রায় প্রকাশ করেন যে নিম্নশ্রেণীর মানুষদেরও জনপ্রতিনিধিত্বের ভাগ দেওয়া উচিত, অমনি তাঁরা রেগে তেলে-বেগুন হয়ে ওঠেন। এবং বলেন যে, যে-মানুষের খোয়া খাবার মত কিছু নেই তার পক্ষে সৎভাবে দেশের সামগ্রিক কল্যাণের জন্যে অংশগ্রহণ করা সম্ভব নয়। চক্রান্তকারীরা সহজেই তাদের ভোট পেতে বা কিনে নিতে পারবে। তাঁরা যা চিন্তা করেন তার বিপরীত কথা বলার জন্যেই তাঁরা এ কথা বলেন। ধনীদের মধ্যে যত সৎ লোক আছেন দরিদ্রের মধ্যে তার চেয়ে বেশি সৎ লোক আছেন বলেই, অন্যদের চেয়ে এরা উৎকোচ গ্রহণের ব্যাপারে নিজেদের অনেক কম জড়াবে বলেই মন্ত্রীরা জনপ্রতিনিধিদের মধ্যে এদের পেতে চান না। তাঁরা তাঁদের গোপন খাতাপত্তর আমাদের দেখতে দিন্, তাঁরা তাঁদের অনুগামীদের তাঁদের সংবাদসংগ্রহকারীদের তাঁদের রাজনৈতিক দালালদের ও তাঁদের গোয়েন্দাদের নাম-ধাম আমাদের পড়তে দিন্, তাহলে তখনই বোঝা যাবে যে, নিজেদের হীন আকাঙ্ক্ষা

ও উচ্চ অভিলাষ চরিতার্থ করার জন্যে ধনীরাই তাঁদের বিবেক বিক্রয় করেছেন অথবা নিজেদের ক্ষুধা দমন করার জন্যে ধনীদের চেয়ে বেশি সংখ্যক দরিদ্র্য অমন কাজ করেছে। কেবলমাত্র ধনীরাই আইন তৈরি করেন, তাঁরাই স্থির করেন কার উপর কতটা কর ধার্য হবে, এই করের বেশির ভাগই তাঁরা চাপান দরিদ্রের উপর। রাষ্ট্রের শুল্ক ধার্যে কতটা অবিচার হচ্ছে, কার ঘাড়ে কতটা চাপছে তা দেখলে হৃদয় বিদ্রোহী হয়ে উঠে। করের বোঝা ভারি হয়েছে এমন অভিযোগ কি কখনো কোনো ধনী শহরবাসীকে করতে শুনেছ? ইউরোপের মানুষেরা যে করের বোঝায় চাপা পড়ে অর্ধ-নিষ্পেষিত হয়ে গোংরাচ্ছে, সে বোঝা বহন করছে কারা? তা বহন করছে দরিদ্র দিনমজুর, এবং গ্রামবাসীরা। কিন্তু শহরবাসীর কাছে গ্রামের মূল্য কী। শহরবাসীর বহিঃভ্রমণের জন্যে ও গির্জার উৎসবের জন্যেই যেন ঈশ্বর সৃষ্টি করেছেন গ্রাম! কৃষকের · কর্তব্য হচ্ছে—নিজের দুর্দশা সত্ত্বেও ধনীর উদ্‌বৃত্ত সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণ করার জন্যে তার একমাত্র পুত্রকে ধনীর হাতে দিয়ে দেওয়া, যদি এই পুত্রটি তার দুঃখকষ্ট একটু জানায়, তাহলে সেই একমাত্র পুত্রটিকে ফেরৎ পাঠানো হয় কৃষকের কাছে, যে ছোকরার কিনা দিনে পাঁচ কয়েৎসারের (প্রাচীন কম দামী মুদ্রা) জন্যে পিতৃঘাতী বা মাতৃঘাতী হবার জন্যে প্রস্তুত থাকতে হবে। সব রকম কর বা শুল্ক ধার্য হয় নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের উপর, এবং ধনীদের দম্ভ যতটা সহ্য করতে পারে তাঁদের বিলাসদ্রব্যের উপর কেবল ততটাই কর বসে; একটু সস্তা দরের আমোদ-আহ্লাদ গরীবদের থেকে তাঁদের স্বাতন্ত্র্য স্পষ্ট করে ধরতে দেবে না। অভিশপ্ত গবর্নমেণ্টের ঋণ পত্রের উদ্ভাবক তাঁরাই যাঁরা জীবিত মানুষদেরই অসুখী দেখে তৃপ্ত হতে চান না, তাঁরা সুখে মরার জন্যে তাঁদের সঙ্গে তাঁদের গোরস্থান পর্যন্ত এই নিশ্চিত বিশ্বাসও নিয়ে যেতে চান যে ভবিষ্যৎ কালের মানুষেরাও ধ্বংস হোক—তাঁরা শিল্প-বাণিজ্যের প্রায় সব মূলধন আটক করে রাখেন এবং এই ভাবে এদের সর্বনাশ ঘটানো যখন সম্পূর্ণ হয়, তখন তাঁরা নিজেরা কর-মুক্ত থেকে আমাদের আরও বেশি সর্বনাশ এনে দেন, এ সবের দরুণ রাষ্ট্রের যা ক্ষতি হয় তা পূরণের জন্যে ক্ষয়িষ্ণু শিল্প-বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে আরও কর দাবি করা হয়। কারখানার ধনী মালিকেরা নিজেদের সর্বনাশ হয়ে গিয়েছে মনে করেন যখন তাঁদের প্রত্যেক মেয়ে টার্কিশ শাল ব্যবহার

করতে পারে না; এই জন্যে তাঁর যাতে নিজেকে বা নিজের পরিবারের কাউকে কোনো ব্যাপারে বঞ্চিত করতে না হয় সেজন্য তাঁরা তাঁদের ক্ষতির অঙ্কটা শ্রমিকদের উপর চাপিয়ে দেন এবং তাদের দিন-মজুরি কমিয়ে দেন। প্যারিস শহরের বছরে দরকার হয় চার কোটি, এর সিংহভাগ থেকে যায় পছন্দসই জোগানদার ও উদ্যোগী ব্যবসায়ীদের হাতে। এখন সেখানে আরো অর্থের দরকার হয়েছে, তাই কিছুদিন ধরে ভাবা হচ্ছে মদ মাখন ও কয়লার উপরে নতুন কর বসানো যায় কিনা। এতে ধনীদের কোনো ক্ষতি হবে না, সব সময়ের মত মরতে মরবে গরিবরাই। এক বোতল মদের উপরে কর হচ্ছে পাঁচ সাউস (sous); সস্তা মদ যা গরিবেরা খায় বা দামী মদ যা ধনীরা খায়—এতে করের কোনো ইতরবিশেষ হচ্ছে না। কোনো অপেরার এক সেরা গায়িকা বছরে চল্লিশ হাজার ফ্রাঙ্ক রোজগার করে, কিন্তু সে কোনো কর দেয় না; কিন্তু রাস্তার ধারে অর্গান বাজিয়ে যে সামান্য কিছু রোজগার করে, তাকে তার ভিক্ষার সঞ্চয় থেকে পুলিশের হাতে বেশ ভারি অংশ দিতে হয়। লটারির মত একটা জঘন্য ব্যবস্থাটা একটা এমন ধরণের কর, যা সমাজের দরিদ্রশ্রেণীর উপরে গিয়েই চাপে। দিন-মজুরদের কাছ থেকে রাষ্ট্র বছরে তিন কোটি আদায় করে; যে গভর্নমেণ্ট নিজে এমন কাজ করে সেই কিনা এখনো একজন চোরকে জেলে পুরতে দ্বিধা করে না, এবং একজন ডাকাতকে মৃত্যুদণ্ড দেয়! এসব ঘৃণ্য কাজকর্ম তো আছেই, তার উপরে যাদের কিছুই খোয়া যাবার নেই সেই হতভাগ্যদের নানা রকম গালিগালাজ করে, আর ধনীদের সতর্ক করে দিয়ে বলে তারা যেন সব সময় ঐ প্রাণী সম্বন্ধে সাবধান থাকে, যে প্রাণীর নাম জনসাধারণ। এ সব ঘটনা যদি ফ্রান্সে ঘটতে পারে, যে দেশে স্বাধীন সাংবাদিকতা অনেক হিংস্র কাজকে নিন্দা ক'রে বাধা দেয়, এবং অনেকের অনেক ক্ষতি পূরণ করতে দ্বিধা করে না; তাহলে যে সব দেশে সকলেই মুখ বুজে আছে, যেখানে কেউ কোনো অভিযোগ করার সুযোগ পায় না, এবং যেখানে প্রতিটি মানুষ একা একা তাদের নিজের বেদনার যন্ত্রণাটাই ভোগ করতে থাকে, সে সব দেশের দশা কী। সে সব দেশে গরিবদের কী চোখে দেখা হয়, তাদের সঙ্গে কী রকম ব্যবহার করা হয়, কিভাবে তাদের অবজ্ঞা করা হয়—তা আমাদের বেশ চোখে আঙুল দিয়েই দেখিয়ে দিয়েছে ঐ ব্যাধি—ঐ কলেরা, যা নাকি ঈশ্বরেরই অভিপ্রায় রূপে এসে গিয়েছিল

বলে কাগজে-কাগজে নির্লজ্জের মত প্রচার করা হয়—যে নির্লজ্জতার আর জুড়ি নেই। রাশিয়ায় অষ্ট্রিয়ায় এবং প্রুশিয়ায় মানুষেরা কি ভাবে হেসেছিল, কিভাবে বিদ্রূপ করেছিল আর কিভাবে দাবি জানিয়েছিল যে, তারা সব ভালোমতই বোঝে এবং তাদের সেই হাসি ছিল তরবারির ঝলক, কামানের মুখ থেকে এসে গিয়ে ছিল তাদের কাছে নির্দেশ, এবং তাদের বিদ্রূপ হয়ে গিয়েছিল মৃত্যু—কেননা, তাদের মনে এই ভুল ধারণাটাই বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল যে, অভিজাতরা, ও ধনীরা তাদের বিষ খাইয়ে মারতে চায় এবং এই কলেরা হচ্ছে দরিদ্রের প্রতি ধনীর ঘৃণা থেকেই উদ্ভূত! কিন্তু এত ভুল বোঝাবুঝির মধ্যেও একটা সত্য লুকিয়ে ছিল। মানুষের প্রতি জঘন্য ব্যবহার দেখে-দেখে দরিদ্ররা জেনে নিয়েছিল যে, ধনীদের হাতের ক্রীড়নক রূপেই দরিদ্রদের সৃষ্টি—তারা একটা যন্ত্রবিশেষ, এই যন্ত্রটির কাজ যখন ফুরিয়ে যায় তখন সেটা ছুড়ে ফেলে দেওয়া হয়, এবং যন্ত্রটি বিকল হলেই তা ভেঙে-দুমড়ে দেওয়া হয়। এই সত্যটি বোধহয় উপলব্ধি করতে পারেন নি বিদ্রূপকারীরা ও বিদ্যাভিমানীরা। দারিদ্রদের প্রতি করুণার বশবর্তী হয়েই কি জোর-জবরদস্ত ক'রে তাদের মেরে-ধরে তাদের বাড়ি-ঘর ও পরিবার-পরিজনদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে তাদের নিয়ে যাওয়া হল হাসপাতালে? এটা করা হয়েছিল ধনীদের আতঙ্ক কমাবার একটা ব্যবস্থা হিসেবেই। ধনীরা কি কাগজে-কাগজে লিখে তাঁদের সম্প্রদায়ের সকলকে আশ্বাস দেন নি, তাঁরা কি এই ব্যবস্থার জন্যে উল্লাস প্রকাশ করেন নি? এই রাগ কেবল গরিবদের ও অতি নগন্য মানুষদেরই আক্রমণ করে, ধনীদের বা অভিজাতদের ভয়ের কিছুই ছিল না। এ ধরণের বক্তৃতা কি তখন জনগণ শোনে নি, বা কাগজে পড়েনি; তারা কি এজন্যে কিছু মনে করবে না? না কখনোই না। ধনীরা একথা বুঝে নিয়েছেন যে, দরিদ্ররা কিছু মনে করে না, কেন না তারা চিন্তা করে না। কিন্তু তাদের কাছে চিন্তা হচ্ছে ফল, এবং কাজ হচ্ছে মূল; জনসাধারণ যখন চিন্তা করতে আরম্ভ করবে, তখন তাদের চিন্তা সম্বন্ধে সন্দেহ করার সময়ও তোমরা পাবে না, এবং সে চিন্তা আর ফিরেও যাবে না! যাই হোক, অনেক মেজাজ দেখালাম, অনেক উষ্মা প্রকাশ করা গেল। রাশিয়ায় একজন মেষপালক আছে—যার বয়স ১৬৮: কিন্তু কোনো রাশিয়ান তো মেজাজ দেখায় না। অপরাধী পেলে সে চাবুক কষে, দরকার হলে সে নিজেও চাবুক

খায়, সে অন্যকে বোঝাবার চেষ্টা করে, নিজেও বুঝতে চেষ্টা করে। আমরা সুসভ্য জার্মানরা অতটা স্বাস্থ্যোজ্জ্বল হয়ে উঠতে পরেনি। তবু ওরকম ঘটনা এখনো ঘটতে পারে।

প্যারিস থেকে লেখা চিঠি

কোট্টা এখান থেকে—এই প্যারিস থেকে—একটা সংবাদপত্র প্রকাশের পরিকল্পনা করেছেন, এ কথা ডি.'র কাছে শুনলাম, এঁর কাছেই কোট্টা এ ব্যাপারে আপাততো প্রস্তাব করেছেন। কাজটা যদি সফল হয়, তাহলে সেটা জৈব—অনুগ্রহের মতই হবে। প্রায় এক শ জার্মান মন্ত্রী এ ব্যাপারে পাগলা হয়ে যাবে। এই মানুষটি যদি ইচ্ছে করতেন তবে তাঁর এত ধনসম্পদ, এত কর্মতৎপরতা, তাঁর ব্যবসায়ীমহল ও তাঁর এত চেনা-জানা মহল নিয়ে কত কী-যে করতে পারতেন! একমাত্র তিনিই জানেন কী করে নিষ্প্রাণ কলমে প্রাণসঞ্চার করা যায়, এবং যারা গোপন তথ্যের বিকিকিনি করে তাদের কাছ থেকে সেসব তথ্য কী করে হাতানো যেতে পারে। আমি যখন সংবাদাদি পরীক্ষা-নিরীক্ষার এবং তার উপর বিধিনিষেধ আরোপের কথা ভাবি, তখন দেয়ালে আমার মাথা ঠুকতে ইচ্ছে করে। একজনের মন হতাশায় ভরে দেবার পক্ষে এ যথেষ্ট। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা একটা জয় নয়, এটা একটা সংগ্রাম তো নয়ই; এটা হচ্ছে হাতিয়ার দিয়ে নিজেদের সজ্জিত করার একটা উপায় মাত্র। কিন্তু লড়াই না করে জয় আসবে কী ক'রে, এবং হাতিয়ার ছাড়া লড়াই হবে কী ক'রে? এই যে একটা চক্রবৎ চক্রান্ত, এ'তেই মানুষকে উন্মাদ করে দেয়। জন্তুজানোয়ারেরা যেমন তাদের দাঁত দিয়ে আত্মরক্ষা করে, আমাদের তেমনি বাহুবলে আত্মরক্ষা করতে হবে। তাঁরা নিজের আপন ইচ্ছায় কখনোই আমাদের সংবাদপত্রের স্বাধীনতা দেবেন না। আমাদের শাসকদের বা তাঁদের উপদেষ্টাদের প্রতি কোনো অবিচার আমরা করতে চাইনে; আমি এ কথাও জোর দিয়ে বলতে চাই নে যে, সর্ব ব্যাপারে এবং সর্ব ক্ষেত্রে যেসব গ্লানিকর ও ক্ষতিকর কাজ হয়ে চলেছে সংবাদপত্র সেই সব কথা সর্বসমক্ষে ফাঁস করে দেয় ব'লে, এবং সেইসব জঘন্য কাজ নিরবচ্ছিন্ন ভাবে চলুক—এটা তাঁরা চান বলেই সংবাদপত্রকে স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে; ব্যাপারটা এমন নয়। তাঁরা যদি স্বর্গের দেবদূতের মতন শাসনকাজ চালাতেন, এবং সবচেয়ে বেশি জুলুমবাজ নাগরিকও যদি দেখতেন যে, দাবি

জানাবার মতন তাঁর কিছুই নেই, তা হলেও তাঁরা সংবাদপত্রকে স্বাধীনতা দিতে চাইতেন না। আমি ঠিক জানিনে, বোধ হয় তাঁদের মধ্যে প্যাঁচার স্বভাবের মতন স্বভাব আছে, দিনের আলো তাঁরা সহ্য করতে পারেন না। তাঁরা প্রেতের মতন, মোরগরা যেই ডাক শুরু করে দেয়, অমনি তাঁরা অদৃশ্য হয়ে যান।

রবার্ট প্রুটৎস

রবার্ট প্রুটৎস (১৮১৬-১৮৭২) ছিলেন একজন সাংবাদিক, লেখক ও ও সাহিত্যপ্রাণ ঐতিহাসিক। তাঁর "দি ফ্রেঞ্চ রিভোলিউশন" প্রবন্ধে তিনি পুনরায় ১৭৮৯ সালের ঘটনাবলীর প্রশংসা করেছেন, এর নীতির ও প্রয়োজনীয়তার বিষয়ও তিনি বেশ উপলব্ধি করতে পেরেছেন। তাঁর "রিআকশনারি রোমানটিকস" প্রবন্ধে প্রুটৎস "ইয়ং জার্মান"-আন্দোলন সম্বন্ধে অন্যান্য সব লেখকের মতবাদের অনুরূপ অভিমত প্রকাশ করেছেন, অর্থাৎ গ্যেটে ও রোমান্টিক বা ভাববাদী কবিদের অস্বীকার করেছেন। এই ভাববাদীদের কয়েকটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য অবদান অবশ্য এখানে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে, কিন্তু তার মধ্যে একটু যেন পক্ষপাতিত্ব আছে এবং একটু যেন বিকৃতভাবে দেখার ঝোঁক আছে, কিংবা বলা যায় ঐসব কবির উদ্দেশ্য সম্বন্ধে একটু বোধ হয় ভুল-বোঝাবুঝি আছে। সে যাই হোক, এই সমালোচনামূলক প্রবন্ধে "ইয়ং জার্মান"-গোষ্ঠীর দৃষ্টিভঙ্গির পরিষ্কার পরিচয় এতে পরিচয় আছে।

ফরাসী বিপ্লব

ফলেন পরিচিয়তে: তা যদি ঠিক তাহলে, সমস্ত অষ্টাদশ শতাব্দী ধীরে ধীরে এমনভাবে বেড়ে উঠছিল যে একটা স্বর্ণময় বর্ণময় ফলে সে যেন পরিণত হয়ে উঠতে পারে, যেন একটা কুঁড়ি ক্রমে-ক্রমে বেড়ে উঠে একটা নিটোল ফল, ঠিক সেইভাবেই সেই শতাব্দীর কিনারা থেকে সে আমাদের হাতছানি দিচ্ছে; এর পরিণতি এবং এর পরিণাম হচ্ছে গাছের সেই ফলেরই মত, সেটা হচ্ছে ফরাসী বিপ্লব।

ফরাসী বিপ্লব ব্যাপারটা যত তুচ্ছ ঘটনাই হোক, তবুও আমরা বেশ জোরের সঙ্গে বলব, এবং এভাবে বলব এই জন্যে যে, আমাদের মধ্যে এখনও

এমন লোক আছেন—না, কেবল লোক নয়, কেবল পুলিশম্যান নয়, কেবল ছোটখাটো নিরাপত্তারক্ষী অফিসার নয়, এছাড়াও আছেন এমন মানুষ, এমনকি যাঁরা রীতিমত স্কলার ঐতিহাসিক ও রাজনীতিবিদ্‌, যাঁরা নাকি এখনও এমন মত পোষণ করেন এবং তালিকা দেখিয়ে চিঠিপত্র দেখিয়ে ও পুরাতন নথিপত্র দেখিয়ে এমন প্রমাণ করতে চান যে ফরাসী বিপ্লবের উৎপত্তি হচ্ছে কেবলমাত্র—

ভালো কথা, বেশ। কিসের থেকে এই উৎপত্তি?

কারণ, ফরাসীরা স্বভাবতই একটু অবাধ্য গোছের, কারণ তাদের উপর কর চাপানো হয়েছিল খুব বেশি, খাদ্যশস্য ভালো উৎপন্ন হয় নি, কারণ ঐ লোকটা মন্ত্রী হতে পেরেছিল বা মন্ত্রী হতে পারেনি, এবং ষোড়শ লুই এই কাজটা করেছিলেন বা ঐ কাজটা করেন নি, এবং এই ব্যাপারে বা অন্য ব্যাপারে ঘটনা যদি এইভাবে ঘটত বা ঐভাবে ঘটত—এক কথায়, সেই সময়ে ফরাসীদের সঙ্গে একজন সাহসী ও যোগ্য জার্মান প্রফেসার ছিলেন, এবং দূরদৃষ্টি সম্পন্ন একজন বিচক্ষণ জার্মান কূটনীতিবিদ তাঁদের পাশে ছিলেন, তা না হলে সব ব্যাপারটাই একেবারে অন্যরকম হয়ে যেত এবং এখনো ষোড়শ লুই'ই রাজত্ব করতেন, কিংবা তাঁর নাতিরা করত; কিন্তু নেপোলিয়ন—ইতিমধ্যে তিনি হয়তো হয়ে যেতেন অবসরপ্রাপ্ত একজন মেজর, এ সবেরই জন্যে একজন জার্মান অধ্যাপকের বুদ্ধির ও দূরদৃষ্টির প্রশংসা করতে হয়।

আমার বক্তব্য এই যে, ফরাসী বিপ্লব যত তুচ্ছ ব্যাপার বলেই গণ্য হোক না কেন, তবু বার বার ক'রে এ কথা বলতেই হবে যে ফরাসী বিপ্লব শুধুমাত্র ফরাসী বিপ্লব ছিল না, এটা কেবল ফরাসীদেরই বিপ্লব ছিল না, এটা সমস্ত পৃথিবীর একটা ব্যাপার, এটা ইতিহাসের বিপ্লব, এটা প্রকৃতপক্ষে একটা নূতন যুগের সূচনা।

এমনকি আমরা, খুবই অনুগত ও শান্তিকামী জার্মানরা, আমাদের হৃদয়মন যতই নম্রতায় ও বিশ্বস্ততায় পরিপূর্ণ হোক না কেন, সেই আমরা এই সম্ভাবনার কথা ভাবলে আতঙ্কিত হয়ে উঠতে পারি: কিন্তু তাতে কিছু হবে না, এর হাত থেকে আমরা রক্ষা পাব না। এমনকি আমরা যারা এই বিপ্লবের ফল বিশেষ পাইনি, যে বিপ্লব নূতন স্বাধীন ও আনন্দময় জীবনের সংকেত নিয়ে এসেছে, ন্যায় বিচারের ও উন্নত মানবিকতা-বোধের চেতনা নিয়ে এসেছে, যে বিপ্লব পৃথিবীর দিগন্তসীমায় রক্তবর্ণ প্রভাতের তারা নিয়ে উদিত—আমরা

যদিও এইসব সুফলের সামান্যই লাভ করেছি, কিন্তু আমরাও এর উৎপত্তির ও এর পুষ্টির কাজে অবশ্যই অংশগ্রহণ করেছি। এ হচ্ছে সেই একই স্বাধীনতার ও সংস্কৃতির আইডিয়া, এ হচ্ছে মানবাত্মার সর্বময় কর্তৃত্বের সেই চিরন্তন স্বীকৃতি, এ হচ্ছে সেই মহৎবাণী—যে বাণী বলেছে যে সব মানুষের জন্ম একই সাম্য ও একই স্বাধীনতা নিয়ে ; এবং ঈশ্বরের অধীন সমগ্র মানবসমাজের প্রতি আমাদের সকলের কর্তব্য সমান—সমস্ত অষ্টাদশ শতাব্দী জুড়ে আমাদের কবি ও চিন্তাশীল ব্যক্তিরা এই বিষয় নিয়েই বিশেষভাবে নিজেদের উদ্বিগ্ন রেখেছিলেন ; তাঁদের গানের মধ্য দিয়ে সেই চিন্তার ধারা আমাদের দিকে বয়ে এসেছে, এবং সলোমনের আদেশ যেমন জাদুর মত সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে, ঠিক সেই ভাবে ঐ চিন্তার ধারা সব চিন্তাশীল ও দার্শনিকের মধ্যে ব্যাপ্ত হয়েছে। এঁদের মধ্যে কেউ কেউ হয়তো বিষয়টি সম্পূর্ণ বোধগম্য না হওয়ায় শিশুর মত অস্পষ্ট উক্তি করছেন ও কথা খুঁজে বেড়াচ্ছেন, শিশুরা তো সব সময় শব্দের অর্থ বোঝে না, কিন্তু মানে না বুঝলেও ঐ শব্দটিই সে আধো-আধো উচ্চারণ করে। এই ভাবে অনুসন্ধান করা ও উচ্চারণ করাই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু শতাব্দীর শেষদিকে ফ্রান্স যা উপলব্ধি করতে পেরেছে, মার্সাইয়ের সেই গৌরবোজ্জ্বল মৃত্যুবরণের সংগীতে এখনো যার প্রতিধ্বনি বাজছে, এবং গিলোটিনের সেই সোপানশ্রেণী থেকে প্রায়শ্চিত্তের যে ভারী রক্তবিন্দু আমাদের কালেও এসে ফোঁটা ফোঁটা পড়ছে— !

ঘটনার পরিণতি ভয়াবহ হয়ে উঠেছিল, স্বাধীনতার দেবদূত যাঁকে বলা যায় তিনি যে পৃথিবীময় মৃদু পদচারণা করে সকলের উপর আশীর্বাদ বর্ষণ করে তাদের সুখী করার পরিবর্তে নিজের অঙ্গবাসকেই রক্তরঞ্জিত করতে বাধ্য হলেন, তাঁর হাতের মৃদু ও কোমল স্পর্শ দিয়ে শৃঙ্খল মোচন করার পরিবর্তে তাকে যে কুঠারের নির্মম আঘাত দিয়ে শৃঙ্খল ভেঙে টুকরো টুকরো করতে হল—এর জন্য তিনি দায়ী নন্। স্বাধীনতার অর্জনের অর্থ রক্ত নদীর মধ্যে দিয়ে হেঁটে যাওয়া নয়, মুণ্ডচ্ছেদ করা বা ফাঁসি দেওয়ার স্বাধীনতার তাৎপর্য নয়। যেমন, উদাহরণ রূপে বলা যায় যে, অত্যাচারের অর্থ যেমন রেশমের শয্যায় আমাদের শুইয়ে আমাদের আদর করা এবং মাংস ও পানীয় জোগান দেওয়া নয়। এ সবের জন্যে দায়ী তাঁরা, যাঁরা এই বিপ্লবের বিক্রমের মধ্যে দেখতে পেয়েছিলেন দানব, উত্থানের মধ্যে দেখতে পেয়েছিলেন পতন, ভোরের সূর্য-কিরণের মধ্যে দেখতে পেয়েছিলেন অগ্নি-

কাণ্ডের শিখা। ভদ্রমহোদয়গণ, যখর একটা বয়লার ফেটে যায়, তখন বাষ্পের দোষ না দিয়ে দোষারোপ করা হত বয়লারের উপর ; কিন্তু আসল দোষ সেই মানুষের যে মাত্রার অতিরিক্ত তপ্ত করেছিল বয়লার, যে বাষ্পকে চাপ দিয়ে এমন সংকুচিত করেছিল যে বয়লার না ফেটে পারল না, যে সময়মত সেফটি ভাল্ভ খুলে দিয়ে বাষ্পকে মুক্ত হয়ে বেরিয়ে আসার পথ করে দিল না।

তাহলেই আমরা বিপ্লবের এই রক্তাক্ত চেহারা দেখে যেন ভয় পেয়ে না যাই, আমরা যেন আমাদের নিষ্কলঙ্ক পবিত্র হাত তুলে ফরাসীদের বেদনার জন্য পরিতাপ না করি কেননা তারা রক্তের অক্ষরে স্বাধীনতার নাম লিখেছিল, এবং অষ্টাদশ শতকের জন্যেও বেদনাবোধ না করি, যে শতক অমন ভীষণ উচ্চতায় উঠতে পেরেছিল। ভদ্রমহোদয়গণ, আসুন আমরা শ্রদ্ধা মিশ্রিত বিস্ময় প্রকাশ করি, ইতিহাসের এই ভয়ংকর প্রয়োজনে উপলব্ধি করে প্রকাশ করি এই বিস্ময়, এবং আসুন এর থেকে আমরা শিক্ষা গ্রহণ করি, বিশেষ কিছু নয়, কেবল এইটুকু শিক্ষাই যেন লাভ করি যে, বয়লারকে মাত্রাতিরিক্ত উত্তপ্ত ক'রে কেউ যেন না তোলে।

ফরাসী বিপ্লব থেকে আমরা এইটুকু জানতে পেরেছি যে, এটি হচ্ছে, সারা অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্য দিয়ে যে জীবন্ত স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা পুঞ্জীভূত হচ্ছিল, সংস্কার-মুক্তির ও বন্ধন-মুক্তির যে প্রেরণা সঞ্জীবিত হয়ে উঠছিল, ফরাসী বিপ্লব হচ্ছে তারই কার্যকর একটা পরিণতি। যা ছিল একথা থিয়োরি মাত্র তাই পরিণত হল কার্যে, যা ছিল সাহিত্য তাই হয়ে দাঁড়াল রাজনীতি, যা ছিল সংস্কৃতি তা প্রয়োগ করা হল কর্মে। এ হচ্ছে সেই তারকারই মত, পুরাণে যার সম্বন্ধে বলা হয় যে, সম্পূর্ণরূপে অস্ত্র সাজিত হয়ে অস্ত্রের ঝনৎকার বাজিয়ে যে নাকি তার স্রষ্টার ললাট থেকে নির্গত হয়েছিল।

প্রতিক্রিয়াশীল ভাববাদ

রোমান্টিকেরা, অর্থাৎ ভাববাদীরা, সাহিত্যের মধ্যেই একটা সাহিত্য প্রতিষ্ঠা করতে খুব আরাম পেতেন, জাতির মধ্যে জাতি একটা ছোট্ট সুবিধা-ভোগী গোষ্ঠী যাদের সঙ্গে তুলনা করা চলে রুচিহীন স্থূলবুদ্ধি অশিক্ষিত জনসাধারণের। তাদের মধ্যে সুশ্রীতার ও মমতাময়তার বিশেষ অভাব ছিল, কোনো বিষয় গভীরভাবে শিক্ষা করার মতন ধৈর্য তাদের ছিল না। কিন্তু এইসব গুণের জন্যই ফিকটে, বিশেষ ক'রে শিলার, এমন বিরাট ও মহৎ হয়ে

উঠেছিলেন। এইসব গুণের অভাব ঘটলে মানব-জীবনের যে কোনো উদ্যোগে বা কাজে সাফল্যলাভ করা ও বড় হওয়া অসম্ভব না হলেও বড় কঠিন। এই কারণেই এসব গুণ না থাকলে বড় হয়ে উঠে দাঁড়াবার মূল ভিত্তিটিই থাকে না, জাতির মৌলিক বোধও নষ্ট হয়ে যায়।

এই ব্যাপারে, এবং অন্যান্য ব্যাপারেও বটে, রোমান্টিকরা নিজেদের যুক্ত করতে চান গ্যেটের সঙ্গে, যাঁর খ্যাতি নিয়ে অনেক সময়ই অনেক রকম আলোচনা হয়েছে।

এর দ্বারা আমি এ কথা বলতে চাইনে যে, তাঁর সম্বন্ধে যা বলা হয়ে থাকে তাঁর খ্যাতি ছিল তাঁর সেই ব্যক্তিগত আচরণ, তাঁর অনমনীয় লোক ব্যবহার, সামাজিক কথাবার্তায় তার নিরুত্তাপ ভাব ইত্যাদির উপর নির্ভর; কিংবা তিনি যে ছোট একটি রাষ্ট্রের মন্ত্রীর প্রতিনিধিত্ব করতেন, কিংবা একটি বৃহৎ শহরের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির তিনি পুত্র ছিলেন—কিসের উপর তাঁর খ্যাতির নির্ভর আমরা সে সম্বন্ধে কোনো সিদ্ধান্ত না নিলাম। আমি অন্য কথা বলতে চাই—বলতে চাই তাঁর সাহিত্যিক খ্যাতির কথা, যে খ্যাতির সঙ্গে মিশে ছিল জনগণের প্রতি তাঁর ঘৃণা, জনসাধারণের প্রতি অবজ্ঞার ভাব—এই মহৎ কবি এই সবের দ্বারা একটু যেন প্রভাবান্বিত ছিলেন, এবং বিশেষ করে এই দিক থেকে শিলারের সঙ্গে ছিল তাঁর বিশেষ পার্থক্য। গ্যেটের ক্ষেত্রে (যে কথা আমি আগে উল্লেখ করে এসেছি) তাঁর খ্যাতি ছিল তাঁর সামগ্রিক স্বভাবের সহজ ও স্বাভাবিক পরিণতি। তিনি চমৎকার রকমের আত্মশ্লাঘা নিয়ে থাকতেন, এর দ্বারা তাঁর পরিপূর্ণ নিটোল ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠে। এ ব্যাপারে অন্য কারও কিছু বলবার নেই, কেননা এ ব্যাপারে কারও কিছু বলারও দরকার করে না।

অপরপক্ষে রোমান্টিকদের বেলায় এই খ্যাতি ছিল অন্যের আলোয় আলোকিত হবার মত, কিছুটা কৃত্রিম এবং আত্ম-সচেতন খ্যাতি। তারা জনগণকে অবজ্ঞা করত, তারা নিজেরা জ্ঞানী হতে পেরেছে এই ধারণার বশবর্তী হয়ে নয়, জনগণই ছিল নির্বোধ ব'লে। গ্যেটের মতবাদ অনুসারে নিজে বাঁচো ও অন্যকে বাঁচতে দাও—এই নীতিটা তাদের কাছে হয়ে ওঠে আভিজাত্যের উদ্ধত্যের মত, যেটার মর্মার্থ হল, আমি বেঁচে আছি, এবং অন্যেরা কল্পনা করছে যে তারা বেঁচে আছে। গ্যেটে ছিলেন অন্তর্মুখী, রোমান্টিকরা অন্যদের বাদ দিয়ে নিজেরা হয় আত্মমুখী; গ্যেটে

পৃথিবীকে বরখাস্ত করেছেন এবং এ'তেই তাঁর ছিল আনন্দ, রোমান্টিকরা পৃথিবীকে ঘৃণা করে এবং এ'তেই বেশ মজা পায়।

রোমান্টিকরা অন্যদের চেয়ে নিজেদের অনেক বেশি উত্তম অনেক বিজ্ঞ ও অনেক রসপ্রাণ মনে ক'রে জনসাধারণের কাছ থেকে নিজেদের একেবারে আলাদা করে ফেলেছে। এর যা অবশ্যম্ভাবী পরিণতি যা হবার তাই হয়েছে, যে জনসাধারণকে তারা অবজ্ঞা করে তারা যাতে এদের অসহায় ভেবে এদের ছত্রখান করে দিতে না পারে এই জন্যে এরা দলবদ্ধ হয়েছে এক একটা জোটে ও এক একটা গোষ্ঠীতে।

রোমান্টিকরাই আমাদের সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রকৃত স্বাতন্ত্র্যবাদী। যাকে জোট বলে সেই পৃথক ও অন্য নিরপেক্ষ দল আমাদের সাহিত্যের ক্ষেত্রে আগেও দেখা গিয়েছে এবং অস্বাভাবিক মানুষের ব্যক্তিত্বের একটা অস্বাস্থ্যকর ও পচা ফল রূপেই তা পরিচিত ও বর্জিত হয়েছে। তবুও, একমাত্র এই রোমান্টিকরাই এই জিনিসটি বেশ আনুষ্ঠানিক ভাবেই গড়ে তুলল, এবং এটাকে একটা নীতির মর্যাদা দিল। তারাই একটা ব্যাপারে সর্বপ্রথম এগিয়ে এল, সেটা হচ্ছে লজ্জাকর ব্যাপারের বাঁধ ভেঙে দেওয়া ; তারা খোলা বাজারে প্রকাশ্য ভাবে এমন জিনিস মেলে ধরল যা নাকি সাহিত্যিক চক্রান্তকারীদের মতে অতি সুন্দর শিল্পবস্তু, নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্যে কলমবাজির সেই অস্বাস্থ্যকর পদ্ধতি। ইতিপূর্বেও অবশ্য যার চর্চা হত, কিন্তু তখন তা হত অতি গোপনে অতি নিভৃতে। এখন তারা সংঘবদ্ধ পত্র-পত্রিকার মারফত বেশ ফলাও করে তার প্রচার করছে। এরাই প্রথম জনসাধারণের মনে এমন আকাঙ্ক্ষার উদ্রেক করে দিয়েছে যার ফলে এখন তারা সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান জিনিস সাহিত্যের মধ্যে যা খোঁজ করে, তার নাম কেচ্ছা।

তার উপরে আরও একটা কথা—এই জোট-বাঁধার রীতি এখন কেবলমাত্র সাহিত্যের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নেই, এটা এখন সাহিত্যিকদের মধ্যের দলাদলিই কেবল নয় ; এটা এখন আরও ক্ষতিকর হয়ে উঠেছে, এটা এখন আমাদের সামাজিক অনুষ্ঠানাদির মধ্যেও অনুপ্রবেশ করেছে, এমনকি আমাদের গার্হস্থ জীবনেও দেখা দিয়েছে। সাহিত্যে এবং তৎসংক্রান্ত অন্যান্য ক্ষেত্রে, যেমন শিল্প থিয়েটার প্রভৃতিতে কেবলমাত্র সামাজিক ঘটনা ও কথোপকথনই ব্যবহৃত হয়ে থাকে, এই অভ্যাসটা খুবই দুঃখজনক ; কিন্তু এই সবের মধ্যে জনজীবনের বিষয়, ঐতিহাসিক ঘটনা, জন্মভূমি সংক্রান্ত কথা, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের কথা বা

নাগরিক সমস্যা ইত্যাদি বিষয়ে একবর্ণ বলা হয় না। সেই সুবাসিত ও সুরভিত চা-পার্টি, যেখানে একটা বইকে বা একটা শিল্পবস্তু অথবা একজন খ্যাতিমান ব্যক্তিকে ঘিরে জমায়েত হয় অনেকে "যাদের বোধ কম কিন্তু ফুর্তি দেদার", তাঁরা এখানে কোনো উৎসাহের বশবর্তী হয়ে জমায়েত হন না, জমায়েত হন কেবল ফ্যাশানের জন্যে, এবং মনে করেন এর দ্বারা তাঁরা কত অভিজাত ও কত সংস্কৃতিবান্ রূপে গণ্য হয়ে গেলেন। কিন্তু যাঁরা এদের দেখেন তাঁরা মনে মনে অতিষ্ঠ হয়ে ওঠেন, কিন্তু তাঁদের এই অস্বস্তিকর অবস্থা দেখে ঐ জমায়েতকারীরা নিজেদের আরও বেশি আভিজাত্যপূর্ণ মনে করেন, তাঁদের এই রকম দেখে জনসাধারণ যে কতটা মজা পান তা তাঁরা বোঝেন না। এইটেই হচ্ছে নান্দনিক ক্ষেত্রের সব চেয়ে বড় বিরক্তির কারণ।···

···কিন্তু কেউ কখনো নিজেকে একেবারে একা ও একক রাখতে পারে না। কবির কথায় বলা যায় যে, তার আত্মা আঁকড়ে ধরতে চায় এমন জিনিস চায় মানুষ; যে তার আত্মার উপরে বিশ্বাস হারিয়েছে, সে তখন বিশ্বাস করে কেবল প্রেতাত্মাকে; যে মানুষ তার ঈশ্বরে বিশ্বাস একেবারে চূর্ণ করে ফেলেছে সে নিশ্চয় নিজেই গড়ে তুলবে একটা ভাবমূর্তি।

রোমান্টিকরা স্বেচ্ছায় যে কৃত্রিম মরুভূমি নিজেদের চারদিকে রচনা করে নিয়েছিল সেখানে শেষ পর্যন্ত তারাও আর তৃপ্তি পেল না, জীবনের প্রকৃত সত্তা থেকে বেশ ভেবেচিন্তেই অবশ্য নিজেদের আলাদা করেছিল তারা। তারা স্বাভাবিক ভিতটাই অস্বীকার করেছিল, ইতিহাসকে মানুষকে রাজনীতিকে অস্বীকার করেছিল। তারা খুঁজে বেড়াচ্ছিল একটা নূতন ও কৃত্রিম ভিত। তারা খোঁজে দ্বীপের মতন দেখতে এমন-একটা বস্তু, প্রকৃতিবিজ্ঞানীরা আমাদের যেসব লতাগুল্ম ও দূর্বাঘাস ইত্যাদির কথা বলেছেন, সেইসব পদার্থ ঐ দ্বীপের অগাধে যে সবুজের সমারোহ নিয়ে উপস্থিত হয় তা প্রকৃত বর্ণ নয়, বর্ণের ভ্রান্তি মাত্র। তাদের যে হৃদয় ছিল স্বাভাবিক উষ্ণতায় ও পরিপূর্ণতায় জীবন্ত, তাদের বুক থেকে সে হৃদয় উপড়ে ফেলে এক আত্মঘাতী মনোভাবের পরিচয় তারা দিয়েছে। এই শূন্যস্থান পূরণের জন্যে তারা কৃত্রিম যন্ত্রাদি বসিয়েছে, অনেকটা ঘড়ির মতন সেই যন্ত্র, একটা স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থায় যার চাকা ও অন্যান্য অংশ কাজ করে চলেছে, যার একঘেয়ে ঝিকঝিক শব্দকে স্বাভাবিক জীবন স্পন্দনের ধ্বনি বলে বোধ করা হচ্ছে।

এইজন্যেই এখন সাহিত্যের একটা কেন্দ্রবিন্দুর খোঁজ পড়েছে, যার জন্যে সমগ্র রোমান্টিক যুগই সমবেত ধ্বনি তুলেছে, এইজন্যেই কোনো একটি ধাঁচের সঙ্গে, কোনো একটি যুগের সঙ্গে, কোনো একটা ব্যবস্থার সঙ্গে নিজেদের আলগা ভাবেই যুক্ত করার প্রয়োজনীয়তা তারা বোধ করছে, যাকে নাকি এই একবারও শেষ বারের মত বেশ কাব্যিক প্রচেষ্টা বলেই বোধ হবে। এইজন্যেই এত প্রয়াস ও প্রচেষ্টা, এত খামখেয়ালীপনা ও চারদিকে এত ছোটাছুটি—অভিযানের এই উদগ্র বাসনা যাতে বাইরে থেকে কিছু শিল্প আমদানী করা যায় নূতন উপকরণের নূতন গঠনের ; এত-সব উদ্যোগের কারণই হচ্ছে এখন সেই রোমান্টিকদের মধ্যে জীবনও নেই, জীবনের সজীবতাও গেছে।

এখানে বিশেষ করে তিনটি দিকের কথা বিচার করা যায়, যে তিনভাবে সাহিত্য বিপথগামী হয়। এই সাহিত্য ইতিহাসের গতিপথ ধরতে রাজি হয়নি, স্বাধীনতার অনুগামী হয়নি—যা নাকি একই সঙ্গে সৌন্দর্যের সহায়। কিংবা বলা যায়, সাধারণভাবে জনজীবনের অবস্থার চাপে প'ড়ে যা এই পথ ধরতে পারে না।

প্রথমত, মধ্যযুগের প্রতি একচোখোপনা ও তার প্রতি খেয়ালখুশি-মত পূর্বানুরাগ। সেই মধ্যযুগে, যাকে আধুনিক বিশ্বের গোধূলিলগ্ন বলা চলে, যে বিরোধীরা এখন পৃথিবীকে একটু ঝাঁকি দিচ্ছে তারা ছিল তখন ঘুমন্ত, এবং মাঝেমাঝে হয়তো তারা একটু নাড়াচাড়া দিত যেন স্বপ্ন দেখে অমন করত। যখন এই স্বপ্নের গোধূলি যুগে চারদিকের নিঃশব্দতার মধ্যে হঠাৎ একটা আলগা শব্দ বেজে উঠত, যে শব্দের অর্থ বোধগম্য হত না, যখন মধ্যযুগের উদ্ভিদ্‌জীবনে সবই স্থির করা হত অদৃষ্টবিচার করে, যখন কোনো ঐতিহাসিক সংকটই কোনো ব্যক্তি-বিশেষের শান্তি বিঘ্নিত করেনি, তারা তখন ভাবত যে তারা মানবজাতির প্রকৃত ও ত্রুটিশূন্য যুগ স্পষ্ট উপলব্ধি করতে পারছে। সেই পুরাতন বিশ্বের স্বাস্থ্যোজ্জ্বল সজীবতা, তার প্রচুর ক্ষমতা, তার সংগুপ্ত সৌন্দর্য—সবই এই নতুন যুগের দুর্বল ও প্রয়োজনপীড়িত মানুষের বোধের কাছে মনে হচ্ছে নিষ্প্রাণ, নেতিবাচক ও বেসুরো। তাদের সেই পীড়িত স্নেহ, লক্ষ্যহীন চেষ্টা, উত্তাপহীন উত্তেজনা, সত্যবিহীন আবেগ সবই মধ্যযুগের জটিল ও বিকৃত ব্যবস্থারই অঙ্গীভূত।

···এবং এর সঙ্গে যোগ করতে হয় জাতীয়-সূত্রটিও।

কিন্তু এখানেও কথা উঠতে পারে কোন্ জাতীয়তার কথা তাঁরা বলতে

চান। যে জার্মানীর বিষয়ে তাঁরা বলে থাকেন সেই জার্মানীর অবস্থান কোথায়? কোন্ জনপ্রিয় প্রতিষ্ঠানের বা কোন্ ঐতিহাসিক অবস্থার প্রশংসা তাঁরা আমাদের কাছে করেছেন? তাঁরা কি পিছু হটে গিয়ে অতীতে পৌঁছে যাচ্ছেন না? তাঁদের কর্তব্য হচ্ছে খোসমেজাজে এই বর্তমানের সঙ্গে মিশে যাওয়া, এর চাহিদার সঙ্গে এর অধিকারের সঙ্গে এক হয়ে যাওয়া? কিন্তু তার পরিবর্তে তারা কী করছেন? তাঁরা কি অন্যে'র আলোয় আলোকিত একটা বিকৃত ও মিথ্যা মধ্যযুগকেই এযুগের নবজাতক রূপে আমাদের কাছে প্রতীয়মান করতে চাচ্ছেন না? অতীতের বড়-বড় ঘটনার আগে-আগে আনা হচ্ছে, সেইসব ঘটনার আত্মাকে নয়, তাদের প্রেতাত্মাকে। আমরা আশা করব, তবুও সূর্য উঠবে, এবং তার মঙ্গল করে এইসব বিষণ্ণ ছায়াকে মুছে দেবে, তাদের নিশ্চিহ্ন করে দেবে সেই অন্তহীন শূন্যে যে-শূন্য থেকে যারা আবির্ভূত হয়েছিল।

দ্বিতীয় বিষয়টি হচ্ছে তাদের শিল্পের একটা কেন্দ্রবিন্দুর খোঁজে রোমান্টিকরা যে দিকে ঝুঁকেছিল, সেটি হচ্ছে কাথলিসিজম্ বা সর্বজনীনতা। তাদের এই সর্বজনীনতার ঝোঁক মধ্যযুগের প্রতি সহানুভূতির জন্যেও নয়, দক্ষিণাঞ্চলের—বিশেষ করে স্পেন-দেশের—সাহিত্যের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করেও নয়, যে সাহিত্য, আগেই বলে এসেছি, তারা চর্চা করেছে পূর্বানুরাগের বশেই। তাদের এ ঝোঁক মধ্যযুগীয় গির্জার আকর্ষণীয় চেহারার জন্যও নয়, যদিও এইসব গির্জার বিশাল আয়তন এবং তার অবিচল মূর্তি এক শাশ্বত শান্তির রাজ্যেরই প্রতিচ্ছবি তুলে ধরত, এক স্বপ্নময় সর্বময় প্রশান্তির চেহারাই ফুটিয়ে তুলত—রোমান্টিকেরা এরকম একটা অবস্থার জন্যে অবশ্যই লালায়িত ছিল এবং তারা এসব নিয়ে কাব্যও রচনা করেছে, গানও গেয়েছে—যেন সে এক স্তব্ধ যুগ এবং আশীর্বাদপুষ্ট মানুষের অর্ধনিমজ্জিত একটি দ্বীপ সেটি। এ সবই সত্য। কিন্তু তাদের সর্বজনীনতার কারণ অন্য। তাদের নিজেদের বিবেকের অস্থিরতা, তাদের মানসিক শৈথিল্য, তাদের নৈতিক দুর্বলতা যা তাদের হাজার রকমের ভ্রান্তি ও সংঘাতের ফলে অবশেষে তাদের নিক্ষেপ করে ফেলে দেয়, তাদের ভেঙে টুকরো-টুকরো করে, তাদের ক্লান্ত ও অবসন্ন করে, এবং শেষপর্যন্ত তারা এসে আশ্রয় নেয় এই সর্বজনীনতার ক্রোড়ে। রোমান্টিসিজমের যারা প্রধান প্রবক্তা তাদের বক্তব্যের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, যারা সর্বজনীনতা উচ্চস্বরে প্রচার করে তারা তাদের অনেক ঊর্ধ্বে, ক্যাথলিক ছবি বা ক্যাথলিক কোনো

মূর্তি দেখলে তারা চোখ কুঁচকোয় ; এদের কেউই ক্যাথলিক আওতায় জন্মায়ও নি, মানুষও হয়নি। যারা প্রোটেস্টাণ্ট ছিল তারাই হয়েছে ক্যাথলিক, তারা ক্লান্ত হয়ে এদিকে এসেছে ; একটা ঝঞ্ঝার পরে জাহাজডুবির ফলে তারা ক্যাথলিসিজ্‌ম্ গ্রহণ করেছে একটা নিরাপদ বন্দর হিসেবে।

সর্বশেষে তৃতীয় বিষয়টি। সাহিত্যে যা ঘাটতি আছে তা পূরণের জন্যে রোমাণ্টিকরা সাহিত্যে সারবস্তু স্বরূপ জীবন্ত জমাটবাঁধা পরিপূর্ণতা যা দিতে চাইল তা হচ্ছে এই : সাহিত্যকে তারা সাহিত্য চিবিয়েই বাঁচতে বলল। অর্থাৎ, আমি বলতে চাই যে, তারা সাহিত্য দিয়েই সাহিত্যকে লালন-পালন করতে লাগল, তারা বইয়ের সম্বন্ধে বই লিখতে লাগল, কবিতা সম্বন্ধে কবিতা, হাসির নাটক সম্বন্ধে হাসির নাটক। সাহিত্যে উপকরণের অভাব ছিল, সাহিত্যে এমন বিষয়বস্তু ছিল না যা কিনা সাহিত্য দখল করতে পারে এবং তা বর্ণনা করতে পারে, এবং সেই বর্ণনার দ্বারা একটা প্রভাব সৃষ্টি করতে পারে। বেশ, ভালো কথা। বেজি জাতীয় ঐ প্রাণীটি কি নিজের শরীরের চর্বি খেয়ে জীবনধারণ করে না? ঠিক ঐ ভাবেই সাহিত্য থেকেই সাহিত্যসৃষ্টি তাহলে সম্ভব হবে না কেন।—ঐ ভাবেই তৈরি হল শিল্পীর উপাখ্যান, ঐ সব নাটক। শিল্পসম্মতভাবে বাস্তবজীবনের প্রতিচ্ছবি ফুটিয়ে না তুলে, ব্যক্তিবিশেষের জীবন বা জাতির অদৃষ্ট ইত্যাদি সারবান্ বিষয়ে কিছু বলতে না পেরে এইসব নাটক নাট্যমঞ্চে যা নিয়ে এল তা হচ্ছে সাহিত্যিক লড়াই, শিল্পসম্বন্ধে বাগ্‌বিতণ্ডা, হতভাগা কলমবাজদের কদর্য বই—যার না-আছে সার না-আছে স্বর। এসব মঞ্চস্থ করে তাদের উপহাসও করা হল, তাদের লোপাটও করা হল।

এইসব প্রচেষ্টায় যা উপেক্ষা করা হল তা হচ্ছে মানুষের আগ্রহ হতে পারে এবং জনসাধারণের সহানুভূতি আকর্ষণ করতে পারে এমন বিষয়। সাধারণ মানুষের কাছে মধ্যযুগের দাম কী। ক্যাথলিসিজ্‌মেরই বা তাদের কাছে মূল্য কী। বিশেষ করে সেই কুয়াশাচ্ছন্ন লক্ষ্যহীন শীর্ণ-মধুর এই ক্যাথলিসিজ্‌মের? এইসব সাহিত্যিক দ্বন্দ্বেরই বা জনসাধারণের কাছে মূল্য কী?—এইসব নানাবিধ কলাকুশলতার লড়াই, গোষ্ঠীতে-গোষ্ঠীতে অন্তর্দ্বন্দ্ব? যা দিয়ে রোমাণ্টিকরা এক-এক জন হোমর হবার চেষ্টা করেছে, সেই ব্যাঙের আর ইঁদুরের লড়াই দিয়ে এদের কাজ কী!

এই জন্যেই মনে হচ্ছে যেসব উপাদান ও উপকরণ দিয়ে রোমাণ্টিকরা সাহিত্যকে রক্ষা করার চেষ্টা করেছিল, সেই সবই সাহিত্যকে আরও গভীরে

ডোবায়। যেসব উপকরণ দিয়ে সাহিত্যের একটা ভিত তৈরি ক'রে তার বিষয়বস্তু ও কেন্দ্রবিন্দু দ্বারা তাকে সজ্জিত করে তোলার চেষ্টা হয়েছে ঠিক সেই উপকরণ সাহিত্যকে একেবারে আলাদা করে ফেলেছে তার প্রকৃত ভিত্তি বিষয়বস্তু ও কেন্দ্রবিন্দু থেকে : জনসাধারণ থেকে।

অ্যাডলফ গ্লাসব্রেনার

তখন রাত্রি, অন্ধকার রাত্রি

অ্যাডলফ গ্লাসব্রেনার (১৮১০-১৮৭৬) সাংবাদিক ও গ্রন্থকার হিসেবে উদার মত অবলম্বন করার দরুণ তাঁর যৌবনকালে বেশ হয়রান হয়েছেন। তাঁর পরবর্তীকালীন রচনার মধ্য দিয়েই তিনি বার্লিনের হাস্যরসাত্মক লোক-সাহিত্যের প্রবর্তক হয়ে ওঠেন। আমাদের উদ্‌বৃতাংশে তাঁর সময়ে প্রচলিত মতবাদকে একটু অ-সাধারণ ভঙ্গিতে উপস্থাপিত করা হয়েছে, একে বলা যায় উপহাসমূলক নীতিকথা; সমসাময়িক একটা চল্‌তি বিষয় নিয়ে এটি লেখা, বিতর্কমূলক এই রচনার উদ্দেশ্য সহজেই আন্দাজ করা যায়, তাহচ্ছে জার্মানীর প্রতিক্রিয়াশীলদের দলবদ্ধ শক্তি সেখানকার চিন্তার স্বাধীনতাও দমন করেছিল।

তখন রাত্রি, অন্ধকার রাত্রি। আমি বিশালাকৃতি একটা দোলনা দেখতে পেলাম, তার চারদিক পাহাড় দিয়ে ঘেরা। এই দোলনায় শুয়েছিল একটি অতি প্রশান্ত ও শক্তিমান জাতি। এবং ওই পাহাড়ের একটির উপরে বসেছিলেন একজন উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মী, দোলনায় তিনি দোল দিচ্ছিলেন এবং গুনগুন করে গান গাইছিলেন যাতে জাতিটা ঘুমিয়ে পড়ে। যখন অনেক উঁচুতে একটা তারা জ্বলে উঠল উজ্জ্বল হয়ে, তিনি তখন উপরে উঠে গেলেন এবং সেটা নিভিয়ে দিলেন। শিশুদের চোখে ঐ তারাদের সুন্দর মিটিমিটি আলো এসে যাতে না পড়ে, সেজন্যে তিনি একে-একে সব-ক'টি তারা নিবিয়ে দিলেন। অবশেষে চারদিক একেবারে অন্ধকার হয়ে গেল, এবং কবরখানার মত নিঃশব্দ হয়ে গেল চারধার।

অনেক দূর থেকে এসে গেল মেঘেরা, মেঘেদের চোখে তখন লাল গোলাপী স্বপ্ন, তাদের বুকের মধ্যে স্বাধীনতার মধুর সংগীত পৃথিবীর প্রতি ভালোবাসার গান শব্দ করে উঠল। মনে হতে লাগল শিশুরা যেন শুনছে ঐ গান, কেননা একটু নড়ে উঠল, তাদের মুখে হাসি জেগে উঠল। ঐ গান বাজতেই লাগল

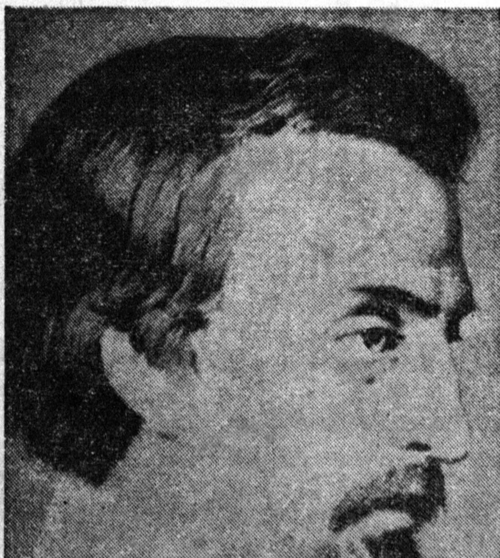


হাইনরিখ ফন ক্লাইস্ট
(১৭৭৭-১৮১১)



জোসেফ ফন আইকেনডরফ
(১৭৮৮-১৮৫৭)

হাইনরিখ হাইনে
(১৭৯৭-১৮৫৬)

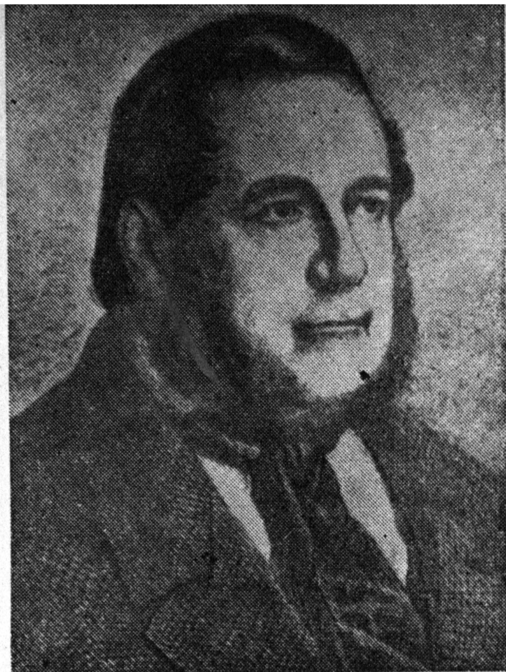


জর্জ বুকনার
(১৮১৩-১৮৩৭)



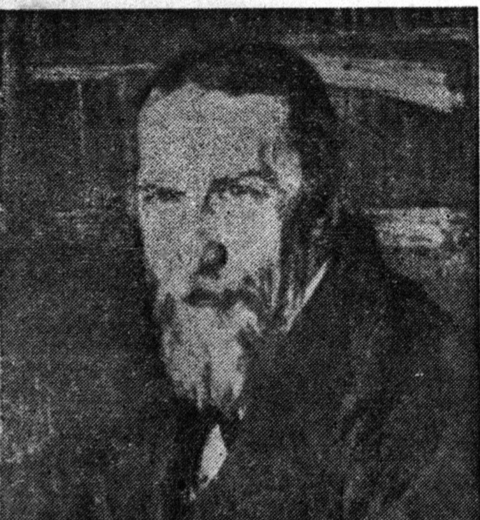


এডুয়ার্ড মোরাইক
(১৮০৪-১৮৭৫)

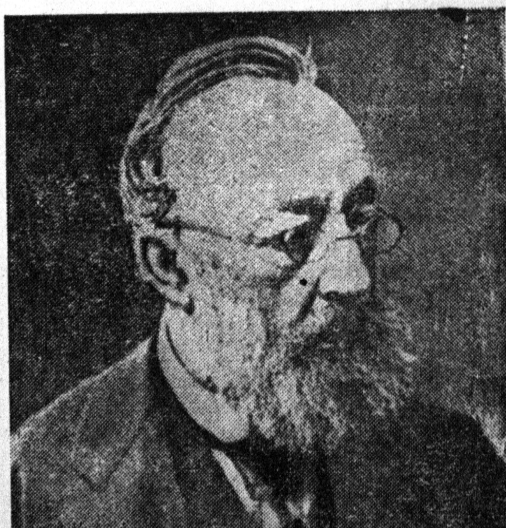


অ্যাডালবার্ট স্টিফ্‌টার
(১৮০৫-১৮৬৮)

ভিল্‌হেলম রাবে
(১৮৩১-১৯১০)



গটফ্রিড কেলার
(১৮১৯-১৮৯০)



আরও মধুর শব্দে ও আনন্দের ধ্বনিতে। শেষে জেগে উঠল শিশুরা, এবং ঐ গোলাপী স্বপ্নের দিকে তারা হাত বাড়াতে লাগল।

তখন ঐ উচ্চপদস্থ ব্যক্তিটি রেগে গেলেন, এবং ঐ দোলনার মধ্যে ওদের বেঁধে ফেললেন, এবং অনেক লোককে তাঁর কাছে আসতে বললেন। তাদের মুখ কালো ও ভীষণ রকম দেখতে, তারা লম্বা কালো পোষাক প'রে ছিল।

এই কালো মানুষগুলো দোলনার চারদিক ঘিরে দাঁড়াল, গোলাপীস্বপ্ন নিয়ে যে মেঘেরা জমে ছিল, তাদের তাড়া ক'রে তাড়িয়ে দিল, এবং শিশুদের বলল প্রার্থনা করতে ও ঘুমোতে, ঘুমোতে ও প্রার্থনা করতে—কেননা এই হচ্ছে প্রভুর আদেশ, যিনি তাদের পাঠিয়েছেন।

শিশুরা ঐ কালো মূর্তি দেখে ভয় পেল, এবং তাদের চোখ বন্ধ করল।

তখন ঐ লোকগুলো গলা খুলল, উচ্চগলায় তারা গান গাইতে লাগল, আওয়াজটা মনে হতে লাগল ফাঁকা ও ভৌতিক :

আমরা যখনি পেয়ে যাই যেই টের
কারো কোনো বিদ্যার পাণ্ডিত্যের
চেপে ধরি অমনিই তার গলাটাই,
আলো জ্বললেই সেটা তখনি নেভাই !
ঘুমোও এবং শুধু করো প্রার্থনা
পৃথিবীতে কাজ জেনো কিছু আর তো না।
প্রার্থনা করো প্রভু হৃষ্টমনে
আসীন থাকেন তাঁর সিংহাসনে।
নিজের শিকল ভাঙবার চেষ্টায়
রত হলে অভিশাপ পাবে শেষটায়।

আমরা যা-কিছু ভাবি যা-কিছু করি
প্রেরণা পাঠান তার সব ঈশ্বরই।
ঘৃণা-উপহাস কারা পাবে আছে স্থির,
সব দোষ মাপ শুধু অত্যাচারীর।
রাজপ্রতিনিধিটির উদ্ধত শির
উন্নত রাখবার খুঁজবে ফিকির।

স্বাধীন এ-পৃথিবীতে তিনি একলাই
আর কারো কোনোরূপ স্বাধীনতা নাই।

অন্ধকারাচ্ছন্ন শিখরচূড়ায়
প্রতিহিংসাই রত আছে প্রতীক্ষায় ;
কে কোথায় সুখী আছে, কে আছে স্বাধীন
সেই হতভাগ্যের বিষম দুর্দিন !
চিন্তা করে না যারা, রচনা করে না—
সেই যে ভাগ্যবান্ যাবে তা চেনা।
আমাদের মত করে প্রার্থনা—বিশ্রাম
তারাই বাড়ায় অত্যাচারীর সুনাম।

সেই শিশুরা এই গান শুনে ঐ ভৌতিক লোকেদের সম্বন্ধে আরও ভীত হয়ে উঠল, এবং আরও শক্ত করে বন্ধ করল তাদের চোখ, আবার ঘুমিয়ে পড়ল তারা, এবং সেই মধুর ও সুন্দর সংগীতের স্বপ্ন দেখতে লাগল। যখন ঐ মানুষরা দেখল যে, জনসাধারণ ঘুমন্ত, তখন তারা দাঁত বের করে ঘৃণায় ও অবজ্ঞার হাসি হাসতে লাগল, এবং সেই উচ্চপদস্থ ব্যক্তিটি আবার দোল দিতে লাগল দোলনায় এবং গাইতে লাগল সেই ঘুমপাড়ানি গান।

জর্জ বুকনার

জর্জ বুকনার (১৮১৩-১৮৩৭) চিকিৎসা বিজ্ঞান ও প্রকৃতি বিজ্ঞান পাঠ করেছিলেন। অল্প বয়সেই তিনি গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক বিরোধী দলে যোগ দেন, এবং "সোসাইটি ফর হিউম্যান রাইটস" নামে ১৯৩৪ সালে একটি গুপ্ত সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন—এর উদ্দেশ্য হেস্‌এর গ্র্যাণ্ড ডাচি-তে যে প্রতিক্রিয়াশীল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল তার আমূল পরিবর্তন সাধন করা। "দি হেসিয়ান কান্ট্রি মেসেঞ্জার" নামে তিনি যে প্রচার পুস্তিকা প্রকাশ করেন তাতে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার অনেক ইঙ্গিত ছিল। এটি প্রকাশের পর তাঁকে গ্রেপ্তার করার জন্যে তাঁর নামে ওয়ারেণ্ট বের হয়। ১৮৩৫ সালে জার্মানী থেকে পালিয়ে, প্রথমে স্ট্রাসবোর্গে যান, তার পরে যান জুরিখে—এখানে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের লেকচারার হন। এখানেই তিনি টাইফয়েড জ্বরে মাত্র ২৩ বৎসর বয়সে মারা যান।

বুকনারের অতি সামান্য কিন্তু বৈশিষ্ট্যপূর্ণ রচনায় কবিত্বের ও দার্শনিকতার গভীর নিদর্শন আছে। বাস্তবকে অতি ঘনিষ্ঠ ভাবে দেখার ফলে তিনি হতাশাবাদী ও শূন্যবাদী হয়ে ওঠেন। ঐতিহাসিক ও সামাজিক শক্তির কাছে মানুষ যে এক অসহায় শিকার এটি স্পষ্ট করে দেখানো (যেমন তাঁর নাটকে—"ওয়েৎসেক"এ, অ্যালবান বার্গ তাঁর অপেরায় যার নাম দিয়েছেন "ওৎসসেক") ছাড়াও তিনি মানুষের অস্তিত্বের অর্থ কি, মানেই বা কি—এই জ্বলন্ত প্রশ্নটি নিয়েই নিজেকে বেশি বিব্রত রেখেছিলেন।

চিঠিপত্র

তাঁর জীবনের এই হচ্ছে পঠভূমি। এরই উপরে রেখে তাঁর চিঠিপত্রের বিচার করতে হবে। এই সব চিঠিতে বুকনার সুখের জন্যে তাঁর অন্বেষণের এবং তাঁর জীবনের আনন্দ যে নষ্ট হয়ে যাবে এই ভয়ের কথা প্রকাশ করেছেন। ১৮৩৪এর মার্চ মাসের চিঠি তাঁর বাগদত্তা প্রণয়িণী স্ট্রাসবোর্গের ভিলহেলমাইন জিগ্‌লকে লেখা, গোপনে এঁর সঙ্গে তখন তিনি বাগদত্ত; ভিলহেলমাইনকে লেখা অন্য চিঠিটি—যার তারিখ ১৮৩৭ এর জানুয়ারি—বুকনার লিখেছিলেন তাঁর মৃত্যুর কয়েক সপ্তাহ আগে। জুরিখ থেকে তাঁর পরিজনকে ১৮৩৬ সালের নভেম্বরে লেখা চিঠিতে তিনি সুইজারল্যাণ্ডের অবস্থার সঙ্গে জার্মানীর অবস্থার তুলনা করেছেন, সুইজারল্যাণ্ডের অবস্থা তিনি একটু অনুকূল চোখেই যেন দেখেছেন। তাঁর সহপাঠী মিনিজোরোড' এর মৃত্যু সম্বন্ধে একটা ভুল খবর পাওয়ায় তাঁর মনের উপর ভীষণ চাপ পড়ে, সেই অবস্থায় তিনি এই চিঠির উপসংহারে এই আশা প্রকাশ করেন যে, জার্মানীতে একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসা সম্ভব।

মার্চ ১৮৩৪

বাগ্‌দত্তা বধূকে লেখা

তুমি কি ভাবে আরোগ্যলাভ করছ তা জানতে না পারলে আমি কিছুতেই শান্তি পাব না, সান্ত্বনা পাব না। এখন আমি রোজ লিখি, গতকালই আমি একটা চিঠি লিখতে আরম্ভ করেছি। ডারম্‌স্টাডে না গিয়ে সোজা স্ট্রাসবোর্গে যাবারই আমার ইচ্ছা। তোমার অসুখ যদি একটু বাড়াবাড়ির দিকে যায় তাহলে এক মুহূর্তের মধ্যে আমি গিয়ে হাজির হব। কিন্তু এমন চিন্তার মানে কি? আমার কাছে এ এক রহস্য। ইস্টারের সময় যে ডিম নিয়ে উৎসব

করা হয়, আমার মুখ যেন অনেকটা সেই রকম, যতই আনন্দ জমে ওঠে ততই তার গায়ের রঙের দাগ আরও ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু আমি যেন একটু আতঙ্কের কথা লিখে ফেলছি, এতে তোমার চোখে চাপ পড়বে, আর তোমার জ্বর বাড়বে। কিন্তু না, আমি ওসবে বিশ্বাস করিনে। পুরনো একঘেয়ে ব্যথাটারই এটা হচ্ছে একটা প্রতিক্রিয়া। বৃদ্ধ ক্ষয়রোগীকে বসন্তকালের মৃদু বাতাস মৃত্যুর মতন চুম্বন করে। তোমার ব্যথাটাও অনেক দিনের এবং তার উপশম হয়ে এল ব'লে, ব্যথাটা ম'রে এল ব'লে। তুমি মনে করছ তুমিও বুঝি ঐ সঙ্গে ম'রে যাবে। কিন্তু তুমি কি নূতন দিনের উজ্জ্বল আলো দেখতে পাচ্ছ না? তুমি কি শুনতে পাচ্ছ না আমার পায়ের শব্দ, যে শব্দ আবার তোমার কাছেই চলে যাচ্ছে? এই দেখ, আমি আমার চুম্বন পাঠাচ্ছি সেই সঙ্গে পাঠাচ্ছি স্নোড্রপ কাওস্লিপ ও ভায়োলেট ফুলের সুগন্ধি গুচ্ছ, যে ফুল হচ্ছে যৌবনদীপ্ত সূর্যের জ্বলন্ত চোখের দিকে পৃথিবীর প্রথম সলজ্জ দৃষ্টিপাত। দিনের অনেকটাই আমি তোমার ছবি নিয়ে ঘরে বন্দী হয়ে কাটাই, এবং তোমার সঙ্গে কথা বলি। গতকাল সকালবেলা আমি তোমাকে ফুল পাঠাব বলেছিলাম, এই সঙ্গে রইল সেই ফুল। এর বদলে তুমি আমাকে কী দেবে? আমার এই পাগলা-গারদটা তোমার কেমন লাগে? আমি যদি গুরুতর ভাবে কিছু করতে ইচ্ছে করি তখনই আমার নিজেকে মনে হয় সেই কৌতুকনাট্যের লারিফারির মত—সে যখনই তরবারি টেনে বার করে তখনই বেরিয়ে আসে শশকের লেজ।...

আমার ইচ্ছে আমি চুপ করে থাকি। একটা ভয়ংকর ভয় আমাকে ঘিরে ধরেছে। পত্রপাঠ মাত্র উত্তর দেবে। কিন্তু দোহাই, এতে যদি তোমার এতটুকুও শারীরিক কষ্ট হয়, তা'হলে লিখো না। তুমি একটা বিহিত ব্যবস্থা করার কথা আমাকে বলেছিলে, কথাটা অনেক দিন ধরেই আমার জিবের ডগায় আটকে আছে; কিন্তু আমাদের এই গোপনীয়তাটাই আমি ভীষণভাবে ভালোবেসে ফেলেছিলাম—। তুমি তোমার বাবাকে সব কথা খুলে বলো, কিন্তু এ ব্যাপারে দুটো শর্ত আছে: তোমার নিকটতম আত্মীয়-স্বজনদের কিছুতেই কিছু জানাবে না; প্রতিটি চুম্বনের পিছনে রান্নাঘরের হাঁড়ি-পাতিলের ঝনঝন শব্দ আমার ভালো লাগে না, এবং হাজার রকমের মাসি-পিসির সামনে একটি পরিবারের অস্বস্তিও আমার পছন্দ নয়। দ্বিতীয়ত, আমি যতক্ষণ না লিখছি ততক্ষণ আমার মা-বাবাকে কিছু লিখবে না। তুমি শান্ত ও

নিশ্চিন্ত হতে এমন যা-কিছু করার ভার আমি তোমাকেই দিলাম। তোমাকে আমি ভালোবাসি—এ ছাড়া আর কী আমি তোমাকে বলতে পারি? ভালোবাসা ও আনুগত্য ছাড়া আর কোন্ শপথ তোমার কাছে আমি করতে পারি? কিন্তু যাকে বলে ভরণ-পোষণ? আর দু'বছর ছাত্র-অবস্থা আছে; ঝড়ঝাপটা পূর্ণ জীবনের একটা নিশ্চিন্ত সম্ভাবনা আছেই, সম্ভবত তা হবে অল্পদিনের মধ্যেই এবং কোনো বিদেশে।

জুরিখ, ২০শে নবেম্বর ১৮৩৫

পরিজনের কাছে লিখিত

রাজনৈতিক কর্ম তৎপরতা বলতে যা বোঝায়, সে সম্বন্ধে তোমরা নিশ্চিন্ত থাকতে পার। আমাদের সংবাদপত্রে প্রকাশিত অলৌকিক কাহিনী পড়ে তোমরা বিচলিত হোয়ো না। সুইজারল্যাণ্ড হচ্ছে একটা প্রজাতন্ত্র, যেহেতু লোকেরা অন্য কোনো কথা না পেয়ে কেবল বলে থাকে যে, প্রজাতন্ত্র ব্যাপারটাই অসম্ভব, তারা সদাচারী জার্মানদের রোজ জানায় অরাজকতার খুনের ও নরহত্যার কাহিনী। আমার সঙ্গে দেখা হলে তোমরা আশ্চর্য হয়ে যাবে; এমনকি এখানে আসার পথে সুন্দর-সুন্দর বাড়ি ঘরে পূর্ণ বন্ধু-ভাবাপন্ন গ্রাম সর্বত্রই দেখতে পাবে, এবং জুরিখের যত কাছে এসে পড়বে তখন এমনকি কিনার বরাবর দেখবে সমৃদ্ধির চেহারা। গ্রাম ও ছোটছোট শহরে এমন চেহারা তোমরা দেখতে পাবে ওখানে বসে যার কোনো ধারণাই আমাদের ছিল না। এখানকার রাস্তা সৈন্যে, সরকারী কর্মচারীতে ও কুড়ের বাদশা বেসামরিক লোকের ভিড়ে বোঝাই নয়, এখানে কোনো অভিজাত ব্যক্তির গাড়িতে চাপা পড়ারও বিশেষ ঝুঁকি নেই। তার জায়গায় এখানে দেখবে স্বাস্থ্যবান ও উৎসাহে পূর্ণ মানুষ, অল্প খরচে এখানে বেশ ভালো এবং অনাড়ম্বর প্রজাতান্ত্রিক গভর্নমেণ্ট চলছে। মানুষের আয়ের উপর ধার্য কর দিয়েই চলে এই সরকার। এ রকমের আয়কর আমাদের দেশে বসানো হলে তাকে আমরা অরাজকতার চূড়ান্ত বলে নিন্দা করব। মিনিজেরোড মারা গিয়েছে, একজনের চিঠি থেকে জানতে পারলাম। তার মানে তিন বছর ধরে তার উপর অত্যাচার করে তাকে মেরে ফেলা হল। তিন বছর! ফ্রান্সের নৃশংস লোকেরা কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই মেরে ফেলতে পারত, প্রথমে আদালতের রায়, তারপর গিলোটিন! কিন্তু তিন বছর! সত্যি, আমরা বেশ সদাশয় গভর্নমেণ্ট পেয়েছি, এ গভর্নমেণ্ট রক্ত সহ্য করতে পারে না: এই জন্যে প্রায় চল্লিশ জন লোক

এখনো বন্দীশালায়, এটা কিন্তু অরাজকতা নয়, এটা আইন ও শৃঙ্খলা, এবং যখন অরাজক সুইজারল্যাণ্ডের কথা এই ভদ্রলোকেরা ভাবেন তখন তাঁরা শিশু হয়ে ওঠেন। ঈশ্বরের নামে বলতে পারি, এই ভদ্রলোকেরা যে বিশাল মূলধন ধার করছেন তা একদিন শোধ দিতেই হবে, এবং বেশ মোটা সুদ সমেত, খুবই মোটা সুদ সমেত।

লেনৎস

টুকরো লেখা "লেনৎস" (১৮৩৬) হচ্ছে বুকনারের একমাত্র বর্ণনা-মূলক রচনা। "স্টার্ম উণ্ড ড্রাং"-এর নাট্যকারের জীবন থেকে নেওয়া একটা ঘটনার কথাই এখানে বিবৃত হয়েছে—জেকব মাইকেল রেইনহোল্ড লেনৎস পাগল হয়ে গিয়েছিল। ঘটনাটা ১৭৭৮ সালের যখন লেনৎস বাস করত প্যাস্টর ওবেরলিনের সঙ্গে অ্যালসাটিয়ায়। ওবেরলিনের লেখা খুঁটিনাটি নোট্-এর উপর নির্ভর করেই বুকনার এই কাহিনীটি রচনা করেছেন। এই রচনাটি হচ্ছে মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের মত, লেনৎসের মানসিক অবসাদের কথাই এখানে বর্ণিত হয়েছে, যে অবসাদের দরুণ সে আত্মহত্যার চেষ্টা করে (আমাদের উদ্ধৃতিটি রচনার শেষাংশ)। লেনৎস তখন একাকীত্বে ও উদ্বেগে ভুগছে; সে তখন ধর্মকে আঁকড়ে ধরতে চাইছে, কিন্তু পৃথিবীর দুর্দশাই তাকে বানিয়ে দিল একজন নাস্তিক।

৮ তারিখের সকালবেলা লেনৎস ঘুম থেকে উঠল না। ওবেরলিন তার ঘর পর্যন্ত গেল। সে তখন বিছানায় প্রায় নগ্ন অবস্থায় শুয়ে আছে, আর তখন সে খুব উত্তেজিত। ওবেরলিন তার গায়ের উপর ঢাকা দিতে চাইল, কিন্তু সে তখন আর্তনাদ করছে যে, সবই কেমন ভারি, বিষম ভারি। সে হাঁটতে পারবে বলে সে ভাবে নি; এখন সে অবশেষে বাতাসের ভয়ংকর ওজন অনুভব করতে পারল। ওবেরলিন তাকে চাঙ্গা করে খুশি ক'রে তুলতে চেষ্টা করল, কিন্তু প্রায় সারাটা দিন লেনৎস ঐ ভাবে পড়ে রইল, কিছু খেলোও না।

বিকেলের দিকে ওবেরলিনকে যেতে হল বেলিফস্-এ একটা অসুস্থ মানুষকে দেখতে। আবহাওয়া ছিল বেশ ঠাণ্ডা, চাঁদের আলোও ছিল বেশ উজ্জ্বল। ফেরার পথে ওবেরলিন গেল লেনৎসের কাছে, তখন তাকে বেশ তাজা দেখল সে, তার সঙ্গে বেশ শান্ত ভাবে সংযতভাবেই কথা বলল লেনৎস।

ওবেরলিন তাকে হেঁটে বেশি দূরে যেতে বারণ করল, লেনৎস তাকে কথা দিল বেশি দূরে যাবে না। সে হাঁটতে হাঁটতে খানিকটা চলে গেল, কিন্তু হঠাৎ ফিরে দাঁড়াল সে, ওবেরলিন খুব কাছে চলে এল, এবং বেশ জোরের সঙ্গে বলে উঠল, "দেখ, মশায়, আমাকে যদি ওসব কথা আর শুনতে না হয় তাহলে আমি বেশ সুস্থ বোধ করব।"—"কিসের কথা বলছ, ভাই ?"—"তুমি কি শুনতে পাচ্ছ না ? শুনতে পাচ্ছ না ওই ভীষণ শব্দ, সমস্ত দিগন্ত জুড়ে ওই যে চীৎকার করছে, যে চীৎকারকে অনেক সময় বলা হয় 'নিরবতা, নিঃশব্দতা' ? আমি এই শান্ত প্রান্তরের মধ্যে পড়ে আছি বলেই আমি সব সময়ই শুনতে পাই, আর এইজন্যে আমি ঘুমোতে পারিনে। সত্যি, আমি যদি আবার ঘুমোতে পারতাম !" মাথা নাড়তে নাড়তে সে হাঁটতে হাঁটতে চলে গেল।

ওবেরলিন ভাল্ডবাক-এ ফিরে গেল। এবং একজন কাউকে ওর কাছে পাঠাবে বলে ভাবছে তখন তার ঘরের দিকে যাচ্ছে বলে সিঁড়িতে কার যেন পায়ের শব্দ পেল। সামান্য একটু পরেই নীচের প্রাঙ্গণে কি-যেন ভেঙে পড়ল, শব্দটা এত জোরে হল যে, ওবেরলিন ভাবতে পারেনি যে, এটা কোনো মানুষের পড়ে যাবার শব্দ হতে পারে। ধাত্রী ছুটে এল, তার মুখ মৃতের মত ফ্যাকাশে, এবং সে কাঁপছে।…

সেই প্রান্তর থেকে তারা যখন পশ্চিমের দিকে যাত্রা করল তখন গাড়ির মধ্যে সে বেশ শান্ত হয়ে বসে রইল। কোথায় তাকে ওরা নিয়ে যাচ্ছে, এ বিষয় সে একেবারেই উদাসীন। রাস্তা খারাপ থাকায় গাড়িটা মাঝেমাঝেই মুশকিলে পড়ছিল, কিন্তু সে চুপচাপ বসে রইল, একেবারে শান্ত হয়েই। সে যেন একেবারেই অন্যমনস্ক। সমস্ত পাহাড়-প্রদেশ ডিঙিয়ে তাদের এই যাত্রার সমস্ত সময়টাই সে ছিল ঐ ভাবে। সন্ধ্যার দিকে তারা এসে পৌঁছল রাইন উপত্যকায়, ক্রমশঃ পিছনে ফেলে রেখে এল সমস্ত পাহাড়, অস্ত সূর্যের আভায় সেই পাহাড় শ্রেণীকে এখন দেখাচ্ছে নীলবর্ণের পরিচ্ছন্ন ঢেউয়ের মতন, আবার মনে হচ্ছে একটা জলপ্লাবনের মতন যার উপরে সূর্যের রক্তিম রশ্মি খেলে বেড়াচ্ছে, ওই পাহাড়ের পাদদেশটি আবৃত করেছে উর্ন-লাভের নীলাভ লুতা—এই রকম মনে হতে লাগল। তারা স্ট্রাসবোর্গের দিকে যতই এগোতে লাগল ততই অন্ধকার নেমে আসতে লাগল। পূর্ণিমার চাঁদ উঠে এসেছে, দূরের সব কিছুই অন্ধকার, কেবল কাছের পাহাড়ের কিনার

স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। পৃথিবীটা মনে হচ্ছে বিরাট একটা সোনার বাটির মতন, তার কিনার ঘিরে সোনালি চাঁদের আভা পড়েছে। লেনৎস একদৃষ্টে সম্মুখ দিকে চেয়ে আছে, কোনো অমঙ্গলচিন্তাও তার নেই, কোনো প্রত্যাশাও নেই। কিন্তু তার মনের মধ্যে আছে একটা ভয়ের ভাব, চারদিক যতই ধীরে ধীরে মিশে যেতে লাগল অন্ধকারে ততই ঐ ভাবটা তার মনে গভীর হয়ে উঠতে লাগল। তাদের গিয়ে উঠতে হবে একটা সরাইখানায়। সে নিজেকে খতম করে ফেলার জন্যে কয়েকবার চেষ্টা করল, কিন্তু তাকে বেশ ভালোভাবেই পাহারা দিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

পরদিন সকালে যখন আকাশ-ভরা মেঘ ও বৃষ্টির বর্ষণ চলেছে তখন তারা পৌঁছল স্ট্রাসবোর্গে। সে বেশ শান্ত ও স্বাভাবিকই ছিল, সকলের সঙ্গে কথাবার্তা বলল। অন্য আর পাঁচজনের মতনই আচরণ ছিল তার, কিন্তু তার ভিতরটা ছিল একটা ভয়াবহ শূন্যতায় ভরা। আর কোনো ভয় তার নেই, কোনো আকাঙ্ক্ষা নেই। তার অস্তিত্বটা তার কাছে একটা অপরিহার্য বোঝার মতন মনে হতে লাগল।

এই ভাবেই সে বেঁচে রইল।

ডানটনের মৃত্যু

১৭৮৯ সালের ফরাসী বিপ্লবের ঐতিহাসিক তাৎপর্য সম্পর্কে ভালোভাবে পড়াশুনা ক'রে বুকনার ১৮৩৫ সালে লিখলেন তাঁর নাটক "ডানটন'স্ ডেথ"। যদিও তিনি বৈপ্লবিক আন্দোলনের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিলেন, এবং তাতে কোনো সাফল্য তাঁর ভাগ্যে ঘটে নি, তিনি যে নাটকটা লিখলেন তাতে কিন্তু কোনো সমসাময়িক বিষয়কে কেন্দ্র ক'রে বৈপ্লবিক উদ্দীপনা সঞ্চারের চেষ্টা তিনি করেননি। বরঞ্চ এর বিপরীতটাই এতে আছে, এতে আছে হতাশা ও অদৃষ্টবাদ। বিপ্লবের একজন নেতা ডানটন, তখনও তিনি রাজনৈতিক ক্ষমতার পূর্ণ অধিকারী, তবুও তিনি বিপ্লব নিয়ে এবং তাঁর জীবন নিয়ে একেবারে ক্লান্ত। তাঁর সব উৎসাহ যেন পঙ্গু হয়ে গিয়েছে, তিনি নিজেকে নিয়েই বিভোর হয়ে পড়েছেন, তাঁর বক্তব্যের মধ্যে এখন শুধু শূন্যবাদ ও ঘৃণাবাদ। তাঁর যিনি বিরোধী, কিন্তু শান্ত ও ন্যায়পরায়ণ রোবেসপিয়ার, তিনি বলপ্রয়োগ ক'রে ও ত্রাস সঞ্চার ক'রে স্বাধীনতা অর্জনে বদ্ধপরিকর। এই ভাবে তিনি ইতিহাসের সমস্যাসংকুল দিকটা তুলে ধরেছেন। বিপ্লবের পরামর্শ সভার দৃশ্যাবলীতে বুকনার প্রকৃত তথ্যেরই দীর্ঘ প্রতিলিপি মেলে

ধরেছেন। আমাদের উদ্ধৃতাংশ হচ্ছে সেণ্ট জাস্টের একটি বক্তৃতা, এতে বৈপ্লবিক উদ্দীপনার সঙ্গে ব্যক্তি বিশেষের প্রতি ঘৃণাপূর্ণ অবজ্ঞা মিশে আছে।

সেণ্ট জাস্ট

মনে হচ্ছে এই সভায় এমন কয়েকটি স্পর্শকাতর কান আছে যা নাকি "রক্ত" শব্দটাই সহ্য করতে পারে না। তাঁরা যদি উপর-উপর একটু নজর করে দেখেন তাহলেই তাঁরা বুঝতে পারবেন যে, প্রকৃতি ও সময়—এই দুইটি জিনিসের চেয়ে আমরা বেশি নিষ্ঠুর নই। প্রকৃতি তার নিজের নিয়মেই চলতে থাকে নীরবে ও বাধাহীন ভাবে। এই নিয়মের সঙ্গে সংঘর্ষ ঘটলেই মানুষ ধ্বংস হয়ে যাবে। বাতাসের উপাদানের একটু পরিবর্তন, প্রাকৃতিক অগ্নির একটু ব্যাপক প্রসার, জলের চাপের মাত্রার একটু তারতম্য—কোনো মহামারী, আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত কিংবা কোনো বন্যা হাজার হাজার মানুষকে মৃত্যুমুখে ঠেলে দেয়। খুবই নগণ্য এবং চোখে দেখা যায় না প্রকৃতির মধ্যের কোনো উপাদান-জাতীয় পদার্থের মধ্যে যদি একটু ইতরবিশেষ ঘটে তাহলে আর কিছুই দেখা যাবে না, কেবল পড়ে থাকতে দেখা যাবে: কতকগুলি মৃতদেহ।

তাহলে আমার কথা হচ্ছে: অন্তঃ-প্রকৃতি কি বহিঃ-প্রকৃতির থেকে একটু বেশি সংবেদনশীল হবে? বহিঃ-প্রকৃতি তার বিরোধী কোনো ধ্যান বা ধারণা যেমন বরদাস্ত করে না, যেমন সে সব ধ্বংস করে দেয়, অন্তঃপ্রকৃতিও কি তেমন করবে? যদি কোনো ঘটনা অন্তঃপ্রকৃতির কাঠামোর কোনো পরিবর্তন ঘটায়, অর্থাৎ মানবজাতির মধ্যেই পরিবর্তন আনে, তার জন্যে কি রক্তপাতের প্রয়োজন আছে? আত্মিক ক্ষেত্রে, সর্বত্র সর্বসাধারণের মধ্যে নূতন মেজাজ দেখা দিলে মানুষ ধারণ করে অস্ত্র, বহিঃপ্রকৃতি যেমন তার মেজাজ বদলের সময়ে ব্যবহার করে আগ্নেয়গিরি, ব্যবহার করে জলপ্লাবন। মহামারীতেই মানুষ মরুক, বা, বিপ্লবেই মরুক—তাতে কী আসে যায়?

মানবজাতির প্রগতির গতি খুব ধীর, এর পদক্ষেপ মাপতে হয় শতাব্দীর হিসাবে, প্রত্যেক পদক্ষেপের পিছনে একটা বংশের বা পুরুষের কবরখানা দেখা যায়। অতি সহজ কোনো আবিষ্কারের জন্য বা কোনো মৌলিক নীতির দিকে অগ্রসর হতে গেলে লক্ষ লক্ষ মানুষকে আত্মবলিদান করতে হয়। এটা কি তাহলে ধরে নিতেই হবে না যে, ইতিহাসে গতি দ্রুত হয়ে উঠলে, আরও বেশি লোককে মৃত্যুবরণ করতে হবে?

আমাদের শেষকথা অতি সংক্ষিপ্ত ও অতি সাধারণ : যেহেতু সব মানুষ সমান ভাবে যখন জন্মায়, তখন সব মানুষই সমান ; প্রকৃতি এসে তাদের মধ্যে যতক্ষণ পার্থক্য সৃষ্টি না করে ততক্ষণ তারা সমানই থাকে। এই জন্যেই প্রত্যেকে সমান সুযোগ পাবার অধিকারী, বিশেষ ধরণের সুযোগ-সুবিধা কেউই পেতে পারে না, সে কোনো ব্যক্তি বিশেষই হোক, বা কোনো ছোট বা বড় গোষ্ঠীই হোক। এই যে বাক্যটা বলা হল, তা কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করার ফলেই হাজার-হাজার মানুষের মৃত্যু ঘটেছে। ১৪ জুলাই, ১০ আগস্ট, ৩১ মে —এইগুলি হচ্ছে ঐ বাক্যটির যতিচিহ্ন। ঐ বাক্যটির অর্থ বোধগম্য হতে চারটি বছর সময় লেগেছিল ; সাধারণভাবে হয়তো একটা শতাব্দী সময় লেগে যেত, এবং কয়েকটি বংশ বা পুরুষ সে ক্ষেত্রে হত এর যতিচিহ্ন। এতে কি তাহলে আশ্চর্য হবার কিছু আছে যে বিপ্লবের এক-একটা তোড় প্রতিটি অনুচ্ছেদে প্রতিটি বাঁকে যদি অজস্র মৃতদেহ ছড়িয়ে যায় ?

আমাদের বাক্যে আমরা কয়েকটি উপসংহার যোগ করতে চাই— কয়েকটি মৃতদেহ কি আমাদের আরও মৃত্যুবরণের পথে বাধা সৃষ্টি করবে ? মোজেস তাঁর অনুগামীদের লোহিত সাগরের মধ্যে দিয়ে ও মরুভূমির মধ্যে দিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন, যতক্ষণ পুরাতন ও জীর্ণ বংশের অবসান ও তাঁর প্রতিষ্ঠিত নূতন রাষ্ট্রের উত্থান না ঘটেছে, ততদিন চলেছিল তাঁর এই অভিযান। হে ন্যায় বিচারকগণ, আমাদের লোহিত সাগরও নেই, মরুভূমিও নেই ; আমাদের যা আছে তা হচ্ছে যুদ্ধ ও গিলোটিন। বিপ্লব হচ্ছে পেলিয়াসের কন্যাদের মত : মানুষের মধ্যে নবজীবন সঞ্চারের জন্যেই তা মানুষকে নিঃশেষ করতে থাকে। সেই প্রলয়পয়োধি-জল থেকে যেমন পৃথিবীর আবির্ভাব, মানবজাতিও তেমনি রক্তসমুদ্রে স্নান করে এমন সজীব ও সতেজ শরীর নিয়ে উত্থিত হবে যে, মনে হবে এইমাত্র যেন তাদের সৃষ্টি করা হয়েছে।

দীর্ঘ হর্ষধ্বনি। কয়েকজন সদস্যের সোৎসাহে দণ্ডায়মান

ইউরোপের অত্যাচারীদের যেসব গুপ্ত শত্রু আছে, এবং সারা বিশ্বে যারা তাদের পোশাকের নীচে ব্রুটাসের ছোরাটি লুক্কায়িত রেখেছে, তারা সকলে আমাদের এই আনন্দিত মুহূর্তটির অংশ গ্রহণ করুক।

শ্রোতারা ও ডেপুটিরা হল্-ঘরে ভেঙে পড়ল

এডুয়ার্ড মোরাইক

চিত্রশিল্পী নলটেন

এডুয়ার্ড মোরাইক (১৮০৪-১৮৭৫) ছিলেন গ্যেটের পরেই ঊনবিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ গীতিকবি। তিনি দক্ষিণ জার্মানীতে বেশ শান্ত ও নিভৃত জীবন যাপন করতেন। তাঁর কবিতায় যেমন ভাবাবেগের অনেক লক্ষণ দেখা যায়, সেই রকম চিরায়ত মেজাজও আছে, প্রকৃতির প্রতি আকর্ষণ এবং চিত্রধর্মী বর্ণনাও তাঁর কবিতায় আছে, এবং আছে লোকগীতির অনুরূপ সহজ ও সরল প্রকাশভঙ্গি ও সেইসঙ্গে স্বাভাবিক কৌতুকরস। তাঁর প্রথম দিকের উপন্যাস "পেইণ্টার নলটেন" (১৮৩২) একজন চিত্রশিল্পীর আবেগ-জনিত সমস্যার উপর নির্ভর করে লেখা; এবং রচনার ভঙ্গিও বিশেষভাবে আবেগপ্রবণ। থিয়োবল্ড নলটেন তাঁর নিজেরই অত্যধিক অন্তর্মুখী স্বভাবের জন্য সর্বদাই নিজেকে একটু অসহায় বোধ করত, এই অন্তর্মুখীনতা তার কাছে যেমন অস্বস্তিকর মনে হত, তেমনি এর বিপুল শক্তি সম্বন্ধেও সে সচেতন ছিল। নলটেনের ব্যক্তিত্বের অনেক বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে বিস্তৃত ব্যাখ্যা দেওয়া হয়নি, যেমন, কোনো কোনো মানুষের আসক্তিতে তার বুঁদ হয়ে থাকা; কিন্তু উপন্যাসটির অন্যান্য চরিত্র বেশ পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে, এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর যা বৈশিষ্ট্য ছিল সেদিক থেকে সব পরিষ্কার ভাবেই করা হয়েছে, যেমন মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষণ। আমরা এখানে যে অংশ উদ্ধৃত করছি, সেখানে দুইজন নারীর মাঝখানে নলটেনের এক সংকটময় অবস্থা দেখানো হয়েছে। এই সংকটের মধ্যে নলটেন যেন তার বোধ ও বুদ্ধিই হারিয়ে ফেলেছে। এর একটি মেয়ে হচ্ছে এলিজাবেথ, এ হচ্ছে যাযাবর, নলটেনের কাকার মেয়ে; অল্প বয়সেই নলটেন এর প্রেমে পড়ে, এবং শত চেষ্টা সত্ত্বেও নিজেকে এই প্রণয়পাশ থেকে মুক্ত করতে পারে না; অপর মেয়েটি হল অ্যাগনেস, এ হচ্ছে এক অরণ্যরক্ষীর মেয়ে; এলিজাবেথের কাছ থেকে বাধা পাওয়ায় সে এই অ্যাগনেসের প্রণয়ের প্রতিদান দিতে পারে না।

থিয়োবলডের কাছে সে এল, এবং খুব সন্তর্পণে সে তার হাতটি রাখতে চেষ্টা করল থিয়োবলডের হাতের উপরে। তার হাতাটি জোরে ছুঁড়ে ফেলে থিয়োবলড চেঁচিয়ে উঠল, "আমার চোখের সামনে থেকে দূর হয়ে যাও; অনাচারী! অবিবেচক পেতনি তুমি, আমি যেখানেই যাই সেখানেই তুমি

আমার কাছে অভিসম্পাত হয়ে আছ। যেদিন আমাদের প্রথম দেখা হয়েছিল, সেই দিনটা নিপাত যাক, জাহান্নমে যাক। নির্বোধ একটা ছেলে মাত্র ছিলাম আমি, সেই সময় একটা নিষ্পাপ করুণার আবেগ আমাকে তোমার কাছে টেনে নেয়, যার জন্যে অনেক তিক্ততা এসেছে আমার জীবনে, তোমার জীবনেও এসেছে দুর্ভাগ্য। একজন বোনের মত তোমার ভালোবাসাটা কি রকম লজ্জাকর ভাবে, কী রকম জঘন্য নষ্টামির মধ্য দিয়ে, আর তোমার কপট করুণার মধ্যে দিয়ে অন্য-এক ভালোবাসার রূপ নিল! কিন্তু আমি তখন চিন্তা করতে শিখিনি, কিছু বুঝতে শিখিনি, আমি একেবারে বোকাই ছিলাম তখন, কার সঙ্গে আমি ঘনিষ্ঠতা করেছি তা বুঝতে পারিনি। কিন্তু মাথার উপর আছেন ঈশ্বর, তিনি এজন্যে যে শাস্তিটা দিয়েছেন তা একটু বেশিই হয়ে গেল। দুর্দশার পর দুর্দশা এসে যাচ্ছে আমার, এ রকম হবে আমি তা ভাবতেই পারিনি, এমন দুর্দশার আর তুলনা নেই। মাথার উপর থেকে তুমি চেয়ে আছ আমার দিকে ও এই মেয়েটির দিকে, হয়তো তোমার সেই দৃষ্টি অর্ধেক করুণায়, এবং অর্ধেক সন্দেহে ভরা—হয়তো তোমার বিশ্বাস হচ্ছে না যে আমার মনের যে অশান্তি আমার মনকে কুরে খাচ্ছে আমার অপরাধও ঠিক তার সমান। এই গৃহহীন যাযাবর মেয়েটির দুর্ভাগ্যের চিহ্নিত হয়তো দেখতে পাচ্ছ তার কপালে—এই মেয়েটির জন্যেই আমার জীবনে এত বিপদ ও অশান্তির বন্যা। আমি তাকে অপরাধী বলতে চাইনে, সে আমার করুণাই পাবে, আমার ঘৃণা নয়। কিন্তু করুণাময় ঈশ্বরই যদি সব করুণা নিষ্ঠুরতা উজাড় করে দিতে আরম্ভ করে, তখন কে থাকতে পারে ন্যায়নিষ্ঠ, কে হতে পারে দয়াপরবশ! আমি যদি এখনই, এইখানেই, এক উন্মাদের অর্থহীন আক্রমণে আক্রান্ত হই। এর পরিণাম কী হবে তা না বুঝেই যদি সে করে এই আক্রমণ? এই দেখ, সে যেন আমার অসহ্য কাছে এসে যাচ্ছে। এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমি বিলাপ করছি কেন? মাথার উপরে দেবদূতেরা যখন জীবন ও মৃত্যুর সংগ্রামে রত, আমরা তখন এখানে দাঁড়িয়ে আছি কেন! সে মরে যাচ্ছে। সে মরে যাচ্ছে! আমি কি তাকে দেখতে পাব? এখনো কি আমি তাকে বাঁচাতে পারব? চলো, আমার সঙ্গে চলো! কিন্তু কোথায় যাবে? তার কাছ সোজা আসছে ঐ মারগট। হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি ওর মুখ দেখেই বুঝতে পারছি—যা হবার হয়ে গেছে। অ্যাগনেস মারা গিয়েছে, সে মরে গিয়েছে। এবার আমাকে যেতে দাও, পালাতে দাও। পৃথিবীর শেষ প্রান্তে চলে যেতে দাও আমাকে।"

এলিজাবেথ তাকে আঁকড়ে ধরল। তার প্রবল উত্তেজনায় সে সাংঘাতিক কথা বলল এলিজাবেথের বিরুদ্ধে, কিন্তু একটু কেঁদে উঠে এলিজাবেথ তার দু হাত দিয়ে থিয়োবলডের হাঁটু জড়িয়ে ধরল, এতে আর নড়তে পারল না সে। এই হৃদয়বিদারক দৃশ্য থেকে চোখ ফিরিয়ে নিলেন প্রেসিডেন্ট। এলিজাবেথ বলতে লাগল, "হায়, হায়, আমার প্রিয়তম যখন আমাকে গালাগাল দেয় তখন আকাশের যে তারার নীচে তার জন্ম সেই তারারা কাঁপতে থাকে। আমাকে চিনতে পারছ না তুমি? লক্ষ্মী, আমার দিকে তাকাও! কিসের জন্যে আমি এখানে ছুটে এসেছি? অতদূর থেকে কে আমাকে টেনে এনেছে এখানে? আমার ক্ষতবিক্ষত রক্তাক্ত পায়ের দিকে চেয়ে দেখ। তুমি বড় দুষ্টু হয়ে গিয়েছ, বড়ই অকৃতজ্ঞ হয়ে গিয়েছ। সব সময়ই যে তোমার চিন্তায় আমি মগ্ন। সূর্যের ঐ কড়া রোদে, রাত্রির ঝড়ঝঞ্ঝার মধ্য দিয়ে, ঝোপঝাড় খালবিলের মধ্য দিয়ে ভালোবাসার আকর্ষণেই আমি হাঁফাতে হাঁফাতে ছুটে এসেছি। আমার জীবনে ক্লান্তি ব'লে আমি কিছু বোধ করিনি, আমার মৃত্যু কেউ ঘটাতে পারেনি। আমার এই অসহ্য দুঃখকষ্টের মধ্যেও আমি আনন্দ লাভ করেছি, ওই দুরন্ত পলাতককে খুঁজে বের করার জন্য কেবল ছুটে-ছুটে বেড়িয়েছি, অবশেষে তাকে আমি পেয়েছি। হ্যাঁ, সত্যিই আমি তাকে পেয়েছি। এখন সে আমারই সম্মুখে দাঁড়িয়ে আমাকে চিনতে পারছে না। ধিক আমাকে! এতদিন দুজন দুজনের কাছ থেকে পৃথক থাকার পর এখন একত্র হবার পর আশা করেছিলাম যে, আমরা আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠব। কিন্তু আমার হৃদয়ের বেদনা তুমি বুঝতে পারছ না। এক আহত জন্তুর মতন ক্রোধে তুমি আমাকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছ, কিন্তু যে তার প্রভুর পা একবার চেটেছে সে কখনো তার প্রভুকে ছেড়ে যেতে পারে না।...তোমরা সকলে বলো—এর মানে কী। আমার অধিকার রক্ষায় তোমরা আমাকে সাহায্য করছ না কেন। হে স্বর্গের অধিবাসীরা, তোমরা সাক্ষী রইলে, এই মানুষটি আমারই। যে পাহাড়ের উপরে তার সঙ্গে আমার দেখা সেখানে সে শপথ করেছিল বহুকাল আগে, বলেছিল যে, সে আমার। পুরাতন প্রাচীরের চারদিকে শরৎকালের বাতাস ঘুরে বেড়াচ্ছিল, তার এই প্রতিজ্ঞার কথা সেই বাতাসও শুনেছে। এখনো প্রত্যেক বছর বাতাসেরা ঐ সুখের দিনটিকে স্মরণ করে। আমি আবার সেখানে গিয়েছিলাম, তাদের বলতে শুনেছি: ছেলেটি বেশ ভালো, কিন্তু বরাবর যদি এমন থাকে! শিশুরাই সত্যি কথা বলে।—অ্যাগনেস, সে তোমার

কে! তুমি তার কাছে তোমার কথা রাখতে পারনি। তুমি তার কাছে সব খুলে বলেছ, আর সেইজন্যেই সে অসুস্থ হয়ে পড়েছে, আজ সন্ধ্যায় এ ব্যাপারে সে আমার কাজে অভিযোগ করেছে। তুমি যদি তার কাছে অবিশ্বস্ত হয়ে থাক, আমার কাছে তুমি তাহলে শপথ ভাঙার অপরাধে তুমি দ্বিগুণ অপরাধী।"

এই শেষ কথাটার চিত্রলিপীর বুকে যেন বাজ পড়ল। সে নিজের উপরেই ক্রোধান্ধ হয়ে উঠল। প্রেসিডেণ্টের সব যুক্তি সব উপদেশ অগ্রাহ্য করে কীভাবে নিজের চুল ছিঁড়তে লাগল তা একটা দেখার জিনিস, আর এমন সব কথা উচ্চারণ করতে লাগল, তা যেন ক্ষমার অযোগ্য। শেষ পর্যন্ত সে ছুটতে লাগল প্রাসাদের দিকে, দয়াপরবশ হয়ে প্রেসিডেণ্ট তার পিছন-পিছন ছুটতে লাগলেন। প্রেসিডেণ্টের ইঙ্গিতে কয়েকজন লোক উন্মত্তপ্রায় মেয়েটিকে ধরতে গেল, কিন্তু যেন হাওয়ার হাত থেকে ছিনিয়ে নিল এমনিভাবে সহসা সে বের করল একটা ছোরা, এ'তে তার কাছে যেতে কেউ ভরসা পেল না। তার পর মেয়েটি অনেকক্ষণ ধ'রে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল, তারপর অবর্ণনীয় ভাবে সে বিদায় নেবার একটা ভঙ্গি করল। নলটেন যে দিকে গিয়েছে সেই দিকে দুই হাত বাড়িয়ে সে জানাল এইভাবে বিদায়সম্ভাষণ। তারপর সে অন্য দিকে ফিরল, এবং ধীর পদক্ষেপে এগোতে-এগোতে ক্রমশ মিলিয়ে গেল অন্ধকারে।

অ্যাডালবার্ট স্টিফটার

আমার প্রপিতামহের নথি

অ্যাডালবার্ট ষ্টিফটার (১৮০৫-১৮৬৮) উনবিংশ শতাব্দীর সর্বশ্রেষ্ঠ অস্ট্রীয় উপন্যাসিক। দুরুহ মানসিক স্থৈর্যের দ্বারা তিনি জার্মান ক্লাসিক ধারায় আধ্যাত্মিক অগ্রগতির একটি আদর্শ স্থাপনে সফল হন—ভাবাবেগকে জয় করে শান্ত স্নিগ্ধতা ও সরলতার পথ ধরে চলাই যে গৌরবের তা তিনি প্রমাণ করতে চেষ্টিত হন। ষ্টিফটারের রচনায় প্রকৃতি একটি প্রধান স্থান অধিকার করেছে, মানুষের ও প্রকৃতি পারস্পরিক সম্পর্কই এ'তে স্পষ্ট করে দেখানো হয়েছে। তাঁর বর্ণনার মধ্যে তাঁর সেই সমাজবিহীন জন্মভূমিকেই তিনি নূতন ভাবে যেন সৃষ্টি করে তুলেছেন। "মাই গ্রেট-গ্র্যাণ্ড ফাদার্স' পেপার" (১৮৪২) নামক তাঁর গল্পে তিনি আগস্টিনাস নামক এক ডাক্তারের জীবন-কথা বলেছেন, তাঁর প্রপিতামহের নোটবুক থেকে তিনি এর উপাদান সংগ্রহ

করেন। এই ডাক্তার তাঁর সম্প্রদায়ের সেবা করে এক আদর্শ গ্রাম্য ডাক্তার ও সংস্কৃতিক অগ্রগতির ক্ষেত্রে পথিকৃৎ রূপে চিহ্নিত হন। অদৃষ্ট তাঁকে প্রবল আঘাত হানে, এবং নিজের অসংযত মেজাজের জন্য অনেক রকম হতাশা আসে তাঁর জীবনে। কিন্তু তিনি এসব দুর্বিপাক জয় করে নেন, এবং লাভ করেন মানবিকতাবোধ যা নাকি ন্যায়পরতা বিশ্বাস ভালোবাসা ও সমাজের সেবা করার আকাঙ্ক্ষা থেকেই উদ্ভুত। এই আখ্যায়িকার মধ্যে কর্নেল উলসিনের জীবনের কথা বলা হয়েছে, তার সূচনাটিই এখানে উদ্ধৃত হল ; এতে মানুষের ভ্রান্তির কথা এবং তা থেকে উদ্ধার পাবার কথাও আছে।

"উলহিম নামে কোনো বংশের কথা তুমি কখনো শুনেছ ?"

আমি উত্তর দিলাম, "মনে হচ্ছে শুনেছি। প্রাগে আমার ছাত্র-জীবনের কথা সেটা। ক্যাসিমির ফন উলহিম।"

"জুয়াড়ি, গুণ্ডা, ও অপব্যয়ী।" তিনি বললেন।

"ঐ রকমই হবে।" আমি উত্তর দিলাম।

তিনি বললেন, "আমি সেই ক্যাসিমির ফন উলহিম।"

"কর্নেল উলসিন, তুমি সে ?" আমি বলে উঠলাম, "কিন্তু তা অসম্ভব।"

"এটা সম্ভব, কেননা এটা সত্য।" তিনি বললেন, "ক্যাসিমির উলসিন ফন উলহিম। আমার সম্বন্ধে অনেক গুজবই সত্যি হওয়ার কথা। আমি খুব ভালো লোক নই। লোকে যতটা জানে তার চেয়ে কোনো কোনো ব্যাপারে আমি একটু ভালো। আমার মধ্যে যা খারাপ তা তারা খুব ভালো ক'রেই জানে। আমার মধ্যের ভালো গুণগুলি তাদের কাছে খারাপ মনে হয়েছে ; আর এর মধ্যে সবচেয়ে ভালো যা, তা তারা একেবারেই জানে না ; দুঃখকষ্ট যা পেয়েছি তাতে আমি লাভবানই হয়েছি। আমার কথা তাহলে একটু শোনো, বন্ধু। ষোলো বছর বয়স পর্যন্ত আমি বাবার ঘরেই ছিলাম। অনেক আগেই মা মারা গিয়েছিলেন। আমার বড় এক ভাই ছিল। আমরা একজন যাজক শিক্ষকের কাছে পড়াশুনা করি। আমার দাদা সব ব্যাপারেই আমার চেয়ে ভালো ছিল। আমি আমার বাবার দুঃখের ও রাগের কারণ হয়েছিলাম। আমার বয়স যখন ষোলো তখন বাবা মারা গেলেন। যখন তার চিঠি সমেত তাঁর শেষ উইলটি খোলা হল তখন দেখা গেল যে, আমার দাদাই একমাত্র উত্তরাধিকারী, এবং আইন-অনুযায়ী যেটুকু আমার প্রাপ্য,

আমি তাই পাব। আমার বাবার অবিবাহিত ভাই—আমার কাকা—আমাদের অভিভাবক হবেন। আমার বাবার সম্পত্তি তিনি দেখা-শোনা করবেন, আর, আমার মা আমার জন্যে যা রেখে গিয়েছেন তাও তিনি তত্ত্বাবধান করবেন। আমি আমার দাদাকে পাজি বলে গাল দিলাম, আর বললাম যে, আমি পৃথিবীর পথে বেরিয়ে পড়তে চাই, আর সেই ত্রিশ-বছরের লড়াইয়েরও ভ্যালেনস্টাইন ও অন্যান্যদের মতন একজন জেনারেল ও নেতা হতে চাই। এইভাবে সকলের উপর শোধ নিতে চাই। আমাদের অভিভাবক বললেন, সেনাবাহিনীতে যোগ দেওয়াই আমার উচিত, কেননা এতে আমার বুদ্ধি খুলবে আর আমি শায়েস্তা হব। কিন্তু তাঁকে তাঁর সাধ্যমত আমার সম্পত্তির দেখাশুনা করতেই হবে, আর, কোনো জামিন না-রাখলে তিনি আমাকে এক কপর্দকও দিতে পারবেন না। কিন্তু আমার পথখরচা-বাবদ তিনি তাঁর নিজের পকেট থেকেই কিছু টাকা আমাকে দিতে পারেন; ঐ টাকা আমাকে সাবধানে খরচ করতে হবে, কেননা পরে আমি আর কিছুই পাচ্ছিনে। আমি বললাম যে, ধার-হিসেবে আমি ঐ টাকা নিতে পারি, এর জন্যে যথেষ্ট জামিন তাঁর হাতেই রইল। আমার কাকার উপদেশ বা সতর্কবাণী না শুনেই আমি বাড়ি ছেড়ে চলে গেলাম।

"আমি সেনাবাহিনীতে একটা কাজ চাওয়া। তারা আমাকে পরীক্ষা ক'রে দেখতে চাইল, এবং একটি স্কুলে পাঠাতে চাইল। আমি এমন ভাবিনি। এইজন্যে আমি ব্যাভেরিয়ার প্রিন্সের কাছেও এবং কাউণ্ট প্যালাটাইনের কাছে গেলাম। সর্বত্র ওই একই কথা শুনলাম। সেইজন্যে আমি জার্মানী ছেড়ে পশ্চিম দিকে রওনা হলাম। একদিন আমি রাইন নদী ডিঙিয়ে ফ্রান্সে প্রবেশ করলাম, সেখানকার রাজার পায়ের কাছে আমার তরবারি রাখব ব'লে। অনেক অঞ্চল পার হয়ে অবশেষে আমি প্যারিসে পৌঁছলাম। আমাদের সেই যাজক গৃহশিক্ষকের কাছে ও বই পড়ে যতটা শিখেছিলাম ততটুকুই ফরাসী ভাষা আমি জানতাম। আমাকে সাহায্য করতে পারে প্যারিসে এমন একজনের সঙ্গেও আমার পরিচয় ছিল না। তবুও আমি অক্লান্ত ভাবে চেষ্টা করতে-করতে অবশেষে রাজসন্নিধানে উপস্থিত হলাম।

"আমি যখন তাঁর সেবা করার অভিপ্রায় জানালাম তখন তিনি জানতে চাইলেন সবার আগে আমি কী শিখতে চাই, এর উত্তরে আমি বললাম: ভাষা। উত্তরে তিনি বললেন, তাই শেখ, তারপর অপেক্ষা করো। এবং

প্রতিজ্ঞা করলেন যে, তিনি আমার কথা মনে রাখবেন। আমি অপেক্ষা করতে লাগলাম, যার সঙ্গে কথা বলতে পারলাম তার সঙ্গেই কথা ব'লে ব'লে ভাষাটা রপ্ত করে নিলাম। কয়েকটা মাত্র স্বর্ণমুদ্রা ছাড়া আমার সবই যখন খরচ হয়ে গিয়েছে তখন আমি কিছু টাকা জিতবার জন্যে একটা জুয়াখেলার আসরে যাব বলে স্থির করলাম। এই জায়গাটার কথা আমি শুনেছিলাম। একদিন রাত্রে সেই বাড়ির সেই ঘরে গেলাম, যেখানে এই খেলা চলছিল। খেলাটা আমি জানতাম না, সেইজন্যে কিছুক্ষণ তা দেখলাম। তার পরে অন্যান্যদের মত আমি একটা কার্ডের উপরে একটা সোনার মুদ্রা রাখলাম। কিছুক্ষণ পরে একটা লোক একটার পর একটা কার্ড রাখতে লাগল, এবং মুখে একঘেয়ে উক্তি করে যেতে লাগল, তারপর একমুঠো সোনার মুদ্রা আমার দিকে ঠেলে দিল। আমি সেগুলো দিয়ে আমার সামনে বেশ একটা স্তূপ বানিয়ে তুললাম, আবার কিছু মুদ্রা কার্ডের উপরে রাখলাম। জিতলাম হারলাম, আবার জিতলাম। খেলা যখন শেষ হল তখন আমার পকেট ভর্তি ঐ মুদ্রা।

"পরদিন রাত্রে আমি আবার সেখানে গেলাম, আমার জিত হল, অনেক মুদ্রা পেলাম। মাঝেমাঝে আমি হেরেছি বটে, কিন্তু তারপরে জিতেছি আরও অনেক বেশি। বুঝতে পারলাম আমাকে সকলে লক্ষ্য করছে। যে কার্ডে আমি মুদ্রা রাখছি, অন্য সকলে সেই কার্ডে মুদ্রা রাখতে লাগল। আমি খেলাটা বুঝে ফেলেছিলাম, সেইজন্যে মন দিয়ে ভেবেচিন্তে ঠিক করতে লাগলাম কোন্ কার্ডে রাখব, কোন্‌টায় রাখব না; কোন্ সময় খেলা থামাতে হবে, কোন্ সময় নতুন করে আরম্ভ করতে হবে। আমি পালক লাগানো চমৎকার টুপী কিনলাম, আর কিনলাম সুন্দর-সুন্দর পোশাক। কিছুদিন পরেই আমি এমন একটা ঘোড়া কিনলাম যার তুল্য ঘোড়া অরলিন্সের ডিউকের আস্তাবলেই কেবল থাকতে পারে। কিছুদিনের মধ্যেই আমার ঘোড়া হল তিনটি। অনেক বাড়িতে আমার নিমন্ত্রণ হতে লাগল, এখন আমি মহিলাদের ও মেয়েদের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে পারি, এর আগে যাদের কেবল জানলা দিয়ে উঁকি দিতে দেখেছি, কিন্তু চমৎকার গাড়িতে চেপে যেতে দেখেছি। আমার বন্ধুরা আমাকে আমোদ-প্রমোদের আসরে নিয়ে যেতে লাগল। এই ভাবে আমি এ বিরাট শহরটির জীবনধারার সঙ্গে পরিচিত হয়ে উঠলাম। আমার জমকালো পোশাকের সঙ্গে আমি ঝুলিয়ে নিলাম জমকালো

তরোয়াল, তার বাঁটের সঙ্গে লাগানো হল এমন হীরে সামান্য লোকের সংগতিতেই যা ব্যবহার করা কঠিন।

"একদিন আমরা শহরের বাইরে এক জঙ্গলে গেলাম। এখানে আমি বেশ রোগা ও বিপন্ন একটা লোকের সঙ্গে আলাপ করলাম, আগেও কয়েকবার একে আমি দেখেছি। সে আমার দিকে তাকাল, কিছু বলল না তারপর ফিরে দাঁড়াল। আমি তার সামনে গেলাম, তাকে জিজ্ঞাসা করলাম সে আমাকে অপমান করছে কেন। এবারও সে উত্তর দিল না। আমি তাকে চ্যালেঞ্জ ক'রে বললাম যে, সে যদি বোবা না থাকে তাহলে আমার সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধে নামুক। সে বলল, 'আমি একটা পাজি লোকের বিরুদ্ধে তরবারি তুলব না।' উত্তরে আমি বললাম, 'আমি তোমাকে বাধ্য করব।' সে বলল, 'আমি খুনী ও ডাকাতদের কাছ থেকে আত্মরক্ষা করব। আমি তাকে ধাক্কা দিলাম, সে তার তরবারি খাপ থেকে বের করল, এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই সে মাটিতে এমন ভাবে পড়ে গেল যে মনে হল, সে মৃত। কিন্তু একটু পরেই সে বলল, 'আমি অপদার্থের হাতে মরলাম।' আমি এ কথা শুনে চমকে উঠলাম। আমার বন্ধুরা আমাকে পালাতে সাহায্য করল, ঐ লোকটাকে তারা দেখাশুনা করবে বলে শপথ করল। আমি শহরে ফিরে এলাম।

"পরদিন তারা আমার কাছে এসে বলল যে, লোকটা বেঁচে আছে, তাকে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। কেউ জানে না যে, লোকটা কার সঙ্গে লড়াই করেছিল, এবং এটা গোপনই রাখা হবে। কয়েকদিন পরেই আমি জানতে পারলাম যে, আমার ঐ শত্রুটি হচ্ছে চয়সেলের ডিউক, সে বেঁচে গিয়েছে, আর তার প্রাসাদে এখন তার সেবা-শুশ্রূষা হচ্ছে। ব্যাপারটা গোপন রাখার জন্যে আমরা আরও সতর্ক হব বলে ঠিক করা হল। চার সপ্তাহ বাদে আমরা জানতে পারলাম যে, সে সেরে উঠছে। আমি এক অনাথাশ্রমের প্রধান কর্মচারীর কাছে গেলাম, এবং যা কিছু ছিল—সোনা মণি-মুক্তা পোশাক-পরিচ্ছদ ঘোড়া—সব তাকে দিয়ে অনাথদের জন্যে যা-যা দিলাম তার একটা রসিদ চাইলাম। প্যারিসে আমি যেটুকু অর্থ নিয়ে এসেছিলাম তাই কেবল রাখলাম, আর রাখলাম ধূসর রঙের একটা ঘোড়া, এটা আমি কিনেছিলাম।

"দু সপ্তাহ বাদে আমার সঙ্গে দেখা করার জন্যে ডিউককে আমি চিঠি

লিখলাম, চিঠির সঙ্গে রসিদটা পাঠিয়ে দিলাম। ডিউক আমাকে যেতে লিখল। তার ভৃত্যদের চলে যেতে ব'লে সে আমাকে বলল, 'এখন আমি তোমার সঙ্গে কথা বলব। এখন যে-কোনো ফ্রেঞ্চ অভিজাত ব্যক্তি তার গ্রামের বাড়িতে বা শহরের প্রাসাদে তোমার সঙ্গে কথা বলবে।' আমি তাকে আমার নথিপত্র দেখিয়ে বললাম যে আমি একজন জার্মান রাজবংশের যোদ্ধা, আমি তাকে যা করেছি তার জন্যে সে যেন আমাকে ক্ষমা করে। উত্তরে সে বলল, 'যে লোকটার সঙ্গে আমি লড়াই করেছি তার সম্বন্ধে আমি এতক্ষণ চুপ করেছিলাম, আমি সুস্থ হয়ে না ওঠা পর্যন্ত তার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেব না ঠিক করেছিলাম। কিন্তু এখন আমি আর মামলা করব না স্থির করেছি, বরঞ্চ আমি এ কথা স্বীকার করব যে, একজন অভিজাত ব্যক্তির সম্মানে ঘা দিয়ে আমি তাকে দ্বন্দ্বে ক্ষিপ্ত হতে বাধ্য করেছিলাম। ঐ অভিজাত ব্যক্তি ভুল করেছিলেন, এখন তিনি বেশ ভালোভাবেই তার ক্ষতিপূরণ করেছেন। এখন আমার শত্রুকে নিয়ে আমি গর্বিত।' এ কথা শুনে আমি তাঁর সন্তুষ্টির জন্যে যা-কিছু করার তা করব বলায় তিনি বললেন, 'ব্যাপারটা আমাদের মধ্যে চুকে গিয়েছে। এখন কেউই আর সন্তুষ্টির কোনো কথা তুলবে না।' উত্তরে আমি বললাম যে, এইসব সন্তুষ্টির জন্যে আমাকে যদি এদেশে ধরে রাখা না হয়, তাহলে অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সঙ্গে আমার দেখা সাক্ষাৎই হবে না। কেননা আমি জার্মানীতে ফিরে গিয়ে আমাদের দেশের সেনাবাহিনীতে যোগ দেব। আমার দিকে হাত বাড়িয়ে সে বলল, 'এটা বেশ সম্মানজনক সিদ্ধান্ত। আশা করি আমরা আবার মিলিত হব।' আমরা করমর্দন করলাম। তারপর তার কাছ থেকে আমি বিদায় নিলাম। সব কাগজপত্র নিয়ে আমি বাসায় ফিরলাম। সেখানে একটি চিঠি পেলাম, তাতে আমাকে রাজার সেনাবাহিনীতে একটা ছোট কাজ দেবার প্রস্তাব আছে। তরবারি দিয়ে সেটা ছিঁড়ে অন্যান্য বাজে কাগজের মধ্যে সেটা ফেলে দিলাম।

"পরের দিন সেই ধূসর ঘোড়ায় চেপে পূবের দিকে রওনা হলাম—রাইনের দিকে।

পিটার রোসেগার

অরণ্যের আদমসুমারি

পিটার রোসেগার (১৮৪৩-১৯১৮) একজন কৃষকের সন্তান, তিনি বাস করতেন অষ্ট্রিয়ার পার্বত্য অরণ্যে। এখানেই পিটারের শৈশব ও যৌবনকাল অতিবাহিত হয়, তারপর তিনি যান গ্রাৎস সহরে, এখানে ১৮৭০ সালের পরে তিনি তাঁর বেশির ভাগ গ্রন্থ রচনা করেন। বর্ণনা-মূলক তাঁর বেশির ভাগ রচনা তাঁর জন্মস্থানের ঐ কৃষকদের জীবন নিয়ে লেখা, ঐ স্থানটি তখন শিল্পাঞ্চল থেকে একেবারেই পৃথক ছিল। বর্ণনা-মূলক রচনাই এঁর লেখার বিশেষ গুণ, তার সঙ্গে কল্পনা আন্তরিকতা ও অন্তর্দৃষ্টি মিলিত হয়ে এঁর রচনা হৃদয়গ্রাহী হয়ে উঠেছে। এইসব গুণই তাঁর রচনাকে বিশেষ জনপ্রিয় ক'রে তুলেছিল, যে আদমসুমারি রিপোর্ট এখানে মুদ্রিত হচ্ছে তার মধ্যে এই গুণ স্পষ্ট প্রতীয়মান। বিশেষ ক'রে তাঁর আত্মকথা সংক্রান্ত রচনাতেই এই সব গুণ বেশি দেখা যায়। মিথ্যা ভাবাবেগ তাঁর ছিল না, তাঁর রচনা হচ্ছে উন্নত স্থানিক শিল্পের দৃষ্টান্ত।

কয়েক সপ্তাহ আগে আমি অরণ্যের প্রতিটি কুটিরে গিয়েছিলাম এক টুকরো কাগজ হাতে নিয়ে। আমি সব গৃহ-কর্তাদের তাদের যাবতীয় খুঁটিনাটি অবস্থার কথা জিজ্ঞাসা করি, পরিবারের লোক কতজন, ছেলেপিলেদের নাম তাদের কোন্ কোন্ বছরে জন্ম তা জানতে চাই। জন্মের বছর বলতে গেলে সেই সময়কার একটা ঘটনা বা তখনকার কোনো একটা অবস্থার উল্লেখ করতে হত। যেমন—অমুকের জন্ম হয়েছিল সেই গ্রীষ্মকালে যেবার সেই প্রবল বন্যা হয়, ঐ মেয়েটার জন্ম হয়েছিল সেই শীতকালে যেবার আমাদের খেতে হয়েছিল ভূষির রুটি। এইসব ঘটনাই কিছু নির্দিষ্ট ক'রে বলার পক্ষে একমাত্র নিশানা।

এদের নামের মধ্যে বিশেষ বৈচিত্র্য নেই। পুরুষ অধিবাসীদের নাম হচ্ছে হানেস বা সেপ্ বা বার্টহোল্ড বা টোনি বা ম্যাথেস; নারীদের নাম ক্যাথারিন বা মারিয়া, এই নামটার রূপান্তর ঘটেছে, এবং তা উচ্চারণ করা হয় মিনি, মিরৎসেল, মির্ল, মিলি, মিরৎস, মারৎস। অন্য নামের ক্ষেত্রেও এই রকম;

এই সম্প্রদায়ের বাইরে থেকে কেউ এলে, তাকে অবিলম্বে স্থানীয় লোকদের উচ্চারণের সঙ্গে তার নাম খাপ খাইয়ে নিতে হয়। কিছুদিন ধরে আমাকে সকলে বলত অ্যানড্রেড্‌ল; কিন্তু আমার মতন ছোট একজন মানুষের এত বড় নাম তাদের পছন্দ না হওয়ায় এখন তারা আমাকে বলে শুধুমাত্র রেডেল।

পারিবারিক নাম এদের মধ্যের খুব সামান্য কয়েকজন জানে। কেউ কেউ হয়তো ভুলে গেছে, কারও-কারও আদপে ছিলই না। নিজেদের বংশধারা ও সম্পর্ক বুঝবার জন্যে তারা একটা ভাল ব্যবস্থাই করেছে। হ্যান্‌স্‌ল-টোনি-সেপ্‌। এটা একটা বাড়ির নাম—এতে বুঝতে হবে বাড়ির মালিকের নাম সেপ্‌, তার বাবার নাম ছিল টোনি, ও পিতামহের নাম হ্যানস্‌ল। ক্যাথি-হ্যানি-ভাবা-মির্জ-মার্গারেট! এর মানে হল—ক্যাথি হচ্ছেন মার্গারেটের বৃদ্ধ প্রপিতামহী। অরণ্যের নিভৃতে এই পরিবারের অস্তিত্ব হয়তো অনেক দিন ছিল।

এই ভাবে এক লোকের পরিচয় দিতে আধ ডজন নাম বলতে হয়, প্রত্যেক মানুষই তাদের নামের সঙ্গে পূর্ব-পুরুষদের নামের মালা ঝুলিয়ে রাখে। উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া সম্পদই বলা যাক বা স্মৃতিচিহ্নই বলা যাক—এটা তাদের কাছে একমাত্র তারই নিদর্শন।

কিন্তু এই জটিলতা তো বেশিদিন চলতে দেওয়া যায় না। পল্লী-যাজকের দপ্তরের জন্যে নামের একটা ব্যবস্থা করতেই হয়। একজনের নামের সঙ্গে তার বংশনাম বা পদবী থাকা চাই। বিষয়টির মূলে গেলে এ ব্যবস্থা করায় বিশেষ অসুবিধে হবার কথা না। কোনো মানুষের বৈশিষ্ট্য বা জীবিকা বা পদমর্যাদার উপর নির্ভর ক'রে এই নামকরণ করা যেতে পারে। ভবিষ্যতেও ঐ পরিচয় থেকে যেতে পারে।

কাঠুরিয়া পল্‌ বিয়ে করল আন্নামির্ল-কে, তার নাম আমি আর হাইসেল-ফ্রানৎসেল-পল্‌ না বলে তাকে কেবল বললাম, পল্‌ উডিং, কেননা সে গাছের গুঁড়ি কেটে তা কাঠ কয়লা করার জন্যে চুল্লীতে পাঠিয়ে থাকে, আর এই কাজটাকে লোকে বলে 'উডিং'।

ট্রি-ট্যাপার* সেপ্‌ হয়তো তার বাবার নাম ভুলে গিয়েছে, তাকে

* মূল কথাটার মানে অরণ্যকর্মী গাছ যাতে নষ্ট হয়ে না যায় তার জন্যে যারা গাছের গায়ে গজানো ছত্রাক চেঁছে সাফ করে।

সোজাসুজি ঐ পদবী দেওয়া যায়, তার বংশধররাও ঐ পদবীতে চিহ্নিত থাকতে পারে, তারা সকলেই ট্রি-ট্যাপার হতে পারে।

ক্লিয়ার জর্জের একটা হাট্ (কুটির)—তার গা দিয়ে বয়ে চলেছে একটা স্প্রিং (ঝরণা), আমি এর নাম দিলাম স্প্রিংহাট্। এই কুটিরের মালিককে আমি হাইসেল-মাইচেল-হাইসেল-হ্যানেস্ বলব কেন। তিনি হচ্ছেন মিস্টার স্প্রিংহাট্, তাঁর স্ত্রী মিসেস স্প্রিংহাট্ তাঁর ছেলেও স্প্রিংহাট্। জীবনে সেপাই হোক বা যে-জীবিকাই তার হোক, সে রইল স্প্রিংহাট্।

সেই রকম পেলাম স্টর্মহ্যানস—স্টর্ম (ঝড়) তাড়িত এলাকায় তার বাস বলে তার এই নাম দেওয়া হল।

কাঠ কয়লাবাহী সেপ্ হচ্ছে বামন, তার গলায় মস্ত গলগণ্ড। তদনুযায়ী তাকে বলা হয় ইয়োডেলনেক। কয়েকদিন আগে তাকে আমি জিজ্ঞাসা করলাম যে, তার নাম আমি যদি আমার খাতায় লিখি জোসেফ ইয়োডেলনেক, তাতে তার আপত্তি আছে কিনা। আপত্তি সে করল না, সম্মতই হল তৎক্ষণাৎ। আমি তাকে বোঝালাম যে, এই নাম হবে তার ছেলের, তার ছেলের ছেলের। সে গাঁইগুঁই করে বলল, "ঐ নাম যত খুশি ততবার ব্যবহার হোক।" একটু পরেই সে বলল, "বেশ, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, নামটা তো এখন পেলাম। ছেলেও যদি পেতাম।"

ঐ খাদটার কাছে ঐ জলপ্রপাতের পাশে তিনটি ফার্ (দেবদারু জাতীয়) গাছ দাঁড়িয়ে আছে, কাঠ কাটিয়ে জোসেল-হ্যানসেল-অ্যানটন ঐ গাছ তিনটি কাটেনি ঐ অঞ্চলের মানুষদের জন্তু-জানোয়ারদের আশ্রয়ের কথা ভেবে। ঐ ফার্ গাছ সে বাঁচিয়ে রেখেছে বলে পুরস্কার-স্বরূপ তার নাম দেওয়া হল অ্যানটন শিল্ড্ফার্।

এই নতুন নাম অনেকেই বেশ পছন্দ করছে। এ ধরণের নাম পেয়ে অনেকেই গর্বিত, আগের চেয়ে তারা যেন্ আত্মবিশ্বাস পেয়ে গিয়েছে। এখন সে বুঝতে পেরেছে যে, সে কে। এখন থেকে এই নতুন নামটির সুনাম বাড়ানোর দিকেই তাদের লক্ষ্য হবে, আর এই নামের মর্যাদা অর্জনেও ঝোঁক হবে।

একটি লোক বনের মধ্যে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়, আমি ঠিক জানিনে তার কোনো নাম আছে কিনা, যদি থেকে থাকে, তাহলে কী সেই নাম। মনে হয় যদি তার নাম কিছু থেকে থাকে তাহলে নামটা হয়তো বিশেষ ভালো না।

সে আমাকেও এড়িয়ে চলে, সবাইকেই এড়িয়ে চলে। অনেক দিন ধ'রে সে নিজেকে কোথায় লুকিয়ে রাখে তা কেউ জানে না, অস্বাভাবিক ভাবে কোনো অসময়ে হঠাৎ হয়তো হাজির হয়, কেন তার এই আগমন তা কেউ জানে না। এইসব দেখে আমি তার নাম দিয়েছি—একক।

ভিলহেলম্ রাবে

দি শুডারামপ্

ভিলহেলম্ রাবে (১৮৩১-১৯০০) খুবই বাস্তববাদী ছিলেন, এর ফলে তিনি জীবনের নগ্ন সত্য কি তা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন—এই জন্যেই তিনি হতাশাবাদী হয়েছিলেন, এবং সভ্যতার প্রতি তাঁর শ্লেষ ও বিদ্রূপ প্রকাশ পেয়েছিল। এ সবের থেকে মুক্তির জন্য এবং এর দরুণ মনের যে ভাব হয় তা উপশমের জন্য ভাবাবেগের শক্তি যে কার্যকর হয় এবং বাস্তবতা থেকে নিজেকে একটু ঊর্ধ্বে যে রাখা সম্ভব তা তিনি স্বীকার করতেন। তিনি মনে করতেন এ'তে রসিকতা আনাও সম্ভব। তাঁর নভেল "শূডারামপ্" দুঃখবাদী মনোভাবই প্রকাশ করেছে। অ্যানটনিয়া হাউলার নামক একটি অনাথা বালিকা লাউয়েনহফ নামে এক গ্রামেই বড় হয়ে ওঠে; স্কোয়ার হেনিগ-এর মা তাকে লালন-পালন ও আদরযত্ন করেছেন। তার বয়স যখন ষোলো, তখন তার নিরুদ্দিষ্ট ঠাকুরমা ফিরে এলেন, ইনি যেমন শঠ তেমনি প্রতারক। ইতিমধ্যে তিনি অনেক পয়সা ক'রে বেশ ধনী হয়েছেন, এখন তিনি তাঁর ভবিষ্যৎ অভিসন্ধি পূরণের জন্যে মেয়েটিকে জোর ক'রে বিয়ে দিতে চাইলেন। শান্ত গ্রাম্য পরিবেশ থেকে অ্যানটনিয়াকে নিয়ে যাওয়া হল ভিয়েনা শহরের সেই ভয়াবহ আবহাওয়ার মধ্যে সমাজের উঁচু মহলে, যে সমাজ সম্পূর্ণ দূষিত ও স্বার্থপরতায় ও লোভে পূর্ণ। এসবের থেকে নিজের মনকে মুক্ত করার প্রবল চেষ্টা করতে করতে মেয়েটি অসুস্থ হয়ে পড়ল ও মারা গেল। জয় হল দুষ্টেরই ও বদমাইসিরই।

একটা অস্বস্তিকর অস্থিরতা ও অধৈর্য ক্রমেই স্কোয়ার ফন লাউয়েন-কে কাবু করে ফেলছিল। তাঁর পরিচিত-পরিজন যারা তাঁরা এই স্বচ্ছন্দ জীবন-যাপনের জন্যে তাঁকে হিংসে করত, তারা কিন্তু কিছু বুঝতে পারল না।

কেননা একমাত্র তিনিই জানতেন যে ক্রডেনবেক-এ বাস করে তিনি ঠিক যেন জীবন-ধারণের স্বাদই পেলেন না। এখন তাঁর বয়সও হয়েছে, নিজের মত অনুযায়ী অন্যকে দিয়ে কাজ করানোর মতন স্বাধীনও তিনি হয়েছেন, এমন কি তাঁর মাকেও তিনি তাঁর স্বাধীন মত জানাতে পারেন। তিনি ঠিক এমনই করে বসলেন বা করবেন বলে ঘোষণাই করলেন বলা যায়, কিন্তু কাজটা তিনি করে বসলেন ভুল সময়ে।

তাঁর ছেলে যখন তাঁর বৃদ্ধ মাকে জানালেন যে তিনি তাঁকে এবং লাউয়েন-হফের প্রধান নায়েবকে সব ভার বুঝিয়ে দিয়ে কিছুদিনের জন্যে তাঁর এই জমিদারি থেকে ছুটি নিয়ে বাইরে যেতে চান, তখন বৃদ্ধা যেন আতঙ্কিত হয়ে উঠলেন। একটা দুঃখ-জনক দৃশ্যের অবতারণা হল এবং এখানে-ওখানে বিরক্তিকর আবহাওয়ার উদ্ভব হল। কিন্তু হেনিগ অবিচল রইলেন। তিনি বললেন যে, তাঁর ইচ্ছে মতন তাঁকে চলতে না দিলে তিনি মারা যাবেন। তাঁকে একটু ভ্রমণ করতে হবে, পৃথিবীটা একটু দেখে নিতে হবে, তা'হলেই তাঁর পক্ষে নিজের গৃহে বাস করাটা সহজ হবে। তিনি ছাড়া আর সকলেই প্যারিসে গিয়েছে, ইটালীতে গিয়েছে। কিন্তু বাইরে যাবার অদম্য উৎসাহ তাঁর যেমন, এমন আর কারও নয়। যাকে বলা যায়, মাউণ্ট ব্রোকেনের এই উত্তর-অঞ্চলে এমন একজন নেই যার কিনা মাউণ্ট ভিসুভিয়াসে গিয়ে থুতু ফেলার ইচ্ছা তাঁর মতন হয়েছে। এ জন্যেই, ঈশ্বরের দোহাই, সকলে যেন একটু বিবেচনা করে দেখে এবং এই শৃঙ্খল থেকে তাঁকে একটু মুক্ত হতে দেয়। তিনি সেই সজ্জন পুরুষ গটৎস ফন বারলিশিংগেনের মতন তিনিও তাঁর মর্যাদার নামে শপথ করছেন যে, এর পরে ক্রডেনবেক-এর বাইরে আর তিনি যেতে চাইবেন না।

এই যুক্তির বিরুদ্ধে অনেক প্রতিযুক্তি দেখালেন তাঁর মা। এমনকি তিনি রূঢ়ও হয়ে উঠলেন, এবং জোর দিয়ে বলতে লাগলেন যে, এর আগে এমন একজনও স্কোয়ার ফন লাউয়েন বাইরে যাননি যিনি কিনা বিদেশ থেকে পিটারের মতন রিক্তহস্ত হয়ে না ফিরছেন। বিশেষ ক'রে ঐ ইটালী ভূখণ্ড সম্বন্ধে তিনি কখনো কারও কাছ থেকে ভালো কথা শোনেন নি। সেই যে একজন স্কোয়ার ফন লাউয়েন সেখানে গিয়েছিলেন সুপলিঙ্গেনবার্গের সম্রাট লোথারের সঙ্গে, তিনিও সুদূর ভবিষ্যৎকাল পর্যন্ত তাঁর সমস্ত বংশধরদের কাছে এক সতর্কবাণীর মতন হয়ে থাকবেন, এবং গ্লবিগার্ণের নাইট এখনো

যে কোনো সময়ে ঐ হতভাগ্য বেকুবের কথা বলতে গেলে ঐ জায়গাটারই উল্লেখ করবেন।

গ্রবিগার্ণের নাইট কেবল একটা শব্দ করলেন, "হুঁ"। তারপর বিড়বিড় করতে লাগলেন, এ বিষয়ে আর-একটা কথাও বললেন না। সেণ্ট-ট্রাউইনের যুবতী মেয়েটি অবশ্য স্পষ্টভাবেই বলল যে, মনোহারী ফ্রান্সের কথা যদি বলা হয় তাহলে এর বিরুদ্ধে বলার মতন তার কিছু নেই—এমন কি সেখানকার রাজনৈতিক দল সম্বন্ধেও না, তারা অরলিয়ানিস্ট হোক, রিপাবলিকান হোক, বা বোনাপার্টিস্টই হোক। একটা ভ্রমণে বিপদও আছে অসুবিধেও আছে—এটা মেনে নিতে হয়। একজন যুবক একটা অভিযানের ঝুঁকি নিতে উৎসুক হবে—এটা অবাস্তব বা অস্বাভাবিক ব্যাপার কিছু নয়।

"ওটা একটা বেকুবের যুক্তি, ওটা মূর্খের গালগল্প। আমি অনুমতি দিচ্ছি নে। এখন, তুমি যা খুশি তা করতে পার, হেনিগ।" এই কথা ব'লে বেশ উত্তেজিত ভাবেই টেবিল থেকে উঠে গেলেন ফ্রাউ অ্যাডেলহেড ফন লাউয়েন।

ফেব্রুয়ারি মাসের ঝোড়ো সন্ধ্যাবেলা এই কথাবার্তা হয়েছিল। বেশ উত্তপ্ত হয়ে খালি মাথাতেই গৃহকর্ত্রী প্রাঙ্গনটি পার হয়ে তাঁর পরিচারিকার কাছে সান্ত্বনা ও সহানুভূতির জন্যে গেলেন। এবং জীবনে এই প্রথম তাঁর ঠাণ্ডা লেগে গেল এবং তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন।

কয়েকদিন বাদে তিনি তখনও বেশ শয্যাগতই, তখন তিনি তাঁর জ্বর ও তলপেট ব্যথা সত্ত্বেও অনেক কষ্টে একটু উঠবার মতন করে তাঁর ছেলের কান টেনে ধ'রে তার কানে কানে বললেন:

"শোনো, পৃথিবীতে আমি সবচেয়ে বেশি যা ঘৃণা করি তা হচ্ছে মুখ-ভার। তুমি বেশ ভালো ছেলে, হেনিগ। সময় থাকতে-থাকতে তুমি তোমার এই যুবা-বয়সটা ভালোভাবে ব্যবহার করতে ইচ্ছে করেছ। এটা ভালো কথা। তোমার ইচ্ছেটা বেশ ভালোই। আমিও যা ভালো বুঝেছি তা'ই করে এসেছি। কে কি মনে করল তা গ্রাহ্য করিনি। আমি সারা জীবন খেটে দুধ-সাদা মোজা বুনেছি। আমার মনে হচ্ছে এবার ঠিকই আমাকে যেতে হবে। তা যদি হয় তাহলে, উপরতলার বাগানের দিকের কোণের ঘরটা দেখো। সেখানে দেরাজের ডান দিকের নীচের দিকের একেবারে নীচের দেরাজে তুমি দু-জোড়া মোজা পাবে, শণের সুতো দিয়ে বাঁধা। ওগুলো তোমার হোক। আমার ছত্রিশ বছরের নিজের রোজগার ওগুলি, আমার

ধর্মদীক্ষা নেওয়ার সময়কার পয়সাকড়িও ওতে আছে। ওগুলি তুমি খরচ করতে পার, এখন তা খরচ করার সময় হয়েছে। হেনিগ, আমি তোমাকে বলে যাচ্ছি, এই লাউয়েন হফ জমিদারিটি তোমার, তোমার অধিকার-বলেই এ তোমার। আমি ঐ নাইটকে ও ঐ যুবতী মেয়েটিকে তোমার জিম্মায় রেখে গেলাম। আমি জানি তুমি দরিদ্র ও সদাশয় লোককে সব সময় টেবিলের প্রধান জায়গায় বসতে দেবে। এইটেই সংগত। কিন্তু ভাবতে বড় অবাকই লাগে যে, তারা থাকবে আর আমি যাব। এতদিন জীবন সম্বন্ধে কে বেশি অনুযোগ আর অভিযোগ করেছে? তারা, না আমি? নিশ্চয়ই আমি না। প্রত্যেকদিন সকালে আমি জীবনের নতুন আনন্দ পেয়েছি, এই আনন্দ-ভোগ সব সময় অবশ্য আনন্দকর হয়নি। হতে পারে অন্যদের মতন আমি অনেক বিষয় গভীরভাবে বুঝতে পারিনি। এটা আশ্চর্যই বটে, খুবই আশ্চর্যের কথা। আমি কখনো ভাবিনি যে, দুজন আমার হাত-পা মালিশ করে দেবে। সে অন্য কথা। যে একবার ভাল জিনিস ভোগ করেছে, তাকে বাদবাকি সবই মেনে নিতে হবে। এ নিয়ম থেকে তুমিও বাদ যাবে না জেনো। এবার যাও, নাইটকে পাঠিয়ে দাও। এমন দুঃসময়ে সে যতটা সাহায্য করেছে তার জন্যে ধন্যবাদ দেবার ভাষা নেই। ও হেনিগ, হেনিগ! ঐ নাইটকে যোগ্য সম্মান দিয়ে যাবে, তাঁর প্রাপ্য সম্মান দেবে। সর্বদা তাঁকে মুরুব্বির আসনে বসাবে, তাঁর মতামত জানতে চাইবে, তাঁর পরামর্শ নেবে। যখন বুঝবে যে তুমিই ভালো বুঝছ আর তাঁর কথা-অনুযায়ী তোমার চলার ইচ্ছে নেই, তখনও তাঁর মত জানতে চাইবে। আমি সর্বদা তাই করেছি, এবং এতে সুফলও পেয়েছি।

গটফ্রিড কেলার

গ্রীন হেনরি

সুইজারল্যাণ্ড থেকে আগত গটফ্রিড কেলার (১৮১৯-১৮৯০) তাঁর লেখা অনেক গল্পেই সমগ্রভাবে ও ব্যাপকভাবেও বাস্তব জগতের দিকেই বিশেষ লক্ষ্য রেখেছেন, এসবের তিনি যে বর্ণনা দিয়েছেন তার মধ্যে তাঁর বিজ্ঞতার প্রসন্ন হাস্যের ও আন্তরিক রসবোধের পরিচয় আছে। মানুষের জীবনের অন্ধকার ও সংকটময় এলাকাটি অবহেলিত, এবং যাঁরা মাঝারি ধরণের স্বাস্থ্যোজ্জ্বল

জীবন যাপন করেন তাঁরা বেশ গৌরবজনক স্থান অধিকার করে আছেন। মাঝেমাঝেই মধ্যবিত্ত সমাজের ও সাম্প্রদায়িকতার প্রতি কেলারের কঠোর মনোভাব প্রকট হয়ে ওঠে। তাঁর প্রথম দিকের রচনার মধ্যে তাঁর "গ্রীন হেনরি" (১৮৫৪) নভেলটি অন্যতম, এতে অবশ্য লেখক হিসাবে তাঁর মন যে তেমন গড়ে ওঠে নি, তা স্পষ্ট বোঝা যায়। এটা গ্যেটের "ভিলহেলম্ মেইস্টার" এর মতই মানুষের চরিত্র গঠনের চিত্র কিন্তু ক্লাসিক সমন্বয়ের আদর্শের সঙ্গে এর মিল কম, বিশেষ করে নভেলটির প্রথম রূপটি। হেনরিখ (হেনরি) একজন চিত্রশিল্পী, তাঁর চিত্রকর্মের প্রতি তাঁর আস্থা আছে। তার সুইজারল্যাণ্ডের গৃহে তার স্নেহময়ী মায়ের স্নেহ-মমতায় লালিত-পালিত হয়েও সে যেন স্থির থাকতে পারে না, নানারকম বিভ্রান্তিতে সে দোলায়মান। মিউনিখে তার ছাত্রাবস্থায় তার মনের এই ভাব আরও তীব্র হয়ে ওঠে, যার ফলে শিল্পক্ষেত্রেও তার ব্যর্থতা আসে, জীবনেও ব্যর্থতা আসে। ভগ্নমনোরথ হয়ে সে গৃহে ফিরে আসে, সেখানে তার ভগ্নহৃদয় মা তখন মারা গেছেন। নিজের অপরাধ সম্বন্ধে ভাবতে-ভাবতে হতাশায় তারও মৃত্যু ঘটে। অনেক বছর পরে কেলার বইটি আবার নতুন করে লেখেন, এবং উপসংহারটা আরও স্পষ্ট করে তাতে দেখান— হেনরিখ সমাজের মানুষের সক্রিয় সেবা করে জীবনের অর্থ সম্বন্ধে পূর্ণজ্ঞান লাভ করে, এবং সময় মতই ঘরে ফেরে। উদ্ধৃতাংশে হেনরিখ তার যুবা-বয়সের কালে তার সুইজারল্যাণ্ডের গৃহের স্মৃতি মন্থন করছে—

রচনার প্রারম্ভ

গতকাল একটু বেশি রাত্রে অ্যানা ও তার বাবা যখন চলে গেলেন তখন আমি সেখানে ছিলাম না ব'লে অ্যানা আমার কাছ থেকে বিদায় নিতে পারেনি। তার সঙ্গে আর দেখা হল না বলে আমি যদিও খুবই মর্মাহত হয়েছিলাম, কিন্তু আমার উল্লাস আমার ঐ দুঃখকে চাপা দিয়ে রেখেছিল। আমার ঘরের জানালার কাছে আমি পুরো একটি ঘণ্টা শুয়েছিলাম, দূরের আকাশে তারাদের গতিবিধি লক্ষ্য করছিলাম, আর দেখছিলাম নীচের দিকে রুপালী জ্যোৎস্নাকে টেনে নিয়ে চলেছে ঐ ঢেউ ঐ প্রান্তরের দিকে, এবং জ্যোৎস্নার কয়েকটি টুকরো তটভূমির এদিকে-ওদিক ছড়িয়ে-ছিটিয়ে দিচ্ছে, মনে হচ্ছে ঐ ভার বইতে পারছে না বলেই হয়তো তারা এমন করছে, এবং সেই সঙ্গে করে চলেছে গান। চাঁদের আলো আমার মুখে পড়ছিল, তা দেখা

যায় না, কিন্তু সে আলো যেমন সুমিষ্ট তেমনি অন্তরঙ্গ, আর শিশিরবিন্দুর মতই তা যেমন টাটকা তেমনই ঠাণ্ডা।

তখনও যেন নেশাগ্রস্ত ও স্বপ্নাচ্ছন্ন আছি, আমি ঐ অবস্থায় আমার আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে মিলিত হলাম, এবং শোবার ঘরে আমার প্রতিবেশী সেই কল-ওয়ালাকে পেলাম, তার হালকা ধরণের গাড়িতে করে সে আমাকে শহরে নিয়ে যেতে চেয়েছিল। এ ব্যবস্থাটা কিছুদিন আগেই স্থির হয়েছিল। ওর ব্যবসায়ের কাজের জন্যে যখন ও শহরে যাবে তখনই আমি ফিরে যাব বলেই ঠিক করেছিলাম। তার সঙ্গে যাওয়াটা আমার কাছে বেশ আরামপ্রদ ছিল বলেই এই ব্যবস্থা। এ বিষয়ে আমি আর খোঁজখবর করিনি, ঐ কলওয়ালাও অপ্রত্যাশিতভাবে উপস্থিত হয়েছে, এবং আমার হিসেবের থেকে একটু আগেই এসেছে। আমার খুড়ো ও পরিবারের লোকেরা বললেন ওকে যেন আমি চলে যেতে দিই আর আমি থেকে যাই। আমার মন তখন অ্যানার জন্য ও শান্ত হ্রদটির জন্যে কাঁদছে। কিন্তু আমি সকলকে বেশ ভালো ভাবেই জানিয়ে দিলাম যে, আমার বিশেষ দরকারেই আমাকে এই সুযোগটা নিতে হচ্ছে; আমি তাড়াতাড়ি খাওয়াদাওয়া সেরে নিলাম, জিনিসপত্র গুছিয়ে নিলাম, আত্মীয়-স্বজনদের কাছ থেকে বিদায় নিলাম, এবং সেই কলওয়ালার ছোট গাড়িটিতে গিয়ে উঠলাম। আমরা তক্ষুণি গ্রামপথ ধরে এগিয়ে চললাম, এবং পৌঁছলাম বড়রাস্তায়। আমি এসবই করলাম একটু বিহ্বলতার মধ্যে, এর কারণ আমার মনে হয়েছিল যে আমি থেকে গেলে অনেকেই ভাবতে পারে যে, আমি অ্যানার জন্যেই থেকে যাচ্ছি, এবং আমি সত্যিই তাঁর প্রেমে পড়েছি, এবং এসবের পেছনে আর একটা জিনিসও অবশ্যই ছিল, সেটা আমার খামখেয়ালিপনা।

আমাদের গ্রাম থেকে কিছুটা দূরে যাওয়া মাত্র আমার এই চলে-যাওয়ায় জন্যে আমার কেমন অনুতাপ হতে লাগল। গাড়ি থেকে ঝাঁপিয়ে পড়তেও ইচ্ছে হল এক-একবার। ঐ লেকটি ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে যে-পাহাড়ের শ্রেণী, আমি সেইদিকে চেয়ে রইলাম, এবং ক্রমেই তারা কেমন নীলাভ হয়ে যাচ্ছে ও আকারে ছোট হয়ে যাচ্ছে—সেদিকে যেন মনই দিলাম না। আরও বড়-বড় হ্রদের কিনারের পর্বতশ্রেণীও ক্রমশ মাথা উঁচু করছে দূরে—তাও আমি ঠিক মন দিয়ে দেখছিলাম না।

প্রথম কয়েকটা দিন আমি ঠিক যেন ধরতেই পারিনি যে, আমি কোথায়

এসেছি। এই শহরকে ঘিরে আছে যে অপূর্ব সৌন্দর্য তার দিকে মন না গিয়ে আমার মন সেই গ্রামের দৃশ্যই আমার চোখের সামনে স্বর্গীয় সৌন্দর্য নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিল, আমি এইবার প্রথম ঐ গ্রামের মোহিনীশক্তি যেন টের পেলাম— তার ঐ সরল আড়ম্বরহীন এবং সেইসঙ্গে শান্ত ও অপরূপ মায়া আমাকে মোহিত করতে লাগল। এই শহরের সবচেয়ে উঁচু পাহাড়চূড়ার উপর দিয়ে যখনই আমি দৃষ্টি নিক্ষেপ করতাম, তখনই চোখে ভেসে উঠত ওরই নেপথ্যের গ্রাম্য সেই ভূমিখণ্ডের দৃশ্য, গ্রাম্য ইস্কুলের মাস্টারমশায়ের সেই হ্রদটি ; এবং সেই সবই আমার মনে হত পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে মনোহারী দৃশ্য। ঐ দিক থেকে যে বাতাস বয়ে আসত তা বেশ পরিচ্ছন্ন ও প্রফুল্ল বলে মনে হত, এবং বহু দূরে আমার দৃষ্টির বাইরে নীলাভ গোধূলির আলোয় আচ্ছন্ন সেই জায়গাটার কথা মনে হত, যেখানে অ্যানাদের বাড়ি। অমনি আমাদের মাঝের এই ব্যাবধানটা কীরকম একটা মায়ায় আচ্ছন্ন হয়ে উঠত। যখন গিরিখাতে নেমে গেলে আমার চোখের আড়ালে চলে যেত দিগন্ত, তখনও আমি সেই মনোহারী এলাকার কথাই ভাবতাম এবং মনে-মনে তা খুঁজে বেড়াতাম। গৃহে ফেরার জন্যে আমার মন ব্যাকুল হয়ে উঠত। যে আকাশটা গিয়ে সেখানে পৌঁছেছে আমি উৎসুকভাবে আমার কাছের পাহাড়ের উপর দিয়ে সেই আকাশের দিকে চেয়ে থাকতাম।

ইতিমধ্যে আমার একটা কাজের প্রশ্নটা নতুন করে উঠে পড়ল, এতে প্রত্যেকটা দিনই আমার কাছে যেন বিশেষ জরুরি হয়ে উঠতে লাগল। আমি এর জন্যে এমন চুপচাপ করে আশায়-আশায় আর যেন থাকতে পারছিলাম না।

আমি বসে-বসে অনেক চিন্তা করতে লাগলাম, এবং ছবি-আঁকা ছেড়ে দেবার জন্যে আমার অদৃষ্ট নিয়ে অনুতাপ করতে লাগলাম। এ'তে মা-ও কষ্ট পাবেন। এবং মনে হল তিনি বুঝি আবার চিন্তা ক'রে দেখবেন, এবং বরাতে যা'ই থাকুক, আমি যা করতে চাই তাই আমাকে তিনি করতে দেবেন।

অবশেষে তিনি একটি লোককে পাকড়াও করেছিলেন, সেই লোকটা সবার অলক্ষ্যেই অদ্ভুত ধরণের একটা চিত্র নিয়ে শহরের উপকণ্ঠে একটা মঠে এসে হাজির হল। সে একাধারে চিত্রশিল্পী, তামার পাতে খোদাইকার, লিথোগ্রাফার ও মুদ্রক। সুইজারল্যাণ্ডের অনেক পরিচিত দৃশ্যের ছবি সে এঁকেছে একেবারে পুরনো ধাঁচে, তামার পাতে তা খোদাই করেছে, তার থেকে অনেক কপি ছেপে ফেলেছে, আর, কয়েকজন অল্পবয়সী ছেলেকে দিয়ে তাতে

রং লাগিয়ে নিয়েছে। এইসব ছাপা ছবি চারদিকে বিলি ক'রে সে বেশ ভালোমতই ব্যাবসা ফেঁদেছে। তার এ কাজে সে সাহায্য পেয়েছে কতকগুলি তাজা ও সৎ ছেলের, তারা এসব কাজকর্ম করত সেইখানে আগে যেটা সন্ন্যাসিনীদের খাবার ঘর হিসেবে ব্যবহৃত হত। এই ঘরের দুই পাশে বেশ লম্বা-লম্বা গোটা দুয়েক জানালা ছিল, তাতে ছোট ছোট কাঁচের পরকলা লাগানো, এতে ঘরের মধ্যে প্রচুর আলো আসে, কিন্তু ঐ পরকলার কাঁচ একটু এবড়ো-খেবড়ো বলে ভিতর থেকে বাইরেটা দেখা যায় না। এ'তে এই আর্ট ইস্কুলের কাজকর্মের পক্ষে বেশ সুবিধেই হয়েছে। প্রত্যেকটি জানালার কাছে একজন করে ছাত্র পিছনের জনের দিকে পিঠ দিয়ে ও সামনের জনের ঘাড়ের দিকে মুখ দিয়ে বসে। এই বাহিনীর প্রধান দলটি চার থেকে ছয়জন তরুণ বয়সীদের নিয়ে তৈরি, এর মধ্যে আছে কয়েকজন ছেলে—এরা সুইজার-ল্যাণ্ডের দৃশ্যে জ্বলজ্বলে রং লাগাচ্ছে; সেখানে এল একটা রুগ্‌ণ লোক, অনবরতই সে কাসছে; তামার পাতে সে রজন ও অ্যাকোয়া ফর্টিস লাগাতে লাগল যাতে পাতে বেশ গর্ত হয়ে যায়, তার পর এন্‌গ্রেভিংএর সুঁচ দিয়ে সে ঘষতে লাগল, একে বলা হয় তামার পাতের এন্‌গ্রেভার। এর পর এল লিথোগ্রাফার—বেশ হাসিখুশি ও সরল মানুষ, এর কাজের ক্ষেত্র বেশ বিস্তৃত—এখানকার প্রধান যিনি তাঁর পরেই এর স্থান, কেননা একে সব সময় হাতের কাছে পাওয়া দরকার, চক দিয়ে পেন্সিল দিয়ে, খোদাই করে কিংবা রঙিন ড্রয়িং এঁকে একজন রাজনীতিবিদের বা মদের তালিকার ছবি চটপট আঁকতে হতে পারে এই ব্যক্তিকে, অথবা একটা ধানভাঙা কলের বা মেয়েদের উপযোগী কোনো ভক্তিমূলক বইয়ের মলাটের চিত্রও আঁকতে হতে পারে। প্রাক্তন এই খাবার ঘরের পিছন দিকে কালোকুলো দুজন লোক খুব দ্রুত হাত চালিয়ে কাজ করে চলেছে, তামা ও পাথর খোদাইকারদের সহকারী এরা, দুজনেই একটি চাপা-যন্ত্রে চাপ দিয়ে ভিজে কাগজে আর্টিস্টের আঁকা ডিজাইনের ছাপ তুলছে। এবং সর্বোপরি, এই জনমণ্ডলীর পিছনে যেখান থেকে সব ব্যাপারের উপর চোখ রাখা যায় সেখানে আছেন সেই প্রধান সেই মাস্টার, মিস্টার হেবারসাট, আর্টিস্ট এবং ডীলার ইন ওয়ার্কশ অব আর্ট, কপার-খোদাই ও লিথোগ্রাফির এই প্রতিষ্ঠানের সত্বাধিকারী যে কোনো ধরণের কাজ এলেই তা তিনি করে দেবার জন্য প্রস্তুত, তিনি তাঁর টেবিলে বসে আছেন বেশ কঠিন ও সূক্ষ্ম ধরণের কাজ করার জন্যে তৈরি

হয়ে; কিন্তু সাধারণত তিনি ব্যস্ত থাকেন হিসাবের খাতা নিয়ে, চিঠিপত্র লেখা নিয়ে ও তৈরি জিনিসপত্র প্যাক করার কাজে।

কে বা কারা যেন আমার মাকে পরামর্শ দেন এই লোকটির সঙ্গে কথা-বার্তা বলার জন্যে, এবং তার ব্যবসার ধরণটা একটু দেখার জন্যে, এবং তার কাছে প্রথমে আমাকে যেন সে একটু আশ্রয় দেয়, তার পরে আমি যদি কাজ দেখাতে পারি, এবং লোকটা যদি কথা দেয় যে আমাকে দিয়ে সে তার নিজের কাজ করিয়ে নেবে না, তাহলে আমাকে পরামর্শ দেবার জন্যে সে কিছু ফী পাবে। লোকটা এ প্রস্তাবে রাজি হয়ে যায়, এবং এমন-একজন তরুণকে সত্যিকারের শিল্পী করে তোলার সম্ভাবনায় সে বেশ খুশিও হয়; এবং আমার মা যে টাকার অঙ্ক খরচ করতে রাজি হয়েছেন তার জন্যে মায়ের খুব প্রশংসা করেন। আমার মা-ও মনে করেছিলেন যে, এতদিন মিতব্যয়িতার দ্বারা তিনি যা সঞ্চয় করতে পেরেছেন, সেটা আমার ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার জন্যে তাঁর লগ্নি করার এই সময়। সেই জন্যে এই মর্মে শর্তও হয়ে যায় যে, তিন মাস অন্তর নিয়মিত ফী দাখিল করা হবে, এবং আমি তাঁর ঐ কারখানায় দুই বছর কাটাব, এ'তে যে ট্রেনিং আমি পাব তাতে আমার খুবই উপকার হবে। দুই পক্ষের দ্বারা শর্ত স্বাক্ষরিত হবার পর এক সোমবার সকালবেলা আমি আমার চিত্রবিচিত্র চিত্রাবলী সঙ্গে নিয়ে তার কাছে গেলাম, আমার হাতের কাজ দেখতে চাইলে দেখাতে পারব বলে সঙ্গে এগুলি নেওয়া। আমার আঁকা এইসব বিচিত্র কাগজ দেখে লোকটা আমার উৎসাহের ও অভিপ্রায়ের প্রশংসা করল, তার পর তার প্রতিষ্ঠানের লোকজনের সঙ্গে আমার পরিচয় করে দিল। এতক্ষণ তারা সবাই তাদের আসন ছেড়ে এসে কৌতূহল নিয়ে আমাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে ছিল। তখন প্রকৃত একজন ছাত্রের এর অনেক আগেই আর্ট স্কুলে আসা উচিত ছিল বলে তারা বোধ হয় মনে করল। তারপর লোকটা বলল যে, নিয়মিত ভাবে একজন ছাত্রকে ট্রেনিং দিতে সে বেশ আনন্দই বোধ করবে, এবং আমার একাগ্রতা ও ধৈর্য সম্বন্ধে তার আশানুরূপ কাজ আমি করব বলে ভরসা প্রকাশ করল।

একজন তরুণ রংশিল্পীকে তার জানালার ধারে আসনটি ছাড়তে হল, সে অন্য জায়গায় গিয়ে বসল, আমি ওর জায়গাটা পেলাম। তার পরে, আমি যখন ফাঁকা টেবিলটার সামনে দাঁড়িয়ে আছি এবং খুব প্রত্যাশা নিয়ে আছি এর পরে কি হবে, তখন মিস্টার হেবারসাট তার পোর্টফোলিয়ো থেকে

একটা ল্যাণ্ডস্কেপের ছবি বের করল, একটি লিথোগ্রাফের সাধারণ একটি খসড়া, ছেলেবেলায় ইস্কুলে যে জিনিস অনেক দেখেছি। সব প্রথম এর থেকে আমাকে হুবহু একটা নকল তৈরি করতে হবে। কিন্তু আমি যেই বসতে যাব তখন ঐ মাস্টার আমাকে কাগজ ও পেন্সিল আনতে বলল। কিন্তু ওসব আমার সঙ্গে ছিল না, কেননা কিভাবে কাজ আরম্ভ করা হবে, সে সম্বন্ধে আমার কোনো ধারণাই ছিল না। আমার কি-কি দরকার সে আমাকে বলল, কিন্তু আমার সঙ্গে টাকা-পয়সা ছিল না, আমাকে তাই লম্বা রাস্তা ভেঙে যেতে হল আমার বাসায়, তারপর আবার দোকানে গিয়ে সবচেয়ে ভালো আর নতুন জিনিস আনতে হল। দ্বিতীয় বার যখন যাই তখন বেলা প্রায় সাড়ে এগারোটা। কাজ আরম্ভ করার জন্যে আমাকে কাগজ-পেন্সিলও দিল না, আমাকে সেগুলো আনতে পাঠাল, রাস্তায় রাস্তায় ঘুরতে হল, আর মায়ের কাছ থেকে টাকা চাইতে হল। এবং অবশেষে যখন আমাকে কাজে বসানো হল তখন আর-সকলে দুপুরের খাবার জন্যে চলে গেছে। এইসব ব্যাপারটাই আমার কাছে বড়ই স্থূল ও যাচ্ছেতাই ব'লে মনে হল। একটা শিল্প-সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানে যেভাবে ব্যবহার করা হতে পারে বলে আমি কল্পনা করেছিলাম, সবই তার বিপরীত দেখে আমার মন পীড়িত হয়ে উঠল।

যাই হোক, যে ধারণা করে বসেছিলাম, তা কিছুটা বদ্‌লে নেওয়া গেল। বাহ্যত দেখতে অতি সামান্যই এমন যে কাজ আমাকে দেওয়া হল তাতে আমাকে যতটা ব্যস্ত থাকতে হবে ভেবেছিলাম তার চেয়ে বেশিই ব্যস্ত থাকতে হল। হেবারসাট বিশেষ করে আমাকে বলে ছিল যে, আমার প্রত্যেকটি রেখা যেন মূলের ঠিক মাপ-অনুযায়ী হয়, একটু বড়ও না, একটু ছোটও না। কিন্তু আমার কপি সব সময় একটু বড় হয়ে যেতে লাগল, অবশ্য সমগ্রটার সব অনুপাত বজায় রেখে। এই সময় আমার মাস্টার সুযোগ পেল অনেক কথা বলার ও কঠোরতা দেখাবার। নিখুঁত ভাবে আঁকা যে কত কঠিন তাও বলল। এবং আর্ট যে কত কঠিন কাজ তাও বুঝিয়ে দিল, এবং আমাকে বুঝতে দিল যে, আমি যত তাড়াতাড়ি এসব কাজ করা যেতে পারে বলে মনে করি, এ কাজ তেমন নয়।

প্রথমে দিন-কয়েক আমাকে এমন অবস্থায় ফেলল যাতে আমাকে তার উপর নির্ভর করে থাকতে হয়। আমি নাকি স্বচ্ছ তীক্ষ্ণ রেখার আর নোংরা ভোঁতা রেখার মধ্যের পার্থক্য বুঝিনে। সেইজন্যে চিত্রের গঠন ও চিত্রের

চরিত্র সম্বন্ধে বেশ মনোযোগ দিতে লাগল সে। অবশেষে ব্রাশের হরদম ব্যবহারে আমি রহস্তের মূলে গিয়ে পৌঁছে গেলাম, এবং মূলের সঙ্গে অবিকল মিলিয়ে একের পর এক ব্রাশ-ড্রয়িং এঁকে যেতে লাগলাম। এখন আমি কেবল ভাবতে লাগলাম কয়টা ছবি এঁকেছি, এখন আমার আনন্দ আমার আঁকা ছবি কেমন বিক্রি হচ্ছে তার উপর। খুব ভালো চমৎপ্রদ বিষয়ও এখন আর আমার মনের উপরে কোনো ক্রিয়া করে না। প্রথম শীতকালটা পার হবার আগেই আমি আমার টিচারের দেওয়া সব কপিই করে ফেলেছি, এবং বলতে পারি টিচার নিজে করলেও যেমনটি হত অবিকল তেমনটি করেছি। আমি যখনই অবিকল নকলের সূত্রটি ধরতে পেরেছি, তখনই আমি আমার মাস্টারের মতন সহজেই তুলি বুলিয়ে লেপনের দক্ষতা অর্জন করে ফেলেছি, এবং এ কাজ বেশ দ্রুতই করতে পেরেছি; কেননা বাস্তবতাই বলো আর বোধশক্তিই বলো—সেদিক থেকে আমি শোচনীয় ভাবে অনেক নীচু পর্যায়ে চলে গিয়েছিলাম।

থিয়োডর স্টর্ম

সাদা ঘোড়ার সওয়ার

থিয়োডর স্টর্ম-এর (১৮১৭-১৮৮৮) গল্প মানুষের মনের ভিতরকার কথা নিয়েই লেখা। সামাজিক জীবনের বর্ণনা তাঁর লেখায় খুব কম আছে; তিনি মানুষের মানসিক আবেগের উপরেই বেশি প্রাধান্য দিয়েছেন, এবং মানুষের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য-জনিত যে দ্বন্দ্ব দেখা দেয়, তাই নিয়েই লিখেছেন। তাঁর লেখায় বিষাদের স্বর খুব বেশি দেখা যায়, এবং পাওয়া যায় পরিণত মেজাজের আঁচ—সব জিনিসের অসারতা সম্বন্ধে চেতনা ও তাঁর একাকীত্বের থেকেই বোধহয় তাঁর এই মনোভাবের উদ্ভব। স্টর্ম-এর উত্তর-জার্মানীর সমুদ্র তীরবর্তী বাগগৃহই তাঁর সব গল্পের পটভূমিকা ও ভাবমণ্ডল পরিবেশন করেছে।

স্টর্ম-এর গল্পসমূহের মধ্যে তাঁর শেষ গল্প "দি হোয়াইট হর্স রাইডার" বিশেষ স্থান অধিকার ক'রে আছে। এই গল্পের হক্ হাইয়েনের জীবন বিবৃত হয়েছে, যৌবনকাল থেকে সে পূর্ণোদ্যমে তার ব্যক্তিগত ও জীবিকাগত সাফল্যের জন্যে চেষ্টা করে চলেছে। জেলার প্রধান শাসক, তথাকথিত "কাউন্ট অব দি ডাইক"এর মেয়েকে সে বিয়ে করে, তাঁর মৃত্যুর পর এই পদটি সে পায়। কিন্তু হাইনে যখন বন্যা প্রতিরোধের জন্যে নতুন 'ডাইক' বা বাঁধ

তৈরি করাচ্ছে তখন তাকে কেবল সমুদ্রের সঙ্গেই লড়াই করতে হল না, তার চেয়েও বেশি লড়তে হল গ্রামবাসীদের শত্রুতার ও একগুঁয়েমির সঙ্গে ; তাদেরই কল্যাণের জন্যে যে সে এই কাজটা করছে তা তারা বুঝতে চাইল না। এই প্রতিরোধে হাইয়েন আত্মপ্রত্যয়ে উদ্ধত হয়ে উঠল, ক্রমে সে দেনায় পড়ল, তার শক্তিও খর্ব হয়ে এল। ঐ বাঁধ যখন ভাঙল, তার স্ত্রী ও পুত্র তাতে ডুবল, তখন সে তার সাদা ঘোড়ায় চেপে ঐ সমুদ্রে ঝাঁপ দিল। এক নিঃসঙ্গ সৈনিক হিসেবে অশেষ শক্তিশালী অদৃষ্টের সঙ্গে লড়াই ক'রে সে এক অদ্ভুত ও অলৌকিক লক্ষণে লক্ষণাক্রান্ত হয়েছে। আমাদের উদ্‌ধৃতাংশে হক হাইয়েন নিজের গুরুত্ব যেন একটু বেশি মাত্রায় জাহির করছে ; যে বাঁধের জন্যে তার সংঘর্ষ এবং যে ভূমি সে সমুদ্র থেকে উদ্ধার করছে তা যেন তার নিজের কাজ ও তার ব্যক্তিগত কীর্তি।

পরদিন কোদাল দিয়ে শেষ মাটি কাটা হল। বাতাস কমে এসেছে, সমুদ্রচিল ও সামুদ্রিক অন্যান্য পাখিরা বেশ সৌষ্ঠবপূর্ণ বাঁক নিয়ে-নিয়ে স্থলে ও জলে যাতায়াত করছে। জেভার্স আইল থেকে অসংখ্য বুনো হাঁসের গলা ভেসে আসছে, এমন দিনেও তারা এখনো নর্থ সী-র কিনারে থেকেই তৃপ্ত আছে ; জলাভূমির উপর সকালের যে শুভ্র কুয়াশা ঝুলে আছে তা ভেদ ক'রে ধীরে ধীরে শরৎকালের সোনালি সকাল এসে গেল, তার আলো এসে পড়ল মানুষের নিজের হাতে গড়া সর্বশেষ কৃতিত্বের উপর।

কয়েক সপ্তাহ বাদে রাজার প্রধান-তত্ত্বাবধায়ক ও সিভিল কমিশনারেরা নিজেরা এই কাজ দেখতে এলেন। এই কাজ সম্পূর্ণ হওয়া উপলক্ষে ঐ তত্ত্বাবধায়কের বাড়িতে এক ভোজসভা হল—টিডি ভলকার্টের শবযাত্রার পরে এমন উৎসব এদিকে আর হয়নি। সেখানে সব চৌকিদার উপস্থিত ছিল, এবং উচ্চপদাধিকারী আরও অনেকে। ভোজের পরে তারা এবং তত্ত্বাবধায়কেরা সকলেই নানাবিধ গাড়ি-ঘোড়ায় চাপল, কিন্তু প্রধান-তত্ত্বাবধায়ক নিজেই এলকি-কে দু-চাকার গাড়িতে তুলে দিলেন বাদামি রঙের ঘোড়াটা অধৈর্যের মতন তার খুর ঠুকতে লাগল। তখন সে লাফিয়ে পিছন দিকে উঠে পড়ল ও লাগাম হাতে নিল, তত্ত্বাবধায়কটির স্ত্রীকে গাড়ি চালিয়ে নিয়ে যাবার সৌভাগ্য হাতছাড়া করল না, কেননা এই মহিলাকে সব সময়ই সে খুব বুদ্ধিমতী বলে মনে করেছে। তারা আনন্দের সঙ্গেই গাড়ি চালিয়ে চলল, নতুন

বাঁধের দিকে উঠে গেল, তার পর নতুন উদ্ধার করা জমির কিনার বরাবর চলল।

এমন সময় উত্তর-পশ্চিম কোণ থেকে হালকা হাওয়া এল, এবং এই দুই দিক থেকেই খুব বেগে জোয়ার আসতে লাগল। না, এর কোনো ভুল নেই। বাঁধ যেভাবে ধীরে-ধীরে বেঁকে গিয়েছে তাতে তার গায়ে এসে ঢেউগুলোর তেজ একটু কমে গেল। হক্ হাইয়েন এই রকমই হবে বলে আগে থেকেই বলেছিল। কমিশনাররা তার খুব তারিফ করলেন। চৌকিদারদের কয়েক-জন দোমনা ভাবে একটু আপত্তি যা জানিয়েছিল, তা এঁদের সকলের সমবেত সমর্থনে চাপা পড়ে গেল।

এই মহৎ দিনটি কেটে গেল। কিন্তু একদিন নতুন বাঁধের গা দিয়ে ঘোড়ায় চেপে যেতে-যেতে তত্ত্বাবধায়কের মনে নতুন করে সন্তোষ দেখা দিল। সে চিন্তামগ্ন হল। হয়তো সে ভাবছিল যে, তার উদ্যম ছাড়া যে জায়গাটা এমন-ভাবে ঘের দেওয়া যেত না, সারারাত্রি জেগে জেগে পাহারা দিয়ে পরিশ্রম করে ঘাম ঝরিয়ে যে জায়গাটা তৈরি হল, সেই জায়গাটার নাম রাজকুমারীর নামে হয়েছে কেন, কেন এর নাম দেওয়া হয়েছে নিউ ক্যারোলিন পলডার। কিন্তু এটাই হয়েছে, সব দলিলে-কাগজপত্রে এই নামই লেখা হয়েছে, কোনো-কোনোটায় আবার মোটা মোটা লাল হরফে। ঘাসে ঢাকা জমির উপর দিয়ে যেয়ে সে দেখতে পেল দুজন শ্রমিক কাঁধের উপর তাদের যন্ত্রপাতি নিয়ে আসছে, ওদের একজন অন্যজনের কুড়ি-পা পিছনে। সে শুনতে পেল দূরের জন বলছে, 'আমার জন্যে একটু অপেক্ষা কর।' কাছের লোকটি তখন বাঁধ থেকে উদ্ধার করা জমির দিকে নামছে, সে বলল, 'অন্য সময়। এখন আমার সময় নেই জেন্‌স্। দেরি হয়ে গিয়েছে, আমাকে কিছু ঘাস কাটতে হবে।'

'কোথা থেকে?'

'কেন এখান থেকে। হক্ হাইয়েন পলডার থেকে।'

সে জোর গলায় ঐ কথা বলতে-বলতে এগিয়ে চলল, তার সামনের সমগ্র জলাভূমিকে যেন জানান্ দিতে লাগল। কিন্তু হক্-এর মনে হতে লাগল সমস্ত পৃথিবীকে জানাবার জন্যেই তার নাম এভাবে উচ্চারিত হচ্ছে। সে পাদানির উপর ভর দিল, তারপর সাদা ঘোড়ায় চেপে ছুটল, তার বাঁয়ে বিস্তৃত ঐ জমির উপর যে জমি অনেক দূর পর্যন্ত প্রসারিত হয়ে গিয়েছে। 'হক্ হাইয়েন পলডার'—প্রত্যেক নিশ্বাসের সঙ্গে সে ঐ কথাটা উচ্চারণ করতে লাগল। তার

মনে হতো অন্য কোনো নাম এখানে মানাবে না। যদি সকলেই তার বিরোধী হয়ে থাকে, কী করা যাবে, কিন্তু এই নামটার হাত থেকে তো তারা সরে থাকতে পারবে না। রাজকুমারী ক্যারোলিন তো কেবল দলিলের কাগজপত্রেই থেকে যাবে। ঘোড়া তড়বড়িয়ে চলতে লাগল, কিন্তু 'হক্ হাইয়েন পলডার' কথাটা তার কানে বেজেই চলল। তার মনে এই নতুন বাঁধটা এমন বিপুল ও বিশাল রূপে দেখা দিল যে, মনে হল এটা যেন পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্য! সমগ্র বিশ্বে এর সঙ্গে আর-কিছুর তুলনা চলে না। তার সঙ্গে ঘোড়াটা নৃত্য করুক —এমন সে চাইল, কিন্তু তার মনে হল তার দেশবাসীরা সকলে তাকে যেন ঘিরে ধরেছে। একা সেই যেন সেই জনতার উপর মাথা তুলে দাঁড়িয়ে, তার চোখ ঐ ভিড়ের উপর দিয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগল, তার দৃষ্টি তীক্ষ্ণ কিন্তু দয়ার্দ্র।

বাঁধটা শেষ হবার পর তিন বছর কেটেছে। ঝড়ঝাপটা সবই এ সহ্য করেছে, মেরামতের খরচও খুব কম হয়েছে। উদ্ধার-করা নতুন জমি ফুলের গাছে ছেয়ে গেছে, ঐ ভূখণ্ড দিয়ে কেউ হেঁটে গেলে গ্রীষ্মকালের বাতাসের সঙ্গে সুমিষ্ট সুবাস তাকে আহ্লাদিত করে তোলে।

এখন এই পলডার বা উদ্ধার-করা জমি বিলি করার ব্যবস্থাটা পাকা ক'রে ফেলার সময় এসেছে। প্রথাগত নিয়ম অনুসারে এ বিষয়ে দলিলপত্রও তৈরি হয়ে গেল। বাজারে নতুন শেয়ার আসা মাত্রই হক্ নতুন শেয়ার নিয়ে নিল। কিন্তু ওল্ পিটার্স তিক্ততার সঙ্গেই কিছু নিতে অস্বীকার করল, এখানকার কোনো ভূমিখণ্ডেরই সে মালিক হল না। ভাগ-বাঁটোয়ারা পাকাপাকি হবার সময় দ্বন্দ্ব কলহ যা হবার তা হল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত একটা মীমাংসা হয়ে গেল। অবশেষে এমন যখন হল তখন এই তত্ত্বাবধায়কটি নির্বিঘ্নে আরও একটি বাধা অতিক্রম করতে পারল।

রয়াল সোসাইটির কিউরেটরগণ
মাননীয়েষু

১৮৩৩ সালে হ্যানোভার রাজ্যের অধিবাসীরা উদার নীতির শাসনতন্ত্রের জন্যে সংগ্রাম করে জিতেছিল। যখন নূতন রাজা, আর্নস্ট অগস্ট, সিংহাসনে বসলেন তখন তিনি এই "মৌলিক শাসনতান্ত্রিক আইন" বাতিল বলে ঘোষণা করলেন—এ ঘটনা ১৮৩৭ সালের ১লা নভেম্বরের। এটা বাতিল করায় যে

যুক্তি তিনি দেখালেন তা হচ্ছে এই যে, "রাজ-প্রতিনিধিদের ও আইনসভার সদস্যদের সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে" এই আইন চালু করা হয় নি, তার উপর রাজবংশের আত্মীয়দের এবং তার নিজের "সরকারী ক্ষমতা" লঙ্ঘন করা হয়েছে। তারপরে ১৮ নভেম্বর তারিখে গটিনজেন বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সাতজন অধ্যাপক এক প্রতিবাদপত্র বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কিউরেটরদের কাছে পাঠান। স্বাক্ষর-কারীদের আপত্তি সত্ত্বেও এই প্রতিবাদপত্র সংবাদপত্র সমূহে প্রকাশিত হয়, এবং বিদেশী পত্র-পত্রিকাও এই প্রতিবাদের সংবাদ প্রকাশ করেন। জার্মানীতে এ বিষয়ে সকলেই গভীরভাবে উদ্বিগ্ন হয় এই কথা জেনে যে একটা উদারনৈতিক আন্দোলনও দমন করা যেতে পারে। "গটিনজেনের সাতজনের" মধ্যে একজন ডালম্যান—এইরূপ মন্তব্য করেন: "এই ঘোষণা মূলত বিবেকের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, বিবেকের অধিকারের বিরুদ্ধে আপত্তি, বিবেকের যা করার অধিকার আছে এই রাজাদেশ তার বিরোধী, এবং তা মানতে সে রাজি নয়, সেই সঙ্গে এটা একটা রাজনৈতিক চাল মাত্র।" ১১ নভেম্বর ১৮৩৭ সাল তারিখের রাজার সিদ্ধান্ত অনুসারে ঐ সাতজন অধ্যাপকই বরখাস্ত হল—ড্যালম্যান, জ্যাকব গ্রীম ও গার্ভিনাস দেশ থেকে নির্বাসিত হন। ১৮৪৮ সালে ঐ সাতজনের প্রায় সকলেই ফ্রাঙ্কফুর্ট ন্যাশনাল অ্যাসেমব্লির সভ্য হয়েছিলেন।

গটিনজেন, ১৮ নভেম্বর ১৮৭৩

১ নভেম্বর তারিখে রাজা যে বিশেষ অধিকারপত্র প্রকাশ করেছেন সে সম্বন্ধে রয়াল ইউনিভার্সিটির কয়েক সদস্যের সবিনয় নিবেদন—

বিশেষ অধিকার সংক্রান্ত যে রাজাদেশ ১ নভেম্বর তারিখে ঘোষিত হয়েছে সে সম্বন্ধে স্বাক্ষরকারীরা বিনীত ভাবে জানাচ্ছেন যে, তাঁরা তাঁদের বিবেকের নির্দেশে ইউনিভার্সিটির কিউরেটরদের কাছে যথাযোগ্য সম্মানের সঙ্গে এই পত্র পাঠাতে বাধ্য হয়েছেন।

রাজা যে আদেশ দিয়েছেন সেই আদেশের প্রতি আমাদের যথেষ্ট সম্মান থাকা সত্ত্বেও, স্বাক্ষরকারীরা তাঁদের বিবেকের বিচারে এ কথা মেনে নিতে পারছেন না যে, এই দেশের মৌলিক শাসনতান্ত্রিক আইন অকেজো, এবং সেই-জন্যে বাতিল, কেননা স্বর্গত মাননীয় রাজা ঐ চুক্তিপত্রে সমগ্র সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ করেন নি, কিন্তু তাঁর ঘোষণায় আইনসভার অনেক প্রস্তাবেরও উল্লেখ করেন নি,

এমনকি এখন কিছু-কিছু সংশোধন যোগ করেছেন যা অনুমোদনের জন্যে ঘোষণার পূর্বে আইনসভাতে পেশই করা হয়নি। সর্বজনস্বীকৃত আইনের বিধান অনুসারে যা নেই তার দ্বারা যা যুক্তিযুক্ত তা খারিজ হয়ে যায় না। অনেক বিষয় উল্লিখিত হয়নি বলে যে আপত্তি জানানো হয়েছে তা কেবলমাত্র কয়েকটি স্বতন্ত্র বিষয়ের প্রতিই প্রযোজ্য, সমগ্র বিষয়টির ক্ষেত্রে তার বিন্দুমাত্র যোগ নেই, সুতরাং সামগ্রিকভাবে মৌলিক শাসনতান্ত্রিক আইনের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই। ঠিক এই নিয়মটিই প্রযোজ্য হবে, যদি শাসনতন্ত্রের কোনো সংশোধনের জন্য রাজপরিবারের অন্তর্গত ব্যক্তিদের সম্মতি থাকা চাই, এই চুক্তিতে ঐ আইন খারিজ করা হয় তাহলে রাজকীয় সুবিধাদির সেটা চরম বিপজ্জনক অবস্থা বলতে হবে। মূল শাসনতান্ত্রিক আইনে অনেক রাজকীয় সুবিধা দেওয়া হয়নি, এই রকম একটা কল্পিত ধারণার প্রসঙ্গেই যদি বলতে হয়, তাহলে এই বিনীত স্বাক্ষরকারীরা এরকম একটা কঠোর অভিযোগের মুখে এই কথা বলা ছাড়া গত্যন্তর দেখছেন না যে, ১৮৩৩ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর তারিখের বিশেষ অধিকার সংক্রান্ত রাজকীয় নির্দেশে রাজার বিশেষ অধিকার ও সুবিধা সংরক্ষণের জন্য একটি ধারা আছে, যেমন আছে জার্মান ফেডারেল আসেম্‌ব্লিতে। এই আইনসভাতে শাসনতান্ত্রিক আইন বিষয়ে আলোচনার সময় একটি কমিশন গঠিত হয়, উক্ত কমিশন এ ধরণের কোনো অভিযোগই আনেন নি। উপরন্তু ঐ এলাকার শাসনতান্ত্রিক আইন তার উদারতার ও সতর্কতার জন্য সারা জার্মানীতে প্রশংসিত হয়েছে। তাহলেই, এই বিনত স্বাক্ষরকারীরা এই ব্যাপারটির গুরুত্ব বিশেষভাবে বিবেচনা করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, এই শাসনতান্ত্রিক আইনের ধারা-উপধারা এবং এর প্রয়োগ বিধিসম্মত ; এবং তাঁরা এই আইনের আওতায় যাঁরা পড়ছেন তাঁদের পক্ষ থেকে কিছু বলার বা অনুসন্ধান করে দেখার সুযোগ না দিয়ে এ বিষয়ে প্রকাশিত রাজাজ্ঞার সঙ্গে একমত হতে পারছেন না। এ বিষয়ে রাজাজ্ঞা স্বীকার করে নেওয়া তাঁদের বিবেকের বিরুদ্ধাচরণ করা হবে বলে তাঁরা মনে করেন। তাঁরা সেইজন্যে এটা প্রকাশ্যে ঘোষণা করাই তাঁদের বিশেষ দায়িত্ব বলে মনে করেন, এবং এখন তাই করছেন যে, তাঁরা এই আইন সম্বন্ধে যে শপথ নিয়েছেন তার দ্বারা এখনো তাঁরা আবদ্ধ ; তাঁরা একথাও বলছেন যে, ব্যবস্থাপক সভার ডেপুটি নির্বাচনের ব্যবস্থা যদি এই আইনের ভিত্তিতে করা না হয় তাহলে তাঁরা ওই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবেন না। তাঁরা নির্বাচনও মেনে নেবেন না।

এবং, সর্বশেষ কথা এই যে, এই আইনের বিরুদ্ধাচরণ করে ব্যবস্থাপক-সভা গঠিত হলে তাঁরা তা আইনসিদ্ধ বলে স্বীকার করে নেবেন না।

এখানে যদিও রয়াল ইউনিভার্সিটির সদস্য বিনত স্বাক্ষরকারীরা স্বতন্ত্রভাবে তাঁদের নিজ-নিজ নাম উল্লেখ করছেন, তারা একথা সন্দেহাতীতভাবে জানিয়ে রাখতে চান যে, এ বিষয়ে তাঁরা তাঁদের সহকর্মীদের সঙ্গে একমত। কিন্তু অচিরেই সংঘর্ষ উপস্থিত হলে তাঁরা তাঁদের প্রত্যেকের মধ্যে দায়িত্ব কার কতটা তা ঘোষণা করতে বিলম্ব করবেন না। তাঁরা এ বিষয়ে নিশ্চিত যে, তাঁরা কর্মীরূপে আনুগত্যের সঙ্গে তাঁদের কর্তব্য কাজ করে যাচ্ছেন, তাঁরা ছাত্রদের রাজনৈতিক চরম পন্থা গ্রহণ থেকে বিরত থাকার জন্য তাদের সতর্ক করে দিয়েছেন; এবং তাঁদের ক্ষমতা অনুযায়ী তাঁরা তাঁদের দেশের গবর্নমেণ্টের প্রতি তাদের অনুগত থাকতে বলেছেন। তাঁদের এই প্রচেষ্টার সাফল্য শিক্ষক হিসাবে যতটা কার্যকর, তার চেয়ে বেশি কার্যকর তাঁদের ব্যক্তিগত ন্যায় নিষ্ঠার উপর। যখনই তাঁরা ছাত্রদের সম্মুখে যথেচ্ছ জুয়াখেলার খেলোয়াড় হিসেবে দাঁড়াবেন, তখনই তাঁদের সব প্রচেষ্টা ধূলিসাৎ হয়ে যাবে। যদি তেমন পরীক্ষার সময় আসে তখন সেইসব মানুষের রাজানুরক্তির ও তাদের আনুগত্যের উপর মহামান্য রাজা কতটা নির্ভর করতে পারবেন যারা নাকি বেপরোয়াভাবে নিজেদেরই পবিত্র শপথের বিরুদ্ধে যেতে পারে?

এফ. সি ডালমান, ই. অ্যালব্রেখ্‌ট,
জেকব গ্রীম, ভিলহেল্‌ম্‌ গ্রীম,
জি. জারভিনাস, এইচ. এওয়াল্‌ড্‌,
ভিলহেল্‌ম্‌ ওয়েবার।

কার্ল মার্কস

কার্ল মার্কস্ (১৮১৮-১৮৮৩) বার্লিনে ও বন্-এ পলিটিক্যাল সায়েন্স, দর্শন ও ইতিহাস অধ্যয়ন করেন। ১৮৪৩ সালে তিনি প্যারিসে চলে যান, এখানে তিনি ফ্রায়েডরিখ এঙ্গেলস-এর সঙ্গে একযোগে কাজ করতে আরম্ভ করেন। প্রাশিয়ার গবর্ণমেণ্টের অনুরোধে মার্কস্-কে তাঁর কমিউনিস্ট রচনাদির জন্যে প্যারিস থেকে বহিষ্কার করা হয়। তিনি ব্রাসেলস্-এ যান, ১৮৪৮ সালে এখান থেকেও তিনি বহিষ্কৃত হন। এর পর থেকেই তিনি

চরম দারিদ্র্যে লণ্ডনেই বেশির ভাগ কাটান। এখানে তিনি তাঁর বৈজ্ঞানিক-দার্শনিক গ্রন্থ "দাস কাপিটাল" লেখেন। এর প্রথম খণ্ড ১৮৫৬ সালে ইংরেজিতে প্রকাশিত হয় (জার্মান ভাষায় ১৮৬৭ সালে), পরবর্তী খণ্ডাদি বের হয় ১৮৮৫ ও ১৮৯৪ সালে। পাশ্চাত্য দেশের প্রায় প্রত্যেক রাষ্ট্রের মেহনতী মানুষের আন্দোলনের নেতাদের সঙ্গে তাঁর যোগ ছিল।

পুত্রের পত্র

তাঁর ইউনিভার্সিটির ছাত্রবস্থায় তাঁর পিতাকে একটি মাত্র চিঠিই এখনও পাওয়া যায়, তার অংশবিশেষ এখানে মুদ্রিত হল। ১৯ বৎসর বয়সে স্নাতক-পূর্ব কালে তিনি তাঁর অধ্যায়নের বিবরণ এতে দিয়েছেন। এই চিঠিতে মার্কস-এর কিছু মনের কথাও আছে ("জেনি" তাঁর বাগদত্তা বধূ তখন, পরে বিবাহিত বধূ হন—জেনি ফন ওয়েস্ট ফ্যালেন)। এই চিঠিতে তাঁর বুদ্ধি-বৃত্তির সূচনাও লক্ষ্য করা যায়, যথা—মননশীল আদর্শবাদের খণ্ডন এবং বিজ্ঞানভিত্তিক ও অভিজ্ঞতাপুষ্ট পৃথিবী সম্বন্ধে তাঁর একটা সুস্পষ্ট ধারণার অন্বেষণ।

বার্লিন, ১০ নভেম্বর ১৮৩৭

প্রিয় বাবা,

জীবনে এক-একটা সময় আছে, যখন সীমানার চিহ্নের মতন, অতীতকে তা আলাদা করে দেয়, এবং নিশ্চিত রূপেই একটা নূতন দিকের নির্দেশ দিয়ে থাকে।

এই রকম পরিবর্তনের মুখে আমরা, যাকে বলা যায় ঈগলের মতন চোখ, মনের সেই তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে অতীত ও বর্তমানকে পর্যালোচনা করে দেখার আগ্রহ বোধ করি, এবং এই ভাবেই প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে সম্যক্ ভাবে ওয়াকিবহাল হতে চাই। বস্তুত পক্ষে পৃথিবীর ইতিহাসও অতীতের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে চায়, এবং আত্মচিন্তাও করতে চায়, এতে অনেক সময় মনে হয় যে, তা বুঝি আবার পিছন দিকে যাত্রা করেছে বা স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তখন সে আরামকেদারায় গা এলিয়ে ব'সে নিজেকে বুঝবার চেষ্টা করছে, এবং নিজের কাজের বিচার করার চেষ্টা করছে বুদ্ধি দিয়ে মেধা দিয়ে বিচারশক্তি দিয়ে, বিশেষ করে যেন বিচার দেখার চেষ্টা করছে তার বিচারবুদ্ধিরই।

সেই সময়ে স্বতন্ত্রভাবে সকলে গীতিকাব্য রচনার দ্বারা বড় হবার চেষ্টায় হয়তো ব্যাপৃত। কেননা, সব রূপান্তরই অন্তিম সংগীতেরই একটা অংশ, এবং সেই কবিতার প্রস্তাবনারও অংশ যে-কবিতা অপরূপ অপূর্বতার মধ্যে থেকে ঠিক উপযুক্ত বর্ণসুষমাটি বেছে নেবার জন্য প্রবল চেষ্টা করে চলেছে, হয়তো সেই বর্ণ খুব স্পষ্ট করে দেখা যাচ্ছে না। যাই হোক, আমাদের অতীতের অভিজ্ঞতার স্মারকচিহ্ন আমরা রেখে যেতে চাই; আমাদের কাজের দ্বারা আমরা যে চেতনা ও উত্তেজনা হারিয়েছি ঐ অভিজ্ঞতাই সেই শূন্যস্থান পূর্ণ করে দিতে পারে। এবং মাতাপিতার হৃদয়ের মতন এমন ভালো আশ্রয়স্থল আর কোথায়?—যে হৃদয় হচ্ছে সবচেয়ে শান্ত বিচারক, সবচেয়ে আন্তরিক সহানুভূতিপ্রবণ, এবং যা হচ্ছে স্নেহেরই সূর্য যার রশ্মি আমাদের সব রকম প্রচেষ্টার একেবারে গভীর অতলে গিয়ে তা উত্তপ্ত করে তোলে। অবস্থার চাপে পড়েই এমন কাজ করে ফেলেছে, কোনো আপত্তিকর বা দূষনীয় কাজের জন্যে ক্ষমা পাওয়ার বা সেই অপরাধের হাত থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্যে এর চেয়ে ভালো যুক্তি আর কোথায় আছে? দৈবাৎ তার কোনো প্রতিকূল কাজের জন্য বা তার কোনো ভুলের জন্যে একজন মানুষ সত্যি সত্যি দুষ্ট-প্রকৃতির বলে যে চিহ্নিত হয়ে যায় না, তার কারণ এই।

তাহলেই এখন যদি, আমার এখানে একটি বছর কাটাবার পর, আমি পিছন ফিরে তাকিয়ে সমগ্র পরিস্থিতির উপর নজর দিই, এবং সেই ভাবেই তোমার সহৃদয় চিঠির উত্তর দিই, তাহলে সাধারণভাবে আমি জীবন সম্বন্ধে যে ধারণা পোষণ করি আমার সমগ্র অবস্থাটি সম্বন্ধেও সেই ধারণা পোষণ করায় তুমি হয়তো আপত্তি করবে না। আমি বলতে চাই আমার মনের বিভিন্ন কর্মোদ্যমের কথা, সর্বক্ষেত্রেই তা বিশেষ একটি ধারণা গড়ে নিতে পেরেছে—জ্ঞানচর্চায়, শিল্পে বা ব্যক্তিগত ব্যাপারে।

তোমাকে ছেড়ে আসার পর একটি নূতন পৃথিবী আমার সম্মুখে উপস্থিত হয়েছে, সেটা হচ্ছে ভালোবাসার পৃথিবী; প্রথমে এটা ছিল প্রত্যাশার ও ব্যর্থ ভালোবাসার আবহাওয়া। এমনকি বার্লিনের পথে যে-যাত্রা আমি খুবই উপভোগ করতাম, প্রকৃতির প্রতি আমার আকর্ষণকে যে-যাত্রা আরও প্রবল করে তুলত এবং জীবনের প্রতি ভালোবাসাকে প্রদীপ্ত করে তুলত, তা-ই আমাকে নিরুত্তাপ ও নির্বিকার করে রেখেছিল। সত্যিই, আমি এমনই ভগ্নোদ্যম হয়ে পড়েছিলাম যে আমার মনের সব আবেগ-উত্তেজনার মতন

অমন রুক্ষ ও অত কঠোর বোধ হয় ঐ পাহাড়গুলোও ছিল না বলে আমার মনে হত। বড়-বড় শহরগুলোও যেন আমার শিরার শোণিতের মতন চঞ্চল ও চলমান ছিল না; আমার কল্পনায় আমি যে গুরুভার বহন করতাম, সরাইখানার যেন অমন কোলাহল মুখর ও অসহনীয় ছিল না। এবং শেষ কথা এই, শিল্পও যেন সুন্দর ছিল না জেনির মত। বার্লিনে এসে পৌঁছনো মাত্র আমি আমার আগের সব যোগাযোগ ছিন্ন করে ফেললাম, ইচ্ছার বিরুদ্ধেই মাঝে মাঝে কারো-কারো সঙ্গে করতাম, এবং শিল্প ও বিজ্ঞানের সঙ্গে আত্মমগ্ন হয়ে থাকতাম।

আমার আইন-বিষয়ক বৃত্তি সংক্রান্ত বিষয়ে এইটুকু বলতে পারি যে আমি এখানে সম্প্রতি সিনডথানার নামক জনৈক অ্যাসেসরের সঙ্গে পরিচিত হয়েছি, তিনি আমাকে উপদেশ দিয়েছেন যে, আইনের তৃতীয় পরীক্ষা দেবার পর আমি যেন অ্যাসেসরের কাজ গ্রহণ করি, এই কাজ আমার মনোমতই হবে কেননা, অন্য সব রকম প্রশাসনিক বিজ্ঞানের চেয়ে আইনই আমার সবচেয়ে ভালো লাগে। ঐ ভদ্রলোক আমাকে বললেন যে, তিনি এবং আরও অনেকে ওয়েস্টফালিয়ার মুনস্টারের প্রাদেশিক আদালতে যোগ দিয়ে তিন বছরের মধ্যে অ্যাসেসর পদে উন্নীত হতে পেরেছেন, খেটে কাজ করলে এভাবে উন্নতি করা নাকি কঠিন নয়। বার্লিনে বা অন্যান্য জায়গায় এসব ব্যাপারে যেমন কড়াকড়ি আছে এখানে নাকি তেমন নেই। কেউ যদি অ্যাসেসর পরীক্ষা পাশ করে পরে স্নাতক হয়, তাহলে অবিলম্বে ইউনিভার্সিটির লেকচারার হওয়ার সুযোগ নাকি অনেক বেশি; যেমন হয়েছেন হের্ গার্টনার বন-এ, তিনি প্রাদেশিক আইনের সাধারণ একটা বই লিখেছেন, তাছাড়া তিনি আইনবিজ্ঞানে হেগেলিয়ান মতাবলম্বীদের দলের বলে পরিচিত। সে যাই হোক, শ্রদ্ধেয় বাবা, এসব বিষয় কি তোমার সঙ্গে সামনাসামনি আলোচনা করা যাবে না? এডুয়ার্ডের অবস্থা, আমার স্নেহময়ী মাতৃদেবীর অসুখ, তোমার নিজের অসুস্থতা—আশা করি এই অসুস্থতা গুরুতর নয়—এইসব মিলে আমার ইচ্ছে হচ্ছে, কেবল ইচ্ছে হওয়া কেন, আমার যেন মনে হচ্ছে, এটা অতি জরুরি যে, আমি অবিলম্বে ঘরে ফিরে যাই। তোমার অনুমতি ও তোমার সমর্থন সম্বন্ধে আমার মনে যদি কোনো সংশয় না থাকত তাহলে আমাকে এতক্ষণে ওখানেই দেখতে।

আমাকে বিশ্বাস করো, বাবা, আমার মনে কোনো স্বার্থের মতলব নেই

(যদিও জেনিকে আবার দেখতে পেলে আমার আনন্দের সীমা থাকবে না), কিন্তু আমার মনে এমন-একটা চিন্তা এসে আমাকে পীড়ন করছে যে চিন্তার বিষয়টি আমি এখন প্রকাশ করব না। কোনো কোনো দিক থেকে বিচার করতে গেলে এটা আমার পক্ষে বিপজ্জনক পদক্ষেপই হবে বটে, কিন্তু আমার প্রিয় জেনিই যেমন লিখেছে, আমাকে যেসব পবিত্র কর্তব্য সাধন করতে হবে তার কাছে ওসব বিচার বিবেচনার কোনো দাম নেই।

আমি তোমাকে সনির্বন্ধ অনুরোধ করছি, বাবা, তুমি যা'ই মনে করে থাকো, আমার এই চিঠি বা চিঠির এই পাতাটা আমার মহীয়সী মাতৃদেবীকে দেখিয়ো না। হঠাৎ আমি যদি গিয়ে উপস্থিত হই, তাহলে মাননীয়া মহিলা স্বস্তিই বোধ করবেন।

মাকে আমি যে চিঠি দিই সে-চিঠি জেনির কাছ থেকে পাওয়া সহৃদয় কয়েকটি ছত্রের অনেক আগে লেখা। হয়তো আমি অসাবধানে সামান্য ও তুচ্ছ ব্যাপার নিয়েই অনেক কথা লিখে ফেলেছি।

আশা করি আমাদের পরিবারের উপর অন্ধকার ক'রে যে-মেঘ জমে উঠেছে তা কেটে যাবে ; আমি তোমাদের সঙ্গে একত্র হয়ে সব কষ্ট ভোগ করতে ও চোখের জল ফেলতে পারব ; এবং তোমার সান্নিধ্যে থেকে প্রমাণ করতে পারব আমার গভীর ও আন্তরিক সহানুভূতি ও আমার প্রগাঢ় ভালো-বাসা—অনেক সময় আমি যা বিশ্রীভাবে প্রকাশ করে থাকি। এবং আরও আশা করি, আমার শ্রদ্ধেয় ও স্নেহশীল বাবা, আমার যে-মন অনবরত এদিকে আর ওদিকে টানাপোড়েন করছে তাকে বুঝতে পারবে, এবং যে হৃদয়টি সংগ্রামের আবেগে মগ্ন সেই সর্বদা ভ্রান্তিশীল হৃদয়কে মার্জনা করবে। আশা করি ইতিমধ্যে তুমি সম্পূর্ণ সেরে উঠেছ, এবং আমি তোমাকে নিবিড়ভাবে আলিঙ্গন করে ধরতে পারব আর আমার মনের সব কথা তোমার কাছে উজাড় করে দিতে পারব।

তোমার স্নেহধন্য

কার্ল

আমার এই অস্পষ্ট হাতের লেখার ও বিশ্রী ভাষার ভঙ্গির জন্যে আমাকে ক্ষমা কোরো, বাবা। এখন প্রায় চারটে বাজে, মোমবাতি সম্পূর্ণ জ্বলে গলে গিয়েছে, আমার চোখও ঝাপসা হয়ে এসেছে। আমার মধ্যে একটা অস্থিরতা

এসে গিয়েছে। আমার মন যে এত উন্মত্ত হয়ে উঠেছে, তোমার ও আমার সব প্রিয়জনের কাছে না যাওয়া পর্যন্ত আমি তাকে শান্ত করতে পারব না।

অনুগ্রহ করে মমতাময়ী জেনিকে আমার ভালোবাসা জানিয়ো। ইতিমধ্যে অজস্রবার আমি তার চিঠিটা পড়েছি, আর ওর মধ্যেই নূতন নূতন মোহিনী শক্তি যেন আবিষ্কার করেছি। সব দিক থেকেই, এমনকি স্টাইলেও, একটি মেয়ের লেখা এমন সুন্দর চিঠি আর হতে পারে বলে মনে হয় না।

কমিউনিস্ট পার্টির ম্যানিফেস্টো

১৮৪৭ সালে লণ্ডনের "লীগ অব্ জাস্ট" (পরে "কমিউনিস্ট পার্টি") কমিউনিস্ট কার্যপ্রণালীর একটি ইস্তাহারের খসড়া করার জন্য কার্ল মার্কস্ ও ফ্রায়েডরিখ এঙ্গেলস্-এর উপরে ভার দেন। একটি রাজনৈতিক ইস্তাহাররূপে ১৮৪৮ সালে অনেক ভাষায় প্রকাশিত হয় এই "কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো"। ১৮৪৮-এর বিপ্লবের উপর এর কিন্তু কোনো প্রভাব পড়ে না। এই ম্যানিফেস্টো আন্তর্জাতিক বিপ্লবের প্রণালীর খুব লাগসই একটা ব্যাখ্যা দেয়, এবং ঐতিহাসিক বস্তুতন্ত্রবাদের নানাবিধ মৌলিক তত্ত্বের ব্যাখ্যাও দেয়, যার নাম পরে হল "মার্কসিজ্‌ম্"। হেগেলের আমলের দর্শন থেকে মার্কস্ আরম্ভ করেন, জার্মানীর আদর্শবাদী আমলের শেষপর্ব থেকে এই দর্শনের সূত্রপাত। কিন্তু হেগলের আদর্শবাদী মতবাদ থেকে মার্কস্ সরে এলেন, তার উপর পৃথিবীর ইতিহাসের ব্যাখ্যানও তিনি যেভাবে করলেন তাতে সবই বস্তুতন্ত্রবাদের ধারণাতেই কল্পিত হল। ঐতিহাসিক ঘাতপ্রতিঘাত তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানাদি করেছেন বলে তিনি দাবী করলেন, এবং ভবিষ্যতে ইতিহাসের গতি কোন্ দিকে যাবে তাও বলতে পারবেন বলে জানালেন। মার্কসিজম্ মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থাকেই তার জীবনের ও তার চিন্তার মূল বলে ধার্য করল, এবং এইটেই ইতিহাসের কার্যকর শক্তি বলে স্থির করল। মার্কস-এর মতে ইতিহাস হচ্ছে শ্রেণীসংগ্রামেরই ইতিহাস, বর্তমান যুগের মধ্যবিত্ত পুঁজিবাদীদের শিল্প-সম্প্রসারিত সমাজে সেই সংগ্রাম চরম অবস্থায় এসে পৌঁছেছে। শ্রমিকরা সরাসরি নিজের জন্য শ্রম করে না, মজুরির বিনিময়ে সে তার শ্রম বিক্রি করে কারখানা-মালিকদের কাছে যারা নাকি উৎপাদনের সবটারই মালিক। শ্রমিক নিজে যতটা ভোগ করতে পারে সে তার চেয়ে বেশী উৎপাদন করে, এই ভাবেই এসে যায় সেই তথাকথিত "উদ্বৃত্ত মূল্য"—সারপ্লাস ভ্যালু। কারখানা-মালিক এইটেই আত্মসাৎ করে নিজের লাভ

ব'লে। এইভাবেই মূলধন পুঞ্জীভূত হয় এবং কয়েকজন ধনীর হাতে তা জমে ওঠে ; ওদিকে নির্ভরশীল সেই শোষিতদের সংখ্যা বেড়ে চলে, এবং শোচনীয় অস্তিত্ব নিয়ে তারা মজতুর, বা যাকে বলা হয় "প্রোলেটারিয়েট", সেই হিসাবে জীবন ধারণ করে। উত্তেজনা অসহনীয় হয়ে ওঠে, তার ফলে দেখা দেয় শ্রমিক-বিপ্লব, এর দরুণ উৎপাদন হয়ে ওঠে সাধারণ সম্পত্তি, এবং এ'তে শোষক ও শোষিতের মধ্যের পার্থক্য ঘুচে যায়। এর পরিণাম হচ্ছে সমাজ-তান্ত্রিক সমাজের আদল, সব বাধাবিপত্তি দূর করে এবং বিশ্বময় তা ছড়িয়ে গিয়ে সেই প্রত্যাশিত স্থায়ী ও চূড়ান্ত অবস্থা যা এনে দেবে তাই হচ্ছে কমিউনিজম্, যখন সর্বত্র বিরাজ করবে শান্তি ও ন্যায়বিচার।

মার্কস তাঁর নিজের দর্শন দিয়ে পৃথিবীর গতির ব্যাখ্যান করতে চান নি, তা তাঁর লক্ষ্য ছিল না, তিনি চেয়েছিলেন এই গতি পরিবর্তন করতে। এই পরিবর্তন এসেছে। এর মধ্যে এক-চোখো নীতি ও ভুল ভবিষ্যদ্বাণী থাকা সত্ত্বেও, মার্কসিজমের মধ্যে এমন অনেক ন্যায্য তত্ত্ব আছে ও প্রমাণ আছে, যা আমাদের বর্তমান বিশ্বের অনেক রাজনৈতিক সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা বিশ্লেষণে সাহায্য করবে।

উদ্ধৃতি, ১৮৪৮*

সারা ইউরোপে যেন প্রেতের হানাহানি চলেছে—এটা হচ্ছে কমিউনিজমের ভূত। এই ভূত ছাড়ার জন্যে পুরাতন ইউরোপের সব শক্তি এক পবিত্র আঁতাতে মিলেছে পোপ ও জার, মেটারনিখ ও গুয়িৎসোট, ফরাসী বিপ্লবী ও জার্মান পুলিশের গোয়েন্দা।

বিরোধী এমন কোন্ দল আছে যাকে ক্ষমতায় আসীন শক্তি কমিউনিস্ট-ধর্মী বলে নিন্দা না করেছে? কোন্ প্রগতিশীল বিপক্ষ দলকে এবং সেইসঙ্গে কোন্ প্রতিক্রিয়াশীল বিপক্ষ দলকে এই বিরোধী দলটি কমিউনিস্ট বলে ভৎ'সনার প্রবল প্রতিবাদ করেছে?

এই ঘটনা থেকে দুটি প্রত্যক্ষ ফল পাওয়া যাচ্ছে :

১. কমিউনিজমকে পৃথক একটি শক্তি রূপে ইউরোপের সমস্ত শক্তিই স্বীকার করে নিয়েছে ;

---

* জার্মান ভাষায় সর্বপ্রথম লণ্ডনে মুদ্রিত। সেই বছর ফরাসী ও পোলিশ অনুবাদ প্রকাশিত হয়, দুই বছর পরে ইংরেজি অনুবাদ, এবং রুশ ভাষায় একটিমাত্র অনুবাদ বারো বছরেরও বেশী পরে।

২. এখনই উপযুক্ত সময় যখন কমিউনিস্টরা খোলাখুলিভাবে সারা বিশ্বের জ্ঞাতার্থে তাদের অভিমত তাদের লক্ষ্য তাদের ঝোঁক প্রকাশ করে দেবে ; এবং পার্টির একটি ইস্তাহারে কমিউনিজম্ সম্বন্ধে ছেলেভুলানো এই ভুতুড়ে গল্পের জবাব দেবে।

এই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন রাষ্ট্রের কমিউনিস্টরা লণ্ডনে এসে জমায়েত হয়েছেন, এবং নিম্নোদ্ধৃত এই ইস্তাহারের খসড়া তৈরি করেছেন, এটি ইংরেজী ফরাসী জার্মান ইতালীয়ান ফ্লেমিশ ও দিনেমার ভাষায় প্রকাশ করা হবে।

সব সমাজের অস্তিত্বের ইতিহাস হচ্ছে শ্রেণীসংগ্রামের ইতিহাস।

মুক্তমানুষ ও ক্রীতদাস, সম্ভ্রান্তব্যক্তি ও সাধারণ মানুষ, ভূম্যাধিকারী ও ভূমিদাস, সমাজের অধিপতি ও দিনমজুর—এক কথায় উৎপীড়ক ও উৎপীড়িত সদাসর্বদা পরস্পরের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে আছে, এবং কখনো গোপনে কখনো-বা খোলাখুলি ভাবে নির্বাধ সংগ্রাম করে চলেছে ; এই সংগ্রাম প্রত্যেকবারই শেষ হয়েছে সমাজের এক বৈপ্লবিক পুনর্বিন্যাসে অথবা বিবদমান দুই পক্ষেরই সর্বনাশে।

জায়গীরদার-প্রথার যে ধ্বংসাবশেষ থেকে বর্তমান কালের মধ্যবিত্ত সমাজ গড়ে উঠেছে সেই সমাজও শ্রেণীশত্রুতা থেকে এখনও মুক্ত হতে পারেনি। এখন নূতন শ্রেণীর সৃষ্টি করা হয়েছে, উৎপীড়নের নূতন ব্যবস্থা করা হয়েছে, এবং পুরাতন পদ্ধতির জায়গায় সংগ্রামের নূতন পদ্ধতি আনা হয়েছে।

আমাদের এই যুগ, এই মধ্যবিত্তের যুগ, একটি অতি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ লক্ষণে স্পষ্ট, সেটা হচ্ছে এই যে, শ্রেণীশত্রুতাকে একটু সহজ করে নেওয়া হয়েছে এই যুগে। সমগ্র সমাজ ক্রমে ক্রমে দুইটি বৃহৎ পারস্পরিক শত্রুতায় বিভক্ত হচ্ছে, দুইটি শ্রেণীতে ভাগ হচ্ছে যারা সোজাসুজিভাবে পরস্পরের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। এই দুই পক্ষ হচ্ছে : মধ্যবিত্ত ও মজদুর।

আধুনিক রাষ্ট্রের ব্যবস্থাপক হচ্ছে একটি কমিটি মাত্র, যার কাজ হচ্ছে সমগ্র মধ্যবিত্তের যাবতীয় বিষয়ের তদারকী করা।

ইতিহাস থেকে জানা যায়, এই মধ্যবিত্ত সমাজ অনেক বৈপ্লবিক ব্যাপারে অংশ নিয়েছে।

এই মধ্যবিত্তেরা যখনই সুযোগ পেয়েছে তখনই জমিদারীর ও গোষ্ঠীপতির সঙ্গে মধুর সম্পর্ক ছিন্ন করে ফেলেছে। "প্রাকৃতিক ভাবে শ্রেষ্ঠ বলে নির্ধারিত" এই ভাবে মানুষের সঙ্গে যে সম্পর্ক সেই জাঁকজমকপূর্ণ জমিদারী বন্ধন তারা

নির্মমভাবে ছিঁড়ে ছত্রখান করে দিয়েছে, এবং মানুষে-মানুষে এখন আর কোনো যোগসূত্রই রাখেনি, অবশ্য একটি যোগ ছাড়া, তা হচ্ছে নগ্ন স্বার্থবোধ ও "নগদ বিদায়।" ধর্মের আগ্রহ নিয়ে স্বর্গীয় উল্লাসের ইতি করেছে এরা, বীরত্বব্যঞ্জক কোনো উদ্যম, বা অশালীন ভাবপ্রবণতাও এরা আর রাখেনি, নিজের স্বার্থসিদ্ধির দিকে নজর রেখে তারই ঠাণ্ডাজলে যেন এসব সমাধিস্থ করেছে। বিনিময়মূল্য কি রকম তার উপর এরা স্থির করে ব্যক্তিগত মর্যাদা, এবং সনদের দ্বারা নির্ধারিত অসংখ্য ও অকাট্য স্বাধীনতার জায়গায় স্থাপন করেছে একটিমাত্র বিবেকবর্জিত স্বাধীনতা, তার নাম—ফ্রী ট্রেড। এক কথায়, শোষণের এবং তা ধর্মের ও রাজনীতির ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন করে শোষণের, পরিবর্তে নূতন পন্থা এরা নিয়েছে—তা হচ্ছে একেবারে নগ্ন, একেবারে নির্লজ্জ এবং একেবারেই নির্মম।

মধ্যবিত্তেরা পৃথিবীর বাজারে তাদের শোষণ-ক্রিয়ার জন্যে সব দেশেই উৎপাদনের ও উৎপাদিত দ্রব্যের ব্যবহারের একটা বিশ্বজনীন চেহারা দিয়েছে।

সব দেশকেই এরা বাধ্য করে, উৎপাদনে মধ্যবিত্ত পন্থা অবলম্বনের জন্যে। ভয় দেখায়, তা না হলে তাদের সর্বনাশ হবে। যাকে এরা সভ্যতা বলে সেই জিনিস সবার মধ্যে চালু করার জন্যে সকলকে এরা বাধ্য করে; অর্থাৎ সকলকেই এরা মধ্যবিত্ত হবার জন্যে প্ররোচনা দেয়। এক কথায় নিজের ভাবাদর্শেই এরা একটা বিশ্ব গড়ে নেয়।

মধ্যবিত্তেরা তাদের শ-খানেক বছরের এই রাজত্বের মধ্যেই উৎপাদনের ক্ষেত্রে এমন-একটা ভীষণ শক্তি গড়ে তুলেছে যা তাদের আগের কয়েক পুরুষে কাজ একত্র করলেও এর ধারে-কাছে আসতে পারে না। মানুষের ও যন্ত্রের বশ্যতায় আনা হল প্রকৃতির আপন শক্তিকে, শিল্পে ও কৃষিতে ব্যবহার করা হতে লাগল রাসায়নিক দ্রব্য, বাষ্পে চালিত হল জাহাজ, রেলগাড়ি, ইলেক্‌ট্রিক টেলিগ্রাফ, চাষবাসের জন্যে মহাদেশ-কে-মহাদেশ পরিষ্কার করা, নদীতে খাল কাটা, ভূমি থেকে জনমণ্ডলীকে জাদুমন্ত্রের দ্বারাই যেন উচ্ছেদ করা—উৎপাদনের এত রকমের শক্তি যে সামাজিক মানুষের মধ্যেই নিদ্রিত আছে, পূর্ববর্তী শতক এটা অমঙ্গলজনক চিন্তা বলেই কি মনে করত না?...

যে অস্ত্র দিয়ে মধ্যবিত্তেরা জায়গীরদারী প্রথা মাটিতে পতিত করেছিল, সেই অস্ত্রই এখন উদ্যত হয়েছে মধ্যবিত্তেরই বিরুদ্ধে।

কিন্তু তাদের মৃত্যু ঘটাতে পারে এমন অস্ত্রই কেবল মধ্যবিত্তেরা তৈরি করেনি, ঐ অস্ত্র ব্যবহার করতে পারে এমন মানুষও তারা তৈরি করেছে, এই মানুষেরা হচ্ছে একালের মেহনতী মানুষ, এরা হচ্ছে ঐ মজদুর।

যে অনুপাতে বুর্জোয়া বা মধ্যবিত্ত বাড়ছে, সেই অনুপাতেই বাড়ছে এই মজদুর—এই মেহনতী মানুষ; যতক্ষণ তারা কাজ পায় ততক্ষণই তারা বাঁচতে পারে, তারা কাজ পায় ততক্ষণই যতক্ষণ তাদের শ্রম বাড়িয়ে চলতে পারে মূলধন।

ব্যাপক ভাবে যন্ত্রের ব্যবহারের দরুণ এবং শ্রমের নানা বিভাগে বিভক্তি-করণের দরুণ, সব মজদুরই তাদের কাজের সব বৈশিষ্ট্যই হারিয়েছে, তার ফলে তাদের সেই কাজে আর তেমন মোহ নেই। তারা এখন যন্ত্রেরই একটা আনুষঙ্গিক জিনিস হয়ে দাঁড়িয়েছে; এবং এইজন্যে অতি সহজ খুবই একঘেয়ে ও সামান্য যোগ্যতা তাদের থাকলেই হল।

এই মজদুররা অগ্রগতির অনেকগুলি ধাপ পেরিয়ে যায়। তার জন্মের সঙ্গে সঙ্গে তার সংগ্রাম আরম্ভ হয় মধ্যবিত্তের সঙ্গে। প্রথমে এই দ্বন্দ্ব চালিয়ে যায় শ্রমিকরা ব্যক্তিগত ভাবে, তার পর কারখানায় নিযুক্ত শ্রমিকরা একত্র হয়ে, তার পর এক-একটি এলাকায় এক-একটি প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকরা সংগ্রাম করে সেই মধ্যবিত্ত মানুষটির সঙ্গে যে তাদের শোষণ করছে।

কখনো-কখনো শ্রমিকদের জয় হয়, কিন্তু সেটা সাময়িক জয় মাত্র। তাদের সংগ্রামের আসল ফল তাৎক্ষণিক ফলাফলের উপর নির্ভর করে না, নির্ভর করে তাদের ক্রমবর্ধমান ইউনিয়নের শ্রমিকদের উপর। আধুনিক যন্ত্রযুগের সৃষ্ট নানাবিধ যোগাযোগের উন্নত ব্যবস্থায় ইউনিয়নের অনেক সাহায্য হয়, এর দ্বারা বিভিন্ন স্থানের শ্রমিকরা নিজেদের মধ্যে সংযোগ রাখতে পারে। অগণিত স্থানিক সংগ্রামকে কেন্দ্রীভূত করার জন্যে এই রকম সংযোগের ব্যবস্থাই দরকার, একই ধরণের সংগ্রামকে এ'তে শ্রেণীতে-শ্রেণীতে একটা জাতীয়-সংগ্রামের রূপ দেওয়া যায়...

"ভয়ংকর শ্রেণী", যাকে বলা হয় সামাজিক গাঁজলা, পুরাতন সমাজের সর্বনিম্ন শ্রেণী যেসব নিষ্কর্মা জনতাকে ফেলে রেখে গিয়েছে, সেই শ্রেণী এখানে-ওখানে এই মজদুরদের সংগ্রামের সঙ্গে লিপ্ত হয়ে যেতে পারে; আবার এদের জীবন যে অবস্থায় পড়ে আছে তাতে এরা প্রতিক্রিয়াশীলদের কাছ থেকে ঘুষ খেয়ে তাদের হাতের পুতুলও হয়ে যেতে পারে।

মজদুররা যে অবস্থায় আছে, ঠিক সেই অবস্থায় পুরাতন সমাজের মানুষেরা বলতে গেলে একেবারে ডুবে গেছে। মজদুরেরা কোনো সম্পত্তির অধিকারী নয়; এদের স্ত্রীর সঙ্গে বা এদের সন্তানদের সঙ্গে এদের যা সম্পর্ক, মধ্যবিত্তদের পারিবারিক সম্পর্কের সঙ্গে তার কোনো মিল নেই। আধুনিক যন্ত্রশিল্পের শ্রমিক, মূলধনের কাছে একালের পরাধীনতা ইংলণ্ডেও যেমন ফ্রান্সেও তেমন, আমেরিকাতে বা জার্মানীতেও তেমন—এ'তে শ্রমিকদের জাতীয় চরিত্র বলতে কিছু রাখেনি। এদের কাছে আইন ধর্ম বা নৈতিক চরিত্র—সবই হচ্ছে মধ্যবিত্তদের একটা সংস্কার মাত্র, এর পিছনে লুকিয়ে আছে মধ্যবিত্তদের নানাবিধ মতলব...

তার সব শ্রেণী-বিভাগ ও শ্রেণী-শত্রুতা সহ মধ্যবিত্ত সমাজের স্থলে আমরা চাইব একটি সংঘ যার মধ্যে প্রত্যেকের স্বাধীন উন্নতির শর্ত হচ্ছে সকলের স্বাধীন উন্নতি···

তাদের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য গোপন করাটা কমিউনিস্টরা ঘৃণা করে। তারা খোলাখুলি ভাবে ঘোষণা করছে যে, যে-সামাজিক অবস্থা এখন বহাল আছে বলপ্রয়োগের দ্বারা তা উচ্ছেদ করাই হচ্ছে তাদের লক্ষ্য। কমিউনিস্টদের বিপ্লবে শাসনশ্রেণী কম্পিত হয়ে উঠুক, এইটেই তাদের অভিপ্রেত। তাদের শৃঙ্খল ছাড়া আর-কিছুই খোয়া যাবার মতন কিছু নেই মজদুরদের। বিশ্বজয় তাদের করতে হবে।

সব দেশের মজদুরেরা এক হও

হারমান শুলৎসে-ডেলিটৎস

সামাজিক অধিকার ও কর্তব্য

হারমান শুলৎসে-ডেলিটৎস (১৮০৮-১৮৮৩) তাঁর রচনার মধ্য দিয়ে ব্যবসায়ী মধ্যবিত্তশ্রেণীর সামাজিক অবস্থার উন্নতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য সাধন করেছেন। ১৮৫০ সালে তিনি প্রথম ঋণদান-সমবায় প্রতিষ্ঠা করেন, সমবায়-আন্দোলনে এখনও এই প্রতিষ্ঠানটি এখনও বিশেষ উল্লেখযোগ্য অংশ গ্রহণ করে চলেছে। ১৮৫৯ সালে তিনি নানাবিধ সমবায় প্রতিষ্ঠানকে একত্র করে একটা সংঘবদ্ধ প্রতিষ্ঠান গঠন করেন, তার নাম "জেনারেল অ্যাসোসিয়েশন অব্ দি জার্মান কমারশিয়াল অ্যাণ্ড্ ট্রেডস্ কো-

অপারেটিভ্‌স্‌।" এর মূল উদ্দেশ্য ছিল এই যে, শৃঙ্খলাবদ্ধ সম্প্রদায়ের প্রত্যেকে যাতে পরস্পরের সাহায্যে এসে সকলের অবস্থা একটু সহজ করে তুলতে পারে। ইনি শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহের সমবায় প্রতিষ্ঠার কথাও ভেবেছিলেন, যাতে এর সব সদস্যই লভাংশ ভাগাভাগি করে নিতে পারে, এবং রাষ্ট্রের সাহায্য ছাড়াই চলতে পারে। এ কথা উল্লেখ করা দরকার যে তিনি মার্ক্‌স্‌বাদীদের দ্বারা প্রভাবান্বিত ছিলেন না ; এটা স্পষ্ট বোঝা যায় তার বক্তৃতা "সোস্যাল রাইট্‌স্‌ অ্যাণ্ড ডিউটিজ" (১৮৬৬) থেকে। এখানে, তাঁর বক্তব্যের মূলে আছে রাষ্ট্র ও সমাজের প্রতি তাঁর গঠনমূলক মনোভাব।

বার্লিনে বক্তৃতা ১৮৬৬

উপর-উপর থেকে যা মনে হয় প্রকৃতপক্ষে ব্যাপারটি তা নয়। আমাদের কালের যত দ্বন্দ্ব তা সামাজিক প্রশ্ন নিয়ে তত নয় যতটা প্রধানত রাজনৈতিক প্রশ্ন নিয়েই। যাই হোক, বিভিন্ন জাতির জাতীয়-উন্নতির জন্যে প্রত্যেক জাতির উপর যে রাজনৈতিক চাপ দেওয়া হচ্ছে, ততই এসব ব্যাপারের যে মৌলিক উপাদান, অর্থাৎ মানুষ, তারই বাঁচবার অধিকারটাই এই রাজনৈতিক তৎপরতায় প্রধান ও মুখ্য লক্ষ্য হয়ে দাঁড়াচ্ছে ; এবং এই অধিকার অর্জনের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলি মূল লক্ষ্যে পৌঁছবার একটা উপায় মাত্র। তাহলেই আমাদের কালের এই সংগ্রাম ঠিক রাষ্ট্রের সঙ্গে নয়, রাষ্ট্র তো একটা কাঠামো মাত্র ; আমাদের সংগ্রাম এই রাষ্ট্রের যে উপাদান সেই মানুষের সমাজের সঙ্গেই, এই সমাজ হচ্ছে প্রকৃতির দ্বারা নির্ধারিত মানুষের অস্তিত্বের ও তার প্রাণধারণের একটি সংঘ। সমাজের আমরা অন্তর্ভুক্ত তার উপরেই আমাদের অধিকারের ও কর্তব্যের বিষয় নির্ভর করছে, এবং এরই উপরেই আমাদের সকলের মনোযোগী হওয়া দরকার। এ ছাড়াও অবশ্য আছে রাষ্ট্র কর্তৃক প্রচারিত কিছু নির্দেশনামা। এরই সঙ্গে যুক্ত আছে এ যুগের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কাজ ও অনেক প্রশ্ন—আমাদের এই সমসাময়িক কালের বস্তুবাদী ও আধ্যাত্মিক জীবনের উপর যার প্রভাব অনেক। বিশেষ ক'রে সমাজের যে গ্লানির চাপে পড়ে জনসংখ্যার বেশির ভাগই অনেক দুর্ভোগ ভোগ করে চলেছে, তাদের প্রতিও আমাদের মনোযোগী হওয়া অত্যন্ত দরকার। সেইসঙ্গে, ঐ সমাজের যাঁরা একটু সুবিধাজনক অবস্থায় আছেন তাঁদের এই অনুরোধ-উপরোধ করাও বিশেষভাবে দরকার যে, তাঁরা যেন ঐসব দুর্ভাগাদের অবস্থার

উন্নতির জন্যে যৎপরোনাস্তি চেষ্টা করেন ; জনমণ্ডলী ক্রমশই ঐ দুর্গতদের বিষয়ে বিশেষ সচেতন হয়ে উঠছেন বলেও এ কাজ করতে হবে।

সামাজিক অধিকারের ও কর্তব্যের যে কথা বলে আসা হল সে সম্বন্ধে আলোচনা করতে হলে আমাদের উচিত মানুষের সমাজের প্রকৃতির ও উদ্দেশ্যের প্রতি নজর দেওয়া মানুষের প্রতি কী করণীয় আছে সমাজের ; এবং এই কথা ওঠা মাত্র আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয় মানুষের প্রতি, তার প্রকৃতির ও তার নিয়তির প্রতি ; কেননা মানুষকে দিয়েই সমাজ গঠিত। কেবল এইভাবেই সমগ্র সমাজের সঙ্গে প্রতিটি ব্যক্তির নিয়মিত সম্পর্ক নির্ধারণ করা সম্ভব। এবং বর্তমান সামাজিক অবস্থা যে ঠিক এই রকম আছে তার কারণ নির্ধারণও এইভাবেই করা যায়। এই সমাজে যে গ্লানিকর অবস্থা বিরাজ করছে তা পরীক্ষা করে দেখার জন্যে এইভাবেই আমরা তার হদিশ পেতে পারি, এবং আমরা আমাদের কাছেই এর কারণগুলি তুলে ধরতে পারি ও এর প্রতিবিধানের জন্যে উপায় উদ্ভাবন করতে পারি।

মানুষ ও সমাজ

তাহলে আমরা প্রথমেই মানুষের তার নিজের সঙ্গে কি সম্পর্ক সে বিষয়টি ভেবে দেখি, তারপর আরও উপসংহার টানতে হলে কয়েকটি সর্বজনস্বীকৃত নীতির বিষয়েও আমাদের আলোচনা করতে হবে। দেহযন্ত্র বিশিষ্ট একটি প্রাণী হিসেবেই মানুষ আমাদের সামনে উপস্থিত, এবং অপরিবর্তনীয় কয়েকটি প্রাকৃতিক নিয়মেরই সে অধীন, যা সমগ্রভাবে সকলের জীবনকেই নিয়ন্ত্রিত করে অথবা বিশেষ করে তার জীবনটি নিয়ন্ত্রিত করে। তাহলেই তার অস্তিত্ব কয়েকটি এমন বিশেষ ব্যবস্থার সঙ্গে নিবিড়ভাবে আবদ্ধ যে ব্যবস্থা প্রাণ ধারণের এক অপরিহার্য ও অবিরত প্রক্রিয়া, এবং সমগ্র প্রাণিজগতের সঙ্গে সে এই প্রক্রিয়ার অংশ গ্রহণ করে থাকে। কিন্তু পৃথিবীর অন্য প্রাণীর সঙ্গে তার যা পার্থক্য তা হচ্ছে এই : সে ব্যক্তিত্বের অধিকারী, অর্থাৎ তার আত্মচেতনা আছে ও আত্মপ্রত্যয় আছে। যে প্রকৃতির নিয়ম মানুষের অস্তিত্ব স্থির করে দিয়েছে তারই মধ্যে মানুষ তার এইসব বিশেষত্বের জন্যেই অন্যান্য প্রাণীর থেকে স্বতন্ত্র। প্রকৃতির এই নিয়মকে মানুষ অনন্তকাল থেকে ক্রিয়াশীল ও অপরিবর্তনীয় বলে মনে করতে শিখেছে, যদিও সেই নিয়মেরই প্রভাবে বিশ্বের অনেক পরিবর্তনই ঘটে যাচ্ছে, এবং একেই মানুষ তার যাবতীয় কাজের

নীতিনির্ধারক বলে স্বীকার করে নিয়েছে; কিন্তু অপরপক্ষে অন্য প্রাণী বা উদ্ভিদের ক্ষেত্রে ঐ নিয়মই কাজ করে যেন তাদের অজ্ঞাতসারে, এর ভালোমন্দ সম্বন্ধে তারা কিছুই বলতে পারে না। অন্যান্য জীবেরা তাদের প্রবৃত্তির দ্বারাই বেছে নেয় প্রকৃতির মধ্যে কোন্‌টা তাদের উপযোগী, এবং যেটা তাদের ক্ষতিকর তা তারা এড়িয়ে চলে। কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে সব বিষয় সম্বন্ধে তার প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জন করা চাই, তার কাজে কতটা সে ঐ নিয়মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে তা স্থির করে নিতে হবে তাকে। এরই মধ্যে মানুষের সামর্থ্য ও দুর্বলতা দেখতে পাওয়া যাবে। জন্তুরা তাদের স্বাভাবিক প্রয়োজনের দ্বারা যেন ঘেরাও হয়ে আছে, তারা ভুলও করে না, ভুলপথেও যায় না। কিন্তু মানুষ এই দুইটিই করতে পারে। তার অস্তিত্বের নিয়মকে স্বীকার করতে গিয়ে এবং বাহির বিশ্বের সঙ্গে তার সম্পর্ক কতটা যার প্রভাবে সে তার কাজের ধারা স্থির করে নেয়, তার বিচার করতে গিয়ে ভুল করা সম্ভব। এবং তার ত্রুটিশূন্য বোধ থাকা সত্ত্বেও সে তার স্বাধীন ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগ করতে গিয়ে কোনো কাজে ভুল করতে পারে। এ রকম হতেই হবে। ভুল করার কোনো সম্ভাবনা ব্যতীত জ্ঞান-অর্জন হয় না; ভুলপথে যাবার কোনো সম্ভাবনা না থাকলে স্বাধীনতাও আসে না। যদি প্রথম থেকেই সত্যকে আমাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হত, তাহলে আমরা কখনোই সত্যের সন্ধানের বা তা পাওয়ার কথা বলতাম না; অর্থাৎ আমাদের নিজেদের কার্যের দ্বারা বা নিজেদের চেষ্টার দ্বারা তা আবিষ্কার করতে চাইতাম না,—এবং একেই সংক্ষেপে বলে জ্ঞান, আমাদের জীবনের বুদ্ধিসত্তার অনেক গুরুতর মূল্যই আমরা এর উপর অর্পণ করি। আমাদের কর্মকুশলতা সম্বন্ধেও এটা খাটে। আমাদের যদি বেছে নেবার কোনো সুযোগ না থাকত তাহলে আমাদের একটা জিনিসকেই, নির্ভুল জিনিসকেই আঁকড়ে ধরতে হত, তাহলে কোনো স্বাধীনতাই আমাদের থাকত না, এবং তাহলে আমরা জন্তুদের মতই প্রবৃত্তির দাস হয়ে যেতাম।

আমাদের অস্তিত্বের এই যে নিয়ম, এ সম্বন্ধে ভুল করা বা এর বিপরীতে কাজ করার অর্থ নিশ্চয় কেউ এমন করবেন না যে, এসবের থেকে নিজেকে সরিয়ে আনার ক্ষমতা যেন আমাদের করায়ত্ত। এর বিপরীতটাই ঠিক। এই নিয়মের বশবর্তী মানুষ যে কাজ করে বা যে কাজ করতে ভোলে এবং তার যা পরিণাম হয় তা মানুষ কখনো বদল করতে পারে না। কেউ নিজের

আচরণ ওদের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে পারল, কি পারল না, সেটা আলাদা কথা, কিন্তু অপরিহার্য পরিণতি তাকে মেনে নিতেই হবে। ঠিকভাবে বুঝতে পেরে এবং তদনুসারে কাজ ক'রে আমরা অনেক কৃতিত্ব অর্জন করতে পারি এটাও যেমন ঠিক, তেমনি অনেক বাধা ও বিশৃঙ্খলাও এসে যেতে পারে; এক কথায়—বিপদ সব সময়ই আমাদের পিছনে লেগে আছে। এই লাগসই দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক—দেহের জৈব পদার্থের রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটেই চলেছে, এই পরিবর্তনের ফলে প্রত্যেক মিনিটে আমার শরীরে নূতন চেতনা সঞ্চার হচ্ছে। আমরা খাদ্য খাই, পানীয় পান করি, নিশ্বাস গ্রহণ করি বাঁচবার জন্যে। তাঁর নিজের স্বাধীন ইচ্ছায় মানুষের পক্ষে দম বন্ধ ক'রে বা অনাহারে নিজেকে মেরে ফেলাও সম্ভব; কিন্তু নিশ্বাস না-নিয়ে বা না-খেয়ে মানুষের পক্ষে বাঁচা সম্ভব নয়। যদি এর যে-কোনো একটা থেকে নিজেকে বিরত রাখে, তাহলে অস্তিত্বের নিয়মের বিরোধিতা করা হয়, এবং এই ভাবেই নিজেকে সে ধ্বংস করতে পারে, এবং এর দ্বারা নিয়মের প্রমাণ হয়ে যায়।

আমরা আত্মচেতনা ও আত্মপ্রত্যয়ের মধ্যেই মানুষের স্বভাবের চূড়ান্ত রূপ দেখতে পাই। সত্যের তাগিদ ও স্বাধীনতার তাগিদ—এই দুইই হচ্ছে মানুষের সব চিন্তার ও কাজের উৎস। যা ভালো এবং যা সুন্দর, যা সঠিক ও যা সত্য—তা চিনতে পারা, এবং এই চিনতে-পারা'কে জীবনের সর্বস্তরে স্বীকার করে নেওয়া—এসব করবে তারাই মানুষের মধ্যে যাদের বুদ্ধিদীপ্ত কর্মোদ্যম আছে। সত্যের অনুসন্ধানের সঙ্গে যদি সেই অনুপাতে স্বাধীনতা না থাকে তাহলে সেই অনুসন্ধান কখনো তার লক্ষ্যে পৌঁছতে পারবে না, সেই রকমই স্বাধীনতার সঙ্গে যদি তদনুপাতিক স্বীকৃতি না-থাকে তাহলে তার পরিণাম আত্মবিনাশ। তাহলে এ'কে চায় অন্যকে দুয়ের প্রত্যেকেই আর-একটিকে নিয়ন্ত্রণ করে, এবং এদের আত্মসচেতন ইচ্ছা শক্তির এই নিখুঁত পারস্পরিক অনুপ্রবেশ—এখানেই আছে মানুষের জীবনের উন্নতির লক্ষ্য। অর্থাৎ আমাদের অস্তিত্বের ও আমাদের চারদিকের প্রাকৃতিক পরিবেশের নিয়ম স্বীকার করে নেওয়ার মধ্যেই, এবং পরিণাম কী হতে পারে সে সম্বন্ধে সচেতন থেকে ওই নিয়ম মেনে চলার মধ্যেই আছে জীবনের উন্নতির লক্ষ্য।

আমরা যদি মানুষকে একটি ব্যক্তি বলে গ্রহণ করি, তাহলে তার সমকক্ষরা তাকে যে-আত্মীয়তার সঙ্গে বাঁধে, আমরা তাদের সেই পারস্পরিক সম্পর্কটা

ধরতে পারব। এদিক থেকে আমাদের চোখে সে একজন সামাজিক জীব; এবং জীব হিসাবেই প্রকৃতির নিয়মে সে তার সমগোত্র জীবের সঙ্গে সম্প্রদায়গত ভাবে বাস করতে বাধ্য। অরণ্যের জন্তুদের মতন বা মরুভূমির লুণ্ঠক প্রাণীর মতন, সমগোত্রীয় প্রাণীর থেকে একেবারে আলাদা হয়ে সে বাঁচতে পারে না; এমন করতে তিলে-তিলে তাকে ক্ষয় হতে হবে। এই রকম সম্পূর্ণ একা হয়ে গেলে সে তার অদৃষ্টও গড়ে নিতে পারবে না। এই আলোচনায় আমরা অবশ্য ধর্মতত্ত্ব সম্বন্ধীয় সাধনা-আরাধনার কথা আনছিনে। আমাদের মতে মানুষ-সহ যাবতীয় প্রাণীর স্বাভাবিক পরিণাম হচ্ছে: সব সুপ্ত শক্তির সম্পূর্ণ বিকাশ, এবং প্রত্যেকের মধ্যে যে স্বাভাবিক ঝোঁক আছে তার পূরণ।

কিন্তু যে ব্যক্তি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ভাবে বাস করে, সে কখনো নিজের উদ্যমে এই পরিপূর্ণতা পায় না। তার সাম্প্রদায়িক জীবন অবশ্যই দরকার, এবং নিজের গোত্রীয় লোকের সঙ্গে পারস্পরিক লেন-দেন আবশ্যক। এসব না হলে সেই রকম ব্যক্তিকে কেবলমাত্র একটা শারীরিক অস্তিস্ব নিয়েই বেঁচে থাকতে হয়। যদি কোনো বিশেষ ক্ষেত্রে এই রকম একটা অবস্থা হয় তাহলে সেই ব্যক্তির সব উদ্যম ও শক্তি তার অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্যেই খরচ হয়ে যায়, তার অন্য কোনো ক্ষমতার বিকাশের জন্যে তার সময় বা শক্তি আর থাকে না। কথাটা মন দিয়ে শোনো—সমাজের মধ্যে বাস করে সবচেয়ে বেদনাদায়ক পরিণতিও সমাজের বাইরে বাস করার চেয়ে অনেক ভালো। এই রকম একজন দুর্ভাগা ব্যক্তির নির্জনে বাস করা, সব ব্যাপারে নিজের উপর নির্ভর করে থাকা তাকে এমনি অসহায় করে দেয় যে, আমাদের মধ্যের দীনতম দরিদ্রতম ব্যক্তিও তেমন অবস্থা সহ্য করতে পারবে না; কেননা ঐ স্বতন্ত্র ব্যক্তিটি তার ভাষাও প্রায় হারিয়ে ফেলে, এবং শৃঙ্খলাবদ্ধ চিন্তাও সে করতে পারে না। যাই হোক, প্রকৃতই এমন অজ্ঞাতবাস যে কেউ করে তা আমাদের কল্পনার বাইরে। এইটেই প্রমাণ করে যে, এ অবস্থা মানুষের প্রকৃতির বিরোধী।

মানুষের এই সামাজিক জীবন কারও আবিষ্কার করা জিনিস নয়, কেউ এ ব্যবস্থা তার উপর চাপিয়েও দেয়নি, অথবা, সুবিধার জন্যে, যা সরিয়ে ফেলা যেতে পারে—এমন জিনিসও এ নয়। প্রকৃত পক্ষে মানুষের অস্তিত্ব থেকেই উদ্ভূত, এটা একটা স্বাভাবিক প্রয়োজন। যেখানেই মানুষ আছে বা থাকবে সেখানেই আছে ও থাকবে সমাজ। তার পক্ষে নির্জনতা হবে ক্ষয়রোগ

এবং মৃত্যু। মানুষের স্বভাবই সামাজিক। এই সামাজিক প্রবৃত্তি অনেক সময় আত্মসংরক্ষণেরও প্রবৃত্তি এইটিই আমাদের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী প্রবৃত্তি। এই সমাজ থেকে প্রত্যেকের মধ্যে যে শৃঙ্খলা আসে, সেটাও স্বাভাবিক ভাবেই গড়ে ওঠে। সমাজ গঠনের প্রক্রিয়া আমাদের জৈব নিয়মের দ্বারাও নিয়ন্ত্রিত; যে ভাবে মানুষ বা অন্য জীব গঠিত হয়ে উঠেছে, এও অনেকটা সেইভাবেই। এই নিয়ম আবিষ্কার করতে হলে সব প্রথম সমাজের প্রকৃতি সম্বন্ধে আমাদের সব ব্যাপারটা জেনে নিতে হবে। এ বিষয়ে সাধারণ ভাবে যে দুটি মত প্রচলিত আছে তার উল্লেখ করা যায়।

প্রথমেই আমরা দেখি মানুষ তার ব্যক্তিগত উন্নয়নের জন্যে তার ব্যক্তিগত অস্তিত্বের জন্যে সমাজের উপর নির্ভরশীল। এবং বিশেষ একটি দিক নিয়েই এর বিচার করা যায়। এই মত অনুসারে সমাজ হচ্ছে কতকগুলি মানুষের সমষ্টি, এর মধ্যে প্রত্যেকেই তার নিজের নিজের লক্ষ্যের উদ্দেশে ধাওয়া করছে, আর সমাজও তাদেও লক্ষ্যে পৌছবার জন্যে প্রত্যেকেরই সহায়তা করে চলেছে। এটা হচ্ছে সমাজের আইনগত দিক, যেখানে সম্প্রদায়ের সকলেই তাদের কর্মোদ্যমের সময় সমাজকে একটা উপায় রূপে গ্রহণ করেছে, লক্ষ্য হিসেবে নয়। নীতিটা হচ্ছে অনেকটা এই রকম, আইনের ক্ষেত্রে যাকে বলা হয় আদেশমূলক নয়, নিষেধমূলক। যেমন—অন্যের জন্যে এমন কাজ না-করা যা নাকি আমার জন্যে করে এমন আমি চাইনে। এটা অবশ্য আমরা রাষ্ট্রের কাছে দাবি করতে পারি।

খুব খুঁটিয়ে দেখতে গেলে, প্রত্যেকের নিজ নিজ লক্ষ্যে পৌছবার চেষ্টা ছাড়াও, আমরা সমাজে আর একটা জিনিস দেখতে পাই—একটা অখণ্ড ভাবমূর্তি আমাদের চোখের সামনে জেগে ওঠে, তাতে আর-একটু উন্নত দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। একজন আত্মসচেতন প্রাণী হিসেবে মানুষ তার অস্তিত্বের ও তার কর্মোদ্যমের একটা টেকসই প্রকাশ দেখাতে পারে, তার একটা স্থায়ী ফল দেখাতে পারে, চিন্তার ও কর্মের একটি স্থিতি আনতে পারে, বাইরের বিশ্বে তার কাজের ছাপ রাখতে পারে, এবং তার নিজের জন্যে সে সব জিনিসকেই নূতন ভাবে গড়ে তুলতে পারে। এই একজন ব্যক্তি তার অস্তিত্বের বাইরেও একটু গুরুত্ব পেয়ে যায়, এতে সে কেবল তার আশ পাশের মানুষের কাছেই কেবল মর্যাদা পায় না, পরবর্তী অনেক পুরুষের কাছেও পায়। সেই চরিত্রের ঐরূপ পরোক্ষ প্রভাবের ফলে, ঐ

ভাবে অন্যের মনে প্রভাব বিস্তারের ফলে আমাদের চিন্তায় ও কর্মে উদ্দীপনা আনে, এবং তা হয়ে যায় সমগ্র যুগের সাধারণ সম্পদ, পরবর্তী কালের হাতে তা অর্পিত হয়, তার পর শতাব্দীর পর শতাব্দী তা সঞ্চিত হয়ে থাকে মানবজাতির উত্তরাধিকার হিসেবে, তার জন্মমুহূর্তেই আমাদের পরবর্তী কালের শিশুরা সেই সম্পদের অধিকারী হয়ে যায়। জন্তু বা পশু আমরা যাদের বলে থাকি, তারা বর্তমানে ঠিক সেই একই জায়গায় দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আছে, শত সহস্র বছর আগেও তাদের প্রথম দল যেখানে ছিল ঠিক সেইখানেই ; কিন্তু আমাদের পূর্ব পুরুষ মানুষের জ্ঞানের ও কর্মোদ্যমের জন্য যে পরিশ্রম করে গিয়েছেন তাঁদের উত্তর পুরুষ তার ফল লাভ করতে পেরেছে। পূর্ববর্তী জন যেখানে এসে যে কাজ ছেড়ে গেছে, পরবর্তী জন এসে সেখান থেকে পূর্ণোদ্যমে কাজ আরম্ভ ক'রে চলায় যুগে-যুগে সেই কাজ ক্রমবর্ধিত হয়েই চলেছে। প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানুষের সঙ্গে যাঁরা সবচেয়ে জ্ঞানী ছিলেন ও সবচেয়ে বিজ্ঞ ছিলেন সে আমলের সেই স্থূল ও এলোমেলো মতবাদের মধ্যেও, তাঁদের সঙ্গে আমাদের কালের মাঝারি শিক্ষিত ছেলেদের কত তফাত! এই ছেলেরা দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যায়, হয় তো খুব গুরুত্বপূর্ণ কোনো প্রাকৃতিক ঘটনার বিবরণ জানতে পারে একটা স্বতঃসিদ্ধ ব্যাপার হিসেবে, এবং হয়তো স্কুলে তাদের ছাত্রজীবনেই। তার উপর, সেই পুরা কালের মানুষদের কৃতিত্বের কথাও ভাবতে হয়, যাঁরা কোনোরকম যন্ত্রপাতি ছাড়াই কেবল নিজেদের দৈহিক শক্তি প্রয়োগ করেই, মাটি থেকে তাঁদের নিত্য-প্রয়োজনীয় জিনিস কত শ্রমের দ্বারা উদ্ধার করে নিয়েছেন। অন্যদিকে, বর্তমানে শিল্পের এই অগ্রগতির যুগে, নিপুণ ও বহু কর্মক্ষম যন্ত্রের সাহায্যে ও প্রাকৃতিক শক্তির প্রয়োগে, সেকালীন অনেক অদ্ভুত কাণ্ড বহুৎ পিছনে পড়ে গিয়েছে! বর্তমান কাল এসব পেয়েছে যেন যৌতুক হিসেবে কেবলমাত্র প্রাকৃতিক নিয়ম বা আইনের প্রয়োগে, এবং এর মধ্যেই আরও ঐশ্বর্য সঞ্চয়ের উদ্দীপনা পেয়ে যাচ্ছে, এবং এইভাবে ঐশ্বর্যশালী হয়ে এবং বিপুলতা লাভ করে তা তার উত্তরাধিকারীর হাতে অর্পণ করছে। এই ভাবে, আমরা কেবল সেই সব ব্যাক্তিকেই দেখিনে যারা পাশাপাশি বাস করছে, আমরা দেখি তাদেরও যারা আসছে পরবর্তীকালে আগের কালের প্রত্যেকের উত্তরাধিকারী হয়ে, তারা বেশ অন্তরঙ্গভাবেই পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত, কোনো-কোনো দিকে এদের মধ্যে একটা ধারাবাহিকতা আছে। এটা যেন

সমজাতীয়দের মধ্যে একটা নিবিড় সম্পর্ক। প্রত্যেকে এই বিষয়টি বিবেচনা ক'রে দেখুক : নিজেকে পৃথক করে রেখে নয়, নিজেকে বর্জন করেও নয়, আমাদের কালে কোনো ব্যাক্তিকে নিজের নিরাপদ অস্তিত্বের জন্যে তাকে সকলের সঙ্গে এক হয়ে যেতে হবে, সকলের সন্নিকটে থাকতে হবে। এই অবস্থায় নিজেদের উন্নীত করার সম্ভাবনা নির্ভর করছে যতদূর সম্ভব সকলের সঙ্গে নিজেদের অন্তরঙ্গ করে নেওয়ায়। আমাদের আলোচনার বিষয় বলে যার উল্লেখ করেছি এতক্ষণ সেই সামাজিক অধিকার ও কর্তব্য সম্বন্ধেই কিছু বলা হল। আমরা বিশেষ করে নৈতিক আইনের কথাই বলতে চাই, সমাজের উপরতলাকে নিয়ন্ত্রণ করে এই আইন, এ ব্যাপারে শাসককুল অবশ্য বাইরে থেকে কোনো সমর্থনই জানান না। তথাকথিত সুনাম বলতে আমরা যা বুঝি তা রক্ষার জন্যেও ঈশ্বরের আদেশের স্থলেও এই নৈতিক কানুন নিজের স্থান করে নেয় 'না। আমাদের মধ্যেই এই আইন তার কার্য করে যায়, আমাদের বিবেকের মধ্যেই এ কাজ করে, অর্থাৎ আমাদের অস্তিত্বের এ যেন মধ্যমণি, এর প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আমরা সচেতন। একে লঙ্ঘন করাটা হবে মানবজাতির অস্তিত্ব অটুট রাখার জন্যে যে মৌলিক নিয়ম আছে, তা লঙ্ঘন করারই মত, এবং এ'তে পাপ হবারই কথা ; কেননা এর দরুণ ব্যক্তি বিশেষেরই কেবল না, সমগ্র সম্প্রদায়েরই অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়তে পারে। এই জন্যেই সংক্ষেপে বলা যায় যে, এর সঙ্গে আমাদের সকলের ব্যক্তিগত হিতাহিত জড়িত আছে। যাঁরা একটু সুবিধাজনক অবস্থায় আছেন সমাজের সেই শ্রেণীকে এ বিষয়ে খুব ভালো করে বোঝাবার কিছু নেই। কেননা এই নৈতিক কানুন মেনে চলাটা কতটা জরুরি তা তাঁরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন, শিক্ষার ক্ষেত্রে ও জীবনের প্রতিষ্ঠাকে নিশ্চিত করতে এই নীতিবোধ একান্তই দরকার। মানব প্রকৃতিকে কোনো বাহ্যবস্তু বলে মনে করলে ভুল করা হবে, এবং এটা যে অন্যের স্বার্থের সঙ্গে সংযুক্ত নয়, তাও যেন মনে করা না হয়। মানবতার মত এত বড় প্রজ্ঞা আর কিছু নেই ; শক্তি ও সামর্থ্যের কোনো প্রকার প্রয়োগ এর তুল্য হতে পারে না ; মানবতার ব্যবহারের দ্বারা যতটা সুফল পাওয়া যেতে পারে, এমন আর-কিছু থেকেই পাওয়া যায় না। যেসব বস্তুবাদী তত্ত্বের কথা আগে বলা হয়েছে, তা ছাড়াও, কোনো ব্যক্তি-বিশেষের ব্যক্তিগত উন্নতি বিশেষ ক'রে নির্ভর করে এরই উপরে। নৈতিক শক্তিকে কার্যকর করে না তুললে, যা ভালো ও যা সঠিক

তার সমর্থনে এই শক্তি প্রয়োগ না করলে, যে শূন্যস্থানের সৃষ্টি হয় তা কোনো অকেজো জ্ঞানের দ্বারা তো পূর্ণ হয়ই না, হয়তো পূর্ণ হয় বস্তুগত কোনো মালিকানার দ্বারা। চিন্তার ও কাজের মধ্যে একটা সতেজ চলাফেরা চাই, কোন্‌টা হওয়া কর্তব্য, কোন্‌টাই-বা হওয়া উচিত—এই বোধটাই একজন মানুষের মধ্যে তার অস্তিত্বের পূর্ণ চেতনা সঞ্চার করে, এবং এর থেকে আসে মানসিক পরিতৃপ্তি। আর, আমরা যদি সমাজের মধ্যে আমাদের পারস্পরিক সম্পর্কের উপর পূর্ণ নজর দিই, তাহলেই আমাদের অস্তিত্বের চেতনা আরও সজীব হয়ে ওঠে। প্রত্যেক ব্যক্তির কাজে সমাজের যে কল্যাণ হয়, তা দ্বিগুণিত আশীর্বাদের মতন এসে বর্ষিত হয় ঐ ব্যক্তির উপর। মানুষ সমাজকে যতটা দেয়, তার অনেক বেশিই সে আগাম পেয়ে যায়, এবং প্রতি ঘণ্টায়ই পেয়ে যেতে থাকে। এযুগের সামগ্রিক জীবন থেকেই প্রত্যেক ব্যক্তি সফলতার সঙ্গে তার জীবনকে উন্নীত করতে পারে; এই সামগ্রিক জীবনের ঝর্না থেকেই ব্যক্তিবিশেষের উৎপত্তি, তার ধারা গিয়ে পড়বে ঐ সমাজের মধ্যেই এবং সমাজকে আরও সমৃদ্ধ ও স্ফীত করে তুলবে। সভ্যতার সম্পদ দিয়ে আত্মাকে লালন করা, মানবজাতির প্রতি ভালোবাসায় বুক পূর্ণ ক'রে তোলা, একটা যুগের উপর ইতিহাস যে ছাপ রেখে যাবে—অন্তরাত্মা দিয়ে ইতিহাসের সেই ছাপ মুদ্রণে সাহায্য করা,—এই সবই হচ্ছে মানুষের বুদ্ধিমত্তায় পূর্ণ জীবনের উপাদান। এই রকম বাঁচাই প্রকৃত জীবনধারণ, মানুষের পরিপূর্ণতায় এই ভাবে নিজেকে গঠন করাই মানবজীবনের কাজ। এর বিপরীতটা হচ্ছে সব উচ্চ আদর্শের কাছে পরাজয়, এবং আত্মিক মৃত্যু।

যাঁরা শিক্ষিত এবং যাঁরা ধনবান, এই রকম অভিপ্রায় যেন ধীরে-ধীরে তাঁদের মনের মধ্যে প্রবেশ করে! যত কমই হোক বা যত বেশিই হোক এই আদর্শ জীবনে যে যতটাই গ্রহণ করুক, এই বিশাল কর্তব্য পালনে নিজের শক্তিকে যত সামান্য বলেই কেউ মনে করে থাক, তাতে কিন্তু আসে-যায় না। সকলে একত্র হয়ে কাজ করলে অনেক বৃহৎ কাজও সম্পন্ন করা সম্ভব। এর লক্ষণ দেখা দিতে আরম্ভ করেছে। অনেক সামাজিক সংগঠন ইতিমধ্যেই বেশ তেজের সঙ্গে অঙ্কুরিত হয়ে উঠেছে তার ডালে কলিকাও দেখা দিয়েছে, ঐ কলি থেকে চতুর্দিকে প্রস্ফুটিত হয়ে উঠবে পুষ্প। অভিপ্রায় ও উদ্দেশ্য যাদের এক এই রকম সংঘের কাছেই বর্তমান কালের সমাজ তার অনমনীয় কর্মপ্রেরণা চায়; এবং স্বাধীন সমবায়-ভিত্তিক সংগঠন তারা গঠিত করার কাজে লেগেছে, এর

পিছনে আছে তাদের নৈতিক শক্তি। এ কালের যেটা সবচেয়ে বড় প্রশ্ন ও বৃহৎ সমস্যা তারা যাতে তাদের সেই সাংস্কৃতিক কর্তব্য পালন করতে পারে, এবং তা মানব প্রকৃতির মধ্যে সঞ্চারিত করে দিতে পারে, এবং যে বাহ্যিক শক্তি তার নির্দেশনামা জারি করে চলেছে তা দূর করতে পারে, তাহলেই ভবিষ্যতে সব সমস্যার সমাধান হবে।

ফ্রায়েডরিখ ভিলহেল্‌ম্ রাইফেইসেন

রাষ্ট্রের ঋণদান-অফিস

গ্রামের মানুষদের দুঃখদুর্দশা লাঘবে সমবায় সমিতি (নিউউইড ১৮৬৬)।

হারমান স্থলজে ডেলিটৎস যেমন ব্যবসায়জীবি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সাহায্যের জন্যে সমবায়-সমিতি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, ঠিক সেইভাবেই চাষী-সম্প্রদায়ের জন্য সমবায়-সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন ফ্রায়েডরিখ ভিলহেলম রাইফেইসেন (১৮১৮-১৮৮৮)। দ্রুতবেগে শিল্পসম্প্রসারণের ফলে চাষীরা দুর্দশাগ্রস্ত হয়, তাদের দুঃখ লাঘবের জন্যেই তাঁর এই উদ্যোগ। রাইফেইসেনের মনোভাব ছিল খাঁটি খ্রীষ্টীয় ও সামাজিক; তাঁর কাছে সমবায়-আন্দোলন ছিল ধর্মীয় ও নীতিগত আদর্শের দ্বারা পরিচালিত প্রতিষ্ঠান। রাষ্ট্রীয় সাহায্যের সঙ্গে যাতে প্রত্যেকে নিজের নিজের সাহায্যেও আসতে পারে—এই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। তিনি যেসব সঞ্চয় ও ঋণদান ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করেন এখনো তা চাষীদের সমবায় প্রতিষ্ঠানেরই অঙ্গ, এখন তা ফেডারেল জার্মান রিপাবলিকে একত্র হয়ে "জার্মান রাইফেইসেন আসোসিয়েশন"এর অঙ্গীভূত হয়েছে। এখানে যা উদ্ধৃত হচ্ছে তা রাইফেই-সেন-এর "স্টেট লোন-অফিসেস কো-অপারেটিভ সোসাইটিজ অ্যাজ এ মীন্‌স্ অব রিলিভিং দি মিজারি অব দি রুরাল পপুলেশন" (১৮৬৬) বই থেকে নেওয়া।

সমবায়-সমিতি স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা

"সে সব ভালো দিন এখন গত, যখন প্রতিবেশীর কথার উপর নির্ভর করেই প্রতিবেশীরা সাহায্যের জন্যে এগিয়ে আসতেন, এর জন্যে লিখিত কোনো দলিলের দরকার হত না। বিশ্বাসের জায়গায় এখন এসেছে অবিশ্বাস; ভাই এখন ভাইকে সচরাচর সাহায্য করে না: টাকা পয়সার ব্যাপারে ভাই-ভাই ভাব আর নেই।" এ ধরণের অনুযোগ-অভিযোগ এখন হামেশাই শোনা যায়, বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলেই বেশি শোনা যায়। এর কি কোনো ভিত্তি আছে? হ্যাঁ কিংবা না।

সেই অতীতের ভালো দিনগুলো আবার ফিরে আস্থক, আমরা তা চাইনে। আমাদের যুগটাও তেমনিই ভালো, কিংবা তার চেয়েও ভালো। যে অবস্থার বদল করা সম্ভব নয় তা মেনে নিলে, এবং সেই অবস্থার সম্পূর্ণ স্থযোগ গ্রহণ করলেই অগ্রগতি সম্ভব। আমাদের এই কাল সম্বন্ধেও এ কথা খাটে। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নূতন নূতন আবিষ্কার ও অগ্রগতি, এবং বৃহত্তর শিল্পে ও বাণিজ্যে তার প্রয়োগ একটা মস্তবড় বিপ্লব এনে দিয়েছে ; এর স্থযোগ স্থবিধা এখনকার মতন পেয়ে যাচ্ছে বড় বড় বাণিজ্যিক বাজার ও কারখানা। যে স্থিতাবস্থা ছিল তা- একটু নড়ে চড়ে গিয়েছে, গ্রাম্য অঞ্চল ও ছোটছোট ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান পিছিয়ে পড়েছে। এই নতুন যুগের স্থযোগ-স্থবিধার সদ্ব্যবহার করা তাদেরই কাজ। তা করতে পারলে তারা অতীতের সেই ভালো দিনগুলো ফিরে আস্থক—এমন চাইবে না।

আমরা যে প্রশ্ন তুলেছি তার যদি সংক্ষিপ্ত নেতিবাচক উত্তর দিয়ে থাকি, তা হলে এক দিক থেকে স্বীকার করে নিতেই হবে যে ঐসব অভিযোগ যুক্তিসঙ্গত। যাঁরা নিম্নশ্রেণীর থেকে অনেক দূরে থাকেন তাঁদের যা ধারণা তার চেয়ে প্রকৃত প্রয়োজন অনেক অনেক গুণ বেশি। প্রথমত, টাকার অভাব আছেই, তার উপর বর্তমান অবস্থায় গ্রামাঞ্চল থেকে ও ছোটখাটো ব্যবসার থেকে ক্রমশই টাকা সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে। এই একটি বিশেষ বিষয়ে তাহলে আমাদের যে প্রশ্ন উঠেছে তার একমাত্র উত্তর হচ্ছে—হ্যাঁ।

স্বীকার করে নেওয়া গেল যে অভাব আছে ; এই অভাব মোচন করা হবে কী ভাবে ; কী ক'রে কার্যকরভাবে সাহায্য দেওয়া যেতে পারে? এর পথ আমাদের দেখিয়ে দিয়েছে বৃহত্তর শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান, বড়বড় বণিক ও বড়বড় উৎপাদনকারীরা। বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফল নিজেদের কাজে লাগিয়ে, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ফলপ্রসূভাবে প্রয়োগ করে এবং এই কাজের জন্যে নিজেদের উদ্যোগে টাকাপয়সা সংগ্রহ করে, এবং ব্যক্তিবিশেষের উদ্যোগে যখন কাজ হল না, তখন সকলে মিলে সমবায়-প্রথায় কাজ ক'রে তাঁরা ক্রমশই ধনী হয়ে উঠছেন, ক্রমশই তাঁদের ধন বৃদ্ধি হয়ে চলেছে। তাহলেই দেখা যাচ্ছে যে, তাঁরা ধনী হয়েছেন তাঁদের জ্ঞান ও তাঁদের টাকা কাজে লাগিয়ে ; তাঁরা আরও ধনী হবেন ; তাঁরা আরও টাকা পুঞ্জীভূত করে তুলবেন, এবং ক্রমশই ছোটছোট প্রতিষ্ঠান ও গ্রামাঞ্চল থেকে টাকা চলে আসবে তাঁদের হাতে। এতে এদের বাঁচার পথই রুদ্ধ হবে। জ্ঞান ও টাকা এই দুটিই হল

একমাত্র জিনিস যার দ্বারা চাষী ও মিস্ত্রী আবার নিজেদের পায়ে দাঁড়াবার মতন শক্তি পাবে।

একথা না বললেও চলে যে, এখানে আমরা উচ্চতর বা গভীরতর কোনো জ্ঞানের কথা বলছিনে, আমরা সাধারণভাবে যাকে জ্ঞান বলে থাকি তার কথাই বলছি। সাধারণ জ্ঞান যাকে বলে তারই চর্চার কথা বলছি—গ্রামাঞ্চলের মানুষের মধ্যে এ জিনিসের বিশেষ অভাব নেই। এর আগে যা হয়েছে তার চেয়ে অনেক বেশি ক'রে চাষীরা ও মিস্ত্রীরা তাদের মানসিক ও শারীরিক শক্তির ব্যবহার যেন করে; এতে তারা তাদের যন্ত্রপাতির উৎকর্ষ ও উপযোগিতা ধরতে পারবে, জমির প্রকৃতি ও অবস্থা বুঝতে পারবে, সার বা অন্যান্য উপকরণ কতটা দরকার তা বুঝতে পারবে—এ'তে সব ব্যাপারটাই নিজেদের কাজে লেগে যাবে; এতে অনেক শৃঙ্খলা ও মিতব্যয়িতার দ্বারা ব্যবসায় পরিচালিত হতে পারবে; এবং গার্হস্থ্যজীবনে যেসব গুণের বিশেষ দরকার তাও আয়ত্ত হবে, শৃঙ্খলাবোধ ও পরিচ্ছন্নতার দিকে নজর যাবে। যাঁরা গ্রামে বাস করেছেন তাঁরাই জানেন এসবের কত অভাব সেখানে, এবং পরিবর্তন আনাই বা কতটা কঠিন। আমরা এখানে অবশ্য সাধারণ ভাবেই কথা বলছি; হয়তো কোনো-কোনো জায়গায় বেশ প্রশংসনীয় ব্যতিক্রম আছে। আমরা বেশ খুঁটিনাটি করেই অনেক ক্ষেত্রে দেখেছি যে, বেশির ভাগ পুরানো পদ্ধতি ধরে চলতেই আগ্রহী, তাদের বাবা-ঠাকুরদা যেভাবে চলেছেন সেইভাবে তারা চলতে চায়, নতুন কোনো উদ্ভাবনাকে সংশয়ের চোখে দেখে, অগ্রগতিমূলক কোনো কাজ তারা বাতিল করে দিতে চায়। গ্রামাঞ্চলের মানুষদের সাধারণ স্বভাবের দরুনই এমন হয়ে থাকবে। সে যাই হোক, স্কুলের শিক্ষার ত্রুটিই এসবের জন্যে অনেকটা দায়ী।

অনেক দেশহিতৈষী ও লোকহিতৈষীর চেষ্টা সত্ত্বেও একালের মানুষের মধ্যে, বিশেষ করে যেসব জায়গা বিচ্ছিন্ন সেখানকার মানুষের মধ্যে, উন্নতি যা ঘটেছে তা সামান্যই। সবচেয়ে বড় দায় হচ্ছে নবীনদের উপর প্রভাব বিস্তার করা; এবং এ কাজ হতে পারে স্কুলের প্রাথমিক শিক্ষার মধ্য দিয়ে, এ শিক্ষা ভালো হলে মন এমন ভাবে সচেতন হবে যাতে সর্ব বিষয়েই তা সজাগ থাকবে, এবং এর দ্বারাই দেশের মানুষের মান বিশেষ মাত্রা-অনুযায়ী উন্নীত হবে। এতে তাদের বিচারবোধ আসবে, সংস্কার থেকে মুক্ত হবে; এবং বক্তৃতা বা রচনা বুঝতে শিখবে, এবং নিজের উপর তা প্রয়োগ করতে

পারবে। এইভাবে ছোটদের শিক্ষা দেবার জন্যে বিশেষভাবে ট্রেনিং পাওয়া প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষক দরকার ; এবং এজন্যে বর্তমান অবস্থার কথা বিবেচনা ক'রে শিক্ষকদের আয় বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা বিশেষ জরুরি কাজ। এমন করা হলে শিক্ষকদের প্রাইভেট টিউশনিতে তাঁদের সব উদ্যম ব্যয় করতে হবে না, তাঁরা তখন দেশের মানুষের কল্যাণের কাজেই আত্মনিয়োগ করবেন ; এবং বলতে গেলে কৃষিকাজের ব্যাপারে সর্বদিকে যাতে সামগ্রিক উন্নতি ঘটতে পারে তারই যেন সংযোগসূত্র হয়ে উঠবেন তাঁরা। এমনটি হতে হলে, যেসব ছেলে স্কুলের পাঠ সমাপ্ত করবে, তাদের জন্যে প্রতিষ্ঠা করতে হবে কৃষি-বিদ্যালয় ও ব্যবসায়-শিক্ষার বিদ্যালয় ; সেইসঙ্গে, বড়দের জন্যে কৃষিবিষয়ক-আলোচনার জন্যে সভাগৃহ স্থাপন করাও যে কতটা দরকার, তা আর ব'লে বোঝানো যাবে না।

এইসব সমিতি যত ভালোভাবেই কাজ করুক, আমরা যেন তাদের কাছ থেকে জাদুকরী কোনো কাজ প্রত্যাশা না করি, সব ব্যবস্থার মধ্যে একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তন এসে যাবে বলে মনে না করি। যা-কিছু কল্যাণ তা ধীরে-ধীরে আসবে। সুযোগ্য পরিচালনায় অনেক ভালো কাজ অবশ্যই হবে। এইজন্যেই সমবায়-সমিতি প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তার কথা এর চেয়ে বেশি জোর দিয়ে বলার দরকার করে না। এই সমিতি যাদের জন্যে খুব বেশি করে দরকার, তারা কিন্তু এর প্রতিষ্ঠার সংরক্ষণের বা পরিচালনার ব্যাপারে অক্ষম। এইজন্যে এ'তে সকলের পরিপূর্ণ সহযোগিতা বিশেষ কাম্য। ক্রমশ দারিদ্রের এই প্রসারের ফলে যাঁরা টাকা দাদন দিয়ে তেজারতি কারবার করতে চায় না, তারা একটু অসুবিধায়ই পড়ে। এইজন্যেই, যাঁরা সংগতি-সম্পন্ন তাঁদের নিজেদের স্বার্থেই তাঁদের এই সমিতি গঠন করা দরকার। এবং যতটা সম্ভব এ'তে অংশ গ্রহণ করাও উচিত। গ্রাম-দেশে, বলতে গেলে, অনেক গুপ্তধনই লুকিয়ে আছে। জমিতে আরও ভালো ভাবে ও গভীর ভাবে চাষ ক'রে জলসেচের ব্যবস্থা ক'রে, প্রান্তরভূমির ও বনভূমির ব্যবহার ক'রে, আঙুর চাষ ক'রে ও অন্যান্য ফলের চাষের উন্নতি ঘটিয়ে, মিতব্যয়িতার দ্বারা মাটির কাছ থেকে অনেক ঐশ্বর্য লাভ করা যেতে পারে ; এতে দরিদ্র সম্প্রদায় সংগতিসম্পন্ন হয়ে উঠতে পারবে, মানুষের পরিশ্রমের সঙ্গে এইসব সমিতির সহযোগিতার ফলেই এমন হওয়া সম্ভব। কিন্তু নীতি ও ধর্মের দিক দিয়েও আমাদের বলতে ইচ্ছে হবে—এইসব ব্যাপারেই সমবায়-সমিতির

প্রয়োজন সবচেয়ে বেশি। যে হারে দারিদ্র্য বাড়বে, ও অভাব বেড়ে চলবে, নৈতিক অবনতিও সেই হারেই সর্বত্রই প্রসার লাভ করবে। আন্তরিক নিষ্ঠার সঙ্গে আধ্যাত্মিক প্রেরণায় উদ্‌বুদ্ধ হয়ে খুব ভালো কাজ করতে গেলেও তা অর্থের অভাবে পণ্ড হয়ে যায়। নৈতিক অবনতি রোধের জন্যে চেষ্টা করে গেলেও তাতে কোনো কাজ হবে না। ভিক্ষা বা দান—এতে কোনো কাজ হয় না। এতে ভালোর চেয়ে মন্দই হয় বেশি। সাহায্য দান করতে হবে এই কথা বলেঃ "যে কাজ করবে না, সে খেতে পাবে না।" যারা সাহায্য চায় তাদের শক্তির ও যোগ্যতার উন্নতিবিধানই হবে আমাদের লক্ষ্য ; এবং এই শক্তি যাতে তার পরিমাণ-মত সম্পদ আহরণ করতে পারে, সেইদিকেই দিতে হবে দৃষ্টি। এইভাবেই সকলকে ক'রে তুলতে হবে আত্মনির্ভর।

ফার্ডিনাণ্ড লাসালে

রাষ্ট্রের শ্রমিকশ্রেণী সংক্রান্ত ধারণা

ফার্ডিনাণ্ড লাসালে (১৮২৫-১৮৬৪) জার্মানী সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক আন্দোলনের প্রবর্তক। তিনি বিপ্লবী গণতান্ত্রিক, ১৮৪৯ সালের পর থেকে তিনি বার-বার রাজদ্রোহী রূপে অভিযুক্ত হয়েছেন, ও কারাগারে প্রেরিত হয়েছেন, এবং পরে, তাঁর সমাজতান্ত্রিক মতবাদের জন্যে "শ্রেণীবিদ্বেষের প্ররোচক" রূপে অভিযুক্ত হয়েছেন। তাঁর লিখিত সমাজতান্ত্রিক কর্মসূচীর উপর নির্ভর করে ১৮৬৩ সালে "জেনারেল জার্মান ওয়ার্কার্স আসোসিয়েশন" প্রতিষ্ঠিত হয়—এইটেই জার্মানীর প্রথম সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টি। লাসালে এর সভাপতি হন।

এখানে যা উদ্‌ধৃত হচ্ছে তার থেকেই বোঝা যাবে যে, তিনি ছিলেন শ্রমিকশ্রেণীর প্রবক্তা ; কিন্তু মার্কস্‌বাদী তিনি ছিলেন না। তিনি সাধারণ-ভাবে সকলের সমান ভোটাধিকার দাবি করেছেন, এবং শিল্পে শ্রমিকরা মুনাফার অংশ পাবে এই পদ্ধতির প্রবর্তনা চেয়েছিলেন ; কিন্তু তিনি ছিলেন রাষ্ট্রের পক্ষে, এইখানেই মার্ক্‌স-এর সঙ্গে তাঁর পার্থক্য। তিনি শ্রেণীসংগ্রামে বিপ্লবী মনোভাবাপন্ন ছিলেন না, এইজন্যেই তিনি শ্রমিক-আন্দোলনকে রাষ্ট্র-ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টায় বিসমার্কের সঙ্গেও আলাপ-আলোচনা

করেছেন। প্রকৃতপক্ষে তার দ্বন্দ্ব ছিল উদারপন্থী মধ্যবিত্তদের সঙ্গে, রাষ্ট্র সম্বন্ধে যাঁদের ধারণা, তাঁর মতে, প্রকৃত গণতান্ত্রিক ছিল না। উদ্ধৃত অংশ থেকে এর কিছু আভাস পাওয়া যাবে।

যাকে নাকি বলা হয়ে থাকে—চতুর্থ রাষ্ট্র, সেই সংবাদপত্র যে রাজনৈতিক নীতি সমর্থন করেন তা মধ্যবিত্তশ্রেণীর নীতি থেকে পৃথক, অর্থাৎ যে ক্ষেত্রে মধ্যবিত্তরা চান সীমিত ভোটাধিকার, সেক্ষেত্রে সংবাদপত্র চান সর্বজনীন ভোটাধিকার। উচ্চশ্রেণীর মানুষের কাছে নৈতিক শক্তির যে মর্যাদা তার চেয়ে অনেক বেশি মর্যাদা সংবাদপত্রের কাছে, সমাজে এর বিশেষ একটি স্থান থাকায় সংবাদপত্রের পক্ষে এমন নীতি গ্রহণ করাই সমীচীন হয়েছে। এবং এরই ফলে রাষ্ট্রের একটা নৈতিক লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য সম্বন্ধেও সংবাদপত্রের যে ধারণা তা মধ্যবিত্তশ্রেণীর ধারণার থেকে পৃথক।

মধ্যবিত্তদের মতে রাষ্ট্রের নৈতিক নীতি হবে এমন যাতে প্রত্যেক মানুষকে তার শক্তি অনুযায়ী কাজ করায় কোনো বাধা দেওয়া হবে না।

আমরা যদি সকলেই সমান শক্তিমান হতাম, সমান বুদ্ধিমান হতাম, সমান শিক্ষিত হতাম, সমান ধনবান হতাম, তাহলে অবশ্য ঐ নীতিটি যথার্থ বলে গ্রহণ করা যেত।

কিন্তু আমরা যখন সকলে সমান নই, সমান হতেও পারব না, তখন এই নীতিটি সন্তোষজনক বলে গ্রহণ করা যায় না। কেন না, এর মধ্যে দিয়েই দুর্নীতির ও দুরাচারের প্রশ্রয় দেওয়া হবে। এর ফল হবে এই যে, যারা বেশি শক্তিমান বেশি বুদ্ধিমান ও বেশি ধনবান তারা দুর্বলদের শুষে শেষ করে ফেলবে।

শ্রমিকশ্রেণীরা নীতি সম্বন্ধে যা মনে করে তা এই—প্রত্যেক ব্যক্তির নিজ ক্ষমতা অনুযায়ী বাধাহীন ভাবে কাজ করাটাই যথেষ্ট নয়, এর সঙ্গে আরও কিছু যোগ করতে হবে সকলের সামগ্রিক কল্যাণের জন্যে, সকল ব্যক্তির ও সম্প্রদায়ের স্বার্থ এক ক'রে দেখা, এবং উন্নয়নের ফল সকলে যাতে ভোগ করতে পারে তার ব্যবস্থা করা।

মধ্যবিত্তদের ধারণায় রাষ্ট্র কেবলমাত্র ব্যক্তিগত স্বাধীনতা দেবে, তাকে রক্ষা করবে, এবং তার ধনসম্পদ রক্ষণ করবে।

ভদ্রমহোদয়গণ, এটা যেন একজন পুলিশম্যানের কথা। এটা পুলিশ-

ম্যানের কথা এই জন্যে বলছি যে, তাঁদের দৃষ্টিতে রাষ্ট্রের সব দায়িত্ব কেবল যেন চুরি-ডাকাতি বন্ধ করায়ই। দুঃখের বিষয় এই রকমের ধারণা অনেক উদারপন্থীরও আছে, গণতন্ত্রে বিশ্বাসী এমন অনেকের মধ্যেও এরকম ধারণা আছে। এর কারণ তাঁদের কল্পনা-ক্ষমতার ত্রুটি। মধ্যবিত্তরা যে ধারণা নিয়ে আছেন তাতে মনে হয় যে, দেশে যদি চুরি-ডাকাতি বলে কিছু না থাকে তাহলে রাষ্ট্রের করণীয় কাজ বলে আর কিছুই থাকে না।

কিন্তু ভদ্রমহোদয়গণ, সংবাদপত্র একেবারে ভিন্ন ধারণা পোষণ করে, তাঁদের ধারণাই হচ্ছে রাষ্ট্রের কর্তব্য সম্বন্ধে মনীষীর ধারণা।

ইতিহাস হচ্ছে প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রামের কাহিনী; কেবল প্রকৃতির সঙ্গে কেন—দুঃখদুর্দশার সঙ্গে, অজ্ঞানতার সঙ্গে, দারিদ্র্যের সঙ্গে, দুর্বলতার সঙ্গে; এবং এইসবের ফলে ইতিহাসের আরম্ভকাল থেকে মানুষকে যে দাসত্বের নিগড়ে বাঁধা পড়তে হয়েছে, তারও সঙ্গে সংগ্রাম। এইসব দুর্বলতাকে ক্রমে-ক্রমে জয় করে মানুষ যে এগিয়ে চলেছে, ইতিহাস সেই স্বাধীনতার কাহিনীই আমাদের সামনে মেলে ধরেছে।

আমরা যদি প্রত্যেকে কেবল নিজের-নিজের কথা ভেবে একা একা চলতাম, তাহলে এই সংগ্রামে আমরা এক পা-ও এগতে পারতাম না।

মানুষের স্বাধীনতার এই উজ্জীবনই হচ্ছে রাষ্ট্রের কাজ, মানবজাতির উন্নয়ন সাধন করে তাকে সব রকম দুর্বলতা থেকে মুক্ত করাই রাষ্ট্রের কর্তব্য। রাষ্ট্র হচ্ছে সমস্ত মানুষের মিলিত একটি সংঘ, মানুষের এই একতাই প্রত্যেক মানুষের ভিতরের শক্তি বাড়িয়ে তোলে; ব্যক্তিগত ভাবে প্রত্যেকের মধ্যে যে শক্তি নিহিত থাকে সেই শক্তিই এমন হলে প্রত্যেকের মধ্যের শক্তিও সহস্রগুণ বেড়ে যায়।

তাহলেই দেখা যাচ্ছে যে, কারও ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও ধনসম্পত্তি রক্ষা করাই রাষ্ট্রের কাজ নয়; মধ্যবিত্তরা অবশ্য তাই মনে করেন, কেননা তাঁরা যে স্বাধীনতা ও ধনসম্পদ নিয়ে রাষ্ট্রে প্রবেশ করেছেন তা'ই তাঁদের কাছে সব। এর বিপরীতটাই সত্য, তা হচ্ছে এই—প্রত্যেক ব্যক্তি একা কাজ করে যা কখনো আয়ত্ত করতে পারবে না, তাদের একত্র করে সংঘবদ্ধ করে তাদেরকে নিয়েই সেইসব আয়ত্ত করায় এবং উন্নত জীবন ধারণ করায় সহায়তা করা। তারা যাতে উপযুক্ত শিক্ষা পেতে পারে, উপযুক্ত ক্ষমতা অর্জন করতে পারে, স্বাধীনতা ভোগ করতে পারে—তার ব্যবস্থা করাই রাষ্ট্রের

কাজ। একার পক্ষে যা অসাধ্য, দশজন একত্র হলে তা যে অসাধ্য নয়, তা দেখিয়ে দেওয়াই রাষ্ট্রের কাজ।

মানুষের ক্রমিক উন্নতি বিধান ও মানুষের মানসিক প্রসার সাধন করাই রাষ্ট্রের করণীয় কাজ। অন্যভাবে বলা যায় যে মানুষের অদৃষ্ট নিয়ন্ত্রণ ক'রে, যে সংস্কৃতির প্রতি মানুষের সহজাত আকর্ষণ আছে তার সঙ্গে মানুষের যোগ সাধন করে দিয়ে মানুষের একটা প্রকৃত অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠা করে দেওয়াই রাষ্ট্রের কাজ। মানবজাতিকে শিক্ষায়-দীক্ষায় নিয়ন্ত্রিত করতে হবে রাষ্ট্রেরই।

ভদ্রমহোদয়গণ, রাষ্ট্রের নৈতিক দায়িত্ব হচ্ছে এই। এই কাজই বরাবর হয়ে আসছে। পৃথিবীর প্রথম আমল থেকেই। ইচ্ছায় না হলেও অবচেতন ভাবেই, এমন কি অনেক সময় নেতাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধেও রাষ্ট্র এইভাবে কাজ করে চলেছে।

কিন্তু শ্রমিক-শ্রেণী, এবং যারা নিম্নশ্রেণী নামে পরিচিত, ব্যক্তিগতভাবে এক অসহায় অবস্থায় দিনযাপন ক'রে, তারা এখন নিজেরাই উপলব্ধি করতে পারছে যে, সকলকে একত্র করে সকল ব্যক্তির মঙ্গলের জন্যে কাজ করাই রাষ্ট্রের কর্তব্য; কেননা, ব্যক্তিগত ভাবে খেটে তারা যে কাজ করতে না-পারবে, দল বেঁধে করলে সেই কাজ করতেই তারা সক্ষম হবে।

শ্রমিকশ্রেণীর এই ধারণা অনুযায়ী যে রাষ্ট্র পরিচালিত হয়েছে তার কখনো পতন ঘটেনি; রাষ্ট্রের ইচ্ছাতেই এ কাজ না হয়ে থাকতে পারে, ঘটনার চাপে বা প্রকৃতির নিয়মে অবচেতন অবস্থাতেই হয়তো এই ব্যবস্থা গৃহীত হয়ে থাকবে। কিন্তু এখন পরিষ্কার ভাবে বুঝে নিয়ে এবং সম্পূর্ণ সচেতন ভাবেই এই কাজ করা আবশ্যক। এর আগে যে কাজ হয়ে ছিন্নবিচ্ছিন্ন ভাবে বা খুব সামান্য ভাবে, এখন সেই কাজ পূর্ণ উদ্যমে করা দরকার, এবং তাহলেই মানুষের মনের বল বেড়ে যাবে অসম্ভব ভাবে, সুখসমৃদ্ধি ও সংস্কৃতির প্রসার ঘটবে অভূতপূর্ব ভাবে। আগের কালের যে অবস্থা খুবই সুখকর বলে স্বীকৃত হয়েছিল, সেই অবস্থাটা তাহলে একেবারেই অকিঞ্চিৎকর বলে মনে হবে।

ভদ্রমহোদয়গণ, এ'কেই বলতে হবে রাষ্ট্র সম্বন্ধে শ্রমিকশ্রেণীর ধারণা। আপনারা সহজেই বুঝতে পারছেন যে, মধ্যবিত্তদের ধারণার থেকে এ ধারণার কতটা তফাত। রাষ্ট্র পরিচালনার ব্যাপারে সকলের অভিমত নেওয়া আবশ্যক —এই হচ্ছে শ্রমিকশ্রেণীর কাম্য; কিন্তু মধ্যবিত্তরা সর্বজনীন ভোটাধিকার চান না, তাঁরা চান সীমিত ব্যবস্থা, আদমসুমারীর মতন একটা ব্যবস্থা।

আমি যেসব ধারণার কথা পর-পর বলে গেলাম, সে সবই হচ্ছে শ্রমিক-শ্রেণীর ধারণা…বর্তমানে ইতিহাসের এমন একটা যুগ এসেছে, যার আরম্ভ হচ্ছে ১৮৪৮ সালের এই ফেব্রুয়ারি মাস, যখন রাষ্ট্র সম্বন্ধে এই ধারণা কার্যকর করে তুলবার ভার নিতে হবে এই নতুন যুগকে। ভদ্রমহোদয়গণ, আমরা আমাদেরই অভিনন্দন জানাতে পারি, এইজন্যে এই অভিনন্দন যে, আমরা এমন সময়ে জন্মেছি যে সময় ইতিহাসের এমন-একটা গৌরবোজ্জ্বল ঘটনার সাক্ষি হয়ে থাকবে, এবং আমরা সেই ঘটনাটি ঘটাবার জন্যে হয়তো অংশ গ্রহণ করারও সুযোগ পাব।

জোহান পিটার হেবেল

নানা ধরণের বৃষ্টি

জোহান পিটার হেবেল (১৭৬০-১৮২৬) দক্ষিণ-পশ্চিম জার্মানীর একজন পাদ্রি ও শিক্ষক ছিলেন। দক্ষিণ-জার্মানীর স্থানীয় ভাষায় কবিতা রচনার তিনি প্রবর্তক, তাঁর গদ্যরচনায় তিনি তার বর্ণনাক্ষমতার চরম ক্ষমতা দেখিয়েছেন। তাঁর ছোটগল্পে এবং তাঁর অনেক মন্তব্যের মধ্যে অনেক সময় নীতিবাক্যের আভাস পাওয়া যায়, এখানে তাঁর রচনার যে দৃষ্টান্ত দেওয়া যাচ্ছে তাতে এর কিছু প্রমাণ পাওয়া যাবে। তার মনের স্বচ্ছতার সঙ্গে সরলতার এবং রসিকতার ও কৌতুকের প্রতি তাঁর প্রবণতার অনেক দৃষ্টান্ত আছে। দৈনন্দিন জীবনের ঘটনা থেকেই তিনি তাঁর রচনার উপকরণ সংগ্রহ করেছেন, কিন্তু তাঁর প্রকাশভঙ্গির বিশিষ্টতার দরুণ তাঁর রচিত গল্পের মধ্যে অতিরিক্ত একটা অর্থও যেন পাওয়া যায়। ১৮০৮ থেকে ১৮১১ সালের মধ্যে এগুলি প্রকাশিত হয়।

সহকারীটি বললেন, ভালো বৃষ্টি কোন্‌টা এ বিষয়ে কোনো প্রশ্নই উঠতে পারে না। ভালো বৃষ্টি হচ্ছে সেইটেই যা দিয়ে ঈশ্বর আমাদের মাঠময়দান সিক্ত করেন, আমাদের আঙুরক্ষেত ভিজিয়ে দেন, আমাদের মধ্যে ফল ও ফসলের ঋতুর আশীর্বাদ পাঠিয়ে দেন। কিন্তু, সহকারীটি জানতে চাইলেন, যদি গন্ধক বা রক্ত, ভেক, শিলা বা এমনকি সেনাদের টুপীর বৃষ্টি হয়, তাকে আমরা কী বলব ?

গন্ধক বৃষ্টি

বসন্তকালের ঝড়ঝঞ্ঝার পরে, সেই ঝড়ের সঙ্গে যদি প্রবল বৃষ্টিপাত হয়ে যায়, তাহলে আমরা জমা-জলের ডোবার কিনার-বরাবর হলুদ রঙের চূর্ণ দেখতে পাই যা অনেকটা গন্ধকচূর্ণের মতন দেখায়। অনেকেই মনে করে থাকেন যে, মেঘের মধ্যে গন্ধকের বাষ্প জমে তারই ফলেই ঝড় হয়, এবং ঝড়ের সময় বৃষ্টির ধারার সঙ্গে ঐ গন্ধক নেমে আসে; একদা যে আগুন ও গন্ধক সোডোম ও গোমোরা-র উপর বৃষ্টির সঙ্গে নেমে এসেছিল তাঁরা সেই কথা স্মরণ করেন। প্রথমত, ঈশ্বরকে এইজন্যে ধন্যবাদ দেব যে আমরা সোডোম বা গোমোরা-য় বাস করছিনে। দ্বিতীয়ত, কোনো জিনিস হয়তো এটার মতন দেখতে বা ওটার মতন দেখতে, কিন্তু আমরা খেসারত দিয়ে জেনেছি জিনিসটা ও-দুটোর কোনোটাই নয়। ডোবার কিনারের ঐ হলুদ রঙের গুঁড়োও গন্ধক নয়, আগুনে ফেললে যদি তা জ্বলতেও থাকে তাহলেও গন্ধক নয়, ওগুলো হচ্ছে গাছ থেকে ঝরে পড়া পুষ্পরেণু। টিউলিপ ফুলের পাপড়ির মধ্যে ছয়টি ছোট্ট স্তম্ভবিশেষ পাক খেয়ে দাঁড়িয়ে আছে, এর প্রত্যেকটির ডগা কালো ধুলোয় ঢাকা। যে-কেউ এই টিউলিপ ফুল শুঁকতে যাবে তার নাকের ডগা কালো হয়ে যাবে। লিলি-ফুলে এই গুঁড়োর রং হলদে, যে-কেউ এই ফুল শুঁকবে তার নাকের ডগা হলুদ হবে। এগুলো হচ্ছে পুষ্পরেণু। সব ফুলেই এই রেণু আছে। ফল বা বীজ গজিয়ে ওঠার জন্যে এর দরকার আছেই। যদি বসন্তকালে প্রবল বর্ষণ হয়, যখন গাছেরা ফুলময় হয়ে আছে, তখন ঐ বৃষ্টির ধারা ঐ রেণুগুলোকে ধুয়ে নামিয়ে নিয়ে আসে, এই জন্যেই গাছে-গাছে ফুল যখন ফুটে ওঠে তখন যদি প্রবল বৃষ্টি হয় তাহলে সে বছর বেশি ফল ফলে না। অনেকগুলো ফুলময় গাছ যদি ঘন হয়ে এক-জায়গায় থেকে থাকে তাহলে বৃষ্টি প্রচুর পরিমাণে এই রেণু নামিয়ে নিয়ে আসে। মাটির উপর এগুলো জমা হয়ে পড়ে থাকে, তারপর জল শুকিয়ে গেলে এগুলো দেখে মনে হয় গন্ধক। গরমকালে বা শরৎকালেই ঝড় বেশি হয়ে থাকে, কিন্তু তখন কেউ এই গন্ধক বৃষ্টি দেখতে পায় না, কেননা সেই সময় কোনো গাছেই তেমন ফুল থাকে না। এ সময় গাছ থেকে আপেল পড়ে নারকেল পড়ে আরও কত ফল পড়ে, কিন্তু কাল্পনিক এই গন্ধক আর পড়ে না।

রক্ত বৃষ্টি

বসন্তকালে বা গরমের দিনে এমন অনেক সময় ঘটে যে, আমরা এখানে-ওখানে বৃষ্টির ফোঁটার মত লাল লাল বিন্দু দেখতে পাই, কোনোটা বা ভিজে কোনোটা বা শুকনো। গাছের পাতায়, বা মাটির উপর রাখা কোনো হালকা রঙের জিনিসে, যেমন ধরা যাক, মাঠের উপরে শুকোতে দেওয়া কাপড়ে এই বিন্দু দেখা যায়। এসব কোথা থেকে এসেছে তা বুঝতে ন পেরে, স্বাভাবিক কিছু না ভেবে অলৌকিক ঘটনা বলে মনে করাতেই মানুষের আগ্রহ ব'লে তারা সহজেই বলে যে রক্ত বৃষ্টি হয়েছে, এবং তার মানেই যুদ্ধ।

হলদে রঙের কিছু হলেই তা যেমন গন্ধক নয়, লাল রঙের সব-কিছুই তেমনি রক্ত নয়। এ ক্ষেত্রে ব্যাপারটা এই। ছোট্ট একটা গুঁটি-পোকার ডিম সারাটা শীতকাল কোনো ঝোঁপেঝাড়ে বা গাছের ডালে আটকে থাকে, বসন্তকাল এলে সূর্যের তাপে সেই ছোট ডিমে যেন তা দেওয়া হয়, ডিম ফোটে। কয়েক সপ্তাহ পরে গুঁটিপোকাটি বেশ বড় ও গোলগাল হয়ে ওঠে, গুড়ি দিয়ে দিয়ে সে কোনো উঁচু জায়গায় উঠে যায়,আর তার নীচের অংশ দিয়ে আঁকড়ে ধরে কোনো জায়গা, মাথার দিক থাকে ঝুলে, তার পর গায়ের খোলস খুলে ফেলে অদ্ভুত একটা ক্ষুদে জীব হয়ে ওঠে যার মাথাও নেই পাও নেই পাখাও নেই। তখন এটাকে দেখে বলাই অসম্ভব যে, এটা শেষ পর্যন্ত কী দাঁড়াবে। এর কিছুদিন পরে এর চামড়া ফেটে যায়, আর এর শরীরের নীচের অংশ থেকে পাখার মত কী গজায়, তখনই বোঝা যায় যে, এ হতে চলেছে একটা প্রজাপতি। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই, এই সময়টা সে চুপচাপ থাকে, তার রংচঙে পাখা ফুটে বেরিয়ে এসেছে। ছয় থেকে আট ফোঁটা লাল রং তার পিছনের অংশ থেকে ঝরে মাটিতে পড়ে। তখন তৈরি হয়ে গেল প্রজাপতি, পাখা মেলে মনের আনন্দে সে উড়তে আরম্ভ করল হাওয়ায় শরীর ভাসিয়ে, উড়ে চলল ফুলে-ফুলে। একটা কদাকার কুৎসিত গুঁটি-পোকাকে ঈশ্বর একটা বর্ণময় প্রজাপতি ক'রে দিতে পারেন। বসন্তকালে যখন ঝোঁপঝাড় গাছগাছড়া অনেক সূক্ষ্ম জালে জড়িয়ে থাকে তখন হাজার হাজার ক্ষুদে ডিম এর মধ্যে ঢাকা থাকে, সূর্যের তাপ একসঙ্গে এদের সকলকে ফুটিয়ে দেয়। এদের সকলে যদি উপযুক্ত খাদ্য পায় আর হেঁটে যায় তবে একই সময়ে তারা সকলে হয়ে উঠবে প্রজাপতি। এরা সকলে যখন একত্র সমবেত

থাকে আর একই সময়ে প্রজাপতি হয়ে উড়ে যায় তখন তারা এই লাল লাল ফোঁটা ছড়িয়ে চলে যায়। একটা বাগানে এই রকম এক'শ প্রজাপতি আট'শ ফোঁটা ছড়াতে পারে, আর একেই কিনা মনে করা হয় রক্ত বৃষ্টি।

ভেক বৃষ্টি

অনেক সময় অনেকে ভেক বা ব্যাঙ বৃষ্টির কথা বলে থাকে। কিন্তু কেউ কখনো ব্যাঙকে বৃষ্টির সঙ্গে ঝরে পড়তে দেখেনি। ব্যাপারটা এই। গরম-কালে যখন একটানা তাপ চলেছে তখন এই ব্যাঙেরা আশপাশের বনজঙ্গলে গিয়ে আস্তানা নেয়, কারণ ঐসব জায়গা একটু ঠাণ্ডা ও স্যাঁতসেঁতে। তারা এমন ভাবেই লুকিয়ে থাকে যে তাদের কেউ দেখতে পায় না। যখন এক পশলা বৃষ্টি নামে, তখন তারা দলে-দলে বেরিয়ে আসে, ভিজে মাটিতে ও ভিজে ঘাসে শরীর ডুবিয়ে তারা আরাম উপভোগ করে। যে-কেউ এমন কোনো জায়গায় গিয়েছে এবং হঠাৎ একসঙ্গে এতগুলো ব্যাঙের আবির্ভাব দেখেছে, সে অবাক হয়েছে। যেখানে একটাও ব্যাঙ ছিল না। হঠাৎ সেখানে এতগুলো এল কী করে তা কল্পনাও করতে সে পারেনা। এই জন্যেই সরল মানুষেরা মনে করে যে ব্যাঙ বৃষ্টি হয়েছে। আলস্যের দরুণ মানুষ অনেক যুক্তিহীন ও অসম্ভব ব্যাপারও বিশ্বাস করে নিতে চায়, এর জন্যে কোনো ঝঞ্ঝাটের মধ্যে যেতে চায় না, খোঁজখবর করতে চায় না যে, যা তারা বুঝতে পারছেনা তার কারণটা সঠিক কী।

শিলা বৃষ্টি

কিন্তু শিলা বৃষ্টির ব্যাপারে ঘটনাটা একেবারে অন্য রকম। এটা কোনো কল্পনার ব্যাপারই নয়। এর অনেক পুরাতন নজির আছে, সাম্প্রতিক প্রমাণও এর আছে যে, কখনো এক-একটা বেশ ভারি শিলা, কখনো-কখনো নানা আকারের অনেকগুলো শিলা কোনো হুঁশিয়ারি না দিয়েই আকাশ থেকে পড়েছে। এ বিষয়ে সবচেয়ে পুরনো ঘটনা যিশুখ্রীষ্টের জন্মের ৪৬২ বছর আগের। ঐ বছর মস্ত একটা শিলা আকাশ থেকে এসে পড়ে থ্রেস্-এ—এখন যা হচ্ছে তুরস্কের একটা প্রদেশ রুমিলি। সেই সময় থেকে আজ পর্যন্ত, অর্থাৎ এই ২২৬৭ বছরে—অবশ্য যতটা আমরা জানি—আটত্রিশ বার এরকম শিলাপাত ঘটেছে। যেমন, ১৪৯২ সালের ৪ নভেম্বর তারিখে ২৬০ পাউণ্ড ওজনের একটা শিলা

পড়েছিল এনসিশেম-এ। ১৩৭২ সালে ২০০ ও ৩০০ পাউণ্ড ওজনের দুটি শিলা পড়ে ইতালীর ভেরোনার কাছে। আমরা সকলেই জানি, পুরাতন কালের কাহিনী বলা বেশ সোজা। কিন্তু এ সব সত্যি কিনা কাকে জিজ্ঞাসা করব? কিন্তু সাম্প্রতিক অন্য কয়েকটি ঘটনা থেকে পুরাতন কালের বিবরণের সত্যতা মেলে। ১৭৮৯ সালে, এবং ১৭৯০ সালের ২৪ জুলাই ফ্রান্সে, এবং ১৭৯৪ সালের ১৬ জুন ইতালীতে আকাশ থেকে অনেক শিলা পড়েছিল, অর্থাৎ অনেক উঁচু থেকেই পড়েছিল। আবার, ১৮০৩ সালের ২৬ এপ্রিল দুই থেকে তিন হাজার শিলার হঠাৎ বর্ষণ হয়েছিল প্রচণ্ড শব্দের সঙ্গে ফ্রান্সের অরনে বিভাগের লা'ইগলে নামক গ্রামে।

১৮০৮ সালের ২২ মে রবিবার আকাশ থেকে শিলাপাত ঘটে মোরাভিয়ায়। অস্ট্রিয়ার সম্রাট বিশেষজ্ঞদের দিয়ে এ বিষয়ে অনুসন্ধানের জন্যে আদেশ দেন, সেই অনুসন্ধানের বিবরণ হচ্ছে এই।

সকালটা বেশ মনোরমই ছিল, ভোর সাড়ে পাঁচটা নাগাদ চারদিক কুয়াশায় ভরে যেতে আরম্ভ করল। স্ট্যানার্ন-এর অধিবাসীরা তখন গির্জার দিকে চলেছে, এ বিষয়ে তারা কিছুই ভাবেনি। হঠাৎ তারা তিনবার প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দ শুনল, তাদের পায়ের নীচের মাটি কেঁপে উঠল, তার পর হঠাৎ কুয়াশা এমন ঘন হয়ে এল যে, তারা তাদের বারো-পা আগের মানুষ-জনই কেবল দেখতে পেল। এর পর কয়েকটা অস্পষ্ট শব্দ তারা শুনল, মনে হল যেন এক-নাগাড়ে বন্দুকের গুলী ছোড়া হচ্ছে, কিংবা যেন ড্রাম পেটা হচ্ছে। ঐ ড্রাম-বাদনের শব্দ এবং মাঝে-মাঝেই বাঁশির আওয়াজ শুনে সকলে ভাবল যে তুর্কী সংগীত সহযোগে তেলিশের সেনাবাহিনী বুঝি এগিয়ে আসছে। তারা গোলা-বর্ষণের কথা ভাবেনি। তারা বিস্ময়ে ও ভয়ে পরস্পরের মুখের দিকে তাকাচ্ছে, এমন সময় চার ঘণ্টার হাঁটা-রাস্তা যতটা হয় চারদিকের সেই রকম দূরত্ব ঘিরে এমন প্রবল বৃষ্টি নামল যার হাত থেকে কোনো ওভারকোট বা অন্য কোনো আচ্ছাদন দিয়েও রক্ষা নেই। অনেক রকমের শিলা, আখরোটের আকার থেকে আরম্ভ করে একটা শিশুর মাথার আকার, এবং ওজনের দিক থেকে সিকি আউন্স থেকে আরম্ভ ক'রে দশ পাউণ্ড, পড়তে আরম্ভ করল আকাশ থেকে; তার একটানা গুড় গুড় শব্দ ও বাঁশির মত আওয়াজ বাজতে লাগল। কোনোটা পড়তে লাগল সোজাসুজি কোনোটা-বা একটু আড়াআড়ি ভাবে। অনেকেই এটা দেখছিল,

এবং পড়ামাত্রই যে শিলা কেউ কুড়িয়ে নিয়েছে সে দেখেছে সেটা একটু গরম। প্রথমে যেগুলি পড়ে তা তাদের ওজন অনুযায়ী মাটির মধ্যে গেঁথে যায়। কোনো কোনোটা তু-ফুট গভীর থেকে খুঁড়ে বার করা হয়েছে। পরে যেগুলি পড়ে সেগুলি কেবল মাটির উপরেই পড়ে থাকে। এগুলির ভিতরটা ধূসর ও বালি-বালি কিসব উপাদানে গড়া, আর চকচকে কালো আবরণ দিয়ে মোড়া। কেউ বলতে পারে না এরকম কতগুলো পড়েছিল। অনেকগুলিই হয়তো চাষের জমিতে পড়েছে এবং মাটির নীচেই রয়ে গিয়েছে। যেগুলি পাওয়া গিয়েছিল ও একত্র করা হয়েছিল তার ওজন আড়াই হন্দর। সব ব্যাপারটা স্থায়ী হয়েছিল ছয় থেকে আট মিনিট, কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই কুয়াশা কেটে গিয়েছিল, তুপুরের মধ্যে সব ঝরঝরে পরিস্কার হয়ে ওঠে, সবই আবার হয়ে ওঠে শান্ত। কিন্তু এ ধরণের শিলাপাতের কারণ বিশেষজ্ঞেরা তা গোপন রাখতে চান, এ বিষয়ে তাঁদের কাছে জানতে চাইলে তারা বলেন তাঁরা কিছু জানেন না।

টুপী বৃষ্টি

কিছুতেই যার কারণ বোধগম্য হয় না সেই রকম একটা ঘটনা হচ্ছে এই যে, একবার নাকি সৈন্যদের টুপীর বৃষ্টি হয়েছিল। স্যাক্সনির কোনো এক গ্রামের এক অধিবাসী নাকি একদিন বিকেলের দিকে ক্ষেতে কাজ করছিল, ক্ষেতটা পাহাড় থেকে বেশি দূরে না। হঠাৎ আকাশ ঘনঘটায় ভরে গেল; সে দূরে বজ্রধ্বনি শুনতে পেল; চারদিক অন্ধকার করে এল, একটা বিরাট কালো মেঘ আকাশ ছেয়ে ফেলল, ঐ লোকটা কিছু বুঝবার আগেই তার ডান দিকে ও বাঁ দিকে তার গায়ে আকাশ থেকে পড়তে লাগল টুপী। সারা ক্ষেতটাই কালো হয়ে গেল, ক্ষেতের মালিক তখন শ খানেক টুপীরও প্রায় মালিক। হতবাক হয়ে সে ছুটে তার বাড়িতে গিয়ে সকলকে ব্যাপারটা বলল। প্রমাণ হিসেবে সে একা যতগুলি আনতে পারে ততগুলি টুপী সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিল। অবশ্য স্থানীয় টুপীওয়ালা এতে অসন্তুষ্টই হয়েছিল। কয়েকদিন পরে জানা গেল, ঐ পাহাড়ের ওপারের সমতলভূমিতে এক সেনাবাহিনী কুচকাওয়াজ করছিল, তখন হঠাৎ দমকা বাতাস এসে সেপাইদের মাথার টুপী উড়িয়ে নিয়ে যায়, সেই টুপী হাওয়ার ধাক্কায় উঠে যায় আকাশে, তার পর পাহাড়ের ওপারে গিয়ে পড়ে। এই গল্প অনেকে করে। এটা কি

একেবারেই অসম্ভব নয়? কিন্তু এর জন্যে যেমন দরকার খুব তেজি ঘূর্ণি-বাতাস, তেমনি দরকার তেজি বিশ্বাস।

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কাঠামো সম্বন্ধে কয়েকটি সাধারণ কথা

সহৃদয় পাঠক যখন তাঁর পরিচিত পাহাড়ের ও বৃক্ষের নিকটে তার পারিবারিক পরিবেশে বসেন কিংবা যখন ঈগ্‌ল সরাইখানায় একটা গ্লাস নিয়ে বসেন তখন তিনি বেশ আরামেই থাকেন, এবং কিছুই ভাবেন না। কিন্তু সকালে যখন সূর্য তার নিঃশব্দ মহিমা নিয়ে উদিত হয় তখনও তিনি জানেন না এ সূর্য কোথা থেকে এল, সন্ধ্যায় যখন সূর্য অস্ত যায় তখনও তিনি জানেন না সূর্য চলল কোথায়, রাত্রে তার আলো সে কোথায় লুকিয়ে রাখে তাও তিনি জানেন না, আবার পাহাড়ের কোন্ পথ ধরে তার আবার আগমন ঘটবে তাও তিনি জানতে চান না। কিংবা, যখন চাঁদ কখনো ফিকে আলো নিক্ষেপ করে কখনো শীর্ণ হয়ে রাত্রি পাড়ি দিয়ে চলেছে, কখনো সে গোলাকার হচ্ছে কখনো হচ্ছে পরিপূর্ণ---এসব কি করে হচ্ছে তাও তিনি জানেন না। যখন তিনি তারকাময় আকাশের দিকে তাকান, এবং দেখেন যে, একটা তারা খুব সুন্দর ভাবে ও খুব উজ্জ্বল ভাবে দপদপ করছে তখন তিনি ভাবেন যে এসব তাঁর সুবিধের জন্যেই ঘটছে; তবুও তিনি জানতে চান না এসব কী ও কেন। প্রিয় বন্ধু, প্রত্যহ এসব দেখা এবং এসব সম্বন্ধে কিছু জানতে না-চাওয়া প্রশংসার কাজ নয়। আকাশ হচ্ছে ঈশ্বরের দয়াবানতার ও শক্তিমানতার এক বিরাট গ্রন্থ, এতে সংস্কারের হাত থেকে উদ্ধারের উপযোগী অনেক তথ্য আছে, ঐ তারাগুলো হচ্ছে ঐ গ্রন্থের সোনালি অক্ষর। কিন্তু এটা আরবি-তে লেখা, দোভাষী না হলে এর পাঠ উদ্ধার করা যাবে না। কিন্তু একবার যে এই বই পড়তে শিখেছে ও পড়ে থাকে, সে আর কখনো গালে হাত দিয়ে বসে সময় কাটাতে পারবে না—রাত্রিবেলা একবার যদি সে পথে একা পড়ে যায়। কোনো অপকর্ম করার জন্যে অন্ধকার যদি তাকে হাতছানি দেয়, সে আর পারবে না অন্যায় করতে।

অ্যালেকজাণ্ডার ফন হামবোলডট

আমেরিকার সম-দিবারাত্রি অঞ্চলে ভ্রমণ

নিসর্গবিদ্ অ্যালেকজাণ্ডার ফন হামবোলডট (১৭৬৯-১৮৫৯) তাঁর ভ্রাতা ভিলহেলমের মতই জার্মানীর ক্লাসিক যুগের মানসিকতার অধিকারী ছিলেন। সেই সঙ্গে নিসর্গ-বিজ্ঞানের উন্নতির জন্যেও তিনি অনেক কাজ করে গিয়েছেন। ১৭৯৯-১৮০৪ সালে তিনি মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকা অভিযানে বের হন তাঁর ফরাসী বন্ধু বঁপলার্দ-এর সঙ্গে। তাঁর এই ভ্রমণ বৃত্তান্ত ত্রিশ খণ্ডে সম্পূর্ণ, ১৮১১ থেকে ১৮২৬ সাল পর্যন্ত এটি রচনা করেন প্যারিসে। এতে বিষয়টির উপর তাঁর পূর্ণ-অধিকারের পরিচয় আছে। আমাদের উদ্ধৃতাংশ দাস-ব্যবসায় নিয়ে আলোচনা, এতে স্পেনীয় বিজয়ের ও ধর্মপ্রচারকদের শাসনের সূক্ষ্ম ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ আছে। হামবোলডট অনেক কথার মধ্যে একথাও বেশ খোলসা করেই বলেছেন যে, ধর্মপ্রচারকদের প্রাথমিক উদ্যমটা ছিল আদর্শের মোড়কে ঢাকা অর্থনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির ফিকির।

কুমানা-র আমাদের বাড়িটা যদি নক্ষত্র পর্যবেক্ষণের ও হাওয়ার নানাবিধ গতি নিরীক্ষণের পক্ষে আদর্শ জায়গা হয়ে থাকে, এটা তাহলে দিনের বেলায় অনেক বেদনাদায়ক দৃশ্য দেখারও উপযোগী জায়গাও বটে। বিরাট পার্কটির একাংশ তোরণ দিয়ে ঘেরা, তার উপরে সেই লম্বা কাঠের গ্যালারি আছে, গরমের দেশে যা নাকি সচরাচর দেখা যায়। আফ্রিকার উপকূল থেকে দাসেদের নিয়ে এসে এই জায়গায় বিক্রি করা হত। ইউরোপীয় সমস্ত গবর্নমেণ্টের মধ্যে ডেনমার্কই প্রথম এই ব্যবসা বন্ধ করে; অনেক দিন ধরে ডেনমার্কই একমাত্র শক্তি রূপে গণ্য ছিল। তবু, এই ঘটনা সত্ত্বেও, এ কথার উল্লেখ করতে হবে যে, প্রথম যে নিগ্রোদের আমরা বিক্রি হতে দেখি তাদের নামানো হয়েছে ডেনমার্কেরই এক দাস-জাহাজ থেকে। মানবিকতার কর্তব্য কি কি—জাতীয় মর্যাদা অথবা নিজেদের লোভী স্বার্থসিদ্ধির জন্যে নিজ দেশের আইনের দ্বারা নিজের দেশের লোককে প্ররোচিত করা?

যেসব দাস বিক্রি করা হত তাদের বয়স ছিল পনেরো থেকে কুড়ির মধ্যে। প্রত্যেক দিন সকালবেলা তাদের মধ্যে নারকেল তেল বিলি করা হত, এই

তেল দিয়ে তারা গা মাজত যাতে তাদের গায়ের চামড়া কালো কুচকুচে হয়। যারা এদের কিনতে আসত তারা এদের দাঁত পরীক্ষা করে দেখত—তাদের বয়স ও স্বাস্থ্য সম্বন্ধে এ'তে বেশ ধারণা হত। আমরা বাজারে ঘোড়া কিনতে গিয়ে যেভাবে জোর করে তার মুখ ফাঁক করে দেখি, সেইভাবে আর কি। এই ঘৃণ্য রীতিটার সূত্রপাত আফ্রিকায়। সারভ্যানটিস অনেকদিন মূরেদের বন্দীশালায় আটক ছিলেন, তিনি এ বিষয়ে চমৎকার চিত্র অঙ্কন করে গিয়েছেন, এ্যালজিয়ার্সে খ্রীষ্টান দাস বিক্রির নিখুঁত বর্ণনা তিনি দিয়ে গিয়েছেন। একথা ভাবাও কষ্টদায়ক যে এ আমলেও ওয়েষ্ট ইণ্ডিজে এমন ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক আছে যারা গরম লোহা দিয়ে তাদের দাসেদের গায়ে ছাপ দিয়ে দেয়, তারা পালিয়ে গেলে তাদের যাতে আবার ধরা যায়, এইজন্যে তাদের এই কাজ। যারা "অন্যের পরিশ্রম বাঁচায়, তাদের চাষাবাদ করতে হয় না ফসল তোলার দায় তাদের থাকে না" তাদেরই উপর করা হয় এই ব্যবহার।

নিগ্রোদের প্রথম বিক্রির ব্যাপারটা আমাদের মনে যতই দাগ কেটে থাক্, আমরা আমাদের এইজন্যে অভিনন্দন জানাই যে, আমরা এমন মানুষদের মধ্যে বাস করছি এবং এমন একটা মহাদেশে বাস করছি যেখানে ঐ রকমের দৃশ্য দেখা যায় না, এবং যেখানে দাসেদের সংখ্যা অকিঞ্চিৎকর। ১৮০০ সালে কুমানা ও বার্সিলোনা প্রদেশ-দুটিতে দাসেদের সংখ্যা ছয় হাজারের কম ছিল। এখানকার লোকসংখ্যা এক লক্ষ দশ হাজার। আফ্রিকার দাস নিয়ে ব্যবসা স্পেনীয় আইন কখনোই ভালো চোখে দেখেনি: আফ্রিকার এই দাস নিয়ে ব্যবসা এইসব উপকূলে প্রায় না-থাকার মতনই ছিল, তখন সেই ষোড়শ শতকে আমেরিকার দাস নিয়ে ব্যবসা এখানে ভীষণ ভাবে চলেছে। মাকারাপান—পুরাতন কালে যার নাম ছিল আমারাকাপানা, কুমানা, আরায়া, এবং বিশেষ করে কুবাগুয়া দ্বীপে তৈরি নিউ কডিজ ছিল সে আমলের দাস-ব্যবসার বড়-বড় ঘাঁটি। মিলানের গিরোলামো বেনজোনি বাইশ বছর বয়সে টেরা ফারমা দেখতে এসেছিলেন, তিনি ১৫৪২ সালে কারিয়াকো-র বোরডোনেস উপকূলে ও পারিয়াতে কয়েকটি অভিযানে অংশ নেন, তাঁর উদ্দেশ্য ছিল হতভাগ্য দাসের নিয়ে যাওয়া। তিনি বেশ সহজ ভাবে এবং যে দরদ সে-আমলের ঐতিহাসিকদের মধ্যে বিশেষ ছিল না, সেই রকম দরদ দিয়েই, তিনি চাক্ষুষ যে নির্দয়তা ও নিষ্ঠুরতা দেখেছেন তার অনেক

দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। তিনি দেখেছেন, দাসেদের নিউ কাডিজে টেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, তাদের কপালে ও হাতে ছাপ মারার জন্যে ও রাজার অফিসারদের টাকা দেবার জন্যে। এই বন্দর থেকে তাদের পাঠানো হত হাইতি দ্বীপে বা সেণ্ট ডমিংগোতে। পাঠানো হত, কেননা তাদের প্রভু বদল হয়েছে, তাদের বিক্রি করা হয় নি, সেনারা তাদের জন্যে পাশা খেলে জিতে গিয়ে তাদের মালিক হয় গিয়েছে।

আমাদের প্রথম অভিযান হয় আরায়া-তে, এবং সেইসেই জায়গায় যেখানে আগে দাস-ব্যবসা খুব চলত ও সমুদ্র থেকে মুক্তো তোলা হত। ১৯ আগষ্ট রাত প্রায় দুটোর সময় আমরা রায়ো ম্যানজানারেস-এ নামলাম। এখানে আসার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল আরায়ার দুর্গের ধ্বংসাবশেষ দেখা, লবণের কারখানা দেখা, এবং ম্যানিকোয়ারেজ নামে সরু উপদ্বীপের কিনারের পাহাড়ে কিছু ভূতাত্ত্বিক অনুসন্ধান চালানো। রাত্রিটা ছিল বেশ আরামপ্রদ ঠাণ্ডা, জোনাকিরা আশেপাশে উড়ে বেড়াচ্ছে, নদীর কিনার বরাবর গাছের মিছিল। আমরা জানি যে, এই জোনাকি ইতালীতে ও দক্ষিণ-ইউরোপে কত সাধারণ জিনিস। কিন্তু এখানে তারাই যে একটা অপরূপ চিত্র ফুটিয়ে তুলছে তা সেখানকার সেই অজস্র চলমান আলোকবিন্দুর সঙ্গে তুলনীয় নয়; এই গ্রীষ্ম-মণ্ডলের রাত্রির সৌন্দর্য তারা বাড়িয়ে তুলছে, এবং মনে হচ্ছে যেন সাভানা ঘাসের বিস্তারের উপরে ওই আলো প্রতিবিম্বিত হয়ে উঠছে, মনে হচ্ছে যেন আকাশের ঐ তারকামণ্ডল নেমে এসেছে পৃথিবীতে।

আমরা যখন নদীর দিকে নেমে আবাদ ভূমির দিকে গেলাম তখন দেখলাম নিগ্রোরা আগুন জেলে বহ্ন্যুৎসব আরম্ভ করে দিয়েছে। পাম-গাছের উপর আলো পড়েছে, এবং ধোঁয়া পাক খেয়ে খেয়ে উঠছে আর আকাশের চাঁদের রং যেন একটু লালচে করে দিয়েছে। রবিবারের রাত, একটা গীটার বাজিয়ে সেই তালে-তালে দাসেরা নৃত্য করছে। আফ্রিকার নিগ্রো জাতিরা উদ্যমের ও আনন্দের যেন ভাণ্ডার। সপ্তাহের কাজ সাঙ্গ করার পর তারা গভীর নিদ্রার বদলে নাচ ও গান করে রাত কাটানোই পছন্দ করে। এই অসতর্কতার ও এই চপলতার আমরা যেন নিন্দে না করি, দুঃখ ও বেদনাপূর্ণ জীবনের তিক্ততা এর দ্বারা কিছুটা হালকা হয়। এই পারিয়া অন্তরীপেই কলম্বাস প্রথম এই মহাদেশের সাক্ষাৎ পান; প্রান্তরের শেষ ওখানেই, এই জায়গাটা পতিত ভূমি করে দিয়েছে যুদ্ধবাজ নরমাংসভোজী কারিব, ও

ইউরোপের মার্জিতরুচি বণিক জাতিরা। ষোড়শ শতকের গোড়ার দিকে মারাকাপানের করুপানোর উপকূলে এখানকার অধিবাসীদের উপর ঠিক তেমনি ব্যবহার করা হত, যেমন ব্যবহার এ কালে আমরা করি গায়নার কিনারের অধিবাসীদের উপর। এখানকার জমিতে চাষ হত, এবং এখানকার ফলমূলের গাছ অন্যত্র চালান যেত, কিন্তু নিয়মিতভাবে উপনিবেশ প্রতিষ্ঠার কোনো ব্যবস্থা তখনও এই নূতন মহাদেশে হয়নি। স্পেনের লোকেরা এখানে যে আসত, তার কারণ হচ্ছে গায়ের জোরে বা কোনো-কিছুর বিনিময়ে দাস মুক্তো বা সোনার দানা সংগ্রহ করা। এই যে লোভী উদ্দেশ্য, এ'কে ঢাকবার জন্যে ধর্মের প্রতি তীব্র আসক্তির ভান করা হত। প্রত্যেক যুগেরই এ দিক থেকে নূতন পদ্ধতি আছে, সেই যুগের হাওয়া পদ্ধতিরই বদল হয়, চরিত্রের নয়।

আফ্রিকার নিগ্রোদের নিয়ে যেরূপ নৃশংসভাবে ব্যবসা করা হয়েছে ঠিক সেইভাবেই এই তাম্রবর্ণ ইণ্ডিয়ানদের নিয়ে ব্যবসা চলল। এই ফলও দাঁড়াত এক, বিজয়ী ও বিজিত দু পক্ষই আরও হিংস্র হয়ে উঠত। এর থেকেই স্থানীয় লোকদের মধ্যে লড়াই হামেশাই ঘটতে লাগল; বন্দীদের টেনে-হেঁচড়ে নিয়ে যাওয়া হত উপকূল অবধি, সেখানে তাদের বিক্রি করা হত শ্বেতকায়দের কাছে, তারা এদের শিকলে বেঁধে জাহাজে করে নিয়ে যেত। স্পেনীয়রা কিন্তু সে সময়ে, এবং তার অনেক পর পর্যন্তও ইউরোপীয় জাতিসমূহের মধ্যে মার্জিত জাতি হিসাবে গণ্য ছিল। শিল্পকলা ও সাহিত্য ইতালীর উপর যে আলোকপাত করেছিল, তা প্রতিফলিত হয়েছিল সেইসব জাতির মধ্যে যাদের ভাষার উৎপত্তি ঘটে সেই উৎস থেকেই দান্তের ও পেত্রার্কের ভাষার উৎপত্তি যে উৎস থেকে। হয়তো আশা করা গিয়েছিল যে মনের এই নূতন জাগরণে এবং কল্পনার এই উন্নত উন্মেষে সাধারণভাবেই আচার-আচরণেরও উন্নতি ঘটবে। কিন্তু ধনলিপ্সাই নিয়ে এসেছে ক্ষমতার অপপ্রয়োগ, ইউরোপের জাতিরা ইতিহাসের প্রতিটি যুগেই দূর-দূর দেশে গিয়ে তাদের চরিত্রের একই পরিচয় দিয়ে এসেছে। দশম লিও-র সেই প্রখ্যাত রাজত্বকালটি নূতন বিশ্বে এমন নিদারুণ নিষ্ঠুর আচরণ করেছে যা বর্বর যুগের উপযুক্ত বলেই গণ্য হতে পারে। আমেরিকা-বিজয়ের সময়ের যে ভয়াবহ চিত্র আমরা পেয়েছি তাতে আমরা কমই বিস্মিত হয়েছি, কেননা এত মানবিকতা সংক্রান্ত আইন-কানুনের সুযোগ পাওয়া সত্ত্বেও আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলে এখনো যে সব আচরণ করা হচ্ছে তাও নেহাত কম ভয়াবহ নয়।

পঞ্চম চার্লস যে-নীতি গ্রহণ করলেন তার ফলে ঐ নূতন মহাদেশে দাস-ব্যবসা বন্ধ হল। কিন্তু স্পেনীয় এই আক্রমণকারীরা এই অনুপ্রবেশ চালিয়ে যাওয়ায় এবং ছোটখাটো লড়াই দীর্ঘ দিন ধরে চালিয়ে যাওয়ায় আমেরিকার লোকসংখ্যা কমে যায়, এবং জাতিতে-জাতিতে শত্রুতা দানা বেধে ওঠে, এবং দীর্ঘকাল ধরে সভ্যতার বীজ অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়। অবশেষে এল ধর্ম প্রচারকেরা, তারা ধর্মের ধ্বজা তুলে শান্তির বাণী বলতে লাগল। ধর্মের এই একটা সুবিধে আছে এই যে, ধর্মের নামেই মানুষের উপর যে অত্যাচার করা হয়েছে ধর্মের কথা দিয়েই তার জন্যে সান্ত্বনা দেওয়া যায়। রাজাদের সামনেও সাধারণের হয়ে কথা বলা চলে, হিংসায় বাধা দেওয়া যায়, এবং যাযাবরদের ছোট ছোট দলে আবদ্ধ করে মিশন প্রতিষ্ঠা করা যায়, এই মিশনের কল্যাণে কৃষিরও উন্নতি করা যায়। পূর্ব পরিকল্পনা অনুসারে ধীরে ধীরে গড়ে তোলা যায় মঠ, এটা একটা একক ব্যবস্থা যা নাকি ক্রমশই বাড়তে থাকে, এবং ফ্রান্সের থেকে চার বা পাঁচ গুণ বড় এলাকা জুড়ে ধর্মের অনুশাসন কায়েম করা যায়।

কিন্তু এইসব প্রতিষ্ঠান প্রথমত রক্তপাত বন্ধের জন্যে প্রয়োজনীয় বলে স্বীকৃত হলেও এবং সমাজের প্রথম ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করলেও, তারা অগ্রগতির পরম শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিচ্ছিন্ন করে নেবার এই যে পদ্ধতি এর ফল হয়েছে এই যে, সেই ইণ্ডিয়ানরা এই মিশনারীর চতুষ্পার্শে জমায়েত হবার আগে যে অবস্থায় ছিল এখনো সেই অবস্থায়ই আছে। তাদের সংখ্যা বেড়েছে অনেক, কিন্তু তাদের আইডিয়ার কোনো বিস্তার ঘটেনি। তারা ক্রমশ তাদের চরিত্রের বলিষ্ঠতা হারিয়েছে এবং স্বাভাবিক উদ্যমও তাদের কমে গিয়েছে, যে বলিষ্ঠতা ও উদ্যম হচ্ছে স্বাধীনতারই পরিণতি। তাদের গার্হস্থ্য জীবনের সামান্য কাজকেও নানারকম নিয়মে বেঁধে, তাদের অনুগত করার বদলে তাদের বেকুব বানানো হয়েছে। তাদের জীবিকার কোনো ভাবনা নেই, তাদের স্বভাব হয়েছে বেশ শান্ত, কিন্তু মিশনের শাসনের একঘেয়েমির দরুণ তাদের চোখের স্তব্ধ দৃষ্টিই বলে দেয় যে তারা এই আশ্রয়-স্থলে এসেছে দুঃখের সঙ্গে সব স্বাধীনতা বিসর্জন দিয়েই। মঠের এই পদ্ধতিতে রাষ্ট্র অনেক কাজের লোকের যোগ্যতা থেকে বঞ্চিত হয়েছে, কিন্তু এই পদ্ধতি অনেক সময় অনেক উত্তেজনা প্রশমন করে, যে দুঃখ ঘুচবে না তার জন্যেও সান্ত্বনা দেয়; এবং মনকে প্রস্তুত করে সাধনার জন্যে। কিন্তু নূতন

বিশ্বের মাটিতে তাদের অন্যত্র থেকে উপড়ে নিয়ে এসে পুঁতে দেওয়া; সমাজের অগন্য ব্যাপারে তাদের নিয়োগ করা ইত্যাদির ফলে এর পরিণাম হয়েছে ভয়াবহ! এদের বুদ্ধিগত দিকটা বংশ-পরাম্পর শৃঙ্খলিত হয়ে থাকবার মতন হয়ে আছে, জাতিতে-জাতিতে মেলামেশায় বাধা পেয়ে আসছে, এবং যা-কিছুই মনকে উন্নত করে বা ধারণাকে ব্যপ্ত করে, তার উপরেই এরা খাপ্পা হয়ে থাকে। এইসবগুলির সম্মিলিত ফলে, যারা এই সব মিশনে বাস করে তারা সব রকম উন্নয়নের থেকে অনেক দূরে থেকে যায়। একে আমরা বলব, অনড় অবস্থা, সমাজ যদি মানুষের মনের পিছন-পিছন না চলে, এগিয়ে যেতে না পারে, তাহলে তাকে পিছিয়ে পড়াই বলতে হবে।

মেরি ফন এবনার-এশেনবাক

প্রতিবেশীরা

তাঁর নভেলে ও ছোটগল্পে মেরি ফন এবনার-এশেনবাক (১৮৩০-১৯১৬) ভিয়েনার অস্ট্রিয় সমাজজীবনের চিত্র এঁকেছেন এবং সেই সঙ্গে অনেক মনস্তাত্বিক অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে চাষীদের জীবনের কাহিনীও লিপিবদ্ধ করেছেন। তাঁর রচনার মধ্যে নীতিবোধ বেশ স্পষ্টভাবে ফুটেছে এবং সামাজিক ন্যায়-বিচার সম্বন্ধে তাঁর সচেতনতাও বেশ স্পষ্ট; তাঁর লিখিত সমালোচনাতেও তাঁর এই মনোভাব প্রকাশিত। তাঁর রচিত উপকথা ও রূপকথার একটি সংগ্রহ ১৮৯২ সালে প্রকাশিত হয়; এই সংগ্রহ-গ্রন্থ থেকেই আমরা "দি নেবার্স" রচনাটি উদ্ধার করছি। এটি একটি সুন্দর ও সহজবোধ্য রূপক; এর আবেদন বরাবরের।

সাদা-চুলের মানুষ ও কটা-চুলের মানুষ—দুজন ছিল প্রতিবেশী। দুজনই ছিল নম্র স্বভাব মেষপালক-উপজাতির দুই প্রধান। তারা দুজন দুজনের প্রয়োজন অনুসারে তাদের ক্ষেতের ফসল দুজনের মধ্যে বিনিময় করে নিত। বিপদে-আপদে দুজন দুজনের ছিল সহায়। কেউই বুঝতে পারত না এদের দুজনের মধ্যে কার দিকে একটু ঝুঁকলে বেশি লাভ হবে।

শরৎকালের একটি দিনে একটা ঘটনা ঘটল—ভীষণ বেগে ঝড় এসে কটা-চুলের মানুষটির জঙ্গলে অনেক ক্ষতি করে দিল। অনেক কচি-কচি

গাছ হয় উপড়ে গেল কিংবা ভেঙে গেল, অনেক পুরনো গাছের শক্ত শক্ত ডালপালা ভেঙে গেল।

জঙ্গলের মালিক তার লোকজনদের ডাকল; তারা এসে ঐ ডালপালা কুড়িয়ে তা আঁটি করে বাঁধল।

জ্যান্ত গাছেদের গা থেকেও লম্বা-লম্বা ডাল কেটে নেওয়া হল। বসন্ত-কালে এইগুলি দিয়ে কটা-চুলের মানুষটির গৃহিণীর মুরগীর আস্তানায় বেড়া দেওয়া হবে।

তারপর একটা ঘটনা ঘটল। সাদা-চুলের মানুষটির ভৃত্য লক্ষ্য করল যে, কাঁচা ও গাছের ডালগুলি খামারে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। তার নির্বোধ চোখে এগুলির সংখ্যা মনে হল অপর্যাপ্ত। ভয় পেয়ে সে তার মনিবের কাছে ছুটে গেল, বলল, "আমার মনে হচ্ছে আমাদের ঐ প্রতিবেশী আমাদের ক্ষতি করার জন্যে কোনো চক্রান্ত করছে। আমার যদি ভুল হয়ে থাকে তবে আমি বিশ্বাসঘাতক।"

এই লোকটি এবং ভয়ার্ত আরো অনেকে—এর মধ্যে জ্ঞাণীগুণী লোকও অবশ্য অনেক ছিল—এই সাদা-চুলের মানুষটির মনে অবিশ্বাস ও সন্দেহ জাগিয়ে তুলতে লাগল। যারা অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত আছে তাদের কাছ থেকে আত্মরক্ষার জন্য আগে থেকেই নিজেকে অস্ত্রে সজ্জিত করে রাখবে বলে স্থির করেছিল এই মানুষটি।

কটা-চুলের মানুসটির খামার অনেক লম্বা লম্বা গাছের ডালে ভরা ছিল। সাদা-চুলের মানুষটি তার তিনটে খামার ঐ রকম ডালে পূর্ণ করতে চাইল।

কাঠুরিয়াদের পাঠানো হল বনে। কচি-কচি গাছ কেটে ফেলতে; প্রসারিত ডালপালা কেটে নামাতে, যে সব ডাল সূর্যের আলোর জন্যে আকাশের দিকে হাত বাড়িয়েছে তাদের পাতা-সমেত ছেদন করতে কাঠুরিয়াদের একটুও মায়া হল না।

কিছু দিনের মধ্যেই বন একেবারে যেন ধ্বংস হয়ে গেল, তা যাক। সাদা-চুলের মানুষটি অনেক ডালপালা পেয়ে গেল।

তার বরাতে যা ঘটেছে, এবার তাই ঘটল তার ঐ বন্ধুর ভাগ্যেও। যাঁরা বোকা যারা বুদ্ধিমান, যারা গোঁয়ার যারা শান্ত তারা সকলেই এক বাক্যে বলতে লাগল, "মালিক, এটা তোমার কর্তব্য—লড়ায়ের সময় যেন অনেক অনেক ডাল থাকে, সেদিকে লক্ষ্য রাখা তোমার উচিত।"

কটা-চুলের মানুষ ও সাদা-চুলের মানুষ দুজনেই আত্মরক্ষার জন্যে তাদের সাধ্যের অতিরিক্ত ব্যবস্থা করতে লেগে গেল। তারা এটা বুঝতে পারল না যে, তাদের রক্ষা করার মতন তাদের দারিদ্র্য ও দুর্দশা ছাড়া আর কিছুই নেই। যতদূর দৃষ্টি যায় কোনো দিকেই কোনো গাছপালা আর নেই। জমিজমার কোনো আবাদ করা হচ্ছে না। কোনো লাঙ্গল নেই কুড়ুনি নেই। সবাই এখন পরিণত হয়েছে ঐ কাষ্ঠদণ্ডে।

অবস্থা ক্রমে এমন দাঁড়াল যে, বেশির ভাগ লোকই তখন ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে লাগল, "লড়াই শুরু হয়ে যাক। শত্রুরা ঝাঁপিয়ে পড়ুক আমাদের উপর। ক্ষিদের জ্বালায় এইভাবে জ্বলে-জ্বলে মরার চেয়ে ঐ দণ্ডের আঘাতে শেষ হয়ে যাওয়া অনেক ভালো।"

সাদা-চুলের মানুষটি ও কটা-চুলের মানুষটি বুড়ো হয়ে গিয়েছে, শান্ত হয়ে গিয়েছে। তারাও গোপনে মৃত্যুকামনা করে চলেছে। তাদের জীবনের সব আনন্দ তাদের প্রজাদের দুর্দশা দেখেই শেষ হয়ে গিয়েছে।

অবশেষে আবার একটা সুযোগ এল।

এদের উভয়ের এলাকা ভাগ করে দাঁড়িয়ে আছে যে পাহাড়টা, তারা দুজনেই একদিন সেই পাহাড়ে উঠে পড়েছে।

দু জনেই চিন্তা করতে লাগল, "আমি আর-একবার আমার বিধ্বস্ত এলাকাটি দেখব।"

তারা অনেক কষ্টে হামাগুড়ি দিয়ে-দিয়ে উঠতে-উঠতে প্রায় একই সময়ে পাহাড়ের চূড়ার কাছে চলে এল, হঠাৎ দুজন মুখোমুখি হল, পিছিয়ে আসার চেষ্টা করল, কিন্তু তা এক মুহূর্তের জন্যে মাত্র। আত্মরক্ষার জন্যে তারা যে হাত তুলেছিল, সে হাত নেমে গেল, যে লাঠিতে ভর দিয়ে তারা দাঁড়িয়ে ছিল তা পড়ে গেল।

তাদের মধ্যের যে প্রীতি প্রায় পঞ্চাশ বছর হল ঘৃণায় পরিণত হয়েছিল, সেই প্রীতি আবার জেগে উঠল। বেদনার্ত আবেগে এক বন্ধু আর এক বন্ধুর দিকে আধা-অন্ধ চোখ মেলে চাইল। আর তারা যেন সাদা-চুলের মানুষ বা কটা-চুলের মানুষ নয়! প্রায় একসঙ্গেই তারা বলে উঠল, "ওরে ওই সাদা মাথা।"* এবং দুজন দুজনকে আলিঙ্গন করল।

* তারা সাদা ও কটা দল হিসেবে লড়াই করেছে। কিন্তু বয়স এখন দুজনের মাথাই সাদা করে দিয়েছে। তারা এখন বুঝতে পারছে যে; তাদের মধ্যে আর পার্থক্য নেই—মিলনের ভূমি এইটেই।

তারা কিছুতেই মনে করতে পারল না, তাদের দুজনের মধ্যে কে আগে অন্যের বিরুদ্ধে লাগার জন্যে এই সব কঠোর দণ্ড জমা করেছিল, কে কাকে আক্রমণ করেছিল। তারা বুঝতে পারল না, এই অবিশ্বাস কী করে গড়ে উঠল, যার ফলে তাদের এবং তার প্রজাদের অস্তিত্বই যাই-যাই করে উঠেছে।

একটা ব্যাপারে অবশ্য তারা নিশ্চিত হতে পারল : তা হচ্ছে এই তাদের পার্থিব ধনসম্পদ খোয়া যাবে এই ভয়ে তারা যা হারিয়েছে, পৃথিবীর কোনো কিছু দিয়েই তার আর পূরণ হয় না।

থিয়োডোর ফনটেন

থিয়োডোর ফনটেন (১৮১৯-১৮৯৮) উনিশ শতকের একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাসিক, তাঁর রচনার বাস্তব চিত্র অতি স্পষ্ট ভাবেই চিত্রিত দেখা যায়। তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা তাঁর জীবনের শেষ দিকে রচিত, তাঁর সময়কার বার্লিনের জীবনযাত্রার কথা এতে লিপিবদ্ধ আছে, নিজের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই তিনি লিখেছেন প্রুশিয়ার সরকারি কর্মচারিদের ও অফিসারদের কথা, বার্লিনের আশপাশের মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্তদের কথা। তাঁর নভেলে ফনটেন নিজের মন্তব্য দিয়েই নিজের বক্তব্য সেরেছেন, কোনো রকম ব্যাখ্যা বা ব্যাখ্যানের মধ্যে যান নি। তাঁর নভেল বেশির ভাগই কথোপকথন-মূলক, এর মধ্যে দিয়েই সামাজিক ব্যবস্থা সম্বন্ধে তাঁর মনের ভাব প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু রাষ্ট্রের রাজনৈতিক সামাজিক বা নীতিগত কোনো ব্যবস্থার উচ্ছেদের কথা তিনি কোথাও বলেন নি—যদিও এটা বোঝাই গিয়েছিল যে, এ রকম আরামের রাজত্ব বেশিদিন চলবে না। এখানে যে কথোপকথন উদ্ধৃত হচ্ছে তা ফনটেনের শেষ উপন্যাস "দি স্টেশলিন" (১৮৯৮) থেকে নেওয়া ; এর থেকে স্পষ্টই এই উপলব্ধির কথা বোঝা যাবে যে, অন্ধ রক্ষণশীলতার দ্বারা পুরাতন পদ্ধতি জীইয়ে রাখা যাবে না, কিন্তু এর ধ্বংসও বাঞ্ছনীয় নয়। ঐতিহাসিক বিবর্তন সম্বন্ধে যে অভিমত দেওয়া হয়েছে তা সম্ভবত ফনটেনের নিজের।

দি স্টেশলিন

"এখন আমরা আসছি তোমাদের সেই স্টেশলিন থেকে, সেই লেক থেকে,—এইটেই তোমাদের এখানকার সবচেয়ে উৎকৃষ্ট জিনিস। যাকে

বলে বরফ ভাঙা আমি তার প্রতিবাদ করেছিলাম। এর কারণ হচ্ছে এই যে, যে জিনিস নিজেকে লুকিয়ে রেখেছে তার মধ্যে নাক গলানো কিংবা তা উঁকি মেরে দেখায় আমি ভয় পাই। যা আছে আমি তা শ্রদ্ধার চোখে দেখি। তার উপর অবশ্য তাকেও শ্রদ্ধা করি যা ক্রমে গড়ে উঠছে, কেননা গড়ে উঠতে-উঠতেই তা হয়ে উঠবে একটা বাস্তব। য-কিছু পুরাতন তা ভালো-বাসা আমাদের উচিত, ভালোবাসা পাওয়ার অধিকার তার আছে। কিন্তু নূতন সম্বন্ধে মাত্র এই কথা বলতে পারি যে, এর মধ্যে আমরা বাঁচব। এবং, এসবের মধ্যেও একটা কথা আছে যা আমাদের লিখিয়েছেন স্টেশলিন, সেটা হচ্ছে এই যে, প্রত্যেক জিনিসের মধ্যেই একটা পারস্পরিক সম্পর্ক আছে, আমরা যেন তা ভুলে না যাই। অন্য জিনিস সম্বন্ধে অজ্ঞ থাকা হচ্ছে নিজেকে আলাদা করে রাখা, এবং নিজেকে একা করে ফেলাই হচ্ছে মৃত্যু। এ কথা সব সময় মনে রাখা দরকার। আমার শ্যালকের উপর আমার যে বিশ্বাস তা একেবারে নির্ভেজাল। সে মহৎ চরিত্রের লোক, কিন্তু আমি ঠিক জানিনে সে দৃঢ় চরিত্রেরও লোক কি না। সে বেশ নম্র সংবেদি স্বভাবের লোক, এ রকম লোক সহজেই প্রভাবিত হয়ে যায়। ভুল ও সংস্কার সম্বন্ধে নানারকম পরস্পর বিরোধী মতামতের সামনে শক্ত হয়ে দাঁড়াবার মতন মানসিক বৈশিষ্ট্য তার যথেষ্ট পরিমাণে নেই। সে সমর্থন চায়। ভলডেমার, তুমি তার যৌবনকাল থেকেই আমার শ্যালকের সহায় হয়ে আছ। এখন আমি তোমার কাছে যে কথা বলতে চাই তা হচ্ছে এই যে, "তুমি তার সহায় হয়েই থেকো।"

"প্রিয় কাউন্টেস, আমার বলতে ইচ্ছে করছে, আমি কত আনন্দে আপনার কাছে ঢুকেছি। আপনি জানেন, আপনার যা আদর্শ আমার আদর্শও তাই, এইজন্যে আপনার কাজ আমি আরও সহজেই করতে পারছি। এই আদর্শই আমার জীবন। পুরাতন যেখানে পরাভূত সেখানে নূতনের কাছে আত্মসমর্পণ করতে পারাকে আমি আশীর্বাদ বলে মনে করি। এই রকম 'নতুন' গুণ বিষয়টি হচ্ছে আমাদের প্রধান বিবেচ্য বিষয়। এই 'নতুন' গুণ জিনিসটার থাকা উচিত কিনা (তা থাকবেই), কিংবা থাকা অনুচিত— এই প্রশ্নের উপরেই সব-কিছু নির্ভর করছে। আমাদের চারপাশে এমন অনেক চমৎকার-চমৎকার লোক আছেন, যাঁরা বেশ গুরুত্বের সঙ্গেই বিশ্বাস করেন যে, ঐতিহ্য গত এবং সর্বোপরি যাজকীয় (দুঃখের বিষয় খ্রীষ্টিয় নয়)

ব্যবস্থাকে সোলোমনের গির্জার মতনই রক্ষা করতে হবে। তার উপর আমাদের উঁচু মহলের মধ্যে এমন একটা সহজ ঝোঁক আছে যে, তাঁরা মনে করেন যা-কিছু 'প্রাশিয়ান' তাই হচ্ছে সংস্কৃতির একটা উচ্চ মান।"

"ঠিকই বলেছেন। কিন্তু সুবিচার ও সুবিবেচনার খাতিরেই আমি একটা প্রশ্ন করতে চাই—ঐ সহজ ও সরল ঝোঁকটার কি কোনো ওজর সত্যিই নেই?"

"এক সময় ছিল বটে। কিন্তু সে দিন গত। তার আর পার নেই। পুরাতনের সঙ্গে নূতনের এই যে বিরোধ, এর কারণ হচ্ছে এই যে, মানুষ তার জন্মের অধিকারে সঠিক জায়গাটি পাচ্ছে না। একালে যে কোনো দিকে যে কোনো কাজে তাদের দক্ষতা প্রয়োগের স্বাধীনতা তাদের আছে। আগের কালে কী হত? একজন তিন শ বছর ধ'রে কোনো জমিদারির লর্ড বা তাঁতী হয়েই কাটিয়ে দিত। একালে একজন তাঁতীও একদিন লর্ড হয়ে যেতে পারে।"

"এর বিপরীতটাও কিন্তু সমান সত্য।" হেসে বলল মেলুসিন, "আমরা এবার এই সূক্ষ্ম বিষয়টি ছেড়ে দিই। আমি বরঞ্চ শুনতে চাই আমাদের জীবনের ও সমাজের কাঠামোর মূল্যবোধ সম্বন্ধে আপনার কি ধারণা, এ বিষয়ে আমাদের ধারণা সম্বন্ধে আপনি যখন ভীষণভাবে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন।"

"কথাটা সম্পূর্ণ ঠিক নয়। আমার যদি কোনো সন্দেহ থেকে থাকে তাহলে তা বিষয়বস্তুটি নিয়ে নয়, এ সম্বন্ধে যে গভীর বিশ্বাস আছে, তাই নিয়ে। সামান্য বিষয়কেও বিশিষ্ট বস্তু ব'লে, উৎকৃষ্ট বস্তু ব'লে গ্রহণ ক'রে তা চিরকালের জন্যে রক্ষা করাটা, আমার মনে হয়, খুবই খারাপ। এক সময় যা কাজে লেগেছে, বরাবর তা কাজে লাগিয়ে যাওয়া, এক সময় যা ভালো ব'লে গ্রাহ্য হয়েছিল চিরকাল তা ভালো ব'লে বা সর্বোৎকৃষ্ট ব'লে গ্রাহ্য করা ঠিক নয়। এটা অসম্ভব ব্যাপার। সব জিনিস নিয়েই এ কথা অবশ্য খাটে না, কিন্তু কোনো একটা জিনিস এককালের জাঁকজমকের সঙ্গে খাপ খেয়েছিল বলেই সব সময় তা খাপ খেয়ে যাবে না। পিছন ফিরে তাকালে, আমরা তিনটি যুগের অভিজ্ঞতার কথা জানতে পারব। এটা আমাদের মনে রাখা উচিত। এর মধ্যে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ, এবং সেইসঙ্গেই সর্বপ্রথম হচ্ছে বোধ হয় সোলজার কিং-এর আমল। এই মানুষটার বিশেষ প্রশংসা করা যাবে না,

কিন্তু নিজের কালের তিনি বেশ উপযোগী ছিলেন, এমনকি হয়তো নিজের কালকে অতিক্রম ক'রে একটু এগিয়েও ছিলেন। তিনি কেবলমাত্র রাজতন্ত্রই কায়েম করেননি, তিনি একটা নূতন যুগেরও ভিত গড়েছিলেন—এইটেই কিন্তু বড় কথা, এবং তিনি অনেক সংশয় অনাচার স্বৈরাচার দূর করে শৃঙ্খলা ও ন্যায়পরতা স্থাপন করেন। ন্যায়পরতাই ছিল তাঁর ধ্যান ও জ্ঞান।"

"তারপর ?"

"এর পর এল দ্বিতীয় যুগ। প্রথম যুগের পর এটা আসতে বিশেষ দেরি হল না, এবং যে-দেশটা ইতিহাসের দিক থেকে ও প্রকৃতির দিক থেকে তেমন উদ্দীপনাময় ছিল না, সেই দেশ হঠাৎ প্রতিভায় প্রদীপ্ত হয়ে উঠল।"

"এতে খুবই বিস্মিত হয়েছিল নিশ্চয় সকলে ?"

"হয়েছিল। কিন্তু দেশের মধ্যে যতটা বাইরে তার বেশি। সবিস্ময়ে প্রশংসা জিনিসটা একটা শিল্পকলা বিশেষই। মহৎকে মহৎ বলে বুঝতে পারা সোজা কাজ না······এর পরে এল তৃতীয় যুগ। মহৎ নয় কিন্তু মহত্ত্বে পূর্ণ। এটা হল যখন দরিদ্র অসহায় মৃতপ্রায় ভূমিটি প্রতিভায় নয়, উদ্দীপনায় জেগে উঠল, এবং উচ্চতর আধ্যাত্মিক শক্তিতে, জ্ঞান-বুদ্ধিতে, এবং স্বাধীনতার উপর দৃঢ় আস্থা এসে গেল।"

"বেশ কথা, লোরেনৎসেন। বলে যাও।"

"আপনাদের আমি যা বললাম তা ঘটতে সময় লেগেছিল একটা শতক। সে সময় আমরা অন্যদের চেয়ে এগিয়ে ছিলাম, কখনো-কখনো মানসিকতার দিক থেকে, কিন্তু নৈতিক বোধের দিক থেকে নিশ্চিতভাবেই। কিন্তু ঈগলের নখে যেন আর বিদ্যুৎ খেলে না, সে উদ্দীপনা মারা গেল। পিছিয়ে পড়ার একটা বিপরীত গতি এসে গেল। যে জিনিস অনেক আগে ঝ'রে মরে গেছে, আমি আবার বলি তা আবার জাগিয়ে তুলতে হবে। এটা তারা করবে না। অবশ্য, একভাবে দেখতে গেলে, একদিন সব জিনিসই ফিরে আসে; কিন্তু ফিরে আসতে লেগে যায় হাজার-হাজার বছর। ভালো হোক মন্দ হোক সেই রোমক সাম্রাজ্য আমরা আবার ফিরে পেতে পারি, কিন্তু টোব্যাকো কলেজের সেই স্পেনীয় বেত বা স্যানসাউসির সে বাঁকানো লাঠি আর ফিরে আসবে না। সে সব শেষ হয়ে গেছে। এটা ভালোই হয়েছে। এক সময় যা ছিল অগ্রগতি তা পশ্চাৎ গতিতে পরিণত হয়েছে। যুদ্ধ ও সেনাবাহিনী (যদিও তার সংখ্যা বেড়েই চলেছে)

আধুনিক কালের ইতিহাস থেকে মুছে যাচ্ছে—এইটেই ইতিহাসের প্রকৃত পড়ার জিনিস। এগুলি যদিও বা মুছে না যায়, এর উপর আগ্রহটা মুছবেই। আগ্রহের সঙ্গে মর্যাদাও: তাদের জায়গায় এসে যাচ্ছে আবিষ্কারকেরা, এবং জেম্স্ ওয়াট ও সীমেন আমাদের কাছে ডু গুয়েসক্লিন বা বায়ার্ডের চেয়ে অনেক দামী। বীরত্ব তার সুনাম হারায় নি, তা বহুকাল ধ'রে হারাবেও না, বরঞ্চ এ আরও বেড়েছে; এ কথা এড়িয়ে গিয়ে আমাদের শাসকেরা প্রচার করতে আরম্ভ করেছেন যে, বীরত্বের ধার কমে যাচ্ছে।"

"আপনি যা বললেন তা ঠিক। কিন্তু কার বিষয়ে বলছেন? আপনি 'শাসক' বলছেন, এটা কী। মানুষ বা কোনো বস্তু? এটা কি যন্ত্র—পুরাতন কাল থেকে আনা, যার চাকা কেবল ফাঁকা আওয়াজই করে, অথবা এটা কি সে, যে ঐ যন্ত্র চালায়? কিংবা এটা কি কোনো দল যা নাকি যন্ত্রের মানুষটিকে পরিচালনা করে? আপনি যাই বলছেন তার মধ্যে একটু উদ্ধত ভাব আছে। আপনি কি অভিজাতদের বিরোধী? আপনি কি 'পুরাতন পরিবার' এর বিরুদ্ধে?"

"প্রথমেই বলি—না। পুরাতন পরিবারদের আমি ভালোবাসি। আমি এমনও বলতে পারি যে, সকলেই তাদের ভালোবাসে। তারা একালেও বেশ জনপ্রিয়। কিন্তু যে ভালোবাসা প্রত্যেকের প্রত্যেক মানুষেরও প্রত্যেক শ্রেণীর বিশেষ দরকার তা তারা নিজেরাই নষ্ট করে ফেলেছে, এলোমেলো করে ফেলছে। আমাদের ঐ পুরাতন পরিবারদের প্রত্যেকের মধ্যে এমনি একটা ধারণা আছে যে, 'তাদের বাদ দিয়ে জীবনধারণ করা যাবে না'। এটা সত্যেরই অপলাপ, কেননা তাদের বাদ দিয়েও জীবন বেশ চলতে পারে। তারা অন্যকে ধারণ করে রাখবার জন্য স্তম্ভ আর নয়, তারা হচ্ছে পাথরের ও শ্যাওলার পুরাতন ছাদ, যা বেশ ওজনদার ও যার চাপ বেশ ভারি, কিন্তু ঝড়জল আটকাবার সাধ্য তাদের আর নেই। খুবই সম্ভব যে, আভিজাত্যের যুগ আবার ফিরে আসতে পারে, কিন্তু বর্তমান কালে আমরা যেদিকেই তাকাই সেইদিকেই গণতান্ত্রিক জীবন দর্শনের সাক্ষাৎ পাই। নতুন যুগের জন্ম হচ্ছে। আমি বলতে পারি, যে যুগ আসছে তা আরও আনন্দময়। যদি বেশি আনন্দময় নাও হয়, তবুও বাতাসে অক্সিজেনের মাত্রা বাড়বেই যাতে আমরা আরও আরাম করে বিশ্বাস নিতে পারব। যতই সহজে নিশ্বাস নেওয়া যাবে ততই জীবন্ত হয়ে ওঠা যাবে। যাই হোক, ভলডেমার সম্বন্ধে আপনি আমার উপর

নির্ভর করতে পারেন, কাউণ্টেস। যদিও এর মধ্যে একটা প্রধান ব্যাপার আছে, সে হচ্ছে কনটেসা। এই মহিলা সম্বন্ধে আপনাকে গ্যারাণ্টি দিতে হবে। শেষ পর্যন্ত তো সব বিষয়েই মেয়েদের সিদ্ধান্তই পাকা।"

"এরকম অনেকে বলে বটে। কিন্তু আমরাও এমন বোকা যে, তাই বিশ্বাস করে নিই। কিন্তু এ কথার সূত্রে আমরা অন্য কথায় এসে পড়ছি। উপস্থিত, ব্যাপারটা তুমিই ঘটাতে পারবে। এখন এই বৈপ্লবিক কথাবার্তার পর আমাকে আমার সেই শান্ত মানুষদের নিরিবিলি আশ্রয়ে ফিরে যেতে অনুমতি দাও। আমি বুড়োমানুষটার কাছ থেকে আধ ঘণ্টার ছুটি নিয়ে এসেছি ; আশা করি তুমি আমার সঙ্গে একটু আসবে, সেই 'জাদুঘর' পর্যন্ত না হলেও (জাদুঘর তো প্রোগ্রাম অনুযায়ী দেখা হয়), অন্তত ঐ মোড়টা পর্যন্ত।"

সূর্যোদয়ের আগে

২১/২২ অক্টোবর ১৮৮৯

"বিফোর সান রাইজ" (১৮৮৯) হচ্ছে গারহার্ট হপমানের প্রথম বাস্তববাদী নাটক। ফনটেনের লেখা এই নাটকের অপূর্ব একটি সমালোচনা থেকে এই নাটকটির বিষয়-বস্তু ও বিশেষ গুণ প্রকাশিত হয়ে পড়ে, তিনি এই সমালোচনায় বাস্তববাদিতার বিবর্তনে এই নাটকের বিশেষত্ব স্বীকার করে নেন। ফনটেন নিজেও তাঁর নভেলে এই রকম বাস্তবতার দিকে ঝুঁকেছিলেন, তিনি হপমান সম্বন্ধে বলেন "মার্জিত বাস্তববাদী", কিন্তু মাঝে মাঝে দার্শনিকতার ও ভাবালুতার প্রশংসা তিনি করতে পারেন নি। নভেলে ও রঙ্গমঞ্চে বাস্তবতার প্রয়োগ সম্বন্ধে ফনটেনের অভিমত বেশ আকর্ষণীয়। বাস্তববাদী নাটকে সব বাস্তব জিনিসই দেখানো যেতে পারে বটে, কিন্তু নাট্যকারের সব জিনিসটির একটা শিল্পসম্মত চেহারা দিতে হবে— ফনটেনের এই অভিমতটি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য।

সমালোচনা করা কাজটা কখনোই সোজা কাজ না, কোনো কোনো সময়ে কাজটা কঠিনও (অন্তত আমি তাই মনে করি)। এরকম একটা ঘটনা কাল ঘটেছিল। যে মানুষের এমন সাহস আছে যে সোজাসুজিভাবে

ঘৃণা প্রকাশ করতে পারে; সংক্ষেপে তার এই কথা সেরে ফেলতে বেশ স্বচ্ছন্দে ও সানন্দে, কিংবা সরলভাবে আকাশ ছোঁয়া প্রশংসা করতে পারে, সে কখনো হপমানের সামাজিক নাটক নিয়ে খুব মাথা ঘামাবে না। কিন্তু যে মানুষের অমন সাহস নেই, সে যদি দেখে প্রত্যেকটি দৃশ্যের সঙ্গে তার মনে নতুন নতুন প্রশ্ন জেগে উঠছে, তা বলে তার পক্ষে একটা কঠিন দিনের লেখার কাজ ঘাড়ে চাপল।

দু মাসও হয়নি, নাটকটা আমার হাতে এসেছিল। "গারহার্ট হপমান"। কে এই মানুষটা? তার পর: "বিফোর সানরাইজ, এ সোশ্যাল ড্রামা"। সম্প্রতি গ্রীষ্মের ছুটি কাটিয়ে এসে আমি যে সাহস সঞ্চয় করতে পেরেছি তার উপর নির্ভর ক'রে আমি কাজে বসলাম। এই ছোট বইটি সপ্তাহখানেক আমার কাগজ-পত্রের নীচে চাপা প'ড়ে ছিল, তার পর এটিতে চোখ পড়ল, আমি পড়লাম, একবারেই প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পড়ে ফেললাম।

একটা অদ্ভুত, একটা বীভৎস গল্প। আমরা যেসব দেশ জানি তার সর্বত্রই এমন জেলা আছে, যেখানে চাষীরা, এমন কি চাষ-মজুরেরা, রাতারাতি বড়লোক হয়ে যায়। এই নাটক আমাদের এই রকম এক জেলায় নিয়ে গিয়েছে। জাউয়ের জায়গার কাছেই এটা সাইলেসিয়ার একটি গ্রাম, আমরা যে বাড়িটায় ঢুকলাম তা কেবল শহুরে কায়দায় ওয়ালপেপার দিয়ে মোড়া ও ছবি দিয়ে সাজানোই নয়, এখানো বৈদ্যুতিক ঘণ্টা আছে, আর আছে টেলিফোন। এই ফোনে লোকজন কথাও বলে। হ্যাঁ, সেখানে ঘণ্টা আছে, টেলিফোন আছে; ঘোড়া আছে, সহিসও আছে, এমন কি বার্লিন থেকে আনা উর্দি-পরা এক ভৃত্যও আছে, তার নাম এডোয়ার্ড। প্রকৃতপক্ষে এই বাড়িটা এমন সুসজ্জিত বটে, কিন্তু এটা একটা ভয়ংকর বাড়ি, এর কোণে কোণে কেবল ভূত।

বুড়ো চাষী ক্রাউসে খুব মদ্যপায়ী, বলতে গেলে সে পানশালাতেই যেন বাস করে, তার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী বয়সে তার চেয়ে অনেক কম—আগে এ ছিল এক রাখালবালিকা—তার চেয়ে ভালো কিছুনা, তার যখন খুশি লাগে তখন সে 'অভিজাত মহিলা'র মত অভিনয় করে; প্রথম পত্নীর গর্ভজাত বড় মেয়েটির বিয়ে হয়েছে এক এনজিনিয়ারের সঙ্গে, তার নাম হফমান। এই মেয়েটি তার বাপের কাছ থেকে প্রচুর মদ্যপান করা শিখেছে, এবং তার স্বামী হফমান হচ্ছে এই বাড়িটির মালিক, সে বেশ বাক্‌পটু আর খুবই ইন্দ্রিয়পরায়ণ,

সে নিজেকে ও তার কর্মচারীদের নিয়োগ করে কেবল তার আনন্দবর্ধনের জন্যে। এই মদ্যপ ও পাপীর দলের সঙ্গে আমাদের পুরোপুরি পরিচয় হবার আগেই আমাদের সঙ্গে পরিচয় হল হফমানের স্কুলের সহপাঠীর সঙ্গে, তার নাম অ্যালফ্রেড লোথ। অ্যালফ্রেড লোথ এখানে এসেছে শ্রমিকদের অভাব-অভিযোগ জানার জন্যে, বিশেষ করে খনি-শ্রমিকদের চাক্ষুষ দেখে তাদের সম্বন্ধে জানতে। সে একজন আদর্শবাদী রাজনীতিক, তার মনে সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক আইডিয়া আছে, প্রবন্ধ ও বই লেখাই তার জীবিকা। সে বেশ সজ্জন, একটু একরোখা, দারুণ তত্ত্ববাদী, এবং নীতির প্রতি আসক্ত, কিন্তু খুবই সৎ ও বিশ্বাসী। তার নীতির মধ্যে প্রথম হচ্ছে মদ্যপানের বিরুদ্ধে সংগ্রাম। সে হচ্ছে সেই ধরণের মানুষ যে তার মনের শক্তি দিয়ে সুন্দর ধরণের মানুষ গড়তে চায়, এবং এই ভাবে একটা সুখী মানবসমাজ গড়ে তোলায় যার ইচ্ছে। স্বাস্থ্যই হচ্ছে স্বভাবতই প্রথম প্রশ্ন, এবং ভিত্তি। এই অ্যালফ্রেড লোথ লোকটি মানুষের উন্নতি করার চিন্তায় বুঁদ হয়ে থাকে, সে মদ কখনো ছোঁয় না, কিন্তু ঘটনাচক্রে সে এসে পড়েছে মদের এক ভাটিখানায়, মদ্যপের আখড়ায়। খুঁটিয়ে দেখা তার স্বভাব নয়, সে কিছুই লক্ষ্য করে না। হয়তো এর কারণ হচ্ছে এই যে—তত্ত্ববাদীদের ক্ষেত্রে যা হয়ে থাকে—ছোট মেয়ে হেলেনের উপর তার টান হয়ে গেছে। মেয়েটিও তার প্রতি আসক্ত। তার উপর হেলেন এ-বাড়ির আর পাঁচজনের মতন নয়। তার মায়ের শেষ ইচ্ছা অনুসারে কয়েক বছর আগে সে লেখাপড়া করার জন্যে গিয়েছিল হেরন্‌হাটে। এখানে অ্যালফ্রেড লোথের আগমনে তার আগের কালের কথা মনে পড়তে লাগল যখন সে তার বাবার গৃহে অনেক মানুষ দেখেছে ও অনেক মানুষের গলা শুনেছে। ক্রমেই তার মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হতে লাগল যে, সে এখন যে পাঁকে পড়ে গিয়েছে তার থেকে তাকে উদ্ধার করতে পারবে এই সরল মানুষটি, ভগবানই যেন তাকে পাঠিয়েছেন। এ মানুষটা ফুসলিয়ে নিয়ে যাবার মতন নয়, এ সৎ, এবং এর নীতি আছে। আরও এক কথা—মানুষটা তাকে ভালোবাসে। এর মধ্যে কথা দেওয়ার কোনো মানে নেই, তারা বাগ্‌দত্তই হয়ে গিয়েছে। হেলেন কেবলই দিন গুণতে লাগল কখন সে এখান থেকে গিয়ে অন্য অবস্থায় পড়বে। দরকার হলে লড়াই করতে হবে। ভালোর জন্যেই হোক আর মন্দের জন্যেই হোক, অদৃষ্ট অন্য ঘটনা ঘটাল। গ্রামের ডাক্তার শিমেলফেনিগ সেই বাড়িতে এল। এই

মানুষটিকে অ্যালফ্রেড লোথ চিনতে পারল, হফমানের মতই এ-ছিল তার বন্ধু, কিন্তু এই লোকটি নীতিভ্রষ্ট হয় নি, এখনো আগের মতই বিশ্বস্ত ও বিশ্বাসী আছে। নাটকের মধ্যে নাটকীয়তার দিক থেকে এটি একটি সুন্দর দৃশ্য। লোথের মতই এই ডাক্তারটি আদর্শবাদী কিন্তু নিরাশাবাদী। তার এই বন্ধুটির কাছে ঐ ডাক্তার ক্রাউসের বাড়ির ও তার পারিবারিক জীবনের চিত্র মেলে ধরল, লোথ স্তব্ধ হয়ে সেই চিত্র যেন দেখল, মনোযোগ দিয়ে শুনল সব বৃত্তান্ত। এখন সে পড়ল সংকটে। নীতি স বিসর্জন দেবে, না, তার প্রণয় প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করবে। সে পরেরটাই বেছে নিল, একটা বিদায়লিপি লিখল, এবং সেই বাড়ি ছেড়ে চলে গেল। কয়েক মিনিট পরে ভয়ে মুহ্যমান হয়ে লোথকে খুঁজতে লাগল, কিন্তু তার সেই চিঠি ছাড়া আর কিছু পেল না। বেপরোয়া হয়ে সে তখনই স্থির করে ফেলল কী করবে। দেওয়াল থেকে একটা ছুরি তুলে নিয়ে সে ছুটে চলে গেল পাশের কামরায়। তখনই এক দাসী হেলেনকে একটা বার্তা দেবার জন্যে এসে উপস্থিত হল, এবং তাকে খুঁজতে খুঁজতে পাশের কামরায় ঢুকেই আবার ভয়ার্ত আর্তনাদ করে বেরিয়ে এল। সারা বাড়িতে এই রক্তপাতের সংবাদটি ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হতে লাগল। যবনিকা যখন নেমে আসছে রঙ্গমঞ্চ তখন ফাঁকা।

এই হচ্ছে নাটকটির বিষয়বস্তু। আশা করি সংক্ষিপ্ত আকারে এর সব কথাটুকু ঠিকমত বলতে পেরেছি। কিন্তু আমি সঠিকভাবে যা প্রকাশ করতে পারিনি তা হচ্ছে সমগ্র নাটকটির মেজাজ। সেটা এভাবে ফুটিয়ে তোলা সম্ভবও নয়। এই জন্যেই এই রকমের পুনর্কথন ত্রুটিপূর্ণ হতে বাধ্য, এবং অনেক সময় তা ক্ষতিকরও বটে। এই রকমের রচনা, যা অনেকটা গাথা-ধর্মী, তার মেজাজটাই আসল জিনিস, কেননা সত্য ও অসত্য এই প্রশ্নের এ হচ্ছে সমার্থক। যদিও এটি আমার মধ্যে আলোড়ন আনে, এটি যদি এমন তেজি রচনা হয় যে এর ত্রুটি ও দুর্বলতা উপেক্ষা করা যেতে পারে, তাহলেই বুঝব কবি তাঁর কথা আমার মর্মে পৌঁছে দিতে পেরেছেন, এবং তিনিই খাঁটি কবি ; এ রকমের কবির দৃষ্টি স্বচ্ছ হতে বাধ্য, তিনি বাস্তবতার প্রতি সুবিচার করবেনই, এবং সেই সঙ্গে যে জিনিস যা, সেই নামেই তার পরিচয় দেবেন। যদি এর প্রভাব তেমন কার্যকর না হয়, যদি তাতে ঘাটতি থেকে থাকে, বলার ভঙ্গির মধ্যে যদি পরিশুদ্ধ করার প্রবণতা না থাকে, যদি কুৎসিতকে নূতন রূপ না দেওয়া যায়, তাহলে বলব কবি তাঁর উদ্দেশ্য

সিদ্ধি করতে পারেন নি। এর কারণ হয়তো তাঁর যুক্তিগুলি খাঁটি ছিল না, এবং তাঁর মনের মধ্যে মিথ্যা পুঞ্জীভূত ছিল অথবা হয়তো তিনি কথাই ব্যবহার করেছেন কিংবা হয়তো তাঁর সৃজনী শক্তি তখন তাঁর আয়ত্তে ছিল না এবং এক অশুভ মুহূর্তে তিনি আরম্ভ করেছিলেন এই রচনা। শেষের কথাটি সত্য হলে, তিনি পরের বার আরও ভালো লিখতে পারবেন, তা যদি না পারেন তাহলে তিনি 'অন্যবিধ ভালো কাজে' আত্মনিয়োগ করলে ভালো করবেন। গারহার্ট হপমান যে কাজ বেছে নিয়েছেন, তিনি অবশ্য সেই কাজেই লিপ্ত থাকবেন, কারণ তিনি আসল মেজাজটারই কেবল নয় প্রকৃত সাহসেরও তিনি অধিকারী। সৎ শিল্পের সহায়ই হচ্ছে সৎ সাহস। বাস্তব সত্যের মধ্যে শিল্পকাজ থাকতে পারে না—এ ধারণাটাই ভুল। অপর পক্ষে, যদি ঠিক ভাবে প্রয়োগ করা যায় (এটা অবশ্য বিতর্কের বিষয়) তাহলে বাস্তবতাও উঁচু দরের শিল্প হতে পারে।

আমি যখন গারহার্ট হপমানের নাটকটি পড়ি তখন মোটামুটি ভাবে এই রকম আমার মনে হয়েছে। তাঁকে আমার কেবলমাত্র ইবসেনের পরিপূরক বলে মনে হয়েছে। বহুকাল ধরে ইবসেনের যা-যা প্রশংসা করে এসেছি, তাঁর সেই আহ্বান "মানুষের জীবনের পরিপূর্ণতার মধ্যে ঝাঁপ দাও," সমস্ত সমস্যার নূতনত্ব ও সাহসিকতা, ভাষার সেই শিল্পনিপুণ সরলতা, চরিত্রচিত্রণের অদ্ভুত দক্ষতা, তার উপর প্রত্যেক কাজের যুক্তিপূর্ণ উপলব্ধি এবং অসংগত বিষয়ের বর্জন—এর সবই আবার আমি পেলাম হপমানের মধ্যে ; এবং যেসব জিনিস ইবসেনের লেখার মধ্যে পছন্দ করিনি, যেমন—দূরচিন্তা, পাণ্ডিত্য প্রকাশ, সূক্ষ্মকে আরও সূক্ষ্ম করার প্রয়াস এবং শেষ পর্যন্ত সেই সূক্ষ্ম বিন্দুটি ভেঙে যাওয়া, তার উপর শূন্যে পরিভ্রমণ, বক্তার মতন বক্তব্য প্রকাশ, কতকগুলি ধাঁধা তৈরি করা যে ধাঁধার সমাধান করতে কেউই চায় না কেননা সকলেই তখন ওসব নিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে—এইসব ত্রুটি আমি হপমানের লেখায় পাইনি। হঠাৎ কখনো-কখনো দার্শনিক রোমান্টিক খেয়ালে মাঝে মাঝে তিনি বাস্তববাদী হয়ে ওঠেন নি, কিন্তু প্রকাশভঙ্গি-সহই তিনি বাস্তববাদী, এবং আগাগোড়াই তিনি তাই।

এই তরুণ কবি ও তাঁর নাটক সম্বন্ধে এই আমার ধারণা। আমি এই ধারণা দিয়ে নিজেকে সুরক্ষিত করে (আমার তাই মনে হয়েছিল) আমি রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করলাম। আমার অভিমতের যেটা ভিত, আমি সেখানে অটল

রইলাম : কিন্তু অপর দিকে একথা স্বীকার করতে হবে যে, মঞ্চের অভিনয় নাটকটি পাঠ করার থেকে অনেক ভিন্ন রকমের। এটা কিছু কম এমন নয়। এটা একেবারে আলাদা। অনেক দৃশ্যে, যেমন উদাহরণ দিই, যেখানে লোথ তার বন্ধু হফমানের কাছে তার রাজনৈতিক কর্মসূচীর কথা খুলে বলছে, এবং ঐ বাড়ির মেয়েটির কাছে ঐ কথা বলছে, লোথ ও হেলেনের প্রণয় দৃশ্য, লোথ ও হফমানের মধ্যে বিবাদের দৃশ্য, এবং অবশেষে, সেই চূড়ান্ত দৃশ্যটি, যা চতুর্থ অঙ্কের প্রায় অর্ধেকটা জুড়ে আছে, লোথ ও ডাক্তার শিমেলফেনিগের মধ্যের কথার সেই দৃশ্যটি—এসবই হচ্ছে প্রায় চিরাচরিত ঘটনার মতন, এই দিক থেকে চিরাচরিত বলছি যে, এখানে এমন ঘটনা ঘটেনি বা এমন কথা বলা হয়নি যা নাকি আগে অন্য কোনো ভালো নাটকে নেই। এইসব দৃশ্যে যে ফল ফলেছে তা সবই ভালো, এবং এমন ফল হয়েছে—যার জন্যে কোনো দর্শকই কোনো আপত্তি জানায় নি ; কিন্তু ভালো হোক মন্দ হোক যে ঘটনা দেখেই নাটকটির চরিত্র বোঝা যেতে পারে, এবং যা থেকে আমি একটা বৈপ্লবিক প্রতিক্রিয়া পাব বলে ভরসা করেছিলাম, সে সব দৃশ্য মনে বিশেষ কোনো দাগ কাটতে পারেনি। দর্শকদের মধ্যে দুরকম ক্রিয়া হয়েছে, কেউ উচ্ছ্বসিত হয়ে হেসে উঠেছে প্রশংসায়, কেউ-বা নিন্দায়—বার্লিন বাসীরা এইভাবে মুখেমুখেই সমালোচনা করতে অভ্যস্ত। যাই হোক, শত্রু বা মিত্র কারও মনেই নাটকটি বিশেষ দাগ কাটতে পারেনি। আর আমি যদি আমাকেই জিজ্ঞাসা করি এইসব দৃশ্য থেকে আমি কী পেয়েছি, আমি খেলোয়াড় হলে যেসব দৃশ্য নিয়ে আমি বাজি ধরতাম, তা হলে বলব আমি বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই যা পেয়েছি তা হচ্ছে বিরক্তি। বিশেষ করে দ্বিতীয় অঙ্ক সম্বন্ধে এ কথা খাটে, যে অঙ্কটি পড়ার পর আমার মনে হয়েছিল সবচেয়ে ভালো, ও সবচেয়ে চমকপ্রদ। কিন্তু অভিনয় দেখে আমি হতাশ হয়েছি, এখানকার বীভৎস দৃশ্যগুলি মনের উপর যে ভয়াবহ প্রভাব ফেলবে বলে মনে করেছিলাম তার কিছুই হল না। কেবল দেখা গেল একজন বদ্ধ মাতালকে ও কয়েকজন বীর্যহীন মানুষকে। যে নৃশংসতা কবি বেশ শিল্পনৈপুণ্যের দ্বারা ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন, তার উপর যদি আর-একটু বেশি জোর দেওয়া হত, তাহলে হয়তো তার কিছু ক্রিয়া দর্শকের মনে হত, কিন্তু তা হল না। কিন্তু এখন ভেবে দেখছি এবং তাতে আমার খুবই মনে হচ্ছে যে তাতে ভয়াবহতাই বেড়ে উঠত, কিন্তু তাতে হয়তো দৃশ্যটি আরও কুৎসিতই লাগত।

স্টেজ-ম্যানেজার ও প্রযোজক হয়তো এই দুইটি খারাপের মধ্যে থেকে একটিকে বেছে নিয়েছেন। কিন্তু আমি এই দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে বাড়ি ফিরেছি, খুব শিল্প সম্মত উপায়েও বাস্তবতা যদি বই থেকে মঞ্চে রূপান্তরিত করা হয়, তখন মঞ্চের কিছু নিয়ম মেনে চলা দরকার; দৈনন্দিন জীবনের অনেক ব্যাপারের বিবরণ একটু কদর্য হলেও তা নভেলের সৌন্দর্য অনেক সময় বাড়ায়; কিন্তু মঞ্চে তা তেমন ভালো দেখায় না, তা জমেও না।

হপমানের এই নাটক নিয়ে অনেক বিতর্ক হবে। এবং দীর্ঘ-দিনের অনেক বন্ধুত্ব হয়তো কমবেশি মনোমালিন্যে দাঁড়াবে, কিন্তু একটা জিনিস নিয়ে কোনো তর্কই উঠবে না। সেটি হচ্ছে সেই লেখকটি স্বয়ং এবং তার চেহারা সবার মনে যে ছাপ রেখে গেছে। দাঁড়িওলা রোদে-পোড়া চওড়া-কাধের একটা মানুষের মাথায় নোয়ানো টুপী ও গায়ে অপেরা-কোট থাকবে বলেই অনেকে মনে করেছিল, তার জায়গায় এল বেশ লম্বা রোগা মাথায়-পরিচ্ছন্ন-চুল এক জোয়ান ভদ্রলোক, যার গায়ে অতি সুন্দর পোশাক এবং যার আচার-আচরণ অতি চমৎকার। এটা অনেকেই সহ্য করতে পারে নি। হয়তো অনেকে এজন্যে তার বিরুদ্ধে প্রয়োগের জন্যে অস্ত্রে শাণ দেবে, বলবে, এটা হচ্ছে শয়তানের ছদ্মবেশে, এবং এই সূত্রে তারা মনে করতে চাইবে সেই ডাক্তারের কথা, যিনি তাঁর পেশা-গত জীবনের অভিজ্ঞতার কথা দিয়ে যে বই রচনা করেছেন তার প্রথমেই লিখেছেন—"আমার খুনীরা সকলেই দেখতে ছিল যুবতী মেয়ের মত।"

ফ্রায়েডরিখ নিটশে

জার্মানী ১৮৭০—১৮৭১

প্রভাবশালী জার্মান দার্শনিক ফ্রায়েডরিখ নিটশে (১৮৪৪-১৯০০) আদর্শ-বাদী সব দার্শনিক তত্ত্বকে অস্বীকার করে জীবনদর্শনকে কয়েকটি যুক্তিহীন ভিত্তির উপর স্থাপন করেন। "ধ্বনি" ও "প্রকৃতি" হচ্ছে মানুষের প্রেরণার উৎস—এইটেই ছিল তার বক্তব্য বিষয়। এই বিপদজনক সিদ্ধান্তের ফলে পরবর্তী কালে তিনি নৈতিক বন্ধন ও নৈতিক মূল্যবোধকেও অস্বীকার করেন, তিনি খ্রীষ্টধর্মকেও স্বীকার করেন না, প্রকৃতপক্ষে সব রকম মানবিক বা সামাজিক উদ্যমকে তিনি "দাসত্বের নীতিশাস্ত্র" বলে অভিমত দেন।

তাঁর প্রথম দিকের রচনায় নিটশে-র দৃষ্টি স্বচ্ছ ছিল। তাঁর "থটস আউট অব সিজন" রচনায় তিনি তাঁর সময়ের বিরুদ্ধেই বলিষ্ঠভাবে দাঁড়িয়েছিলেন।

আমরা প্রথম প্রবন্ধের (১৮৭৩) প্রথমাংশ এখানে তুলে দিচ্ছি। ১৮৭১ সালে ফ্রান্সের সঙ্গে সংঘর্ষে জয় হবার পর জার্মান রাষ্ট্রের পত্তন হয়, তখন শক্তির দিক থেকে, নিরাপত্তার দিক থেকে ও ধনসম্পদের দিক থেকে জার্মানীর অভূতপূর্ব উন্নতি দেখা যায়। এতে মধ্যবিত্তদের সোল্লাস আশাবাদের সীমা-পরিসীমা ছিল না। মধ্যবিত্ত-সমাজের অপর্যাপ্ত ধনসম্পদের মধ্যে যার অভাব ছিল তা হচ্ছে উচ্চাকাঙ্ক্ষা, বুদ্ধিবৃত্তির চর্চা, ও সাংস্কৃতিক অনুশীলন। যাকে সংস্কৃতি বলে মনে হয়েছে আসলে তা হচ্ছে তথাকথিত 'কুলটুর', যে কথা নিটশে এখানে বলেছেন। কখনো সতর্ক করে দিয়ে, কখনো-বা অনুনয় ক'রে নিটশে তাঁর সময়ের বিরুদ্ধে কথা বলেছেন; বলেছেন, আর্থিক ও পার্থিব উন্নতি হওয়া সত্ত্বেও সভ্যতাকে ধ্বংস করাই হচ্ছে।

জার্মান জনমত যুদ্ধের পরিণাম ও তার ক্ষতিকর পরিণতি সম্বন্ধে কোনো অভিমত দিতে চায় না। সে যুদ্ধে যদি জয় হয়ে থাকে তাহলে তো কথাই নেই। যেসব লেখক জনমত ছাড়া আর কোনো রকম আরও গুরুত্বপূর্ণ মত আছে বলে জানেন না, তাঁরা যুদ্ধের প্রশংসায় ও নীতিবোধ সংস্কৃতি ও শিল্পের উপর যুদ্ধের অসীম কল্যাণকর প্রভাবের কথা বলার জন্যে নিজেদের মধ্যে পাল্লা দিয়ে চলেছেন। যাই হোক, এ কথা মানতেই হবে যে, বড় রকমের একটা জয় হচ্ছে বড় রকমেরই একটা বিপদ। জয়কে বহন করা পরাজয় বহন করার থেকে কঠিন। বস্তুতঃপক্ষে, এ রকম জয় লাভ করা সহজ, কিন্তু তা হজম করা তত সহজ নয়। কেননা এমন জয় ঘোরতর পরাজয়েও পরিণত হতে পারে। ফ্রান্সও একটা ভুল করছে, সেখানকার জনমত এবং যাঁরা প্রকাশ্যে তাঁদের মত প্রকাশ করে থাকেন তাঁরা একবাক্যে বলছেন জার্মান সংস্কৃতিরও জয় হয়েছে এই যুদ্ধে, এবং সেইজন্যে এই অভূতপূর্ব ঘটনার জন্য এবং সাফল্যের জন্য তার মাথায় বিজয় মুকুট পরিয়ে দিতে হবে। এটা একটা দুঃখজনক বুদ্ধির দোষ, কিন্তু এটা বুদ্ধির দোষ বলেই দূষণীয় নয়, এর মধ্যে অনেক ধোঁকাও আছে বলেই এটা দূষণীয় নয়। এ'তে আমাদের জয় পরিণত হতে পারে পরাজয়ে। এমন পরাজয়, যার ফলে 'জার্মান সাম্রাজ্যে'র অস্তিত্ব রক্ষার জন্য জার্মান আত্মারই উচ্ছেদ হয়ে যেতে পারে।

একটা কথা, ধরা যাক, দুটি সংস্কৃতি পরস্পরের সঙ্গে লড়াই করেছে, এর মধ্যে বিজয়ীর সংস্কৃতির মান কতটা বেশি তা পরিমাপ করা দুঃসাধ্য,

সুতরাং এর জন্যে উল্লাস করা বা আত্ম-গরিমা প্রকাশ করা সাজে না। কেননা, বিজয়ীর সংস্কৃতির মূল্য কতটা প্রথমেই তা জেনে নিতে হবে। সম্ভবতঃ এটি খুবই কম; সে ক্ষেত্রে যুদ্ধক্ষেত্রে বিপুল সাফল্য সত্ত্বেও, এই জয়ের জন্যে বিজয়ী দেশের পক্ষে তার বর্তমান সংস্কৃতির জয় ঘোষণা করে এমন বিপুল ভাবে উল্লাস করার কোনো যুক্তিসংগত কারণ খুজে পাওয়া যায় না। অপর পক্ষে, জার্মান সংস্কৃতির জয়ের প্রশ্ন উঠতে পারে না একটা সামান্য কারণেই, ফরাসী সংস্কৃতি এখনো বহাল আছে, এবং আমরা আগের মতই তার উপর নির্ভর করে আছি। সামরিক জয়ে কোনোরূপ সাহায্য করেনি এই সংস্কৃতি। সৈনিকদের কঠোর নিয়মানুবর্তিতা, তাদের সাহসিকতা, তাদের কষ্টসহিষ্ণুতা, নেতাদের শ্রেষ্ঠতা, সমগ্র বাহিনীর একতা ও আনুগত্য— এই সবই হচ্ছে জয়ের কারণ। সংক্ষেপে বলতে হয়, যেসব জিনিসের সঙ্গে সংস্কৃতির কোনো সম্পর্ক নেই তাই বিরোধীপক্ষের বিরুদ্ধে সংগ্রামে জয় এনে দিয়েছে, সে সব জিনিস বিরোধীপক্ষের কম ছিল বলেই এই জয়। আমাদের আশ্চর্যই বোধ হয় এ কথা ভেবে যে, এতবড় জয়ের জন্যে প্রয়োজনীয় এত উপকরণের মধ্যে জার্মান সংস্কৃতি একেবারেই কিছু করল না কেন আমাদের মনে হয়, আমরা যাকে জার্মান সংস্কৃতি বলছি তা তার সময়কে তোয়াজ করাটাই বেশি সুবিধাজনক বলে মনে করেছে। এই মনোভাবকে যদি বাড়তে দাও, শাখায়-প্রশাখায় বিস্তারিত হতে দাও, যদি এই সংস্কৃতির জয় হয়েছে এই ধারণা নিয়ে তাকে লালন করতে থাক, তাহলে, একটু আগে যা বলেছি, সমগ্র জার্মান আত্মারই উচ্ছেদ করা হবে, এবং কে জানে তারপর জার্মান জাতির যে শারীরিক কাঠামোটি পড়ে থাকবে তা কারও কোনো কাজে লাগবে কি না।

কিন্তু ফরাসীদের ঐ হঠাৎ ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠার ও হঠাৎ ভয়ংকর হয়ে ওঠার বিরুদ্ধে জার্মান জাতিকে যে ভাবে মাথা ঠাণ্ডা রেখে ও অসীম সাহসিকতার সঙ্গে সংঘবদ্ধ করা গিয়েছিল, নিজেদের গৃহ শত্রুর বিরুদ্ধে যে ভাবে দাঁড় করানো গিয়েছিল, যে অ-জার্মান "শোধনবাদ" এখনো মারাত্মক ভুল বোঝার দরুণ আমাদের দেশে সংস্কৃতি নামে চলছে তার বিরুদ্ধে যদি ঠিক ঐ ভাবেই জার্মান জাতিকে সংঘবদ্ধ করা যায়, তাহলে প্রকৃত জার্মান সভ্যতা সম্বন্ধে হাল ছেড়ে দিতে হবে না। জার্মানরা কখনো স্বচ্ছদৃষ্টি সম্পন্ন সাহসী নেতার ও জেনারেলের ঘাটতি দেখেনি। তবুও আমার মনে সন্দেহ জাগছে,

জার্মান জাতিকে সাহসিকতার পথ নির্দেশ আবার করা যাবে কি না। এবং এই যুদ্ধের পর প্রতিদিনই যেন অসম্ভব বলে মনে হচ্ছে। কেননা, আমি বুঝতে পারছি যে, প্রত্যেকেরই এই দৃঢ়-বিশ্বাস হয়েছে যে, সংঘর্ষের আর প্রয়োজন নেই, এত সাহস দেখাবারও দরকার নেই; এবং তারা মনে করছে যা আছে তা বেশ আছে। যা-যা দরকার ছিল তা অনেক আগেই পাওয়া হয়ে গেছে; অর্থাৎ সংস্কৃতির সর্বোৎকৃষ্ট বীজ সর্বত্র বপন করা হয়ে গিয়েছে, এবং তা থেকে অঙ্কুরও দেখা দিয়েছে, এবং কোথাও-কোথাও ফুলও ফুটেছে। এ ব্যাপারে কেবল সন্তুষ্টি নয়, যা আছে তা হচ্ছে উল্লাস ও আনন্দ। জার্মান সংবাদপত্রের লেখকদের লেখায় এই আনন্দোল্লাস দেখতে পাই, এবং নভেল নাটক গান ও গল্প ইত্যাদি যাঁরা উৎপাদন করে চলেছেন তাঁদের মাঝে এটা দেখি। জার্মানীর আধুনিক কালের মানুষদের অবসর অর্থাৎ "সাংস্কৃতিক মুহূর্ত"গুলি আঁকড়ে ধরে এক রঙের পালকের পাখিরা যেমন একত্র হয় তেমনি এঁরা একত্র হয়ে ঐ মানুষদের বোধ ও বুদ্ধির সর্বনাশ করছেন ছাপা কাগজ সরবরাহ করে। এই যে একটা দল হয়েছে, এঁদের কাছে সবই কল্যাণময়, সবই আত্ম-গরিমা, সবই মর্যাদা। "জার্মান সংস্কৃতির এই সাফল্য"-লাভের পর তাঁর আত্ম-সচেতন ও মর্যাদার অধিকারীই যেন কেবল হয়ে ওঠেন নি, তাঁরা হয়ে উঠেছেন যেন ভয়ংকর পবিত্র, তাঁরা তাই বেশ নম্রভাবে কথা বলেন, জার্মান জনগণকে উদ্দেশ করে তাঁরা বক্তৃতা দেন, তাঁরা ঐ সব লেখার সংকলন বের করেন এমন মেজাজে যেন তাঁরা কোনো চিরায়ত সাহিত্যের সংকলন প্রকাশ করছেন, এবং বস্তুতঃপক্ষে তাঁরা পৃথিবী-ব্যাপী প্রচারিত পত্রিকায় এ কথা ঘোষণাও করে থাকেন যে, এগুলি নতুন জার্মান ক্লাসিক এবং সাহিত্যে উৎকর্ষের আদর্শ।

আশা করা অন্যায় নয় যে, যাঁরা বেশি চিন্তাশীল তাঁরা সাফল্যের এই অপব্যবহারের বিষময় ফল সম্বন্ধে সচেতন হবেন, শিক্ষিত জার্মানদের মধ্যে যাঁরা একটু মার্জিত তাঁরা তাঁদের চারদিকে অনুষ্ঠিত এই প্রহসনের জন্যে বিব্রত বোধ করবেন। কেননা, একটা কিম্ভূতকিমাকার চেহারার ছায়া আরশিতে দেখা, এবং মোরগের মত আয়নায় নিজের মূর্তির প্রতিচ্ছবি দেখে আহ্লাদে ডগমগ হবার মতন বিব্রত আর কিসে হতে পারা যায়? কিন্তু শিক্ষিত লোকেরা যা-হচ্ছে-হতে-দাও ধরণের মেজাজ নিয়ে ইচ্ছে করেই বসে থাকেন। জার্মান আত্মার বিষয় চিন্তার চেয়ে তাঁরা আত্ম-চিন্তাতে

বিভোর হতেই ভালোবাসেন। তার উপর তাঁরা এ বিষয়ে দৃঢ়-নিশ্চিত যে তাঁদের নিজেদের সংস্কৃতি বেশ পরিণত, বেশ শ্রীমণ্ডিত এ কালীন ফসল, এবং সবকালীনও বটে; এবং এই জন্যে জার্মানীর সামগ্রিক সংস্কৃতি সম্বন্ধে তাঁরা চিন্তান্বিত নন্, কারণ তাঁরা এবং তাঁদের মতন অনেকে এ সব দুশ্চিন্তা পার হয়ে এগিয়ে গেছেন। কিন্তু বিবেচক ও বুদ্ধিমানেরা, তাঁরা যদি আবার বিদেশী হন, সহজেই ধরতে পারবেন, গুণগত না হলেও গুণতি-গতভাবে বর্তমান কালের বিদ্বান ব্যক্তিরা যাকে সংস্কৃতি বলেন, এবং নূতন জার্মান ক্লাসিকের যে সম্ভব চর্চা চলেছে তারা মধ্যে পার্থক্য কোথায়। যেখানেই জ্ঞানের চেয়ে যোগ্যতার দর বেশি, আর্টের চেয়ে খবরা-খবর সংগ্রহের দাম বেশি, সংক্ষেপে, যে সংস্কৃতি এখনো বর্তমান আছে জীবনে তার প্রতিফলন আবশ্যক বলে যখন মনে করা হয়, তখন আমরা মাত্র এক প্রকারের জার্মান সংস্কৃতির কথাই মনে করতে পারি, যে সংস্কৃতি ফ্রান্সকে জয় করেছিল বলে দাবি করে থাকে।

এটা একেবারেই ভ্রান্ত দাবি। সব নিরপেক্ষ ব্যক্তি, এবং শেষ পর্যন্ত ফ্রান্সও স্বীকার করেছে যে, অফিসারদের ভালো শিক্ষা, সৈন্যদের উপযুক্ত ট্রেনিং, এবং বৈজ্ঞানিক কলা-কৌশল—এইসব সুবিধার জন্যই জার্মানীর জয় হয়েছে। জার্মান শিক্ষা যদি আলাদা করে রাখা যায় তাহলে জার্মান সংস্কৃতি কি এই জয় এনে দিতে পারত? এর কোনো মানে হয় না। কঠোর নিয়মানুবর্তিতা এবং গভীর আনুগত্য—সংস্কৃতির সঙ্গে এসবের কোনো সম্পর্কই নেই। অসীম সংস্কৃতি সম্পন্ন গ্রীস সৈনিকদের চেয়ে ম্যাসিডোনিয়ার সৈন্য-বাহিনীর এই রকম সুবিধা ছিল। জার্মান সংস্কৃতির জয় বলাটা একটা ভুল ধারণা, কেননা সংস্কৃতি কাকে বলে এই ধারণা জার্মানী থেকে এখনো অদৃশ্য হয়ে যায় নি।

একটা জাতির জীবনের সর্ববিধ কাজে সব রকম শিল্প-সম্মত প্রথার সমবায়ই হচ্ছে সংস্কৃতি। অনেক জ্ঞান ও বিদ্যাচর্চা এর জন্যে বিশেষ জরুরি নয়। সংস্কৃতি যে আছে তার প্রমাণও এটা নয়। সংস্কৃতির অন্য পিঠ, অর্থাৎ বর্বরতার সঙ্গে জ্ঞানচর্চা ও বিদ্যাচর্চা থাকতে পারে। অর্থাৎ, কোনো সুঠাম পদ্ধতি না থাকলেও, অথবা নানারকম পদ্ধতির জগাখিচুড়ি হলেও ওসব থাকতে পারে।

বস্তুতঃপক্ষে, এখন জার্মানীর সেই দশা। সব এখন জগাখিচুড়ি পাকিয়ে

গিয়েছে। এটা ভাবাই যায় না যে, এত শিক্ষাদীক্ষা নিয়েও এসব লক্ষ্য না করে বর্তমান এই "সংস্কৃতি" তারা এমন ভাবে উপভোগ করছে কী ভাবে। তাদের চারদিকের সব কিছুই তাদের চোখ খুলে দেবে, এই রকমই তো আশা করা যায়—জামা-কাপড়ের ঘটা, তাদের বাড়ির তাদের ঘরের সজ্জা, তাদের শহরের পথ চলতে তারা যে সব দৃশ্য দেখে, এবং তাদের ফ্যাশনের দোকানের জিনিসপত্র। সবই তো তাদের চোখ খুলে দেবে বলে আশা করা যায়। সামাজিক জীবনের আচার-আচরণও তো লক্ষ করার জিনিস। গানের আসরে, থিয়েটরে, আমাদের শিল্প-সম্মত জীবন-যাপনে তাঁদের তো লক্ষ্য করা উচিত যে সব রকম স্টাইল কেমন সমান্তরালে চলেছে, তেমন ভাবে সব জড়িয়ে যাচ্ছে। জার্মানরা স্তূপ করে তুলছে নানা মহাদেশ থেকে সংগৃহীত নানারকমের ও নানা বর্ণের ও নানা প্রকারের এমন সব দুষ্প্রাপ্য জিনিস যা নাকি বেশ চটকদার কিন্তু যার নেই কোনো আকর্ষণী শক্তি, এইগুলিই সব স্কলাররা এসে বলবে "আধুনিকতার চূড়ান্ত", কিন্তু এতে কেউ আপত্তি জানাবে না। এই রকম "সংস্কৃতি" নিয়ে, যা প্রকৃত সংস্কৃতিরই একটা ব্যঙ্গচিত্র মাত্র যা হাস্য উদ্রেক করে মাত্র, তা দিয়ে কোনো শত্রু নিপাত করা যায় না, বিশেষ ক'রে ফরাসীদের মতন শত্রু বিনাশ করা তো যায়ই না। কেননা তাদের প্রকৃত সংস্কৃতি আছে (তার মূল্য যা'ই হোক না কেন), যে সংস্কৃতির অনুকরণ আমরা করে চলেছি কৌশলে বা অকৌশলে।

আমরা যদি অনুকরণ বন্ধ করে দিতাম, তা'হলে তা তাদের উপর জয় বলে চিহ্নিত হত না, বরঞ্চ তাদের কাছ থেকে মুক্ত হওয়া রূপেই চিহ্নিত হত। আমরা যদি তাদের উপর আমাদের প্রকৃত সংস্কৃতি চাপাতে পারতাম তা'হলে জার্মান সংস্কৃতির বিজয় ঘোষণা করতে পারতাম। বর্তমানে যা অবস্থা তাতে আমরা সব রকম গঠন নৈপুণ্যের জন্যে প্যারিসের উপরেই নির্ভর করে আছি, এটা করেছি প্রয়োজনের তাগিদেই। কেননা, এখন পর্যন্ত নির্ভেজাল জার্মান সংস্কৃতি বলতে কিছু নেই।

আমাদের নিজেদের থেকেই এ বিষয়ে আমাদের সচেতন হওয়া উচিত ছিল। জার্মানদের উদ্দেশ করে প্রকাশ্যে এ কথা বলার অধিকার সামান্য যে কয়জনের আছে তারা বেশ তিরস্কারের সঙ্গেই এ কথা বলেছেন। "আমরা জার্মানরা গতকালের মানুষ"—একারম্যানকে এক সময় গ্যেটে এ কথা বলেছিলেন। "এ কথা সত্য যে, গত এক শতক ধরে আমরা আত্মোন্নতির

জন্যে নিষ্ঠা সহকারে অনুশীলন করে চলেছি, কিন্তু যথেষ্ট বুদ্ধিমত্তা ও উন্নত সংস্কৃতি অর্জন করতে আমাদের দেশবাসীর আরো দীর্ঘ সময় লাগবে, তখন আমরা তাদের বলতে পারব—অনেক কাল আগের কথা যখন তারা ছিল অসভ্য ও বর্বর।"

অটো ফন বিসমার্ক

হের ফন পুটকামেরকে লেখা একটি চিঠি

অটো ফন বিসমার্ক (১৮১৫-১৮৯৮) ১৮৪৭ সালে তাঁর রাজনৈতিক জীবন আরম্ভ করেন কনসারভেটিভ ডেপুটি হিসেবে, যদিও তিনি সরকারের সঙ্গে সব সময় একমত হতে পারতেন না। ১৮৬২ সালে প্রাশিয়ান রাজা তাঁকে প্রধানমন্ত্রী করেন। বিসমার্কের রাজনৈতিক নেতৃত্বে ১৮৬৬ সালে প্রাশিয়া যুদ্ধ করে অস্ট্রিয়ার সঙ্গে, যার পর থেকে জার্মানীর সঙ্গে অস্ট্রিয়ার সংযোগ ছিন্ন হয়। ১৮৭১ সালে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়ের পর জার্মানী একতাবদ্ধ হয় এবং জার্মান সাম্রাজ্যের পত্তন হয়। বিসমার্ক হন এই সাম্রাজ্যের চ্যান্সেলার, ১৮৯০ পর্যন্ত তিনি এই পদে ছিলেন। তাঁর পররাষ্ট্র নীতি ছিল অনেক প্রকার সন্ধিচুক্তি করে শান্তি রক্ষা করা, কিন্তু তাঁর স্বরাষ্ট্র নীতি ক্রমেই সংরক্ষণশীল হয়ে ওঠে, এবং কখনো-কখনো কঠোরও হয়ে ওঠে। ১৮৮৩ থেকে ১৮৮৯ পর্যন্ত তিনি নূতন ও আদর্শস্থানীয় অনেক সামাজিক আইন প্রবর্তন করেন, কিন্তু সোশ্যাল ডেমোক্রাটদের রাজনৈতিক আন্দোলনের মোকাবিলার জন্যে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা প্রয়োগ করতে থাকেন, এই ভাবে শ্রমিকশ্রেণীকে রাষ্ট্র থেকে পৃথক করে রাখা হয়, এবং তারা মার্কস নীতির দিকে ঝুঁকবার সুযোগ পায়।

এখানে উদ্ধৃত চিঠিতে বিসমার্ক তাঁর "অন্তর্জীবনের ও বিশেষ করে খ্রীস্টধর্মের প্রতি তাঁর মনোভাবের একটি বিবরণ" বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁর যৌবনকালে বিসমার্ক চিরাচরিত খ্রীস্টধর্ম বিশ্বাসের পথ থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখেন, এবং স্বাধীন চিন্তার মনোভাব গ্রহণ করেন। কিন্তু স্থির ও দৃঢ় বিশ্বাস এসে তাঁর মধ্যে যে পরিবর্তন আনে তার কারণ এক ভক্তিমান ধর্মীয় সংঘের সঙ্গে তাঁর পরিচয়, যাঁরা কেবল ভগবৎতত্ত্বই প্রচার করতেন। এখানেই বিসমার্কের সঙ্গে পরিচয় হয় জোহানা ফন পুটকামের-এর সঙ্গে, যাঁকে তিনি বিবাহ করেন ১৮৪৭ সালে।

ডিসেম্বরের শেষ, ১৮৪৬

প্রিয় হের ফন পুটকামের,

এই চিঠি কিজন্যে লিখছি প্রথমেই আমি তা উল্লেখ করছি। পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে মহৎ দান আপনি আমাকে করতে পারেন, সেটি হচ্ছে আপনার কন্যার হস্ত। আমি তার পাণিগ্রহণে আগ্রহী। আমি জানি এটা অনেকটা ধৃষ্টতার মতন মনে হবে, কেননা আপনার সঙ্গে অল্পদিন পরিচয় ও বারকয়েক দেখা সাক্ষাতের পরই আমি আপনার প্রস্তাব করছি যা হচ্ছে আমার উপর আপনার সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ আস্থা রাখারই প্রস্তাব। কিন্তু আমি জানি সময়ের স্বল্পতা ও আমাদের মধ্যের এই দূরত্ব আমার সম্বন্ধে আপনার কোনো অভিমত গড়ে তার পক্ষে বাধা-স্বরূপ। আমি নিজে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আপনার এই গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত বিষয়ে কোনো গ্যারান্টি দিতে পারিনে, ভগবানের উপর বিশ্বাস থাকলে মানুষের উপর বিশ্বাস তত প্রয়োজনীয় বলে বোধ না হতে পারে। আমি আপনাকে কেবল আমার সম্বন্ধে অকপটে বলতে পারি, যাতে আপনার সিদ্ধান্ত নেবার সুবিধা হয়। বলতে পারি যে, আমি আমার সম্বন্ধে একেবারে পরিষ্কার। আমার বাহ্যিক চালচলন সম্বন্ধে আপনি অন্যের কাছ থেকে খোঁজখবর নিতে পারবেন। এইজন্যে আমি কেবল আমার অন্তর্জীবনের কথাই বলব, যেটা হচ্ছে বাহ্যিক জীবনেরই বনিয়াদ; বিশেষ করে বলব খ্রীস্টধর্ম সম্বন্ধে আমার মনোভাব কী।

এ কথা বলতে হলে আমাকে অনেক আগের কথা বলতে হবে। আমি শিশুকাল থেকেই আমার মাতাপিতা থেকে বিচ্ছিন্ন এবং তারপর থেকে কোনোদিনই তাদের সঙ্গে বনিবনা হয়নি। তাঁরা আমার শিক্ষার ব্যবস্থা এমনভাবে করেছিলেন যাতে মানসিক উৎকর্ষের জন্যে ও তাড়াতাড়ি জ্ঞান-লাভের জন্যে অন্য সব ব্যাপারকে উপেক্ষা করা হত। ধর্মীয় পাঠচক্রে অনিয়মিত ভাবে হাজির হতাম, ধর্মের কথা কিছু বুঝতে পারতাম না, কিন্তু আমার ষোলো বছর বয়সের জন্মদিনে আমাকে দীক্ষিত করা হল। কিন্তু আমার মনের মধ্যে যে ছাপ আঁকা হয়ে গেল তা হল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে স্রষ্টার কোনো সম্পর্ক নেই এই স্থূল তত্ত্ব এবং পরিশেষে যা দাঁড়িয়ে গেল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় শক্তি ও স্রষ্টা একই জিনিস—এই বিশ্বাস। ছেলেবেলা থেকে রাত্রে প্রার্থনা করা অভ্যাস ছিল, কিন্তু এই সময় থেকে আমি প্রার্থনা করা বন্ধ করে দিলাম। এটা উদাসীনতার দরুণ নয়, এটা করলাম অনেক ভেবে-চিন্তেই।

কেননা আমার মনে হতে লাগল যে, প্রার্থনা করাটা ঈশ্বরের ইচ্ছার বিপরীত কাজ। আমি নিজেকেই বলতে লাগলাম যে, ঈশ্বরই তাঁর সর্বব্যাপী শক্তিতে সব জিনিস সৃষ্টি করছেন, তাঁর মধ্যে আমার চিন্তা ও আমার ইচ্ছাও অন্তর্ভুক্ত, সুতরাং আমার মধ্যে দিয়ে নিজের কাছে ঈশ্বরকেই প্রার্থনা করতে হবে। আমার ইচ্ছাশক্তি যদি ঈশ্বর নির্ভর না হয়, তাহলে চারদিকের অপরিবর্তন-শীলতা সম্বন্ধে সন্দেহ এসে যাওয়া স্বাভাবিক, এবং তাহলে ঐশ্বরিক প্রভাবও ভ্রান্ত বলে স্বীকার কবতে হয়; তাহলে মানুষের প্রার্থনারই বা কী দাম থাকে?

সতেরো বছর বয়সের কিছু আগেই আমি গটিনজেন বিশ্ববিদ্যালয়ে যাই, এবং তার পরের আট বছর মা-বাবার সঙ্গে সামান্যই দেখা করেছি। আমি আমার খুশি অনুযায়ী চলাটা বাবা মেনে নিয়েছিলেন, কিন্তু আমি আমার পড়াশুনায় মন দিচ্ছিনে বলে দূর থেকেই ভৎর্সনা পাঠাতেন, হয়তো তিনি মনে করতেন বাদবাকি সবই ভগবানের ইচ্ছায় হবে। অন্য কারও কাছ থেকে আমি কোনো নির্দেশ বা উপদেশ পাইনি। এই সময়ে উচ্চাশা নিয়ে আমার পড়াশুনা এবং মনের মধ্যে একটা হতাশা ও ফাঁকা-ফাঁকা ভাব আমার সঙ্গের সাথি হয়ে দাঁড়াল, এবং জীবনের গুরুত্বের প্রতি আমার মনোযোগ আকৃষ্ট হল, জীবনের নিত্যতা সম্বন্ধে যেন বোধ এল, এসব যে এল তার কারণ আমাদের প্রাচীন দার্শনিকেরা। হেগেলের লেখা আমি তেমন বুঝতে পারতাম না, কিন্তু স্পিনোজার গাণিতিক পদ্ধতিতে প্রকাশিত বক্তব্য আমি কিছু কিছু বুঝলাম। এতেই আমি পেতে লাগলাম মানসিক সান্ত্বনা।

কিন্তু ছয় সাত বছর আগে আমার মায়ের মৃত্যুর পর আমি যে একা বোধ করতে লাগলাম, তখন আমি ক্লিহকে গেলাম, জীবনের ঐ দর্শন সম্বন্ধে গভীর ভাবে ভাববার জন্যে। আমার মতের পরিবর্তন হল সামান্যই, কিন্তু এই নির্জনে আমি যেন শুনতে লাগলাম এক অন্তর্বাণী, যাতে মনে হতে লাগল যে, যেসব মত আমি আগে স্বীকার করতাম, সেসব যেন ভ্রান্ত। আমি কেবল যুক্তির মধ্যেই নিজেকে আবদ্ধ রাখতে চাইলাম, তার পর স্ট্রাউস, ফয়েরবাশ, ব্রুনো, বাউয়ের ইত্যাদি পাঠ ক'রে যেন সন্দেহের এক অন্ধগলিতে এসে পৌঁছলাম। আমি নিজেকে দিয়েই বুঝতে পারলাম যে, ঈশ্বর মানুষকে জ্ঞান শক্তি দেন নি। সুতরাং সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের অভিপ্রায় কি তা জানার জন্যে মানুষের চেষ্টা হচ্ছে তার একগুঁয়েমি ছাড়া আর কিছু না। মানুষের মৃত্যুর

পর ঈশ্বর তাকে দিয়ে কি করতে চান তা দেখার জন্য মানুষকে ধৈর্য ধারণ করতে হবে। যে বিবেক ঈশ্বর আমাদের দিয়েছেন তার দ্বারাই ঈশ্বরের অভিপ্রায় আমরা উপলব্ধি করতে পারি, পৃথিবীর এই অন্ধকারে চলবার জন্যে এই বিবেকই হচ্ছে ঈশ্বর প্রদত্ত একটা সূক্ষ্ম সূতা। এ কথা আমি বলতে চাইনে যে, বিশ্বাসে আমার কোনো শান্তি ছিল না। আমার ও আরও অনেকের অস্তিত্বের কোনো মানে নেই কোনো প্রয়োজন নেই—এই রকম হতাশ চিন্তায় আমি অনেক সময় অতিবাহিত করেছি। আমরা যেন ভগবানের সৃষ্টিকাজের সময়ের উপজাত একটা জিনিস তাঁর চাকার ধূলোর মত কখনো জেগে উঠছি, কখনো মিলিয়ে যাচ্ছি।

আমার স্কুল জীবনের পর প্রথম বছর চার আগে আমি মরিৎস ব্ল্যাংকেন-বার্গের সংস্পর্শে এলাম। জীবনে আমি যা পাইনি তাঁর মধ্যে আমি তাই পেয়ে গেলাম। আমি পেলাম একজন বন্ধু। তিনি তাঁর শত চেষ্টাতেও আমার মধ্যে এল না ঐ জিনিসটি, যার নাম বিশ্বাস। মরিৎসের দৌলতেই আমি ট্রিগলাফ-পরিবারের সঙ্গে ও তাঁদের সমাজের সঙ্গে পরিচিত হই। এঁরা যেসব ব্যাপারকে শিশুসুলভ আগ্রহের সঙ্গে গ্রহণ করেছেন সেসব সম্বন্ধে আমার সীমিত কৌতুহল নিয়ে জানবার চেষ্টা করেছি, এবং এদের সব আচরণ দেখে আমি সংকোচও বোধ করেছি। এই সমাজের মানুষদের বাহ্যিক কাজকর্ম দেখে আমার মনে হত আমি বুঝি এঁদের মতনই হতে চাই। আমি দেখেছি তাঁদের মনে আস্থা আছে, শান্তি আছে, এসব যে বিশ্বাসের দরুণই হয়েছে তা আমি বুঝতে পারতাম। কিন্তু বিশ্বাস জিনিসটা তো কারও উপর আরোপ করা যায় না, কারও কাছ থেকে কেড়ে নেওয়াও যায় না। এই বিশ্বাস আমি অর্জন করতে পারি কিনা তার জন্যে আমি ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে লাগলাম। অল্পদিনের মধ্যেই আমি এই সমাজের সঙ্গে মিশে গেলাম, এবং এতদিন যে পারিবারিক জীবন পাইনি এবার তা পেয়ে বেশ আরাম বোধ করতে লাগলাম।

তার পর আমি এমন কয়েকটা ঘটনায় জড়িয়ে পড়লাম, যে কথা আমি প্রকাশ করতে পারব না, কেননা সেসব হচ্ছে অন্য ব্যক্তিদের গোপন কথা। এইসব ঘটনায় আমি ভীষণ আঘাত পেয়েছিলাম, এর ফলে আমার জীবনের লক্ষ্য সম্বন্ধে এক অসারতার বোধ যেন আমার মধ্যে জেগে উঠতে লাগল। কয়েকজন বন্ধুর পরামর্শে এবং নিজের আগ্রহেও বটে আমি মনোযোগ দিয়ে

ধর্মগ্রন্থ পাঠ করতে লাগলাম, নিজের বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করা স্থগিত রাখলাম। আমার ভিতরে-ভিতরে যা আবর্তিত হচ্ছিল তা এসে গেল আমার জীবনে। আমার বন্ধু কার্ডেমিনের মারাত্মক অসুখের সময়ে কোনো যুক্তির ধার না ধেরে আমি আন্তরিকভাবে প্রার্থনা করে ফেললাম। ঈশ্বর আমার প্রার্থা পূরণ করেন নি, কিন্তু তিনি তা বাতিল করেও দেন নি, কেননা ভবিষ্যতে কখনোই আমি তাঁর কাছে প্রার্থনা জানাতে ইতস্তত করতে পারি নি। আমি জীবনে যা কখনো পাইনি সম্ভবত এবার তাই পেলাম, শান্তি পেলাম না বটে, পেলাম সাহস ও বিশ্বাস।

হৃদয়ের এই পরিবর্তনের কী দাম আপনি দেবেন তা জানিনে, মাত্র দু মাস হল এসেছে এই পরিবর্তন। তবুও আমি আশা করি, আপনি যা'ই স্থির করুন এ পরিবর্তন বহালই থেকে যাবে। আমার অকপটতা ও বিশ্বস্ততা ছাড়া অন্য কোনো ভাবে আমি আপনার সম্মুখে আমাকে মেলে ধরতে পারিনি, আমার একমাত্র আশা এই যে, আন্তরিকতার সাফল্য ঈশ্বর মঞ্জুর করবেন।

আপনার কন্যা সম্বন্ধে আমি আমার মনের ভাবের কথা আপনার বলতে চাইনে। আমি যা করতে ইচ্ছা করেছি, কথার থেকে তা'ই বেশি স্পষ্ট। ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কোনো প্রতিজ্ঞা বা প্রতিশ্রুতির কোনো মূল্য আপনার কাছে না থাকারই কথা কেন না, মানুষের মনের উপর নির্ভর করা কতটা বেকুবি আমার থেকে আপনি তা অনেক বেশি জানেন। আপনার কন্যার জন্য আমার গ্যারান্টি হচ্ছে কেবলমাত্র ঈশ্বরের আশীর্বাদ। আমি এখানে একটা কথা উল্লেখ করি। কার্ডেমিনদের ওখানে তাকে কয়েকবার দেখে, তারপর এই গ্রীষ্মকালে সকলে একত্রে নৌযাত্রা করে, আমার মনে এই কথাই বার-বার জেগেছে যে, আমি যা ভাবছি তা আপনার কন্যার জীবনের সুখ ও শান্তির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ কি না, এবং আমার আত্মবিশ্বাস আমার যোগ্যতার চেয়ে বেশি কি না, আপনার কন্যা তার স্বামীর কাছে যতটা প্রত্যাশা করে আমার মধ্যে সে তা পাবে কি না। সম্প্রতি, অবশ্য, ঈশ্বরের করুণার উপর আমার আস্থা আমাকে আমার মনের কথা প্রকাশ করার শক্তি দিয়েছে। আমি এর আগে আপনার সঙ্গে সাক্ষাতের সময় আপনাকে কিছু বলিনি, কেননা মৌখিকভাবে সব কথা বলা যাবে ব'লে আমি মনে করিনি। এই বিষয়টার গুরুত্ব উপলব্ধি ক'রে, এবং আপনার ও আপনার স্ত্রীর কাছ থেকে আপনার

কন্যার একদিন অন্যত্র গমনে আপনাদের পক্ষে কতটা আত্মত্যাগের কাজ হবে তা বুঝতে পেরে আমি অনুমান করছি আমার আবেদনে আপনারা সম্ভবত সাড়া দিতে পারবেন না, আমার প্রার্থনা মঞ্জুর করতে পারবেন না। কিন্তু আমার এক শেষ অনুরোধ আছে। আপনার সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা করার সুযোগ থেকে আমাকে বঞ্চিত করবেন না। আপনি এ বিষয়ে সরাসরি ভাবে নেতিবাচক সিদ্ধান্ত জানাবার আগে কি-কি কারণে আমার প্রার্থনা না-মঞ্জুর করলেন তা জানার সুযোগ আমাকে দেবেন।

এমন অনেক কথাই অবশ্য আছে যেসবের উল্লেখ আমি করিনি, কিংবা এই চিঠি তার ভালোমত বিবরণ দিতে পারিনি। আপনি আমাকে যে-যে প্রশ্ন করতে চান আমি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তার উত্তর দেবার জন্যে প্রস্তুত আছি। তবুও আমার মনে হয়, সবচেয়ে প্রয়োজনীয় যেসব কথা আমি তা এই চিঠিতে জানাতে পেরেছি।

অনুগ্রহ ক'রে আপনার স্ত্রীকে আমার গভীর শ্রদ্ধা জানাবেন। আপনি আমার আন্তরিক ভক্তি ও প্রীতি গ্রহণ করবেন।

বিসমার্ক

ম্যাক্স্ ভেবার

রাজনীতির পেশা

সমাজবিজ্ঞানী ম্যাক্স ভেবার (১৮৬৪-১৯২০) অন্যান্য অনেক বিষয়ের সঙ্গে কার্ল মার্কস-এর সমাজবিজ্ঞানমূলক তত্ত্ব পাঠ করেন। মার্কস যেভাবে ইতিহাসের ব্যাখ্যা করে গিয়েছে, তা তিনি অনুসন্ধান করেন, এবং নিজের অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর ক'রে, সমাজের ও ইতিহাসের বিবর্তনে আধ্যাত্মিক ও জড়বাদী শক্তির মধ্যে সম্পর্ক কতটা তা খুঁজে দেখার চেষ্টা করেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মধ্যে জীবন কাটিয়েছেন তিনি। এই যুদ্ধের ফলে বোঝা গিয়েছিল যে একটা ভুল নীতির বা যে নীতির কোনো অস্তিত্ব নেই তার প্রয়োগের পরিণাম কী। এর পরেই ১৯১৯ সালে তিনি লেখেন "ভোকেশন টু পলিটিক্স"। এখানে ম্যাক্স ভেবার রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের মধ্যে নৈতিক বোধের উপর জোর দিয়েছেন, তাঁর সময়ে যার বিশেষ অভাব তিনি লক্ষ্য করেছেন। প্রকৃত জীবনের

অবস্থাকে এড়িয়ে না গিয়েও রাজনীতি করলে তার কি-কি করণীয় এবং তার সম্ভাবনাই-বা কি-কি, তিনি তার বিবরণ দিয়েছেন।

"পেশা" হিসেবে রাজনীতি গ্রহণ করলে তাতে আনন্দ কতটা, এবং যাঁরা এই পেশা গ্রহণ করেন তাঁদের উপর কি-কি শর্ত আরোপ করা যেতে পারে?

প্রথমত, এটা দেয় ক্ষমতার একটা অনুভূতি। রাজনীতি ক্ষেত্রে যাঁরা তেমন গুরুত্বপূর্ণ পদের অধিকারী নন্, পেশাদার এমন রাজনৈতিক কর্মীও সাধারণ মানুষের থেকে নিজেকে অনেক বড় বলে মনে করেন, কেননা জনসাধারণের উপর তাঁর প্রভাব যে আছে এ বিষয়ে তিনি সচেতন, এবং জনসাধারণের উপর যে ক্ষমতা প্রয়োগ করা হয় তার কিছু অংশ তাঁর জাতেও আছে ব'লে তিনি জানেন। বিশেষ করে সংঘবদ্ধভাবে ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ অনেক ঘটনা যে তাঁরাই ঘটাচ্ছেন—এ বিষয়েও তাঁরা বেশ সজাগ। এসব সত্ত্বেও প্রথমত তাঁকে এই প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয় যে, তাঁর ক্ষমতা সুবিবেচনার সঙ্গে প্রয়োগের উপযুক্ত কতটা যোগ্যতা তাঁর আছে, এবং কিসের জোরে তিনি তাঁর ঘাড়ে এতটা দায়িত্ব নিচ্ছেন। এর থেকে আমরা নীতিগত আর একটি প্রশ্নে পৌঁছে যাচ্ছি। ইতিহাসের চাকা যাকে বলা যায় তা পরিচালনার পক্ষে তাঁকে কি ধরণের মানুষ হতে হবে।

রাজনীতিজ্ঞের পক্ষে এই তিনটি গুণ থাকা আবশ্যক বলে মনে হতে পারে: নিষ্ঠা ও ইচ্ছার প্রবলতা, সুবিচার সম্বন্ধে দায়িত্ববোধ। বাস্তব ব্যাপার সম্বন্ধে সহজ বোধ, যার অর্থ হল এই যে, দেশ যিনি শাসন করছেন তিনি দেবতুল্যই হোন বা শয়তানতুল্যই হোন তাঁর প্রতি আনুগত্য। আমাদের বন্ধু জর্জ সিমেল যাকে "বন্ধ্যা উত্তেজনা" বলেছেন সে রকম মনোভাবের কথা বলছিনে, যা নাকি অনেক বুদ্ধিজীবীর, বিশেষ করে রাশিয়ান বুদ্ধিজীবীর মধ্যে বিশেষ ভাবে দেখা গিয়েছে (অবশ্য সব রাশিয়ানের মধ্যে নয়), এবং এখন (১৯১৯) যা "বিপ্লব" নামক এক মস্ত পরিচয় নিয়ে অবাধ এক আনন্দোৎসব আরম্ভ করে দিয়েছে, আমাদের বুদ্ধিজীবীদের উপরেও যার প্রভাব কম নয়, যাঁরা "বুদ্ধিজীবীদের ভঙ্গি নিয়ে এমন ভাবাবেগে" চলেছেন যা পরিণামে একেবারে নিষ্ফল হয়ে যাচ্ছে, এবং প্রমাণ হচ্ছে দায়িত্ব বিষয়ে যাঁদের বিন্দুবিসর্গ কোনো বোধ নেই। প্রবল ইচ্ছা বা নিষ্ঠা, যার কথা বলা হল, সেইটেই অবশ্য সব নয়। যে উদ্দেশ্য-সাধনের জন্যে তিনি কাজ করছেন,

সেই কাজ সম্বন্ধে পূর্ণ দায়িত্বজ্ঞান থাকলে এবং তদানুযায়ী নিজের চরিত্র গঠন করে তুলতে পারলে তবেই তিনি রাজনীতিজ্ঞ হবার যোগ্যতা অর্জন করতে পারেন। এবং রাজনীতিজ্ঞের যা প্রয়োজন তা হচ্ছে তাঁর মানসিকতার দিক থেকে বিচারবোধ সম্বন্ধে সম্যক্ ধারণা, যে ঘটনা ঘটে চলেছে সে সম্বন্ধে তিনি যাতে প্রশান্তভাবে আত্মগত হয়ে তা উপলব্ধি করতে পারেন তার উপযুক্ত পরিবেশ রচনা, অর্থাৎ সব ব্যাপার ও সব মানুষকে একটু দূর থেকে দেখা।

"দূরত্বে অভাব"ই হচ্ছে কোনো রাজনীতিজ্ঞের পক্ষে একটা ডাহা ভুল, এবং এই ভুলই আমাদের উঠ্তি বুদ্ধিজীবীদের রাজনীতিক্ষেত্রে অপদার্থ দাঁড় করিয়ে দেবে। সমস্যাটা হচ্ছে ঠিক এই—একই মানুষের মধ্যে প্রবল ইচ্ছার আবেগ ও স্থির বিচারবোধ একাধারে রাখা যায় কী ক'রে। নীতি স্থির করা হয় মাথা দিয়ে, শরীরের আর-কোনো অঙ্গ দিয়ে বা হৃদয় দিয়ে নয়। রাজনীতির প্রতি অনুরাগ যদি কেবল বুদ্ধির খেলা না হয়ে মানবিক কোনো কাজ হয়ে থাকে, তখনই ইচ্ছার আবেগ তাকে সফল রাজনীতিজ্ঞ করে তুলতে পারে। মনের প্রবল জোরই রাজনীতিজ্ঞকে বিশিষ্ট করে তুলতে পারে, এবং "বন্ধ্যা উত্তেজনা" যাকে বলা হয়েছে সেইরকম উত্তেজনার বশবর্তী হয়ে যাঁরা রাজনীতির খেলা খেলেন তাঁদের কাছ থেকে স্বতন্ত্র করে রাখতে পারে; এবং এটা হতে পারে সর্ব অর্থেই ঐ "দূরত্ব" বজায় রাখলে। এইসব গুণ থাকলেই একজন রাজনীতিজ্ঞের "ব্যক্তিত্বে"র "শক্তি" বৃদ্ধি পায়।

এই জন্যেই সর্বসময়ে একটি সাধারণ শত্রুকে তার পরাস্ত করেই চলতে হবে, মানুষমাত্রের মধ্যেই যে শত্রু আছেই, সেটি হচ্ছে—দম্ভ। সব দূরত্বের ও সব অনুরাগেরই এ হচ্ছে পরম শত্রু।

দম্ভ হচ্ছে একটা সাধারণ ধর্ম, কেউই সম্ভবত এর থেকে মুক্ত নয়। বস্তুত পক্ষে, শিক্ষাজগতে ও স্কলারদের মধ্যে এটাকে অনেকটা পেশাগত রোগ বলা চলে। তবুও, এ কথা যতই অপ্রিয় শোনাক, তবুও বলতে হচ্ছে যে স্কলারদের দম্ভ তত ক্ষতিকর নয়, কেননা জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে তাদের কোনো প্রভাব নেই। কিন্তু রাজনীতিজ্ঞদের ক্ষেত্রে এর বিপরীতটাই সত্য, তিনি ক্ষমতা লাভের উচ্চাকাঙ্ক্ষা নিয়েই কাজ করে যান, কেননা ক্ষমতাই হচ্ছে তাঁর কার্য-সাধনের একটা উপায়। এ'কে "ক্ষমতা লাভের প্রবৃত্তি"ই বলতে হয়, এইজন্যে এটা রাজনীতিজ্ঞের জীবনের স্বাভাবিক ধর্মই। রাজনীতির মতন এমন পবিত্র পেশার মধ্যে পাপ ঢোকে তখনই যখন কর্তৃত্ব করার আকাঙ্ক্ষায় ও ক্ষমতা

লাভের আগ্রহে যে উদ্দেশে তাঁর এই কাজে আত্মনিয়োগ সে কথা ভুলে গিয়ে ব্যক্তিগত এক নেশায় বিভোর হয়ে যান একজন কর্মী। রাজনীতি ক্ষেত্রে অন্তত দু রকমের মারাত্মক পাপ আছে, এক হচ্ছে কর্তৃতাধিকারের ব্যগ্রতা, বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই যার সঙ্গী হয়ে আসে দায়িত্বজ্ঞানহীনতা। তার পর হচ্ছে দম্ভ—সকলের চোখে দৃষ্টির সামনে আসবার ব্যাকুলতা। এই দুইটির একটি বা দুইটিই হচ্ছে রাজনীতিবিদের সবচেয়ে বড় প্রলোভন। মিথ্যা স্তোক দিয়ে যাঁরা জনপ্রিয়তা অর্জনের চেষ্টায় রত থাকেন এ কথা তাঁদের পক্ষেই বেশি প্রযোজ্য। সেইজন্যেই তাঁকে অনবরতই অভিনেতার মত অভিনয় করতে হয়, এবং নিজের আচরণ সম্বন্ধে কোনো দায়িত্ববোধ না রেখে তিনি কেবল লক্ষ্য করতে থাকেন লোকের মনে কতটা দাগ কাটতে তিনি পারলেন। তাঁর অন্তর্মুখিনতা তাঁকে ক্ষমতার অনুরূপ কোনো চটকদার ব্যাপারের দিকে টানে, কিন্তু আসল ক্ষমতা যে সেটা নয় তা তিনি বোঝেন না। অন্যদিকে তাঁর দায়িত্বজ্ঞানহীনতার প্রমাণ হচ্ছে এই যে, ক্ষমতার জন্যেই তিনি ক্ষমতা চান, এর আর কোনো উদ্দেশ্যই যেন নেই। যেহেতু ক্ষমতা না হলে কোনো কাজই চলে না, এজন্যেই বুঝি রাজনীতি-ক্ষেত্রে ক্ষমতার জন্যে এত লালসা। যাঁরা হঠাৎ-নবাব হবার মতন হঠাৎ-ক্ষমতার অধিকারী হয়েছেন তাঁদের এই ক্ষমতার মতন ক্ষতিকর আর-কিছু নেই। এবং তাঁরা যে প্রকৃত ক্ষমতারই অধিকারী এই আত্মম্ভরিতাই অনেক ক্ষতির কারণ। যে-কোনো রকম ক্ষমতারই দশা এই। "ক্ষমতার জন্যে রাজনীতি" যাকে বলে তার জন্যে এদেশেও বেশ জোর চেষ্টার নজির আছে, এই ক্ষমতা দেখতে বেশ জোরদার, কিন্তু আসলে তা ফাঁকি ও ফাঁকা। এদিক থেকে "ক্ষমতার রাজনীতি"র যাঁরা সমালোচক তাঁরা ঠিক কথাই বলেন। এ ধরনের অনেক প্রচেষ্টা দেখেই আমরা স্পষ্ট বুঝতে পেরেছি, এর মধ্যে কতটা দুর্বলতা ও বন্ধ্যাত্ব লুকানো আছে। মানবিক কোনো রকম কর্তব্য সম্বন্ধে এঁদের যে কতটা নোংরা ধারণা আছে, এর থেকেই তা স্পষ্ট বোঝা যায়। সব রকম কাজ, বিশেষ ক'রে রাজনৈতিক কাজ, এর সঙ্গে যে কতটা মর্মান্তিক ভাবে জড়িত তা তাঁরা বুঝতে পারেন না।

আমরা এখানে বিস্তারিত ভাবে রাজনীতির প্রকৃত উদ্দেশ্য এবং কার্যত তার বিপরীত কাজ ইতিহাসে কিভাবে হয়ে এসেছে তা বলতে চাই নে। এসব সত্ত্বেও, মনের মধ্যে যদি আসল উদ্দেশ্যটি—একটা বিশেষ বিষয়ের জন্যে

প্রয়াস—দানা বেঁধে থাকে তাহলে কাজটি কখনো ভ্রষ্ট হতে পারে না। কোন্ উদ্দেশ্য নিয়ে রাজনীতিজ্ঞ ক্ষমতার জন্যে চেষ্টা করছেন ও সেই ক্ষমতা অর্জন করছেন, তা নির্ভর করে তাঁর বিশ্বাসের উপর। তিনি জাতীয়তার জন্যে, মানবিকতার জন্যে, সামাজিক ও নৈতিক, সাংস্কৃতিক, আধ্যাত্মিক বা ধর্মীয় ব্যাপারে কাজ করতে পারেন, "অগ্রগতি" সম্বন্ধে তিনি যেরকম অভিমতই পোষণ করুন, এর উপর তাঁর গভীর বিশ্বাস বা আস্থা তিনি রাখতে পারেন বা না-রাখতে পারেন। তিনি দাবি করতে পারেন যে একটা "আইডিয়া"র জন্যে তিনি কাজ করছেন; তিনি নীতির দিক থেকে এ দাবি করতে না-পারেন, তিনি কেবল দৈনন্দিন জীবনের বাহ্যিক চাহিদা জোগান দেবার জন্যে কাজ করার ইচ্ছা করতে পারেন। যা'ই তিনি করুন, সব ব্যাপারেই যা চাই তা হচ্ছে বিশ্বাস। তা না হলে, এ কথা সত্য যে, মানুষের অনেক পতন ও অনেক অপদার্থতাও বাইরের দিক থেকে একটা বড়-রকমের রাজনৈতিক সাফল্য বলে ঘোষিত হতে পারত না।

এবার আমরা আসল কথায় এসে পৌঁছাচ্ছি। আমাদের এ কথা মনে রাখতে হবে যে, নীতিগত তত্ত্বের দিক থেকে ঠিক আছে এমন অনেক কাজই দুইটি পৃথক, বা অবিশ্বাস্য-রকম বিপরীত সূত্রে ভাগ করা যায়। একটা হচ্ছে "পরিপূর্ণ ও নিখুঁত মূল্যবোধ," অন্যটি হচ্ছে "দায়িত্ব।" এর মানে এই নয় যে, মূল্যবোধ স্বীকার করাটা দায়িত্বজ্ঞানহীনতায় নামান্তর, এবং দায়িত্বজ্ঞান জিনিসটা চরিত্রের দৃঢ়তার অভাব। এমন কথা কখনোই বলা হচ্ছে না। কিন্তু এই দুয়ের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য আছে। সম্পূর্ণ মূল্যবোধ মেনে কাজ করা ব্যাপারটিকে ধর্মীয় সূত্রে বলা যায় "খ্রীষ্টানেরা সংগত কাজ করেন, এবং বাকিটা ঈশ্বরের হাতে ছেড়ে দেন," এবং দায়িত্ববোধ সম্বন্ধে বলা যায় যে, দায়িত্ব নিয়ে যাঁরা কাজ করেন তারা নিজেরই আচরণের পরিণতি ভেবে সে কাজ করেন। যত জোর দিয়েই তাঁর ইউনিয়নের মূল্যবোধে বিশ্বাসী কোনো ট্রেড-ইউনিয়ন-কর্মীকে বোঝানো যাক-না যে, তাঁর এই বিশ্বাস নিয়ে কাজ করার ফলে তাঁদের সংগ্রামীদের উপরে পীড়নই আসবে এবং তাদের উন্নতিতে বাধা ঘটবে, তবু তিনি এ কথায় এতটুকু প্রভাবিত হবেন না। দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে তাঁদের কাজ করার পরিণাম যদি খারাপ হয়, তাহলে এজন্যে তাঁরা অন্যের নির্বুদ্ধিতারই দোষ দেবেন, অথবা দোষ আরোপ করবেন সেই ঈশ্বরের উপরে যিনি তাদের সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু দায়িত্ববোধ নিয়ে যিনি কাজ করেন তিনি

মানুষের ভুলত্রুটির কথাটা স্বীকার করেন; মানুষ যে দোষে-গুণেই মানুষ এটাও তিনি মানেন; নিজের আচারণের পরিণাম সম্বন্ধে তাই তিনি অন্যের উপর দায় চাপান না। তিনি বলেন, আমার কাজের পরিণামের দায়িত্ব আমার। কিন্তু যাঁরা মূল্যবোধে বিশ্বাস নিয়ে কাজ করেন, তারা ঐ বিশ্বাসের আগুন জ্বালিয়ে রাখার 'দায়িত্ব'টুকুই স্বীকার করেন—সামাজিক অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাবার জন্যে যে-আগুন জ্বালা হয়েছে তা যেন নিভে না যায় তার প্রতি দৃষ্টিরাখাটাই তাঁদের একমাত্র 'দায়িত্ব'। এঁদের লক্ষ্য ঐ আগুন নতুন করে জ্বালানো, এ'তে সফলতা কতটা আসতে পারে সেদিক থেকে দেখতে গেলে এই কাজকে যুক্তিহীন ব'লে মনে হবে। চোখের সামনে একটা জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত মেলে ধরা ছাড়া এর আর কোনো মূল্য নেই।

যিনি নিজের চিত্তের মঙ্গল চান ও অন্যান্যদের চিত্তের মুক্তি চান তাঁরা রাজনীতি-প্রয়োগ করে তা চান না, কেননা রাজনীতির কাজ আলাদা, এ কাজ বলপ্রয়োগ করেই সাধন করতে হয়। রাজনীতির ক্ষেত্রে যাঁরা দেবতা বা দানব তাঁরা প্রেমের ঈশ্বরের সঙ্গে একটা অন্তর্দ্বন্দ্বে লিপ্ত, এবং যাজকীয় চরিত্রের যে খ্রীষ্টীয় ভগবান তাঁর সঙ্গে তাঁদের ঐ রকমেরই দ্বন্দ্ব। এই বিরোধ এমন প্রবল হয়ে উঠতে পারে যা নাকি আর শান্ত করাই দুরূহ। বার-বার এ দ্বন্দ্ব নিবারণের জন্যে ফ্লোরেন্সে চেষ্টা হয়েছে, তবুও সেখানকার মানুষের যাজকীয় রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে। সেকালে, মানুষের আধ্যাত্মিক কল্যাণের পরিবর্তে (ফিশটের কথায়) এই দ্বন্দ্বই ছিল মানুষের একমাত্র শক্তি, এবং নৈতিক বিচার-বোধ সম্বন্ধে এতেই ছিল কাণ্টের, যাকে বলে "শীতল সমর্থন"। এই পরিস্থিতি সম্বন্ধে মেকিয়াভেলি তাঁর এক গল্পে—আমার যদি ভুল হয়ে না থাকে—তাঁর নায়ককে স্তুতি করেছেন এইজন্যে যে, সে তার জন্মভূমিকে সেখানকার মানুষের ঊর্ধ্বে স্থান দিয়েছিল।

জন্মভূমি সম্বন্ধে সকলের ধারণা এক নয়, আমরা যদি জন্মভূমির বদলে বলি: "সমাজতন্ত্রের ভবিষ্যৎ" বা "আন্তর্জাতিক শান্তি" আমরা তাহলে একই সমস্যার সম্মুখীন হই। কেননা এ সবেই—রাজনীতি প্রয়োগ করাই সেখানে একমাত্র লক্ষ্য—বলপ্রয়োগই হচ্ছে সেখানে একমাত্র কাজ, এবং দায়িত্ববোধের নীতির দিক থেকে বা "চিত্তের সর্বপ্রকার কল্যাণ"-এর দ্বারা বিপর্যস্ত হবারই কথা। যাই হোক, বিশ্বাসের চেয়ে বেশি তীব্রভাবে যদি মূল্যবোধের নীতিই অনুশরণ করা যায় তাহলে তার পরিণামে যে শোচনীয় ফল ফলবে তা ভোগ

করতে হবে কয়েক পুরুষ ধ'রে, কেননা এর পরিণামের দায়িত্ব তো কেউ গ্রহণ করছে না। এ'তে যে পৈশাচিক শক্তি নিহিত আছে তাও কেউ লক্ষ্য করছে না, এই শক্তি হচ্ছে নির্দয়, আগে থেকে এই শক্তি সম্বন্ধে হুঁশিয়ার না হলে ঐ শক্তিই সবাইকে গ্রাস করে ফেলবে। "এই শয়তান অনেক পুরাতন।" এই বাক্যের মধ্যে বয়সের কোনো উল্লেখ নেই। "ওকে চেনার জন্যে বড় হও।" বয়স দিয়ে কিছুর বিচার করার পক্ষে আমি নই। কারো বয়স হয়তো কুড়ি, আর আমার বয়স পঞ্চাশ, বয়সে আমি বেশি ব'লেই আমি বেশি শ্রদ্ধেয় হয়ে গেলাম, এটা আমি মানিনে। বয়স দিয়ে কিছুর বিচার হয় না। যা দিয়ে বিচার হতে পারে তা হচ্ছে জীবনের বাস্তবতাকে দেখার উপযুক্ত শিক্ষালাভ করা, এবং সেই বাস্তবতা সহ্য করা এবং তার মুখোমুখি হবার যোগ্যতা অর্জন করা।

এ কথা সত্য যে, মাথা খাটিয়েই নীতি নির্ধারণ করতে হয়, কিন্তু কেবলমাত্র মাথা খাটিয়েই এ কাজ করা যায় না। এদিক থেকে মূল্যবোধ ব্যাপারটির যাঁরা প্রবক্তা তাঁরা ঠিক। কিন্তু কার মূল্যবোধের প্রবক্তা হওয়া উচিত বা দায়িত্ববোধের প্রবক্তা হওয়াই বা কার উচিত—এ সম্বন্ধে আমরা কাউকে কোনো উপদেশ দিতে চাইনে। কেবল একটিমাত্র কথা বলা যায় যে, এখন যদি অনেকের মতেই এই অ-"বন্ধ্যা" উত্তেজনার এই সময়ে হঠাৎ যদি মূল্যবোধে বিশ্বাসী রাজনীতিকেরা এই কথা বলতে আরম্ভ করেন যে, "পৃথিবীটাই নির্বোধ ও কুচক্রী, আমি নই, পরিণামের কোনো দায় আমার নয়, যাদের হয়ে আমি কাজ করছি এ দায় তাদের, এবং যাদের নির্বুদ্ধিতা ও শঠতা নাশ করার জন্যে আমি কাজ করছি, এ দায় তাদের" তাহলে আমি তাঁদের কাছে জানতে চাইব, এই মূল্যবোধের নীতির উপর তাঁদের প্রকৃত আস্থা কতটা। আমার এ রকম ধারণা হয়েছে দশ জনের মধ্যে নয় জনই এর বাস্তবিকতা সম্বন্ধে কোনো বোধ রাখেন না, তাঁরা ভাবাবেগের নেশায় বুঁদ হয়ে কাজ করে যান। এ'তে আমার মনে কোনো দাগই কাটে না। কিন্তু আমার মনে তখনই দাগ কাটে, যখন—বয়সে তরুণ বা প্রবীণ এ বিচার না করে—যখন দেখি একজন পরিণত মানুষ দায়িত্ববোধ নিয়ে বলতে পারেন, "এই কাজ আমি করেছি, আমি এ ছাড়া আর কিছু করতে পারিনে।" এ রকম কথা শুনলে মানুষ মাত্রকেই অভিভূত হতে হয়। যে মানুষের মন মৃত নয় এমন প্রত্যেককেই এভাবে অভিভূত হতে হবে। এ দিক থেকে দেখতে

গেলে মূল্যবোধে বিশ্বাস ও দায়িত্ববোধে বিশ্বাস দুটি বিপরীত জিনিস নয়, এ হচ্ছে একে অন্যের পরিপূরক, এই দুটি মিলিত হয়েই একজন প্রকৃত মানুষ গঠন করতে পারে, এবং এই রকম মানুষই "রাজনীতির পেশা" গ্রহণে অধিকারী।

রাজনীতি হচ্ছে আবেগ ও বিচারবোধ প্রয়োগ করে ধীরে-ধীরে কাজ করারই পথ। এ কথা প্রকৃতই সত্য, এবং ইতিহাসেও এর অনেক নজির আছে যে, যদি অসম্ভবকে বার-বার পরাভূত করা না হত, তাহলে আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে যা-যা সম্ভব হয়েছে তার কিছুই হত না। এই কাজ যে মানুষ করতে পারেন তিনিই নেতা। কেবল নেতা নয়, তিনি একজন বীরনায়কও বটে। যাঁরা এ দুয়ের কোনোটাই নন্, তাঁদের উচিত তাঁদের মনকে অসীম বলে বলীয়ান ক'রে তোলা, এবং এ কাজ যা অর্জন করা সম্ভব, সেই সম্ভাবনাকে পরিপূর্ণ ক'রে তোলা। যে মানুষ স্থির নিশ্চিত হতে পারবেন যে, তাঁর দৃষ্টিতে দেখা তাঁর পৃথিবীই তার নির্বুদ্ধিতা ও শঠতা দিয়ে তাঁর নিজস্ব গুণাবলীকে চূর্ণ করতে পারবে না, যিনি নিশ্চিত হতে পারবেন যে, এইসব প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও তিনি পূর্ণ বিশ্বাসে বলতে পারবেন, "তবুও আছি", তিনিই রাজনীতির পেশা গ্রহণে অধিকারী।

বিংশ শতক

উপক্রমণিকা

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বিভিন্ন লেখকের সৃষ্ট সাহিত্যের মধ্যে কিছু-কিছু প্রভেদ থাকা সত্ত্বেও এর চরিত্র ছিল প্রায় একই রকমের, প্রত্যক্ষ বাস্তবকে রূপ প্রায় সকলেই দিয়েছেন। বাস্তব জীবনই বিবরণমূলক রচনার পক্ষে তখন বিশেষ উপযোগী ছিল। বিংশ শতকে এই একটি বিষয়েই সকলে সজাগ রইলেন না, বিষয়ের ও বর্ণনাভঙ্গির অনেক প্রকারভেদ ঘটল, এর মানে এই নয় যে, লেখকরা বাস্তবকে পরিহার করলেন। তাঁরা প্রকৃতপক্ষে আরও সচেতন হয়ে উঠলেন, তাঁরা বাস্তবতার নূতন রূপ ও সেই সঙ্গে তার নূতন সমস্যা পরিবেশন করার জন্যে নূতন প্রকাশভঙ্গির সন্ধানে রত হলেন। বাস্তবিক পক্ষে, সাহিত্য-রচনার প্রত্যেকটি বিষয় বেশ সমস্যাসংকুল হয়ে উঠল।

উনিশ শতকের শেষ দিকে বাস্তববাদ হয়ে উঠতে লাগল প্রকৃতপক্ষে অতি বাস্তববাদ বা প্রত্যক্ষবাদ অর্থাৎ ভালো-মন্দ কিছু বাদ না দিয়ে জীবনের সব ঘটনাকেই মেলে ধরার প্রতি প্রবণতা দেখা দিতে লাগল, এবং ভবিষ্যতের দিকে এর বেশ ঝোঁক দেখা দিতে লাগল। এই ন্যাচরালিজম বা যাকে আমরা প্রত্যক্ষবাদ বলছি—সেই জিনিসে উনিশ শতকের বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি এবং মানুষের জীবনে তার প্রয়োগের ফল এবং জড়বাদের দার্শনিক তত্ত্ব এক হয়ে গেল। মানুষকে তার বংশগত গুণের ও তার সময়কালের পরিবেশের ও পরিস্থিতিরই উপাদান বলে মনে করা হত। এইজন্যে তার জীবনে যাতে সুখ ও শান্তি আসতে পারে তার জন্যে অবস্থার পরিবর্তনের দাবি উঠেছিল। অতি বাস্তববাদী নাটক রচিত হতে লাগল নিম্নশ্রেণীর জীবন নিয়ে, বিশেষ করে শিল্প-শ্রমিকদের নিয়ে এবং সমাজে যারা অপাংক্তেয় তাদের নিয়ে। দর্শকদের সম্মুখে এইসব দৃশ্য মেলে ধরে তাঁদের জানিয়ে দেওয়া হতে লাগল যে, সমাজের এই অবস্থা সংগত অবস্থা তো নয়ই, বরঞ্চ একে বলা যায় একটা সামাজিক অপরাধ। মার্কস্‌বাদী দৃষ্টিতে এই অসহায় মানুষের মুক্তির একমাত্র উপায় হচ্ছে তার শ্রেণীর সঙ্গে তার এক হয়ে যাওয়া, যাতে তারা সংঘবদ্ধ হয়ে

এমন শক্তি অর্জন করবে যার ফলে তারা রুখে দাঁড়াতে পারবে। রাজনীতির দিক থেকে এই অতি বাস্তববাদী লেখকদের বেশির ভাগই সামাজিক এই অবস্থার থেকে সমাজতান্ত্রিক অবস্থাই বেশি পছন্দ করতে লাগলেন। এই জন্যে অতি বাস্তববাদী লেখকেরা, তাঁদের মতবাদ প্রচারের জন্যেই, মানুষের জীবনের প্রকৃত চিত্র যতটা সম্ভব প্রত্যক্ষ করানোর জন্যেই চেষ্টা করে যেতে লাগলেন।

যেসব লেখক শিল্পকলা বা সাহিত্যকলার উপরই বিশ্বাসী ছিলেন তাঁরা এই অতি বাস্তববাদীদের নীতি একেবারে বাতিল করে দিতে লাগলেন, কেননা তাঁদের কাছে মানুষের মনের অনুভূতি ও তার ক্রিয়া প্রতিফলিত করাই হচ্ছে সাহিত্য। এ সত্ত্বেও, এঁদের সকলেই কবিতার ক্ষেত্রে এই শিল্পবোধ নিয়ে তৃপ্ত রইলেন না, তাঁরা সংকটকালে নীতিকথা ও ধর্মীয় উপলব্ধি নিয়েও লিখতে লাগলেন। কয়েকজন বিশেষ বিশেষ লেখকের সঙ্গে ভাববাদী লেখকেরও উদ্ভব ঘটল, যার ফলে ১৯১০ থেকে ১৯২০ সালের মধ্যে দেখা দিল একটা সাহিত্যিক আন্দোলন। এরা হলেন কয়েকজন তরুণ লেখক, তাঁদের কালের কতকগুলি অসংগতি ও কপটতার সঙ্গে যাঁরা নিজের খাপ খাওয়াতে পারেননি। তাঁরা দেখেছিলেন বাহ্যিক আড়ম্বরের ঘটা ও শক্তির আস্ফালন, তাঁরা দেখেছিলেন সংগতিসম্পন্ন মধ্যবিত্তশ্রেণীর সম্পদ লালসা, ও দেখেছিলেন সাম্রাজ্যবাদী নীতি অবলম্বন করে চলা; এবং যে সময়ে তাঁরা উপলব্ধি করেছিলেন যে, বিশ্বযুদ্ধ ঘনিয়ে এসেছে। প্রথম দিকে এর ফলে আরম্ভ হল ব্যক্তিগত বিদ্রোহ অথবা নিভৃতে বসে নিঃশব্দ রোদন, কিন্তু ১৯১৪ সালে যুদ্ধ বাধলে এই ভাববাদী আন্দোলনই নৈতিক ও রাজনৈতিক রূপ নিল। ভাববাদীরা এই যুদ্ধের জন্য দোষারোপ করতে লাগল পুরাতন শক্তিশালীদের, শিল্পক্ষেত্রের পুঁজিবাদীদের ও সমরবাদীদের উপর; এবং তারা এর বিকল্পে তুলে ধরতে লাগল সমাজবাদী ও যুদ্ধবিরোধী আন্দোলন। জড়বাদী বা বৈজ্ঞানিক কোনো প্রেরণায় তারা পৃথিবীতে পরিবর্তন আনতে চায় নি, তাদের আন্দোলন ছিল একেবারেই আদর্শবাদী। বিশ্বে যে "নূতন মানুষ" তারা চেয়েছিল সে মূর্তি যেন প্রকৃত মানবমূর্তি নয়, তা যেন কেবল আত্মা ও হৃদয় দিয়ে গড়া পৌরাণিক কোনো মূর্তি মাত্র। এইজন্যে ভাববাদী সাহিত্যে বাস্তব জীবনের চিত্র নেই, কিন্তু আছে ভবিষ্যতে যা হতে পারে তারই যেন এক ভাবমূর্তি, এবং মনের যা আকাঙ্ক্ষা তারই যেন এক প্রতিমূর্তি। যেটুকু

প্রভাব এ আনতে পেরেছিল তা অতিরঞ্জনের জন্যে এবং কল্পনাবিলাসী প্রকাশভঙ্গির জন্যে।

জার্মানীতে এই ভাববাদী আন্দোলনই হচ্ছে সমগ্র গোষ্ঠীর লেখকদের বড়-রকমের শেষ আন্দোলন। আধুনিক সাহিত্যের গঠনে এটা একটা বিশিষ্ট পদক্ষেপ হিসেবে ইউরোপীয় লেখকদের প্রভাবান্বিত করেছে, কিন্তু তার মধ্যে জার্মানী নেই, এ প্রভাব যা পড়েছে তা জার্মান-সীমানার বাইরে। আমরা এখানে যে উদ্ধৃতি দিচ্ছি তা হচ্ছে আধুনিক বাস্তবতাকে রূপ দেবার জন্যে লেখকেরা যে যে প্রচেষ্টা করে চলেছেন তার দৃষ্টান্ত। আমাদের সময়ের রাজনৈতিক ও সামাজিক তথ্য পরিবেশন করতে গিয়েই থিয়েটরের উদ্ভব ঘটেছে। মঞ্চে যেসব উপাদান ব্যবহার করা হয়েছে তা প্রকৃত জীবনের রূপ ফুটিয়ে দর্শকের চোখে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টির জন্যেই। উপন্যাসের ক্ষেত্রে উনিশ শতকের বাস্তবিক-মনস্তাত্ত্বিক ঐতিহ্যের ভিতর দিয়ে এসেই তাঁর রূপবদল ঘটেছে। উচ্চাঙ্গের উপন্যাস সামাজিক অবস্থার সমালোচনা-বিবর্জিত বিষয় নিয়েই লেখা, সভ্যতার সামগ্রিক অকল্যাণ ও অবক্ষয় এবং বর্তমান কালের মানুষ যে অবস্থায় বাস করছে, তার কথাই এতে লিপিবদ্ধ। সমসাময়িক পটভূমি হচ্ছে জার্মান ও রাষ্ট্রীয় সামাজ্য, এবং তার পরে, যুদ্ধের পরবর্তী কালে, ভাইমার প্রজাতন্ত্র (১৯১৯-১৯৩৩) যা হচ্ছে অনেক সংঘাত ও সংঘর্ষের পরে প্রবর্তিত জার্মানীর প্রথম গণতন্ত্র। হিটলারের ক্ষমতায় আসা এবং ১৯৩৩ সালে ন্যাশনাল সোশ্যালিস্ট রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সঙ্গেই জার্মানীতে সাহিত্যের সমাধি ঘটে—এরকম ব্যাপারের নজির আর নেই। প্রায় সব বড়-বড় লেখক ও কবি দেশ ছেড়ে চলে যান, কেউ-কেউ চলে যান তাঁদের বরাতে কি ঘটবে তা বুঝতে পেরে, কেউ-কেউ যান নূতন শাসকদের চাপে পড়ে। তাঁদের যেসব লেখায় সেই সময়ের সমস্যার কথা বলা ছিল, এবং সমাজতান্ত্রিক মনোভাব প্রকাশিত ছিল, তা নিষিদ্ধ হল। ন্যাশনাল সোশ্যালিজম্‌'কে যাঁরা পূর্ণ সমর্থন করেছিলেন তারা ছাড়া আরও কেউ-কেউ জার্মানীতে থাকতে পেরেছিলেন - প্রয়োজন বোধেই এঁরা আড়ালে চলে গিয়েছিলেন। এইজন্যেই বিংশ শতকের অনেক বিশিষ্ট জার্মান সাহিত্যই রচিত হয়েছে বিদেশে। দ্বিতীয়-বিশ্বযুদ্ধের পর, জার্মানীতে আবার সাহিত্যিক পরিবেশ গড়ে উঠল, কিন্তু পূর্বের ঐসব ঘটনার ফলে লেখকেরা সাহিত্যের সমস্যা সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠলেন। এই পরিবর্তিত বাস্তব চেহারার রূপ দেবার জন্যে তাঁরা নূতন

গঠনকৌশল খুঁজতে লাগলেন। এটা এখনো একটা প্রশ্ন থেকে গিয়েছে যে, ঐ গঠনকৌশল আয়ত্ত করা ছাড়াও সাহিত্য কি কোনো অবস্থার পরিবর্তন-সাধনের ক্ষমতা রাখে, এবং প্রকৃত জীবনের পুনর্গঠনে তা কি-প্রভাব বিস্তার করতে পারে ?

গারহার্ট হাউপমান

তাঁতিরা

গারহার্ট হাউপমান (১৮৬২-১৯৪৬) সাইলেসিয়ার লোক, তাঁর প্রথম দিকে লেখা নাটকে তিনি অতি বাস্তববাদীদের এক বিশিষ্ট প্রতিনিধি রূপেই গণ্য ছিলেন। তিনি বেশ সহানুভূতির সঙ্গেই নিপীড়িত শ্রমজীবী মানুষের দুর্দশার চিত্র এঁকেছেন, এবং সেই সঙ্গে এ-ও দেখিয়েছেন যে ব্যক্তিবিশেষের যে সর্বনাশ হয়েছে তার কারণ নিজের লোকেদের প্রতি তার উদাসীনতা ও তার জন্মগত প্রবৃত্তি। হাউপমানের পরবর্তী নাটকেও এই অতি বাস্তববাদী উপাদান অবশ্যই ছিল, কিন্তু তার সঙ্গে অন্য বিষয় ও অন্যতর প্রকাশভঙ্গি মিশে ছিল। বক্তব্য বিষয় অনেকটা প্রতীক ধর্মী ছিল, এই জন্যে বর্তমানকালের সঙ্গে তার বিশেষ যোগ নেই, এবং প্রকাশ-ভঙ্গি অনেকটা ছিল স্বপ্নিল ও রূপকথার মত।

তাঁর "দি উইভার্স" (১৮৯২) নাটকে ১৮৪৪ সালের সাইলেসিয়ার তাঁতিদের বিদ্রোহের অনেক ঘটনা আছে। যন্ত্রের দ্বারা তাঁত চালানো প্রবর্তিত হলে অনেক তাঁতি তাঁদের কাজ হারাল, কেউ-কেউ কাজ করতে লাগল যৎসামান্য মজুরিতে। ক্ষুধার তাড়নায় তারা তাদের পুঁজিবাদী শোষকদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াল—এখানে সেই পুঁজিবাদী হচ্ছে ড্রেসিগার। শেষে কোনো সমাধান দেওয়া হয় নি, কেবলমাত্র ভবিষ্যতের দিকে সতর্কতার অঙ্গুলি নির্দেশ করা হয়েছে। তাঁতিদের যে অবস্থা দেখানো হয়েছে ইতিহাসের দিক থেকে তা প্রকৃত, পটভূমির দিক থেকে এ'তে নাটকটি রচনার সময়ের সাময়িক রূপ দেখানো হয়েছে। আমাদের উদ্ধৃতাংশ হচ্ছে ড্রেসিগারের ঘরের দৃশ্য, বাইরে তাঁতিদের জনতা সমবেত। এ'তে বিদ্রোহী নিম্নশ্রেণীর বিরুদ্ধে ত্রিপাক্ষিক আঁতাত দেখানো হয়েছে—পুঁজিবাদী শিল্পপতি (ড্রেসিগার), রাষ্ট্র (পুলিশ সুপারিনটেনডেণ্ট) ও গির্জা (ধর্মোপদেশক

কিটেলহাউস)। তরুণ ভেইনহোলড, যে তাঁতিদের হয়ে কথা বলছিল, তাকে বাড়ি থেকে বের করে দেওয়া হল।

পাত্র পাত্রী

ধর্মোপদেশক কিটেলহাউস
শ্রীমতী কিটেলহাউস
মি. ড্রেসিগার
শ্রীমতী ড্রেসিগার
ভেইনহোল্ড্, ড্রেসিগারের ছেলের শিক্ষক
ফাইফার, ম্যানেজার } ড্রেসিগারের কর্মচারী
জন, কোচম্যান } ড্রেসিগারের কর্মচারী
হাইডার, পুলিশ সুপারিনটেনডেণ্ট

অঙ্ক ৪

ড্রেসিগারের ব্যক্তিগত ঘর। বর্তমান শতকের প্রথম দিকের রুচি অনুযায়ী খুব বিলাসবহুল ভাবে সাজানো। ঘরের মধ্যে ছাদের ভিতর দিক, দরজা এবং স্টোভ সাদা, কাগজ দিয়ে মোড়া দেয়াল, সোজা রেখার উপর ফুল কাটা সেই কাগজে, এতে ঘরটার চেহারা বেশ গুমট দেখাচ্ছে। মেহগনি কাঠের আসবাব বেশ কারুকাজ করা ও লাল রং করা। ডান দিকে, গাঢ় লাল পর্দায় ঢাকা দুটি জানালার মাঝখানে লেখাপড়ার টেবিল রাখা। এর ঠিক উলটো দিকে আছে সোফা, তার পাশেই সিন্দুক। সোফার সামনে একটা টেবিল—তার চার দিকে চেয়ার ও ইজিচেয়ার। পিছনের দিকের দেয়ালে বন্দুক রাখার আলমারি। অন্য তিনটি দেয়ালে গিল্‌টি-করা ফ্রেম দিয়ে বাঁধানো বাজে-সব ছবি। সোফার উপর দিয়ে গিলটির ভারী কারুকাজ করা একটা আয়না। বাঁ দিকে একটা সাধারণ দরজা, এটা দিয়ে হল্-ঘরে যাওয়া যায়। পিছন দিকে পাল্লা-ভাঁজ করা একটা দরজা খোলা আছে, বৈঠকখানা ঘর দেখা যাচ্ছে এর ভিতর দিয়ে—অস্বস্তিকর জাঁকজমকে এই ঘরটিও সাজানো। দুজন মহিলা—শ্রীমতী ড্রেসিগার ও ধর্মযাজকের স্ত্রী শ্রীমতী কিটেলহাউসকে বৈঠকখানায় দেখা যাচ্ছে, তাঁরা ছবির দিকে তাকিয়ে আছেন। সেখানে কিটেলহাউসও আছেন, তিনি কথা বলছেন ভেইনহোল্ডের সঙ্গে।

কিটেলহাউস ॥ (সদাশয় এক প্রবীণ ব্যক্তি, ধূমপান করতে-করতে ও ভেইনহোলডের সঙ্গে কথা বলতে-বলতে সামনের ঘরে এলেন, ভেইনহোলডও ধূমপান করছে। ঘর খালি দেখে তিনি চারদিকে তাকালেন ও মাথা একটু নাড়লেন) মি. ভেইনহোলড তোমার বয়স অল্প, এতেই সব পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে। আমরা প্রবীণেরা তোমাদের বয়সে, আমি একই অভিমতের কথা বলছিনে, কিন্তু অভিমতের একই উদ্দেশ্যের কথা বলছি। তরুণদের অনেক গুণ আছে, তরুণেরা অনেক সুন্দর-সুন্দর আদর্শ নিয়ে আছে। কিন্তু, মি. ভেইনহোল্‌ড, সে সব আদর্শ টেঁকসই হয় না। ওরা এপ্রিলের রোদ্দুরের মতই সরে যায়, চলে যায়। আমার মতন বয়স হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করো। বছরের পবিত্র দিনগুলি বাদ দিয়ে বছরে বাহান্ন বার ক'রে ত্রিশ বছর ধ'রে একজন মানুষ তার বক্তব্য যখন উচ্চ মঞ্চ থেকে বলে এসেছে, তখন অনিবার্যভাবেই তাকে শান্ত হতে হবে। ভেবে দেখ, তুমি যখন আমার বয়সী হবে।

ভেইনহোল্‌ড্ ॥ (উনিশ বছর বয়স, ম্লান, লম্বা, মাথায় বড়-বড় চুল, চঞ্চল, এবং একটু নার্ভাস ধরণের) সশ্রদ্ধ ভাবেই বলছি, মি. কিটেলহাউস,… আমি ভাবতে পারিনে…মানুষের স্বভাবের এত পার্থক্য থাকতে পারে।

কিটেলহাউস ॥ শোনো হে বন্ধু ভেইনহোল্‌ড্, মানুষ যতই চঞ্চল প্রকৃতির ও অস্থির স্বভাবের হোক (তিরস্কারের মত করে), তুমিই এর একটা দৃষ্টান্ত, যত বেপরোয়া ভাবে ও যত ভয়ংকর ভাবেই সে বর্তমান অবস্থাকে আঘাত করুক, শেষ পর্যন্ত তাকে শান্ত হতে হয়ই। আমি স্বীকার করি আমাদের সহকর্মীদের মধ্যে এখনও অনেকে এমন থাকতে পারেন যাঁরা বয়সে প্রবীণ হলেও নবীনদের মতন আচরণ করেন। একজন হয়তো মদ্যপানের অপকারিতার কথা প্রচার ক'রে বেড়াচ্ছেন এবং মদ্যপান বর্জন সমিতি প্রতিষ্ঠা করছেন, অন্য জন হয়তো প্রকাশ করছেন আবেদন-পুস্তিকা, এবং পড়তে না বেশ লাগসই লাগছে। কিন্তু এ'তে কল্যাণ কতটা কী হচ্ছে? তাঁতিদের দুর্দশা আছেই, এ'তে তা লাঘব না হয়ে সমাজের শান্তিই ক্ষুণ্ণ হবে। না, না। এসব ক্ষেত্রে বলতে ইচ্ছে হয়। মুচি, নিজের কাজে মন মাতিয়ে রাখো, পেটের চিন্তা কোরো না, তোমার কাজ তো কেবল মন নিয়ে। ঈশ্বরের পবিত্র বাণী প্রচার করো, তিনি পাখিদের আশ্রয় দেন ও খাদ্য দেন, যিনি লিলি ফুলদের

পাপড়ি দেন, অন্য সব ব্যাপার তাঁর উপর ছেড়ে দাও। কিন্তু আমি জানতে চাই, আমাদের অতিথি-বৎসল মি. ড্রেসিগার গেলেন কোথায় ?

(শ্রীমতী ড্রেসিগার এলেন, তাঁর পিছন-পিছন শ্রীমতী কিটেলহাউস। ইনি বেশ সুশ্রী দেখতে, বয়স ত্রিশের মত, স্বাস্থ্যবতী, রংবাহারী চেহারা। তাঁর আচরণে এবং তাঁর সাজগোজের মধ্যে একটু যেন বেসুরো ভাব দেখা যাচ্ছে)।

শ্রীমতী ড্রেসিগার ॥ আমিও এইটেই জানতে চাই, মি. কিটেলহাউস। উইলিয়ম সব সময় এই রকমই করে। তার মাথায় একটা ব্যাপার ঢুকলেই সে হাওয়া হয়ে যায়, আর, আমাকে ফেলে যায় ফ্যাসাদে। আমি এ নিয়ে অনেক বলেছি, কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না।

কিটেলহাউস ॥ ব্যবসাদার লোকদের এই দশাই হয়, শ্রীমতী ড্রেসিগার।

ভেইনহোল্ড্ ॥ আমি নিশ্চয় করে বলতে পারি যে নীচ তলায় কিছু-একটা ঘটেছে।

উত্তপ্ত ও উত্তেজিত অবস্থায় ড্রেসিগারের প্রবেশ

ড্রেসিগার ॥ রোজা, কফি দেওয়া হয়েছে ?

শ্রীমতী ড্রেসিগার ॥ (গোমড়া মুখে) তুমি কি আবার পালিয়ে যাবার বায়না খুঁজছ ?

ড্রেসিগার ॥ (অমনোযোগের সঙ্গে) আহা হা, এসব ব্যাপার তুমি কিছু বোঝো না।

কিটেলহাউস ॥ মাপ করবেন, মি. ড্রেসিগার, আপনার বিরক্তির কি কোনো কারণ ঘটেছে ?

ড্রেসিগার ॥ বিরক্তি ছাড়া একটা দিন কাটে না। আমি এতে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছি। রোজা, কফির কী হল ?

(শ্রীমতী ড্রেসিগার রাগতঃ ভাবে চলে গেলেন, যেতে-যেতে চওড়া এমব্রয়ডারি করা তার পোশাকে জোরে-জোরে টান দিতে লাগলেন)

ড্রেসিগার ॥ মি. ভেইনহোল্ড্, তুমি একবার নীচে গেলে ভালো হয়। তোমার কিছু অভিজ্ঞতা আছে। তার উপর···কিন্তু এসো আমরা একটু শান্ত হয়ে বসি।

কিটেলহাউস॥ স্বচ্ছন্দে। দিনের বোঝা ও ধুলোবালি ঝেড়ে ফেল, মি. ড্রেসিগার। আমাদের সাহচর্যে সব ভুলে যাও।

ড্রেসিগার॥ (জানালার কাছে গেলেন, পর্দা একটু টানলেন, বাইরে তাকালেন) হীন ইতর সব লোক। এদিকে এসো, রোজা। (রোজা জানালার কাছে গেলেন) দেখ…ঐ লম্বা লাল-চুল-ওলা লোকটাকে দেখ।

কিটেলহাউস॥ যে লোকটাকে ওরা রেড বেকার বলে!

ড্রেসিগার॥ এই লোকটাই আপনাকে পরশুদিন অপমান করেছিল না? আমাকে আপনি কী বলেছিলেন মনে আছে—জন্ যখন আপনাকে গাড়িতে তুলে দিচ্ছিল?

শ্রীমতী ড্রেসিগার॥ আমি নিশ্চয় কিছু জানিনে।

ড্রেসিগার॥ এবার এসো। ধাঁধায় থেকে লাভ কী। সব জানা দরকার। এ-ই যদি সেই লোকটা হয় তাহলে আমি তাকে গ্রেপ্তার করাব। (তাঁতিদের গানের রেশ ভেসে আসছে) শোনো, কান পেতে শোনো।

কিটেলহাউস॥ (বেশ রেগে) এই নোংরামির কি শেষ নেই? আমি এখন বলতে চাই যে, এবার পুলিশ আসা দরকার। আমাকে অনুমতি দাও। (জানালার ধারে গেলেন)। মি. ভেইনহোল্ড্, চেয়ে দেখ। এরা বয়সে সবাই কাঁচা নয়। ওদের মধ্যে অনেক বুড়ো তাঁতিও আছে। যাদের আমি বছরের পর বছর দেখছি, ও ঈশ্বরকে যারা ভয় করে বলে জানি। ওরা এখন ঐ অসহ্য হৈ চৈ-এ মেতে উঠেছে। ঈশ্বরের আইনকে যারা পদদলিত করছে। তুমি কি এখনো বলতে চাও যে, তুমি এইসব লোকের পক্ষে আছ?

ভেইনহোল্ড্॥ নিশ্চয় নয়, মি. কিটেলহাউস। ওরা ক্ষুধার্ত, ওরা অজ্ঞ। তারা তাদের অসন্তোষ-প্রকাশের একটা পন্থাই জানে। সেই ভাবেই তারা তা জানাচ্ছে। আমি এসব লোকের কাছ থেকে আশা করিনে যে—

শ্রীমতী ড্রেসিগার॥ আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি বলে আমি দুঃখিত, মি. ভেইনহোল্ড্…মানবপ্রেম বা বিশ্বপ্রেম সম্বন্ধে বক্তৃতা দেবার জন্যে আমার বাড়িতে তোমাকে আনিনি। আমাদের অনুরোধ, আমার ছেলেদের পড়াশুনা-দেখার দিকেই তুমি কেবল মন দেবে, এবং আমাদের অন্য

সব ব্যাপার সম্পূর্ণভাবে আমাদের উপরেই ছেড়ে দেবে, সম্পূর্ণ ভাবে। বুঝেছ?

ভেইনহোল্ড্‌॥ (অল্প-একটু সময় শক্ত হয়ে দাঁড়াল, মৃতের মতন ম্লান হয়ে এল মুখ, তার পর চেষ্টা করে একটু হেঁসে মাথা নত করল, নীচু গলায় বলল) নিশ্চয় নিশ্চয়, অবশ্যই আমি বুঝেছি। এমন ঘটবে তা আমি জানতাম। এটা রকম হোক, আমারও ইচ্ছে।

(প্রস্থান)

ড্রেসিগার॥ (রূঢ় ভাবে) যত তাড়াতাড়ি সম্ভব যাও। এ কামরা এখন আমাদের দরকার।

শ্রীমতী ড্রেসিগার॥ উইলিয়াম, উইলিয়াম!

ড্রেসিগার॥ তোমার কি বুদ্ধি লোপ পেল, রোজা! তুমি এমন মানুষের মতন আচরণ করছে, যে 'কনা হীন নীচ ইতর লোককে সমর্থন করে।

শ্রীমতী ড্রেসিগার॥ কিন্তু উইলিয়াম, সে কিন্তু এ ব্যাপার সমর্থন করেনি।

ড্রেসিগার॥ মি. কিটেলহাউস, আপনি কী বলেন, সে সমর্থন করেছিল, না, সমর্থন করে নি!

কিটেলহাউস॥ মি. ড্রেসিগার ওর বয়সটার জন্যে ও মার্জনা পেতে পারে।

শ্রীমতী কিটেলহাউস॥ আমি এর কিছু বুঝতে পারছি নে। ঐ ছেলেটি এত ভালো বংশের ছেলে। ওর বাবা চল্লিশ বছর সরকারি কাজ করেছেন, তার সুনাম এতটুকু ক্ষুণ্ণ হয় নি। এখানে ছেলেটি কাজ পাওয়ায় ওর মা-তো আনন্দে প্রায় অধীরই হয়েছিলেন। কিন্তু এখন··· এখন সে নিজে এর কোনো মর্যাদাই দিচ্ছে না।

ফাইফার॥ (হঠাৎ দরজা খুলে হল্ ঘর থেকে চেঁচিয়ে উঠল) মি. ড্রেসিগার মি. ড্রেসিগার। তারা ওকে ধরেছে। আপনি দয়া করে আসবেন? ওরা ওদের একজনকে পাকড়েছে।

ড্রেসিগার॥ (তাড়াহুড়ো ক'রে) কেউ কি পুলিশ ডাকতে গিয়েছে?

ফাইফার॥ পুলিশের সুপারিনটেনডেণ্ট উপরে আসছেন।

ড্রেসিগার॥ (দরজার কাছে গিয়ে) আপনাকে পেয়ে খুশি হলাম। আপনাকেই আমার এখন চাই।

(কিটেলহাউস ইঙ্গিতে জানালেন মহিলাদের এখান

থেকে চলে যাওয়াই ভালো। তিনি, তাঁর স্ত্রী, এবং শ্রীমতী ড্রেসিগার বৈঠকখানা ঘরে চলে গেলেন)।

ড্রেসিগার ॥ (পুলিশ সুপারিনটেনডেণ্টকে, উত্তেজনার সঙ্গে) আমি আমার এক রঙরেজকে দিয়ে একজন পালের গোদাকে পাকড়াও করিয়েছি। আমি আর সহ্য করতে পারছিলাম না, এদের ঔদ্ধত্য একেবারে সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল, সহ্য করা দায় হয়ে উঠেছিল। আমাদের ঘরে এখন অতিথি, এখন কিনা ঐ বেয়াদপেরা ভরসা পায়···আমার স্ত্রীকে দেখলেই তারা অপমান-করে ; আমার ছেলেদের জীবন বিপন্ন। আমার অতিথিরা ধাক্কা খাবার ও চপেটাঘাত পাবার ঝুকি নিয়ে আসে। এটা কি কখনো সম্ভব যে, আমার মতন এমন নির্বিরোধ মানুষ ও আমার এই সংসারটির মতন এমন নিরুপদ্রব ব্যাপার, এভাবে হেনস্তা হবে ? আর, যারা এসব করেছে তাদের কোনো সাজা হবে না ? তা যদি হয়···বেশ···তাহলে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্যে আমাকে অন্য কোন্ পথ নিতে হবে, আমি তা ভেবে দেখব।

সুপারিনটেনডেণ্ট ॥ (প্রায় পঞ্চাশ বছর বয়স, মাঝারি উচ্চতা, পেট-মোটা, স্বাস্থ্যবান। পরনে ঘোড় সওয়ারের পোশাক ও জুতায় কাঁটা, ও তলোয়ার ঝোলানো) না, না, মি. ড্রেসিগার, ভাববেন না। আমি আপনার সম্পূর্ণ ভাবে কাজে লাগবার জন্যে প্রস্তুত। আপনার মন এ নিয়ে উত্তেজিত করবেন না। আমাকে যেমন খুশি কাজে লাগিয়ে নিন্। আপনি যা করেছেন তা ঠিক করেছেন। একজন পালের গোদাকে পাকড়েছেন এতে আমি বেশ আনন্দ পেয়েছি। আমি খুশি এ কথা ভেবে যে এ ব্যাপারে একটা নিষ্পত্তির দিন এসে গেছে। শান্তি বিঘ্ন করতে এখন মাত্র জনাকয়েকই আছে। আমি তাদের উপর নজর রেখেছি অনেক দিন থেকেই।

ড্রেসিগার ॥ হ্যাঁ, একজন বা দুইজন আনাড়ি ছোকরা, কুড়ে বাউণ্ডুলে, যারা কাজ ফাঁকি দেয়, কাজ দেখলেই ভয় পায়, যারা লম্পটের জীবন যাপন করে, গণিকালয়ে ঘুরে বেড়ায় যতক্ষণ পকেটের কানাকড়িটিও খরচ হয়ে না যায়। আমি কিন্তু এদের সব অনাচার ও ব্যাভিচার চিরদিনের মত বন্ধ করে দিতে চাই। এটা আমার নিজের স্বার্থে নয়, জনসাধারণের কল্যাণের জন্যেই।

সুপারিনটেনডেন্ট ॥ নিশ্চয়। নিঃসন্দেহে মি. ডেসিগার! কেউ আপনাকে দোষ দিতে পারবে না। আমার হাতে যতটা ক্ষমতা আছে...

ডেসিগার ॥ সব্বাইকে একেবারে পাকড়াও করতে হবে।

সুপারিনটেনডেন্ট ॥ ঠিক বলেছেন। এ ব্যাপারে আমরা একটা দৃষ্টান্ত স্থাপন করব।

হুগো ফন হফমানসথাল

লর্ড শ্যানডসের চিঠি

অল্পবয়সেই অস্ট্রীয় কবি হুগো ফন হফমানসথাল তাঁর সহজসুন্দর ভাষায় উন্নত ধরণের সাহিত্য সৃষ্টি করেন। তাঁর এই রচনায় বিষাদের সুর ও মৃত্যুর জন্যে ব্যাকুল প্রতীক্ষা রোমান্টিক কবিদের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়; এবং তাঁর রচনায় সভ্যতা সম্বন্ধে যে একটা ক্লান্তির সুর আছে তার থেকেই বোঝা যায়, হফমানসথাল আগে থেকেই বুঝতে পেরেছিলেন যে, অস্ট্রো-হাঙ্গারিয়ান সাম্রাজ্য ধীরে-ধীরে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছে। তাঁর "লেটার অব লর্ড শ্যানডস" (১৯০২) রচনায় তাঁর আত্মজীবনী মূলক উপাদান আছে, এবং এইটেই হফমানসথালের রচনায় এক সংকটকাল ও গতি পরিবর্তনের সাক্ষ্য। তাঁর উপর এই রচনা বিংশ শতকের অন্যান্য অনেক লেখকের অভিজ্ঞতার লক্ষণাক্রান্ত। ভাষার জন্যে হাহুতাশ করে যে মানুষ, এই লেখা তার আত্মিক মনোভাবেরও বিবরণ। লর্ড শ্যানডস হচ্ছেন একজন সফল লেখক, তিনি তাঁর অস্তিত্ব সম্বন্ধে সব বিশ্বাস ও সব নিরাপত্তা-বোধ হারিয়েছেন, এবং পৃথিবীর পরস্পর বিরোধী অবস্থা সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন। তার ব্যবহৃত কথার মধ্যে যেন বৃহৎ খদ দেখা যায়, এবং বাস্তব-বোধ যায় টুকরো-টুকরো হয়ে: এ'তে কবিত্বময় ভাষা যায় ছত্রখান হয়ে। কিন্তু চিঠিটা হতাশা দিয়েই শেষ নয়: শ্যানডস এমন-সময় মুহূর্তের কথাও বলেছেন যখন সামান্য বিষয়ও তার কাছে বেশ বৃহৎ ব্যাপার উদ্ঘাটন করে দেয়; যা অবশ্য কথায় সে প্রকাশ করতে পারে না। হফমানসথাল তাঁর সাহিত্য জীবনের পরের দিকে নাটক রচনাতেই মনোনিবেশ করেন, এবং গীতিবহুল নাটকও রচনা করেন—যাতে ভাষাকে সাহায্য করেছে গান ও নাটকীয় অঙ্গভঙ্গি। এই "চিঠি"টির গুরুত্ব এই দিক দিয়ে যে আপাত দৃষ্টিতে

অসম্ভব মনে হলেও এ'তে ভাষার ভগ্নদশার কথা রীতিমত জোরদার ভাষায় প্রকাশ করা হয়েছে।

এই চিঠিটি লিখেছেন ফিলিপ, যিনি লর্ড শ্যানডস, আর্ল অব বাথ-এর কনিষ্ঠ পুত্র যিনি। তিনি লিখেছেন ফ্রান্সিস বেকন-কে, পরে যিনি হন ব্যারন ভেরুলাম, সেণ্ট অ্যালবান্স্-এর ভাইকাউণ্ট। সব সাহিত্য কর্ম ছেড়ে দেবার জন্যে চিঠিতে মার্জনা চাওয়া হয়েছে।

তুমি আমার সহৃদয় বন্ধু। আমি দু বছর চুপচাপ হয়ে আছি, তুমি সেই নীরবতা মার্জনা করে আমাকে চিঠি লিখেছ। এটা আরো বেশি সহৃদয়তার লক্ষণ এই জন্যে যে, তুমি আমার সম্বন্ধে উৎকণ্ঠা প্রকাশ করেছ। আমার মন একেবারে অসার হয়ে গিয়েছে ভেবে তুমি বিচলিত হয়েছ। জীবনের অজস্র সংকট ও সংঘাত সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল হয়েও জীবন সম্বন্ধে নিরুৎসাহ না হওয়ার এইরূপ মনোভাব কেবল মহৎ ব্যক্তিরাই লালন করতে পারেন, এবং তাঁরাই হালকাভাবে ও কৌতুকের সঙ্গে তাঁদের কথা প্রকাশ করতে পারেন।

হিপোক্রেটিস্-এর এই সংক্ষিপ্ত জীবন-সূত্র দিয়ে কথা শেষ করেছ, লিখেছ, যারা বুঝতে পারে না যে গুরুতর ব্যাধিতে তাদের স্বাস্থ্যের হানি ঘটেছে, তারা মানসিক দিক থেকে অসুস্থ। এই সূত্রে আমি বলতে চাই যে, আমার অসুস্থতার জন্যেই কেবল আমার ওষুধ দরকার নয়, তার চেয়েও বড় কারণ আছে, আমার অন্তর্জীবনের প্রকৃতি-পরিবর্তনের জন্যে আমার বোধ শাণিত করার দরকার হয়েছে, সেই জন্যেই দরকার ওষুধের। তোমার চিঠির যে রকম উত্তর দেওয়া উচিত আমি সাগ্রহে সে রকম উত্তর দিতে ইচ্ছুক। আমি সানন্দে সম্পূর্ণভাবে আমাকে তোমার সম্মুখে মেলে ধরতে চাই, কিন্তু এ কাজ কি ভাবে করা যেতে পারে আমি তা বুঝতে পারছি নে। আমার সন্দেহও হচ্ছে তুমি যে-মানুষটিকে সম্বোধন ক'রে চিঠিটি লিখেছ, আমি এখনো সেই মানুষ আছি কি না। আমি কি সেই, যার বয়স এখন ছাব্বিশ, এবং যে উনিশ বছর বয়সে লিখেছিল 'দি নিউ প্যারিস' 'দি ড্রিম অব ডাফনে' 'এপিথালামিয়ম'—সে গ্রাম্যগাথাগুলির শব্দালংকার এখনো বেজে চলেছে, যে নাটক এখনো সম্রাজ্ঞী এবং অনেক লর্ড ও ভদ্রজন এখনো অনুগ্রহ করে মনে রেখেছেন? তার উপর, আমি কি সে'ই তেইশ বছর বয়সে যে ভেনিসের সেই প্রশস্ত উদ্যানের খিলানের নীচে দাঁড়িয়ে নিজের মধ্যেই গদ্য ভাষার এমন

পরিকল্পনা ও শৃঙ্খলা পেয়ে গিয়ে এমন আহ্লাদিত হয়ে উঠেছিলাম, যে আহ্লাদে আমি সমুদ্র থেকে মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়ানো প্যালাডিও স্থানসোভিনো মনুমেণ্ট দেখেও পাই নি। আমি যদি সে'ই মানুষটিই থেকে থাকি, তাহলে আমি কি আমার মধ্যে থেকে আমার গভীর চিন্তা দিয়ে সংগ্রহ করা সেই ভাষার সব চিহ্ন মুছে ফেলেছি, এমন ভাবেই তা মুছে ফেলেছি যে, আমার চোখের সামনেই তোমার চিঠিটা রাখা আছে, তাতে তুমি আমার প্রবন্ধের যে শিরোনামটি উল্লেখ করেছ তা আমার দিকে অপরিচিত ও অজ্ঞাত বলে মনে হচ্ছে। প্রথমে আমি বুঝতেই পারি নি, পরিচিত ওই চিত্রটির অর্থ কী। কিন্তু প্রতিটি শব্দ ধ'রে-ধ'রে তা পড়তে হল, মনে হতে লাগল এই শব্দগুলিকে একত্র গাঁথা হয়ে এভাবে আমি যেন প্রথম দেখলাম। কিন্তু আমি সেই মানুষই। আমার প্রশ্নগুলির মধ্যে যেন অলংকার আছে, যে-অলংকার মহিলাদের পক্ষে বেশ উপযোগী কিংবা হাউস অব কমন্স-এর পক্ষে, কেননা এর ক্ষমতা আমাদের কালে এসে এত বেড়ে গিয়েছে যে, সব জিনিসের অন্তস্থলে গিয়ে এ পৌঁছতে পারে। কিন্তু আমার মনের অভ্যন্তরটি তোমার কাছে প্রকাশ করে দিতে আমি ব্যাকুল হয়েছি—তা হচ্ছে এক অদ্ভুত অবস্থা, একটা পাপ, আমার মনের একটা অসুখ; তুমি যদি এক অতলস্পর্শ গভীরতার কথা ভাবতে পার যা কোনো সেতু দিয়ে বাঁধা যায় না, তাহলে বুঝবে সেই রকম একটা ব্যবধান আমাকে আমার সাহিত্য কর্ম থেকে আলাদা করে রেখেছে, আমার আগের রচনা ও ভবিষ্যতের রচনা ঐ ভাবে পড়ে আছে আমার সামনে। আমার আগের লেখাগুলি আমার কাছে এমনই অপরিচিত লাগছে ওগুলি আমার নিজের ব'লে আমি মনে করতে পারছিনে।

আমি ঠিক জানিনে তোমার দাক্ষিণ্যের জন্যেই তোমার স্তুতি করা উচিত কিংবা তোমার স্মরণ শক্তির তীক্ষ্ণতার জন্যেই তোমার প্রশংসা করা উচিত, কেননা তুমি অনেক ছোট ছোট পরিকল্পনার কথা উল্লেখ করেছ, যে-পরিকল্পনা আমি করেছিলাম সেই দুর্লভ উৎসাহের আমলে, এবং যে-উৎসাহ আমরা উভয়ে মিলে উপভোগ করেছিলাম। এ কথা সত্যি যে, আমি আমাদের মহামান্য সম্রাট অষ্টম হেনরির রাজত্বকালের প্রথম বছরের কাহিনী রচনা করব ঠিক করেছিলাম। আমার পিতামহ এক্সেটরের ডিউক ফ্রান্স ও পোর্টুগালের সঙ্গে পত্রালাপের কাগজপত্র আমাকে দান করে দিয়ে গিয়েছিলেন; সেই নথিপত্রই ছিল আমার পরিকল্পিত রচনার মূলধন। সেই উৎসাহ ও

উদ্দীপনাময় দিনে আমার মনে হত সেই প্রাচীন রোমক ঐতিহাসিক স্যালাস্ট-এর কাছ থেকে বাধাহীন নল দিয়ে যেমন বয়ে চলে জল ঠিক সেই ভাবেই যেন আমার কাছে বয়ে চলে এসেছিল গদ্য ভাষার উপলব্ধি, সেটা একটা আন্তরিক ভাষাভঙ্গি, আলংকারিক কৌশল যার মধ্যে একবিন্দু নেই। এই ভাষাভঙ্গি কোনো বিষয়বস্তুকে নির্ধারিত করে দেয় না, কেননা বিষয়বস্তুকে তা ভেদ ক'রে চলে যায়, বিষয়বস্তুকে গ্রাস করে ফেলে, একই সঙ্গে তা স্বপ্নকে ও বাস্তবকে যেন সৃষ্টি ক'রে তোলে, সে যেন বাহুশক্তির একটা খেলা, তা যেন সংগীতের ও অ্যালজেব্রার মতই চমৎকার। এই ছিল আমার মহামূল্য পরিকল্পনা।

কিন্তু কোনো পরিকল্পনার করার জন্যে মানুষের কতটুকু ক্ষমতা?

আমি আরও অনেক প্ল্যান নিয়ে পুতুল খেলা করেছি। যে সব কথার উল্লেখও তোমার চিঠিতে আছে। প্রতিটি প্ল্যান যেন আমার রক্তবিন্দুর দ্বারা চিহ্নিত করে রেখেছিলাম, এখন তা একটা ক্লান্ত পোকার মত অন্ধকার দেয়ালে এসে ধাক্কা খাচ্ছে, যে দেয়ালে সেই শান্তিপূর্ণ দিনের প্রশান্ত সূর্যের আলো এসে আর পড়ছে না।

আমাদের প্রাচীনেরা যে পুরাণ কথা আমাদের কাছে দিয়ে গিয়েছেন তার কাহিনীগুলির অর্থ উদ্ধারের ইচ্ছে আমার ছিল, যেসব পুরাণকাহিনী রচনায় চিত্রশিল্পী ও ভাস্করেরা অসীম আনন্দ লাভ করেছেন; চিত্রের দ্বারা বর্ণিত সেই সব কাহিনীর মূলকথা ও অফুরন্ত জ্ঞানের তত্ত্ব, আবার যেন মনে হয়, বাতাসের সঙ্গে এক রহস্যলোকে থেকে থেকে ভেসে আসছে আমার কাছে।

এই পরিকল্পনাটির কথা আমার বেশ মনে পড়ে। আমি ঠিক বলতে পারব না কোন্ ইন্দ্রিয় সুখের বা কোন্ আধ্যাত্মিক বাসনার চরিতার্থতার জন্যে এই পরিকল্পনা করা হয়েছিল। শিকারীর আঘাত পাওয়া হরিণ যেমন জলের জন্যে ব্যাকুল হয়ে ওঠে, এইসব বনদেবীর ও সমুদ্রপুরীর নগ্ন উজ্জ্বল শরীরের মধ্যে প্রবেশ করার জন্যে আমার মধ্যে অবিকল ঐ রকম ব্যাকুলতা জেগে উঠেছিল, আমি ঐ নার্সিসাস ও প্রোটিয়াস, পার্সেউস ও এ্যাকটিয়নদের মধ্যে নিজেকে অদৃশ্য করে ফেলতে চেয়েছিলাম, এবং রক্তমাংসের শরীর নিয়ে তাদের সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছিলাম। আমি এঁর চেয়েও বেশি করতে চেয়েছিলাম। জুলিয়াস সিজার যেমন রচনা করেছিলেন,

আমি সেই রকম একটা 'অ্যাপফথেগমাটা' আরম্ভ করতে চেয়েছিলাম, তুমি মনে করতে পারবে, সিসেরো তাঁর এক চিঠিতে এর উল্লেখ করেছেন। আমি ইচ্ছে করেছিলাম, এর মধ্যে আমি সব কথা বলব, পাশাপাশি আমি এ'তে স্মরণীয় উক্তিগুলি লিখে রাখব, আমি আমার ভ্রমণকালে আমাদের কালের যেসব জ্ঞানী ব্যক্তির ও রসিকা নারীর সংস্পর্শে এসেছি, সাধারণ মানুষের মধ্যেও যেসব অসাধারণ মানুষের সঙ্গে যুক্ত হতে পেরেছি কিংবা উচ্চশ্রেণীর ও অভিজাত যেসব ব্যক্তির কাছাকাছি আসতে পেরেছি তাঁদের কথা আমি পাশাপাশি বসাব। আমার ইচ্ছে ছিল, এ সবের সঙ্গে আমি ক্লাসিক থেকে ও ইতালীর গ্রন্থ থেকে উপযুক্ত সত্য কথা ও তত্ত্বকথাও ব্যবহার করব, এবং বইয়ে পাণ্ডুলিপিতে বা কথোপকথনে আমি যেসব বুদ্ধিদীপ্ত কথায় উদ্দীপিত হয়েছি তাও ব্যবহার করব। তার সঙ্গে আরও দেব—উৎসবের কথা, সমারোহের কথা, অদ্ভুত অপরাধের কথা, উন্মাদের বিবিধ বিবরণ, নেদারল্যাণ্ডের ও ফ্রান্সের স্থাপত্য-শিল্প-মণ্ডিত মিনারের বৃত্তান্ত, এবং আরও অনেক কিছু।

সংক্ষেপে এই কথা বলতে পারি যে, সেই সময়ে আমি এক নাগাড়ে এমন নেশায় বুঁদ হয়েছিলাম যে, আমার মনে চারদিকের সমগ্র বিশ্বটাই যেন অখণ্ড এক। আধ্যাত্মিক জগৎ ও বস্তু জগতের মধ্যে কোনো প্রভেদ দেখিনি, ভদ্র ও অভদ্র আচরণের মধ্যে, নম্র ও উদ্ধত স্বভাবের মধ্যে, শিল্প ও বর্বরতার মধ্যে, নির্জনতা ও সামাজিক জীবনের মধ্যেও কোনো প্রভেদ পাইনি। সব জিনিসের মধ্যেই আমি প্রকৃতির উপস্থিতি দেখেছি। আমি পাগলামির বেপরোয়া কাণ্ড-কারখানায় এবং স্পেনীয় উৎসবের মার্জিত মাত্রা জ্ঞানের মধ্যে দেখেছি এই প্রকৃতিকে, গ্রাম্য ছেলেদের চাষাড়ে স্বভাবের মধ্যে ও খুব উচ্চাঙ্গের রূপকের মধ্যে দেখেছি একে। প্রকৃতির সব আচরণের মধ্যেই আমার মনে হয়েছে আমি আছি। যখন আমার শিকার করার আস্তানায় আমি আলুলায়িত-বেশা গোপবালিকাদের দ্বারা নম্র-চোখ-ওলা গরুর বাঁট থেকে কাঠের পাত্রে দোহন-করা দুধ পান করতাম, তখন আমার মনের মধ্যে 'যে শিহরণ জেগে উঠত তা আমার পড়ার ঘরের জানালার কাছে রাখা বেঞ্চে বসে একটা উচ্চাঙ্গের বই থেকে ওতলানো সুস্বাদু পুষ্টিকর পদার্থ গ্রহণের শিহরণ থেকে আলাদা ছিল না। এর একটি ঠিক অন্যটির মতই ছিল। কোনোটাই অন্যটার চেয়ে বেশি ভালো ছিল না।

স্বপ্নের মত কোনো স্বর্গীয় সুষমাও যা ছিল, বস্তু জগতের স্থূলতাও ছিল তাই। এবং এই ভাবই জীবনের সর্বক্ষেত্রে ও সর্বদিকে ব্যাপ্ত ছিল। সব ব্যাপারেই আমি যেন ছিলাম ঠিক কেন্দ্রে। কোনো-কোনো সময় আমার মন এমন উদার হয়ে যেত যে, মনে হত চতুর্দিকের সবই রূপক, এমন প্রতিটি প্রাণী অন্য প্রাণীর যেন জীয়ন কাঠি। আমি অনুভব করতাম যে, আমি প্রত্যেকেরই হাতল ধরে যেন টানতে পারি এবং ঐ জীয়নকাঠি বলিয়ে সকলের মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করে দিতে পারি, তাদের বশ্য করে নিতে পারি।

যে মানুষ এই রকম মনোভাবের দ্বারা সহজেই বশীভূত হয়ে যেতে পারে, তার এখানকার এই দশা সর্বশক্তিমান ঈশ্বরেরই অভিপ্রেত বলে মনে করা যেতে পারে। তার মন সেই পরিস্ফীত একগুঁয়েমির থেকে এমন চরম নৈরাশ্যে ও দুর্বলতায় যে পরিণত হবে, এ আর বিচিত্র কী। এমন ধর্মীয় প্রভাব আমার উপর কোনো কাজ করে না। ঐ প্রভাব পড়ে গিয়ে ঐ সূক্ষ্ম জালের উপর, যে জালের বাধা ভেদ ক'রে আমার চিন্তা অসীম শূন্যের পথে পাড়ি দেয়, কিন্তু অন্য সকলের চিন্তা ঐ জালে ধরা পড়ে আটকে থাকে। আমার কাছে এই বিশ্বাসের রহস্য জমাট বেঁধে একটা মনোহর রূপকে পরিণত হয়েছে, যে রূপক আমার জীবনের এই প্রশস্ত ক্ষেত্রের উপর দিয়ে একটা খিলান হয়ে দাঁড়িয়েছে, সেটা যেন এক উজ্জ্বল রামধনু। আমি যদি সেটা ধরতে যাই তাহলে সেটা সরে-সরেই যাবে, এবং আমাকে যেন সেটি তার আবরণ দিয়ে আবৃত করে ধরবে।

কিন্তু, হে আমার প্রিয় বন্ধু, ঠিক এই ভাবেই পার্থিব ব্যাপার আমার কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। আমার এই আত্মিক যন্ত্রণার কথা কীভাবে আমি তোমার কাছে প্রকাশ করব?—এই যে ফলের ভারে অবনত বৃক্ষশাখা আমার প্রসারিত হাত থেকে দূরে চলে যাচ্ছে, আমার পিপাসার্ত ঠোঁটের কাছ থেকে কলধ্বনি মুখরিত নদীর এই যে পিছু হঠে যাওয়া?

আমার অবস্থা সংক্ষেপে 'এই রকম: আমি শৃঙ্খলার সঙ্গে কোনো কথা চিন্তা করার বা বলার সব শক্তি হারিয়েছি।

অন্যে যেমন অনর্গল ভাবে এবং থতমত না খেয়ে নিজের কথা বলে যেতে পারে আমি প্রথমে ক্রমে-ক্রমে সে শক্তি হারাই, কোনো অসাধারণ বা সাধারণ কথাও আমি আর বলতে পারিনে। 'আত্মা' 'মন' বা 'শরীর' এসব কথা উচ্চারণ করতে আমার কেমন যেন বিস্বাদ মনে হতে লাগল। আমি

আদালতে বা পার্লামেণ্টে বা অন্য কোনো খানে আমার অভিমত প্রকাশ করতে অপারগ হয়ে গেলাম। অন্যের মতের কাছে নতি স্বীকার করার অভিপ্রায়ে এটা হয় নি (তুমি জান আমার স্বভাব একটু উদ্ধত ধরণের), কিন্তু একটা অভিমত প্রকাশ করতে স্বভাবতই জিভের ডগায় যে কথা আসা দরকার তা কিছুতেই আসে না। একদিন, আমার চার বছরের মেয়ে ক্যাথিলিনা পমপিলিয়া একটা শিশু সুলভ মিথ্যা কথা বলেছিল, আমি তাকে ভৎ´সনা করলাম, আর, তাকে বোঝাতে চেষ্টা করলাম, সত্য কথা বলা কতটা দরকার, যেসব কথা বলব ভেবেছিলাম সেসব কথা কেমন-যেন রঙিন বুদ্‌বুদের মতন হয়ে উঠতে লাগল, এবং একটা আর একটার গায়ে গিয়ে পড়তে লাগল, আমি হঠাৎ আমার কথা বন্ধ করে দিলাম, আমি যেন হঠাৎ কেমন অসুস্থ হয়ে পড়েছি বলে মনে হতে লাগল। বাস্তবিকই আমি কেমন যেন ম্লান হয়ে যাচ্ছি ব'লে মনে হল, আমি আমার কপাল চেপে ধ'রে, আমার পিছনে দরজার পাল্লা ধাক্কা দিয়ে বন্ধ ক'রে বাইরে বেরিয়ে এলাম, তারপর নির্জন মাঠের উপর কিছুক্ষণ দ্রুত পায়চারি করার পর কিছুটা সুস্থ হতে পারলাম।

ক্রমে, এই উদ্বেগ ও অশান্তি আমার সর্বাঙ্গে মরচের মতন ছড়িয়ে পড়ল। পরিচিত জনের মধ্যে হৈচৈ করে কথা বলা বা অভিমত প্রকাশ করা বেশ সহজ কাজ, কিন্তু আমি এসব জায়গাতেও কোনো কথাবার্তার মধ্যে যোগ দিতাম না। আমার মনের মধ্যে রাগ জমে উঠত, এবং তা চেপে রাখা কঠিন হত যখন আমি শুনতাম—এই ব্যাপার অমুক বা তমুক লোকের পক্ষে ভালো বা মন্দ; শেরিফ 'ন' খারাপ 'ও' ধর্মোপদেশক 'ট' ভালো লোক; চাষী 'ম' দয়ার পাত্র, তার ছেলেরা সব নষ্ট করার যম; অন্যরা ঈর্ষার পাত্র কেননা তার মেয়েরা মিতব্যয়ী; একটা পরিবার উন্নতি ক'রে চলেছে, অন্য পরিবারটি অবনতির পথে। এসব কথা এত মিথ্যা ও ফাঁকা বলে আমার মনে হয়। আমি বাধ্য হয়ে অস্বস্তিকর কাছে থেকে এইসব আলোচনা শুনেছি। এক সময় আমি একটা ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে আর কড়ে আঙুলের ডগার এক টুকরো অংশ দেখেছিলাম, দেখে মনে হয়েছিল ঐ জায়গাটা লাঙল দিয়ে চষা ক্ষেতের মত দাগ কাটা ও গর্তে ভরা, ঠিক এই ভাবেই এখন আমি মানুষকে ও তার কাজকর্মকে দেখে থাকি। আমি অভ্যাসের সাদা চোখ দিয়ে দেখে তাদের এখন চিনতে পারিনে।

আমার মনে হয় সব জিনিসই টুকরো-টুকরো হয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে; কোনো জিনিসই এখন আর একটা ধারণা দিয়ে ধারণ করা সম্ভব নয়। এক একটা কথা আমার চারদিকে ভেসে বেড়ায়; তারা চোখের মধ্যে এসে জমাট বেঁধে একদৃষ্টে চেয়ে থাকে, আর যার দিকে একদৃষ্টে তাকাতে আমি বাধ্য হই; এই ঘূর্ণিপাকে আমার মাথা ঘোরা রোগ হয়ে দাঁড়াল, অনবরতই ঘুরতে ঘুরতে আমাকে মহ.শূন্যের দিকে টানতে লাগল।

এ অবস্থার হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্যে আমি আমাদের প্রাচীনদের আধ্যাত্মিক জগতে আশ্রয় নিলাম। প্লেটোকে আমি পরিহার করলাম, কেননা তাঁর বিপজ্জনক কল্পনাকে আমি ভয় করি। সকলের মধ্যে থেকে আমি বেছে নিলাম কেবল সেনেকা ও সিসেরো, তাঁদের দিকে মনোনিবেশ করব ঠিক করলাম। তাঁদের আইডিয়ার শৃঙ্খলা ও পরিষ্কার ভাবে তার প্রকাশ—এর দ্বারাই আমার হৃতস্বাস্থ্য আবার ফিরে পাব ব'লে আমার আশা ছিল। কিন্তু তাঁদের মধ্যে প্রবেশের পথ পেলাম না। তাঁদের আইডিয়াগুলি বেশ বুঝতে পারলাম। সেই আইডিয়ার পারস্পরিক ক্রিয়া আমার চোখের সামনে অতি সুন্দর ফোয়ারার মত জেগে উঠতে লাগল, তার উপরে সোনার বর্ণের জল-গোলক সৃষ্টি হতে লাগল। আমি তাদের চারিদিকে ঘুরে তাদের খেলা দেখতে লাগলাম। কিন্তু তারা নিজেরা পরস্পরকে নিয়েই মশগুল হয়ে রইল, এবং আমার ব্যক্তিগত চিন্তার গভীরতা ও তার গুণ তাদের সেই জাদুকরী বৃত্তের বাইরে পড়ে রইল। তাদের মধ্যে থেকেও আমি ভীষণ রকম নিঃসঙ্গতায় নিপীড়িত হতে লাগলাম। চোখহীন পাথরের মূর্তি দিয়ে ঘেরা বাগানের মধ্যে আমি যেন বন্দী হয়ে গেলাম। সেইজন্যে আবার আমি ছুটে বেরিয়ে এলাম মুক্ত অঙ্গনে।

সেই সময় থেকে আমি এমন এক অস্তিত্ব বহন করে চলেছি যা তুমি কল্পনাও করতে পারবে না। এ অস্তিত্বে কোনো বেগও নেই, কোনো চিন্তাও নেই। এমন অস্তিত্বের বিশেষ তফাত নেই আমার প্রতিবেশীর বা কোনো আত্মীয়ের অস্তিত্বের থেকে এবং এই রাজত্বের কোনো ভূম্যাধিকারী অভিজাতের অস্তিত্বের থেকে; কিন্তু এ অস্তিত্ব আনন্দ ও উত্তেজনা থেকে মুক্ত অবশ্য নয়। এই সব শুভ মুহূর্ত কোথায় লুকিয়ে থাকে তা বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আবার দেখ, কথা কেমন আমাকে বর্জন করে চলেছে।

এ ব্যাপারটার কোনো নাম নেই, কোনো সংজ্ঞা নেই। এ'কে কোনো নাম দিয়ে চিহ্নিত করাও যায় না। দৃষ্টান্ত না দিলে তুমি আমার অবস্থা ঠিক বুঝতে পারবে বলে মনে হয় না, এসব দৃষ্টান্ত অসম্ভব বলে তোমার অবশ্য মনে হতে পারে। একটা হাঁড়ি, একটা পরিত্যক্ত মই, রোদের মধ্যে একটা কুকুর, একটা পোড়ো সমাধিক্ষেত্র, একটা খোঁড়া লোক, চাষীর একটা কুড়ে—এসব জিনিসের প্রতি অনেক সময় হয়তো উদাসীন দৃষ্টি দেওয়া হয়, এসব ছাড়াও আরো অনেক জিনিসের প্রতি আমরা উদাসীন থাকতে পারি, কিন্তু সহসাই যে-কোনো মুহূর্তে এমন অপরিসীম মহিমায় তারা উদ্ভাসিত হয়ে উঠতে পারে যে, তখন কোনো কথা দিয়ে তাদের বর্ণনা দেওয়া কঠিন হয়ে যায়। এমনকি বহুদূরের যে জিনিসটা এখন চোখের সামনে নেই, তার প্রতীকটিও রহস্যজনক ভাবে এমন বিশিষ্টতা অর্জন করে বসতে পারে যে, তার ফলে সমস্ত মনের মধ্যে এসে গেল একটা শিহরণ। যেমন ধরো, সম্প্রতি আমি আমার ডেয়ারি-ফার্মের দুধ যেখানে মজুত করে রাখা হয় সেখানে ছড়াবার জন্যে প্রচুর-পরিমাণ ইঁদুর-মারার ওষুধের অর্ডার দিয়েছিলাম। বিকেলের দিকে আমি ঘোড়ায় চেপে একটু বেড়াতে বের হই, এবং ও-সম্বন্ধে আর-কিছুই ভাবিনে। নতুন চষা জমির উপর দিয়ে আমি যখন যাচ্ছি তখন বিশেষ-কিছু উল্লেখযোগ্য জিনিস চোখে পড়ল না ; কেবল কয়েকটা ভীত পাখি উড়ে পালাল, আর দূরে উঁচু-নীচু জমির ওপারে মস্ত-একটা সূর্য অস্ত যাচ্ছে দেখলাম, কিন্তু হঠাৎ আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল দুধ-মজুত করে রাখার ঐ ভাঁড়ারটির দৃশ্য, যে জায়গাটা যেন মৃত্যুমুখী অজস্র ইঁদুরের আর্তনাদে উচ্চকিত হয়ে উঠেছে। সবটাই আমি মনে-মনে উপলব্ধি করতে পারলাম, সেই ঠাণ্ডা ভাঁড়ারটি ঐ বিষের মিষ্টি গন্ধে ভরপুর হয়ে আছে, আর মৃত্যুযন্ত্রনায় অধীর হয়ে ইঁদুরেরা দেয়ালে-দেয়ালে ঘা' দিচ্ছে, আর এখান থেকে পালাবার চেষ্টা করছে, তারা হতাশ হয়ে যাচ্ছে, এমন সময় একজোড়া ইঁদুর একটা বন্ধ করা ফাটলের কাছে এসে পৌঁছল। কিন্তু একি, আবার সেই কথা খোঁজা কেন, যে কথা আমি অনেক আগে পরিত্যাগ করে চলে এসেছি। আল্‌বা লোঙ্গা ধ্বংস হয়ে যাবার কিছু আগের লিভির বর্ণনা তুমি তো পড়েছ, তখন জনতা সেইসব পথ ধ'রে ছুটোছুটি করছে যে-পথ তারা আর দেখবে না, এবং তারা তাদের পায়ের নীচের পাথরের কাছ থেকে বিদায় চাচ্ছে। আমি তোমাকে বলছি, আমি আমার মনের মধ্যে ঐ দৃশ্যটা বহন করছি, এবং সেইসঙ্গে জলন্ত কার্থেজ

নগরীর দৃশ্যও। কিন্তু এসবের চেয়ে স্বর্গীয় এবং এসবের চেয়েও জঘন্য দৃশ্য আছে। তা হচ্ছে আমাদের এই বর্তমান কাল, এই মহামহিমান্বিত বর্তমান। একজন মায়ের কথা ধরো, মৃত্যুর ভয়ে ভীত তাঁর সন্তানরা তাঁকে ঘিরে আছে, মায়ের চোখ তখন মৃতপ্রায় সন্তানের দিকেও নয়, দয়াহীন পাথরের দেয়ালের দিকেও নয়; তাঁর দৃষ্টি শূন্যের দিকে নিক্ষিপ্ত, সেখান থেকে অন্তহীনতার দিকে, এই দৃষ্টির সঙ্গে মিশে আছে তাঁর দাঁতের সঙ্গে দাঁত ঘষা। একজন ক্রীতদাস পাথরে-পরিণত নায়োবির মূর্তির দিকে অসহায় ভাবে চেয়ে আছে, সে নিশ্চয় ঠিক সেইরকম অবস্থাই অনুভব করছে, আমি ঠিক যেমনটি করেছিলাম ঐ অসহায় মাতাটির দন্তঘর্ষণ দেখে।

এসব বিবরণের জন্যে আমাকে মার্জনা কোরো। কিন্তু ভেবোনা যে এসবের জন্যে আমি করুণা প্রকাশ করছি। তোমার যদি এতে করুণার উদ্রেক হয়ে থাকে তাহলে বুঝব এসব দৃষ্টান্ত বাছাই করা আমার ভুল হয়েছে। এটা করুণার চেয়ে অনেক বেশিও, অনেক কমও। এই প্রাণীর প্রতি একটা সহানুভূতি, জীবন ও মৃত্যুর এক যুগপৎ অনুভূতি, স্বপ্ন ও জাগরণের একটা আভাস একই সঙ্গে তাদের মধ্যে খেলে গিয়েছে। কিন্তু কোথা থেকে এল এইসব? অন্য একদিনের সন্ধ্যাবেলার কথা বলি—মালীর ছেলে একটা সুপুরি গাছের নীচে অর্ধেক জলে ভরা একটা পাত্র রেখে গিয়েছে, গাছের ছায়ায় ঐ পাত্র ও জল অন্ধকার দেখাচ্ছে, জলের উপরে ভাসছে একটা সুপুরি। তখন এইসব সামান্য জিনিসই আমার মধ্যে শিহরণ জাগিয়ে তুলল, আমি যেন অনন্ত-অসীমের উপস্থিতি দেখতে পেলাম সেখানে, আমার মাথার চুলের গোড়া থেকে পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত নেমে গেল একটা কম্পন। কথা দিয়ে এর প্রকাশের জন্যে আমি কেন ব্যাকুল হলাম? যে কথা খুঁজে পাবার জন্যে আমাকে কি না মাথা কুটতে হবে সেই দেবদূতের কাছে, যে-দেবদূতের মহিমায় আমার কোনো বিশ্বাস নেই। ঐ জায়গা থেকে কিসের জন্যে আমি স'রে গিয়েছিলাম। কয়েক সপ্তাহ কেটে গেল তার পর থেকে, এখনো আমি কোনো সুপুরি গাছ দেখলেই সেদিনের সেই স্মৃতি আবার যেন আমাকে ঘিরে দাঁড়ায়, এবং সেই শিহরণ ও কম্পন আবার জেগে ওঠে। এই রকম সময় একটি কুকুর বা ইঁদুর বা সুপারি বা বক্র কোনো আপেল গাছ, অথবা পাহাড়ের গা বেয়ে এঁকে-বেঁকে যাওয়া কোনো সরুপথ কিংবা শ্যাওলা-পড়া কোনো পাথর দেখলে সেসব জিনিস আমার যত সুন্দর লাগে, কোনো আনন্দময় রাত্রির সঙ্গী

কোনো সুন্দরী ললনার স্মৃতি আমার কাছে তত মধুর লাগে না। এই মূক ও কখনো-কখনো প্রাণহীন পদার্থ আমার কাছে এমন প্রচুর প্রাণ ও ভালোবাসা নিয়ে উপস্থিত হয়, তখন আমার বিস্মিত চোখে কোনো জিনিসই আর প্রাণহীন বলে মনে হয় না। যা-কিছু আছে, যা-কিছুর কথা মনে করতে পারি, আমার চিন্তা দিয়ে যা-ই স্পর্শ করতে পারি—তার সব-কিছুর মধ্যেই যেন পেয়ে যাই একটা পথ। আমার মনের এই গুরুভার, আমার মাথায় নিষ্ক্রিয়তা তাও যেন একটা অর্থ নিয়ে আসে। আমার চারদিকের সব-কিছুর মধ্যে আমি আনন্দের স্বাদ পাই, আমার চারদিকের সব-কিছুর মধ্যে আমি যেন অনুপ্রবেশ করতে পারি। আমার মনে হয় আমরা নূতন আত্মীয়তা নিয়ে পৃথিবীর যাবতীয় পদার্থের মধ্যেই প্রবেশ করতে পারি, যদি অবশ্য আমরা চিন্তা করে দেখি কেবল মাথা দিয়ে নয়, হৃদয় দিয়ে। আমি এইভাবে অভিভূত হয়ে গেলে যেন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ি। কি ভাবে এ সব ঘটছে, এবং সমগ্র বিশ্বের অস্তিত্বটাই বা কিভাবে অনুভূত হচ্ছে আমার পক্ষে তা বুঝিয়ে বলা তেমনই কঠিন যেমন কঠিন আমার শরীরের অন্ত্রের মধ্যে কি-কি ঘটনা ঘটছে, কিংবা আমার রক্ত জমাট বাঁধছে কিনা তা বুঝিয়ে বলা।

এসব অদ্ভুত ব্যাপার শরীরের বা মনের ব্যাপার কিনা তা বলতে পারব না। আমি যে জীবন কাটাচ্ছি তা হচ্ছে অবিশ্বাস্য-রকম বেকুবের জীবন। আমার মনের এ দুরবস্থার কথা আমার স্ত্রীর কাছে গোপন রাখতে পারিনে, এবং যেসব কর্মচারীদের নিয়ে আমার সম্পত্তির দেখা-শোনার কাজ আমাকে করতে হয় তাদের কাছেও আমার এই উদাসীনতার ব্যাপারটা চাপা রাখতে পারিনে। আমি আমার বাবার কাছে যে সৎ শিক্ষা পেয়েছি, এবং দিনের কোনো সময়টারই সদ্ব্যবহার করার যে অভ্যাস অর্জন করেছি, তাই আমাকে বাইরের জগতের ও মানুষের কাছে আমার স্থৈর্যের ও মর্যাদার চেহারা এনে দিয়েছে।

আমি আমার বাড়িতে নতুন একটি অংশ গড়ছি, এবং এ ব্যাপারে কাজ কতটা এগলো সে সম্বন্ধে স্থপতির সঙ্গে মাঝেমাঝে কথাবার্তা বলছি। আমি আমার জমিদারি নিজেই দেখাশোনা করি, আমার কর্মচারীরা এবং প্রজারা আমাকে হয়তো দেখে যে, আমি কথা বলতে তেমন ভালোবাসিনে, কিন্তু আমি সেকালের মানুষের চেয়ে মানুষের কম শুভাকাঙ্খী নই। আমি যখন ঘোড়ায় চড়ে যাত্রা করি তখন যারা তাদের বাড়ির সামনে মাথার টুপী খুলে

দাঁড়ায় তারা বুঝতে পারে না যে আমার চোখ তখন আমি কোন্ দিকে চালনা করছি, আমি কিন্তু এখন বেশ লক্ষ্য করছি সেই পচা পিচবোর্ডগুলি মাছ-ধরার চারার জন্যে যার মধ্যে তারা খোঁজ করছে উইপোকা, আমার চোখ চলে যাচ্ছে জানালার ভিতর দিয়ে সেই গুমট ঘরের মধ্যে যেখানে একটি কোণে এক নীচু বিছানায় চেক-কাটা চাদর পাতা আছে—যে বিছানা চিরকাল অপেক্ষা করে চলেছে একজনের মৃত্যুর ও অন্যজনের জন্মাবার জন্যে। আমি দেখছি ছোট ছোট কুকুরছানা বা বেড়ালবাচ্চা যারা ফুলদানির পাশ থেকে কিছু চুরি করার জন্যে চলাফেরা করছে ; আমার চোখ খুঁজে বেড়াচ্ছে একটা চাষীর জীবনযাত্রা দেখার জন্যে, যার নগণ্য অস্তিত্ব ও সামান্য চেহারাটিই আমার সেই রহস্যজনক কথাহীন অসীম আনন্দের উৎস হতে পারে। আমার মনের অনির্বচনীয় আনন্দ এসে যেতে পারে ঐ তারকাখচিত আকাশ দেখে নয়, কোনো রাখাল-বালক আগুন জ্বেলেছে দূর থেকে সেই শিখা দেখেই। বেশ জাঁকজমকের সঙ্গে অর্গান বেজে উঠলে আমি তেমন আনন্দ পাব না, যেমন পাব যখন শরৎকালের বাতাস আগতপ্রায় শীতের আকাশের মেঘকে তাড়া করে বেড়াবে এবং বেজে বেজে উঠবে সেই সঙ্গে ঝিঝির শেষ ঝংকার। আমি নিজেকে অনেক সময় সেই সুবক্তা ক্র্যাসাস-এর সঙ্গে তুলনা করি, যিনি তাঁর জলাশয়ে একটা লাল-চোখের মাছ পুষেছিলেন। সেই মাছটি মারা যায়। এই সময় তিনি সেনেটে বক্তৃতা দেবার সময় মাছের জন্যে চোখের জল ফেলেছিলেন, অনেকে এজন্যে তাঁকে ভর্ৎসনা করে এবং তাকে একটা বুদ্ধিহীন মানুষ বলে অভিহিত করে, এর উত্তরে ক্র্যাসাস বলেন, "আপনারা আপনাদের প্রথম স্ত্রীর বা দ্বিতীয় স্ত্রীর মৃত্যুতে যা করেননি, আমি আমার মাছের মৃত্যুতে তা করলাম।"

আমি জানিনে কতবার এই ক্র্যাসাস তাঁর সেই জলজীবটি নিয়ে আমার মনের মধ্যে প্রবেশ করেছেন, এবং তার দ্বারা আমার নিজস্ব সত্তাটি প্রতিবিম্বিত করেছেন শতশত শতাব্দীর ব্যবধান ডিঙিয়ে। তিনি সেই সেনেটে যে কথা বলেছিলেন সে জন্য নয়। তাঁর উত্তরটা নিয়ে বেশ হাসাহাসি হয়েছে এবং অনেক ঠাট্টাবিদ্রূপও। যদি সেনেটের সভ্যেরা তাঁদের স্ত্রীদের জন্যে অশ্রু-বিসর্জনও করতেন তাহলেও আমি যেজন্যে অভিভূত হয়েছি সে কারণ থেকেই যেত। কেননা তাহলেও থেকে যেতেন ক্র্যাসাস যিনি তাঁর পোষা মাছের জন্যে চোখের জল ফেলেছেন। এমন দায়িত্বপূর্ণ শাসনকার্য পরিচালনার জন্যে

সেনেটের আলোচনা চলছিল সেইখানে এই রকম একটা ঘটনার কথা ভাবলে আমার মনে এমন রহস্যময় এক শক্তির উদয় হয় যে, আমি তা কথায় প্রকাশ করতে গেলে, সব ব্যাপারটাই কেমন হাস্যকর হয়ে ওঠে।

অনেক সময় রাত্রিবেলা ক্র্যাসাসের মূর্তি আমার মাথার মধ্যে এসে ঢোকে। আমার তখন মনে হয় আমি নিজেই যেন কেমন গেঁজে উঠছি, উথলে উঠছি, ফেনা কেটে উঠছি, ও জ্বলজ্বল করে উঠছি। সব ব্যাপারটাই হচ্ছে জ্বরের ঘোরে চিন্তা করার মতন, এবং এমন পরিচ্ছন্ন ও স্পষ্ট ভাবে চিন্তা করা যা নাকি কোনো কথার চেয়েও জ্বলন্ত। এতে এমন একটা আবর্তের সৃষ্টি হয় যা ভাষায় সৃষ্ট আবর্তের মত অতলস্পর্শ কোনো গভীরে নিয়ে যায় না, কিন্তু যা নিয়ে যায় আমার আপনার মধ্যে এবং প্রগাঢ় শান্তির জঠরে।

হে আমার প্রিয় বন্ধু, তোমার উপর অনেক উৎপীড়ন করলাম আমি। আমি যে অবস্থায় আছি এবং যে অবস্থাটা আমার মধ্যেই আবদ্ধ থাকবে তার বিবরণ দিতে গিয়ে তোমার উপর অনেক অত্যাচার করা হল।

আমার লেখা বই তোমার কাছে আর পৌঁছচ্ছে না বলে তুমি যে অসন্তোষ প্রকাশ করেছ তার জন্যে তোমাকে ধন্যবাদ জানাই। এই বই নাকি "আমাদের মধ্যের যে বন্ধুত্ব আমরা হারিয়েছি তারই ক্ষতিপূরণ" হিসেবে গণ্য করা যেত। তোমার চিঠিতে এই অংশ প'ড়ে, আমার মনে হল, অবশ্য গভীর দুঃখের সঙ্গেই মনে হল, যে, ইংরেজি ভাষাতেই হোক ল্যাটিনেই হোক আমি আগামী বছরে বা আমার জীবনের অবশিষ্ট সব আগামী বছরেই আমি আর কোনো বই লিখব না। এর একটা অদ্ভুত ও বিভ্রান্তিকর কারণ আছে। যে কারণটি বুঝে দেখবার জন্যে আমি তোমার মতন অসীম উন্নত-মনের একজন মানুষের কাছে তা প্রকাশ করতে চাই, তোমার সংস্কারবিমুক্ত চোখের সম্মুখে আধ্যাত্মিক ও বস্তুজগতের যে মূল্যবোধ আছে তুমি তাই দিয়ে তা বিচার কোরো। কারণ, যে ভাষাতে আমি কেবল লিখতে নয়, ভাবতেও পারিনে সে ভাষা ইংরেজিও নয়, ল্যাটিনও নয়; তা ইটালীরও নয়, স্প্যানিশও নয়, কিন্তু সেটা এমনই এক ভাষা যার একটা শব্দও আমার জানা নয়; সেটা এমন ভাষা যা দিয়ে জড়পদার্থও আমার সঙ্গে কথা বলে, এবং যা দিয়ে কোনো-এক কালে আমি কোনো অজ্ঞাত বিচারকের কাছে আমার পক্ষ হয়ে কথা বলতে পারব।

আমার যদি তেমন ক্ষমতা থাকত যে, ফ্রান্সিস বেকন-কে লেখা আমার

এই চিঠিতে, সম্ভবত শেষ চিঠিতে, আমি আমার সব ভালোবাসা ও কৃতজ্ঞতা ঠেসে ঢুকিয়ে পারতাম ; আমার হৃদয়ের মধ্যে পুঞ্জীভূত অপরিসীম শ্রদ্ধা যা আমি আমার সবচেয়ে বড় এই শুভাকাঙ্ক্ষীর জন্যে পোষণ করি তা যদি পাঠাতে পারতাম এই চিঠির মধ্যে ; আমি জানি আমার কালের তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ ইংরেজ, যত দিন মৃত্যু এসে সব এলোমেলো ক'রে না দেয়, ততদিন আমি এই কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা মনের মধ্যে জমা করে রাখলাম।

ফি. শ্যানডস

ফ্রান্‌ৎস কাফকা

ফ্রান্‌ৎস কাফকা (১৮৮৩-১৯২৪) প্রাগ থেকে আগত একজন ইহুদী লেখক। তাঁর মাতৃভাষা জার্মান। তিনি আইন অধ্যয়ন করেন, ১৯০৮ থেকে তাঁর মৃত্যুকাল পর্যন্ত তিনি প্রাগের একটি ইনশিয়োরেন্স প্রতিষ্ঠানে আইনজ্ঞ কেরাণীর কাজ করেছেন। ১৯১৭ সালে তাঁর যক্ষ্মা রোগ হয়। তাঁর রচনার মধ্যেই তাঁর জীবনকথা আছে (তিনটি অসমাপ্ত উপন্যাস ও অনেক গল্প), বিশেষ ক'রে প্রাগ শহরে নিজেকে আগন্তুকের মতন মনে করা ; তাঁর ভাষা ছিল জার্মান, সেই জন্যে চেকোস্লোভাকিয়ার অধিবাসীদের কাছ থেকে তিনি ছিলেন আলাদা হয়ে ; এবং জার্মানদের কাছ থেকে পৃথক হয়ে ছিলেন তাঁর জাতি ও ধর্মের জন্য ; তার উপর তাঁর কাজ নিয়ে তিনি অসন্তোষ পুষে রাখতেন, এবং বাবাকে দেখে ভয় করতেন যিনি তাঁর পুত্রের মনে স্পর্শকাতরতা ধরতে না পেরে তার উপর খুব নির্যাতন করতেন। কাফকা নিজেই বলেছেন যে, তাঁর রচনার মূল্য ব্যক্তিগত ভাবে তাঁর নিজের কাছেই। তবুও এইসব রচনা আমাদের শতকের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রচনা-সমূহেরই অন্তর্ভুক্ত, কেননা এ কালের মানুষের গুরুতর সমস্যা নিয়েই এগুলি লেখা ; তার উপর অবাস্তবকে বাস্তবতার রূপ দেওয়ার একটা নূতন ও মৌলিক পদ্ধতি এতে প্রবর্তিত আছে। তাঁর রচনার ব্যাখ্যা দেওয়া কঠিন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এসব রচনা নিশ্চিত রূপেই অর্থহীন করে রচিত নয়। কাফকার জীবনের রহস্য উদ্বেগ হাহাকার ও একের পর এক বিফলতাই তাঁর রচনায় দার্শনিকতা ও জীবন ধারণের সমস্যা নূতন রূপ নিয়েছে। মানুষের চৈতন্যের একটা সংকট আছেই, এ'তেই মানুষ নিজেকে অনেক

সময় অপরাধী ব'লে জ্ঞান করে, এই চেতনাই তাকে জ্ঞান-অর্জনের স্পৃহা জাগায়, এবং সামাজিক পরিবেশে ক্ষমতার অধিকারী করতে চায়। কাফকার লেখায় এসব স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

বিচার

কাফকার "দি জাজমেণ্ট" (১৯১২) গল্পটির অনেক অর্থ করা যায়। এটা পিতাকে ভয় করা নিয়ে লেখা, পুত্রের কাছে যে পিতা এমন একজন ক্ষমতাবান ব্যক্তি রূপে পরিচিত হয়েছেন যে, তিনি একটা রায় ঘোষণা করতে পারেন; পিতা ও পুত্রের মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব নিয়েও এটি লেখা— একটা মৃত্যুতে এর পরিসমাপ্তি, একটা ইঙ্গিত থেকে মনে হয় সেটা পিতারও মৃত্যু। এই গল্পে দেখানো হয়েছে, লোকজনের কাছ থেকে তফাতে থাকাটা জর্জের অপরাধ, এবং তার মনে ভালোবাসা বলে কোনো অনুভূতি না থাকাটাও তার দোষ, এবং অপরাধের হাত থেকে মুক্তির একমাত্র উপায় যে মৃত্যু সে সম্বন্ধে আভাস দেওয়া হয়েছে।

বসন্তকালের এক পরিপূর্ণ সময়ের এক রবিবারের সকাল। এক তরুণ ব্যবসায়ী জর্জ বেনডেমান তাঁর বাড়ির দোতলার ঘরে বসে ছিলেন। নদীর কিনার বরাবর একই ধরণের জীর্ণ বাড়ির একটা লম্বা সার, একটি বাড়ি থেকে আর একটা বাড়ির বিশেষ পার্থক্য নেই, কেবল উচ্চতায় ও রঙে সামান্য যা পার্থক্য। তার এক পুরনো বন্ধুকে চিঠি লেখা এই মাত্র সে শেষ করল, এই বন্ধুটি এখন বিদেশে আছে। যেন স্বপ্নের আবেশে সে কাজ করছে এই ভাবে অতি ধীরে ধীরে চিঠিটা সে খামে পুরল। টেবিলের উপর দুই কনুই রেখে তার উপর ভর দিয়ে জানালা দিয়ে সে নদীর দিকে তাকিয়ে বসে ছিল। নদীর অপর পারে ব্রিজ ও পাহাড় স্নিগ্ধ সবুজ রঙে রঙিন। সেই দিকে তাকিয়ে বসে ছিল জর্জ।

সে তার বন্ধুর কথা ভাবছিল, বন্ধুটি তার নিজ গৃহে বাসের কোনো ভবিষ্যৎ নেই জেনে রাশিয়ায় পালিয়ে গিয়েছিল। এখন সেই বন্ধুটি সেণ্ট পিটার্সবার্গে একটা ব্যবসা করছে, এই ব্যবসা প্রথম দিকে বেশ লাভজনক হয়, কিন্তু পরে ধীরে ধীরে তার অবস্থা খারাপের দিকে যেতে থাকে— এ খবর সে বলত যখন সে মাঝে-মাঝে খুবই কদাচিৎ আসত। সুতরাং,

বিদেশে সে অকারণেই নিজেকে নষ্ট করছে। জর্জ শিশুকাল থেকে যে মুখটি দেখে আসছে নতুন রাখা মুখভর্তি দাড়ি দিয়েই সেই মুখটি সে ঢাকতে পারেনি, তার গায়ের চামড়ার রংও ক্রমেই এমন হলদে হয়ে যাচ্ছে যে, বোঝাই যাচ্ছে তার ভিতরে কোনো অসুখ চাপা আছে। সে নিজেই বলেছে যে, সেখানে তার নিজের দেশের লোকের সঙ্গে বিশেষ যোগাযোগ নেই, এবং রুশ পরিবারদের সঙ্গে তার কোনো সামাজিক সম্পর্ক নেই; সেই জন্যে সে পাকাপোক্ত একজন ব্যাচিলার হয়ে কাটাতেই প্রায় বাধ্য হয়ে আছে।

এমন মানুষের কাছে কী লেখা যায়, যে মানুষ যাকে বলে একেবারে বেলাইন হয়ে গিয়েছে; এমন মানুষের জন্যে দুঃখিত হওয়া চলে, কিন্তু তার কোনো সাহায্যে আসা যায় না। তাকে কি দেশে ফিরে আসতে বলা সংগত হবে, দেশে ফিরে নতুন করে সে এখানে নিজের স্থিতি করে নিক্, এবং পুরানো বন্ধুদের সঙ্গে আবার মিশে যাক—এ'তে তো কোনো বাধা নেই, পুরানো বন্ধুদের কাছ থেকে সে অনেক সাহায্যও তো পেতে পারবে। সহৃদয় ভাবেই হোক বা অনুযোগের সঙ্গেই হোক তাকে এরকম পরামর্শ দেওয়ার মানেই হচ্ছে যে, তার এতদিনের সব চেষ্টাই যে বিফল হয়েছে তাই তাকে বলা, সে বিদেশের কাজ-কারবার গুটিয়ে দেশে ফিরে এলে তার দিকে সবাই চেয়ে চেয়ে ভাববে যে উড়নচণ্ডেটি আবার ফিরে এল, কেবল তার বন্ধুরাই জানবে প্রকৃত ব্যাপারটা কী, এবং তার যেসব বন্ধু দেশে থেকেই জীবনে বেশ সফল হয়েছে, সে জানবে যে তার এই বন্ধুরা যা পরামর্শ দিয়েছে, সে কেবল তেমন কাজই করেছে। আর, এ ছাড়া, যেসব লোক তাকে আঘাত করতে চায় তাদের উদ্দেশ্যে কি সফল হবে? সম্ভবত তাকে আর দেশে ফিরিয়ে আনা সম্ভব হবে না, সে নিজেই বলেছে যে দেশের কোনো ব্যবসা-বাণিজ্যের সঙ্গেই তার কোনো যোগ নেই; এ ক্ষেত্রে বন্ধুদের পরামর্শ পেয়ে সে মনে আরও কষ্টই পাবে কিন্তু দেশে আর ফিরতে পারবে না, বিদেশেই পড়ে থাকবে। এবং এর ফলে বন্ধুদের কাছ থেকে আরও বিচ্ছিন্ন হয়েই পড়বে। কিন্তু বন্ধুদের পরামর্শই যদি সে গ্রহণ করেই তবু সে দেশে নিজেকে ঠিক খাপ খাইয়ে নিতে পারবে না, কারও কোনো বিদ্বেষের জন্যে অবশ্য নয়, অবস্থার চাপে; বন্ধুদের সঙ্গে তেমন মাখামাখিও করতে পারবে না, তাদের ছেড়েও থাকতে পারবে না; নিজেকে একটু

অপদস্তও মনে করবে; নিজের বলতে কোনো বন্ধু আছে বা দেশ আছে এমন কথাও বলতে পারবে না। এমন অবস্থায়, বিদেশে সে যেমন আছে তেমনি থেকে যাওয়াই কি ঠিক নয়? সব দিক বিচার-বিবেচনা করে দেখলে কে বলতে পারে যে, দেশে এসে সে জীবনে সফল হতে পারবে?

এইসব কারণেই, মনে করা যাক যে তার সঙ্গে নিয়মিত পত্রলাপ কেউ করতে চায়; কিন্তু দূরদেশের কোনো পরিচিত জনকে যেমন খোলাখুলিভাবে প্রকৃত খবর পাঠানো যেতে পারে তেমন খবর কি তাকে জানানো যাবে? তার গতবারের দেশে আসার পর থেকে তিন বছর কেটে গেল, এর জন্যে সে যে ওজর দেখিয়েছে তা তেমন জোরালো নয়, সে বলেছে যে রাশিয়ার রাজনৈতিক অবস্থা বেশ অনিশ্চিত, এবং খুব ছোট কারবারিরও অল্প দিনের জন্যে হলেও এখানে না থাকাটা ঠিক না; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে হাজার-হাজার রাশিয়ান কিন্তু বেশ স্বচ্ছন্দেই বিদেশে পর্যটন করে বেড়াচ্ছে। কিন্তু এই তিন বছরের মধ্যে জর্জের জীবনে অনেক পরিবর্তন ঘটে গিয়েছে। দু বছর আগে তার মা মারা গিয়েছেন, তারপর থেকে সে ও তারা বাবা দুজনে মিলে ঘর-সংসার চালাচ্ছেন, তার বন্ধুকে এ খবর অবশ্যই জানানো হয়েছিল এবং সেই বন্ধুটি এমন নিরুত্তাপ ভাবে তার সহানুভূতি জানিয়েছেন যে এই ঘটনার গুরুত্ব সে সেই দূরদেশে থেকে কিছুই বুঝতে পারে নি। তারপর থেকেই জর্জ তার ব্যবসায়ে ও অন্য কাজে আরও দৃঢ়তার সঙ্গে মনোনিবেশ করে।

তার মা যখন বেঁচে ছিলেন তখন ব্যবসায়ের যাবতীয় ব্যাপার সম্বন্ধে তার বাবা তাঁর নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী সমস্ত কাজ করতে চাওয়ার ফলে জর্জের মধ্যে কোনো কাজের উদ্যম বা অনুপ্রেরণা গড়ে উঠতে পারে নি; মা মারা যাবার পর থেকে তার বাবার মধ্যে তেড়িয়া-ভাব একটু যেন কমেছে, কিন্তু ব্যবসা নিয়ে তিনি অবশ্য বেশ মেতে আছেন। এর কারণ বোধ হয় এই যে, ব্যবসায়ের আচমকা উন্নতি ঘটে গিয়েছে, এটা আশা করা গিয়েছিল অবশ্য; কিন্তু এই দু'বছরের মধ্যে ব্যবসায়ের আশাতীত উন্নতি হয়েছে, কর্মীর সংখ্যা করতে হয়েছে দ্বিগুণ, উৎপাদন যে বেড়েছে পাঁচগুণ এতে কোনো সন্দেহ নেই; এবং এর আরো উন্নতি হবে।

কিন্তু জর্জের বন্ধুটি এতটা উন্নতির খবর পায় নি। আগে অনেক বারই, এবং শোকপ্রকাশ ক'রে লেখা তার শেষ চিঠিতেও, সে জর্জকে রাশিয়ায় চলে

আসবার জন্যে বলেছে, এবং জর্জ যে-ব্যবসায়ে লিপ্ত বিশেষ করে সেই ব্যবসায়ে রাশিয়াতে উন্নতির অনেক সম্ভাবনা, তাও তাকে জানিয়েছে। সে যে সব হিসেব দিয়েছিল, জর্জদের ব্যবসায়ের এখনকার অবস্থার কাছে তা নেহাতই অকিঞ্চিৎকর। এসব সত্ত্বেও জর্জ তার বন্ধুকে তাদের সাফল্যের খবর দেয় নি, এখন যদি দু বছর আগের অবস্থা থেকে সব অবস্থার কথা সে জানায় তাহলে তা একটু অশোভনই মনে হবে।

সেই জন্যে জর্জ তার বন্ধুকে সামান্য-সামান্য দু চারটে কথাই লিখত, যে সব কথা তার রবিবারের ছুটির অলস অবসরে এলোমেলোভাবে তার মনে আসত। তাঁর বন্ধুটি তার স্বদেশের এই শহরটি সম্বন্ধে যে ধারণা মনে পোষণ করে রেখেছে, তা যেন ক্ষুণ্ণ হয়ে না যায় সেই চেষ্টা ছিল জর্জের। এ'তে এমন ব্যাপার ঘটল যে, দীর্ঘ দিন অন্তর অন্তর লেখা তিনটি চিঠিতে জর্জ তার বন্ধুকে এক নগণ্য ব্যক্তির সঙ্গে তেমনি নগণ্যা এক মেয়ের বিবাহ প্রস্তাবের খবর দিল; কিন্তু জর্জ যা ভাবেনি তাই হল, তার বন্ধুটি এই স্মরণীয় ব্যাপাটি সম্বন্ধে বেশ কৌতূহলী হয়ে উঠল।

তবুও জর্জ এই ধরণের কথাই লিখতে লাগল, কিন্তু সে নিজেই যে এক সঙ্গতিসম্পন্ন ঘরের মেয়ে ফ্রাউলিন ফ্রিয়েডা ব্র্যাণ্ডেন ফেল্ড-এর সঙ্গে মাস-খানেক আগে বাগ্‌দত্ত হয়েছে এ কথা তাকে জানাল না। জর্জ তার এই বাগ্‌দত্ত বধূটির সঙ্গে তার বন্ধুর ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করত, আর চিঠি-পত্রের মধ্যে দিয়ে তাদের মধ্যে যে অদ্ভুত রকমের একটা সম্পর্ক গড়ে উঠেছে তাও বলত। মেয়েটি বলল, "সে তবে আমাদের বিয়েতে আসছে না। কিন্তু আমি তোমার সব বন্ধুকে চিনতে চাই।" "আমি ওকে বিব্রত করতে চাইনে," জর্জ উত্তর দিল এবং বলল, "আমাকে ভুল বুঝো না, আমার অন্তত মনে হচ্ছে সে হয়তো আসবে, কিন্তু সে মনে করতে পারে যে তাকে জোর করে আনা হচ্ছে, এতে সে কষ্ট পাবে; সে হয়তো আমাকে হিংসে করবে, অবশ্যই সে অসন্তুষ্ট হবে, সে সন্তুষ্ট হতে পারে তার জন্যে এমন কিছুই করতে না পারলে তাকে আবার একা-একাই ফিরে যেতে হবে। একা-একাই—এ কথার তাৎপর্য বুঝলে?" "হ্যাঁ, বুঝলাম। কিন্তু সে কি অন্যভাবে আমাদের বিয়ের খবর পাবে না?" "আমি তা অবশ্যই বাধা দিতে পারব না, কিন্তু সে যেভাবে বাস করে তাতে খবর না পাবারই কথা।" "তোমার বন্ধুরা যদি এই ধরণের, তাহলে জর্জ, তোমার একটা মেয়ের সঙ্গে এ রকম সম্পর্ক করাই

ঠিক হয় নি।" "বেশ তো, এজন্যে আমি একাই দায়ী নই, আমরা দুজনেই তো দায়ী, কিন্তু এখন তো অন্য পথ নেওয়া যায় না।" এবং চুম্বনের ফাঁকে-ফাঁকে গভীর নিশ্বাস ফেলতে-ফেলতে মেয়েটি বলতে লাগল, "সে যাই হোক। আমার সব কেমন গোলমেলে মনে হচ্ছে।" জর্জ মনে করল সে তার বন্ধুকে খবরটি দিলে সে বিশেষ কোনো অসুবিধেয় পড়বে না। জর্জ মনে-মনে বলতে লাগল, "আমি ঠিক এই প্রকৃতিরই লোক, এবং আমি যেমন আমাকে ঠিক তেমন মানুষ হিসাবেই তাকে বন্ধু ব'লে গ্রহণ করতে হবে। আমি নিজেকে এখন অন্যভাবে গড়ে নিতে পারিনে যাতে আমার মধ্যে সে তার পছন্দমত বন্ধু পেয়ে যেতে পারে!"

বস্তুত পক্ষে সে তার বন্ধুকে খবর দিল। লম্বা একটা চিঠি লিখল রবিবারের সারা সকাল ব'সে, সে তার প্রণয়ের সফলতার কথাও লিখল এই ভাবেঃ "এখন পর্যন্ত আমার জীবনের সবচেয়ে শুভ সংবাদটি তোমাকে জানাই নি। ফ্রাউলিন ফ্রিয়েডা ব্র্যাণ্ডেনফেল্ড নামের এক সঙ্গতিসম্পন্ন ঘরের মেয়ের সঙ্গে আমি বাগ্দত্ত হয়েছি; তুমি চলে যাবার অনেক দিন পরে তারা এখানে এসেছে, এইজন্যে তুমি তাকে চিনবে না। পরে তোমাকে তার সম্বন্ধে অনেক কথা বলার সময় পাব; আজ তোমাকে শুধু এই কথা জানাই যে, আমি খুব খুশি। তোমার ও আমার মধ্যের সম্পর্কে এখন এই প্রভেদ হল যে, তুমি একজন সাধারণ বন্ধুর বদলে এবার একজন সুখী বন্ধু পেলে। তার উপর আমার বাগ্দত্তা এই বধূটির মধ্যে একজন স্ত্রীলোকের অকৃত্রিম বন্ধুত্ব পাবে, একজন অকৃতদার ব্যক্তির কাছে যার দাম কম না। আমার এই বধূটি তোমাকে তাঁর শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন, তিনি নিজেই তোমাকে কিছুদিনের মধ্যেই চিঠি দেবেন। জানি, তুমি আমাদের এখানে আসতে পারছ না তার অনেক কারণ আছে, কিন্তু আমাদের বিবাহ-অনুষ্ঠানে যোগ দেবার জন্যে সব বাধা কি তুচ্ছ করে দিতে পার না? সে যাই হোক, অন্যের সুবিধার কথা না ভেবে নিজের কোনো অসুবিধা না ঘটিয়ে তুমি যা ভালো মনে করবে তাই কোরো কিন্তু।"

এই চিঠি হাতে নিয়ে জর্জ তার লেখার টেবিলে অনেকক্ষণ বসে রইল, চেয়ে রইল জানালার দিকে। বাইরে থেকে পথচারী পরিচিত জনেরা তাকে হাতে তুলে অভিনন্দন জানাল, অন্যমনস্কতার দরুণ সে প্রতি-নমস্কার জানাতে পারল না।

অবশেষে চিঠিটা পকেটে পুরে নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে হল্-ঘর পেরিয়ে সে তার বাবার ঘরে এল—কয়েক মাসই হয়ে গেল এ-ঘরে সে আসেনি। এ ঘরে আসার তার দরকারই ছিল না, কেননা ব্যবসায়-সংক্রান্ত কাজের সময় বাবার সঙ্গে তার রোজই দেখা হচ্ছে, এবং এক হোটেলে দুজনে এক সঙ্গেই দুপুরের খানা খাচ্ছে। বিকেলের দিকে অবশ্য দুজনে নিজের নিজের অভিপ্রায়-অনুসারে বেরিয়ে যায়। কিন্তু এ সত্ত্বেও জর্জ যেদিন তার বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করতে না যেত, এবং সম্প্রতি তার বাগ্দত্তাটির সঙ্গে দেখা করতে যে দিন না যেত, সেদিন একই বসার-ঘরে সে ও তার বাবা বসে-বসে পড়ত খবরের কাগজ।

রোদ-ঝলমলে এই সকাল বেলায় তার বাবার ঘর এমন অন্ধকার দেখে জর্জের অবাকই লাগল। ওধারের ঐ সরু উঠোনের ওধারের ঐ উঁচু প্রাচীরটার ছায়ায় এমন হয়েছে। তার বাবা এক কোণে জানালার ধারে বসে আছেন, সেখানে তার মায়ের অনেক স্মৃতিচিহ্ন ঝুলছে; তিনি খবরের কাগজ একটু কাত্ করে ধরে আছেন, কেননা তাঁর একটা চোখ একটু খারাপ। টেবিলে সকালের খাবারের ভুক্তাবশিষ্ট পড়ে আছে, বেশি-কিছু তিনি খাননি বলে বোঝা যাচ্ছে।

তার বাবা চট ক'রে দাঁড়িয়ে বললেন, "জর্জ।" তাঁর গায়ের ভারি ড্রেসিং গাউন দু দিকে ছড়িয়ে তিনি পায়চারি করতে লাগলেন। জর্জ মনে-মনে বলতে লাগল, "আমার বাবা এখনো একজন শক্তিশালী মানুষ।" তার পর সে শব্দ করেই বলল, "এখানে অসহ্য অন্ধকার।"

তার বাবা উত্তরে বললেন, "হ্যাঁ। এখানে বেশ অন্ধকার।"

"তুমি জানালাও বন্ধ করে দিয়েছ?"

"আমি এই রকমই পছন্দ করি।"

"হ্যাঁ। বাইরেও বেশ গরম।" যেন তার আগের মন্তব্য টেনেই সে এ কথা বলল, তার পর বসে পড়ল জর্জ।

তার বাবা প্রাতরাসের ডিশগুলি টেবিল থেকে সরিয়ে সেগুলি তাকে তুলে রাখলেন।

জর্জ এই বৃদ্ধ মানুষটির গতিবিধি লক্ষ্য করছিল, তার পর বলল, "আমি তোমাকে এই কথা বলার জন্যে এসেছি যে আমি আমাদের বিবাহের খবরটা সেণ্ট পিটার্সবার্গে পাঠিয়ে দিচ্ছি।" চিঠিটা সে পকেট থেকে একটু তুলেই পকেটের মধ্যে ছেড়ে দিল।

"সেণ্ট পিটার্সবার্গে ?" তার বাবা জিজ্ঞাসা করলেন।

"সেখানে আমার বন্ধুর কাছে।" কথাটা বলেই জর্জ তার বাবার মুখের দিকে তাকাল। ব্যবসায়ের কাজ কর্মের সময় তিনি আলাদা লোক, কিন্তু এখন তিনি শক্ত হয়ে বসে বুকের উপরে আড়াআড়ি ভাবে দুই হাত রেখে কী-যেন ভাবছেন।

"ও, আচ্ছা! তোমার বন্ধুর কাছে!" কথাটার উপর আশ্চর্য জোর দিয়ে তার বাবা বললেন।

"তুমি জান, প্রথমে আমি এ-খবর তাকে জানাতে চাই নি। এখন বন্ধুটির কথা বিবেচনা করেই জানাতে চাই। তুমি তো জানোই যে, সে একজন সাধারণ-প্রকৃতির মানুষ না। আমি ইচ্ছে করেছিলাম যে, অন্য কেউ তাকে খবরটা দিক্, কিন্তু তার সঙ্গে কারও বিশেষ যোগ নেই, সেইজন্যে এটাও সম্ভব না। কিন্তু আমি নিজে তাকে কিছুতে জানাতে চাই নে।"

"এখন তুমি বুঝি তোমার মত বদলেছ?" খবরের কাগজ জানালার উপর বিস্তৃত করে দিয়ে এবং ঐ কাগজে চোখ প্রায় ঢেকে তার বাবা তাকে জিজ্ঞাসা করলেন।

"হ্যাঁ। ব্যাপারটা আমি ভেবে দেখছিলাম। আমি ভাবছিলাম, সে যদি আমার প্রকৃত বন্ধু হয় তাহলে আমার এই আনন্দের সংবাদে সে'ও আনন্দ পাবে। সেইজন্যে খবরটা আর তার কাছে গোপন রাখতে চাইনে। কিন্তু চিঠিটা ডাকে দেওয়ার আগে তোমাকে জানাতে চাই।"

"জর্জ", তার বাবা তাঁর দন্তহীন মুখ বিস্ফারিত করে বললেন, "জর্জ, আমি যা বলছি, শোনো। তুমি এই ব্যাপারে আমার সঙ্গে আলোচনা করতে এসেছ। এতে নিঃসন্দেহে তোমার মনের উদারতারই প্রমাণ হচ্ছে। কিন্তু যতক্ষণ তুমি আমাকে পুরো সত্যটা না বলছ, ততক্ষণ এটা কিছুই না, এটা একেবারে ভুয়ো। যেসব কথার উল্লেখ এখানে দরকার নেই, আমি তা খুঁচিয়ে বা'র করতে চাইনে। তোমার মায়ের মৃত্যুর পর থেকে কয়েকটা কাজ এমন ভাবে করা হয়েছে যা সংগত হয়নি। হয়তো সময়মত সবই খুলে বলতে হবে, এবং হয়তো তা বেশ তাড়াতাড়িও হতে পারে। ব্যবসায়ে এমন-সব ঘটনা ঘটছে, যা আমি জানিনে, হয়তো আমাকে না-জানিয়ে করার জন্যেই তা করা হচ্ছে না, আমাকে গোপন ক'রে করা হচ্ছে এমন কথা আমি বলছিনে, আমি সব জিনিসের সঙ্গে এখন আর তাল রাখতে পারিনে, আমার স্মৃতিশক্তি

কমে আসছে, সব জিনিসে আমি চোখ রাখতেও পারিনে। প্রথমত, এটা হচ্ছে প্রকৃতির অভিশাপ, এবং দ্বিতীয়ত, তোমার মায়ের মৃত্যুতে তুমি যতটা আঘাত পেয়েছ, আমি পেয়েছি তার চেয়ে বেশি। কিন্তু এখন যখন আমরা ঐ চিঠি নিয়ে কথা বলছি তখন আমাকে আর প্রবঞ্চনা কোরো না, জর্জ। এটা একটা তুচ্ছ ব্যাপার, এর কথা না-তুললেও চলত আমাকে প্রবঞ্চনা কোরো না। সেণ্ট পিটার্সবার্গে সত্যিই কি তোমার কোনো বন্ধু আছে?"

বিব্রত বোধ ক'রে জর্জ উঠে দাঁড়াল। বলল, "আমার বন্ধুদের কথা বাদ দাও। আমার হাজারটি বন্ধু মিলেও আমার তুল্য হতে পারবে না। তোমার সম্বন্ধে আমি কী ভাবি তা কি তুমি জান? তুমি নিজের প্রতি তেমন যত্ন নিচ্ছ না। কিন্তু বৃদ্ধবয়সে যত্ন নিতেই হবে। তুমি বেশ ভালোভাবেই জান যে, ব্যবসায়ে তোমাকে ছাড়া আমার চলবে না; সেই ব্যবসায় যদি তোমার স্বাস্থ্যের ক্ষতি করে তাহলে আমি কালই চিরদিনের জন্যে সেই ব্যবসায় গুটিয়ে ফেলার জন্যে প্রস্তুত। কিন্তু তা সম্ভব না। তোমার জীবনধারণের একটা বদল আনতে হবে। কেবল বদল নয়, একটা ওলট-পালট। তুমি এখানে অন্ধকারের মধ্যে বসে থাক, কিন্তু বসার ঘরে তো যথেষ্ট আলো। তুমি সকালের খাবার পুরোটা খাও না, তোমার শক্তি বজায় রাখার মতন খাবার খাও না, একটা কামড় দিয়েই রেখে দাও। তুমি জানলা বন্ধ ক'রে বসে থাক, কিন্তু খোলা হাওয়া তোমার দরকার। না বাবা! এরকম চলবে না। আমি ডাক্তার ডাকব, তাঁর পরামর্শ অনুসারে চলতে হবে। আমি তোমার ঘরটা বদল করব। তুমি সামনের ঘরে যেতে পার, আমি এঘরে চলে আসতে পারি। তুমি এ বদল বুঝতেই পারবে না, তোমার সঙ্গে সঙ্গে তোমার সব জিনিসই ঐ ঘরে যাবে। কিন্তু এসব করতে একটু সময় লাগবে, আমি এখন কিছুক্ষণের জন্যে তোমাকে বিছানায় শুতে বলব, এখন তোমার বিশ্রাম খুব দরকার। এনো আমি ধড়াচুড়া খুলে দিচ্ছি, দেখ, আমি পারব। এখনই যদি তুমি সামনের ঘরে যাও তবে এখনকার মত আমার বিছানাতেই শুতে পার। এটাই সব চেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ হবে।"

জর্জ তার বাবার কাছে ঘনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়াল, তার বাবা তখন তাঁর মাথা তাঁর বুকের উপর নীচু করে বসে, মাথার এলোমেলো সাদা চুল ঝুলে পড়েছে।

তিনি একটুও না ন'ড়ে কেবল বললেন, "জর্জ।"

জর্জ তখনই তার বাবার পাশে হাঁটু গেড়ে বসল, বুড়ো মানুষটির ক্লান্ত

মুখের দিকে চেয়ে সে দেখল তাঁর চোখের তারা-ছুটি বড় হয়ে উঠেছে, চোখের ছুই কোণ থেকে তারা-ছুটি স্থির ভাবে চেয়ে আছে।

"পিটার্সবার্গে তোমার কোনো বন্ধু নেই। তুমি অন্যকে অপদস্ত করেই আসছ, এমন কি আমাকেও বাদ দাও নি। সেখানে কী ক'রে তোমার বন্ধু থাকতে পারে? আমি বিশ্বাস করি নে।"

জর্জ তার বাবাকে চেয়ার থেকে টেনে তুলে তাঁর গা থেকে ড্রেসিং গাউন খুলে দিতে-দিতে বলল, "বাবা, আগের কথা একটু ভেবে দেখ। আমার বন্ধুটির সঙ্গে আমাদের শেষ দেখা হবার পর প্রায়-তিন বছর কেটে গেল। আমার মনে আছে, তুমি তাকে বিশেষ পছন্দ করতে না। অন্তত ছুবার আমি এমন ব্যবস্থা করেছি যাতে তোমার সঙ্গে তার দেখা না হয়, যদিও তখন সে আমার ঘরে আমার সঙ্গে বসে ছিল। আমার বন্ধুকে তোমার অপছন্দ করার কারণও আমি বেশ ভালো ক'রেই জানি—আমার বন্ধুটির রকম-সকম একটু অদ্ভুত ধরণের। কিন্তু পরে তুমি তাকে বেশ মেনে নিয়েছিলে। তুমি তার কথা শুনেছিলে, এবং মাথা নেড়ে তাকে কয়েকটা প্রশ্নও করেছিলে—এজন্যে আমি গর্ববোধ করেছি। তুমি একটু ভেবে দেখলেই সব মনে করতে পারবে। রুশ বিপ্লব সম্বন্ধে সে অবিশ্বাস্য রকম গল্প বলত। যেমন, ধরো সে তার ব্যবসায়-সংক্রান্ত কাজে যখন কিয়েভে গিয়েছিল, তখন সে এক দাঙ্গার মধ্যে নাকি পড়ে, তখন সে এক ঝুল-বারান্দার উপরে এক ধর্মযাজককে দেখে, যিনি তাঁর হাতের তালুতে রক্ত দিয়ে ক্রুশ-চিহ্ন এঁকে সেই হাত তুলে জনতার কাছে নাকি আবেদন জানাতে থাকেন। এই গল্পটা তুমি নিজেই ছু-এক বার বলেছিলে।"

ইতিমধ্যে জর্জ তার বাবার সূতীর অন্তর্বাসের উপরে পরা উলের জামা-কাপড় খুলে ফেলতে পেরেছে, পায়ের মোজাও খুলেছে। এই অন্তর্বাস বেশ ময়লা হয়ে গিয়েছে দেখে সে এই অবহেলার জন্যে নিজেকেই ভর্ৎসনা করতে লাগল। তার বাবার অন্তর্বাস যাতে পরিষ্কার থাকে সেদিকে লক্ষ্য রাখা তার উচিত ছিল। ভবিষ্যতে তার বাবার জন্যে কি কি ব্যবস্থা করতে হবে সে বিষয়ে তার বাগদত্তা বধূর সঙ্গে স্পষ্টভাবে সে এখনো কোনো আলোচনা করে নি। এর কারণ তারা নীরবেই বুঝে নিয়েছিল যে এই বুড়ো মানুষটি পুরনো বাড়িটায় একা-একাই বাস করবেন। কিন্তু এখন সে দ্রুত এই সিদ্ধান্ত করে ফেলল যে, তা হবে না। তার বাবা তার সঙ্গেই বাস করবেন। খুব ভালো

ভাবে দেখে সে বুঝতে পারল যে, সে তার বাবার দিকে উপযুক্ত ভাবে নজর দেবার যে কথা ভাবছে, তাতে বুঝি বড় দেরি হয়ে গেল।

বাবাকে দুহাতে বেষ্টন করে ধ'রে সে তাঁকে বিছানায় নিয়ে গেল। সে যখন দেখল যে, সে তার বাবাকে নিয়ে যখন বিছানার দিকে যাচ্ছে তখন তার বাবা তার ঘড়ির চেন্ নিয়ে খেলা করছেন তখন সে যেন একটু ভয় পেল। তিনি ঘড়ির চেন্ এমন শক্ত করে ধ'রে ছিলেন যে, সহজেই সে তার বাবাকে শুইয়ে দিতে পারছিল না।

কিন্তু তিনি বিছানায় শোয়া মাত্র সব স্বাভাবিক হয়ে গেল। নিজের গায়ে তিনি নিজেই কম্বল ঢাকা দিয়ে দিলেন, আর কাঁধের উপর দিয়ে সচরাচর কম্বল টেনে নেন তার থেকে একটু বেশিই টেনে নিলেন। তিনি জর্জের দিকে এমন ভাবে তাকালেন যাকে অপ্রসন্ন দৃষ্টি বলা যায় না।

বাবার দিকে চেয়ে একটু মাথা নেড়ে জর্জ জিজ্ঞাসা করল, "আমার বন্ধুটিকে এখন মনে করতে পারছ ?"

"ভালোভাবে কম্বল গায়ে দিতে পেরেছি তো ?" তারা বাবা জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি যেন ঠিক বুঝতে পারছিলে না যে, পায়ের দিকে কম্বল ঠিকমত ভাঁজ করে নেওয়া গিয়েছে কি না।

"বিছানায় তবে একটু আরাম পাচ্ছ ?" এই কথা ব'লে জর্জ কম্বলটি তাঁর গায়ে ভালো ক'রে গুজে দিতে লাগল।

"ভালোভাবে নিজেকে ঢাকা দিতে পেরেছি তো ?" তার বাবা আবার জিজ্ঞাসা করলেন, তিনি যেন উত্তরটা শোনার জন্যে বেশ উৎসুক বলে মনে হল।

"ভাববেন না। ভালো ভাবেই ঢাকা দিয়েছেন।"

"না।" চীৎকার ক'রে উঠলেন তার বাবা, পুরো উত্তরটা তিনি শুনতে চাইলেন না, সমস্ত শক্তি দিয়ে গায়ের উপর থেকে ছুড়ে ফেললেন কম্বল, হঠাৎ সোজা হয়ে উঠে বসলেন বিছানায়। এক হাত দিয়ে বিছানার চাল ছুঁয়ে নিজেকে সোজা রাখলেন, টাল সামলে নিলেন।

তিনি বলতে লাগলেন, "ছোকরা, তুমি আমাকে ঢেকে রাখতে চাও, কিন্তু এখনো আমি ঢাকা পড়তে রাজি না। এইটেই যদি আমার শেষ শক্তি হয়ে থাকে তাহলে এইটেই তোমার পক্ষে যথেষ্ট, তোমার পক্ষে একটু বেশিই বরঞ্চ। আমি তোমার বন্ধুকে চিনবনা কেন। সে আমার কাছে

আমার ছেলের মতনই। এই জন্যেই এতদিন ধরে তুমি তার সঙ্গে লুকোচুরি খেলছ। তা ছাড়া আর কী কারণ থাকতে পারে? তুমি কি ভেবেছ যে আমি তার জন্যে দুঃখ পাই নে? এই জন্যেই তুমি তোমার আপিসে নিজেকে একা রেখেছিলে—কর্তাবাবু এখন ব্যস্ত আছেন, তাঁকে বিরক্ত করা ঠিক হবে না—যাতে তুমি তোমার মিথ্যা কথা দিয়ে ভরা রাশিয়ার চিঠিগুলো লিখতে পার। তাঁর ছেলেকে কী ক'রে চিনতে হয় তা জানার জন্যে কোনো বাবাকে কারো কাছ থেকে শিক্ষা নিতে হয় না। এখন তুমি বুঝতে পেরেছ যে, তুমি তাঁকে কাবু করে এনেছ, এতটাই কাবু করেছ যে এখন তুমি তাঁর উপরে চেপে বসলেও তিনি নড়তে পারবেন না। এই রকম সময়ে আমার সুযোগ্য পুত্রটি বিবাহ করবে বলে স্থির করে বসেছে।"

জর্জ এক দৃষ্টে তার বাবার দিকে চেয়ে রইল। তার সেণ্ট পিটার্সবার্গের যে বন্ধুকে তার বাবা হঠাৎ এত ভালো ভাবে চিনে ফেলেছেন, কল্পনার চোখে সেই বন্ধুকে সে এখন দেখতে লাগল। রাশিয়ার ঐ জনারণ্যের মধ্যে সে তাকে দেখতে পেল। সে তাকে দেখতে পেল একটা লুণ্ঠিত শূন্য গুদাম ঘরের দরোজায়। সে তাকে দেখতে পেল তার শো-কেশ-এর ভগ্নস্তূপের মধ্যে, তার যাবতীয় পণ্যের ভগ্নদশার মধ্যে সে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। ওকে অত দূরে চলে যেতে হল কেন।

তার বাবা চেঁচিয়ে উঠলেন, "আমার দিকে নজর দাও।" এ আদেশ শুনে জর্জ তাঁর দিকে এগিয়ে যেতে-যেতে মাঝপথে থেমে দাঁড়াল।

তার বাবা বলতে লাগলেন, "কারণ মেয়েটা তার স্কার্ট উঁচু করে তুলে ধরেছিল, কারণ ঐ জঘন্য মেয়েটা তার স্কার্ট এমনি করে তুলে ধরেছিল," ব'লে তিনি তুলে ধরার ভঙ্গি ক'রে তাঁর শার্ট এত উঁচুতে তুললেন যে, যুদ্ধে তাঁর উরুতে যে ক্ষত হয়েছিল সেই ক্ষতচিহ্নটা দেখা গেল, "কারণ এইভাবে সে তুলেছিল তার স্কার্ট, আর অমনিই তুমি সব সাব্যস্ত করে ফেলেছ, আর কোনো কিছুই যাতে তোমার কোনো বিঘ্ন না ঘটায় সেজন্য তুমি তোমার মায়ের স্মৃতিও কলঙ্কিত করেছ, বন্ধুকে প্রবঞ্চনা করেছ, আর বাবাকে বিছানার সঙ্গে এমনভাবে এঁটে দিতে চেয়েছ যে, সে যেন আর নড়তে না পারে। কিন্তু নড়তে সে পারে। কি, পারে না?"

তিনি কিছুর উপর ভর না-দিয়েই উঠে দাঁড়ালেন, আর পা ছুঁড়তে লাগলেন। তিনি যেন প্রদীপ্ত হয়ে উঠলেন।

তার বাবার কাছ থেকে যতটা দূরে সম্ভব ততটা দূরে সরে গেল জর্জ। অনেক দিন আগেই সে বেশ ভালোভাবেই ঠিক করে রেখেছিল যে, তার বাবার সামান্যতম গতিবিধির উপরেও সে নজর রাখবে, কেননা হঠাৎ কোন্ দিক থেকে তার উপরে আক্রমণ হয় তার কোনো স্থিরতা নেই, পিছন থেকে বা উপর থেকে তার উপর এসে পড়তে পারে কিল বা ঘুষি। এখন তার সেই অনেক কাল আগের সংকল্পের কথা—যা সে প্রায় ভুলেই গিয়েছিল—তার মনে পড়ে গেল, আবার ভুলে গেল। ছুঁচে সুতো পরাবার সময় মানুষের যেমন হয় আর-কি।

তার বাবা আবার বলতে লাগলেন, তাঁর তর্জনী দেখিয়ে-দেখিয়ে বেশ জোরের সঙ্গে তিনি বলতে লাগলেন, "কিন্তু তুমি বঞ্চনা করতে পার নি তোমার বন্ধুকে, আমি তার প্রতিনিধি হয়ে এখানে এই এখন হাজির আছি।"

জর্জ বলে ফেলল, "তুমি একটা ভাঁড়।" এ কথা সে না-বলে পারল না, এ কথা বলার বিপদ সে বুঝতে পারল অবশ্য।

"নিশ্চয়, আমি ভাঁড়ের অভিনয়ই করছিলাম। ভাঁড়ামি--এটা একটা বেশ লাগসই কথা হয়েছে। একটা বুড়ো বিপত্নীক মানুষের পক্ষে এ ছাড়া আর শান্তি কোথায়। বলো, আমাকে বলো। এ কথার তুমি যখন উত্তর দেবে তখন তুমিই একমাত্র আমার জীবিত সন্তান। বলো, আমায় আর কী শান্তি আছে। আমার সেই পিছনের দিকের ঘরে, অবাধ্য কর্মচারীদের দ্বারা বিষাক্ত করা আবহাওয়ায়, মজ্জায়-মজ্জায় যে বুড়ো হয়ে গিয়েছে তার সেই বার্ধক্য নিয়ে কী আর আছে তার শান্তি? আর, আমার পুত্রটি কিনা পৃথিবীর রাস্তায় চলেছে গটগট ক'রে, আমি তার জন্যে যে-যে ব্যবস্থা করে রেখেছি তার সব দফা রফা ক'রে, বিজয়ীর আনন্দে উৎফুল্ল সে, একজন মহামান্য ব্যবসায়ীর মত গম্ভীর মুখে তার বাবার কাছ থেকে সরে যাচ্ছে সে! তুমি কি মনে কর যে, আমি তোমাকে ভালোবাসতে পারতাম না, আমাকে তুমি উপেক্ষা করা সত্ত্বেও?"

জর্জ ভাবল সে এখন একটু ঝুঁকে দাঁড়াক, যদি তার বাবা উল্টে প'ড়ে নিজেকে জখম করে ফেলেন! তার মনের এই চিন্তা তার কানের কাছে যেন ফিসফিস করতে লাগল।

তার বাবা সামনের দিকে একটু ঝুঁকলেন, কিন্তু উল্টে পড়লেন না। তিনি

যতটা ভেবেছিলেন জর্জ তাঁর ততটা কাছে এল না দেখে তিনি আবার সোজা হয়ে দাঁড়ালেন।

"যেখানে আছ সেইখানেই থাক। তোমাকে দিয়ে আমার আর কোনো দরকার নেই। তুমি মনে করছ এখানে আসবার মতন যথেষ্ট শক্তি তোমার আছে, আর ইচ্ছে ক'রেই তুমি কাছে আসছ না। অতটা নিশ্চিত হোয়ো না। আমি এখনো তোমার থেকে বেশি শক্তি রাখি। আমি নিজের ইচ্ছায় হয়তো তোমাকে ছেড়ে দিতে পারতাম, কিন্তু তোমার মা আমাকে এমন শক্তি দিয়েছিলেন যে, আমি তোমার বন্ধুর সঙ্গে বেশ মধুর সম্পর্কই ক'রে নিয়েছিলাম, আর আমার এই পকেটের মধ্যেই আছে তোমার সব খরিদ্দারেরা।"

জর্জ মনে-মনে বলল, "তাঁর শার্টেও পকেট আছে।" এবং তার মনে হল এই মন্তব্য দিয়েই সে তাঁকে পৃথিবীর মধ্যে এক অবিশ্বাস্য চরিত্র ব'লে প্রতিপন্ন করতে পারবে। এক মুহূর্তের জন্যে মাত্র সে এ কথা ভাবল, কেননা সব জিনিস সে কেমন-যেন ভুলে যায়।

"তোমার বধূটির হাত ধ'রে আমার কাছে আসার চেষ্টা ক'রে দেখ। তোমার পাশ থেকে আমি তাকে ঝাড়ু দিয়ে সরিয়ে দেব। তুমি জান না, কী ভাবে তা করব।"

জর্জ এমন মুখভঙ্গি করল যে, সে এসব বিশ্বাস করে না। তার বাবা মাথা নেড়ে জানান দিলেন যে, তিনি যা বলেছেন বর্ণে-বর্ণে তা সত্যি।

"তোমার বিয়ের ব্যাপারটা তোমার বন্ধুকে জানাবে কিনা এ কথা আমার কাছে জানতে এসে তুমি আজ আমার সঙ্গে বেশ মজা করেছ। সে সব জানে, মূর্খ তুমি, সে কিন্তু সব জানে। আমি তাকে অনেক চিঠি লিখেছি: আমার লেখার সাজসরঞ্জাম আমার কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে যেতে তুমি ভুলে গেছ। এইজন্যেই এতদিন ধ'রে সে আর এখানে আসছে না, তুমি যতটা জান তার শতগুণ বেশি সে জানে সব ব্যাপারটা। তোমার চিঠি না খুলেই সে তার বাঁ হাত দিয়ে সেগুলি চটকায়, আর ডান হাত দিয়ে তুলে ধ'রে আমার চিঠি পড়ে।"

উৎসাহে অধীর হয়ে তার বাবা নিজের মাথার উপরে হাত নাড়তে লাগলেন।

চেঁচিয়ে বলে উঠলেন, "সে হাজার গুণ বেশি ভালো ক'রে সব জানে।

"দশ হাজার গুণ।" বাবার সঙ্গে একটু রসিকতা করবার জন্যে জর্জ

বলল, কিন্তু তার মুখের কথাটা মারাত্মক ভাবে তার আন্তরিক কথার মতই শোনাল।

"বছরের পর বছর আমি তোমার কাছ থেকে এই রকম কথা শোনার জন্যেই অপেক্ষা করছি। তুমি কি মনে কর যে আমি অন্য কোনো বিষয় নিয়ে বিভোর থাকি, তুমি কি মনে কর যে, আমি খবরের কাগজ পড়ি? দেখ, চেয়ে দেখ!" বলে তাঁর বিছানায় পড়ে-থাকা কাগজের একটা পাতা তার দিকে তিনি ছুড়ে দিলেন। একটা পুরনো খবরের কাগজ, এ কাগজের নামই সে কখনো শোনেনি।

"তুমি বড় হয়ে উঠতে অনেক সময় নিয়েছ। তোমার মাকে মরতে হল, তিনি সুখের দিনটি দেখে যেতে পারলেন না, তোমার বন্ধুটি রাশিয়ায় পচছে, তিন বছর আগেই সে এমন হলদে হয়ে গিয়েছিল যে, তখনই তাকে বাতিল করে দেওয়ার কথা। আর, আমার কথা? আমার অবস্থা তো দেখতেই পাচ্ছ। এটুকু দেখার মত চোখ তোমার কপালে আছে।"

জর্জ বলে উঠল, "তাহলে তুমি আমার জন্যে অপেক্ষা করেই কি তুমি সময় কাটাচ্ছিলে?"

করুণাপ্রকাশের সুরে তার বাবা হালকা ভাবে বললেন, "আমার মনে হয় এ কথা তুমি অনেক আগেই বলতে চেয়েছিলে। কিন্তু এখন বললে, তাতেই বা ক্ষতি কি।" তারপর গলার স্বর একটু নামিয়ে বললেন, "এখন তুমি জানতে পেরেছ যে, পৃথিবীতে তুমি ছাড়া তোমার আর কিছু নেই, আজ পর্যন্ত তুমি নিজের কথাই ভেবে এসেছ। হ্যাঁ, সরল বালক একদিন তুমি সত্যিই ছিলে বটে, এটাও সত্য যে, আজ তুমি মানুষ-বেশী একটা শয়তান হয়ে উঠেছ। সুতরাং মন দিয়ে শোনো—আমি তোমাকে মৃত্যুদণ্ড দিলাম, তোমাকে ডুবিয়ে মারব।"

জর্জ ঘর থেকে পালিয়ে যাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠল, সে পালাতে-পালাতেই শুনতে পেল শব্দ করে তার বাবা বিছানার উপর প'ড়ে গেলেন। সিঁড়ি দিয়ে এমন বেগে সে নামতে লাগল যেন ঢালু পথে সর-সর ক'রে নেমে যাচ্ছে, ঠিকা ঝি সকাল বেলার ঘর পরিষ্কার করতে যাচ্ছিল, সে তার গায়ের উপর গিয়ে পড়ল, ঝি চেঁচিয়ে উঠল, "হায় যিশু!" আর, নিজের এপ্রন দিয়ে মুখ ঢাকল; কিন্তু জর্জ ততক্ষণে চলে গিয়েছে। সামনের দরজা পার হয়ে সে চলল, তারপর রাস্তা ডিঙিয়ে চলল জলের দিকে। একজন অনশনক্লিষ্ট লোক যেভাবে

খাবার জিনিস আঁকড়ে ধরে, সে সেই ভাবে আঁকড়ে ধরল রেলিং। অল্প বয়সে সে ব্যায়ামবীর বলে নাম করায় বাপ-মায়ের গর্বের বিষয় হয়েছিল। সেই কৌশল সে খাটাল এখানে। রেলিংএর উপর দিয়ে সে নিজেকে উল্টে দিল। মুঠো একটু শিথিল করে সে তখন ধরে রইল রেলিং, সে দেখতে পেল একটা মটোর-বাস্ এই দিকেই আসছে, ওর শব্দে তার জলে-পতনের শব্দ সহজেই ডুবে যাবে ব'লে সে চাপা গলায় বলতে লাগল, "শ্রদ্ধেয় বাবা-মা, আমি সব সময় তোমাদের ভালোবেসেছি।" বলেই সে নীচে পড়ল।

সেই সময় ব্রিজের উপর দিয়ে অবিরল ধারায় চলে যেতে লাগল যান-বাহন।

মামলা

কাফকার "দি ট্রায়েল" নভেলের মূল জার্মান ভাষ্য তাঁর মৃত্যুর পর ১৯২৫ সালে প্রকাশিত হয়। তাঁর বন্ধু ম্যাক্স ব্রড এটি সম্পাদনা করেন। নভেলটি অসমাপ্ত, কিন্তু এর শেষ পরিচ্ছেদটি পাওয়া গিয়াছে। ব্যাঙ্কের এক কেরানী জোসেফ কে. গ্রেপ্তার হল, কিন্তু সে জানেনা কী অপরাধ সে করেছে। তার গ্রেপ্তারের কারণ তাকে বলা হল না, কিন্তু তাকে আটক করা হল না, স্বাধীনভাবে সে চলাফেরা করতে পারল। আদালতে তার বিচার হবে, এবং এই বিচার বাতিল করা চলবে না—এ ব্যবস্থায় সে রাজি হল, যদিও উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কারা তা সে জানতো না। সে তার অপরাধ অস্বীকার করল, এবং আদালতের কর্মচারীদের সে অভিযুক্ত করল। কিন্তু ক্রমেই সে অসহায় ও অনিশ্চিত হয়ে পড়তে লাগল। অবশেষে সে তার দণ্ডের আদেশই মানতে পারল না, কিন্তু আদালতের দুজন স্তাবক তাকে মেরে ফেলল। এই নভেলের বক্তব্য অনেক জায়গাতেই বেশ ভাসা-ভাসা, একনায়কতন্ত্র ব্যক্তি বিশেষের কোনো অধিকার নেই এবং সে যে অসহায় একটা শিকারে পরিণত হতে পারে, এ ব্যাপারে কাফকার যা ধারণা তা ভুল। অন্য দিকে ঈশ্বরের বিচার সম্বন্ধে তার ধারণাও একদেশদর্শী। জোসেফ কে. আত্মসমীক্ষার জন্যে ও আত্মপক্ষ-সমর্থনের জন্যে আদালতের বিচারের সমুখীন হল, কিন্তু এ ব্যাপারে সে বিফল হল। মানুষের মধ্যে স্বাভাবিক ভাবেই যে দোষ থাকতে পারে, সেই দোষেই সে হয়তো দোষী ছিল, অথবা এমনও হতে পারে যে প্রয়োজন ছাড়া অন্য কারো সঙ্গে কোনো সম্পর্ক না রেখে নিজেকে তফাতে সরিয়ে রাখাই তার

অপরাধ, কিংবা বিচারে সম্মত হয়ে যেভাবে সে নিজের পক্ষ সমর্থন করেছে, সেটাও তার অপরাধ হতে পারে। আমাদের উদ্‌বৃতাংশ হচ্ছে নভেলের দ্বিতীয়াংশ থেকে নেওয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ দৃশ্য। আদালতের বেঞ্চের একজন সদস্য, তিনি একজন পাদ্রীও বটেন, গির্জায় বসে কে.'র তাঁর সঙ্গে কথোপকথন। যে মানুষকে আইনের দ্বারা বিচার করা হচ্ছে এখানে আমরা তার বিবরণ পাচ্ছি, এইটেই নভেলটির সারাংশ, কিন্তু এখানে তার যে ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে তাকে আংশিক বলা চলে। আইনের নীতিতত্ত্ব সম্বন্ধে অনেক দীর্ঘ আলোচনা এ'তে আসে, এ'তে এর অর্থের গুরুত্ব যেন আরও কমেছে।

রেলিং'এর উপর থেকে একটা হাত তুলে একটা অস্পষ্ট ভঙ্গি করে পাদ্রী জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি কি জোসেফ কে. ?' কে. বলল, 'হ্যাঁ', সে ভাবল কত খোলাখুলি ভাবে সে নিজের নামটি প্রকাশ করে দিয়েছে, এই নাম তার কাছে সম্প্রতি কি রকম গুরুভার হয়ে উঠেছিল ; যে মানুষদের আগে সে কখনো দেখেনি তারাও আজকাল তার নাম জেনে ফেলেছে। অচেনা জায়গায় নিজেকে এই ভাবে পরিচিত করার মধ্যে বেশ আনন্দই আছে। খুব নীচু গলায় পাদ্রী বললেন, 'তুমি একজন অপরাধী।' কে. বলল, 'হ্যাঁ, আমাকে এই রকম বলা হয়েছে।' পাদ্রী বললেন, 'তাহলে আমি যাকে খুঁজছিলাম সে তুমিই। আমি হচ্ছি জেলখানার পাদ্রী।' 'তাই বুঝি ?' কে. বলল। পাদ্রী বললেন, 'তোমার সঙ্গে আলোচনা করার জন্যে আমি তোমাকে এখানে ডেকে এনেছি।' কে. বলল 'আমি তা জানতাম না। আমি এসেছিলাম একজন ইটালিয়ানকে এই গির্জা ঘুরিয়ে দেখার জন্যে।' পাদ্রী বললেন, 'ওটা হল খুঁটিনাটি কথা। তোমার হাতে ওটা কী ? কোনো প্রার্থনার বই নাকি ?' কে. বলল, 'না, এটা ছবির একটা অ্যালবাম, শহরের দেখার জায়গাগুলোর ছবি।' পাদ্রী বললেন, 'ওটা রাখো।' কে. সেটা এত জোরে ছুড়ল যে, সেটা খুলে গেল, এবং পাতা ওলট-পালট হয়ে মেঝের উপরে অনেকটা দূর পর্যন্ত চলে গেল। পাদ্রী জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি কি জান যে, তোমার মামলা বেশ খারাপের দিকে চলেছে ?' কে. বলল, 'আমারও ঐরকম ধারণা আছে। আমি পেরেছি করেছি, কিন্তু এখন পর্যন্ত একটুও সফল হইনি। অবশ্য, আমার, প্রথম-দরখাস্ত এখনো পেশ করা হয় নি।' পাদ্রী জিজ্ঞাসা করলেন, 'এর পরিণাম কী হবে ব'লে মনে কর ?' কে. বলল, 'প্রথমে ভেবে-

ছিলাম, পরিণাম ভালোই হবে, কিন্তু এখন আমার প্রায়ই সন্দেহ হয়। এর শেষ কী হবে জানিনে। আপনি জানেন?' পাদ্রী বললেন, 'না। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে শেষ পর্যন্ত খারাপই হবে। তুমি দোষী বলে সাব্যস্ত হয়েছ। নীচু আদালতের বাইরে তোমার মামলাটি যাবে না। এখন পর্যন্ত তোমার দোষ প্রমাণিত হয়ে গিয়েছে বলেই ধরা যায়।' কে. বলল, 'কিন্তু আমি তো দোষী না। এটা একটা ভুল-বোঝাবুঝির ব্যাপার হয়েছে। তা-ই যদি হয়ে থাকে তাহলে একজনকে দোষী বলা যায় কী ক'রে? আমরা সকলেই তো মানুষ-মাত্র, প্রত্যেকেই তাই।' পাদ্রী বললেন, 'কথাটা ঠিক। কিন্তু সব অপরাধীই ঐ কথা বলে।' কে. বলল, 'আপনিও কি আমার সম্বন্ধে একটা ধারণা নিয়ে আছেন?' পাদ্রী বললেন, 'তোমার বিরুদ্ধে আমি কিছু ভেবে রাখিনি।' কে. বলল, 'ধন্যবাদ। কিন্তু অন্য আর-আর যাঁরা এই মামলার শুনানীর সঙ্গে যুক্ত, তাঁরা কিন্তু একটা ধারণা ক'রে নিয়ে বসে আছেন। বাইরের লোককেও তাঁরা প্রভাবান্বিত করছেন। আমার অবস্থা এতে ক্রমশই জটিল হয়ে উঠছে।' পাদ্রী বললেন 'মামলার প্রকৃত ব্যাপারের তুমি ভুল ব্যাখ্যা করছ। আদালতের রায় চট ক'রে দেওয়া হয় না, শুনানী ক্রমে ক্রমে এগিয়ে এসে তবে রায় হয়ে দাঁড়ায়।' কে. মাথা নীচু ক'রে বসে বলল, 'এই রকম বুঝি হয়?' পাদ্রী বললেন, 'এ ব্যাপারে তুমি এর পরে কী ব্যবস্থা নিতে চাও?' কে. বলল, 'আমি আরও সাহায্য পাব বলে আশা করছি।' কথাটার ক্রিয়া কেমন হল তা দেখার জন্যে কে. পাদ্রীর মুখের দিকে তাকাল, এবং বলল, 'আরও অনেক সম্ভাবনা আছে আমি এখনো তার খোঁজ করি নি।' পাদ্রী একথা যেন অনুমোদন করলেন না, বললেন, 'তুমি বাইরের সাহায্যের উপর অনেকটাই নির্ভর করে আছ, বিশেষ ক'রে মহিলাদের কাছ থেকে। তুমি কি বুঝতে পারছ না যে, এ ধরণের সাহায্য সংগত নয়?' 'কোনো কোনো ক্ষেত্রে, এমন কি অনেক ক্ষেত্রেই, আপনার সঙ্গে আমি এ বিষয়ে একমত হতে পারি।' কে. বলল, 'কিন্তু সব ক্ষেত্রে নয়। মহিলাদের খুব প্রভাব আছে। আমি যদি আমার চেনা-জানা কোনো মহিলাকে আমার হয়ে যাঁরা কাজ করছেন তাঁদের সঙ্গে যোগ দেওয়াতে পারি, তাহলে আমার জয় হতেও পারে। বিশেষ করে এই আদালতে, কেননা এখানকার প্রায়-সকলেই হচ্ছেন মহিলা-অনুরাগী। বিচারক ম্যাজিস্ট্রেট দূরে একজন মহিলা দেখলেই যেন তাঁর ডেস্ক ভেঙে ফেলতে উদ্যত হন, এবং প্রতিবাদী পক্ষ নিজের

মামলার গরজেই তার দিকে ধাওয়া করে।' পাদ্রী রেলিং-এর উপর ঝুঁকে দাঁড়ালেন, মনে হল এই বুঝি প্রথম তিনি মাথার উপরের চাঁদোয়া আর সইতে পারছেন না। বাইরের আবহাওয়া এখন কেমন হতে পারে? এখন দিনের অস্পষ্ট আলোও আর নেই, অন্ধকার রাত্রি নেমে আসছে। একটি মাত্র আলোর শিখা জানালার কাঁচে কাঁচে প্রতিফলিত হয়েও দেয়ালকে আলোকিত করে তুলতে পারছে না। এই সময়ে পাদ্রীর অনুচর উঁচু উঁচু বেদীর উপর মোম বসাতে লাগল। কে. পাদ্রীকে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি কি আমার উপর রাগ করেছেন? আপনি যে আদালতের হয়ে কাজ করছেন তার আচরণ সম্বন্ধে আপনি হয়তো কিছু জানেন না।' এ কথার কোনো উত্তর পেল না কে.। কে. আবার বলল, 'এসব হচ্ছে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা।' এরও কোনো উত্তর এল না। কে. বলল 'আমি আপনাকে অপমান করতে চাইনি।' এবার পাদ্রী মঞ্চের উপর থেকে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'তুমি কি কিছুই দেখতে পাও না?' এটা ছিল তাঁর ক্রোধের চীৎকার, কিন্তু এই চীৎকারটা যেন কারও পতন দেখে আঁৎকে ওঠার চীৎকারের মতন শোনাল, এবং নিজেও যেন সচকিত হয়েছেন বলে মনে হল।

দুজনেই অনেকক্ষণ চুপচাপ রইল। এই অন্ধকারে পাদ্রী কে-র চেহারা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলেন না, কিন্তু কে. তাঁকে ছোট বাতির আলোয় স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছিল। উনি মঞ্চ থেকে নেমে আসছেন না কেন? তিনি তো এখন কোনো উপদেশ বিলি করছেন না, তিনি কে.-কে কতকগুলো খবর দিয়েছেন মাত্র, যাতে তার কল্যাণ না হয়ে অকল্যাণই হবে। তবুও পাদ্রীর শুভ উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কে.-র মনে কোনো সন্দেহ নেই, ঐ মানুষটি যদি ঐ মঞ্চ ত্যাগ করেন তাহলে তাঁর সঙ্গে একটা রফা হওয়া অসম্ভব নয়, তাঁর কাছ থেকে একটা পাকা ও গ্রহণযোগ্য পরামর্শ পাওয়াও অসম্ভব বলে তার মনে হয় না, যে পরামর্শ কোনো প্রভাবশালীর কুশলী হস্তক্ষেপে নয়, বরঞ্চ তার বিপরীতেই যাবে—যা নাকি আদালতের আওতায় না থাকাই উচিত। কে. অনেক ভেবে দেখেছে—এ রকম সম্ভাবনা আছেই। পাদ্রী যদি এ রকম সম্ভাবনার কথা জানতে পারেন, তাহলে তাঁর কাঁছে আবেদন করলে তিনি নিশ্চয় তাঁর অভিজ্ঞতা কাজে লাগাবেন, এবং আদালতের আচরণ সম্বন্ধে সন্দেহের কথা শুনে কে.-কে আবার চেঁচিয়ে বসিয়ে দেবেন না।

কে. বলল, 'আপনি এখানে নেমে আসবেন না? আপনি এখন কোনো

সারমন প্রচার করছেন না। নেমে এসে আমার পাশে দাঁড়ান।' পাদ্রী সম্ভবত তাঁর ক্রোধ প্রকাশের জন্য অনুতপ্ত, তিনি বললেন, 'আমি এখন নেমে যেতে পারি নে। তিনি হুক থেকে আলো খুলে নিতে নিতে বললেন, 'প্রথমে আমি দূর থেকে তোমার সঙ্গে কথা বলতে চাই। তা না হলে আমার উপর প্রভাব পড়ে যেতে পারে, আর, আমার কর্তব্য ভুলে যেতে পারি।'

সিঁড়ির নীচে কে. তাঁর জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল। উচ্চস্থান থেকে নীচে নামতে নামতে পাদ্রী তাঁর হাত কে.-র দিকে প্রসারিত করলেন। কে. জিজ্ঞাসা করল, 'আমার জন্যে আপনি কি একটু সময় দিতে পারবেন?' কে.-র হাতে ছোট আলোটা দিয়ে পাদ্রী বললেন, 'যতটা সময় তুমি চাও।' এত কাছে এসেও তিনি পবিত্রতার গাম্ভীর্য নিয়ে রইলেন। কে. বলল, 'আপনি আমার প্রতি বেশ ভালো ব্যবহার করেছেন।' উভয়ে গির্জার অন্ধকার রাস্তা ধরে পাশাপাশি হাঁটতে লাগল। 'আদালতের মানুষদের থেকে আপনি একটু আলাদা, অন্য কারো চেয়ে আপনার উপরেই আমার আস্থা আছে, যদিও আদালতের অনেককেই আমি চিনি। আপনার সঙ্গে আমি প্রাণ খুলে কথা বলতে পারি।' পাদ্রী বললেন, 'ভুল বুঝোনা।' কে. বলল, 'আমি কোথায় ভুল বুঝলাম?' পাদ্রী বললেন, 'আদালত সম্বন্ধে তোমার অনেক ভুল ধারণা। আইনের ভূমিকায় এ সম্বন্ধে এই কথা বলা আছে: আইনের সামনে প্রহরী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে এক দেহরক্ষী। গ্রাম দেশ থেকে একজন এসে এই প্রহরীর কাছ থেকে আইনের সামনে যাবার অনুমতি চায়। দ্বাররক্ষী বলে যে, এখনই সে সেই লোকটিকে প্রবেশাধিকার দিতে পারে না। লোকটি তখন জিজ্ঞাসা করে, পরে সে অনুমতি পাবে কি না। দ্বাররক্ষী বলে, পরে পাবার সম্ভাবনা আছে, কিন্তু এই মুহূর্তে সে অনুমতি পাচ্ছে না। আইনের দরজা সব সময়ই খোলা থাকে, এবং দ্বাররক্ষী দরজার এক পাশে দাঁড়িয়ে থাকে, লোকটি তাই নীচু হয়ে প্রবেশ-পথটির ভিতর দিয়ে উঁকি দিল। দ্বাররক্ষী তা দেখে একটু হাসল, বলল, তোমার যদি এতই আগ্রহ তাহলে আমার অনুমতি ছাড়াই ভিতরে চলে যাবার চেষ্টা করো। কিন্তু জেনে রেখো, আমার শক্তি অনেক; আর, আমি সবচেয়ে ছোট-দরের দ্বারপাল। প্রতিটি হল্-ঘরের দরজায় প্রহরী দাঁড়িয়ে আছে, প্রত্যেকেই আগের জনের চেয়ে বেশি শক্তিশালী। এর মধ্যে যে তৃতীয় প্রহরী তার শক্তি এতই বেশি যে, আমি তার দিকে

তাকাতেই ভরসা পাইনে। গ্রামদেশ থেকে আগত লোকটি এসব অসুবিধের কথা ভাবেনি, তার ধারণা ছিল আইন সব সময়ই সকলের নাগালের মধ্যে থাকে। যখন সে দ্বাররক্ষীর জাঁকজমকপূর্ণ সাজ দেখল, তার চোখা নাক দেখল ও তার গালপাট্টা দাড়ি দেখল তখন সে স্থির করল, ভেতরে ঢোকার অনুমতি পাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করাই ভালো। দ্বাররক্ষী তাকে দরজার পাশে বসবার জন্যে একটা টুল দিল। সেখানে সে ব'সে দিনের পর দিন বছরের পর বছর অপেক্ষা করতে লাগল। ভেতরে যাবার অনুমতির জন্যে সে অনেক চেষ্টা করল, এবং অনুনয়-অনুরোধ করে দ্বাররক্ষীকে হয়রান করতে লাগল। নানা গল্পগুজব করে দ্বাররক্ষী তাকে অনেক সময় ব্যস্ত রাখত—তার বাড়িঘর সম্বন্ধে ও অন্যান্য অনেক বিষয় সম্বন্ধে নানারকম প্রশ্ন করত, কিন্তু প্রশ্নগুলো করা কত নেহাতই নৈর্ব্যক্তিক ভাবে, মহৎ ব্যক্তিরা যেরকম ক'রে থাকেন আর-কি, এবং শেষ পর্যন্ত একই কথায় এসে কথা শেষ হত, তাকে বলা হত এখনো সে প্রবেশ করতে পারবে না। লোকটা সঙ্গে অনেক উপকরণ নিয়ে এসেছিল, তার এই পরিভ্রমণের উপযোগী অনেক উপকরণ, একে একে সবই সে ছাড়তে লাগল, যতই তার দাম হোক-না কেন। দ্বাররক্ষীকে ঘুষ দিয়ে হাত করার জন্যেই সে এ রকম করল। দ্বাররক্ষী সবই নিল; প্রত্যেকটি উপহার নেবার সময় সে বলতে লাগল, আমি এটা নিলাম এইজন্যে যে, তোমার কাজ এখনো কিছু বাকি আছে তুমি যাতে তা বুঝতে পার। এই কয়টি দীর্ঘ বছর ধ'রে এই দ্বাররক্ষীকে সে এক-নাগাড়ে দেখেই যাচ্ছে। সে অন্য দ্বাররক্ষীদের কথা ভুলেই গিয়েছে। এই একজনকেই তার একমাত্র বাধা বলে মনে হয়। প্রথম দিকে সে বেশ গলা ছেড়েই তার অদৃষ্টকে দোষ দিয়েছে, পরে, সে বুড়ো হলে নিজের মনে কেবল বিড়বিড় করেছে। সে ক্রমে ছেলেমানুষ হয়ে গেল যেন। এতদিন ধ'রে এখানে থাকতে-থাকতে সে দ্বাররক্ষীর কোটের কলারে বসা মাছিকেও বেশ চিনে ফেলেছে, তাকে সাহায্য করার জন্যে সে ঐ মাছিদের কাছেও অনুনয় করে যাতে সে দ্বাররক্ষীর মনটা বদ্‌লে দেয়। শেষে তার চোখের দৃষ্টি ক্ষীণ হয়ে এল, এখন সে বুঝতেই পারল না যে, তার চারদিকের পৃথিবী ক্রমেই অন্ধকার হয়ে আসছে কি না, কিংবা তার চোখ কোনো ভ্রান্তি সৃষ্টি করছে। কিন্তু এই অন্ধকারে সে একটা দীপ্তি দেখতে পেল, আইনের দরোজা থেকে যে দীপ্তির স্রোত বয়ে আসছে। এখন তার জীবন শেষ হয়ে এল। তার মৃত্যুর

আগে এতদিনের সঞ্চিত অভিজ্ঞতার কথা একটি প্রশ্নে এসে জমে উঠেছে, এই প্রশ্নটি সে দ্বাররক্ষীকে জিজ্ঞাসা করতে পারে নি। তার শক্ত-হয়ে-যাওয়া দেহটা সে আর তুলতে পারে না, এখন সে দ্বাররক্ষীকে সংকেতে সব কথা জানায়, তার সংকেত বুঝবার জন্যে দ্বাররক্ষীকে অনেক ঝুঁকে দাঁড়াতে হয়, তাদের মধ্যের আকারেরও অনেক প্রভেদ এসে গিয়েছে। দ্বাররক্ষী জিজ্ঞাসা করে, এখন তুমি কী জানতে চাও? তুমি অতৃপ্ত। লোকটি উত্তরে বলে, "প্রত্যেকেই আইন পেতে চায়। কিন্তু এটা কেমন হল যে, এতদিনেও আমি ছাড়া আর-কেউ এল না এখানে ঢুকবার আবেদন নিয়ে? দ্বাররক্ষী বুঝতে পারে যে, মানুষটির শক্তি ফুরিয়ে এসেছে, এখন সে শুনতেও পাচ্ছে কম, সেই জন্যে সে তার কানের কাছে গিয়ে বলল, তুমি ছাড়া আর কেউ এখানে প্রবেশাধিকার পাবে না। দরজাটা কেবল তোমার জন্যেই তৈরি হয়েছে। এখন আমি এটা বন্ধ ক'রে দিচ্ছি।'

গটফ্রায়েড বেন

কবিরা কি পৃথিবী পালটে দিতে পারে?

একটি বেতার কথোপকথন

গটফ্রায়েড বেন (১৮৮৬-১৯৫৬) বার্লিনের একজন চিকিৎসক ছিলেন। দুইটি বিশ্বযুদ্ধেই তিনি আর্মি ডাক্তার হিসেবে কাজ করেছেন। প্রথমে তিনি ন্যাশনাল সোশ্যালিজমই সংস্কার আনবার পক্ষে উপযোগী বলে মনে করেন, কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই বুঝতে পারেন যে, তিনি ভুল করেছিলেন। তাঁর রচিত প্রথম দিকের কবিতায় মানুষের বাস্তবজীবনের জরাজীর্ণ অস্তিত্বেরই একটা ব্যাধিগ্রস্ত দিক দেখা যায়, এবং তাতে একটা শূন্যবাদের চেহারাই প্রকট হয়ে আছে; কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই এর পরিবর্তন ঘটে, এবং সব বাস্তবতার অন্তরালের সুন্দর ও পবিত্র জিনিসের প্রতি তাঁর আকর্ষণ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তাঁর পরবর্তীকালের কবিতার মধ্যে মানুষের জীবনের ও সভ্যতার সমস্ত দিকই একত্রে গ্রথিত হয়েছে এক মৌলিক রচনাভঙ্গিতে, এর মধ্যে কোনো রূঢ়তাও নেই, কারও ছিদ্রান্বেষণেরও প্রবণতা নেই। প্রকৃত সৃষ্টিমূলক শিল্পের দ্বারা পৃথিবীর যাবতীয় দুর্বিপাক ও অসম্ভবতা বশীভূত করা যায়। শিল্প সম্বন্ধ বেন যে ধারণা পোষণ করেন তা তাঁর এই বেতার-কথোপকথনে

(১৯৩০) স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কথোপকথনের একজন হয়ে—খ হয়ে—তিনি আমাদের সময়ের সাহিত্য সম্বন্ধে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। প্রকৃত কবিতা হচ্ছে স্বসম্পূর্ণ স্বয়ন্তর—প্রকৃত জীবনের মধ্যে এর কোনোরকম অনুপ্রবেশ না ঘটলেও চলে। তাঁর এই অভিমতের পক্ষে একথা বলা যায় যে, মানুষের অবস্থা সব সময়ই এক, এবং অপরিবর্তনীয়।

ক ॥ আপনার অনেক প্রবন্ধে আপনি কবিদের সম্পর্কে অনেক কথা বলেছেন, যা বলেছেন তা অনেকটা এই—নিজের কালের উপর কবির কোনো প্রভাব নেই, ইতিহাসেও তার কোনো ভূমিকা নেই, এবং কবির যা প্রকৃতি তাতে সে কোনো ভূমিকাই নিতে পারে না। কবি হচ্ছে ইতিহাসের বাইরের জিনিস। এ কথা কি একটা যথেচ্ছ অভিমত নয়?

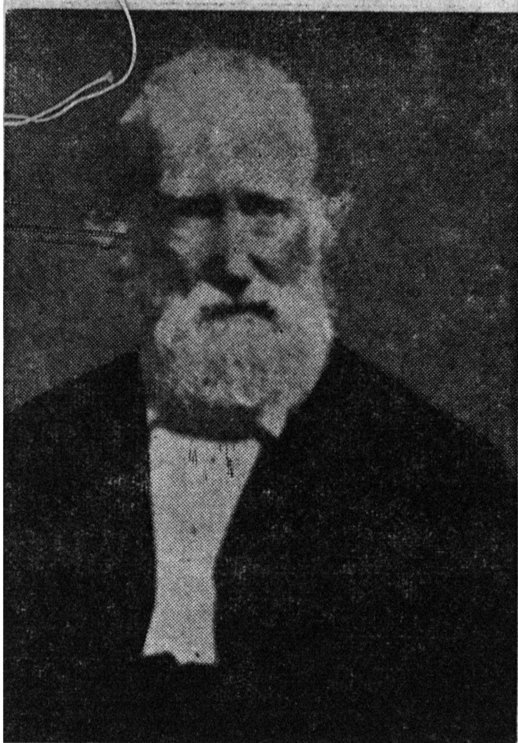
খ ॥ আপনি কি চান যে, আমার এই রকম কথা লেখা উচিত ছিল যে, কবিরা পার্লামেন্ট সম্বন্ধে, স্থানীয় গভর্নমেণ্ট সম্বন্ধে, জমি ক্রয়বিক্রয় নিয়ে, শিক্ষাক্ষেত্রে অশান্তি নিয়ে ও সংবাদপত্রের উন্নতি নিয়ে মেতে থাকবে?

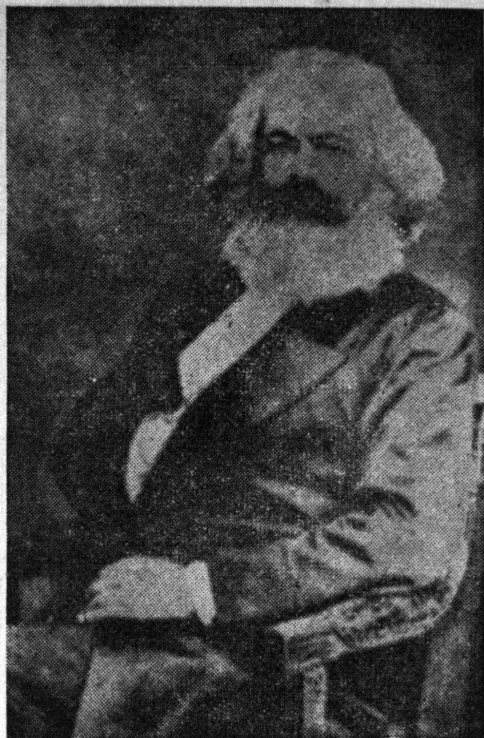
ক ॥ কিন্তু এমন অগণিত নাম-করা লেখক কি নেই যাঁরা আপনার এই নেতিবাচক অভিমতের সঙ্গে একমত নন্, এবং যাঁরা মনে করেন যে, আমরা একটা কালের একটা বাঁকে এসে পৌঁছেছি, আর সেইভাবেই তাঁরা কাজ করেন, তাঁরা মনে করেন, নূতন একধরণের মানবগোষ্ঠীর আবির্ভাব ঘটছে, ও সম্পূর্ণরূপে আলাদা ধরণের একটা সুন্দর ভবিষ্যতের সৃষ্টি হচ্ছে, যার বিবরণ দেওয়া উচিত?

খ ॥ অবশ্যই তাঁরা একটা সুন্দর ভবিষ্যতের চিত্র ফুটিয়ে তুলতে পারেন। কল্পরাজ্যের কাহিনী বলার মত লেখক সব সময়ই পাওয়া যায়, যেমন—জুলে ভার্নে, সুইফ্‌ট্। আর, সময়ের বাঁক সম্বন্ধে আমার বলার কথা এই যে, আমি সব সময়ই বলেছি যে, সময় অনবরত বদলাচ্ছে, নূতন মানবগোষ্ঠী জেগে উঠছে। কিন্তু মানবজাতির জীবনের ভোরের গোধূলিলগ্ন ব্যাপারটা পৌরাণিক যুগ থেকে নিয়মিত ভাবে দেখা দিয়েই চলেছে।

ক ॥ তাহলে আপনি মনে করেন যে, বর্তমান কালের কোনো ব্যাপারে কবিদের জড়িয়ে পড়া ঠিক না?

খ ॥ আমার মনে হয়, ওরকম যারা করেন তাঁরা প্রকৃত কবি নন্, তাঁরা



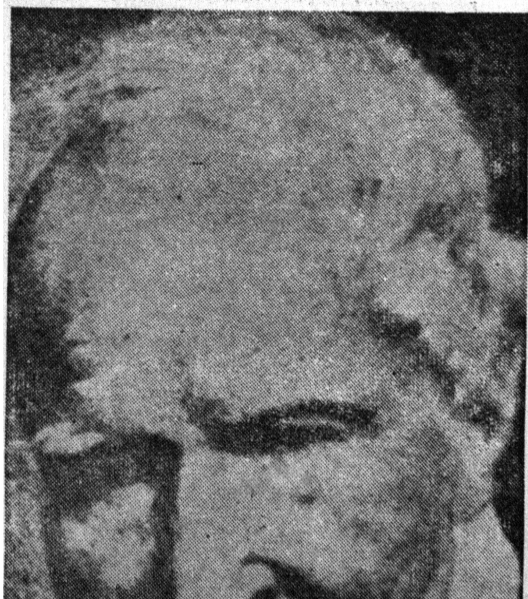


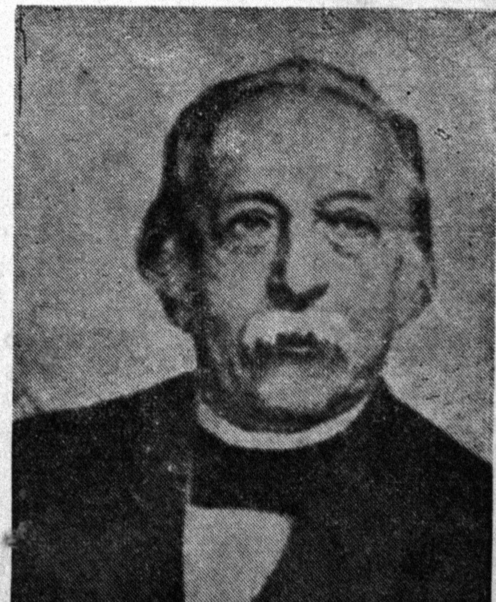
থিয়োডরস্টর্ম
(১৮১৭-১৮৮৮)

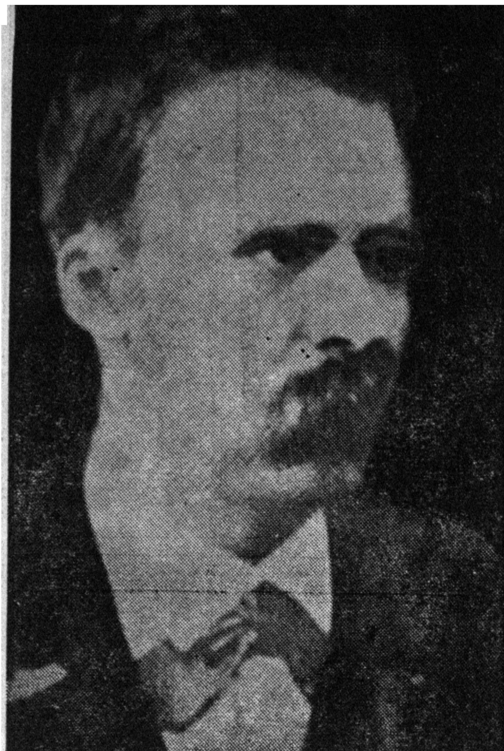
কার্ল মার্কস
(১৮১৮-১৮৮৩)

অ্যালেকজাণ্ডার ফন হামবোলডট
(১৭৬৯-১৮৫৯)

থিয়োডর ফনটেন
(১৮১৯-১৮৯৮)







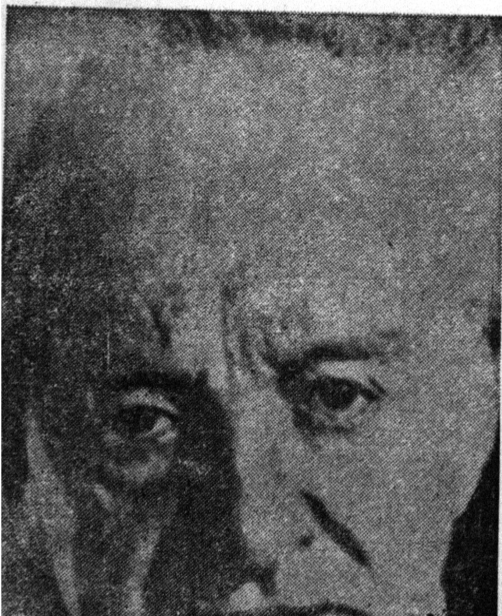


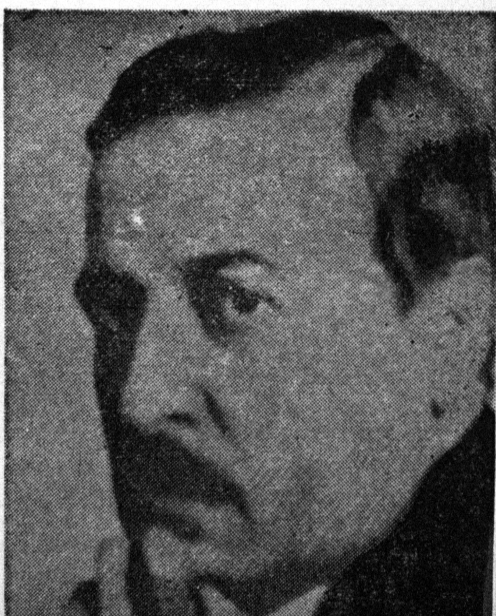
ফ্রায়েডরিখ নিটশে
(১৮৪৪-১৯০০)

অটো ফন বিসমার্ক
(১৮১৫-১৮৯৮)

গারহার্ট হাউপমান
(১৮৬২-১৯৪৬)

হুগো ফন হফমানথাল
(১৮৭৪-১৯২৯)





কবিতা নিয়ে অবসর বিনোদন করেন মাত্র। আমি দেখেছি, এক গোষ্ঠীর লেখক ২১৮ ধারা* বাতিল করার জন্যে আন্দোলন করছেন, অন্য গোষ্ঠীর লেখক মৃত্যুদণ্ড রদ করার জন্যে আলোড়ন করছেন।

এই ধরণের লেখকেরা সেই সংস্কারমুক্তির আমল থেকে অনেক সরকারী পদ অধিকার করে আসছেন। এইসব লেখকের এলাকা হচ্ছে স্থানীয় উত্তেজনা, উদার মত প্রচারের প্রচেষ্টা, এবং আরও সব কর্ম-তৎপরতা যার প্রকৃত রূপ দেখা যাবে ভল্‌টেয়ারের কালাস নিয়ে সংগ্রামে, ও জোলার জ'্যাকুস-এ।

ক॥ এসব কাজ কবিতার চৌহদ্দির অন্তর্গত ব'লে আপনি স্বীকার করেন না?

খ॥ অভিজ্ঞতা থেকেই জানা যায় যে, এসব ব্যাপার কবিতার সীমানার অন্তর্গত নয়। যেসব লেখক সভ্যতার নানাবিধ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত থেকে অভিজ্ঞতা অর্জন করছেন, এবং সেই অভিজ্ঞতাই যাঁদের কাজে লাগাবার কথা তাঁরাই পৃথিবীর খাঁটি বাস্তবতার সঙ্গে মাখামাখি করছেন; এঁরা পৃথিবীতে জড় বলে গণ্য করেন, ও ত্রিস্তরে এঁদের কাজ করে। এরা কারিগরদের কাছে গিয়ে হাজির হন, সেপাইদের কাছে যান, যেসব মানুষ সীমানা ঠিকঠাক করে ও পৃথিবীর বুকের উপর দিয়ে তার টেনে নিয়ে যায়, এঁরা যান তাদের কাছেও। এঁরা বাহ্যিক পরিবর্তন বা আকস্মিক পরিবর্তনের ডামাডোলের ভিড়ে মিশে যান। কিন্তু কবির ধর্ম আলাদা, তার নীতিও পৃথক, তাঁর অভিজ্ঞতার ধরণও অন্য প্রকার; হাতে-নাতে কাজ করে যে পরিবর্তন আনা হচ্ছে বা তথাকথিত সে অগ্রগতি ঘটানো হচ্ছে, তার মধ্যে না গিয়ে তাঁর নিজস্ব অভিজ্ঞতার অন্যরকম ফল চান।

ক॥ আপনি কারিগর ও সেপাইদের কথা বললেন। এদের কথা বলার অর্থ কি এই যে, এরাই কেবল পৃথিবীর পরিবর্তন আনছে ব'লে আপনি মনে করেন?

খ॥ হ্যাঁ। যতটা পরিবর্তন আনা যায় আর-কি। কিন্তু আমি মনে করি এসব পরিবর্তন আনেন তাঁরাই যাঁরা এঁদের থেকে দূরে একটু উঁচুতে বসে আছেন, অর্থাৎ বৈজ্ঞানিকেরা। এঁরা অবশ্য কবির ঠিক বিপরীত। বৈজ্ঞানিকেরা এমন-একটা সূত্র ঠিক করে দেন যা সহজেই লাভজনক

*সেই সময়ে জার্মান পেনাল কোডে ২১৮ ধারাটি ছিল গর্ভপাতের বিরুদ্ধে প্রণীত আইন।

ভাবে প্রয়োগ করা যায়; তাঁরা এমনই একটা সত্য উদ্‌ভাবন করেন যা সাধারণের কাছে বেশ গ্রহণযোগ্য হয়, আর যার প্রমাণ হাতে-নাতে পাওয়া যায়, এবং কাজেও লাগানো যায়, আর সাধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন লোকও তা সহজেই প্রয়োগ করতে পারে। আমি এটা ঠিক বুঝতে পারি যে, যে-জাতি শিল্প ও বিজ্ঞানকে একই নিঃশ্বাসে উচ্চারণ করে সেই জাতি এমনই আলোকপ্রাপ্তির অর্থ এইভাবে নিয়েছে যে, তার কাছে শিল্প ও বিজ্ঞান পাশাপাশি রাখা চলে, বিশেষ করে সেই শতকে যখন নাকি বিজ্ঞানের বেশ রবরবা অবস্থা আর তার থেকেই মনে হয় যে বিজ্ঞান বুঝি খুবই সৃষ্টিশীল। কিন্তু আমি এর থেকেও একটু বেশি বুঝতে পারি। যে-কোনো রবিবারে বার্লিনের উত্তরে ষাট মাইল আন্দাজ যাও, যাও গ্র্যাণ্ড ইলেক্টর অঞ্চলে, ফেরবেলিনে ও ফ্রেডেরিক দি গ্রেটের সঙ্গে যুক্ত যে-কোনো শহরে, তবে দেখতে পাবে পতিত ও শুকনো জমি প'ড়ে আছে —যার বর্ণনা দেওয়াও কঠিন, এমন-সব যা নাকি দারিদ্র্যেরই প্রতিমূর্তি, আইনশৃঙ্খলা অবজ্ঞা করার একটা আখড়া। তখনই বোঝা যাবে 'পেনথেসিলিয়া'র লেখককে* কেন এমন একগুঁয়ে মানুষ বলে মনে করেছিল সেই জাতি, যে-জাতি শহরবাসী জোতদারের ও স্থানীয় ম্যাজিস্ট্রেটের আচরণ দেখেই শিখেছিল যে কেবল হাতে-নাতে কাজ করে সব জিনিস কাজে লাগালে তা কেমন বর্ণহীন সমারোহে পরিণত হয়।

ক ॥ আপনি কি বলতে চান যে, 'পেনথেসিলিয়া' একটা উচ্চস্তরের সাহিত্যসৃষ্টি, কিন্তু রাজনীতিক্ষেত্রে সামাজিক ক্ষেত্রে বা শিক্ষার প্রসারে এর কোনো প্রভাবই পড়েনি?

খ ॥ ঠিক ঐ কথাই আমি বলতে চেয়েছি। তার উপর, আমাদের কাছে এর পরেরই, এই 'পেনথেসিলিয়া'র পরেই, উল্লেখযোগ্য বই হচ্ছে হাইনরিখ মান্‌-এর 'দি স্মল টাউন'---এ বইও কোনো প্রস্তাব ফেলতে পারে নি। আমার বক্তব্য এইভাবে ছাড়া আর প্রকাশ করা যাবে না, তা হচ্ছে এই যে—শিল্প হচ্ছে নিজেতেই নিজে বিভোর, ইতিহাসে এর কোনো প্রভাব নেই, কার্যে প্রয়োগ হল কি হল-না সে দিকে তার হুঁশ থাকবে না। এইই হচ্ছে এসবের মহত্ব।

---

*হাইনরিখ ফন ক্লিস্ট

ক ॥ এটা কি সাহিত্য সম্পর্কে একটা বৈপ্লবিক ও শূন্যবাদী অভিমত হল না ?

খ ॥ সামাজিক অগ্রগতি যদি প্রকৃতই হয়ে থাকে, তা হলে নিশ্চয়ই। কিন্তু যে শিল্পকর্মের সারি একের পর এক ইতিহাস রেখে গিয়েছে তার কথা মনে ক'রে দেখ। নেফেরটিটি ও ডোরিয়ান মন্দির, অথবা অ্যানা ক্যারেনিনা অথবা নসিকার গান অর্থাৎ ওডিসি—এসবের মধ্যে এমন কিছু নেই যা তার বাইরের কিছুকে দেখাচ্ছে, এর কিছুরই ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই, বাইরের কিছুর উপর প্রভাব ছড়াতেও এরা চায় না ; এগুলি যেন আত্মসমাহিত কতকগুলি মূর্তির মিছিল ; নীরব ও গম্ভীর মূর্তি। এ'কে যদি শূন্যবাদ বলতে চাও, তাহলে এ হচ্ছে শিল্পের ক্ষেত্রে বিশেষ ধরণের শূন্যবাদ।

ক ॥ আপনি এই রকম নীরব মিছিলের কথা বললেন—আমি আপনাকে আর-একটি মিছিল দেখাব। এই বার্লিনে ছত্রিশ হাজার যক্ষ্মারোগী আছে, সকলেই তাদের জানে, তারা যাবার কোনো জায়গা পাচ্ছে না। প্রত্যেক বছর চল্লিশ হাজার নারী মারা যাচ্ছে জার্মানীতে—আপনি যে বেআইনী গর্ভপাতের কথা একটু আগে বললেন তারই ফলে এসব মৃত্যু। শিক্ষা-ব্যবস্থার জন্যে আমাদেব দেশের বেশির ভাগ লোক যে অকথ্য ও অবর্ণনীয় লড়াই করে চলেছে তার কথা ভাবুন। বেকারদের কথা ভাবুন, জোয়ান ছেলে, ত্রিশ বছর বয়সী তাজা লোক, কোনো কাজ পাচ্ছে না, কোনো মজুরি নেই তাদের শহরে, কেবল ঘরে গিয়ে রাত্রিবাস করে ইঁদুরের মত। একটা ঘটনার কথা শুনুন। বারো-জনের একটা পরিবার ছিল, বাপ মদ খেত, মায়ের দশম সন্তানটি তখন তাঁর গর্ভে, চোদ্দবছর বয়সী মেয়েটা কসাইখানায় গিয়ে এক পেনি খরচ ক'রে একটু রক্ত নিয়ে এল, সেই রক্ত সে নিজের বুকের উপর ঢেলে দিল, যাতে সকলে মনে করে যে কাসতে-কাসতে তার রক্ত উঠেছে, আর এই ঘিঞ্জি বাড়িটা থেকে বেরিয়ে গিয়ে সে কোনো টি. বি. স্যানিটোরিয়ামে জায়গা পায়। এসব হচ্ছে, যাকে বলে, মর্মন্তুদ ব্যাপার, এসব হচ্ছে চোখের জলের ঘটনা, অসহায়দের দুঃসহ দুঃখ, সুখের চরম অবনতি—কবিরা কি এসব দেখবে কেবল দূরে দাঁড়িয়ে ?

খ ॥ এর উত্তরে আমি দ্বিধাহীন ভাবে বলব, হ্যাঁ, কবিরা দূর থেকে এসব

দেখবে। কিন্তু তারা দেখবে না যারা রাজনৈতিক কারণে কলমবাজি করে, সন্ধ্যাবেলা যে বসে মন্ত্রীর পাশেই, তার জামার পকেটে থাকে ফুল গোঁজা, ও যার খাবার প্লেটের পাশে থাকে পাঁচটি মদের গেলাস। দিনের মর্মান্তিক অবস্থার প্রতিবাদপত্রে সে সই করে। কিন্তু সেই কবিরাই দূর থেকে দেখবে যারা জানে যে, এইসব অহেতুক দুর্দশা সামাজিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা ক'রে বা পার্থিব কোনো উন্নতি ঘটিয়ে দূর করা যাবেনা। যাঁরা বেশ যুক্তিবাদী বলে নিজেদের মনে করেন তারা বলেন: মনের মধ্যে পেন্সনের কথা রাখ ও বাড়িতে উজ্জ্বল আলো জ্বেলে দাও। কোনো যন্ত্রণা ছাড়া সৃষ্টি হয় না, নখদন্ত ছাড়া যেমন জঙ্গল হয় না, দুঃস্বপ্ন ছাড়া যেমন হয়না রাত্রি। কবিরা মনে এই দৃঢ়প্রত্যয় নিয়ে দূর থেকে চেয়ে দেখবেন যে, তার হাতেই আছে এই দুর্দশার ভূত ঝাড়ার উপায়, এবং দুর্দশার যারা শিকার তাদের একত্র করার কৌশল। কবি চীৎকার করে বলে, তোমরা ডুবে যাও, কিন্তু সেই সঙ্গে আমি বলতে পারি—ওঠো, জাগো।

ক ॥ একটা অদ্ভুত ব্যাপার। কিন্তু এর বিপরীতে—

খ ॥ এর বিপরীতে! তুমি হয়তো বলতে চাও যে যে-ব্যক্তি চিন্তা করে বা লেখে তারই উচিত শ্রমিক-আন্দোলনের সমর্থন করা, তাকে কমিউনিস্ট হতেই হবে, শ্রমিকদের জাগরণে সহায়তা করার জন্যে তাকে তার শক্তি-প্রয়োগ করতে হবে। কেন? তোমার এরকম বিশ্বাসের কারণ কি? চিরকালই সামাজিক আন্দোলন হয়ে আসছে। গরিবরা চিরকালই উপরে উঠতে চায়, আর ধনীরা কখনোই নীচে নামতে চায় না। এটা একটা ভয়ানক পৃথিবী, এটা পুঁজিবাদীর পৃথিবী। মিশর যেদিন থেকে গন্ধ দ্রব্যের একচেটে কারবার শুরু করেছে ও ব্যাবিলনের ব্যাঙ্কাররা টাকা নিয়ে ব্যবসা আরম্ভ করেছে, সেই দিন থেকে আরম্ভ হয়েছে এই কাণ্ড। ঋণের উপর তারা শতকরা কুড়ি টাকা সুদ আদায় করত। একচেটে পুঁজিবাদের পুরাতন মানুষরা হচ্ছে এশিয়ার, ভূমধ্যসাগরের কিনারের লোক। রং-ব্যবসায়ীদের ট্রাস্ট, জাহাজের মালিকদের ট্রাস্ট, আমদানি-রপ্তানি, খাদ্যশস্য নিয়ে ফাটকা-কারবার, বীমা কোম্পানি ও তার মধ্যে জুয়াচুরি, কনভেয়ার-বেল্ট ব্যবস্থায় কারখানার কাজ করা, একজন কাটছে চামড়া, অন্যজন সেলাই করছে কোট, জুলুম ক'রে ভাড়া আদায় করা,

ঘরবাড়ির ঘাটতির সুযোগ নেওয়া, যুদ্ধের উপকরণ সরবরাহ করার প্রতিষ্ঠান, এবং তাদের শেয়ারহোল্ডারদের সামরিক কাজ থেকে অব্যাহতি দেওয়া—একটা ভয়ংকর পৃথিবী, একটা পুঁজিবাদের পৃথিবী। এর বিরুদ্ধে আন্দোলনও হয়ে আসছে। সাইরেনীয়ার চামড়ার কারখানার ক্রীতদাসদের জনতা, রোমক ক্রীতদাসদের লড়াই! গরিবরা সব সময়ই উপরে উঠতে চায়, ধনীরা কখনো নীচে নামতে চায় না। তিন হাজার বছরের এই-যে একটা প্রক্রিয়া এসব দেখে আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে, এসব ভালো তো নয়ই, এসব খারাপ। কিন্তু সেইসঙ্গে মনে রাখতে হবে যে, এসব প্রকৃত সত্যও।

এখানেই একটা কথা এসে যাচ্ছে—এটা কি যুক্তিসংগত, এটা কি বীরত্বব্যঞ্জক, এটা কি নীতিসম্মত কাজ যে, মানবজাতির মধ্যে অর্ধেক দারিদ্রকে যদি বলা হয় যে, তাদের অদৃষ্ট ফিরিয়ে দেওয়া হবে। এটা কি বঞ্চনা-করা নয়? বার্কহার্ট যেমন বলেছেন, এটা কি "ভীষণ বেকুবের আশা নিয়ে খেলা" না? মানুষকে বোকা বানানো! লাসালে যেমন বলেছেন এটা কি তেমনি "জনতাকে নিয়ে চালাকি করা" না? জীবনটা হচ্ছে গাছের ঝুলন্ত কমলালেবুর মত, যার লম্বা মই আছে সেই তা পেড়ে নিতে পারে ও নিজের মুঠির মধ্যে নিয়ে নিতে পারে।—একটা গোলগাল ও সোনার বর্ণের জিনিস। এটা কি সব অবস্থাটার প্রকৃত চিত্র নয়? আমি সম্প্রতি একটা জিনিস পড়েছি—আমি যা বলতে যাচ্ছি তা অবশ্য দারিদ্র্য নিয়ে কোনো কথা না, খাদ্যদ্রব্যের অন্যায্য বিলিব্যবস্থার কথাও না, তা হচ্ছে রাজনৈতিক আন্দোলন নিয়ে যেরকমের প্রচার চালানো হচ্ছে, তা নিয়ে। একজন ব্রিটিশ অর্থনীতিবিদ্ একটা মন্তব্য প্রচার করেছেন, বলেছেন, সেখানকার শ্রমিকরা নাকি এমন সুখে আছে তেমন সুখে নাকি শত শত বছর আগের জমিদার বা প্রাসাদবাসী লর্ডরাও ছিলেন না। তাঁর এ কথা বলার কারণ হচ্ছে, ভালো ঘরবাড়ি—সেকালে যা থাকত অন্ধকার, আবদ্ধ, এবং যা গরম ক'রে তোলা যেত না; ভালো খাদ্য সম্বন্ধে—সেকালে গোরু জবাই করে ফেলা হত কেবল মার্টিনমাসের উৎসবের সময় নবেম্বর মাসে, কেননা শীতকালে গোরুর খাদ্যের ব্যবস্থা করা যেত না; অসুখ-বিসুখ ব্যাপারে সেকালের লোকের চিকিৎসার তেমন ব্যবস্থা করতে না পেরে একটু অসহায় অবস্থাতেই থাকত। তাহলেই দেখা যাচ্ছে

তিন শ বছর আগে ধনীরা যে অবস্থায় বাস করত, একালে গরিবরা সেই অবস্থায় বাস করে। পরের তিন শ বছর নিয়েও এইরকম তুলনামূলক আলোচনা হবে। এই ভাবেই চলতে থাকবে শতকের পর শতক। যাকে মানবজাতির জীবনের ভোরের গোধূলিলগ্ন বলা হচ্ছে তার সঙ্গে কখনো কোনো ব্যক্তির পরিচয় হয়নি। তাহলেই আমি যে ব্যাপারকে প্রকৃত সত্য বলে দেখতে পাচ্ছি তার আদর্শগত একটা ব্যাখ্যা দেবার জন্যে আমার গরজ কোথায়, যার অমন ব্যাখ্যা সত্যেরই অপলাপ মাত্র।

শক্তসমর্থ লোকের ক্ষমতার উপরেই আর মানবিকতার শিক্ষা দেওয়া নির্ভর করে—এটাই যুক্তিপূর্ণ ও প্রকৃত সত্য ছাড়া আমি আর কিছু ভাবতে পারিনে। এইজন্যেই তুমি আছ, আর তুমি কখনো অন্য রকম হবে না; এইভাবে তুমি জীবন ধারণ করছ, এইভাবেই করে এসেছ, এইভাবেই তুমি বরাবর করবে। যার টাকা আছে সে-ই স্বাস্থ্যবান হবে; যার শক্তি আছে সেই সত্য নিয়ে শপথ করতে পারে; ক্ষমতা প্রয়োগ করতে যে জানে সেই পারে ন্যায়বিচার করতে। এইটেই হচ্ছে ইতিহাস। আজ যে শরীর পেয়েছ তা গ্রহণ কর, খাও-দাও, মরে যাও। এই মতবাদটাই যখন আত্মার পক্ষে বা মনের পক্ষে প্রয়োগ করা হয় তখন আমার কাছে বেশি যুক্তিপূর্ণ ও তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে হয়। রাজনৈতিক দলেরা সুখের যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকেন তার চেয়ে অনেক বেশি যুক্তিপূর্ণ বলে মনে করি। দশ বছর পার হয়ে এসে ও রাশিয়ার সব বিবরণ শুনে এইটেই আমার কাছে যথোচিত বলে মনে হচ্ছে। যা ঘটছে তার মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে। সর্বহারাদের নিয়ে মেতে ওঠার এই পদ্ধতি, বিপ্লবী শক্তি জমা ক'রে রাখা, নতুন করে ক্ষমতা বণ্টনের দ্বারা পুরাতন ব্যবস্থাই একটু উল্টে নেওয়া—সবই ঠিক; এ'তে সাম্রাজ্যবাদী বা পুঁজিবাদী ঝোঁক থেকেই যাচ্ছে, তার অবসান হচ্ছে না। ফরাসী বিপ্লবের প্রতিধ্বনিতে কান পেতে থাকার চেয়ে সাহস সঞ্চয় করা দরকার, ডারউইনের থিয়োরি অনুসারে নিজেদের যদি সেই সাজে সাজিয়ে নিই, আর সব ভার সমর্পণ করি ভবিষ্যতের উপর, এবং এমন একটা স্বপ্নের আবেশ তুলে যদি যা বাস্তবে রূপ দেবে অন্যে? সব ভদ্রলোকের সন্তানদের ওরা যা করতে বলেছে তা হচ্ছে প্রশস্তি রচনা করা ও প্রচারপত্র লেখা। বেলুন যখন শূন্যে উঠে যাবে তখন তারা সেখানে বসে সব দেখবে এবং সব কাজের

দায়িত্ব দিয়ে যাবে দলের ক্ষুদে-ক্ষুদে লোকেদের উপর, কমরেডদের উপর, সর্বহারাদের উপর। অবশ্য তারাই তাদের বিলাসকুঞ্জে ব'সে বা স্বাস্থ্য-নিবাসে বসে ওদের মধ্যে উত্তেজনা ও প্ররোচনা সঞ্চার করেছে।

ক ॥ একটা কথা সোজাসুজি জিজ্ঞাসা করি—এখন যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বহাল আছে আপনি কি সেই ব্যবস্থার তাহলে সমর্থক ?

খ ॥ এর সোজাসুজি উত্তর হচ্ছে—আমি মনে করি লোকে কাজ করে বাধ্য হয়ে, এবং শোষণ হচ্ছে সর্বপ্রকার জীবের একটা ধর্ম।

ক ॥ বেশ মজার কথা তো!

খ ॥ আমি সব কথা ছেড়ে দিতে পারি—কারিগর, সেপাই, বিজ্ঞান, অর্থনৈতিক থিয়োরি, সাহিত্য—সব। সভ্যতার এইসব ফাঁকা আওয়াজ। কবির কাছে আমার এই দাবি যে, সমকালের কাছ থেকে সে নিজেকে তফাতে রাখবে—এই সমকালের অর্ধেক লোকেরই তাদের ব্যক্তিগত আয় বন্ধ হয়ে গিয়েছে, তারা টাকার মূল্যহ্রাস নিয়ে তিক্ততার সঙ্গে নানান অনুযোগ-অভিযোগ জানায়; অপরাধ হচ্ছে সাতাক্কুর দল। কবি এদের থেকে আলাদা থেকে নিজের অভিরুচি অনুসারে চলতে চায়।

ক ॥ এটা কি তার শিল্পগত নীতির জন্যে ?

খ ॥ না, নীতিগত প্রশ্নে। সভ্যতার দুস্তর কর্দম মনে করে সামাজিক বন্ধনে সে সব বেঁধে রেখেছে। শিল্পীর এরকম কোনো মনোভাব নেই, সে সম্পূর্ণ স্বাধীন, সে ভিক্ষুক, সে হচ্ছে সৌন্দর্য পিপাসু। তার মাথায় যা আসে তাই নিয়ে সে আঁকিবুঁকি কাটে ক্লাউনের মত, গতকাল হয়তো এক বাউণ্ডুলে সেজে নাটক করেছে, আগামী কাল হয়তো অন্য ভূমিকা নেবে। কার কাছে সব বিষয়টা পরিষ্কার করে বোঝাব? কে যেন লিখেছে—সাত-সাতটি বছর ধ'রে আমি শহরে গ্রামে নির্জনে বসে যৎপরোনাস্তি চেষ্টা করে চলেছি, ধাওয়া ক'রে চলেছি, জেকব যেমন করেছিল র‍্যাশেলের জন্যে, কেবল এক পাতা গদ্য বা এক লাইন পদ্য লেখার জন্যে। হাইনরিখ মান্-এর সেই প্রবন্ধটার কথা আমি কাকে বলব; তিনি ফ্লবেয়ার সম্বন্ধে লিখছেন; তিনি বর্ণনা করছেন কি ভাবে ফ্লবেয়ার—যিনি এত কাল কেবল শিল্পচর্চাই করে গিয়েছেন—অন্য রকম কিছু লিখবার জন্যে তিনি চেষ্টা করছেন, মানুষের পক্ষে যা উপকারী, লোকের যা ভালো লাগবে, দৈনন্দিন জীবনের ঝঞ্ঝাটের কথা, প্রত্যেকের

সুখের কথা, কিন্তু তিনি দেখছেন তা অসম্ভব, তিনি লিখতে পারছেন না; তিনি তাঁর লেখার কৌশলের সঙ্গে এসব খাপ খাইয়ে নিতে পারছেন না; একজন উপন্যাসিকের চোখ দিয়ে তিনি ওসব ধরতে পারছেন না। অগত্যা তাঁকে লিখে যেতে হল নিজের মতন ক'রে, বাক্যের জোয়ালে বাঁধাই রইলেন তিনি। রূপকথার সেই শয্যার মতন যা নাকি কেটে বাদ দেয় মাথা ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গ। নিৎশের মতন সূক্ষ্ম মেজাজের মানুষ এই কথা লেখার সময় কতটা কষ্ট পেয়েছিল আমি তা ভাবি, তিনি লিখেছেন—যখন দেখবে কোনো মানুষ পড়ে যাচ্ছে তখন তাকে ধাক্কা দাও। কী কঠিন, কী দানবীয় কথা! কিন্তু, তাঁর উপায় ছিল না, তাকে সমুদ্রযাত্রা করতে হবে, অনন্ত মহাশূন্যের ও মহাকালের উপর তখন দ্বিপ্রহর ঘুমিয়ে পড়েছে, কেবল একটি চোখ তাঁর দিকে চেয়ে ছিল, সে চোখটি হচ্ছে সীমাহীনতা। তার নিজস্ব প্রকাশ ভঙ্গি ও অন্তর্দৃষ্টি ছাড়া তখন তার কাছে অন্য কোনো নীতি ছিল না। কেননা কবির সর্বপ্রকার নীতি গিয়ে মিশে যায় তার ব্যক্তিগত আত্ম-উৎকর্ষে।

ক॥ এটা কিন্তু ভয়ংকর কথা। কিন্তু আবহমান কাল ধ'রে কবিরা কি কথায় ও চিত্রে অশান্ত অবস্থা তুলে ধ'রে ভীতি ও ভীষণতা দূর করে মানবজাতির সেবা করে আসছে না?

খ॥ এ কথার উল্লেখ অন্য প্রসঙ্গে করে এসেছি। কবিরা তাদের গ্রহের ফেরে একটা অসম্ভবের রাজ্যে জন্মে ফেলেছে, তারা কিসের ঝাঁকিতে যেন নিজস্ব ব্যক্তিগত একটা সত্তার অতলস্পর্শ খদে স্থান পেয়ে গিয়েছে; তার শিল্পকুশলতা দিয়ে সে আলোকিত করে এই খদ, এবং প্রকৃতির নির্মম বাস্তবতা থেকে এ'কে উদ্ধার করে আনে, নীচু স্তরের ধারণার সস্তা বাহাদুরির কাছ থেকে এ'কে দূরে রাখে। আমার মনে হয়, কবির কর্তব্য হচ্ছে এই, পৃথিবীর কাছেও এই তার করনীয়। তোমার কি মনে হয় যে, কবির এটা বদ্‌লে নেওয়া দরকার? কিন্তু কী ভাবে সে বদ্‌লাবে? এ'কে আরও সুন্দর ক'রে তুলে?—সে সৌন্দর্যের মাপকাঠি কী। কোন্ রুচি অনুযায়ী? আরো ভালো—সেটা কোন্ নীতির মানদণ্ডে মাপা হবে? আরো গভীর—কোন্ অন্তর্দৃষ্টি সেটা পরিমাপ করবে? তেমন মানুষ কোথায় যে তার জ্ঞান দিয়ে বিবেচনা দিয়ে মহত্ত্ব দিয়ে এসব মেপে নেবে? কার উপরে নির্ভর করবে কবি?

গেটে যেমন বলেছেন, "তার সন্তানদের মধ্যে যে বাস করে, কিন্তু সেই জননী, তিনি কোথায়?"

ক ॥ তাহলে কবি নিজেই নিজের মান নির্ধারণ করে। সে কোনো লক্ষ্য বা কোনো গতি গ্রাহ্য করে না?

খ ॥ কবি তার নিজস্ব ও ব্যক্তিগত রুচি নিয়েই চলে। এই বোধশক্তি যথোচিত হলে তবেই সে এসব সৃষ্টিকার্য করতে পারে যাতে সে মানুষের পক্ষে যতটা সম্ভব ততটা মহৎ হয়ে ওঠে। এই মহত্ত্ব কোনো পরিবর্তন আনতে চায় না, কোনো প্রভাব ফেলতেও চায় না, তা, কেবল মহৎ হয়ে উঠতেই চায়। যুক্তির বুদ্ধিহীনতার দ্বারা চিরকাল পীড়িত হয়েও, চিরকালই মানবজাতির প্রতিভা দ্বারা সে স্বীকৃত হয়ে আসছে! মানবজাতির পরিণাম যতদূর পর্যন্ত জানি উপলব্ধি করতে পারি, তাতে মনে হয় সে কখনো কোনো দৃঢ় বিশ্বাসে নিজেকে বাঁধে নি, ঘটনাই তাকে বেঁধে রেখেছে, কখনো মতবাদে বাঁধা পড়েনি, সব সময়ই তাকে পরিচালনা করেছে একটা ভাবমূর্তি, এত দূর থেকে ঐ পরিবর্তনের দিকে তাকালে পরিবর্তনের চিহ্নই চোখে পড়ে না।

ক ॥ এই জন্যেই বুঝি কবিরা যা রচনা করেন তা কেবল স্বগতোক্তি।

খ ॥ স্বতঃস্ফূর্ত উক্তি। শিলারের কথায় এ'কে বলা যায়—প্রয়োজনের কাজে যারা বাঁধা পড়ে আছে তার উপর দিয়ে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করে বেড়ায় মুক্তমন। কিন্তু এই প্রয়োজন হচ্ছে তুরীয় অবস্থার প্রয়োজন মানুষের জ্ঞান দিয়ে যার বিচার হয় না, অভিজ্ঞতা দিয়ে যা বোঝা যায় না, এটা বস্তুবাদও নয়, সুবিধাবাদও নয়, প্রগতিশীলও নয়। এ'কে বলা যায় অদৃষ্টের সংগীত। সেই অতলস্পর্শ গভীরতা থেকে উত্থিত এ এক প্রকৃত রায়। এটা চিন্তার ও মনের এক গোপন কথা। অল্প লোকের উপরেই এ ভর করে, এবং কবি ও চিন্তাশীল ব্যক্তি এর কাছে এক হয়ে যায়। রডিনের সেই ভাস্কর্যের মত, যেখানে নিম্নদেশের প্রবেশপথে দণ্ডায়মান চিন্তাশীল ব্যক্তিকে আগে কবি ব'লে উল্লেখ করা হয়েছিল। থামের উপরে যা উৎকীর্ণ আছে তাতে দুজনের কথাই বলা হয়েছে—টিটান এক দুঃস্বপ্নে ডুবে আছে। নিটশের প্রবন্ধে ('ফিলসফি ইন দি ট্র্যাজিক এজ অব দি গ্রীক্স') যে অদ্বিতীয় মূর্তি ফুটে উঠেছে তাতেও দুজনের কথা আছে: "কোনো নতুন

রেওয়াজ এসে এদের সাহায্য ক'রে এদের কাজ সহজ ক'রে দেয় না।" তিনি লিখেছেন, এক দৈত্য অন্তহীন সময়ের মধ্য দিয়ে আর-এক দৈত্যকে ডাকছে এবং তারা দুজনে অতি উচ্চে থেকে কথাবার্তা বলে চলেছে, কিন্তু নীচে যে বামনেরা হামাগুড়ি দিতে-দিতে খেলার ছলে বকবক ক'রে চলেছে, ঐ বকবকানিতে দৈত্যদের আলোচনায় কোনো বিঘ্ন ঘটছে না।

রবার্ট মুসিল

সেই গুণহীন মানুষটি

অস্ট্রিয়া থেকে আগত রবার্ট মুসিল (১৮৮০-১৯৪২) অনেক ছোট-খাট বই লিখেছেন, অনেক প্রবন্ধ লিখেছেন, আর লিখেছেন একটি চিত্তাকর্ষক উপন্যাস "দি ম্যান উইদাউট কোয়ালিটিজ"। তিনি তাঁর সারাটা জীবন একটি বৃহৎ গ্রন্থ রচনায় কাটিয়েছেন, যদিও তা সমাপ্ত ক'রে যেতে পারেন নি। খণ্ডে খণ্ডে একটি প্রকাশিত ১৯৩০, ১৯৩৩, ১৯৪৩ ও ১৯৫২ সালে। এ'তে ঘটনা কম, কিন্তু তাঁর মননশীলতার প্রচুর নিদর্শন এতে আছে। নভেলের চিরাচরিত গড়ন এখানে একটু শিথিল হয়ে গিয়েছে অনেক আলোচনা ও সাংস্কৃতিক সমালোচনামূলক প্রবন্ধ যুক্ত করায়। ১৯১৩-১৪ সালের ভিয়েনা হচ্ছে এর পটভূমি। অস্ট্রো-হাঙ্গেরীয় রাজতন্ত্রের যে শেষপর্ব বিশ্বযুদ্ধের দিকে ঝুঁকেছিল সে সম্পর্কে মুসিলের বিদ্রূপাত্মক দৃষ্টিভঙ্গি বর্তমান কালের ইউরোপের অবশিষ্টাংশ সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। সব আইডিয়া, আইন, রাজনৈতিক দল, ধর্ম সবই তখন ভাঙনের মুখে। "গুণহীন মানুষ" হচ্ছে উলরিচ, এই চরিত্রটি মুসিলেরই আত্মচিত্র। আমাদের উদ্ধৃতাংশে আমরা উলরিচকে পাচ্ছি, পৃথিবী সম্বন্ধে তার কোনো পাকা ধারণা নেই, বস্তুতপক্ষে এমন ধারণা হওয়াও সম্ভব না। সে নিজে বিশিষ্ট একটা ব্যক্তিত্ব হয়ে উঠতে চায় না, কেননা এই জড়বাদী আধুনিক বিশ্বে তার কোনো মূল্য নেই। ক্ষণস্থায়ী বাস্তবতার যা দান, সেইটুকু মাত্র সে হবার জন্য তৈরি রইল। কিন্তু তবুও সে বাস্তবতা থেকে সরে গেল না, সে ব্যঙ্গবিদ্রূপের সঙ্গে তার সঙ্গে হালকা ভাবে মিলে রইল।

সেই গুণহীন মানুষটির মধ্যে আছে কেবল মানুষহীন গুণাবলী

কিন্তু উলরিচ সেদিন বিকেলে সেখানে গেল না। ডিরেক্টর ফিশেল তাকে একা ফেলে চলে যাবার পর সে আবার তার যৌবনকাল নিয়ে মেতে গেল, এবং তার আশ্চর্যই লাগতে লাগল কেন যে পৃথিবীর মানুষেরা সব আলংকারিক (যার আসল অর্থ অসত্য) উক্তিগুলি এত পছন্দ করে।

উলরিচ ভাবাবেগপূর্ণ মানুষ, এর দ্বারা তার ইন্দ্রিয়পরতা অবশ্য বোঝাচ্ছে না। অনেক সময় অবশ্য ইন্দ্রিয়ের দ্বারা তাড়িত হয়েছে, কিন্তু উত্তেজনার অবস্থায় বা উত্তেজিত অবস্থাতেও তার আচরণ যেমন ভাবাবেগে চালিত হয়েছে, তেমনি নিস্পৃহও সে থাকতে পেরেছে। সে প্রায় সব ব্যাপারেই মেতে উঠেছে, কিন্তু কোনো ব্যাপারের কোনো গুরুত্ব নেই জেনেও সে সেই দিকে ধাওয়া করেছে এই আশায় যে তার থেকে যদি সে কোনো প্রেরণা পায়। সুতরাং অতিরঞ্জিত না ক'রেও সে তার জীবন সম্বন্ধে বলতে পারে যে, জীবনের সবই তার কাজে লেগেছে, সে সব তার নিজস্ব না হলেও তারা যেন গুচ্ছ বেঁধেই ছিল। প্রতিযোগিতায় হোক, প্রেমে হোক, 'এক-পেনি বা এক পাউণ্ড' তার কাছে সমানই ছিল। এ'তে তার ব্যক্তিগত যে লাভ হয়েছে তা তার নিজস্ব নয়। এর মধ্যে আর যারা সংযুক্ত ছিল এ লাভ তাদেরও।

কিন্তু কেউ-কেউ এর দ্বারা অভিভূত হয়ে যায়, তারই মধ্যে যেন মিশে যায়। কিন্তু শান্তভাবে ভেবে দেখলে বোঝা যায় যে, এমন চিন্তা কত মিথ্যা। উলরিচকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয় যে, প্রকৃতপক্ষে সে কিসের মত, কিসের সঙ্গে তার মিল, তাহলে সে তার উত্তর দিতে পারবে না। কেননা অন্য অনেকের মতই সে কার্যরত থাকা অবস্থায় ছাড়া অন্যভাবে নিজেকে পরীক্ষা করে দেখার চেষ্টা করেনি। তার আত্মবিশ্বাস এতে ব্যাহত হয় নি ; কিন্তু নিজের বিবেক পরখ ক'রে দেখার জন্য সে বিশেষ ঝঞ্ঝাট করেনি। সে কি একজন শক্ত ব্যক্তিত্বের মানুষ? সে নিজেই তা জানত না। এ ব্যাপারে নিশ্চয় সে মারাত্মক ভুল করেছে। কিন্তু সে অবশ্যই এমন একজন মানুষ, নিজের শক্তিতে যার বিশ্বাস আছে। কিন্তু এ বিষয়ে তার কোনো সন্দেহ ছিল না যে, একজনের নানা অভিজ্ঞতা ও গুণ থাকা সত্ত্বেও সে সম্বন্ধে উদাসীন হয়ে থাকা হচ্ছে সাধারণ ও অসাধারণ এই দুইয়ের মধ্যের একটা পথ বেছে নেবার প্রতি মানসিক প্রবণতা। অন্যভাবে যা বলা যায় যে, কারও জীবনে কোনো ঘটনা ঘটা এবং তার নিজের কোনো কাজ করা—এ দুইটি হচ্ছে হয় খুব সাধারণ

কিংবা বিশেষ ব্যক্তিগত ব্যাপার। একটি ঘুষি খেলে তাতে কেবল আঘাত নয়, তাতে অপমানও বোধ করতে হয়, এই অপমানটাই ক্রমে অসহনীয় হয়ে ওঠে। কিন্তু কেউ-কেউ এ'কে খেলোয়াড়ি মনোভাব নিয়েও গ্রহণ করতে পারে যাতে ক্রোধ উদ্রিক্ত হতে না পারে, কিন্তু তবুও এ ব্যাপার কেউ উপেক্ষা করতে পারে না। তখন এটাকে রেখে দেয় অন্যভাবে, এর থেকে একটা লড়াই বেধে যেতে পারে! এর থেকে বোঝা যাচ্ছে এ সম্বন্ধে কিছু করণীয় আছে কিনা তারই উপরে নির্ভর করছে সব কাজ। তাহলেই অভিজ্ঞতারও একটা তাৎপর্য আছে, এ'কে সেই নিজস্ব ব্যক্তিগত ব্যাপার মনে না ক'রে তার নৈতিক শক্তির চ্যালেঞ্জ রূপেই গ্রহণ করে। কিন্তু বক্সিং-এর লড়াইয়ে যে যে বুদ্ধিকে বেশি উন্নত বলে স্বীকার করা হয়, তার প্রয়োগ-মাত্রই কিন্তু তাকে নির্মম ও নির্দয় আখ্যা দেওয়া হয়, যারা বক্সিং জানেনা জীবনের প্রতি তাদের বুদ্ধিদীপ্ত দরদ থাকার জন্যেই এমন হয়। এই রকম আরও অনেক ভাবে পরিস্থিতি বিবেচনা ক'রে দোষ-গুণ বিচার করা হয়ে থাকে। একজন খুনী যদি বেশ ভেবে-চিন্তে ও যোগ্যতার সঙ্গে এগিয়ে যায় তাহলে তার এই কাজকে বর্বরতা বলা হবে। একজন অধ্যাপককে যদি দেখা যায় যে কোনো সমস্যায় পড়ে তার সমাধানের জন্যে তিনি তাঁর স্ত্রীর হাত ধরে চলেছেন, তাহলে তাঁকে অপণ্ডিত বলে ভর্ৎসনা করা হবে। একজন রাজনীতিক যদি তার নিহত শত্রুর বুক মাড়িয়ে চলে যান তাহলে তার নীচ বা মহৎ বলা হবে তাঁর জীবনের সাফল্যের পরিমাণ দেখে নিয়ে। অপরপক্ষে, সৈনিক, জল্লাদ বা অস্ত্রচিকিৎসক ইত্যাদির ঠাণ্ডামাথায় রক্তপাত করা কাজটার নিন্দা হবে না, কিন্তু অন্যদের বেলায় তা হবে। এ রকম দৃষ্টান্ত দেবার আর দরকার নেই।

এই যে অনিশ্চয়তা- -এইটেই উলরিচের জীবনের বিশাল পটভূমিতে একটা ব্যক্তিগত সমস্যা। আগের কালে স্বচ্ছতর বিবেক নিয়ে একজন একটা ব্যক্তি হয়ে উঠতে পারত, কিন্তু এখন তা হয় না। তখন হয়তো ঈশ্বর মানুষকে আরও ভীষণ ভাবে আলোড়িত করতেন, শিলাবৃষ্টি অগ্নিকাণ্ড মহামারী যুদ্ধ আগে বোধ হয় একালের চেয়ে বেশি ছিল; কিন্তু তখন সংঘবদ্ধভাবে করা হত, মাঠ-কে-মাঠ উজাড় করা হত। সেকালের মানুষও ছিল ক্ষেতে রাখা শস্যের মতন। তখন মানুষের ব্যক্তিগত গতিবিধির একটা কারণ ছিল, এবং সে কারণ পরিষ্কার ক'রে বুঝিয়ে বলা যেত। কিন্তু এখন দায়িত্বের মাধ্যাকর্ষণ-

শক্তি ব্যক্তির জিম্মায় নেই, তা আছে বিভিন্ন জিনিসের সম্পর্কের মধ্যে। কেউ কি লক্ষ্য করে দেখে নি যে, অভিজ্ঞতা এখন নিজেকে মানুষের কাছ থেকে পৃথক করে নিয়েছে? তা এখন গিয়ে উঠেছে রঙ্গমঞ্চে, ঢুকেছে বইতে, বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানের বা অভিযানের রিপোর্টের মধ্যে, তা এখন গিয়েছে ধর্মীয় বা ঐ ধরণের বিশ্বাসে বিশ্বাসী সংঘের মধ্যে; সামাজিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার নামে অন্যের মাথায় কাঁঠাল ভাঙার মতন ঐ সব সংস্থা এই অভিজ্ঞতা আরও ব্যাপকভাবে অর্জন করতে চায়। অভিজ্ঞতাকে আর কাজের মধ্যে পাওয়া যায় না, এখন তা ঘুরে বেড়াচ্ছে বাতাসে। তাহলেই একালে কে বলতে পারে যে, তার রাগ তারই রাগ—কেননা তার চেয়ে অনেক বেশি তো আরও অনেকেই জানে। এমন একটা পৃথিবীর পত্তন হয়েছে যেখানে অনেক গুণের চর্চা হচ্ছে, কিন্তু তার মধ্যে মানুষ নেই, অনেক অভিজ্ঞতা অর্জিত হচ্ছে, কিন্তু তা অর্জন করার জন্যে মানুষ নেই। এতে মনে হচ্ছে, অবস্থা যদি একেবারে আদর্শস্থানীয় হয়ে যায় তাহলে, মানুষ নিজের জন্যে কোনোই অভিজ্ঞতা পাবে না, এবং তার ব্যক্তিগত দায়িত্বও লোপ পাবে। মানুষ আগে ছিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্রমণির মতন, তার সে দিন কয়েক শতক হল গত হতে চলেছে, এ'তে তার ব্যক্তিত্বের উপরেই ঘা পড়েছে। অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে অভিজ্ঞতার সঙ্গে পরিচিত হওয়া, কাজের সম্বন্ধে বলা যায় যে কাজে লিপ্ত হওয়া—কিন্তু এই ধারণা এখন মানুষকে প্রায় বেকুবে পরিণত করেছে। এ কথা অবশ্য স্বীকার করতে হবে যে, এখনও এমন লোক আছে যারা ব্যক্তিগত ভাবে অভিজ্ঞতা অর্জন করে, তারা বলে 'আমরা গতকাল অমুকচন্দ্র অমুকের বাড়িতে গিয়েছিলাম' কিংবা 'আমরা আজ এই কাজটি বা ঐ কাজটি করব'। এসব বিষয়ের মধ্যে কোনো তাৎপর্য বা সার আছে কিনা তা না ভেবেই তারা ঐ সব কথা বলে আনন্দ পায়। তারা যা ছোঁয় তাই তাদের ভালো লাগে এবং তারা হচ্ছে যতটা সম্ভব ততখানিই ব্যক্তি। পৃথিবীও এদের সংস্পর্শে আসতে পারলে অমনি স্বতন্ত্র ও সাধারণ হয়ে যেতে পারবে, ও রামধনুর মত নিজের বর্ণবৈভবে উজ্জ্বল হয়ে দেখা দেবে। ঐসব মানুষেরা নিশ্চয় খুব সুখী; কিন্তু অন্যান্যদের কাছে এ ধরণের মানুষ অবিশ্বাস্য বলে মনে হয়; কিন্তু কেন অবিশ্বাস্য মনে হয় তার সঠিক হেতুটা কিন্তু এখনও প্রতিষ্ঠিত হয় নি।

এইসব কথা ভাবতে-ভাবতে হঠাৎ উলরিচ স্মিত হেসে নিজের কাছেই

স্বীকারোক্তি করল, সে নিজেকেই বলল যে, এইসব কারণেই সে হয়ে উঠেছে একটা 'চরিত্র', যদিও ঐ বস্তুটি তার মধ্যে বিন্দুবিসর্গও নেই।

বারটোল্ট ব্রেশ্‌ট্‌

বারটোল্ট ব্রেশ্‌ট্‌ (১৮৯৮-১৯৫৬) হচ্ছেন বিশ শতকের একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি ও নাট্যকার। তাঁর রচিত নাটক ও সেইসঙ্গে নাটক সম্বন্ধে লিখিত তাঁর অনেক প্রবন্ধ আমাদের কালের যাবতীয় নাট্য-সম্পর্কিত রচনার উপর বেশ প্রভাব ফেলেছে, এবং এ ক্ষেত্রে বেশ প্রেরণাও দিয়েছে। এক অনুপম পদ্ধতিতে ব্রেশ্‌ট্‌ মহৎ শিল্পের সঙ্গে ঐতিহাসিক-রাজনৈতিক উদ্দেশ্য-প্রণোদিত মনোভাব মসৃণ ভাবে মিশিয়ে দিতে পেরেছেন।

১৮৯৮ সালে দক্ষিণ-জার্মানীর অগ্‌সবার্গে ব্রেশ্‌টের জন্ম, তিনি মিউনিকে ও বার্লিনে লেখক ও নাট্য-উপদেষ্টা হিসেবে অতিবাহিত করেন; ১৯৩৩ সালে হিটলার যখন ক্ষমতা দখল করেন, তিনি তখন দেশ ত্যাগ ক'রে প্রথমে যান অষ্ট্রিয়ায়, তার পর ডেনমার্ক সুইডেন ও রাশিয়ায়, এবং অবশেষে আমেরিকায়। যুদ্ধ শেষ হবার পর তিনি জার্মানীতে ফিরে আসেন, এবং পূর্ব-বার্লিনে বসবাস করতে থাকেন, এখানে তিনি তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত তাঁর নাটক প্রযোজনা নিয়েই কাটিয়েছেন। মধ্যবিত্তদের সম্পূর্ণ রূপে বাতিল ক'রে দিয়েই তাঁর জীবনের সূত্রপাত; মধ্যবিত্তদের জীবনধারণ প্রণালী তাদের অভিমত ইত্যাদি কিছুই পছন্দ করেননি ব্রেশ্‌ট্‌, বিশেষ ক'রে তিনি অপছন্দ করেছেন তাদের থিয়েটর, যা নাকি দর্শকদের মনোরঞ্জন করার জন্যই নাট্য-পরিবেশন করে, কিন্তু দর্শকদের উপর যার এতটুকু প্রভাব পড়ে না। তাঁর সমাজ-ধ্বংসকারী মনোভাব সত্ত্বেও এই সময়ে তাঁর মধ্যে ইতিবাচক মনোভঙ্গি দেখা যায়, তা হচ্ছে মানুষের ব্যক্তি-জীবনের বাধাহীন পরিপূর্ণতার প্রতি তাঁর অবস্থা। কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই তাঁর জীবনের গতি বদলে গেল, তিনি মার্কসবাদে বিশ্বাসী হয়ে উঠলেন, এর পর থেকে তাঁর নাটকে ও অন্যান্য রচনায় এই বিশ্বাসই প্রকট হয়ে ওঠে। তিনি নূতন ধরণের থিয়েটর গড়ে তুললেন, যাতে বর্তমান যুগকে সেখানে প্রতিফলিত করা যায়, এবং সঙ্গে পরিবেশনার পদ্ধতিতে যাতে দর্শকের উপর তার প্রভাব পড়ে। যে-সব শক্তির সমবায়ে মানুষের ভাগ্য নির্ধারিত হয় তিনি তা মঞ্চে মেলে ধরেন, যেমন—সামাজিক শ্রেণীবিন্যাস, অর্থনৈতিক উন্নয়ন-তৎপরতা, ও ঐতিহাসিক পরিবেশ। এসব তিনি এমন

ভাবে করেন যে, আগের কালের "থিয়েটরী জাদু"র মতন এসব কেবল ভাবাবেগ এনে দেয় না, দর্শকদের চিন্তা করতে শেখায়। ব্রেশ্‌টের থিয়েটরে, নাটক নাটকের মতনই পরিবেশিত হত; অভিনেতারা আলাদা-আলাদা মনোভঙ্গি নিয়ে মঞ্চে উপস্থিত হয়ে দর্শকদের বলত তাঁরা যা দেখলেন তা সমালোচনা করুন। স্লোগান-লেখা ব্যানার, আনুষঙ্গিক গান, কিংবা স্টেজে উঠে ভাষ্যকারের সামাজিক অবস্থার বিবরণ দান—এসব ছিল ব্রেশ্‌টের নাটকের বিশেষত্ব। মঞ্চে যা ঘটত তা ছিল কিছুটা বিপরীত ব্যাপার বা অস্বাভাবিক, দর্শকরা যাতে সব মেনে না নিয়ে বিষয়টি নিয়ে একটু ভাবে, এবং নিজেরাই একটা সিদ্ধান্তে আসে ও সমস্যার সমাধান খোঁজে—এই ছিল এর উদ্দেশ্য। পৃথিবীটা যে পরিবর্তন করারই একটা বিষয় তা দেখানো হত, এবং ব্রেশ্‌টিয় থিয়েটরের উদ্দেশ্যই ছিল পৃথিবীতে পরিবর্তন আনা। মধ্যবিত্ত সমাজ থেকে যার উৎপত্তি, এই ধরণের থিয়েটরের লক্ষ্যই ছিল সেই সমাজ, সেই সমাজের অবস্থা এমনভাবে দেখানো হত যে, দর্শকরা এই অসামঞ্জস্য দূর ক'রে একটা পরিবর্তন আনার উপায় সম্বন্ধে চিন্তা করতে বাধ্য হত, একটা সামাজিক শৃঙ্খলা আনার কথা ভাবত। এ ব্যাপারে তাঁর দক্ষতা ক্রমেই বেড়ে চলেছিল, তিনি তাঁর নাটকে তাঁর নিজেরই উদ্‌ভাবিত পদ্ধতি প্রয়োগ করলেন, তিনি কথোপকথনের প্রথা প্রচলন করলেন, এ'তে দর্শকরাও নাটকের পাত্রপাত্রীর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করতে আরম্ভ করল। কিন্তু পৃথিবীর পশ্চিমাঞ্চলে থিয়েটর-দর্শকদের মন সমাজ-বিজ্ঞানী কাঠামোয় গড়া বলেই সেখানে ব্রেশ্‌টের নাটকের বিশেষ গুরুত্ব হয়নি। কিন্তু এ ছাড়াও একটা গুরুতর প্রশ্ন আছে, থিয়েটরের সামান্য প্রভাবকেই ব্রেশ্‌ট অতিরঞ্জিত করে দেখেছিলেন কি না, এবং সাধারণ দর্শকদের সমালোচনামূলক তর্ক করার মত যোগ্যতা আছে কিনা। যখন তিনি নির্বাসিত জীবন যাপন করেছিলেন সেই সময়ে ব্রেশ্‌টের রচিত উল্লেখযোগ্য নাটক হচ্ছে—"লাইফ অব গ্যালিলিও" "মাদার কারেজ অ্যাণ্ড হার্ চিলড্রেন" এবং "ককেশিয়ান সার্ক্‌ল অব চক"।

ৎসেচওয়ানের ভালো লোকটি

তাঁর "দি গুড পার্সন অব ৎসেচওয়ান" নাটকের শেষে ব্রেশ্‌ট যে সমাপ্তি-ভাষণটি দিয়েছেন তাতে তিনি তাঁর রচনার উদ্দেশ্য কি তা বলার জন্যে অনেক কথার অবতারণা করেছেন। সমস্যাটা কি তা নাটকের মধ্য দিয়ে দর্শকের

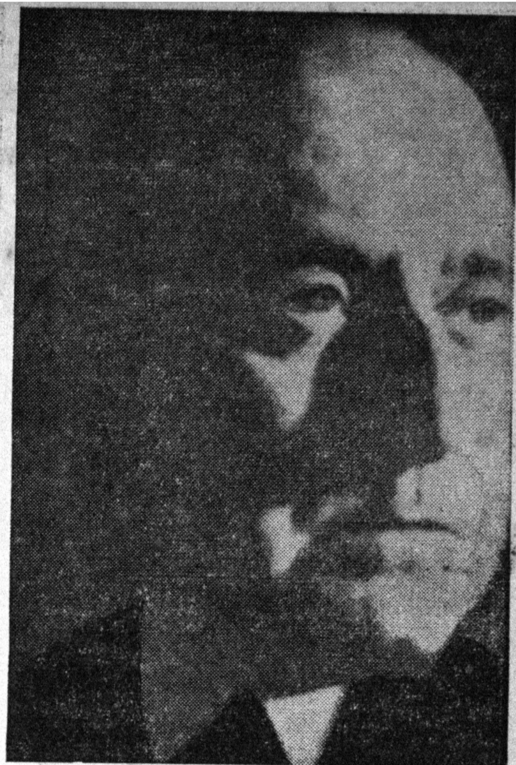
কাছে তুলে ধরায় দর্শকরাই তার সমাধান খুঁজে বার করবে। সমাধান পেয়ে গেলেই—অর্থাৎ সম্পদের সমবণ্টনের মধ্য দিয়ে সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠনের পরই—তারা নিজেদের গরজেই রাজনৈতিক কর্মতৎপরতা আরম্ভ করতে পারে। মঞ্চের উপরে অনুষ্ঠিত ঘটনা থেকেই সমস্যাগুলির উদ্‌ভব ঘটতে লাগল, যেমন—একজন ভালো ও সুখী মানুষের সন্ধানে তিনজন দেবতা এলেন ৎসেচওয়ানে ; তাঁরা শেন তে নামক একজন বেশ কাজের গণিকাকে পেলেন, এই গণিকা তখন অন্তঃসত্ত্বা, বাচ্চাকে যে ভালোভাবে লালন করতে চায়। কিন্তু সমাজের যে অবস্থা বর্তমান, তাতে শেন তে-র অনেক গুণ থাকা সত্ত্বেও তার অনেক অসুবিধে। যারা তাকে টাকাকড়ি দেয় তারা তাকে চাপে রাখে, যারা নিজেরাই অনাহারী তারা তাকে প্রতারণা করে, শোষণ করে। যাকে বলে শরীর ও আত্মা একত্রে রাখা, তা করার জন্যে ও তার ভাবী শিশুর জন্যে কিছু সংস্থান রাখার উদ্দেশ্যে শেন তে নিজেই তার খুড়তুতো বোন শুই তা-র ছদ্মবেশ নিল। এই ভূমিকায় নির্দয় ভাবে সে যত খুশি অর্থ আদায় করতে লাগল, তার পর খুলল একটা ফ্যাক্টরি, এবং পুঁজিবাদীদের শোষণের পদ্ধতিতে চালাতে লাগল ফ্যাক্টরি। দেবতারা যখন দেখলেন যে, এ একাই ডবল জীবন যাপন করছে, তখন তাঁরা হতভম্ব হয়ে স্বর্গে পালিয়ে গেলেন। দুঃখী শেন তে একা পড়ে রইল।

নাট্যশেষের কথা

যবনিকার সামনে এসে দাঁড়াল একজন অভিনেতা, এবং মার্জনা-প্রার্থনার মত ক'রে দর্শকদের বলছে—

অভিনেতা ॥

ভদ্রমহোদয়, মহিলাবৃন্দকে বলি, দমবেন না আপনারা,
আমরা জানি আজ সন্ধ্যায় ভ্রূকুটি করছেন যেন কা'রা।
মনে-মনে ইচ্ছে ছিল আসব সোনা-বাঁধা অতিকথা
কিন্তু শেষে দেখি এসে ভেস্তে গেছে, হায়, সমস্ত তা।
অবশ্যই এ রকম ব্যবস্থায় দায় এঁটে ওঠা,
বন্ধ হল এ নাটক, খোলা রইল সমস্যাটি গোটা।
বিশেষত, আপনাদের আনন্দেই আমাদের জীবনধারণ
দর্শকবৃন্দকে দুঃখী কেন তবে রাখব অকারণ।

ফ্রানৎস কাফকা
(১৮৮৩-১৯২৪)

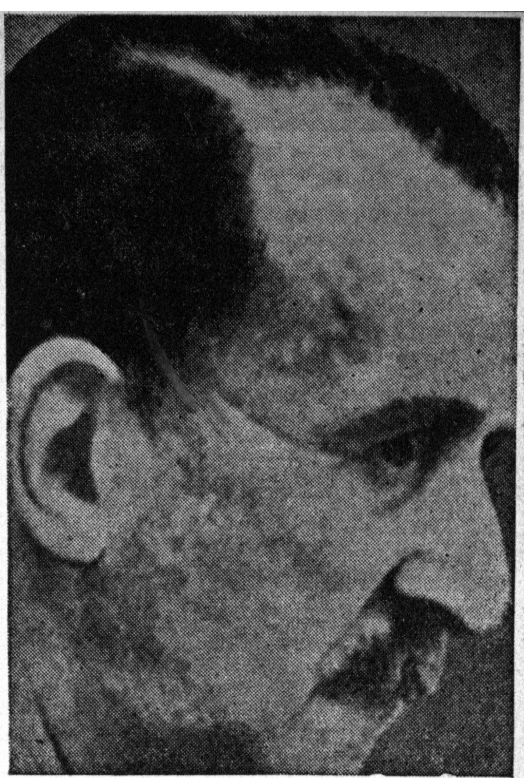
গটফ্রায়েড বেন
(১৮৮৬-১৯৫৬)

রবার্ট মুসিল
(১৮৮০-১৯৪২)

বারটোল্ট ব্রেশট
(১৮৯৮-১৯৫৬)





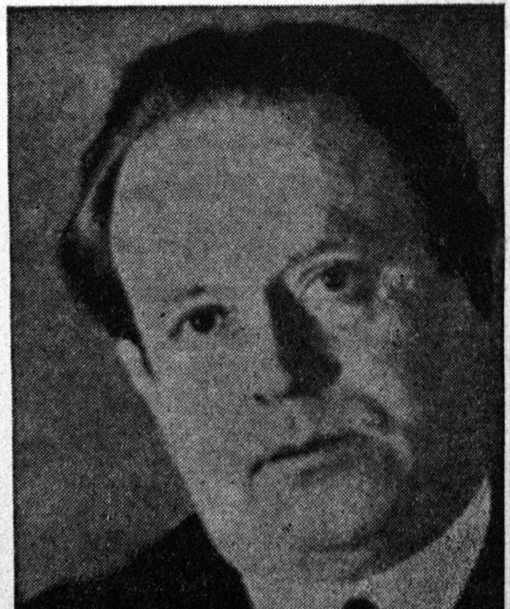
অ্যালফ্রেড ডবলিন
(১৮৭৮-১৯৫৭)

হাইনরিখ মান
(১৮৭১-১৯৫০)

টমাস মান
(১৮৭৫-১৯৫৫)

কুরট টুচলস্কি
(১৮৯০-১৯৩৫)





আশাবাদী যাঁরা তাঁরা যতই করুন গিয়ে ভান
আপনারা সুপারিশ না করলে যে নাটকের নেই পরিত্রাণ।
মঞ্চাতঙ্ক যাকে বলে সে জন্যে কি ভুল হল অনেক-কিছুই ?
এমন ঘটেই থাকে। এ সম্বন্ধে পরামর্শ নেই কি কারুই ?
আপনারা কী বলেন ? হয়তো কিছুরই নেই সামান্য শৃঙ্খলা।
মানুষেরা হবে আরো ভালো ? আর পৃথিবীরও চাই যে বদলা।
দেবতা হবেন দেবতুল্য ? কিংবা কেউ আর থাকবে না কোথাও
আমাদের কথা বলি—আমরা খুশি, করেছি ভালোও।
একমাত্র সমাধান সব সমস্যার আমরা জানি
আপনারা যেতে-যেতে সে কথা করুন কানাকানি—
এ সবের কী ব্যবস্থা নেওয়া হবে সমীচীন এবং সঙ্গত
ভালো লোকে যাতে থাকে ভালো, আর সুখেও অন্তত।
ভদ্রমহোদয় ভদ্রমহিলাবৃন্দকে বলি তবে—
আনন্দিত সমাপ্তিই হতে হবে, হবে হবে হবে।

লা সিওতাতের সৈনিক

ফাসিস্ট ইতালীর সেনাবাহিনী যখন ইথিয়োপিয়ায় প্রবেশ করে, সেই সময়ে, ১৯৩৫ সালে, ব্রেশ্‌ট্ লেখেন "দি সোলজার অব লা সিওতাত"। যুদ্ধে আহত হয়ে এই সৈনিকটি একেবারে জড়পদার্থের মতন হয়ে যায়, এবং সে তার বিকল অঙ্গপ্রতঙ্গ দেখিয়ে ভিক্ষে করে। এই সৈনিকটি যাবতীয় সৈনিকের প্রতীক মাত্র, হাজার-হাজার বছর ধ'রে যারা শাসকদের হয়ে লড়াই করেই যাচ্ছে ; এতে তারা নিজেরাই নিপীড়িত হচ্ছে, এ'তে তাদের নিজেদের কোনো উৎসাহও নেই কোনো লাভও নেই। যুদ্ধের ক্রমবর্ধমান পাগলামিটা লক্ষ করে নিয়েছেন ব্রেশ্‌ট্, এবং জানতে চাচ্ছেন—অবস্থার পরিবর্তন ঘটবে কি না, এবং এসবের হাত থেকে পরিত্রাণ আছে কি না।

প্রথম-বিশ্বযুদ্ধের পর, ফ্রান্সের দক্ষিণে দা সিওতাত নামক এক ছোট বন্দরের শহরে একটা জাহাজ জলে ভাসানো নিয়ে যে উৎসব হয়, তখন এক সরকারী বাগানে আমরা একটা ব্রাঞ্জের মূর্তি দেখি, মূর্তিটা এক ফরাসী সৈনিকের, তার চার পাশ ঘিরে লোকের ভিড়। আমরা মূর্তিটার কাছে

গেলাম, দেখলাম ওটি একটি জ্যান্ত মানুষ সেখানে দাঁড়িয়ে আছে একেবারে নিশ্চল হয়ে, ধূসর রঙের একটা লম্বা কোট তার গায়ে, মাথায় টিনের টুপী, তার বেয়োনেট তাক করা, জুন মাসের রোদে সে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে স্তম্ভের এক ভিত্তির উপরে। তার মুখ ও হাত ব্রোঞ্জের রঙে রং করা। তার একটা মাংসপেশীও নড়ছে না, চোখের পাতাও পড়ছে না।

তার পায়ের কাছে একটা কার্ডবোর্ড ওই ভিত্তির গায়ে দাঁড় করানো, তাতে লেখা আছে—

মানব মূর্তি

(ল্য'ওম স্তাতু)

আমি, চার্লস লুই ফ্রানশার্ড,···নম্বর রেজিমেন্টের একজন প্রাইভেট, ভার্দুঁতে আমাকে জীবন্ত সমাধি দেওয়ায় আমি সম্পূর্ণ নিশ্চল হয়ে থাকার ক্ষমতা অর্জন করেছি, আর, একটা স্ট্যাচুর মতন একেবারে নিশ্চল হয়ে যতক্ষণ খুশি থাকায় অভ্যস্ত হয়েছি। আমার এই কৌশল নিয়ে অনেক অধ্যাপক অনেক পরীক্ষা করেছেন এবং বলেছেন যে, এটা একটা দুর্বোধ্য ব্যাধি। একটা পরিবারের বেকার এই বাবাকে অনুগ্রহ করে যৎকিঞ্চিৎ দান করে যান।

প্লাকার্ডটির পাশে রাখা প্লেটে আমরা কিছু রেজকি ছুড়ে দিলাম, এবং মাথা নাড়তে-নাড়তে সেখান থেকে চলে গেলাম।

এখানে সে দাঁড়িয়ে আছে, আমাদের মনে আপাদমস্তক সে বুঝি অস্ত্র-সজ্জিত, হাজার-হাজার বছরের সেই সৈনিক যার ধ্বংস হয় না; এ সে'ই যাকে নিয়ে ইতিহাস তৈরি হয়েছে, এ সে'ই যে আলেকজাণ্ডারকে সিজারকে নেপোলিয়নকে বড়-বড় কাজ করিয়েছে, যার বিবরণ আমরা পাঠ্যকেতাবে পাড়ি। এ সে'ই। যার চোখের পাতা কাঁপে না। এ হচ্ছে সাইরাসের তীরন্দাজ, ও হচ্ছে ক্যাম্বিসেসের সেই ধারালো চাকা-ওলা রথের চালক—যাকে মরুভূমির বালুকা চিরদিনের জন্যে কবর দিয়ে রাখতে পারে নি, এ হচ্ছে সিজারের চতুরঙ্গ বাহিনীর একজন, চেঙ্গিস খাঁর বল্লমধারী অশ্বারোহী, চতুর্দশ-লুইয়ের দেহরক্ষী, প্রথম-নেপোলিয়নের পদাতিক। তার যে ক্ষমতা তা এমন-কিছু অস্বাভাবিক নয়, যতরকম ধ্বংসাত্মক অস্ত্র হতে পারে তাকে দিয়ে তার সবই ব্যবহার করানো হয়েছে, সুতরাং তার মনোভাব প্রকাশ করার ক্ষমতাও সে রাখে। সে থাকে (সে বলে) পাথরের মত, মৃত্যুর মুখে তাকে

পাঠালেও তার কোনো ভাবান্তর হয় না। সর্ব যুগের বর্শায় সে বিদ্ধ হয়েছে—পাথরের ব্রোঞ্জের লোহার, যুদ্ধের রথে সে পিষ্ট হয়েছে,—আর্টাজেরাক্সেসের ও জেনারেল লুনডেনডর্ফের, হ্যানিবালের হাতির পায়ের চাপে ও অ্যাটিলার অশ্বক্ষুরে সে দলিত হয়েছে, কয়েক শতাব্দীর চেষ্টায় ক্রমোন্নতিশীল কামান থেকে নিক্ষিপ্ত উড়ন্ত ধাতুর টুকরোয় ক্ষতবিক্ষত হয়েছে; উড়ন্ত পাথরেও অবশ্য সে ক্ষতবিক্ষত হয়েছে পুরাকালে, বুলেটে বিদ্ধ হয়েছে—তার আকার কখনো পায়রার ডিমের মত বড়, কখনো মৌমাছির মত ছোট। তার বিনাশ নেই, সে দাঁড়িয়ে আছে, যুগে-যুগে নূতন-নূতন ভাষায় শুনে যাচ্ছে আদেশ, কিন্তু কেন এ আদেশ তা সে জানে না। যে ভূমি সে জয় করেছে সে ভূমি সে অধিকার করে নি, রাজমিস্ত্রী যেমন যে বাড়ি বানায় তাতে বাস করে না। যে দেশ সে রক্ষা করেছে, সে দেশের সে কেউ নয়। এমন কি তার অস্ত্রশস্ত্র উপকরণাদিও তার নয়। কিন্তু বিমান থেকে বোমার বেশে মৃত্যু বর্ষণের নীচে সে দাঁড়িয়ে থাকে, তার পায়ের নীচে গর্ত ও মাইন, মহামারী ও মাস্টার্ড গ্যাস তার চারদিকে, জ্যাভেলিন ও তীর, ট্যাঙ্ক, গ্যাস—এ সবের জন্যে টোপ দেওয়া হয় তার রক্ত-মাংস। তার সম্মুখে শত্রু, পিছনে জেনারেল।

সে অদৃশ্য হাত জ্যাকেট বানায়, সেই হাতই নির্মাণ করেছে অস্ত্রশস্ত্র, তৈরি করেছে তার পায়ের বুট-জুতো। সেই অদৃশ্য পকেটগুলো ভরতি করে দিয়েছে সে। প্রত্যেকে দেশের প্রত্যেক ভাষার মাত্রাহীন চীৎকার তাকে এগিয়ে যেতে বলেছে। এমন কোনো দেবতা নেই যিনি তাকে আশীর্বাদ না-করেছেন। তার ধৈর্যের কদর্য অসাড়তা নিয়ে সে যন্ত্রণা পাচ্ছে, সে অভেদ্য—এই হচ্ছে তার এক দুরারোগ্য ব্যাধি।

এটা কোন্ ধরণের জীবন্ত সমাধি, আমরা ভাবলাম, যার জন্যে তার এই ব্যাধি; এই ভীতিপ্রদ ভয়ংকর ও ভীষণ সংক্রামক এই ব্যাধি?

আমরা নিজেদেরই জিজ্ঞাসা করতে লাগলাম এ ব্যাধি কি নিরাময় হবে না কখনোই?

বিষাদ সম্বন্ধে ত্রিমুখী আলোচনা

এখানে যেটি উদ্ধৃত হচ্ছে ব্রেশ্‌টের আলোচনামূলক রচনায় এই রকম কথোপকথনের মধ্যে বিষয়টি উত্থাপনের পদ্ধতি তিনি অনেক জায়গায় গ্রহণ করেছেন। এ'তে বক্তব্য বিষয় ও বিরোধী বক্তব্য পরিষ্কার করে বুঝিয়ে বলা

সম্ভব। "টমাস" বলছে নতুন থিয়েটরের পক্ষে, এটিই পৃথিবীতে পরিবর্তন আনতে সক্ষম বলে তার বিশ্বাস ; বিয়োগান্তক বলতে যে জিনিস চলে আসছে, তার সম্বন্ধে আর সে কিছুই জানে না। বিষাদময়তা নিয়ে এই আলোচনা, দর্শকদের এর প্রভাব কতটা, তাও আলোচ্য বিষয় ; এবং দর্শকদের সঙ্গে সম্পর্ক নেই এমন থিয়েটর সম্বন্ধেও এই আলোচনা অনেক আলোকপাত করেছে।

কার্ল॥ আমি যখনই তোমাকে বলতে শুনি যে, তুমি থিয়েটরকে নতুন ভাবে গড়ে তুলতে ইচ্ছে করছ, তখনই আমার মনে হয় যে, হালকা-মেজাজী নাটক থেকে উপাদান নিয়ে তুমি তা গুরুগম্ভীর নাটকে ঢোকাতে চাও। এর পরিণাম যা হবে তা পাওয়া যায় খুব নীচুস্তরের প্রহসনেই। এমনি একটা প্রহসনের কথা আমার মনে পড়ে, যাতে দর্শকরা প্রহসনটির লোকটিকে নিয়ে খুব হেসেছিল। ঐ লোকটি স্বেচ্ছায় তার মেয়েকে তাকে দেখাশুনার ভার দিয়েছিল, একদিন লোকটি এক প্রণয়-অভিযানে বেরোবার জন্যে তৈরি হচ্ছে, তখন মেয়েটি দাঁড়াল পথ রুখে। দর্শকদের সঙ্গে লোকটিও যেন আবিষ্কারই করে বসল যে, যাকে সে ভেবেছিল তাকে দেখাশুনা করা, সেইটেই আসলে ভয়ানক অত্যাচার। সামাজিক আচরণেরই এটা কি, যাকে অবস্থান্তর, তাই নয়, তারই একটা দৃষ্টান্ত নয় ?

টমাস॥ হ্যাঁ। তাই।

কার্ল॥ প্রহসনের উপাদান এইভাবে যদি গুরুতর নাটকে নিয়ে আসা যায় তাহলে কি বিষাদান্তক নাটক মার খায় না ?

লুকাস॥ আমারও মনে হয় এরকম করলে ট্রাজিডির সর্বনাশ হবে। কেননা, সংসারের নানারকম বিপর্যয়ের মধ্যে যেসব মজার মজার ঘটনা ঘটছে এখানে তাই এনে ফেলা হয়েছে, এ'তে সাধারণ ঘটনার সঙ্গে একটা বিশেষ ঘটনার যেন তুলনা করা হয়েছে, এবং তাই দিয়েই বিষাদকে ঘনীভূত করে তুলতে চাওয়া হয়েছে ; কিন্তু বিপর্যয়টা এমন ভাবেই দেখানো হয়েছে যা নাকি আকছার যেসব ঘটনা ঘটে তাই চিত্রিত করে তোলার মতন। এটা কি তেমনি নয় ?

টমাস॥ হ্যাঁ। ঠিকই বলেছ। আমি কেবল এই কথাই বলব যে, শেকস্পীয়রও বিষাদের চিত্র বেশি হৃদয়গ্রাহী করার জন্যে তার পাশাপাশিই

কয়েকটা হাসির ঘটনা ঘটিয়েছেন ; তাঁর অনুকরণ যাঁরা করেছেন এমন কয়েকজন সামান্য ব্যক্তি অবশ্য বিষাদের পাশেই বেশ মজাদার দৃশ্য দেখিয়েছেন। এটা নিশ্চিত ভাবে বুঝে নিতে হবে যে, মজার দৃশ্য দেওয়ার জন্যেই শেকস্‌পীয়রের আসল মেজাজটা মার খেয়ে যায় না, বরঞ্চ সেই মেজাজ আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

লুকাস॥ কিন্তু তোমার নাটকের মূলত যে বিষাদময়তা, তা কিন্তু নষ্ট হয়ে যায়। এ'তে আমি আশ্চর্য হইনে। আমি সেখানে দেখতে পাই কল্পনারই বাহাদুরি, মনে-মনে একটা আশা থেকে যায় যে, সমাজের গ্লানি মেলে না ধরলে দর্শকদের কাছ থেকে স্বতঃস্ফূর্ত হাততালি পাওয়া যাবে। এমন আশাও করা হয়ে থাকে যে, সমাজের গ্লানি দূর করার জন্যে যে সংগ্রাম চলেছে, পীড়িত জনগণের যে অনুযোগ-অভিযোগ শোনা যাচ্ছে, এসব অসাম্য দূর হয়ে যাবেই, এবং এসবই হচ্ছে সাময়িক ব্যাপার।

টমাস॥ আমি বলি কি, এসো-না যতক্ষণ পারি ততক্ষণ আমরা আলোচনা চালিয়ে যাই, এর মধ্যে কল্পনা আশাবাদ পরমানন্দ—এসব কথা না তুললেই ভালো। এটা ঠিক যে "ট্র্যাজিক" শব্দটা শোনামাত্রই সকলে একটা সৌন্দর্যলোকে চলে যায়। এই প্রলোভনে আমরা বাধা দিতে পারি। আমাদের বন্ধু কার্ল এতক্ষণে মাত্র এই দিকেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যে, আমরা, নবীনেরা, গুরুতর নাটকের মধ্যে এমন-সব উপাদান এনে ফেলেছি যা-নাকি কেবলমাত্র কমিক নাটকেই এতদিন জায়গা পেত। এখন, এটা বেশ পরিষ্কার হয়ে গেল যে, পুরাতনদের বিষাদাত্মক মেজাজ অনেকটাই নষ্ট হয়ে যাবে যদি নায়কের অদৃষ্টের দিকে একেবারেই নজর দেওয়া না যায়, যদি সেই অদৃষ্টকে এমন-ভাবে চিত্রিত করা না হয় যা নাকি একটা স্থায়ী ব্যাপার এবং যার পরিবর্তন কোনো মানুষ করতে পারবে না আর যা সমস্ত মানুষের মধ্যেই ব্যাপ্ত হয়ে আছে : নবীনের দল কিন্তু এই কাজ করতে চায়। নায়কের সঙ্গে একত্র হয়ে নৈরাশ্য বোধ করার জন্যে তার হতাশার ভাগ নিতে হবে। তার অদৃষ্টকে নিয়ন্ত্রণ করছে যে আইন সে সম্বন্ধে তার অন্তর্দৃষ্টির সঙ্গে সহানুভূতিশীল হতে হলে আমাদের বুঝে নিতে হবে ঐ আইনটার কোনো পরিবর্তন সম্ভব নয়। এই পদ্ধতির দ্বারাই সামাজিক অবস্থার ধারাবাহিকতা ও তার ঐতিহাসিক দিক দেখিয়ে তার ক্ষণস্থায়িত্বের চিত্র তুলে ধরা সম্ভব ; কল্যাণ করার

নামে এর অমঙ্গল করা, কুসংস্কারকে অভিমত ব'লে চালানো ইত্যাদিই তো বেশ করুণার উদ্রেক করতে পারে, এতে ট্র্যাজিক মেজাজ ফুটে উঠবে না কেন। যাই হোক, এটা ধরে নেওয়া ঠিক হবে না যে, এই ট্র্যাজিক মেজাজ আর ফিরিয়ে আনা যাবেই না। এই পদ্ধতিটা অবশ্য বিষাদ সৃষ্টি করতে চায় না। ট্র্যাজিক মেজাজ আনবার জন্যে তা নীতিকথা প্রচার করতে চায় না। কিন্তু যদি সামাজিক অবস্থার ঐতিহাসিক বিবর্তন যদি মেলে ধরা যায় তাহলে অবশ্যই এমন মেজাজ আনা সম্ভব।

কার্ল ॥ তুমি কি মনে করো যে তোমার পদ্ধতি যা সব সময় বলে থাকে "এটা হতে পারে আর হতে পারে না" তা একটা ট্র্যাজিক মেজাজ সৃষ্টি করতে পারে ?

টমাস ॥ প্রত্যেক ঘটনাকে মানুষ যদি সমানভাবে বিভিন্ন মানসিক রূপ দিতে পারে, এবং ঘটনার উপস্থাপনার সময় যদি সে দিকে নজর রাখা হয়, তাহলে বিশেষ ঘটনাটি যা নাকি বিশেষভাবে বাছাই করে নেওয়া হয়েছে সেটাও মানুষের মনে করুণার উদ্রেক করতে পারে, বিষণ্ণতাও আনতে পারে।

কার্ল ॥ তা হয়তো হতে পারে। আমি জানি, পুরাতন দলের নাটকে, এবং আমাদের যেসব সমসাময়িক ব্যক্তি পুরাতনদেরই অনুসরণ করে থাকেন, তাঁরা কখনোই তাঁদের নাটকের কি প্রভাব হতে পারে তার জন্যে দর্শকদের উপর নির্ভর করেন না। তাঁরা যা পান তা হচ্ছে মানবজীবনের এক-একটা টুকরোই কেবল নয়, তার বিষাদময় অনুভূতি। তাঁদের প্রাত্যহিক জীবনে যে সব নির্জীব ব্যক্তি কোনো উদ্দীপনাই পান না, নাটকে তাঁরা তা প্রত্যাশা করেন। তাঁদেরই কল্যাণে কতকগুলি প্রকৃত ঘটনা অন্যান্য ব্যাপারের সঙ্গে মিশাল দিয়ে একটা উত্তেজক রস সৃষ্টি করা হয়। কিন্তু এ কাজ নবীনদের কাজ নয়, নবীনেরা চায় মানুষের জীবনের ঘটনাই পরিবেশন করতে, এ'তে দর্শকের মনে কি ক্রিয়া হতে পারে সে সম্বন্ধে তারা আগে থেকেই কিছু এঁচে নিতে চায় না।

লুকাস ॥ কেউ কি বলতে পারে যে, নবীনরা এটা বন্ধ করতে চায় ?

টমাস ॥ কোনো-কোনো ক্ষেত্রে ও কোনো-কোনো পরিবেশন-কৌশলে আমরা এটা বন্ধ করতে চাই। কিন্তু সর্বত্র নয়।

লুকাস ॥ আমি ভেবেছিলাম সর্বত্রই বুঝি। কেননা, তুমি চাও যে, দর্শকরা

সব সময়েই চিন্তা করুক। এমন চিন্তা করতে থাকলে ভাবাবেগ সেই চিন্তাকে ব্যাহত করবেই। করবে না। তুমি কি বল?

টমাস॥ আমি বলি—এর বিপরীতটাই হবে। ভাবাবেগ ছাড়া চিন্তা আসবে কী ক'রে? যেমন মেকি চিন্তাও অনেক থাকে তেমনি থাকে ত্রুটিপূর্ণ চিন্তা, ভাবাবেগের ক্ষেত্রেও তেমনি মেকি ও ত্রুটিপূর্ণ আবেগ থাকতে পারে। এসব বন্ধ করতে হবে। কিন্তু মূলকথা থেকে আমরা যেন সরে যাচ্ছি। আমরা নবীনেরা যেন এমন নাটকের অবতারণা না-করি ও এমন ঘটনা বাছাই ক'রে না-নিই যার উদ্দেশ্যই হচ্ছে ট্র্যাজিক অনুভূতি সৃষ্টি করা। কিন্তু কোনো-কোনো ঘটনার পরিবেশনায় দর্শকের একাংশে হয়তো এমন উত্তেজনার সৃষ্টি হতে পারে।

কার্ল॥ একটা মানুষকে যদি এমন ভাবে চিত্রিত করা হয় যে, সে এমন কাজ করছে যাতে তার চরিত্র কলুষিত হচ্ছে, অথচ এমন কাজ সে করতে পারে যাতে তার চরিত্রের অমন দশা হবে না—এ রকম ক্ষেত্রে, তুমি যা বলছ তা হওয়া সম্ভব বলে মনে করি।

লুকাস॥ পুরাতনদের কাছে ট্র্যাজিক অনুভূতির সৃষ্টি হয় যখন মানুষ তার নিজের প্রকৃতি অনুসারে চলে। কিন্তু নূতনদের কাছে মানুষের প্রকৃতি বলতে কিছু নেই। আছে কি?

টমাস॥ আছে, আছে, তোমাকে তা মানতে হবে। ঐ বিশেষ ক্ষেত্রে সে তার প্রকৃতি অনুসারে চলতে পারে নি।

লুকাস॥ ও'কে আমি প্রকৃতি বলি নে।

টমাস॥ আমরা প্রকৃতি বলি।

কার্ল॥ ওটা হল দার্শনিক কূটতত্ত্ব।

শ্রমিকশ্রেণী-সংক্রান্ত সাহিত্য বিষয়ে মন্তব্য

ব্রেশ্‌টের এই মন্তব্যগুলি (১৯৪০ বা ১৯৪১ থেকে) হচ্ছে সাহিত্যে বাস্তবতা সম্বন্ধে তাঁর ধারণার বিশ্লেষণ। তিনি সব-কিছুকেই বাস্তব বলে ধ'রে নিয়েছেন, অর্থাৎ মধ্যবিত্ত পুঁজিবাদীর শোষণের ও পীড়নের বাস্তব বর্ণনা। কিন্তু তাঁর নাটকে ব্রেশ্‌ট্ এ কথা স্পষ্ট করেই বলেছেন যে, সাহিত্যে যাবতীয় অবস্থার বর্ণনা ও উপস্থাপনাই বাস্তবতা নয়। কেননা, কোনো বিষয়ের বাহ্যিক চেহারাই তার আসল রূপ নয়. তাঁর ভিতরের সত্য উদ্‌ঘাটনই

সাহিত্যের কাজ। গঠনপ্রণালীর ও তার বিভিন্নতার উপর জোর দেওয়ার একটা উদ্দেশ্য থাকেই, এবং তা দরকারও, কিন্তু এ'কে "বাহ্যিক নিয়ম অনুসরণ" বলা যায় না, ব্রেশ্‌টের মার্কসবাদী সমালোচকেরা তাঁকে বুঝতে না পেরে তাঁর ও রকম সমালোচনা করেছেন।

১. লেখার মধ্যে দিয়ে লড়াই কর! দেখাও যে তুমি লড়ছ! সাংঘাতিক বস্তুতান্ত্রিকতা! বাস্তবতা তোমার পক্ষে আছে, তুমি বাস্তবের পক্ষে থেকো! জীবন কথা বলে উঠুক! এর অন্যথা কোরো না! মনে রেখো যে, বুর্জোয়ারা চায় না যে এরকম বলা হোক। কিন্তু তবু তুমি পারবে। তোমাকে পারতেই হবে। যে-যে জায়গায় বাস্তবতাকে পেড়ে ফেলা হচ্ছে, ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে, তার গায়ে বার্নিশ লাগান হচ্ছে সেই-সেই জায়গা বেছে নাও। বার্নিশ তুলে ফেল চেঁছে! চুপ ক'রে না থেকে প্রতিবাদ কর! প্রতিবাদ সোচ্চার ক'রে তোলো। তোমার যুক্তি তাজা! ভয় পেয়ো না, সত্যই একমাত্র সহায়! তুমি যদি তোমার প্রস্তাবে ও সিদ্ধান্তে সঠিক হও, তাহলেই তুমি বাস্তবের বিরোধীদের সামিল হতে পারবে, সমস্ত বিপদ আঁচ করতে পারবে, এবং সর্বজনের সামনে সব মেলে ধ'রে তার প্রতিবিধান করতে পারবে। নিজের গোষ্ঠীর কল্যাণের জন্যে যা-কিছু করণীয় তার সব করবে—সেটা সর্বমানবের কল্যাণকরই হবে, তোমার আশার বা প্রস্তাবের বা সিদ্ধান্তের সঙ্গে খাপ খাচ্ছে না ব'লে কোনো জিনিস যেন বাদ দিয়ো না ; সত্য ছাড়া অন্য-কোনো বিশেষ ক্ষেত্রে অবশ্য বাদ দিতে পার। কিন্তু সে ক্ষেত্রেও যেন যেসব সংকটের বীভৎসতা তুমি তুলে ধরছ, সেসব সংকট দূর করা যেতে পারে তার দিকে নজর রাখবে। তুমি একাই লড়ছ না, তোমার পাঠকের মধ্যে তুমি যদি লড়াইয়ের উদ্দীপনা জাগিয়ে তুলতে পেরে থাক, তাহলে সেও লড়বে। তুমি একাই এর সমাধান পাবে না, সেও তা খুঁজে বের করবে।

২. নিজের দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াইয়ে নামো। লেখক হিসেবে, নিজের ডেস্কে ব'সে তোমার অস্তিত্বের এই শোচনীয় অবস্থা থেকে নিজেকে উদ্ধার করো। জীবনের অভিজ্ঞতার মুখোমুখী হও বলিষ্ঠতার সঙ্গে।

"সংগ্রামী বাস্তববাদ" এই ধ্বনি গ্রহণের ব্যবস্থা

১. সব দেশের মজদুরশ্রেণীর মানুষের জন্য, সব শোষিত ও নিপীড়িত মানুষের জন্য, লেখকদের গ্রহণ করতে হবে সংগ্রামী বাস্তবতা। কঠোর

বাস্তববাদই সব সত্যের আবরণ উন্মোচন করে দিতে পারে, অর্থাৎ সব শোষণ ও পীড়ন প্রকাশ করে দিতে পারে, শোষণের ও পীড়নের নিন্দা করতে পারে।

২. বাস্তবকে কঠিন সংগ্রামী মনোভাব নিয়ে লিখে প্রকাশ করতে হলে জ্ঞান-অর্জন করা দরকার, সেটা হচ্ছে অন্য ধরণের জ্ঞান—তা হচ্ছে অর্থনৈতিক ও ঐতিহাসিক ধরণের জ্ঞান। যে সব লেখককে এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে বলা হচ্ছে, তাঁরা যাতে এই সব তথ্য পান তার ব্যবস্থা করতে হবে। যাঁরা লেখকদের এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে বলছেন, তাঁদের কর্তব্য হচ্ছে লেখকদের এই সব তথ্য পৌঁছে দেওয়া। তা না হলে এই চ্যালেঞ্জ অর্থহীন হয়ে যাবে।

৩. লেখকরা অন্যদের শিক্ষা দিতে-দিতেও এই জ্ঞান অর্জন করতে পারেন। অন্যদের জন্যে জ্ঞান অর্জন করলে নিজেরও জ্ঞান বাড়বে। তাঁরা যাতে শিক্ষা করতে পারেন সেজন্যে তাঁদের বড়-বড় বৈজ্ঞানিক কাজের মধ্যে জড়িত ক'রে ফেলতে হবে।

৪. অনেক লেখক আছেন যাঁরা তাঁদের রচনা-কাজের জন্যে অবচেতনার উপরেই বেশি গুরুত্ব দেন। তাঁরা এ কাজের জন্যে বেশ উচ্চস্তরের চেতনা লাভ করতে রাজি না, এবং তা করতে অক্ষমত বটেন। এই লেখকরা তাঁদের অবচেতন রচনা ছাড়াও সচেতন লেখকদের নিন্দে করেন, বলেন যে, তাঁরা শিক্ষামূলক রচনা লিখছেন। এটা মনে করা যেতে পারে যে, এই "অবচেতন" লেখকদের এই ভাবে বোঝানো হয় যে, তাঁদের "আসল" অবচেতন রচনা এইসব "অপ্রধান কাজ" থেকে কিছু লাভও তো করতে পারে।

৫. আজকাল কোনো-কোনো মধ্যবিত্তশ্রেণীর লেখকদের মধ্যে শিক্ষণীয় ও তথ্যমূলক রচনার প্রতি ঝোঁক দেখা যাচ্ছে। যেমন, নভেল-লেখকদের দ্বারা লিখিত আধা-বৈজ্ঞানিক এনসাইক্লোপেডিয়া প্রকাশের উদ্যোগটি আরও অনেককে এই কাজে উৎসাহিত করতে পারে। এই রকম এনসাইক্লোপেডিয়া অবশ্য পুরোপুরি বৈজ্ঞানিক বা রাজনৈতিক চরিত্রের হতে পারে না; ভীষণ ভাবে যে কমিউনিস্ট এনসাইক্লোপেডিয়ার প্রয়োজন অনুভূত হচ্ছে তার বিকল্প ওগুলি নয়। কিন্তু ফ্যাসীবিরোধী লেখকদের মধ্যে সব জিনিস পরিষ্কার ক'রে বোঝাবার ও তাদের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপনের পক্ষে এটি অবশ্যই কাজে লাগবে।

প্রভু পুনটিলা ও তাঁর ভৃত্য ম্যাট্টি

ব্রেশ্‌টের নাটক "মাস্টার পুনটিলা অ্যাণ্ড হিজ সারভ্যাণ্ট ম্যাট্টি" বেশ একটা ফলপ্রসূ বিষয়ের উপর ভিত্তি ক'রে লেখা। ফিনলণ্ডীয় জমিদার পুনটিলা তার ভৃত্যদের নির্দয়ভাবে শোষণ ও পীড়ন করতেন। কিন্তু যখন তিনি মদ্যপান করতেন, এবং এটা করতেন প্রায় সময়েই, তখন তিনি হয়ে উঠতেন অন্য মানুষ, তিনি তখন সামাজিক ন্যায়বিচার ও অন্যান্য মানবীয় ধর্ম সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠতেন। মত্ত অবস্থায় তিনি যা-যা সৎকর্ম করতেন, সে অবস্থা কেটে গেলেই তিনি সেসব বাতিল করে দিতেন। ম্যাট্টি ছিল তাঁর শ্রেণীসচেতন মোটরচালক, এইসব ওলটপালট ঘটনা বন্ধ করার চেষ্টা সে করেছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে কাজ ছেড়ে চলে গেল কেননা এই প্রভু-ভৃত্য সম্পর্ক সে আর বরদাস্ত করতে পারল না। আমরা যে দৃশ্যটি এখানে উদ্ধৃত করছি সেটি হচ্ছে, পুনটিলার মেয়ে এভার সঙ্গে পুনটিলার জমিদারির দূতের শুভপরিণয়ের পূর্বের বাগ্‌দান-অনুষ্ঠানের উৎসব। পুনটিলা এখন মদ খেয়েছেন। তিনি সমবেত সকলের কপটতা ও শঠতা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন এখন। তিনি তাঁর দূতটিকে ঠেলে ফেলে দিলেন ও তাঁর মেয়েকে প্রকৃত একটা মানুষ "যোগ্য মোটরচালক ও বন্ধু" ম্যাট্টির হাতে সমর্পণ করলেন।

(খাবার ঘর, ছোট ছোট টেবিলে ও অজস্র তাক দিয়ে ভরা, ধর্মযাজক, জজ, উকিল এদিকে-ওদিকে দাঁড়িয়ে কফি খাচ্ছেন ও ধূমপান করছেন। এক কোণে বসে পুনটিলা ধীরে-ধীরে মদ্যপান করছেন। পাশের ঘরে গ্রামোফোনের গানের সঙ্গে নাচ চলেছে।)

ধর্মযাজক ॥ প্রকৃত বিশ্বাস পাওয়া বড় শক্ত। তার বদলে পাবে সন্দেহ ও বিতৃষ্ণা। আমাদের আশপাশের মানুষ দেখে তাই হতাশ হয়ে যেতে হয়। আমি তাদের কানের মধ্যে ড্রাম পিটে-পিটে বলি যে, তাঁর কৃপা না হলে একটা ফলও ফলত না, কিন্তু তারা জেনে নিয়েছে যে, ফলমূল আপনিই ফলবে, এবং গোগ্রাসে সেগুলি খায়, যেন খাওয়াতেই তাদের অধিকার। এই যে বিশ্বাসের অভাব, এর কারণ হচ্ছে তারা গির্জায় যায় না। আমাকে ফাঁকা গির্জায় ধর্মোপদেশ দিতে হয়, তারা আসে না, কেন না যথেষ্ট বাইসাইকেল নাকি নেই। কিন্তু প্রত্যেক গয়লানির তা

আছে; ওদের যে নেই তার কারণও ওদের জন্মগত দুর্বুদ্ধি। তা না হলে গত সপ্তাহে এ রকম ঘটনা ঘটল কী ক'রে?—আমি একটা মৃত্যুশয্যার পাশে দাঁড়িয়ে জীবনের নশ্বরতা সম্বন্ধে বলছি, মৃত্যুর পর আমাদের ভাগ্যে কী লেখা আছে তা ব্যাখ্যা করছি এমন সময় এই লোকটি হঠাৎ বলে উঠল "আপনি কি মনে করেন আলু সইতে পারে বৃষ্টি?" এতেই মনে প্রশ্ন জাগে, একজনও এমন করলে তাই কি একটা মারাত্মক ক্ষতি নয়?

জজ॥ আমি আপনার সঙ্গে একমত। এইরকম আস্তাকুঁড়ে সভ্যতা টেনে এনে তাকে গোলাপশয্যা বানানো যাবে না।

উকিল॥ আমরা আইনজীবীরা সহজ জীবন কাটাইনে। সামান্য গাঁয়ের লোক নিয়েই আমাদের কাজ, তারা ভিক্ষে করতে রাজি, কিন্তু তাদের অধিকার ছাড়বে না। তারা ঝগড়া নিয়েই আছে, কিন্তু তাদের হীনতা নীচতা বেড়েই চলেছে। তারা এ ওকে গালমন্দ করবেই, ছুরি দেখাবে, জুয়াচুরি করবে, কিন্তু যখনই দেখে যে মামলা করতে পয়সা লাগে, অমনি তাদের উৎসাহ নিভে যায়। আর পয়সার জন্যে একটা চমৎকার মামলার মাঝপথ থেকে সরে দাঁড়ায়।

জজ॥ একটা ব্যবসার জগতে আমরা বাস করছি। সবই মিথ্যে হয়ে যাচ্ছে, আর এতদিন যে মূল্যবোধ ছিল তাও অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। এইসব মানুষের জন্যে দুঃখ করা ছাড়া গতি কী, আর তাদের আর-একটু সভ্য করার জন্যে চেষ্টা করে যেতেই হবে।

উকিল॥ পুনটিলার জমি আপনা-আপনি বাড়ছে, কিন্তু এমন মামলা বড়ই পলকা জিনিস, মামলাকে বেশ জোরালো করে নিতে গেলে মাথার চুলই পেকে যায়। কতবারই মনে হয়—এটা চলবে না, এভাবে চলতে পারে না, এটা নিয়ে সওয়াল করার কোনো মানে হয় না, এটা আরম্ভ হতে-হতেই এর মৃত্যু ঘটল ব'লে—কিন্তু হঠাৎ তাজা হয়ে ওঠে মামলাটা, আবার চাঙ্গা হয়ে ওঠে। কোনো মামলা যখন দোলনায় আছে তখন থেকেই সতর্ক থাকতে হবে, কেননা এখানে শিশু মৃত্যুর হার সবচেয়ে বেশি। তাকে একটু লায়েক করে দিলেই সে সব বুঝে ফেলে। চার-পাঁচ বছরের পুরনো মামলার বেশ পেকে ওঠার কথা, কিন্তু হায়, ঐ পর্যন্তই, ঐখানেই শেষ। যে-জীবন কাটাচ্ছি তা কুত্তার জীবন।

(দূত ও ধর্মযাজকের স্ত্রীর প্রবেশ)

ধর্মযাজকের স্ত্রী ॥ মিঃ পুনটিলা, আপনার অতিথিদের দিকে আপনার একটু নজর দেওয়া উচিত। মিনিস্টার এখন মিস্ এভার সঙ্গে নাচছেন। তিনি আপনার খোঁজ করছিলেন।

(পুনটিলা উত্তর দিলেন না)

দূত ॥ ধর্মযাজকের এই সুযোগ্যা স্ত্রী মিনিস্টারকে অতি চমৎকার এক রসালো উত্তর দিয়েছেন। তিনি এমন কথা পেলেন কোথা থেকে সারা জীবন ভেবেও আমি তার কিনারা করতে পারিনি। তিনি একটু ভাবলেন, তার পর বললেন, ধর্মসংগীতের সঙ্গে আপনি নাচতে পারেন না, যে যন্ত্র দিয়েই তা বাজানো হোক-না কেন। এই রসিকতায় মিনিস্টার তো তো হেসেই খুন। এ সম্বন্ধে আপনি কী বলেন, পুনটিলা ?

পুনটিলা ॥ কিছুই না। আমি অতিথিদের সমালোচনা করিনে। (জজ-কে কাছে আসতে ইঙ্গিত করলেন) ঐ পানপাত্রটি আপনি নেবেন ?

জজ ॥ কোন্‌টা, কারটা ?

পুনটিলা ॥ দূত-বেশী ঐ ভূতটার। নেবেন কিনা, ঠিক ক'রে বলুন।

জজ ॥ সাবধান, জোহানেস, তোমাকে কিন্তু বেশ ধরেছে।

দূত ॥ (পাশের ঘরে যে গান বাজছে তা গুনগুন করে গাইছে, জুতোর ডগা দিয়ে তাল দিচ্ছে) ঐ গান ঐ সুর একেবারে পা পর্যন্ত চলে যায়, তাই না ?

পুনটিলা ॥ (আবার ইশারা করলেন জজ-কে, তিনি তা দেখেও দেখলেন না) ফ্রেডরিক, সত্যি কথা বলুন ; এসব কেমন লাগছে। এসবের জন্যে আমাকে একটা বনভূমি খরচ করতে হয়েছে। (অন্য সকলেও গুনগুন করছেন)।

দূত ॥ (কিছু না-বুঝে) গানের কলিগুলো আমি ঠিক মনে রাখতে পারিনে, আমার স্কুলজীবন থেকেই আমার এই দশা, কিন্তু সুর ও তাল আমার রক্তে মিশে আছে।

উকিল ॥ (পুনটিলা স্পষ্টভাবে সংকেত করার পর) এখানে বেশ গরম। চলুন, সবাই বৈঠকখানা-ঘরে যাই (তিনি দূতকে টেনে নিয়ে যাবার চেষ্টা করলেন)।

দূত ॥ অন্য-একদিন আমি একটা লাইন বেশ মনে করতে পেরেছিলাম: "হ্যাঁ, আমাদের কলা-গাছে কলা নেই।" আমার স্মৃতিশক্তি সম্বন্ধে আশাবাদী হয়ে উঠছি।

পুনটিলা ॥ ফ্রেডরিক, এটা দেখ, তার পর বিচার করো। ফ্রেডরিক!

জজ ॥ তুমি সেই ইহুদীর গল্পটা তো জানো, সে তার ওভারকোট ফেলে এসেছিল একটা কাফেতে। যে নিরাশাবাদী সে বলে, "কোটটা সে ফিরে পাবেই।" যে আশাবাদী সে বলে, "কখনোই পাবে না।"

(সকলের হাসি)

জজ ॥ আমার মনে হচ্ছে ব্যাপারটা কেউ বুঝল না।

পুনটিলা ॥ ফ্রেডরিক!

দূত ॥ এটার মানে খুলে বলতে হবে। আমার মনে হয় কথাটা আপনি উলটো-পালটা করে ফেলেছেন। যে আশাবাদী সে'ই তো বলবে, "হ্যাঁ, সে ফিরে পাবে।"

জজ ॥ না, ও কথা নিরাশাবাদীই বলবে। বুঝতে পারছ না কেন, তামাশাটা হচ্ছে এই যে, ওভারকোটটা অত্যন্ত পুরনো, সেটা হারিয়ে যাওয়াটাই সে চেয়েছিল।

দূত ॥ ও, তাই বলুন। ওভারকোটটা পুরনো বুঝি? সে কথা তো আগে বলেন নি। হা হা হা, এত চমৎকার রসিকতা আমি জীবনে এই প্রথম শুনলাম।

পুনটিলা ॥ (ভীতিপ্রদ ভাবে উঠে) আমাকে এর মধ্যে একটু মাথা গলাতে হচ্ছে। আমি অমন-একটা লোককে আর বরদাস্ত করতে পারছিনে। আমার গুরুতর প্রশ্নের সোজা উত্তর আপনি দিচ্ছেন না, ফ্রেডরিক। এমন একটা উজবেককে আমি আমার পরিবারের একজন ক'রে নিতে চলেছি। এ বিষয়ে আপনার মত কী? যার রসবোধ নেই সে একটা মানুষই না। (দৃঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে) আমার বাড়ী ছেড়ে চলে যাও, হ্যাঁ হ্যাঁ তুমি, চারদিকে তাকিয়ো না, আমি আর কাউকে বলছিনে।

জজ ॥ পুনটিলা, বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে না?

দূত ॥ মহাশয়গণ, আমি অনুনয় করছি, আপনারা ব্যাপারটা ভুলে যান। আপনারা জানেন না, কূটনৈতিক কাজ যারা করে তাদের কী শোচনীয় অবস্থা! সামান্য একটা নৈতিক স্খলনে তার সব সুনাম নষ্ট হয়ে যায়।

প্যারিসে, মেমাত্রের উপরে রুমানীয়ার দূতাবাসের সেক্রেটারীর শাশুড়ি তাঁর প্রণয়ীকে ছাতি দিয়ে পিটুনি দিয়েছিল, তৎক্ষণাৎ এমন একটা পুরনো কেচ্ছা আরম্ভ হয়ে গেল যার জুড়ি নেই।

পুনটিলা॥ সাদা টাই-বাঁধা এ যেন একটা পঙ্গপালের পোকা। বনের পাতা-খেকো পঙ্গপাল!

দূত॥ (উৎকণ্ঠিত হয়ে) আপনারা ব্যাপারটা বুঝুন। তাঁর কোনো প্রণয়ীই ছিল না—এটা তো স্বাভাবিক ব্যাপার। তিনি মারেনও নি—এটা তো সহজেই বোঝা যায়। কিন্তু ছাতি দিয়ে মারা হয়েছিল, এইটেই হচ্ছে জঘন্য কাজ। এটা রং ফলিয়ে রটনা করা আর-কি!

উকিল॥ ও ঠিকই বলছে, পুনটিলা। ওর মর্যাদা খুবই ঠুনকো। ও কূটনৈতিক সার্ভিসে আছে।

জজ॥ নেশাটা আজ তোমার জোর হয়েছে, জোহানেস।

পুনটিলা॥ ফ্রেডরিক, আপনি বুঝতে পারছেন না, অবস্থাটা কত গুরুতর।

ধর্মযাজক॥ মি. পুনটিলা এখন একটু উত্তেজিত, অ্যানা, তুমি এখন ওই ঘরে গেলে ভালো হয়।

পুনটিলা॥ মহাশয়া, আপনি ঘাবড়াবেন না, ভাববেন না, আমি মেজাজ নষ্ট করব। নেশাটা ঠিকমতই হয়েছে, কিন্তু আমার পক্ষে কড়া হচ্ছে ঐ ভদ্রলোকের মধ্যের ঐ উজবুকিটা। ওকে আমি বিরক্তিকর বলে মনে করছি। বুঝলেন?

দূত॥ আমার রসজ্ঞান সম্বন্ধে প্রিন্সেস বিবেস্কো আমার পক্ষ হয়ে মন্তব্য করেছিলেন লেডি অক্সফোর্ডের কাছে, বলেছিলেন, আমি রসিকতা শোনা মাত্রই হেসে উঠি, তার মানে এই যে, আমি চট্ করেই বুঝে ফেলি।

পুনটিলা॥ ওর রসজ্ঞান—ফ্রেডরিক!

দূত॥ যতক্ষণ কারও নাম উল্লেখ করা না হচ্ছে, ততক্ষণ সবই মিটিয়ে ফেলা যায়। কিন্তু অপমানসূচক কথা ব'লে যদি নামও উল্লেখ করা হয়, তা হলে তার আর মিটমাট হয় না।

পুনটিলা॥ (কঠিন বিদ্রূপ ক'রে) ফ্রেডরিক, আমাকে কী করতে হবে? আমি ওর নামই ভুলে গিয়েছি। সে যা বলছে তাতে মনে হচ্ছে তাকে এখান থেকে ভাগানো যাবে না। কিন্তু ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, আমার মনে পড়েছে, আমার কাছ থেকে টাকা ধার করার জন্যে সে সই করেছিল।

ও হচ্ছে এইনো সিলাকা। আশা করি এখন সে চলে যাবে। আপনি কী মনে করেন?

দূত॥ ভদ্রমহোদয়গণ, এখনই একটা নাম উল্লেখ করা হল। যে কথা বলা হয়েছে তা বেশ যত্নের সঙ্গে বিচার করে দেখা হোক।

পুনটিলা॥ এখন কী করব ভেবে পাচ্ছি নে। (হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠে) এক্ষুণি বেরিয়ে যাও, পুনটিলা আর যেন কখনো তোমার মুখদর্শন না করে। আমি আমার মেয়েকে একটা পঙ্গপালের হাতে দেব না।

দূত॥ (চারদিক চেয়ে) পুনটিলা, এখন আপনি মারমুখো হয়ে উঠেছেন। যেখান থেকে অপবাদ আরম্ভ হয় আপনি তার সীমা লঙ্ঘন করছেন—আপনি আমাকে আপনার বাড়ি তাড়িয়ে দিচ্ছেন।

পুনটিলা॥ বাড়াবাড়ি জিনিসটা বাড়াবাড়িই। আমার ধৈর্য শেষ হয়ে গিয়েছে। আমি পরিষ্কার ভাবেই তোমাকে বলছি যে, তোমার নির্বুদ্ধিতায় আমি অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছি, তুমি মানে-মানে চলে যাও, তা না হলে আমাকে বাধ্য হয়ে বলতে হবে, "বেরিয়ে যাও, বাগার্।"

দূত॥ পুনটিলা, এতে আমি রাগ করলাম। ভদ্রমহোদয়গণ, বিদায়, বিদায়, (প্রস্থান)।

পুনটিলা॥ যাও, যেতে থাকো। আমি দেখতে চাই তুমি দৌড়চ্ছ। আমার কথার উদ্ধত জবাব দেওয়ার জন্যে তোমাকে উপযুক্ত শিক্ষা দেব। (দূতের পিছনে সে ছুটল, ধর্মযাজকের স্ত্রী ও জজ ছাড়া সকলেই তাকে অনুসরণ করল)।

ধর্মযাজকের স্ত্রী॥ এটা নিয়ে একটা মস্ত কেলেঙ্কারি হবে।

(এভার প্রবেশ)

এভা॥ কি, হল কী। বাগানে ও কিসের গোলমাল?

ধর্মযাজকের স্ত্রী॥ (তার দিকে ছুটে গিয়ে) বাছা আমার, অদ্ভুত একটা ব্যাপার ঘটে গিয়েছে। তোমাকে শক্ত হয়ে, সাহসে ভর করে দাঁড়াতে হবে।

এভা॥ হয়েছে কী?

জজ॥ (এক গ্লাস শেরি ঢেলে নিয়ে) এটা খেয়ে নাও, এভা। তোমার বাবা পুরো এক বোতল পাঞ্চ্ নিঃশেষ করেছেন, এবং হঠাৎ এইনোর উপর এমন ক্ষেপে গেলেন যে তাকে তাড়িয়ে দিলেন।

এভা ॥ (পান করল) শেরি ফুরাল। সে বাবাকে কি বলল?

ধর্মযাজকের স্ত্রী ॥ তুমি হতভম্ব হয়ে গেলে না?

এভা ॥ তা বটেই তো।

(ধর্মযাজক ফিরে এলেন)

ধর্মযাজক ॥ এটা একটা সাংঘাতিক কাণ্ড।

ধর্মযাজকের স্ত্রী ॥ কিসের কথা বলছ। কিছু হয়েছে নাকি?

ধর্মযাজক ॥ বাগানে এক কুরুক্ষেত্র-কাণ্ড। সে গাকে পাথর ছুঁড়ছে।

এভা ॥ কারো লেগেছে নাকি?

ধর্মযাজক ॥ আমি জানিনে। উকিলবাবু দুজনের মধ্যে দাঁড়িয়েছেন। মিনিস্টার ছুটো গেছে ড্রয়িংরুম থেকে।

এভা ॥ খুড়ো ফ্রেডরিক, এখন আমি নিশ্চয় ক'রে বলতে পারি যে, ও চলে যাবে। মিনিস্টারকে আনা হয়েছিল, এটা বুদ্ধির কাজ হয়েছে। কেলেঙ্কারি এতটাও হতে পারত না।

ধর্মযাজকের স্ত্রী ॥ এভা!

(ম্যাটিকে নিয়ে পুনটিলার প্রবেশ, তাদের পিছনে লাইনা ও ফিনা)

পুনটিলা ॥ আমি পৃথিবীর নষ্টামি খুব ভালো ক'রে দেখেছি। আমি খুব ভালো উদ্দেশ্য নিয়েই গিয়েছিলাম, আর স্বীকারও করেছি যে, একটা ভুল ক'রে ফেলেছিলাম, আমি আমার মেয়েকে একটা পঙ্গপালের হাতে প্রায় সঁপে দিয়েছিলাম, এখন আমি তাকে একটা মানুষের হাতে দেব বলে স্থির করেছি। আমি অনেক দিন আগেই ঠিক করে রেখেছিলাম যে, একটা ভালো লোকের হাতে তাকে দেব। সে হচ্ছে ম্যাটি অ্যালটোনেন —একজন পাকা ড্রাইভার ও আমার বন্ধু। এখন প্রত্যেকে এই সুখী তরুণ দম্পতির মঙ্গল কামনা করে গ্লাস নিঃশেষ করুন। তারা কি জবাব দিল তা বুঝি আপনারা জানতে চান? মিনিস্টারকে আমি একজন শিক্ষিত লোক বলে মনে করেছিলাম, তিনি আমার দিকে এমন ভাবে তাকালেন যেন আমি বিষাক্ত একটা ব্যাঙের ছাতা, তার পর তাঁর গাড়ি আনতে বললেন। অন্যরাও অবশ্য তাঁকেই অনুকরণ ও অনুসরণ করলেন। দুঃখের কথা! আমার মনে হল আমি যেন একজন খ্রীষ্টান শহীদ, যেন এক পাল সিংহের মুখোমুখি হয়েছি এবং তাঁদের আমি আমার মনের কথা বললাম। মিনিস্টার খুব দ্রুত চলে যাচ্ছিলেন, ভাগ্যক্রমে আমি

তাঁকে ধরতে পারলাম তাঁর গাড়িতে উঠবার আগেই, তাই তাঁকে আমি বলতে পারলাম যে, আমি মনে করি তিনিও একজন বাগার্। আমি যা বলেছি, আশা করি, আপনারাও তাতে একমত।

কুর্ট পিনথাস

তরুণ কবিদের উদ্দেশে

কুর্ট পিনথাস (জন্ম১৮৮৬) হচ্ছেন লেখক, সাহিত্য-সমালোচক ও প্রকাশের পাণ্ডুলিপি-পরীক্ষক, প্রথম-বিশ্বযুদ্ধের পর তিনি ভাববাদী সাহিত্যের অক্লান্ত পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। ১৯২০ সালে প্রকাশিত তাঁর কবিতা-সংগ্রহ ("ম্যানকাইনড্'স টোয়াইলাইট") বিশেষভাবে নাম করা বই। তিনি এই বইকে বলেছেন, "আমাদের কালের উদ্বেগ ও আবেগের সংগ্রহ"। সমাজের ধ্বংসকামীদের বা ঈশ্বরে অবিশ্বাসীদের মত-পরিবর্তন সাধনের জন্যে তিনি বিশেষভাবে চেষ্টা ক'রে গিয়েছেন। তাঁর "অ্যাড্রেস টু ইয়ং পোয়েটস" হচ্ছে একটা দলিল বিশেষ, এতে তিনি ভাববাদের প্রকৃতি সম্বন্ধে পরিষ্কার ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তার উদ্দেশ্য কি বা লক্ষ্য কি সে কথাও তিনি বলেছেন। পিনথাস ভাববাদের উন্নত আদর্শের উপর বেশ জোর দিয়েছেন, মানুষের মনে এ'তে বল আছে এবং কবিতার পক্ষে এ হচ্ছে কার্যকর শক্তি। প্রথম-বিশ্ব-যুদ্ধের সময় এটি প্রকাশিত হয়।

আমি এই হল্-ঘরে এসেছি এক অরণ্যের নির্জনবাস থেকে; আমি তোমাদের সম্মিলিত মুখমণ্ডল থেকে দীপ্ত রশ্মি আমার উপর নিক্ষিপ্ত দেখতে পাচ্ছি; এই দীপ্তি আসছে বুদ্ধির জোয়ারের মত, এই দীপ্তি উদ্দীপনার ও সংঘবদ্ধ আনন্দেরই একটু অনুভূতি।

তোমাদের মধ্যে অনেক পরিচিত মুখের দিকে তাকিয়ে আমি দেখতে পাচ্ছি—সংগ্রামের চিহ্ন ও উল্লাসের চিহ্ন, হতাশা ও উদ্দীপনা, যা নাকি তৈরি ক'রে তুলেছে একটা দীর্ঘ যৌবনকাল—তোমাদের যৌবন। শহরে সন্ধ্যা-বেলায় সকলে একত্র হয়ে কর্মপ্রেরণা লাভ, আত্মিক সাম্রাজ্য গঠনের জন্যে প্রতীক্ষা, পড়াশুনা, হতাশ, এবং অনেক দিবারাত্রি একত্র কাজ করা ও আলোচনা করা—আমাদের মুখে অস্তিত্ব রক্ষার একই চিহ্ন দেগে দিয়েছে

এবং আমাদের মনে-প্রাণে একই চিন্তার ও লক্ষ্যের নিশানা এনে দিয়েছে। এবং যখন আমি তোমাদেরও দেখি, হে আমার সমসাময়িক বন্ধুরা, তখন মনে হয় এতদিন আমি তোমাদের জীবন ও জীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তোমাদের বই থেকেই জেনেছি, এবং এখানে-ওখানে অনেক ভিড়ের মধ্যে দেখেছি প্রবীণ ও বৃদ্ধদের—যাঁরা এখন নিঃসঙ্গ ও একাকী হয়ে পড়েছেন; আমরা যখন ত্রিশের কোঠার যুবক ছিলাম তখন এঁদেরই রচনা আমাদের জীবনে প্রবল উদ্দীপনা এনেছিল ও আমাদের পথপ্রদর্শকেরও কাজ করেছিল; তখন পিছনে ছিল তরুণতমদের সদলবলে আগমন-সংকেতন, যখন তাঁদের নামও অজ্ঞাত তাঁদের রচনাও অলিখিত ছিল, কিন্তু তাঁরাই তখন এগিয়ে আসার জন্যে ব্যাকুল। আজ আমি তোমাদের সকলকে দেখছি—কবি, প্রচারবিদ্, স্কলার, রাজনীতিবিদ্, সমালোচক—সকলে এই চার-দেয়ালের মধ্যে একত্র হয়েছ; কিন্তু এই আশ্চর্য সমবায়ও মনের মধ্যে একটা দুঃখ এনে আজকের এই আনন্দকে একটু মলিনই করছে যেন, কেননা, তোমরা অদ্ভুত জীবনীশক্তির অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও, সকলের সেই জীবনীশক্তি একত্র ক'রে এক ক'রে তুলতে পার নি; জীবনীশক্তির সমবায়ই এখন প্রকৃতপক্ষে বিশেষ দরকার।

আমাদের এই কাল—আমাদের এই সময়—শত্রুভাবাপন্ন পৃথিবীর দ্বারা যেভাবে ঘেরাও হয়ে গিয়েছে, যে-ভাবে সেই পৃথিবী আমাদের এই কাল-কে প্রায়-আক্রমণ করার জন্যই উদ্যত, যে, আমাদের সংঘবদ্ধ হওয়ার ও গোষ্ঠীবদ্ধ হওয়ার জন্যে এতটা প্রয়োজন এর আগে কেউ মনে করে নি।

আমি আমাদের এই কাল বা আমাদের এই পুরুষ—এ কথা বলবই, যদিও তুমি, ফ্রান্জা ব্লেই, এ কথার প্রতিবাদ করার জন্যে উঠে দাঁড়ালে, তবুও একথা আমি বলবই। এই যে কথাটা—এই জেনারেশন বা কাল—এটা আমরা বছর দিয়েই মেপে থাকি বটে, কিন্তু বছর গুণে এটা নির্ধারণ করার জিনিস না, কিন্তু কিছু প'ড়ে বা চোখে দেখে আমরা একটা গোষ্ঠীর যে দুঃখ দুর্দশা বা অভাবের কথা জানতে পারি তার থেকেই আমরা বলতে পারি যে, ঐ লোকটি আমাদেরই একজন। . . .

আমাদের মধ্যের প্রায় সকলেই বড়-বড় শহরের লোক। আমরা যে সময়ে বাস করছি তার বিরুদ্ধেই আমাদের মধ্যের বেশির ভাগই চিন্তা করে থাকে বা লিখে থাকে। যুদ্ধের ভয়াবহ অভিজ্ঞতা কিছুরই পরিবর্তন করতে পারে নি;

কিন্তু এতে আমাদের মনে আরও ইচ্ছা ও প্রতিজ্ঞা এসেছে যে, আমরা আরও অনেক কিছু বদল করব। আমাদের মধ্যে যে বন্ধুত্বের বন্ধন এসেছে তা একবয়সী ব'লে আসেনি, এসেছে, আমাদের লক্ষ্য এক বলেই; দৈব-ক্রমে একই শহরে বাস করার জন্যে এ বন্ধুত্ব আসেনি; এসেছে আমরা একই মেজাজের অধিকারী বলেই। এবং নিশ্চিতভাবেই বলতে পারি যে, বয়সের প্রভেদ, বা জাতির প্রভেদ আমাদের পৃথক করতে পারে নি, আমাদের মধ্যে গোষ্ঠী চেতনা জাগরূক আছে। রাশিয়া ও ইতালী থেকে আগত অপরিচিত কমরেড, ফ্রান্স, ডুহামেল, জোউভ, পেগুয়ে, ভিলড্রাক, গুইলব্রো প্রভৃতি জায়গা থেকে আগত অজ্ঞাত কমরেডরা একই বিজ্ঞ ও সদাশয় নেতার নেতৃত্বে সমাগত, সেই নেতা হচ্ছেন রোমাঁ রোলাঁ। আমাদের গোষ্ঠীগত এই সংঘ-বদ্ধতা কেউ ভাঙতে পারবে না, ধূসর বর্ণের ইউনিফর্ম কে আমাদের বিরুদ্ধে লাগানো হয়েছিল, আমাদের একতাবদ্ধ করে রাখবার উদ্দেশ্যে নয়, আমাদের একত্ব ছত্রভঙ্গ করে দেবার জন্যই।

তোমরা যে রাজনীতির দিকে হঠাৎ ঝুঁকেছ, তোমাদের অন্য-কোনো কাজ থেকে এই কাজটিই তোমাদের গোষ্ঠীচেতনা প্রমাণ করছে। কেবল রাজনৈতিক আলোচনায় মত্ত হওয়াই প্রকৃত রাজনীতি চর্চা নয়, কেবলমাত্র আঞ্চলিক সমস্যা সমাধান বা কূটনৈতিক পদ্ধতি উদ্‌ভাবনই রাজনীতি নয়, যে কাজ সোজাসুজি মানুষকে নিয়েই জড়িত, সেইটেই হচ্ছে প্রকৃত রাজনীতি। এই রাজনীতি অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়ে মানুষের পরিবর্তন আনে না, মানুষের পরিবর্তন এনেই অবস্থার বদল ঘটায়। কেননা, এটা তো স্পষ্টই বোঝা গিয়েছে যে, সচেতন সৎ ও উত্তম মানুষই অনুরূপ অবস্থা আনতে পারে, অবস্থার শুভ পরিবর্তন আনতে পারে, ভালো রাষ্ট্র গঠন করতে পারে, এবং জীবনধারণ ক'রে তৃপ্তি পাওয়া যাবে এমন অর্থনৈতিক অবস্থা আনতে পারে। রাষ্ট্র পত্তন হয়ে গেলেই তা বরাবরের জন্য হল না, তা সাময়িক ব্যাপার মাত্র। এ রকম সাময়িক জিনিসকে ঈশ্বরের অভিপ্রেত জিনিস বলে প্রচার করাটা গর্হিত অন্যায় কাজ। রাষ্ট্রের মহত্ত্ব ও সম্পদই বড় কথা নয়, বড় কথা হল মানুষের মহত্ত্ব ও মানুষের উন্নত মন।

তাহলে মানুষই হচ্ছে তোমাদের শিল্পকলার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। কেবল মাত্র মানুষকে নিয়েই তার কাজ। শিল্পের জন্যেই শিল্প—এই নীতি আর চলে না। মানুষের চিত্র অঙ্কণ এজন্যে তোমরা কর না যাতে মানুষ

নিজের চেহারা দেখে খুশিতে অধীর হয়ে উঠবে; মানুষ যাতে নিজের বিরুদ্ধেই জেগে উঠতে পারে, এবং সে যাতে নিজের জীবনীশক্তি প্রয়োগ ক'রে নিজেকে আরও উন্নত করার জন্যে সচেষ্ট হয়ে উঠতে পারে এই জন্যেই তার চিত্র আঁকা। নিজের ভাবাবেগ নিয়েই তোমরা বিভোর হয়ে থাকো না, তোমরা তোমাদের আশপাশের মানুষের ভাবাবেগকে সঞ্জীবিত ক'রে তোলো, কেননা তোমাদের লক্ষ হচ্ছে সব সময়েই মানুষের হৃদয়ই।

তোমরা যদি এ-বিষয়ে আমার এই অভিমতের সঙ্গে একমত হও যে, উৎকর্ষ অর্জনের জন্যেই জীবনীশক্তি মানুষের মনে চেতনা জাগ্রত করে; তাহলে এই জীবনীশক্তি থেকে উদ্‌ভূত সব কথাই রাজনৈতিক কর্মকেই প্রেরণা দেবে। তাহলেই তোমাদের কাজ হচ্ছে, তোমাদের লেখার মধ্য দিয়ে এই জীবনীশক্তি মানুষের মধ্যে সঞ্চার করা, যাতে মানুষ কর্মে উদ্‌বুদ্ধ হয়ে উঠতে পারে। ভাবাবেগ ও যুক্তির মধ্যে দিয়ে এই জীবনীশক্তি যাতে বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়, সে ব্যবস্থা করাও তোমাদের কাজ। কিন্তু মানবজাতিকে তোমরা কেমন দেখছ? এই মানবজাতির মধ্যে তোমরা নিজেদেরই বা দেখছ কেমন?

এটা তোমাদের যৌবনকালেরই একটা অভিশাপ যে, তোমরা বেঁচে থাকবার আনন্দ ও উল্লাস উপভোগ করতে পারলে না, তার উপর যে মানুষ নিজের দুষ্কর্মের হাত থেকে নিজেদের মুক্ত করতে পারছে না, তাদের সম্বন্ধে একটা দায়িত্ববোধও তোমাদের উপর এসে পড়ল। মানুষ যে-দুর্গতি নিজেই সৃষ্টি করেছে তাকে চিনতে না পেরে, সেই দুর্গতির তাড়নায় মানুষের আর্ত-ধ্বনি তোমাদের কানে এসে পৌঁছতে লাগল। নিজের বুদ্ধি ও নিজের কৌশল প্রয়োগ ক'রে মানুষ বিজ্ঞান ও যন্ত্রবিদ্যার দ্বারা প্রকৃতিকে বেঁধে ফেলল, কিন্তু সেই বুদ্ধি ও বিবেচনা প্রয়োগ করে মানুষ নিজের জন্যে সঠিক পন্থা উদ্‌ভাবন ক'রে নিতে পারল না। যে প্রকৃতিকে সে বাইরে থেকে জয় করেছিল, সেই প্রকৃতিই আবার মানুষের মধ্যে থেকে ফেটে বের হল। সে বেশ স্বেচ্ছায়ই সেই নিয়মের জোয়াল ঘাড় পেতে নিল, যে নিয়মকে সে প্রাকৃতিক নিয়ম বলেই অনুমান করেছিল; এর দ্বারা তার জীবনীশক্তিই খর্ব হল, কেননা ঐটা যে জীবনীশক্তির পরম শত্রু; মানুষ তখন যুক্তির দ্বারা নিজেকে চালিত না ক'রে জড়তার ও বিবর্তনের নিয়মের সঙ্গেই নিজের ভাগ্য বেঁধে ফেলল।

স্বেচ্ছায় গৃহীত এইটেই তার একমাত্র গুরুভার নয়, এর উপর বাড়তি যে বোঝা তার ঘাড়ে চাপল সেটা হচ্ছে মানবজাতির অতীতেরও বোঝা। স্বতঃস্ফূর্তভাবে সে কাজে অগ্রসর না হয়ে অনবরতই নিজেকে ইতিহাসের সঙ্গে যুক্ত করে রাখল। কোনো কাজ ভালো খারাপ বা যুক্তিযুক্ত মনে ক'রেও সে সম্বন্ধে সে কিছু করতে পারল না, অতীতের ঐসব ব্যাপারে কি রকম কি ঘটেছে তাই দিয়েই সব বিচার করার চেষ্টা করতে লাগল। তার কৃতকর্মের জন্যে কোনো দায়িত্ব না নিয়ে, সে কেবল ঐতিহাসিক প্রয়োজনের দোহাই দিতে লাগল।

তোমরা এখন বেশ বুঝতে পারছ যে, তার পার্থিব কোনো সুবিধার কথা ছাড়া এখন মানুষে আর কোনো কথাই ভাবছে না। এ ব্যাপার দেখে তোমরা যুবকেরা মর্মাহত হবে যে, পরস্পরের সঙ্গে অন্তরঙ্গ ভাবে মিশবার ও পরস্পরের মতামত বিনিময়ের যে আবহাওয়া মানুষকে রীতিমত মর্যাদা দিত এবং যা সর্বত্রই ব্যাপ্ত হয়ে ছিল, এখন আর সে অবস্থা নেই। সেই জন্যে নিঃসঙ্গ হয়ে ও হতাশ হয়ে এখন তোমরা জীবনীশক্তি নিয়ে গবেষণা করছ। এ'তেও জীবনীশক্তিরই অবমাননা, কেননা জীবনীশক্তি উদ্‌ভাবনে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রয়োগ করা হচ্ছে, এবং তার দ্বারা জীবনীশক্তিই হয়ে যাচ্ছে বরবাদ। জীবনীশক্তি কাকে বলে এবং তার অর্থই বা কী সে সম্বন্ধে আলোকপাত না ক'রে, কি ক'রে এটি বাড়ানো যায় তার উপায় উদ্‌ভাবন নিয়ে অনেকটা ছেলেখেলাই করা হচ্ছে। কেবল মাত্র যুদ্ধ বাধিয়ে দিয়ে বা যে আইন তৈরি হয়েই আছে অন্ধভাবে তার খাপের মধ্যে গবর্নমেণ্টগুলিকে বসিয়ে দিয়েই যে মানুষের ইতিহাসকে বিকৃত করা হয়েছে এমন নয়, জীবনীশক্তির প্রভাবেই যে-যে কাজ হয়েছে সেইসব কাজকে এবং যাঁরা সেইসব কাজ করেছেন তাঁদের সকলকে ঐতিহাসিক গবেষণার বস্তু করে ফেলা হয়েছে, অর্থাৎ কিনা জড়বস্তুর মতন তার বিচার হয়েছে।

ব্যাপারটা এমনই দাঁড়িয়েছে যে, তোমাদের মধ্যের অনেকেই সংস্কৃতি জিনিসটাকে একটা মহৎ জিনিস বলে বুঝতে না পেরে, পূর্বকালের যাবতীয় সংস্কৃতিমূলক কাজ বর্জন করেছ, এর একটা বিকৃত রূপই পণ্ডিতেরা তুলে ধরছেন এবং তদনুরূপ ব্যাখ্যা করছেন—তোমাদের বর্জনের হেতু হচ্ছে এই। এবং এর দ্বারা আরও বেশি অজ্ঞতাই তোমাদের মধ্যে এসে যাচ্ছে।

এ বিষয়ের প্রশ্ন করা হলে, সর্বদেশের মানুষই একটা কদর্য সংস্কারের

দোহাই দেয়, সেটা হচ্ছে দৈব, পুরাকালে যাকে নাকি বলা হত অদৃষ্ট। নিজের কাজের সাফাই গাইবার জন্যে এ রকম অজুহাতই দেওয়া হয়ে থাকে, কেননা নিজেদের কাজের সমর্থনে আর তো কিছুই বলার নেই।

পৃথিবীটাকে মানুষ এমন এলোমেলো করে দিয়েছে যে, একে আর কখনো সাজিয়ে-গুছিয়ে তোলা যাবে না। মানুষ এখন তার গৌরবে ও তার দুর্দশার মাটিতে চাপা পড়েছে, তাকে জাগাতে হলে তাকে কবর খুঁড়ে বের করতে হবে।

মানুষকে তোমরা এইভাবে পাচ্ছ। মুক্ত জীবন ও মুক্ত মন নিয়ে মানুষ আর চলছে না; সে এখন চলছে সেই শক্তির প্রভাবে স্বেচ্ছায় সে যার বশ্যতা স্বীকার করে নিয়েছে এবং এখন যার লাগসই এক-একটা নামকরণ সে করেছে, যথা—অ্যানাক্রনিসটিক ফর্ম অব্ স্টেট স্টাকচার, হিস্টরিকো-বায়োলজিকাল ল, ক্যাপিট্যালিজম, কনভেনশন্স্ অব থিংকিং অ্যাণ্ড লিভিং, মিলিটারিজম, এবং সবচেয়ে মারাত্মক ও নির্দয় সেই কথাটা—হাঙ্গার; অর্থাৎ ক্ষুধা।

কোনো শিক্ষা-প্রচারক বা কোনো আন্দোলক তোমাদের এসব কথা শিখিয়েছে বলেই কিন্তু তোমরা এসব জানতে পারনি, তোমরা এসব জেনেছ বড়ই মর্মান্তিক ভাবে, কেননা এসব তোমরা জেনেছ তোমাদের যৌবনের অভিজ্ঞতা থেকে। কিন্তু তোমরা তো ভালোভাবেই জান যে, যেসব জিনিসকে আমরা খারাপ বা জঘন্য বলে জানতে অভ্যস্ত হয়েছি, বস্তুতপক্ষে সে সবই হচ্ছে নিষ্ক্রিয়তা। তাহলেই তোমাদের একমাত্র সম্মিলিত কাজ, তোমাদের একমাত্র উচ্চকণ্ঠ ঘোষণার উদ্দেশ্যই হচ্ছে, এই নিষ্ক্রিয়তাকে ক্রিয়ায় রূপান্তরিত করা, আন্দোলনে দাঁড় করানো। সব পাপের মধ্যে জঘন্যতম যে পাপ তার সঙ্গে সংগ্রাম করার জন্যে তোমরা কলম ধরো, সে পাপ হচ্ছে হৃদয়ের ও মনের নিষ্ক্রিয়তা—জড়ত্ব।

তাহলেই তোমাদের রাজনৈতিক কবিতা হবে উত্তেজিত করে তোলার জন্যে, সব রহস্য উন্মোচন করে দেবার জন্যে, চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করার জন্যে ও সকলকে জাগিয়ে তোলার জন্যে।

হাইনরিখ মান্, এই রকম আবেগপূর্ণ রাজনৈতিক আক্রমণ ও দাবী আপনার শেষ নভেল নাটক ও বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় ছড়ানো প্রবন্ধের মধ্যে আমরা পেয়েছি, পেয়েছি আপনার রচনা-সংগ্রহে—সর্বত্রই আপনি তরুণদের জাগ্রত

হয়ে উঠতে বলেছেন। কিন্তু আপনি, লাডউইগ রুবিনার, আপনার রচিত সব ম্যানিফেস্টো একত্রে গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হয়েছে, আপনি উদাত্ত কণ্ঠে যে উদ্দীপনাময় বাণী তাতে প্রচার করেছেন যার তুলনা হয় না, আপনি তাতে যেন সমগ্র মানবজাতির পায়ের নীচে লক্ষ লক্ষ টন অতি-বিস্ফোরক পদার্থ সাজিয়ে দিয়েছেন, এবং যেসব মানুষের জীবনীশক্তি আছে তাদের দায়িত্ববোধ নিয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বলেছেন। আমাদের যুগের এই অবসাদের মধ্যে আপনি এক উত্তেজক রাজনৈতিক গীতিকবিতা রচনা করেছেন, সেটা যেন একটা দীপ্ত পাহাড়, যেন একটি বাতিঘর—যেখান থেকে আলো গিয়ে পড়ছে জলের তলে ডুবে-থাকা আমাদের অতীতের উপর ও ভবিষ্যতের ভূখণ্ডের উপর। কার্ল স্টার্নহেইম তাঁর কৌতুক রচনার মধ্যে দিয়ে মধ্যবিত্তদের উদ্বেগের বিরুদ্ধে যেমন শেষ আঘাত হেনেছেন, এবং সোস্যালিস্ট নায়কের বেদনাকেও তেমনি হাস্যকর করে তুলেছেন; তাঁর সঙ্গে ফ্রান্‌জ ভেরফেলের কথাও—তিনি আমাদের দল থেকে এগিয়ে গিয়েছিলেন, তিনি ছিলেন খুবই উৎসাহী, আত্মসচেতনতার দয়ালুতার ও দাক্ষিণ্যের কথা তিনি জোর গলায় বলে গিয়েছেন, তাঁর কণ্ঠস্বর এমনই মধুর ও তেজী ছিল যে, মনে হত যেন ঐসব কথা তাঁর মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসছে না, যেন তা আসছে সমগ্র বিশ্বের হৃদয় মন্থন করে। ফ্রান্‌জ্ ফেমফার্টের মতন দায়হীন বিদ্রোহী যেন দেখা যায় না, আপনার পত্রিকা 'অ্যাকশন' থেকেই তখনকার যাবতীয় রাজনৈতিক শক্তির উদ্‌ভব, আপনি যেখানে যা প্রকাশ করেছেন তার থেকেই দেখিয়েছেন যে কোনো সমকালীন রাজনীতি নিয়ে আলোচনা না করেও কিভাবে মানুষ রাজনৈতিক ভাবে প্রভাবশালী হতে পারে। জোহানেস আর. বেচার্ কোনো-রকম ব্যাকরণের ধার না ধেরে সৌভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্যে সকলকে সংগ্রামে লিপ্ত হবার জন্যে উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছিলেন। লিওনহার্ড ফ্রাঙ্ক, যুদ্ধ সম্পর্কে লিখিত আপনার গল্পে আপনি যুদ্ধের জন্যে যারা দায়ী তাদের কথা স্পষ্ট করে বলেছেন। রেনি সিকল জাতিতে জাতিতে সংঘর্ষে মানুষের ধূলায় পিষ্ট হয়ে যাবার দশার কথা বলেছেন বেশ মৃদু ভাষায়। মানবগোষ্ঠী যাতে পাথুরে মশালের মতন জ্বলে উঠতে পারে তার জন্যে মাথা কুটেছেন ভল্‌ফেনস্টাইন। ম্যাক্স ব্রডের সেই মানবজাতির নেতাদের উৎসাহ দেবার সচতুর বুদ্ধি......

...আর সেই বলিষ্ঠ হাসেনক্লেভার নতুন রাজনৈতিক সংগীতের যিনি তেজোদীপ্ত দেবদূত, তাঁর যে সংগীত নূতন রাজনৈতিক নাটকই হয়ে

উঠেছিল·········আর, আর তোমরা তরুণ নাট্যকার ও গীতিকবির দল, তোমরা সকলেই দৃঢ় শক্তির বিরুদ্ধে বিষাদময় বিদ্রোহের কাহিনী রচনা করছ, এইটেই হচ্ছে মানবজাতির প্রকৃত বিপ্লব। এটা শিল্পের খাতিরে লেখা হচ্ছেনা, মানবজাতির রাজনৈতিক চেতনার জন্যে এবং তার আধ্যাত্মিক আত্মোপলব্ধির জন্যেই তোমাদের এইসব রচনা। এটা আমাদের যৌবন-কালেরই একটা মহান অভিজ্ঞতা যে, এতকাল মৃদু মধুর ভাষায় যাকে বলা হয়েছে মানবতা, ভ্রাতৃত্ব, আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা, দয়া, ন্যায়বিচার, সুখশান্তি, দায়িত্ববোধ, ভালোবাসা—সেইসব আদর্শকে প্রকৃত রূপদানের জন্যে তোমাদের মধ্যে ও আমাদের সকলের মধ্যে বেজে উঠেছে যেন এক ভেরীনিনাদ, মানব-জাতির কল্যাণের জন্যে সংগ্রামে লিপ্ত হবার জন্যেই এই নিনাদ।

তোমাদের রচনা সাহিত্যপদবাচ্য নয়, তোমাদের দাবি হচ্ছে স্বর্গরাজ্য-প্রতিষ্ঠার দাবি—এরকম কথায় পথভ্রষ্ট হোয়ো না। স্বর্গ সম্বন্ধে ধারণাও মানবপ্রকৃতিরই একটা অঙ্গ, এমন কোনো চিন্তা নেই, প্রথমে যা সাহিত্য ছিল না। মনে রেখো মানবজাতির প্রথম বক্তব্য প্রথমে প্রকাশিত হয় অজ্ঞাত পত্রিকাতেই, অনেক অপঠিত কেতাবে, এবং ছোট-ছোট চিন্তাশীল চক্রেই। কোনো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কখনো নতুন কোনো আইডিয়া ঘোষিত হয়নি, বহুল প্রচারিত পত্রিকাতেও নয়, কোনো রাজনৈতিক বক্তার মঞ্চ থেকেও নয়। আধ্যাত্মিক ও নৈতিক দাবির ধ্বনি উঠলে তা অসম্ভব ব'লে হাসির ধ্বনিতে পরিণত হত ঐসব জায়গা থেকেই।

নতুন কালের রচনা ও সেকালের মানুষের মধ্যে ভীষণ ফারাক—এ রকম চীৎকার, নতুন লেখকদের পাঠক সংখ্যা কত সে সম্বন্ধে ব্যঙ্গপূর্ণ প্রশ্ন—সবই তলিয়ে যায়, যেমন তলিয়ে গিয়েছিল শতবর্ষ আগে উচ্চারিত ফ্রায়েডারিখ শ্লেগেল উচ্চারিত সত্যটির দ্বারা : "অনেকে অভিযোগ করে বলেন যে জার্মান লেখকরা এমন সংকীর্ণ একটা পাঠকচক্রের জন্যে লেখেন যে, মনে হয় পরস্পরে যেন লিখছে পরস্পরের পড়ার জন্যে। এটা তো ভালো কথাই। এ'তে বোঝা যাচ্ছে যে জার্মান সাহিত্য ক্রমশই আরও জীবনীশক্তি ও চরিত্র লাভ করবে। এবং ইতিমধ্যে হয়তো গড়ে উঠবে একটা বড় পাঠকসমাজ।" পাঠক সংখ্যা সম্বন্ধে ধারণাও স্বর্গকল্পনার মতই। একদিন এর জন্যে তোমার কৃতিত্বেরই প্রমাণ হবে, প্রমাণ হবে যে, তুমি যখন জনতার সামনে কথা বলেছ তখন জনতার স্তরে নেমে যাওনি। তোমাদের

মধ্যের কেউ যদি আমার মতন খবরের কাগজে সেই কাগজের চিরাচরিত রীতি অনুসরণ করে কাজ করার চেষ্টা করে থাক, তাহলে নিশ্চয় বুঝেছ কী মারাত্মক পথই ধরেছে তারা। পরস্পরে পরস্পরের মান নীচু করে দেবার জন্যে খবরের কাগজ পাঠকের চাহিদার জোগান দেয়, ও পাঠক জোগান দেয় খবরের কাগজের চাহিদার। এ'তে প্রত্যহ মনের স্বাধীনতা খর্ব করার এই যন্ত্রের চাপে মানবজাতি চিন্তা করার কোনো প্রেরণা তো পায়ই না, বরঞ্চ চিন্তা করা ভুলে যাবার জন্যেই সে বাধ্য হয়।

তোমাদের হয়তো সেই সামান্য এথেনিয়ান সক্রেটিসের কথা মনে আছে। লিখিত আকারে তিনি অবশ্য কিছুই রেখে যান নি; তবুও তাঁরই চিন্তার উপর নির্ভর ক'রে তিন হাজার বছর ধরে ইউরোপের দর্শন বেড়ে উঠেছে। তোমরা রুশোর কথাও মনে করতে পারবে, যিনি গান নকল ক'রে ক'রে হাস্যাস্পদ হয়েছিলেন, তাঁর রচনা প্রথমে হয় নিষিদ্ধ, তার পর প্রকাশ্যে তা পোড়ানো হয়, কিন্তু তাঁর এই রচনার ভিত্তিতেই পোল্যাণ্ড তাঁকে সে দেশের শাসনতন্ত্রের খসড়া রচনা করে দেবার অনুরোধ জানাতে উদ্যত হয়েছিল। এবং তোমরা নির্বাসিত কার্ল মার্কস-এর কথা ভেবে দেখ, বেশ ব্যাপকভাবে বিস্তৃত একটি সংগঠনকে উদ্দীপনা দিয়েছিল তাঁর আইডিয়া, এবং মানব-সমাজকে তা পুনর্গঠনের পথে নিয়ে গিয়েছিল—তিনি তা দেখে গিয়েছেন।

তাহলেই তোমরা বুঝতে পারছ যে একটা আইডিয়া উচ্চারিত হলে তা মাথার মধ্যে কিভাবে ঢুকে যেতে পারে; জনতাকে তার জড়ত্ব থেকে জাগিয়ে তোলার জন্যে অভাব-অনটন, ঐশ্বর্য অথবা অস্ত্রবল কিছুই না, যা তাকে জাগাতে পারে তা হচ্ছে আইডিয়া। তোমরা স্থিরনিশ্চিন্ত যে, বাস্তবতা দিয়ে আইডিয়া গঠিত হয় না, আইডিয়া দিয়েই বাস্তবতা গঠিত হয়, এই জন্যেই তোমাদের বাস্তবতা সম্বন্ধে রচনায় তোমরা পরিষ্কার ভাবে মানবজাতির পক্ষে আইডিয়ারই জয়ধ্বনি করতে পেরেছ।

প্রথমেই তোমরা বেশ প্রবল ভাবেই গীতিকবিতা গ্রহণ করলে। তোমরা যখন বিশ্লেষণমূলক কবিতায় বেশ খুশি মনে ও ব্যঙ্গভরে বড় বড় শহরের কথা লিখছিলে, তখনই তোমাদের অজানিতেই তোমরা তোমাদের কালের দুর্দশার পরিচয় পেয়ে গেলে। এখন আর তোমরা বিশ্বের গান গাইতে পার না। পারনা—কেননা, করুণা, অনুযোগ, ঘৃণা, ও ভৎর্সনা এখন তোমাদের মধ্যে পুঞ্জীভূত হয়েছে। তুমি দেখতে পেয়েছ লাস-কাটা ঘর, দেখেছ

পাগলা-গারদ, চূড়ান্ত কামুকতা ও নষ্টামি, দেখেছ শিশুদের, দেখেছ গণিকাদের, বৃদ্ধদের দেখেছ, অপরাধীদের দেখেছ, আর দেখেছ দেবতুল্য মানুষও। কিন্তু এই বাস্তবতার কাছ থেকে তুমি পালিয়ে যাও নি, তুমি পৃথিবীর এই বাস্তবময়তার নরকের দিকেই ছুটে গিয়েছ। তুমি নিজের বোধ ও বুদ্ধি দিয়ে সমগ্র ব্যাপার সম্বন্ধে ভালোভাবে ওয়াকিবহাল হতে চাও বলেই সেই দিকে ছুটে গিয়েছ। তার পর নতুন একটা পরিবর্তন ঘটল, যারা ছিল তোমাদের কবিতার বিরোধী বা সে সম্বন্ধে উদাসীন তারা এসে তোমাদের সঙ্গে যোগ দিল। নৈতিক বিদ্রোহের মধ্যে দিয়ে তোমরা মুক্তির বাণী শোনাতে আরম্ভ করলে। তোমরা সকলকে জেগে উঠতে বললে, তারা কি অবস্থায় আছে তা তাদের দেখতে সাহায্য করলে, তাদের উন্নতির ব্যবস্থা করলে—সে ডাক তারা যুগ-যুগ ধরে শোনেনি তাই তারা শুনল। যে কথা স্ট্রিণ্ড্বার্গও তাঁর নাটকে বলতে পারেন নি, সেই কথা তোমরা বললে। অবশেষে তোমাদের সকলের কণ্ঠস্বর একত্র হয়ে ঐকতানের মতন বেজে উঠল, সেই ধ্বনি দাবি তুলে ধরল যে, বহুকাল হল যে ভাবাবেগ ও যে-আইডিয়া আমরা ভুলে আছি সেই ভাবাবেগ ও আইডিয়া আমাদের জীবন পরিচালনা করুক।

তোমাদের গল্পরচনা সম্বন্ধে তোমাদের বিরোধীদের বক্তব্য এই যে বিগত কয়েক যুগের মনস্তাত্ত্বিক অভিজ্ঞতাই তোমরা কাজে লাগাচ্ছ এবং তাই বয়ে নিয়ে চলেছ। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তোমরা ও ব্যাপার নিয়ে কতটুকুই-বা বিব্রত ছিলে! অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্যে মনস্তত্ত্বের চর্চা, মনমাতানো মনস্তাত্ত্বিক সম্পর্কের বিবরণ দিয়ে এবং সংকটজনক সমস্যার সন্তোষজনক সমাধান পরিবেশন করে পাঠকের মন জয় করা! তোমরা যখন কোনো পুরুষ ও নারীর হৃদয় ও মনের মধ্যে প্রবেশ কর, তখন তাদের নারী-পুরুষ সম্পর্কের মধ্যে সে দুঃসহ যন্ত্রণার সংগ্রাম চলেছে তার কথা তোমরা বলে থাক তাদের বাইরের খোলস ছাড়িয়ে ফেলে দেবার জন্যেই, এবং উপরের খোসাটাই তোমরা দেখাতে চাও তোমাদের স্বজন ও সুহৃদদের।

তোমরা এ বিষয়ে খুবই সচেতন যে, শিল্প হচ্ছে জীবনীশক্তিরই একটা রূপ, বাস্তবের প্রতিচ্ছবিই নয়; বাস্তব ও অবাস্তবের সীমারেখা নিজে থেকেই মুছে যায়। একটি সহজ ও সাধারণ বিষয়ও এমন সহজ সত্যের মতন ক'রে তোমরা তুলে ধর যে, যেসব পাঠক সরলতা ভুলে গিয়েছে তাদের কাছে তা

অবিশ্বাস্য বলে বোধ হয়, মনে হয় অদ্ভুত ও অলৌকিক। কিন্তু কোনো কাল্পনিক বা আজগুবি বিষয়ের বিবরণ যদি সত্য ঘটনার মতন করে বিবৃত কর, তাহলে কেউ বিস্মিত হয় না, তখনই সকলে তাকে বাস্তব ঘটনা বলে মনে করে নেয়। কিন্তু উদ্দেশ্য এতে সফল হল, পাঠকদের মধ্যে ব্যাকুলতা বাড়ল। গল্পটি পাঠ করে তার দৃঢ় ধারণা হল যে, মানুষের মনই পৃথিবীকে পালটে দিতে পারে।

এবং তোমরা তো নাটকের বেশ দক্ষতা অর্জন করছ। তোমরা কি মনে কর যে, নাটকই হচ্ছে তোমাদের সাহিত্যিক বোধ প্রকাশের উপযুক্ত মাধ্যম? …যে নাটককে আমরা সকলে ভাববাদী নাটক বলে থাকি সম্ভবত। এখানে মানুষের সামনে প্রকাশিত হয়ে ওঠে মানুষ। এখানে একজনের মন থেকে যে আলোক বিচ্ছুরিত হয় তা গিয়ে দর্শক-সাধারণের মনের মধ্যে প্রবেশ করে। স্বগতোক্তির তাৎপর্য তোমরা আবার নতুন করে আবিষ্কার করেছ, একজন মানুষের আত্ম-আবিষ্কার ও মানবজাতির উদ্দেশে বলা বাণী যুগপৎ এখানে ঘটে যাচ্ছে।

কিন্তু এ কথা ভুলো না যে, মঞ্চ বিচারালয় নয়। এই দুইটি বিষয়ের প্রভেদ বুঝে নাও, তার পর ঠিক করে নাও কোন্‌টার প্রভাব বেশি—জনসমষ্টির মধ্যে থেকে একজন কথা বলছে, এবং যখন জ্যোতির্মণ্ডল দ্বারা পরিবেষ্টিত এক মহত্তর পৃথিবীর ঘটনা বা বাণী শুনছে একটা জনসমষ্টি—এ ক্ষেত্রে তারা মনে করছে যে তারা যা দেখছে সেইটেই সত্যতর বিশ্ব এবং তার মধ্যে তারা হচ্ছে অসম্পূর্ণ প্রতিবিম্ব মাত্র। তোমাদের ছেলেবেলার কথা মনে কর, কোনো মঞ্চের উপর যে চলাচল ও যে আইডিয়ার রূপ দেখেছ তোমাদের মনে তার ছাপ এমন গভীরভাবে ও স্থায়ীভাবে বসেছে যা নাকি তোমাদের কোনো ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাতেও বা শিক্ষাতেও হতে পারত না। এ কথা মনে করলেই বুঝতে পারবে যে, নাটকে যে বক্তব্য মূর্ত হয়ে সচল হয়ে উঠেছে, তা কোনো বক্তৃতার থেকে অনেক শক্তিশালী; এবং এই চলমান মূর্তিই বাস্তব বিশ্বের উপর আধ্যাত্মিক বিশ্বের ছাপ স্পষ্টতর করার পক্ষে উপযোগী।

তোমাদের আবেগের সত্যতার বিরুদ্ধে অনেক বিরোধী অভিমত আছে। তোমাদের আবেগের গভীরতা, তোমাদের লক্ষ্যপথের প্রকৃতি, তোমাদের ইচ্ছার প্রবলতা কখনই ঐ ঠাণ্ডামেজাজের ও শান্তপ্রকৃতির ভাষা দিয়ে প্রকাশ

করা সাজে না। তোমাদের দরকার হচ্ছে ম্যানিফেস্টো পাঠ করা! তোমাদের কবিতার মধ্যে আছে বিশৃঙ্খলা! হঠাৎ ফোটা ফুলের মতন গভীর হতাশা বা তীব্র উল্লাস সেখানে ফুটে ওঠে। কণ্ঠস্বরের শক্তিকে তোমরা ভালবাস। তোমাদের আবেদন ও তীব্র চীৎকারের আহ্বান সকলের হৃদয় বিদীর্ণ করে দিক। ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সতর্কবাণী হুংকার দিয়ে উঠুক। যে মধ্যবিত্তদের ঘিরে ব্যঙ্গপরিহাস চলেছে, তাদের সম্মুখে এসে দেখা দিক বীভৎসতা। ধ্বংস করে ফেলার জন্যে ব্যাজস্তুতি মুখর হয়ে উঠেছে। অনেকেই তাদের যুগকে নিজের পদ্ধতিতে শাস্তি দিতে কুণ্ঠিত নয়, সে পদ্ধতি হল ধাপ্পা দেওয়া ও প্রচারকুশলতা দেখানো। মধুর গান অনেক সময় ভ্রান্তি সৃষ্টি করে, উৎসব অনেক সময় রক্তিম শিখার মতন দেখা দেয়, এবং একটা যে করুণরসকে অবজ্ঞা করা হত, সেই রসই আচ্ছন্ন করে দেয় আকাশকে, যে আকাশ ভবিষ্যতের জন্যে নীল হয়ে আছে, কিন্তু যার মূর্তি এখন ঘৃণার মেঘপুঞ্জে এখন কালো হয়ে উঠেছে। এখনও তোমরা চীৎকার করে ডাক দিয়ে ওঠো—সহচর বন্ধুগণ! তোমাদের কয়েকটি বইয়ের নাম এই—'আমরা আছি, পরস্পরের সঙ্গে', 'ইউরোপ-অভিমুখে', 'ভ্রাতৃত্ব', 'কেন্দ্রস্থলে মানুষ', 'মৃত্যু ও মুক্তি', 'চ্যালেঞ্জ', 'বন্ধুত্বের দীপশিখা', 'মানুষের চীৎকার', 'নূতন আরম্ভ', 'কমরেডস্'···!

প্রত্যেকটি আবেগ যাতে কথা হয়ে উঠতে যে-কোনো উপায়ে তার ব্যবস্থা করাই তোমাদের অধিকার ও কর্তব্য। তোমাদের শক্তি ও ভাবাবেগ আছেই বলে তোমরা ধরে নিয়েছ, কিন্তু যাঁরা তোমাদের বিচার করবেন তাঁরা দেখতে চাইবেন তোমাদের রচনার মধ্যে তোমাদের হৃদয় অনুভূতি উদ্বেল হয়ে উঠেছে কিনা এবং তোমাদের লক্ষ্যের সম্যক্ রূপ তোমরা দিতে পেরেছ কিনা। কিন্তু কেউ যেন তোমাদের রচনার বিভিন্ন দিক বিচার করেও বলতে না-পারেন যে, তোমাদের মধ্যে তেমন ইচ্ছাশক্তি নেই—মানবজাতিকে নূতন রূপে রূপান্বিত করার ইচ্ছাশক্তি।

তোমরা নিজেদের সক্রিয়কর্মীই বলো আর মানবজাতির কল্যাণের অনবরত আবেদন প্রচার করেই থাক, কিংবা মানুষের জন্মগত অধিকার সম্বন্ধে নতুন নতুন সংগীত রচনাই কর, সর্বত্রই এই ইচ্ছাশক্তিটিই বড় কথা। এই ইচ্ছাশক্তিই হাজার-হাজার মানুষের হতাশা দূর করার জন্যে অনুপ্রেরণা আনে, এবং অল্প কথায় মনের কথা প্রকাশে সাহায্য করে, এবং সেইসঙ্গে অন্যান্যদের

মনেও এমন প্রেরণা এনে দেয় যে, তারা তাদের বক্তব্য প্রচার করে অনেকটা যেন জলপ্রপাতের মত, সে বক্তব্য হচ্ছে মানুষকে উন্নততর স্তরে উন্নীত করার জন্যই ও আমাদের জীবনের অভিজ্ঞতাকে ঐশ্বর্যমণ্ডিত করার জন্যই। তোমার পাণ্ডিত্যপূর্ণ কথার তোড়ে মানবজাতির মধ্যে বোধ সঞ্চারিত করেই থাক বা কিংবা তাকে সীমাহীন মহাশূন্যতার মধ্যেই নিয়ে যাও; তোমরা সংবাদপত্রের পাতা ছিঁড়ে এনে আমাদের যুগের কলঙ্ক উন্মোচন করে মানুষের মনে ত্রাস-সঞ্চার করেই থাক, কিংবা তীব্র ভৎর্সনার সঙ্গে তুমি সর্বজনীন অকর্মন্যতার ছবিই তুলে ধর; তোমরা বাস্তবতাবর্জিত কোনো তথ্য পরিবেশন করে একটি নূতন জগৎ নির্মাণের জন্যেই সোচ্চার হয়ে ওঠো, কিংবা নিজের মস্তিষ্ক খাটিয়ে ধারালো বাক্য গঠন করে আমাদের মনের মধ্যে তা গেঁথে দিতে চাও—সর্বত্রই তোমাদের উদ্দেশ্য এক। মানবজাতিকে তোমরা সক্রিয় ক'রে তুলতে চাও, তোমরা তার মধ্যে মানবিক বোধ আনতে চাও।

এখানে তোমরা অনেকে আছ। এটা ভালো লক্ষণ। প্রতি মাসেই এই সংখ্যা আরও বাড়বে, তার ফল আরও ভালো হবে। এটা একটা অভূতপূর্ব দৃশ্য হবে, শুভ-আরম্ভের জন্যে সমবেত যাত্রা—এটা হচ্ছে মানবজাতির মুক্তির জন্যে ধর্মযুদ্ধের মতনই।

অতীতকালের মহৎ বাণী আমরা ভুলিনি। যে আইডিয়া আমাদের উদ্বুদ্ধ করেছে, যে আইডিয়া দিয়ে আমরা অন্যান্যদের অনুপ্রাণিত করছি, তা কিছু নতুন না, তা হচ্ছে চিরকালীন। আমাদের ঔদাসীন্য সত্ত্বেও ইউরোপীয় চিন্তানায়কদের বাণী আমরা ভুলিনি। রুশ গল্প লেখকদের কণ্ঠস্বর এখনো আমরা শুনতে পাচ্ছি, আমরা শুনতে পাচ্ছি সেই স্নেহশীল ভ্রাতৃমূর্তি ওয়াল্ট হুইটম্যানের গান। আমাদের সহায় হিসেবে আমরা গেটের উক্তি স্মরণ করতে পারি—"জীবনীশক্তিই হচ্ছে একমাত্র সম্বল যা দিয়ে সমস্ত বিশ্বের যাবতীয় বাধা দূর করা যায়।"

পুরাতন মানুষেরাও আমাদের সঙ্গে আছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকরা অন্যান্যদের সঙ্গে গলা মেলাচ্ছেন; কেউ কেউ তাঁদের পদ ত্যাগ করে যুবনেতার ভূমিকা নিচ্ছেন, রাষ্ট্রের ক্ষমতার উপর তাঁরা আর নির্ভর ক'রে নেই। রাজনীতিবিদেরা তাঁদের দাবি আরও স্পষ্ট ক'রে বলার জন্যে উৎসাহিত হয়েছেন, তাঁদের লেখাও ও তাঁদের বক্তৃতায় তাঁরা আমাদেরই উচ্চারিত দাবীর কথা বলেছেন। জীবনীশক্তির দ্বারা উদ্‌বুদ্ধ জগতের স্রষ্টা, জীর্ণ বিশ্বের

সংহারক ও নবীন মানবজাতির প্রহরী, হাইনরিখ মান্, আপনি আমাদের আগে-আগে চলুন ; পৃথিবীর সৌন্দর্যের গান গাইতে সাহসী হয়েছিলেন শেষ গীতি কবি থিয়োডোর ডাউবলার, আমাদের বাস্তবতার বাইরে সময় ও সীমা অতিক্রম করে নূতন বাস্তববোধের চেতনা এনে আমাদের উৎসাহিত করে তুলেছিলেন পল অ্যাডলার। আপনারা আমাদের মধ্যে আছেন। এবং আপনি, ফ্রিটৎস ফন উনরুহ্, যেখানে আপনার জীবন ও আপনার রচনা বেড়ে উঠেছে, আপনি নিজেকে সেই অঞ্চলে আবদ্ধ না রেখে স্বেচ্ছায় আমাদের দলে যোগ দিয়েছেন, তার দুঃসহ পরিণামের ব্যাপারটা হৃদয়বিদারক ঘটনাই বটে, কিন্তু আপনি রক্তপাতের আবহাওয়ার মধ্যেও নূতন আলোক সঞ্চার করতে পেরেছেন, এবং ধীর স্থির ও শান্ত মানবগোষ্ঠীর সৃষ্টি করতে পেরেছেন। আপনিও আমাদের সহায়।

আমাদের এই কাল তার সমস্ত বিশ্বাস ন্যস্ত করেছে এই সঞ্জীবনী শক্তির উপর। রাজনীতির প্রতি তাঁর দৃঢ় আনুগত্য রেখেছে আমাদের কাল। জনতার সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হতে হলে জনতারই নেতৃত্ব গ্রহণ করতে হবে— এই আইডিয়াই হচ্ছে আপনাদের কাছে সবার চেয়ে প্রিয় আদর্শ। প্লেটোর সেই আধ্যাত্মিক মানুষের দ্বারা পরিচালিত রাষ্ট্র থেকে আরম্ভ ক'রে ক্লপস্টকের স্কলারদের দ্বারা পরিচালিত অশিক্ষিত ব্যক্তিদের প্রজাতন্ত্র, 'ভিলহেলম্ মেইস্টার'-এ উল্লিখিত গেটের সেই সুউচ্চ মিনারবাসীদের সমাজ ও জর্জ স্যাণ্ড-এর সেই "অভিজাত বুদ্ধিজীবী" সমাজের দাবি থেকে আরম্ভ ক'রে রেনাঁ-র "যে সব মানুষ জীবনীশক্তির অধিকারী তাঁদের মধ্যের বাছাই-করা যে কয় জন বাস্তবতার সবচেয়ে প্রয়োজনীয় গোপন তথ্য অবগত আছেন, তাঁরাই তাঁদের সর্বশক্তি নিয়োগ ক'রে পৃথিবীর শাসনকাজ চালাবেন"—এইসব আইডিয়া আমাদের এই শতকের যাবতীয় অনিশ্চয়তার মধ্যেও দীপশিখার মতন জ্বলছে। কোনো রাজনীতিবিদ্ ও উপন্যাসকারের দৃঢ় ধারণা এই যে, উনিশ শতকের এই বিশৃঙ্খলতা থেকে মুক্তির উপায় হচ্ছে ঐ। এই রকমই মনে হয়েছিল বিপ্লবের পরে এবং রোমান্টিকদের বিরুদ্ধে নেপোলিয়নের অভিযানের পরে, যে সব রোমান্টিকদের মধ্যে একজন হচ্ছে প্রুশিয়ার অভিজাত জমিদার আচিম ফন আরনিম, যিনি তাঁর বিশেষ উল্লেখযোগ্য গ্রন্থে বলেছেন, "এর পর জার্মান সাম্রাজ্য অধিকার করা যাবে কেবলমাত্র আধ্যাত্মিক উপায়ে।" মনে রেখো যে আগে একবার জীবনীশক্তিসম্পন্ন মানুষের একটি

সংঘ জার্মানীর জনসাধারণের নেতৃত্ব নিতে চেয়েছিল—যখন ফ্রাঙ্কফুর্ট পার্লামেণ্ট বসেছিল; পৃথিবীর মধ্যে এমন মহৎ এমন মর্যাদাসম্পন্ন ও এমন নীতিপরায়ণ লোকসভা আর বসেনি। ১৭৫০ ও ১৮৪৮ সালের মধ্যে এইটেই ছিল মানবজাতির কুসুমিত হয়ে ওঠার পরিণাম—ফল। এ রকম মিলন সম্ভব হয়েছিল অন্য কিছুর জন্যে নয়, রাজনৈতিক ভাবে চেতনা জাগ্রত করে রাখবার চেষ্টাতেই এটা সম্ভব হয়েছিল। এ কালের রাজনীতিকেরা বা ইতিহাসের অধ্যাপকেরা হয়তো এ ব্যাপারটিকে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করেন; কিন্তু সেকালের অধ্যাপকেরা ক্ষমতাবান্‌দের ঢাক পিটিয়ে বেড়ান নি, বরঞ্চ শক্তিধরদের বিরুদ্ধেই ঘোরতর বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিলেন, এবং জনসাধারণের ঔদাসীন্যও তাঁরা বরদাস্ত করেন নি; তাঁরা তাঁদের দাবী ত্যাগ করতে পারেন নি তাঁরা ত্যাগ করেছিলেন তাঁদের পদ।

তোমরা, তরুণ কবিরা এখানে মিলিত হয়েছ বৈজ্ঞানিক রাজনীতিবিদ্‌ ও প্রচারবিশেষজ্ঞদের সঙ্গে, পার্লামেণ্টারি ভাষায় যাকে বলে বামপন্থী বুদ্ধিজীবী; যাঁদের কর্মসূচীর একটা খসড়া তৈরি হয়েছে অতি স্পষ্ট ভাষায় যে চিরকালীন আইডিয়ার ভিত্তিতে, আমি আবার তার উল্লেখ করছি—মানবতা, ভ্রাতৃত্ব, আত্মার স্বাধীনতা, সুখশান্তি, দায়িত্ববোধ, ও ভালোবাসা। মানুষের সেই আদিম আইডিয়া, যা তোমাদের কবিতায় ও আবেদনের মধ্যে বজ্রধ্বনির মতন বেজে চলেছে, তোমাদের লেখা গল্পে যা প্রতিধ্বনিত হয়ে চলেছে, এবং যা প্রয়োগ ক'রে তোমরা তোমাদের নাটকের কথোপকথন লিখে চলেছ, এবং সবশেষে তোমাদের পার্শ্ববর্তী সকলের মনের ক্লান্তি দূর করে তাদের সঞ্জীবিত করে তুলছ।··· এই চিরন্তন কথাগুলিকে ফাঁকা কথা ব'লে ব্যঙ্গ করে এক-গুঁয়ে ও অন্ধ কতকগুলি লোক—এরা প্রত্যহ মিথ্যার বেসাতি করেই জীবিকা অর্জন করে। এরা এ রকম প্রচার করে সেইসব মানুষের মধ্যে যারা নাকি এই আইডিয়া অনুসারে অগ্রসর না-হওয়ার দরুণই হতাশ হয়ে পড়েছিল।

এই সময়ে যখন আমি দেখতে পাচ্ছি যে তোমরা ঐ আইডিয়ার অনুকূলেই আছ, এবং তার জন্যেই জোরালো আবেদন প্রচার করছ, তোমাদের রচনায় যে আইডিয়ার কথা সুস্পষ্ট ভাষায় জোরদার করে বলা হচ্ছে, তখন, আমার মনে হয়, অবস্থান্তরের সময়টা পেরিয়ে গিয়েছে; আমাদের পূর্বসূরিরা নূতন অবস্থার ও নূতন জ্ঞানের আবর্তে পড়ে হতভম্ব

হয়ে পড়েছিলেন, তাঁদের ভাবাবেগে ও শিরায় যে টান পড়েছিল তা তাঁরা সহ্য করতে পারেন নি।

তোমরা এইসব আইডিয়ার কথা বলছ এবং তদনুযায়ী দাবী জানাচ্ছ বলেই তোমাদের কোনো খ্যাতি বাড়বে না, তোমাদের খ্যাতি বাড়বে এই জন্যে যে, ঠিক এই সময়ে তোমরা সে সম্বন্ধে জোর দিয়ে কথা বলছ, গান বাঁধছ এই সময়ের বিরোধী হয়ে। এই কারণেই তোমাদের খ্যাতি বাড়বে। কেননা, এই সময়ের সাহিত্যে যা হচ্ছে তা বিপরীত কাজ। সাহিত্য নিজের মধ্যেই নিজে জড়িয়ে আছে, বেশ হালকা মেজাজে তা কেবল বলে সঙ্গে রাজনৈতিক জীবনের গ্লানির কথা, ও সমাজের পাপের কথা—এমনভাবে বলছে যাতে তা বেশ প্রীতিপ্রদ হয়; এইভাবেই চিন্তার দৈন্য প্রকাশ করে ঐসব বিষয়কে বেশ মর্যাদাই দেওয়া হচ্ছে। তোমরা যদিও অতীতের অনেক কিছুই বরদাস্ত করেছ আর উপভোগও করেছ, কিন্তু অন্য সব কালই তোমাদের চেয়ে অনেক নিকৃষ্ট অনুকরণপ্রিয় ব্যক্তি দেখেছে। অবশ্য, তোমাদের যদি একান্তই অনুকরণপ্রিয় বলতে হয়। তোমরা উৎকৃষ্ট রচনার স্রষ্টা হিসাবে যদি গর্ব করতে না-ও পার, তোমরা যে পথিকৃৎ সেজন্যে গর্ব করা তোমাদের সাজে। যে মানবজাতি তথা-কথিত সত্যের ও তথ্যের এবং ঐতিহাসিক প্রয়োজনীয়তার বলী হয়েছিল, তোমরা সেই মানবজাতির জন্যে যে সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছ, সে সংগ্রামে লিপ্ত হওয়া মানুষের মত মানুষেরই কাজ। এ সংগ্রাম হচ্ছে বাস্তবতার বিরুদ্ধে আইডিয়ার সংগ্রাম। অথচ এখন পর্যন্ত অনেকের মেজাজ এমন স্তরে নেমে গিয়েছে যে, মনে হয় তা যেন বাস্তবেরই ক্রীতদাসে পরিণত, স্বেচ্ছায় এ-দাসত্ব তারা মেনে নিয়েছে। বাস্তবের যান্ত্রিকতার উন্নতি বিধানেই তারা মশগুল, এবং এক ধরণের বুদ্ধিমত্তা দিয়ে তার সমর্থনও জানানো হচ্ছে, যে বুদ্ধিমত্তা ধোঁকাবাজি ছাড়া কিছু না। কিন্তু এখন সেই তথাকথিত সত্যের বা তথ্যের বিরুদ্ধেই লড়াই শুরু হয়েছে; নামেই তা সত্য, কিন্তু প্রকৃত-পক্ষে তা যেন নিষ্ক্রিয়তার একটা মৃত বোঝার মতন। এখন সক্রিয়তার উদ্ভব হয়েছে, আইডিয়ার সংগ্রাম আরম্ভ হয়েছে।

সুতরাং, তোমরা যে নূতনের প্রবর্তন করেছ (বস্তুতপক্ষে যা নাকি প্রাচীন) তার সঙ্গে তোমাদের অন্য করণীয় কাজও আছে—যে মামুলী জিনিষ যুগ-যুগ ধ'রে ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে আসছে, তাকে ধ্বংস করতে হবে

তোমাদের। পিছন থেকে এসে তোমাদের পক্ষে এই কাজ করা হচ্ছে তোমাদের যন্ত্রণাকাতর শতচ্ছিদ্র হৃদয়ের নূতন যন্ত্রণা-বিশেষ। যাকে তোমরা প্রাণ দিয়ে মন দিয়ে ভালোবাস, তাও তোমাদের বর্জন করতে হবে তোমাদের এই তীব্র অভিপ্রায়ের জন্যেই, তোমাদের এই জীবনীশক্তির জন্যেই। আমি যেন তীর ছুটে যাওয়ার শব্দ শুনতে পাচ্ছি, যে তীর তোমাদের হৃদয় বিদ্ধ ক'রে তোমাদের শহীদ করে তুলবে।

তোমাদের বলিষ্ঠ বক্তব্য শুনে কেউ একে মন-গড়া-কথা ব'লে বিদ্রূপ করতে পারবে না। কারণ, কোনো-একটা বড় কাজ করার দৃঢ় সংকল্পটাই বড় কথা নয়, এটা করতে চাওয়াটাই প্রথম ধাপ। যে সব যুগ নিজেদেরই সর্বনাশ করেছে আমরা তাদের দিকে পিছন ফিরে আমাদের বলিষ্ঠ কণ্ঠনিনাদ পাঠিয়ে দিতে পারি ভবিষ্যতের শতশত শতাব্দীর দিকে, যে শতাব্দী আমাদের অপেক্ষায় আছে। এ কাজ আমরা করতে পারি, কেননা, আমরা যে নবজীবন লাভ করেছি।*

অ্যালফ্রেড ডবলিন

বার্লিন অ্যালেকজাণ্ডারপ্লাৎস

অ্যালফ্রেড ডবলিন (১৮৭৮-১৯৫৭) পেশায় ডাক্তার ছিলেন, তাঁর রাজনৈতিক যোগ ছিল সোশ্যাল ডেমোক্রাটদের সঙ্গে। ১৯৩৩ সালে তিনি ফ্রান্সে চলে যান, এখানেই তিনি তাঁর মৃত্যু অবধি বেশির ভাগ সময় কাটান। উপন্যাস-সংক্রান্ত রচনায় তাঁর বহুবিচিত্রতার জন্যে তিনি আধুনিক উপন্যাসের ক্ষেত্রে একজন বিশিষ্ট পথপ্রদর্শন ও প্রতিনিধিরূপে গণ্য হন। তাঁর রচনার মূল বিষয় হচ্ছে জীবনে অতি স্বাতন্ত্র্যবাদী শক্তির প্রভাব ও সমাজে স্বাতন্ত্র্যবাদীর চিন্তার প্রভাব; যার ফলে বিশ শতকে অর্থনৈতিক ক্ষমতা অধিকারের জন্যে এঁরাই গোষ্ঠীবদ্ধ হয়েছেন। ডবলিনের সর্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস হচ্ছে "বার্লিন অ্যালেকজাণ্ডারপ্লাৎস" (১৯২৯), এতে তিনি পরিবহন-কর্মী ফ্রান্জ বাইবারকফ-এর কারামুক্তির পর বৃহৎ নগরী বার্লিনের সঙ্গে তার সংগ্রামের কথা বলেছেন। সে নিজে থেকে সৎ জীবনযাপন করতে চাইল; কিন্তু এলোমেলো স্বভাবের, নম্র, ভালোমানুষ ধরণের এই মানুষটি

*সংক্ষেপ-কৃত। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে সামরিক কাজে নিযুক্ত থাকার সময়ে ১৯১৭ সালে লিখিত। প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯১৮ সালে।

তাক্ষ্ণবুদ্ধির অভাবে অতিসহজেই এই শহরের বিপদ ও প্রলোভনের শিকার হয়ে পড়ল। সে একজন অপরাধীর পোষ্য হয়ে পড়তে বাধ্য হল, শেষপর্যন্ত এই অপরাধী লোকটি বাইবারকফের প্রেমিকাকে খুন করল। এই মর্মান্তিক ঘটনার পর তার জীবনের মোড় ঘুরল, সে ভাবতে লাগল তার জীবনেও তার চারধারে যেসব ঘটনা ঘটছে সেসব বিষয় সম্বন্ধে তার অন্তদৃষ্টি দরকার যাতে সে নিজেকে বহাল রাখতে পারে। এই উপন্যাসে কোলাহলমুখর বৃহৎ নগরের যে দৃশ্য ফুটে উঠেছে অন্য কোনো জার্মান নভেলে তেমনটি আর হয়নি। আধুনিক জীবনের একটা সামগ্রিক চেহারা এমনই যে তা গ্রাস করে ফেলে ব্যাক্তিজীবনকে—একথা এখানে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। আমরা এখানে যে অংশ উদ্ধৃত করছি সেটি হল রাজনৈতিক বিপ্লবীদের এক সভা, সন্ত্রাসবাদীরা এখানে মার্ক্সীয় দৃষ্টিভঙ্গি থেকে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের বিচার করছেন, সেইজন্যে তাঁরা পার্লামেণ্টারি গণতন্ত্রের দ্বারা প্রতিষ্টিত ভেইমার প্রজাতন্ত্রের সঙ্গেও সংগ্রামে লিপ্ত। ফ্রানৎস বাইবারকফের মনে এ রকম সভার কোনো আকর্ষণই নেই, সে বুঝতে পারে না লোকে কিজন্যে রাজনৈতিক দল গঠন করে। এখনো তার স্থির বিশ্বাস যে নিজের চেষ্টায় সে জীবন চালিয়ে যেতে পারবে।

জার্মান রাইখ হচ্ছে একটা রিপাবলিক। এ কথা যে বিশ্বাস করে তারই বিপদ। মাইকেলকারচ রাস্তার কোণে কোপেনিকার স্ট্রীটে একটা মীটিং চলছে। হল্‌ঘরটা সরু ও লম্বা। তরুণ কর্মীরা সবুজ কলারে শিলার-টাই বেঁধে একজনের পিছনে একজন সার দিয়ে বসে আছে, মেয়েরা মহিলারা ও প্যাম্‌ফ্‌লেট বিক্রেতারা সারা হল্‌-এ ঘুরে-ঘুরে বেড়াচ্ছে। টেবিলের পিছনে প্লাটফর্মের উপরে দুজন লোকের মাঝখানে বসে আছে একজন বলিষ্ঠ মানুষ, তার মাথার অর্ধেকটা টাকে ভরা। লোকটা নির্দেশ দিচ্ছে, একে-ওকে তোষামোদ করছে, ও রসিকতা করে উপস্থিত সকলকে মাতিয়ে রেখেছে।

"ঘটনা যখন এরকম ঘটেছে আমরা তখন হাওয়ার সঙ্গে কথা বলতে এখানে হাজির হইনি। ঐ রাইখস্ট্যাগের (মন্ত্রণা সভার) ঐ লোকদের উপরেই তা ছেড়ে দেওয়া যাক। আমাদের কমরেডদের একজনকে একটি লোক জিজ্ঞাসা করেছিল, সে রাইখস্ট্যাগে ঢুকতে চায় কি না। ঐ রাইখস্ট্যাগে—যার মাথার উপরে গম্বুজাকারের সোনার ছাদ, আর নীচে যার মজবুত

গড়নের আরাম-কেদারা। সে বলেছিল: দেখ, কমরেড, আমি যদি ওখানে গিয়ে ঢুকি তাহলে সেখানে আর-একজন স্কাউনড্রেল বাড়বে। কমিউনিস্টরা বেশ আন্তরিকতার সঙ্গেই বলে থাকে: আমাদের নীতি হচ্ছে সব প্রকাশ করে দেওয়া। ওখানে গেলে তার কি ফল হয় আমরা তা দেখেছি। কমিউনিস্টরাও নষ্ট হয়ে যায়। তাদের সব ফাঁস করে দেওয়ার নীতি সম্বন্ধে আমাদের কিছু বলার নেই। সবই হচ্ছে চুরি-জোচ্চুরি; একটা অন্ধ লোকও দেখতে পায় জার্মানীতে কি-কি ফাঁস করে দিতে হবে। এর জন্যে আমাদের রাইখস্ট্যাগে যেতে হবে না। যে যে লোক এসব দেখতে পায় না তার রাইখস্ট্যাগে যাওয়া না-যাওয়া সমান। শ্রমিকশ্রেণীর তথাকথিত প্রতিনিধি ছাড়া সবাই জানে যে, গরম-গরম কথা দিয়ে মানুষদের নরম করাই যায়, তাদের জন্যে আর-কিছু করা যায় না।

"আমাদের ধর্মপ্রাণ সোশ্যালিস্টরা। আমরা পার্টিতে ধর্মভীরু সোশ্যালিস্ট দেখছি; এ'তেই তার মুখ প্রায় বন্ধ: তারা যেন-তেন-প্রকারেণ ধর্ম চায়ই, তারা ধাওয়া করে যাজকদের পিছনে। যার পিছনে ধাওয়া করে সে সত্যিই যাজক কিংবা তার মনিব তা তারা দেখে না, আসল জিনিস হচ্ছে এই যে, তারা অনুগত হতে চায়, আদেশ পালন করতে চায়। (দর্শকদের মধ্যে থেকে: এবং চায় বিশ্বাস করতে।) ঠিক, এটা তো বোঝাই যাচ্ছে। সোশ্যালিস্টরা কিছু চায়ও না, কিছু জানেও না, কিছু করতেও পারে না। তারা সব সময়েই রাইখস্ট্যাগে সংখ্যাগরিষ্ঠ, কিন্তু এই গরিষ্ঠতা নিয়ে কী করতে হবে তা তারা জানে না। আমাকে মাপ করবেন, আমি বলছি, হ্যাঁ, তারা জানে। তাদের বসার জন্যে সৌখিন আরাম-কেদারা দেওয়া হয়েছে, ধূমপানের জন্যে চুরুট দেওয়া হয়েছে, ও কিছু সরকারী কাজ দেওয়া হয়েছে। এজন্যে শ্রমিকরা তাদের যা দিয়েছে তা হচ্ছে ভোট; এর জন্যে প্রত্যেক মাইনের দিনে তারা নিজেদের পকেট থেকে দিয়েছে পয়সা, শ্রমিকদের খরচায় আরও পঞ্চাশ বা একশ জন লোক ঐ পয়সা-আদায়ের জন্যে লাইন দিয়েছে। সোশ্যালিস্টরা রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জন করে নি, রাজনৈতিক ক্ষমতাই কব্জা করেছে সোশ্যালিস্টদের। অনেকে বলে যে, আমরা গাধার মতই বুড়ো হয়ে চলেছি, আর রোজই তা বুঝতে পারছি; কিন্তু জার্মান শ্রমিকের মতন এমন এঁড়ে-গাধা এখনও জন্মায় নি। বার-বারই জার্মান শ্রমিকরা হাতে ভোটপত্র নিয়ে ভোটকেন্দ্রে যায়, ভোট দেয়, তার পরে

ভাবে—বা, বেশ, হয়ে গেল। তারা বলে, আমরা চাই রাইখস্ট্যাগে আমাদের গলা আমরা শুনতে চাই। বেশ তো, এজন্যে তাহলে তারা একটা গায়কের দল গড়ে তুলুক!

"কমরেডগণ নারী ও পুরুষ সকলে, আমরা একটা ভোটপত্রও আর ছোঁব না, নির্বাচনে আমরা আর কোনো অংশ নেব না। আমি স্পষ্টই বলছি—কোনো রবিবারের পিকনিকই আমাদের স্বাস্থ্যের পক্ষে যথেষ্ট। ভোটাররা আইনের প্রতি সম্মান দিয়ে নিজেকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছে। কিন্তু আইন হচ্ছে এক পাশবিক শক্তি, শাসকগোষ্ঠীর ক্ষমতার বহর দেখাবার জন্যেই যেন এর সৃষ্টি। তারা ড্রাম পিটে আমাদের পথভ্রষ্ট করে, আমাদের প্রতারণা করতে চায়, আইন সত্যই কী বস্তু তা আমাদের বুঝতেই দেয় না। কিন্তু ভোট আমরা দেব না, আমরা জানি আইন-মানা কাকে বলে, আমরা জানি রাষ্ট্র আসলে কী, এমন কোনো ফাঁক নেই যার মধ্যে দিয়ে আমরা ওর মধ্যে ঢুকতে পারি। এমন কি সরকারী গর্দভ বা বোঝা-বওয়ার গাধা হয়েও না। নির্বাচন ব্যাপারটাই এই। তারা আমাদের ফাঁদে ফেলতে চায় ও তাদের সরকারী গাধা বানাতে চায়। শ্রমিকদের বেশির ভাগকে দিয়েই তারা তাদের কার্যসিদ্ধি করে নিয়েছে। জার্মানীতে আমরা সকলে আইন ও শৃঙ্খলা মেনে চলতেই শিখেছি। কিন্তু, কমরেডগণ, আগুনের সঙ্গে জলের বিবাহ দেওয়া কি সম্ভব? শ্রমিকদের এটা বুঝতে হবে।

"বুর্জোয়া পার্টি, সোশ্যালিষ্ট ও কমিউনিস্ট সমবেত গলায় সম্মেলক গান গায়ঃ উপর থেকে নেমে আসবে সব আশীর্বাদ। রাষ্ট্রের কাছ থেকে, আইনের কাছ থেকে ও উর্ধ্বতম মহল থেকে। কিন্তু কাজটা হচ্ছে কী ভাবে তা লক্ষ্য কর। এই রাষ্ট্রের প্রত্যেক অধিবাসীর জন্যে শাসনতন্ত্রে কিছু স্বাধীনতার কথা বলা আছে। এ কথা বলা হয়েছে, উত্তম। কিন্তু যে স্বাধীনতা আমরা চাই তা আমাদের কেউ দেবে না, আমাদেরই তা নিয়ে নিতে হবে। বিবেচক মানুষের স্বাধীনতা নষ্ট করার জন্যেই এই শাসনতন্ত্র উদ্যত হয়ে আছে। কমরেডগণ, কাগজে-কলমে লেখা আমাদের অধিকার দিয়ে আমরা কী করব, ওসব হচ্ছে কাগুজে স্বাধীনতা। তুমি যখনই কোনো স্বাধীন কাজ করতে যাবে, অমনি এসে হাজির হবে পুলিশম্যান, তোমাকে ডাণ্ডা-পেটা করবে। ব্যাপার কি ব'লে তুমি চেঁচিয়ে উঠলে সে বলবে আইনের বইতে এই-এই লেখা আছে। ঠিকই বটে, সে তো কোনো শাসনতন্ত্র চেনে

না, সে জানে কেবল পুলিশম্যানের কাজের নিয়মই, তার হাতে আছে ডাণ্ডা, সেইজন্যে তোমার মুখ বন্ধ রাখতে হবে।

"বড়-বড় শিল্পপ্রতিষ্ঠানে শিগগিরের মধ্যে কোনো ধর্মঘট হবার সম্ভাবনা নেই। কিছু করতে গেলে তোমাকে গিলোটিন করা হবে, মুণ্ডচ্ছেদ হয়ে যাবে তোমার। তুমি যা-কিছুই করবে ঐ ভীতিটা মনে রেখেই তা করতে হবে।

"কমরেডগণ, নারী ও পুরুষ সকলে, তোমরা ভোট দিয়ে যাও, তোমরা বলছ এইবার এর ফল ভালো হবে, আমাদের দিকে দৃষ্টি রেখো, তোমরা প্রচার চালিয়ে যাও—বাড়িতে বাড়িতে ফ্যাক্টরিতে—কেবলমাত্র পাঁচটা দশটা বা বারোটা বেশি ভোট, তারপর তোমরা দেখবে, আমরা কিভাবে সব কাজ করে চলেছি। হ্যাঁ, তোমাদেরই সহযোগিতায় সব কাজ হবে। চিরন্তন একটা চক্র, একই ভাবে তার চারদিকে সব ঘুরছে, সেই পুরনো রীতিতেই। পার্লামেণ্টারি-প্রথা শ্রমিকদের দুর্দশাই বাড়ায়। ন্যায়-বিচারে সংকটের কথা অনেকে বলে, এর সংস্কার দরকার—আপাদমস্তক সংস্কার করা দরকার। বিচারালয়কে একেবারে ঢেলে সাজাতে হবে, একে প্রজাতন্ত্রী শাসনতন্ত্রী ও ন্যায়পরায়ণ করে তুলতে হবে। কিন্তু নতুন বিচারপতি আমরা চাইনে। এই ন্যায়বিচারের বদলে আমরা অন্য ন্যায়বিচার চাইনে। আমরা ডাইরেক্ট অ্যাকশন দিয়ে রাষ্ট্রীয় সব প্রতিষ্ঠানকে বদলে ফেলতে চাই। অস্ত্র আমাদের আছে: আমরা আমাদের শ্রম দিতে অস্বীকার করব। সব চাকা থেমে যাবে। কিন্তু একথা এখন চেঁচিয়ে বলার দরকার নেই। কমরেডগণ, আমরা আমাদের নিজেদের কথা এইটুকুমাত্র বলতে পারি যে, আমরা পার্লামেণ্টারি-প্রথা, সমাজসেবা, সামাজিক রাজনীতিক কোনো হাঁকবাজিতে ভুলব না। আমাদের শত্রু মাত্র একটি, সেটি হচ্ছে গভর্নমেণ্ট, আমাদের একমাত্র লক্ষ্য—অরাজকতা ও আত্মসহায়তা।"

চালাকচতুর ছেলে উইলির সঙ্গে ফ্রানৎস ঘরের মধ্যে ঘুরে বেড়াতে লাগল, কয়েকটা প্যামফ্লেট কিনে জড়োসড়ো ক'রে তা পকেটে পুরল। রাজনীতির উপযোগী সে নয়, কিন্তু উইলি তাকে কি সব বোঝাতে লাগল, ফ্রানৎস তা মন দিয়ে শুনতে লাগল কৌতুহল নিয়ে। এক-একবার দু-একটা কথা তার বেশ লাগ-সই লাগল, তার পরেই আবার তা ভুলে গেল। কিন্তু উইলিকে সে ছাড়ল না।

—বর্তমানের সমাজব্যবস্থার মূল হচ্ছে শ্রমিকশ্রেণীর অর্থ নৈতিক রাজনৈতিক

ও সামাজিক দাসত্ব। সম্পত্তির মালিকানা, একচেটে অধিকার, রাষ্ট্রের একচেটে অধিকার—এইসব থেকেই এটা বোঝা যায়। একালের উৎপাদনের উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষের প্রয়োজন মেটানো নয়, লভ্যাংশ বাড়াবার আশা। প্রত্যেকটি কারিগরি উন্নতির ফল হচ্ছে সম্পদের অধিকারীদের আরো বেশি করে সম্পদ বাড়ানো। কিন্তু তার বিপরীতে আমরা কী দেখছি? জন-সাধারণের দুর্দশা আরও চরমে বেড়ে চলেছে। রাষ্ট্র কাজ করছে তাদের রক্ষা করার জন্যেই যাদের অনেক আছে, রাষ্ট্র কাজ করছে তাদের উপর উৎপীড়ন করার জন্যেই যাদের কিছু নেই। এ কাজ রাষ্ট্র করছে চতুরতার সঙ্গে, একচেটে অধিকার রক্ষার জন্যে শক্তি প্রয়োগ করে, ও শ্রেণীতে শ্রেণীতে বিভেদ সৃষ্টি করে। রাষ্ট্রের প্রথম পত্তন-কাল থেকে এমন একটা যুগের সৃষ্টি হয়েছে যার সব কিছুই আপাদমস্তক ঝুটা। ব্যক্তিমাত্রেই এখন স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রে রূপান্তরিত, এক বিরাট যন্ত্রশালার সে যেন প্রাণহীন একটি চাকা বিশেষ। আমাদের জেগে উঠতে হবে। অন্যান্য পার্টির মতন আমরা রাজনৈতিক ক্ষমতা অধিকার করতে চাইনে, আমরা চাই এইসব ব্যবস্থার উচ্ছেদ। তথাকথিত আইনসভার সঙ্গে কখনো কোনো কাজ কোরো না। ওখানে কেবল ক্রীতদাসদেরই আমন্ত্রণ জানানো হয়, তাদের দাসত্বের উপরেই তারা গিয়ে সরকারী সীলমোহর দিয়ে আসে। রাজনীতি-ক্ষেত্রে বা জাতীয়-ক্ষেত্রে যেসব স্বেচ্ছাচারী সব প্রতিষ্ঠানকে আমরা বাতিল বলে গণ্য করি। জাতীয়তা হচ্ছে আধুনিক রাষ্ট্রের একটি ধর্ম। আমরা সব জাতীয়-সংস্থা অস্বীকার করি। এ সবের পিছনে আছে অধিকার ভোগীদের দাপট। কমরেডগণ, জেগে ওঠো। ফ্রানৎস বাইকারকফ উইলির সব কথাই বিশ্বাস করে নিচ্ছে। মীটিংএর পর একটা ডিবেট হবে, এইজন্যে একজন বৃদ্ধ শ্রমিকের সঙ্গে কথা বলার জন্যে তারা থেকে গেল। উইলি তাকে চেনে, শ্রমিকটিও জানে যে উইলি একই রকম কাজ করে থাকে, সেজন্যে আরো তীব্রভাবে আন্দোলন করার জন্যে সে বলল। কিন্তু উইলি একটু হাসল, "শোনো, কবে থেকে আমরা সহকর্মী হে? আমি কয়লা-খনিতে কাজ করিনে।" "বেশ তো, তুমি যাই হও বা যেখানেই কাজ কর-না কেন, কিছু একটা কর।" "আমার কিছু করার দরকার নেই, আমি যেখানে কাজ করি তারা অনেক আগে থেকেই জানে যে, তাদের কী করতে হবে।" উইলি হাসতে-হাসতে একটা টেবিলের উপর ঝুঁকে পড়ল। যাচ্ছেতাই, উইলি, চিমটি কাটল ফ্রানৎসের পায়ে, দু-এক দিনের মধ্যেই একজন আঠার

শিশি নিয়ে আসবে, এবং তাদের জন্যে পোস্টার লাগাবে। সে ঐ শ্রমিকটার দিকে চেয়ে হাসল, লোকটার চুল রুক্ষ, গায়ের শার্টটার বুক খোলা, সে বলল, "তুমি ওই পুস্তিকাগুলো বিক্রি কর—ঐ 'যাজকের আয়না', 'কালো নিশান' ও 'নাস্তিক'? কিন্তু ওর মধ্যে কি আছে তা কি কখনো পড়ে দেখেছ?" "এবার শোনো কমরেড, তোমাকে অত লম্বা-চওড়া কথা বলতে হবে না। আমি নিজেই কি লিখেছি তা তোমাকে কোনো সময় দেখাব।" "ঠিক আছে। অল্প দিনের মধ্যেই তুমি হয়তো দেখতে পাবে তুমি কি লিখেছ। এই ধরো, এখানে লিখছে—সভ্যতা ও কারিগরি বিদ্যা। শোনো—'মিশরের ক্রীতদাসরা যুগ-যুগ ধ'রে বিনা-যন্ত্রপাতিতে একটি রাজকীয় সমাধি তৈরি করেছিল, ইউরোপীয় শ্রমিকেরা যন্ত্র চালিয়ে বহু পরিশ্রমে একটা ব্যক্তিগত সম্পদ নির্মাণ ক'রে তোলে। প্রগতি? সম্ভবত। কিন্তু কার জন্যে এই প্রগতি?' দেখ-না আমি এসেন্-এর বা বরসিগ-এর ক্রুপ কোম্পানি যাতে মাসে আরও হাজার মার্ক বেশি রোজগার করতে পারে সেজন্যে তাদের কাজে অল্পদিনের মধ্যেই যোগ দিচ্ছি তারা বার্লিনের রাজা হয়ে উঠবে। শোনো, কমরেড, তোমার সম্বন্ধে আমি কি ধারণা করতে পারি? তুমি ডাইরেক্ট অ্যাকশন নেবার জন্যে উৎসুক। কিন্তু ঐ ডাইরেক্ট অ্যাকশনটি কোথায় লুকিয়ে রেখেছ তুমি? আমি তো তা দেখতে পাচ্ছি নে। ফ্রানৎস, তুমি কি কিছু দেখতে পাচ্ছ?" "ও থাক্ উইলি, ওকে ছেড়ে দাও।" "এবার তুমি বল তো, ফ্রানৎস, এই কমরেডটার মধ্যে আর সোস্যালিস্ট পার্টির ঐ লোকটার মধ্যে তফাত কী।"

শ্রমিকটি বেশ জমাট হয়ে চেয়ারে বসল। উইলি বলল, আমি তো কোনো তফাত দেখতে পাচ্ছিনে। যা-কিছু পার্থক্য তা কাগজপত্রে ও সংবাদপত্রে। আমার কথা এই, নিজের মতে অটল থাক। কিন্তু ওদের নিয়ে তুমি কী করতে চাও, সেইটেই আমার জানার কৌতূহল। তুমি যদি জিজ্ঞাসা কর যে তুমি প্রকৃতপক্ষে কী কর, আমি তৎক্ষণাৎ উত্তর দেব, বলল, সোশ্যালিস্ট পার্টির লোকেরা যা করে আমি তা'ই করি। ঠিক একই কাজ করি। তুমি একটা লেদের সামনে দাঁড়িয়ে রইলে, তার পর বাড়ি যাবার সময় নিয়ে গেলে মজুরি, আর তোমার কাজের উপর কোম্পানি তোমাকে ডিভিডেণ্ড দিল। ইউরোপীয় শ্রমিকেরা যন্ত্র চালিয়ে যুগ যুগ ধরে পরিশ্রম করে একজনের ব্যক্তিগত সম্পদ গড়ে তুলল। আমার মনে হয়, এ কথা তুমি নিজেই লিখেছ।

রুক্ষ চুলের শ্রমিকটি একবার ফ্রানৎসের দিকে একবার উইলির দিকে

তাকাতে লাগল। সে চারদিকে চেয়ে দেখল তার পিছনে গরাদের বাইরে কয়েকজন লোক দাঁড়িয়ে। শ্রমিকটি টেবিলের কাছে এসে ফিসফিস করে বলল, "শোনো তুমি কী কর?" ফ্রানৎসের দিকে চেয়ে উইলি বলল, "তুমি জবাব দাও।" এখানে ফ্রানৎস কিছু বলতে চাইল না, রাজনৈতিক আলোচনা তার নাকি ভালো লাগে না। কিন্তু রুক্ষ চুলের শ্রমিকটি নিজের কথা ধরেই রইল, "এটা কোনো রাজনৈতিক আলোচনা নয়। আমরা এখন নিজেদের কথা বলছি। তুমি কি ধরণের কাজ কর?"

ফ্রানৎস চেয়ারটির কাছে গেল, লোকটার হাত থেকে বিয়ারের গেলাস ছিনিয়ে নিল, অরাজক লোকটির দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইল, তার চোখে এমন ভীষণ দৃষ্টি, যা দেখে মৃত্যুও ভয় পায়। ঐ পাহাড়ে আমি কি কান্নার ও আর্তনাদের ধ্বনি তুলে দেব, আর ঐ নিভৃত প্রান্তরের অধিবাসীদের মধ্যে হাহাকার জাগিয়ে তুলব, তারা দগ্ধ হয়ে যাবে, কেউ যাবেনা তাদের মধ্যে, পশুপাখি সবাই পালিয়ে যাবে।

"আমি কি কাজ করি সে সম্বন্ধে বলতে হলে বলতে হয় যে আমি কমরেড নই। আমি ঘুরে বেড়াই, এখানে ওখানে এ-চাকরি ও-চাকরি করি। কিন্তু আমি কাজ করি নে, আমার হয়ে অন্যদের কাজ করতে দিই।

লোকটা বোধ হয় আমার সঙ্গে ঠাট্টাবিদ্রূপ করছে। "তাহলে তুমি নিশ্চয় একজন মালিক, অনেক লোক তোমার কাজ করে, এমন কত লোক কাজ করে? কিন্তু যদি তুমি পুঁজিবাদী, তাহলে তুমি এখানে কেন?" আমি জেরুজালেমকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করব এবং ড্রাগনদের আস্তানা বানাব, আমি জুডার সব শহর জনহীন করে দেব, সেখানে কেউ বাস করবে না।

"তুমি কি দেখছ না আমার মাত্র একটা হাত আছে। অন্যটি খুইয়েছি। আমি কাজ করি, এ তার মজুরি হিসাবেই দিতে হয়েছে। সেই জন্যেই কোনো শৌখিন কাজের কথা আমি শুনতে চাইনে।" বুঝতে পারলে, তোমার চোখ দুটি খোলো, তোমার জন্যে কি চশমা কিনে আনব। "না, এখনো আমি বুঝতে পারছি নে কি রকম কাজ তুমি কর, কমরেড। কাজটা যদি সৌখিন না হয়ে থাকে, তাহলে নিশ্চয় সেটা জঘন্য।"

ফ্রানৎস টেবিলের উপর একটা ঘুষি মারল, অরাজক লোকটির দিকে আঙুল তুলল, ঝুঁকে দাঁড়াল তার দিকে, "দেখছ, এতেই সে গড়িয়ে পড়ছে। ওটা অবিকল এই। জঘন্য। তোমাদের সব শৌখিন কাজ হচ্ছে দাসত্ব,

এই কথাই তুমি বললে না? এইটিই হচ্ছে শৌখিন কাজ। হঁ্যা, এইটুকুই আমি বুঝেছি।" তোমার সাহায্য ছাড়াই তা ধরতে পেরেছি; এর জন্যে তোমার সাহায্য চাইনি, শয়তান!

এই অরাজক লোকটি হচ্ছে একজন দক্ষ কারিগর। তার হাত-দুটি বেশ সাদা। সে তার আঙুলের ডগা দেখতে-দেখতে ভাবতে লাগল—এই বদ লোকদের দেখাবার পক্ষে এটা বেশ ভালো জিনিস, এ'তে তারা আপস করলেও করতে পারে। তার কথা শোনার জন্যে আমি কাউকে ডাকি। সে উঠে দাঁড়াল, উইলি তাকে চেপে বসাল। "কোথায় যাচ্ছ তুমি, বৃদ্ধ। তোমার কথা কি শেষ হয়ে গিয়েছে। প্রথমে আমার সাঙ্গাতের সঙ্গে সব মীমাংসা ক'রে ফেল। কেন, পালাতে চাচ্ছ কেন।" "আমি আর একজনকে ডাকতে যাচ্ছি তোমাদের কথা শোনার জন্যে। তোমরা দুজনেই আমার একার বিরুদ্ধে।" "কি বললে? তুমি আর-কাউকে ডাকতে যাচ্ছ? কিন্তু আমি আর-কাউকে চাইনে। এখানে, তুমি আমার বন্ধুকে কী বলছিলে?" অরাজক লোকটি বসল, এর মীমাংসা আমরা তবে নিজেরাই করব। "ও তাহলে কমরেড নয়, আমাদের সহকর্মীও নয়। ও নাকি কাজই করে না। তাহলে সরকারী সাহায্যও ও পায় না?"

ফ্রানৎস-এর মুখের ভাব আরও কঠিন হল, তার চোখদুটো জ্বলতে লাগল। "না, ও কাজ করে না।" "তাহলে ও আমার কমরেড নয়, সমকর্মীও না, সে বেকারদের একজনও নয়। আমার কেবল একটা কথা জানার আছে, অন্য-সব কথা এখন বাদ—ও এখানে এসেছে কেন।" ফ্রানৎস তার দিকে আরও কড়া দৃষ্টিতে তাকাল। "তোমার এই প্রশ্নেরই অপেক্ষা করছিলাম আমি: তুমি এখানে কী চাও? তোমাদের মতন লোকেরা এখানে প্যাম্ফলেট বিক্রি করে, যখন জিজ্ঞাসা করি এসব কিসের জন্যে, এর মধ্যে কি আছে, তখন তোমরা বল—এ কথা জিজ্ঞাসা করছ কেন। তোমরা এখানে কি চাও? তুমি নিজেই কি লেখ নি এই-সব মজুরির দাসত্বের কথা? আমরা ওতে বিচলিত না হলে তোমরা আমাদের জাতিচ্যুত বলে গণ্য কর।" পৃথিবীর যত জাতিচ্যুত লোক আছে, জেগে ওঠো, তোমাদের মালিকদের চক্রান্তেই তোমাদের অনশনে থাকতে হচ্ছে। "কিন্তু তুমি আমার অন্য কথাগুলি শোননি। আমি কাজ করতে অস্বীকার করার কথা বলেছি। প্রথমত, মানুষ-মাত্রকেই কাজ করতে হবে।" "আমি এ কথা মানিনে।"

"ওতে আমাদের কিছু আসে-যায় না। তুমি এখন বিছানায় শুতে যেতে পার। আমি ধর্মঘটের কথা বলছিলাম, গণধর্মঘট, সাধারণ ধর্মঘটের কথা বলছিলাম।"

ফ্রানৎস তার দুই হাত তুলল, হেসে ফেলে, এখন সে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে। "তুমি যাকে ডাইরেক্ট অ্যাকশন বলছিলে, সে সম্বন্ধে এখন তুমি কী করছ? দৌড়ে-দৌড়ে পোস্টার লাগাচ্ছ ও বক্তৃতা দিচ্ছ? আর, সেইসঙ্গে পুঁজিবাদীদের আরও শক্তিশালী করে তুলছ। তুমি একটা বুদ্ধু, যে গুলী দিয়ে তোমাকে আঘাত করবে, তোমরা সেই গোলাগুলীই বানিয়ে তুলছ, এই কথা তোমরা আমাকে শেখাতে চাও! উইলি, এবিষয়ে তুমি কী বল?" "দেখছি তুমি একটা পালকের ঘা দিয়ে আমাকে ধরাশায়ী করতে চাও।" "আমি আবার জিজ্ঞাসা করছি, তুমি কী কাজ কর।" "তাহলে আমি আবার বলব—কিছু না। কিছুই না। কেন কাজ করব? আমি করতেই চাইনে। তোমাদের থিয়োরি অনুসারেই আমার কিছু করা উচিত না। আমি পুঁজিবাদীদের শক্তি আরও বাড়াতে চাইনে। সত্যি কথা এই—এসব ব্যাপারকে আমি পরোয়াই করিনে, কেননা এর পরে ধর্মঘট ও কাজের উৎকর্ষ—কোনোটাই আমার কাম্য নয়। একজন মানুষ নিজেকে নিয়েই নিজে মশগুল থাকবে। আমি নিজেকে নিয়ে বিভোর। আমি নিজের ব্যবস্থা নিজেই করি।"

শ্রমিকটা এক ঢোক জল গিলে ফেলে মাথা নেড়ে বলল, "বেশ। তবে একা-একাই ও কাজ কর।" ফ্রানৎস হাসতেই লাগল। শ্রমিকটি বলল, "আমি তোমাকে অনেক বার এর আগেই বলেছি, একা-একা কোনো কাজই করা যায় না। আমাদের একটা সংগ্রামী প্রতিষ্ঠান দরকার। জনতার মধ্যে আলোকপাত করতে হবে, রাষ্ট্রের অত্যাচারী শাসনের সঙ্গে পাঞ্জা লড়তে হবে, একচেটে অর্থনীতি বরবাদ করতে হবে।" ফ্রানৎস হাসতেই লাগল। মানবজাতিকে কেউ রক্ষা করতে পারবে না, কোনো কাইজার না, জনসাধারণের কোনো সমর্থক না, ঈশ্বর না—কেউ পারবে না দুর্দশার এই নাগপাশ থেকে আমাদের মুক্ত করতে, আমাদের একাই লড়তে হবে।

এখন তারা চুপচাপ মুখোমুখি বসল। সবুজ কলারের বুড়ো লোকটি ফ্রানৎসের দিকে অপলক চেয়ে রইল। ফ্রানৎস তার দিকে কড়া দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। এমন চেয়ে তুমি কী দেখছ, আমাকে বুঝতে পারছ না বুঝি?

শ্রমিকটি মুখ খুলল, "কমরেড, আমি দেখছি, তোমাকে বোঝাতে আমার দম ফুরিয়ে যাচ্ছে। তোমার মাথা মোটা। তুমি দেয়ালে মাথা ঠোকো। মজতুরদের প্রধান উপায় কি তা তুমি জান না। তা হচ্ছে—এককাট্টা হওয়া। তুমি জান না।" "বেশ, এবার তবে টুপী মাথায় চাপিয়ে আমরা ধীরে ধীরে এগোই। কি বলো উইলি। অনেক তো হল। তুমি একই কথা বার বার বলছ।" "তা বলছি বটে। এবার তুমি তোমার আস্তানায় নেমে যাও, আর সেখানে ঘুম দাও। কোনো জনসভায় যাওয়া তোমার উচিত না।" "মাপ করবেন, হুজুর। বেশ খোলা মনে আধ ঘণ্টাটাক কাটানো গেল। অশেষ ধন্যবাদ। ওয়েটার, কত হল আমাদের? এসো, আমিই দাম দিচ্ছি—তিনটে বিয়ার, তুটো ব্র্যাণ্ডি—একটা দশ-মার্ক দিলাম; আমিই দাম দিচ্ছি। এইটেই হল ডাইরেক্ট অ্যাকশন।"

"তুমি আসলে কী, বন্ধু?" লোকটি ছাড়বার পাত্র নয়। ফ্রানৎস খুচরোগুলো পকেটে রাখল। "আমি? আমি হচ্ছি মেয়েমানুষের দালাল।" আমাকে দেখে বোঝা যাচ্ছে না?" "বটেই তো, তাই তো বোধ হচ্ছে।" "আমি বেশ্যার দালাল। তোমাকে বললাম-না! উইলি, তুমি কী তা ওকে বলো।" "এ'তে ওর কোনো দরকার নেই।" যা খুশি হোক ওরা, ওরা সোজা পাত্র যে নয়, এ বিষয়ে নিশ্চিত। তাই হবে। এই রকমই আমি ভেবে ঠিক করেছি। ওরা আমার সঙ্গে ছলনা করেছে, বদমায়েশ, আমার সঙ্গে ঠাট্টাবিদ্রূপ করেছে।" তোমরা হচ্ছ পুঁজিবাদী ব্যবস্থার তলানি। দূর হও। তোমরা মজদূর শ্রেণীরও নও, তোমরা পরগাছা।" ফ্রানৎস উঠে দাঁড়িয়েছে। "আমরা কিন্তু সরকারী দরিদ্র-শালায় যাচ্ছি নে। বিদায়, ডাইরেক্ট অ্যাকশন মহাশয় যাও, পুঁজিবাদীদের আরও কাঁপিয়ে তোলো। সকাল সাতটায় আবার লাইন লাগিয়ে হাড়ের কারখানায়, তোমার মজুরি থেকে তুটো টাকা নিয়ে যেয়ো তোমার গৃহিনীর জন্যে।" "আর যেন এখানে তোমাদের দেখতে না হয়।" "না, না। ডাইরেক্ট অ্যাকশন মহাশয়, ক্রীতদাস বা পুঁজিবাদী—কারও সঙ্গেই আমাদের কোনো কারবার নেই।"

নিঃশব্দে ওরা বেরিয়ে পড়ল। ধুলোভরা রাস্তায়। তুজন তুজনের হাত ধ'রে। উইলি গভীর নিশ্বাস ফেলল, "তুমি নিশ্চয় ওর কাছে বিদায় নিয়েছ, ফ্রানৎস।" ফ্রানৎসের নীরবতায় সে আশ্চর্য হল। ফ্রানৎস ক্ষিপ্ত

হয়ে আছে, যখন সে হল্ থেকে বেরিয়ে আসে তখন রাগে ও ঘৃণায় সে কেমন উত্তপ্ত হয়ে ছিল তা ভাবলে মজাই লাগে, সে উত্তেজিত হয়েছিল, কেন তা সে নিজেই জানে না।

মোকো-ফিক্ক কাফেতে তারা মিয়েৎসের দেখা পেল, সেখানে ভীষণ চেঁচামেচি। ফ্রানৎস ঠিক করল মিয়েৎসের সঙ্গে সে বাড়ি ফিরবে, সে তার পাশে বসে তার সঙ্গে কথা বলতে চায়। সে মেয়েটিকে সেই রুক্ষ চুলওলা লোকটার সঙ্গে কথাবার্তার বিষয় বলল। মিয়েৎসে তার প্রতি বেশ সদয়, ফ্রানৎস জানতে চাইল্ল সে ঠিক-ঠিক কথাই বলেছে কিনা। মেয়েটি হাসল, তার হাসির কারণ বোঝা গেল না। সে তার হাতে থাবা দিতে লাগল। পাখিরা জেগে উঠেছে। ফ্রানৎস দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলল। মেয়েটা তাকে সান্ত্বনা দিতে পারল না।

কাসিমির এডসমিড

কুষ্ঠরোগীদের অরণ্যনিবাস

কাসিমির এডসমিড (১৮৯০-১৯৪৬) ভাববাদী রচনার কর্মসূচী হিসেবে অনেক প্রবন্ধ রচনা করে বুদ্ধিজীবী-মহলের একজন পদপ্রদর্শক ও নেতা হিসেবে গণ্য হন। তাঁর প্রথম দিকের বর্ণনামূলক উপায়ে লিখিত উপন্যাসে তিনি এই ভাববাদিতার কিছু কিছু দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। ন্যাশনাল সোশ্যালিজম্ আন্দোলনের সময়ে প্রকাশ্যে বক্তৃতা দেওয়া সম্বন্ধে তাঁর উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়, তারপর তাঁর রচনা প্রকাশ ও নিষিদ্ধ হয়, তাঁর পরবর্তী কালের রচনায় কাব্যসুষমা কম। "দি ফরেস্ট অব লেপার্স" (১৯১৫) তাঁর গল্প-সংগ্রহের একটি অংশ, একে এডসমিড বলতেন, "ছয়টি নদীমুখ" ("দি সিক্স রিভার-মাউথস"), এর কারণ "এরা নানা দিক থেকে প্রবাহিত হয়ে এসে আমাদের পরম অনুভূতি-ত্রয়ের সঙ্গে মিলিত হয়, সেই তিনটি অনুভূতি হচ্ছে—আত্মত্যাগ, গভীর বেদনা, ও অন্তহীন মৃত্যু। দ্বাদশ শতাব্দীর একজন ফরাসী রাজকীয় গীতিকবি জেহান বোদেল তাঁর জাঁকজমকপূর্ণ জীবন-যাপনের পর আত্মত্যাগ-ব্রত গ্রহণ করেন, কুষ্ঠরোগীদের প্রতি অনেক নির্যাতন করার পর তিনিই কুষ্ঠব্যাধিতে আক্রান্ত হন। পার্থিব সব সুখশান্তি পরিত্যাগ করে তিনি আত্মজয়ে সক্ষম হন, এবং নূতন জীবন লাভ করেন।

"রাজকীয় ভাবে ও বলিষ্ঠ মূর্তিতে" তিনি প্রবেশ করেন কুষ্ঠরোগীদের অরণ্যনিবাসে।

আরাস-এর রাজতুল্য ব্যক্তি জেহান বোদের খচ্চরের পিঠে চেপে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে চলেছিলেন।

খচ্চরটির রং হলদে, সকলের প্রতি অবজ্ঞার দরুণ সঙ্গে তাঁর একটি ছুরি ছাড়া আর কোনো অস্ত্র ছিল না। ছুরিটা ঝুলছিল তাঁর বেল্টে। দুই পাশে দুই হাত তিনি ঝুলিয়ে রেখেছেন।

ঘণ্টা দুই বাদে তীক্ষ্ণ হুইসিলের শব্দ শোনা গেল।

পাহাড়ের ধারের অজস্র ঝুপড়ির মধ্যে একদল লোক ছুটে বেরিয়ে এল প্রকাশ্য দিবালোকে। এদের কারো-কারো হাতে কাঠের মুগুর। এদের মধ্যে যে আগে-আগে ছিল, সে একই জায়গায় ঘুরে ঘুরে নাচছে, মাঝে মাঝে ঝুঁকে পড়ছে। বাঁ হাতে সে লোহার একটা যন্ত্র অনবরত ঘোরাচ্ছে, আর ডান হাত দিয়ে মরচে-পড়া একটা পুরণো তলোয়ার ধরে আছে, এই হাতের আঙুলগুলোর হাড় বের করা এবং তাতে লাল-লাল মাকড়ি উঠেছে। প্রত্যেকের পরণে নোংরা এমন কম্বল, যে দেখে আতঙ্কিত হতে হয়। প্রায় প্রত্যেকের মুখেই নানারকম ক্ষতের দাগ। ঢালু পথে ধীরে-ধীরে গড়িয়ে নেমে এল চার-জনের এক-একটি দল, তারা উঠে দাঁড়াল, তাদের মাথায় লম্বা সাদা চুল দুলতে লাগল, হাত তুলল, তারপর কোটরস্থ চোখ মেলে তাকাল তেজি রোদের দিকে।

জেহান বোদেল ছুরিটা হাতে নিলেন, কিন্তু এটা খুবই ছোট। তিনি চারদিকে তাকালেন। তাঁর হাতের নাগালের মধ্যে কিছু নেই। তিনি একটু পিছিয়ে গিয়ে, রাগে থুতু ফেললেন।

মাকড়সার মতন হামাগুড়ি দিয়ে ওরা তাঁর দিকে আসতে লাগল। ওদের নেতা তাঁর সামনে নিঃশব্দে নাচতে লাগল, লোভাতুরের মত কখনো এগিয়ে কখনো পিছিয়ে সে লাফাতে লাগল।

জেহান তখন তাঁর খচ্চরটিকে মাটিতে শুইয়ে ফেললেন, তার উরুতে তিনটে জায়গা কেটে ফেললেন, পা'টা ছিঁড়ে বা'র করে নিলেন, তারপর তাঁর আক্রমণকারীর কয়েকজনকে মেরে ফেললেন; যন্ত্রণায় কাৎরাচ্ছিল সেই

জীবটি, তার গলা ও গর্দান কেটে ফেলে জীবটিকে মেরেই ফেললেন, তারপর উদ্ধত ভঙ্গিতে রৌদ্রময় অরণ্যপথ ধ'রে হাঁটা দিলেন।

তিনি এতই রেগে গিয়েছিলেন যে, জীবটিকে আহত না করে প্রথমেই ফেললে হত, এ কথা তখন তিনি ভাবতে পারেন নি। তাঁর মনেই হয়নি যে, ঐদিকে চেপে তিনি পালাতেও পারতেন। জেহান পালালেন না।

দুপুর-নাগাদ তিনি পৌঁছলেন ক্রিগনি-তে, এখানে একটা বড় বাজার ছিল। রং বেরঙের অনেক দোকান পাট এখানে, এবং রাস্তা দিয়ে অনেক রকমের লোকজন চলাচল করছে। জেহান বাজারের মাঝখানে একটু উঁচু প্লাটফরমের উপরে গিয়ে দাঁড়ালেন ; ধীরে চারদিক একটু শান্ত হলে অনেক লোক তাঁর মুখের দিকে তাকাতে লাগল, তিনি ঘৃণায় অধীর হয়ে তাদের কাছে প্রতিজ্ঞা করলেন যে, ঐ বনের একজন কুষ্ঠরোগী যে মারতে পারবে তাকে তিনি কুড়িটি স্বর্ণমুদ্রা দেবেন। এর পর তিনি দুটো শিকারী কুকুর কিনলেন, রূপোর লাঠি ও শিকারের স্থান খুঁজে দিতে পারে এমন তুষার শুভ্র একটি কুকুর কিনলেন, আর কিনলেন একটা মাদী ঘোড়া যার লেজ মাটি পর্যন্ত লোটায়।

সব জিনিস তিনি নিয়ে গেলেন সরাইখানায়, গায়কদের ডেকে পাঠালেন, তারপর খানা খেলেন। তিনি যখন তাঁর পছন্দসই মাছটি খাবার জন্যে উদ্যত হয়েছেন, এমন সময় দরজায় হাজির হলেন এক সন্ন্যাসী ও তিনি জেহানের কাছে আসতে চাইলেন। কিন্তু সরাইয়ের মালিক দুই বাহু বাড়িয়ে দিয়ে সন্ন্যাসীকে সরিয়ে দিল। জেহান বোদেল একা-একা বসে খেতে ভালোবাসতেন। কিন্তু সন্ন্যাসীটি চাপ দিতে লাগলেন ও সেণ্ট ভিনসেণ্টের নামে শপথ ক'রে চীৎকার করতে লাগলেন। অবশেষে জেহান তা লক্ষ্য ক'রে তাঁকে ইশারা করলেন। ছয় ফুট দূরে দাঁড়াতে বললেন তাঁকে, কেননা নিশ্বাসের দ্বারা নিজের অস্বস্তি করতে তিনি চান না। সন্ন্যাসীটি তাঁকে একটি ব্যবসায়ের প্রস্তাব করলেন। জেহান এ প্রস্তাব খারিজ করে দিতেই সন্ন্যাসীটি সেণ্ট মোরান্তের রক্তের নামে শপথ করে বললেন যে, তাহলে জেহানকে সারারাত অনুতাপে বুক চাপড়ে কাটতে হবে। যখন তিনি লক্ষ্য করলেন যে জেহানের মুখের কঠোর ভাবটা দূর হয়ে যাচ্ছে, তিনি তখন দ্রুত তাঁর কাছে এসে চাপা গলায় কি-যেন বললেন।

জেহান অনড় হয়ে বসে রইলেন, কিন্তু সন্ন্যাসীটির ভারি মুখমণ্ডলে অজ্ঞাত

একটি ভাব ফুটে উঠল, এবং তিনি সেণ্ট অ্যাফলিসের দেহের শপথ নিয়ে বললেন যে, তাঁর পণ্য খুবই উত্তম।

জেহান হাসতে লাগলেন অবিশ্বাসের হাসি, একটু দাম্ভিক অবজ্ঞাও প্রকাশ পেল, তার পর বাধা দেবার ইচ্ছেও জাগল, সেই সঙ্গে একটু কৌতূহলীও হলেন। তাঁরা দুজনে প্রাঙ্গণটি পার হলেন, খড়ের গাদা পাশে সরিয়ে রাখলেন। একটা আস্তাবলের ভিতর দিয়ে চললেন, তারপর সন্ন্যাসীটি একটি গোপন দরজা খুলে দিলেন।

একটা খালি ঘর। একটা বিছানা জড়িয়ে দেয়ালের কাছে রাখা। তার উপরে একটি মেয়ে দক্ষিণী ভঙ্গিতে বসে ভয়ে যেন কাঁপছে। মেয়েটির বয়স হবে সতেরোর মতন। সে বেশ লাজুক ভাবে উঠে দাঁড়াতেই তার শরীরের সৌন্দর্য বৃহৎ হয়ে ও প্রাণস্পর্শী ভাবে উদ্‌ঘাটিত হল। সন্ন্যাসীটি মেয়ের গায়ের আবরণ সরিয়ে ফেলতে গেলেন, জোহান তাকে অমন করতে নিষেধ ক'রে মেয়েটির কাছে গিয়ে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে তার নাম জিজ্ঞাসা করলেন।

সে বলল, "বোট্রিক্স", এমন ভঙ্গিতে সে তার নাম উচ্চারণ করল যে, জেহানের কানের মধ্যে গিয়ে তা রোমাঞ্চকর স্পন্দন জাগাল। তার গায়ের রং গলিত রুপার মতন সাদা যে মনে হয় মেয়েটি বুঝি প্রোভেন্সের। সন্ন্যাসী জানালেন, না, বাইজানটিয়ামের।

এর পর জেহান মেয়েটিকে দু হাজার স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে কিনে নিলেন।

মেয়েটিকে একটা খচ্চরের পিঠে বসিয়ে নিয়ে দুজনে শহর ছেড়ে চলে গেল। ক্রীতদাসদের সঙ্গে কথা বলেন না জেহান। দুজনে নীরবে চলল। মেয়েটি একটু পিছনে-পিছনে। হঠাৎ একটা চীৎকার তাদের দিকে আসতে লাগল। চারদিক যেখানে ছিল নিস্তব্ধ, কেবল রাস্তার খড়খড়ে বালুর উপরে ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দই যেখানে কেবল বাজছিল, সেইখানে হঠাৎ উন্মত্ত চীৎকার আরম্ভ হল।

রাস্তার মোড়ে এক উলঙ্গ মানুষের মিছিল তাদের পাশ দিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল, ধুলো-মাখা নোংরা ব্যানার তাদের হাতে, সঙ্গে নারী ও শিশুও আছে। কোনো-কোনো মেয়ের ভারী স্তন পান করছে কোলের বাচ্চা, বুড়োরা ক্লান্ত পায়ে ছুটে চলেছে। সবাই চীৎকার করছে। কোনো কোনো পুরুষ মেয়েদের বেশ এঁটে জড়িয়ে ধ'রে চলেছে, ছোট মেয়েরা মাথার চুল বাতাসে উড়িয়ে চলেছে, সেই চুলে মুখ ডুবিয়ে চলেছে অনেক ছেলে।

সকলেই গাইতে-গাইতে ছুটতে-ছুটতে চীৎকার করছে ও শূন্যে লাফিয়ে উঠছে।

বোট্রিক্স লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠল, ও মিছিলের দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিল।

এবার জেহান বুঝলেন যে, তার সওদাটি ভালোই হয়েছে। জেহান তাঁর জিন একটু টেনে তুললেন তার পর মেয়েটিকে তুলে নিয়ে এলেন তাঁর সামনে তাঁর হাঁটুর উপর। খচ্চরটাকে উচ্চহাস্যের সঙ্গে তাড়িয়ে দিলেন। এবং মেয়েটিকে নিয়ে ঘোড়া দাবড়িয়ে চলে গেলেন অরণ্যের মধ্যে।

কুকুরগুলো আগে-আগে দৌড়তে লাগল।

কুষ্ঠরোগীদের কথা তাঁর মনে হল না। কেননা, তিনি অনুভব করতে লাগলেন বোট্রিক্সের শরীর গরম হয়ে উঠছে। তিনি তাকে আবার চুমো খেলেন। ইতিমধ্যে সন্ধ্যা নেমে এসেছে। শিকার-সন্ধানী কুকুরটি তাঁদের সামনে দিয়ে সাদা একটা রেখার মত ছুটে গেল।

চোখের ভ্রুর মতন বাঁকা হয়ে অরণ্যটা অন্ধকারে পড়ে রইল পিছনে। আরাম-এর ফটক বন্ধ হয়ে গেল বাদুড়ের ডানার মতন তাদের পিছনে।

জেহান বোদেলের এই রকমই মনে হয়েছিল, এবং তিনি বোট্রিক্সকে তা বলেছিলেন। জেহান বোদেল হচ্ছেন পিকার্দি-র সবচেয়ে বড় কবি। এ কথা তিনি জীবনে কখনো কথায় প্রকাশ করেন নি, তাঁর আচার-আচরণ থেকেও তিনি কখনো তা বুঝতে দেন নি।

তিনি ঘোড়া থেকে নামলেন, বোট্রিক্সের হাঁটুর পিছন দিকে এক হাত রেখে অন্য হাতের উপর বোট্রিক্সের কাঁধ রেখে তিনি তাকে মস্ত এক সাজানো-গোছানো ঘরের মধ্যে নিয়ে গেলেন, এখানে একটা বিরাট বিছানা পাতা, তিনি তাকে বললেন যে, এসব এখন তারই।

তার পর তিনি তাঁর পরিচ্ছদ বদলালেন, এবং তিনি গেলেন শহরের পশ্চিমে সেই মহিলার বাড়িতে, মহিলাটির জন্যে যে-বাড়িটি তিনিই ব্যবস্থা করেছেন। সেখানে দাসী-মেয়েটি বলল যে, মহিলা গির্জায় গিয়েছেন, একথা শুনে জেহান গির্জায় গেলেন, তখন মহিলাটি প্রার্থনা-শেষে গির্জা থেকে রওনা হয়েছেন। তিনি মহিলাটিকে ও তাঁর সঙ্গিনী কয়েক-জনকে নিয়ে গেলেন স্কোয়ারটির কোণের একটা অন্ধকারাচ্ছন্ন পান্থশালায়।

ঘরে একটা ডিবে জ্বলছে, তার থেকে ধোঁয়া বের হচ্ছে। দেয়ালের

চারদিকে কার্পেট-মোড়া বেঞ্চ, ঘরের মাঝখানে একটি গোল টেবিল। মেঝেটায় হলুদ ও সাদা টালি বসানো। ঘরের মধ্যে মদের ও গোলাপের গন্ধ। জেহান মদের অর্ডার দিলেন ও তাঁর মহিলাটিকে পাশে বসিয়ে নিলেন। ঘণ্টা-খানেক বাদে আরও অনেক লোক এল। মহিলারা বেঞ্চে শুয়ে পড়েছেন ও গান গাইছেন।

এদের মধ্যের দু জন কাঁদতে কাঁদতে তাঁদের জীবনের অনেক স্বীকারোক্তি করতে লাগলেন। লালচুল-ওলা এক মহিলা দাঁত ঘষতে ঘষতে বলতে লাগলেন যে, আগের দিন এক মঠবাসী তাঁকে বলেছে তাঁর মাথার চুল খাটো করে কেটে তিনি যেন সন্ন্যাসিনী হন। একটি জোয়ান লোক জিজ্ঞাসা করল, তিনি কি তাঁর চুল সোনালী রং ক'রে নিয়ে 'সরলা' নাম গ্রহণ করবেন। এতে মহিলাটি অপমান বোধ করলেন, এবং তাঁর গেলাসের মদ লোকটির শার্টের উপর ঢেলে দিলেন; কিন্তু তখন তিনি লোকটার হাঁটুর উপরে গিয়ে প'ড়ে অনুতপ্ত হ'য়ে লোকটির কানের লতি কামড়াতে লাগলেন।

জেহান মদের সঙ্গে মসলা ফোটাতে বললেন। তাঁরা প্রাণ ভরে তা পান করে হাসতে লাগলেন। মহিলারা বেঞ্চের উপর দুলতে লাগলেন ও জড়িত গলায় এলোমেলো গান গাইতে লাগলেন।

জেহান বিরক্ত হয়ে গিয়েছেন। তাঁর যা মেজাজ তাতে অন্যমনস্ক হবার এ ব্যবস্থা তিনি উপভোগই করেন, যদিও তিনি প্রয়োজনের খাতিরেই এসব বরদাস্তও করেছেন আনন্দ পাবার জন্যে নয়, তবুও এখন তাঁর নিজেকে বড়ই নিঃসঙ্গ বলে বোধ হতে লাগল।

এইসব ধোঁয়া সত্ত্বেও তাঁর হাতে তিনি একটা গন্ধ যেন পাচ্ছেন, যে গন্ধ কখনো তিনি জানেন না, এ যেন কোনো মেয়ের চুলের গন্ধ?

তিনি পরিবর্তনটা বুঝতে পারছেন, কিন্তু এই অসুস্থতাবোধের কারণটা ঠিক ধরতে পারছেন না, কিন্তু যখন তিনি খবরটা পেলেন তখন একটু যেন স্বস্তি বোধ করলেন। বিকেলের দিকে তিনি তাঁর এক সঙ্গীর কাছ থেকে জানতে পারলেন যে, মহিলাটি তাঁকে প্রতারণা করছেন। এবার ব্যাপার দেখ, আবার এলেন এক সন্ন্যাসী, তাঁর ছায়া জেহানের সামনে দিয়ে যেন চলে গেল (এবার সন্ন্যাসী কিছু নিতে এসেছেন, কিছু দিতে নয়); জেহানের খুবই হাসি পেল। হাতের গেলাস না দেখেই তিনি মহিলাটির চুলের গোছা মুঠি করে ধরলেন এবং মহিলাটি চীৎকার করে ওঠার আগেই তাঁকে দরজার বাইরে

নিক্ষেপ করলেন। তিনি উঠে দাঁড়ালেন, এবং যে মহিলা প্রথমে একসঙ্গে পাঁচ গেলাস মিশ্রিত মদ খেতে পারবে তাকে শহরের পশ্চিমাঞ্চলের বাড়িটি উপহার দেবেন বললেন। এই কথা বলে তিনি রাত্রির অন্ধকারের মধ্যে বেরিয়ে পড়লেন, স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন তিনি, তিনি মাথা তুলে দুই হাত বাড়িয়ে আকাশের দিকে তাকালেন।

তিনি একটা ছোট রাস্তা দিয়ে চলেছেন, এমন সময় তাঁর মাথায় একটা বুদ্ধি এল। তিনি একটা দরজায় ঘা দিলেন, জানালা দিয়ে উঁকি দিল যে ব্যবসায়ী লোকটি তিনি তাকে বাইরে আসতে বললেন, এবং পরদিন দুপুরে তার সবচেয়ে ভালো পণ্য নিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে বললেন।

সকালের প্রথম আলো দেখা যাচ্ছে রাস্তার ফাঁক দিয়ে। জেহান যখন তাঁর বাড়িতে ঢুকছেন সব ঘণ্টা একই সঙ্গে বেজে উঠল। তিনি হাত-মুখ ধুলেন। উপর তলায় গেলেন। তারপর দরজাটা পুরোপুরি খুললেন যাতে বোট্রিক্স-কে বিশাল শয্যাটির উপর দেখা যায়, তার নরম অঙ্গ সকালের প্রথম আলোয় ঝলমল করছে। তার পর তিনি দুপুর পর্যন্ত ঘুমলেন ; তার পর আহারের জন্যে বোট্রিক্স-কে আনতে গেলেন। আগের দিনের সেই মোটা কাপড়ের ময়লা জামাই তার পরনে দেখে তিনি দুঃখিত হলেন। কিন্তু তার চলাফেরা দেখে মনে হল তার পরনে যেন কিছু নেই, কিংবা সে যেন পারশিয়ান মিহি পোশাক দিয়ে তার সঙ্গে আবৃত করেছে। জেহান বুঝলেন তার এই মনোহর অঙ্গে কোনো বিশেষ সাজের কোনো প্রয়োজন নেই।

দুজনে যখন খাচ্ছে তখন একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটল। জেহান অনুভব করলেন যে তাঁর মধ্যে এই ক্রীতদাসী মেয়েটির মধ্যে একটা অবচেতন ও অপরিচিত সম্মানের ব্যবধান যেন দেখা দিয়েছে, তখন জেহান মেয়েটির কাছ ঘেঁষে বসলেন, এবং মেয়েটি তখনই কান্নায় ভেঙে পড়ল। জেহান এর কারণ জানতে চাইলেন। একটু হেসে নিজের প্লেট দেখিয়ে বোট্রিক্স বলল যে, সে এই সব্জী খেতে পারে না। এ হচ্ছে বাঁধাকপি। জেহান বেশ শব্দ করেই হেসে উঠলেন। তারপর তিনি তাকে সেই ব্যবসায়ীটির কাছে নিয়ে গেলেন, অনেক কাপড়চোপড় সে নিয়ে এসেছে।

পরদিন সকালে তিনি তার বিছানার উপর নিয়ে এলেন লাল ফুল ও আলা-মাণ্ডার পাথর। সন্ধ্যার দিকে মেয়েটি একটা গান গেয়ে শোনাল। মেয়েটি তার পোশাক একটু উঁচু করে নিয়ে নাচল। মোমবাতির শিখা তখন কাঁপছে।

জেহানের সামনে আর যেন তার কোনো সংকোচ নেই। যখন সকালের প্রথম আলো মেঝেয় পড়ে প্রতিফলিত হচ্ছে, তার মধ্যে দাঁড়িয়ে সে সাজ করে নিল। সে জেহানকে গির্জার প্রার্থনায় নিয়ে যেতে বলল। জেহানও তার সঙ্গে গেলেন। তিনটে বেদীর কাছে গিয়ে সে প্রার্থনা জানাল। কৃতজ্ঞতা জানিয়ে সে প্রত্যেকটি বেদীর কাছে করজোড়ে দাঁড়াল, মনে-মনে কি যেন বলল। যখন গির্জা থেকে তারা বেরিয়ে আসছে তখন দেখে পথ বন্ধ। একটি মেয়ে লোক দুই হাত দুই দিকে ছড়িয়ে দিয়ে উপুড় হয়ে শুয়ে আছে, একটা ক্রস চিহ্ন হয়ে গিয়েছে এইভাবে। কাতরভাবে সে প্রার্থনা করছে। তার চারদিকে চারটি ক্রস চিহ্ন, প্রত্যেকটি ক্রসের পাশে এক হাত লম্বা মোমবাতিতে রক্তাক্ত শিখা দপদপ করছে। কয়েকজন লোক এই অনুতপ্তা নারীর চারদিকে দাঁড়িয়ে, কিন্তু মেয়েলোকটি মুখ তুলছে না। বোট্রিক্স একটু দ্বিধাবোধ করল। কিন্তু জেহান তাঁর উপস্থিত বুদ্ধি দেখালেন। তিনি এই মেয়েলোকটিকে চেনেন। প্রথম দিন তিনি বোট্রিক্সকে যেমন পাঁজাকোলে তুলে ধরেছিলেন সেইভাবে তাকে তুলে নিয়ে মেয়েলোকটিকে ডিঙিয়ে অন্ধকার খিলান পেরিয়ে গির্জার মুখে আলোয় এসে পৌঁছলেন। বোট্রিক্সকে তিনি নামালেন না, এইভাবে তাকে নিয়ে বাজার পার হয়ে চললেন। তিনি রাস্তায় বাঁক নিতে যাবেন এমন সময় তাঁর পিছনে তীব্র আর্তনাদের শব্দ শুনলেন। জেহান পিছন ফিরে তাকালেন। কালো চুল মাথায়, মুখ রাগত, হাত নাড়তে-নাড়তে মেয়েলোকটি গির্জার দরজায় এসে দাঁড়াল ও বোট্রিক্সকে বলল গণিকা।

এতে বেশ লজ্জা পেল বোট্রিক্স। জেহান তাকে নিয়ে বাড়িতে গেল।

পর দিন জেহান বোট্রিক্সের কাছে গেলেন না। কিন্তু সকাল যখন হল তখন তার কাছে গিয়ে তাকে বেশ আদুরে সম্বোধনে ডাকলেন।

কিন্তু এ রকম সম্বোধন ঘটত কদাচিত। যখন ঝড় এসে জানালায় ঘা দিত তখন অবশ্যই ঘটত এ রকম সম্বোধন। বোট্রিক্স জেহানের আলিঙ্গনের মধ্যে নিজেকে সমর্পণ করে একটু-একটু কাঁপত। ব্যবধানটা বোট্রিক্স একেবারেই পছন্দ করত না।

এর সপ্তাহ-দুই পরে জেহান রাউয়েনে গিয়েছিলেন। বোট্রিক্স ফটকে দাঁড়িয়ে তাঁর জন্যে অনেক অপেক্ষা করেছে। তার পর তাঁকে বিশাল প্রান্তরের উপর দিয়ে আসতে দেখল। জেহান তাঁকে দেখে হাত নাড়ল। ঘোড়া থেকে নেমে তাকে একটা উপহার দিল। একটা দুষ্প্রাপ্য বানর।

তার কাঠের খাঁচায় বানরটা সারাদিন কিচিমিচি করত। বোট্রিক্স এতে তার ঠোঁট বাঁকাতো। এজন্যে জেহান সেটা বাড়ি থেকে বার করে দিল, এবং তার জন্যে সাদা ফুলের একটা ছোট বাগান বানিয়ে দিল। তার জন্যে বেশ উজ্জ্বল রঙের একটা টিয়াপাখি কিনে আনলেন। এটা নিয়ে সে খেলত। আস্তাবলে একটা ঘোড়া কিনে রাখলেন, ঘোড়াটা তাঁর সেই মাদী-ঘোড়াটার মতই সাদা। তাঁর মনে হত যে বোট্রিক্সের চারদিকের সবই বেশ উজ্জ্বল ও রংদার হবে। একজন গ্রীসীয় লোকের কাছে তিনি যতটা সাদা বাজপাখি চেয়েছিলেন তা সে দিতে পারে নি বলে তাকে চাবুক খেতে হয়। বোট্রিক্সের গায়ের রং যেন ছিল উজ্জ্বল আলোর মতন, এবং তা ছিল যেন আরাস-এর অনির্বাণ শিখা।

একদিন সকালে ঘোড়াদের পায়ের শব্দে বোট্রিক্সের ঘুম ভেঙে গেল। জেহান নিজে হাতেই বোট্রিক্সের পায়ে হলদে মোজা পরিয়ে দিলেন, এবং তার হাঁটু পর্যন্ত সেটা টেনে দিলেন। বোট্রিক্স খাটো পোশাক পরতে লাগল, ও তিন-তারা ওয়ালা রিবন বাঁধতে লাগল তার চুলে। তার পর তুজনে তুটো ক'রে বাজপাখি নিয়ে খরগোশ-শিকারে বেরিয়ে গেল। একটা বাজপাখি অনেক উঁচুতে উঠে একটা বক পাখিকে তাড়া করতে করতে কোথায় চলে গেল। বোট্রিক্স তা দেখছিল, এমন ভাবে সে তাকিয়ে ছিল যে, তার মুখ যেন সারাটা দিনের দীপ্তিতে উদ্‌ভাসিত হয়ে উঠেছে। জেহান তার হাতের দস্তানা খুলে ফেলে ভালোবাসা জানাবার জন্যেই তার হাতে ঘা দিল। অনেকক্ষণ ধরে তারা ঘোড়ায় চেপে বনের মধ্যে দিয়ে চলল। এখানে অনেক মেয়ে-পুরুষ ঘোড়ায় চেপে ঘুরছিল। কিছুক্ষণের জন্যে বোট্রিক্সকে সে হারিয়ে ফেলল। তারপর দূর থেকে তার পোশাকের সৌষ্ঠব দেখে তাকে চিনতে পারলেন, তার কাছে গেলেন। এবং একজন তরুণ নাইট যেমন কোনো তরুণীর হাতের দস্তানা কুড়িয়ে দেবার সময় তার উপর চুম্বন এঁকে দেয়, সেই ভাবে জেহান গেলেন বোট্রিক্সের কাছে।

সারাদিন তারা ঘোড়া দাবড়িয়ে বেড়াল। শিকারের আনন্দে তখন তাদের প্রাণমণ ভরে গিয়েছে। আরও যারা ঘোড়ায় চেপে ঘুরতে ঘুরতে ক্লান্ত হয়ে এই রকম অনেকের সঙ্গে তারা মিলিত হল। একজন মহিলার হাসির শব্দে নিস্তব্ধতা ভেঙে গেল। গিরার্দ নামে একজন নাইটের সঙ্গে জেহান ঘোড়ায় চেপে চললেন।

তারা দেখল শহরের স্কোয়ারটা আর্তনাদে পূর্ণ। এক কোণ থেকে আর্তস্বর তাদের কাছে এসে পৌঁছল। একজন লোক মোটা কাপড় দিয়ে জড়ানো, তার মুখের উপরে মুখোশ চাপা, তার দুই হাত আড়াআড়ি করে একটা খোঁটার সঙ্গে বাঁধা। পাগলের মত তার শরীর সে এদিক-ওদিক মোচড়াচ্ছে। একটা সাঁড়াশি দিয়ে তার ঘাড় ধরা, তার মাথা নড়ছে না, পাথুরে মূর্তির মত নিশ্চল, তার ঠোঁট-দুটো নড়ছিল, ও বড়বড় চোখ-দুটো পাক খাচ্ছিল। তার মাথার উপরে একটা নল ঝুলছে। অন্য একটা লোক নলের কাজটা করছে। ঐ বদ্ধ লোকটার মাথার উপরে তেলের ফোঁটা একটু একটু বাদে পড়ছে। লোকটা কে তা জানতে চাওয়ায় একজন বলে উঠল যে, এ হচ্ছে থিবো দ্য নেসলে—লোকটা কুষ্ঠে আক্রান্ত হয়েও তা গোপন রাখে এবং প্রথম দিকেই শহর ছেড়ে যায় না বলেই তাকে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে। এ কথা শুনে জেহানের মুখ রাগে ভারী হয়ে উঠলো। তাঁর মনে পড়ে গেল তাঁর সেই হলুদ রঙের খচ্চরটার মৃত্যুর কথা, এবং মনে পড়ে গেল একজন কুষ্ঠরোগীকে মারতে পারলে তাকে পুরস্কৃত করার কথা। তার পর মাথা নত করলেন জেহান। তিনি সোজা চলে গেলে গিরার্দের কাছে। তিনি তাকে বললেন যে, ঐ লোকটাকে আরও পঞ্চাশ ফোঁটা গরম তেল দেওয়া হোক—এটা তাঁর আদেশ। তিনি বেশ চেঁচিয়ে এ কথা বললেন, স্কোয়ারের চারপাশের বাড়ির জানালা থেকে উঁকি দিয়ে ছিল যারা তারাও শুনল এই আদেশ।

গিরার্দ মুখ একটু বিকৃত করল। তারা দুজন চোখাচোখি হল। জেহানের দৃষ্টি নাইটের চোখ বুঝি ভেদ ক'রে গেল। নাইট মেনে নিল আদেশ, ও তা পালনের জন্যে নির্দেশ দিতে গেল। যখন সে ফিরে এল, তখন তার মুখ ফ্যাকাশে ও চোখ দিয়ে জলের ধারা নামছে।

কুষ্ঠরোগীটির গলা দিয়ে এমন আর্তস্বর বের হল যে, মনে হল তীরের মতন তা এসে যেন তাদের গায়ে লাগছে।

বোট্রিক্সের চোখেও জল দেখা দিল, তারা বাড়িতে না পৌঁছানো পর্যন্ত সে জল শুকালো না। সে জিজ্ঞাসা করল, কেন জেহান অমন কাণ্ড করল, সে কাঁপতে লাগল। তার মনে হল জেহান বুঝি খুবই নিষ্ঠুর।

জেহান স্থির ভাবে তার সাদা চামড়ার দস্তানার সেই জায়গাটা দেখালো যেখানে জিরার্দ চুমো খেয়েছে, এবং বলল, "তা না হলে আমাকে হয়তো তাকে মেরে ফেলতে হত।"

এর পর বোট্রিক্স অসীম উল্লাস নিয়ে ভাবতে লাগল জেহান তাকে কত ভালোবাসে। সেদিন সন্ধ্যায় কয়েক বার সে ভালো তেল দিয়ে গা মেজে গা ধুলো। সে জেহানকে বেশ আনন্দ-উল্লাসের সঙ্গে আমন্ত্রণ করতে চাইল। এই দিন থেকে আরও যে সাতটি সপ্তাহ সে জেহানের সঙ্গে ছিল, তখন এই আনন্দ-উল্লাস দশগুণ বেড়ে গিয়েছিল। দিনের বেলাগুলো বেশ নীরবে ও নির্ঝঞ্ঝাটে কাটত, কিন্তু রাত্রিগুলো তার উপর দিয়ে কাটল প্রদীপ্ত হয়ে, হাজারটা ঝড়ের তাণ্ডব নিয়ে।

একদিন দক্ষিণ-ফ্রান্সের এক গীতিকবি এসে হাজির হলেন, এবং রাত্রিটা জেহানের বাড়িতেই কাটালেন।

সেদিন আরাস-এর রাজতুল্য ব্যক্তি জেহান বোদেল স্বপ্ন দেখলেন যে, তিনি একটি অরণ্যের মধ্যে দিয়ে হেঁটে চলেছেন, যার গাছগুলো হেলে দাঁড়িয়ে আছে, শব্দ করছে ও গান গাইছে।* সে গান এমনই যে তাতে জেহানের বেশ কষ্ট হতে লাগল। একটি কাঁচের টব দেখে তিনি তার মধ্যে আশ্রয় নিলেন। টবটা গড়িয়ে গেল, ছোট পাহাড় থেকে জলে পড়ল, এবং সমুদ্রের তলায় চলে গেল। কিছুক্ষণ ঐ কাঁচের গায়ে জলের ধাক্কায় জলতরঙ্গ-ধ্বনি তিনি শুনলেন। তার পর এল মাছেরা। তারা চলে গেল। তার পর সমুদ্র ছাড়া আর কিছুই রইল না, এবং এই অসীমতায় তিনি অভিভূত হয়ে গেলেন, তাঁর চিন্তার চারদিকে অনন্ত শূন্য পাক খাচ্ছে। যখন ঘুম ভাঙল তখন তাঁর চিন্তা ধুলার মেঘের মতন হয়ে উঠল, তাঁর মনে হতে লাগল তিনি যেন ভাসছেন।

দুপুরবেলা গীতিকবিটি চলে গেল।

কবিটি এসেছিল নরম্যাণ্ডির মণ্ট সেণ্ট মিকেলের মঠ থেকে। সে তীর্থে চলেছিল স্যান ইয়াগো দ্য কমপোস্টেলায়।

তার মুখ ঘন-বাদামি রঙের, তার চুল কালো।

সে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে জেহানের করমর্দন করল।

সন্ধ্যার দিকে জেহান যখন পরিচ্ছদ বদল করছেন তখন তিনি প্রায় চমকে গেলেন। তিনি আয়না নিলেন…এবং যে শূন্যতায় তিনি পূর্ণ হয়ে উঠলেন তাতে যেন তাঁর সমস্ত সত্বা ফাঁকা হয়ে গেল। তিনি হঠাৎই যেন বুঝলেন যে, এখন তিনি তাঁর কাছে নতুন মানুষ; একটা ভীষণ বোঝার ভারে তিনি ভারাক্রান্ত হয়ে গেলেন।

জেহান দুই হাত পিছনে দিয়ে ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে লাগলেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা। বোট্রিক্স দরজায় ঘা দিল। তিনি তা শুনলেন না। সে বলল যে রাত কিন্তু এসে গেছে। সারা রাত ঐ বিরাট শয্যায় বোট্রিক্স একা কাটাল। চাঁদ তার চোখের সামনে ঘুরে গেল। এ ব্যাপার তার কাছে নতুন। সে শুয়ে শুয়ে কাঁদতে লাগল।

জেহান বোদেল একটা দিন জানালায় বসে শহরের দিকে চেয়ে কাটিয়ে দিল। একটু সরু গদি-আঁটা টুলে বসে রইলেন তিনি। তার দুই দিকে দুটি থাম নিশ্চলভাবে দাঁড়িয়ে। তিনি উঠে দাঁড়ালেন, তাঁর মুখ দিয়ে ফেনা বের হতে লাগল। তিনি দরজার কালো পর্দা ছিঁড়ে টুকরো-টুকরো করলেন, তাঁর সবচেয়ে ভালো তলোয়ার তাঁর ছুরি দিয়ে কাটতে লাগলেন, তার পর খণ্ড খণ্ড করে তা ভাঙলেন। তাঁর হাত তখন রাঙা হয়ে উঠছে ও জ্বালা করছে। আবার গিয়ে তিনি সেইখানেই বসলেন ও শহরের দিকে তাকালেন। একজন বৃদ্ধ দাসী তাঁকে দেখাশুনা করত। তিনি মেঝেয় শুয়ে পেঁয়াজ দিয়ে শরীর মেজে নিতেন। তারপর তিনি বসতেন, ও লিখতেন বেশ উত্তেজিত ভাবেই।

বোট্রিক্স অপেক্ষা করেছে ও দরজায় ঘা দিয়েছে।

কোনো উত্তর দেন নি জেহান।

সে তাকে একটা চিঠি লিখল, সামান্য কথা, কিন্তু তার মধ্যেই বুঝি অনেক কথা। জেহান বেদনায় তাঁর ঠোঁটে কামড়াতে লাগলেন, এবং কান্না চাপবার জন্যেও। এবং একটু হেসে তাকে একটি বাঁধাকপি পাঠালেন, যেন তার ভালোবাসাটা সংহার করার জন্যেই।

কিন্তু এভাবে ভালোবাসা নষ্ট করা গেল না।

এক সপ্তাহ বাদে শহরে ও জেলায় একটা জনরব ছড়িয়ে পড়ল যে জেহান পরদিন তার রচিত নূতন গান পড়ে শোনাবেন।

সেদিন সকালে নিজে থেকেই তিনি বোট্রিক্সের কাছে গেলেন। সে তখন শুয়ে আছে তার বিছানার পাশের একটা ধাপে রাখা একটা গদির উপর। না-খেয়ে মুখ তার ফ্যাকাশে। জেহান তাকে সবচেয়ে ভালো সাজ প'রে তাঁর সঙ্গে আসতে বললেন। তাঁর মুখের ভাব বেশ কঠিন। বোট্রিক্সের ইচ্ছে হল জেহানের উপর সে ঝাঁপিয়ে পড়ে। কিন্তু জেহান তাকে সরিয়ে দিল। এ'তে বোট্রিক্সের মুখের উপর দিয়ে একটা রাগত ভাব ছড়িয়ে পড়ল, সে

বিছানার একটা ঝালর নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগল, জেহান চলে না-যাওয়া পর্যন্ত নড়ল না। তারপর সে ছুটে গেল, জানালার গ্রীলের ফাঁক দিয়ে দেখল। জেহান সেই গদি-আঁটা টুলে বসে অপেক্ষা করছেন, সে লক্ষ্য করল ঐ চোখে আর রাগ নেই, এখন সে চোখ স্থির। আর দেরি করল না বোট্রিক্স।

সে তার মাথায় নীল ও হলুদ পাগড়ি জড়িয়ে জড়িয়ে নিল, তাতে বসিয়ে নিল সাতটি ছোরা, প্রথমটার সঙ্গে একটা সাদা ওড়না বেঁধে নিল, তার পর তার চিবুকের নীচ দিয়ে সেটা ঘুরিয়ে এনে বাঁধল সপ্তমটার সঙ্গে। তার পর সে তার ছোট দুটি স্তন ঘিরে পরে নিল সাদা ওয়েস্টকোট, যার কাঁধের কাছে চটকদার এমব্রয়ডারি-করা, সোনালী ব্রোকেডের কারুকার্য মণ্ডিত সাজ দিয়ে নিজেকে সাজিয়ে নিল। তার পর দুজনে চলল বাজারের দিকে। একটা মস্ত ভিড় জমে গিয়েছে, সার বেঁধে সবাই ধাক্কাধাক্কি করছে। বাইরে থেকে ফটক ডিঙিয়ে নতুন ভিড় আসছে। তার পর আসছে বেশ সংঘবদ্ধ দল, লাল দস্তানা-পরা হাতে ব্যানার ধরে আসছে একজন ধর্মযাজক। কোনো-কোনো দল গান গাইছে। তার পর মেয়েদের একটা বড় দল গ্রীষ্মের গান গাইল, তার মধ্যে এসে যারা নতুন যোগ দিচ্ছে তারা তাল রাখতে না পেরে টিয়াপাখির মত অসংলগ্ন উচ্চারণ করছে।

জেহান বেদীতে গিয়ে উঠলেন। তাঁর পিছনে গির্জার ফটক হাঁ করে আছে, গির্জার গায়ে অনেক মূর্তি খোদাই করা, সেখান থেকে মোমের নিষ্প্রভ শিখা দেখা যাচ্ছে। জেহান বেশ হেসেই সকলকে অভিবাদন জানালেন। তারাও হেসেই প্রত্যভিবাদন করল। তারপরই তাঁর মুখের ভাব বদলে গিয়ে একটু কঠোর হয়ে উঠল, তিনি পড়লেন, যা পড়লেন তার মানে হল নাগরিকদের কাছ থেকে তাঁর বিদায় প্রার্থনা। তিনি পড়ে যেতে লাগলেন। নীচ থেকে অনেক বিদ্রূপ করতে লাগল। সবাই উত্তেজিত হয়ে উঠল। একটা লোক হাত তুলল। সকলেই তারপর হাত তুলল। হাতের পর হাত উঠতে লাগল যেন ঝড় উঠছে, রেলিঙের কাছে তারা যেতে লাগল এবং বলতে লাগল—তাঁর যাওয়া হবে না, থেকে যেতে হবে। মুখগুলো দীপ্ত হয়ে উঠতে লাগল। তারা চীৎকার করে উঠল। তারা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে, তারা দল বেঁধে এগিয়ে যেতে লাগল।

জেহান তখন গলা পর্যন্ত তাঁর হাত তুললেন, জামা চেপে ধরলেন, জামা ছিঁড়ে ফেললেন, এবং নগ্ন বুকটা মেলে ধরলেন জনতার সামনে। দুই হাত

তিনি প্রসারিত করলেন। তাঁর গায়ের চামড়ার উপর নীল নীল ছোপ দেখা গেল, এক লাল টিউমার ফুটে বের হল তাঁর বুক থেকে।

এক মুহূর্তের জন্যে এই বিশৃঙ্খল জনতা এই ভয়ানক ব্যাপারই দেখল।

সকলের হাত নেমে গেল। চীৎকারটা হুংকারে দাঁড়িয়ে গেল। পুরুষরা মেয়েদের টেনে নিতে লাগল এই হৈ-চৈ-এর মধ্যে থেকে। তারা পিছনে সরে এল। যেন চাবুক খেয়ে থেমে গেল সব কলরব। এখন সকলেই পালাচ্ছে। একজন মাত্র লোক সাহস দেখাল, সে তার দৃঢ় মুঠি তুলে চেঁচিয়ে উঠল, "প্রকাশ্য জায়গায় শাস্তি দিতে হবে।"

কিন্তু সে একা।

জলের উপর যেমন আবর্ত দেখা দেয় জেহানের চারদিকে তেমনি চক্র জেগে উঠল। তার ভিতর থেকে কিছু যেন বেরিয়ে আসছে। জনতা সরে যাচ্ছে, রাস্তায় ও বাড়িতে-বাড়িতে চলে যাচ্ছে তারা। বোট্রিক্স অজ্ঞান হয়ে গিয়েছে। দুজন লোক তাকে টেনে নিয়ে গেল।

চারদিক চুপচাপ।

একটাও শব্দ নয়।

জেহান হাসলেন, যেমন হেসেছিলেন ঐ টবের মধ্যে।

এই জায়গা থেকে ফেরবার দুটি পথ আছে। জেহান একটা পথ ধরলেন। এটা একটা স্তম্ভের দরজা, উপব দিকে তার দুভাগ করা। তার মাঝখান দিয়ে ঝুলছে একটা মস্ত ঘণ্টা। জেহান রাস্তার দিকে তাকালেন। কেউ নেই। তিনি অন্যদিকে গেলেন। জানালা দিয়ে কেউই আর উঁকি দিচ্ছে না। তিনি বুকে কুষ্ঠক্ষত নিয়ে এগিয়ে চললেন। এখানে সরু সরু গলিপথ ভেদ করে অন্ধকার রাস্তা গিয়েছে।

একটা লোমের পাগড়ি জেহানের মাথায়। একটা গাঢ় রঙের পোশাক পরনে, বুক খোলা, পায়ে সবুজ রঙের জুতো।

এই ভাবে সে চলেছে ঢালু পথ ধরে। তার ধারণা, কেউ এসে নিশ্চয় তাকে হত্যা করবে।

কিন্তু কেউ তাকে কিছু করল না।

তার বাড়ির সামনেটা বেশ প্রশস্ত। উপরতলায় বেশ বড় বড় থাম ও জানালা। নীচের তলায় একটা লম্বা দরজা দিনরাত খোলাই থাকে। জেহান অপেক্ষা করতে লাগল। কেউ এল না।

সকালের দিকে অনেক দরজা খুলে গেল। মোমবাতি হাতে নিয়ে শহরের রাস্তা ধরে অনেক লোক গির্জার দিকে যেতে লাগল।

সারাটা দিন জেহান সেই গদি-আঁটা টুলে বসে রইল। দরজায় তালা দেওয়া। বোট্রিক্স সারা সকাল দরজায় ঘা দিয়েছে। জেহানকে নাম ধ'রে ডেকেছে, কেঁদেছে। দরজার উপর সে নিজের শরীরটাও সে প্রায় ছুঁড়েই দিয়েছে। সেই নীতিকবিটাকে সে অভিসম্পাত দিতে লাগল, যে এসে জেহানের উপর এই অভিশাপ ছড়িয়ে দিয়ে গে'। কিন্তু দরজাটা কিছুতে খুলল না।

পরের দিন, এবং তার পর দিন রাত্রে জেহান বোদেলের বাড়িটা খোলা পড়ে রইল। কেউ এল না। তার সামনে দিয়ে কেউ বিশেষ গেলও না। সন্ধ্যার দিকে জেহান জানলার গ্রীলের ফাঁক দিয়ে তাকাল। বোট্রিক্স মেঝের উপর একটা বিবর্ণ প্রাণীর মতন পড়ে আছে। কিছুক্ষণ পরে একদল অজ্ঞাত গায়ক গান গাইতে-গাইতে শহর পরিক্রমা করতে লাগল। তাদের বাঁশির ও বেহালার আওয়াজ প্রতিধ্বনিত হতে লাগল।

মাঝরাতে এক চারণকবি জেহানের জানলার নীচে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে অ্যামিস ও অ্যামিলের কাহিনী বলতে লাগল। তারা দুই সহোদর ভাই, দেখতে-শুনতে বেশ ভালো, দুজনকে দেখতেও প্রায় এক-রকম, দুজন দুজন ভালোও বাসত। এর পর অ্যামিস এক কাণ্ড করে, সম্রাটের মেয়েকে নিয়ে সে পালায়। এতে সে বেশ বিপদেও পড়ে; অ্যামিলে তার হয়ে লড়ে। অ্যামিলে জিতে গেল, এবং রাজকুমারীকে তার স্ত্রী বলে স্বীকার করা হল। কিন্তু মেয়েটার প্রতি অ্যামিসের টান বেশি বলে অ্যামিলে তাকে তার ভাইয়ের হাতেই অর্পণ করল; এই কাজের শাস্তিস্বরূপ সে আক্রান্ত হল কুষ্ঠে। কিন্তু অ্যামিস তার দুই ছেলেকে হত্যা করল। এদের রক্তে স্নান করে অ্যামিস রোগমুক্ত হল—

এইটুকু বলার পরই গান থেমে গেল। সকালবেলা এক সন্ন্যাসী এসে দুটি ছেলেকে বিক্রি করতে চাইল।

জেহান কিনতে রাজি হল না।

সেইদিন সকালেই একটা ছুরি দিয়ে বোট্রিক্স দরজা কাটতে আরম্ভ করল, অনেকটা কেটেও ফেলল, কিন্তু তার মাঝখানে লোহার পাত থাকায় তার ছুরিটাই ভেঙে গেল।

সে তখন হতাশ হয়ে শুয়ে রইল চৌকাঠের উপর।

সন্ধ্যার দিকে সে দরজায় অনবরত ঘা দিতে লাগল। তার হাত অবশ হয়ে এল। জানলার ফাঁক দিয়ে দেখল জেহান বসেই আছেন। মনে হল তিনি যেন তাঁর হাত দুটির দিকে চেয়ে আছেন। বোট্রিক্স তখন দরজার খিলে কামড় দিল, রক্তাক্ত হয়ে পড়ে গেল মেঝেতে।

তৃতীয় রাত্রি এসে গেল। জেহানের ঘরের দরজা একেবারে হাট করে খোলা। কেউ আসেনি। ঘাতক? না, সেও না। এল রাত্রি। এল নিস্তব্ধতা।

নিঃশব্দ চারধার। রাস্তায়ও একটা শব্দ নেই।

জেহান একবার উঠলেন। দরজার ওপারে বোট্রিক্স শুয়ে, তার চোয়াল দিয়ে রক্ত গড়াচ্ছে। জেহান তা দেখলেন। একা···এই রাত্রিটাও ঐ টুলে বসেই তিনি কাটিয়ে দিলেন।

ভোর হবার কিছু আগে তিনি উঠলেন। দরজার কাছে গিয়েই তিনি সেটা খুললেন। বোট্রিক্স নেই। এখন প্রার্থনার সময়। জেহান হাত-মুখ ধুয়ে নিলেন পেয়াজের রস দিয়ে, এতে এ রোগের সংক্রামকতা নষ্ট হয়। এর পর ধীরে-ধীরে তিনি বোট্রিক্সের ঘরে গেলেন। ফুলের গন্ধ পেলেন ঘরে···ঐ তো ফায়ারপ্লেস···ডাইজন থেকে তিনি জাহাজের একটা মডেল এনেছিলেন। তিনি টিয়াপাখির নড়াচড়ার শব্দ শুনলেন। তিনি চেয়ে-চেয়ে সারাটা ঘরের কারুকাজ দেখলেন। তিনি দেয়ালের আলো জেলে দিলেন। সেই আলোয় সমস্তটা ঘর তিনি শেষ বারের মতন দেখে নিলেন।

কিন্তু মুক্তির স্বাদ পাবার মতন অনুভূতি এখন আর তাঁর নেই। সব দেখে তাঁর বেদনাই লাগতে লাগল। তিন মাস ধরে যেখানে বোট্রিক্সের যে অনবদ্য শরীরটি নিয়ে তিনি বাস করেছেন সেই ঘরের দিকে তিনি তাকালেন। তিনি দেখলেন বিছানাটা পড়ে আছে, এখানে কেউ শোয়নি। দেখলেন জানালার শার্সিতে এসে উঁকি দিচ্ছে ভোর। এমন সময় পাশের বাড়ির দুটি মেয়ে বৈতালিক গান গেয়ে উঠল।

ধীরে-ধীরে দিন হচ্ছে।

তিনি আস্তাবলে গেলেন। তাঁর মাদী ঘোড়াটার কাঁধে একটু চাপড় দিলেন। ঘোড়াটা তাঁর দিকে তাকাল। হঠাৎ তাঁর মনে হল তিনি এখন সবই পরিত্যাগ করতে চলেছেন। একটু থমকে দাঁড়ালেন জেহান। তাঁর

ভীষণ কান্না পেল। ঘোড়াটার মুখে হাত দিলেন। ঘোড়াটার চওড়া কাঁধ কেঁপে উঠল। এর পর জেহান সেখান থেকে চলে গেলেন।

এবার পিছন ফিরে তাকালেন। কাঁধ ঝাঁকি দিলেন। মনে হল সব বোঝা হয়তো ঝেড়ে ফেলছেন। তিনি ফিরে গেলেন ঘোড়াটার কাছে, সেটা মেরে ফেললেন।

তার পর তিনি রাস্তা ধরে হাঁটতে লাগলেন। তিনি সেই প্রকাশ্য-শাস্তির জায়গাটা পার হলেন। তাঁর ক্ষত বুকটি খোলা। সব ঘণ্টা তখন বেজে উঠেছে। এখন প্রার্থনার সময়। তিনি যখন বাজার-এলাকা পার হচ্ছেন তখন চারদিক আলো হয়ে গিয়েছে। একটি ঘোড়ায় চেপে একজন যাজক চলে গেলেন, তিনি জোরে-জোরে প্রার্থনার গান গাইতে-গাইতে চলেছেন। লোকজন গির্জায় চলেছে। জেহান তাদের মধ্যে দিয়ে চললেন, তারা থমকে থেমে নত হয়ে নমস্কার করল জেহানকে, সেদিনও তাঁর এতই ক্ষমতা ছিল।

তিনি ফটকের কাছে এসে সাঁকোটা পার হলেন। তিনি হেঁটে চললেন। একবার পিছন ফিরে তাকালেন। ফটক বন্ধ হয়ে গিয়েছে। তাঁর ডানদিকে লেক। আটটা স্তম্ভ ফটকটার চারদিক বেষ্টন করে আছে। ঐ দিকে চেয়ে তিনি একটু চিন্তা করলেন। তার পরে তিনি বেগে নেমে গেলেন মাঠে। কুষ্ঠরোগীদের অরণ্য তাঁর সামনেই। ঠিক যেন চোখের ভ্রূর মতন বাঁকা-- এমনই তাঁর মনে হল।

হঠাৎ তিনি একটা চীৎকার শুনলেন, ও দেখতে পেলেন একটা হাত। ঝোপের মধ্যে থেকে সাদা কি-যেন বেশ স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে। বোট্রিক্স তাঁর সামনে এসে দাঁড়াল।

"কোথায় চলেছ?"

"ঐ অরণ্যে।"

"আমাকেও সঙ্গে নাও।"

তিনি তাঁর বুক খুলে ধরলেন। সে মাটিতে পা ঠুকে বলল, "আমি ওসব গ্রাহ্য করিনে।"

শান্তভাবে জেহান বললেন, "না।"

বোট্রিক্স তাঁর হাত চেপে ধ'রে বলল, "আমিও চাই ঐ রোগ। এ'তে তোমার আপত্তি কী?"

জেহান তার কাছ থেকে সরে গেলেন। সে গিয়ে দাঁড়াল জেহানের সামনে।

সে বলল, "তুমি আমাকে চুমো খেয়েছ···এখানে···প্রথম চুম্বন আমার··· রাতের পর রাত তুমি আমার বিছানায় ঘুমিয়েছ·· তোমার কি মনে আছে, আমাকে আদর করে বলতে বাজপাখি।"

জেহানের মনে আছে, তিনি বললেন, "হ্যাঁ। রুপোলি পাখিও বলেছি তোমাকে।"

কিন্তু মেয়েটা বুঝল না যে জেহানের মধ্যের সব-কিছুই এখন মৃত ; রমণীর কমনীয়তা নিয়ে এক সময় তিনি ডুবে ছিলেন, কিন্তু এখন তা তাঁকে আর বিমোহিত করে না। কেন না, তাঁর মন এখন জীবনের নতুন এক অর্থ নিয়ে বিভোর হয়ে পড়েছে। তবুও মেয়েটি অনুনয় করতে লাগল, তাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবার জন্যে কাতর ভাবে আবেদন করতে লাগল।

কিন্তু জেহান তাকে সরে যাবার জন্যে কঠোরভাবে আদেশ করলেন। এ আদেশ মান্য করতে পারল না মেয়েটি। মাটিতেই শুয়ে রইল।

জেহান তখন চেঁচিয়ে উঠল, বলল, "ক্রীতদাসী!"

মেয়েটি উঠে বসল, জেহানের মুখের দিকে তাকাল তুই চোখ মেলে বলল, "তু-হাজার স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে কেনা ক্রীতদাসী।"

জেহান চলে যেতে লাগলেন। বোট্রিক্স পড়ে রইল, বেদনায় লোভে জীর্ণ সে, মনে হল সে যেন বর্ণহীন একটা মাংসপিণ্ড মাত্র। ধূলি-ভরা রৌদ্রমাখা রাস্তায় পড়ে রইল ঐ অসহায় মেয়েটি।

ওদিকে বর্ণময় ফুলের সমাহার। সকালের রোদ পৃথিবীকে কেমন সমুজ্জ্বল করে তুলেছে।

প্রান্তর পার হয়ে চললেন জেহান। তিনি দেখলেন পুণ্যার্থীরা গাছ থেকে ফুল পাড়ছে ও গুনগুন করে গান গাইছে। তিনি পাশে সরে এলেন, তাঁদের অভিবাদন করলেন।

আর-একবার তাঁকে পিছন ফিরে তাকাতে হল। সেই সাদা সন্ধানী কুকুরটা ছুটে আসছে। তিনি তাকে খালের ধারে টেনে নিয়ে গিয়ে মেরে ফেললেন।

তার পর আবার চললেন। আবার চললেন আরাস-এর রাজতুল্য ব্যক্তি জেহান বোদেল। তাঁর পরনে পশুলোমের বর্ডার দেওয়া লাল জামা। মাথায় লোমের পাগড়ি। পায়ে সবুজ জুতো।

এই ভাবে তিনি ঢালু পথে নেমে চললেন। তাঁর ঠোঁট নড়ে উঠল।

তিনি একটু ভাবলেন। তিনি বহু পূর্বে যে গান শুনেছিলেন, সেইটি গাইতে লাগলেন। মনে হল গানটা তাঁর মনে এসে গেছে মনের একটা ফাঁক দিয়ে, তাঁর বন্ধুর কাছ থেকে···

কিন্তু তিনি ঠিক মনে করতে পারলেন না। তাঁর চিন্তার শক্তি আর নেই। তিনি যে কথাগুলো এত শব্দ করে উচ্চারণ করছেন তার মানেই তিনি ঠিক মতন বুঝতে পারছেন না। এটা একটা প্রেমসংগীত। তিনি তাঁর হাতের দিকে তাকালেন, হাত-দুটি রক্তে মাখা।

তিনি বেশ রাজসিক ভঙ্গিতে দাঁড়ালেন।

তার পর বেশ শান্ত ভঙ্গিতে তিনি অরণ্যের দিকে যাত্রা করলেন। অরণ্যটা তাঁর কাছাকাছি এসে যেতে লাগল।

জর্জ কাইজার

যুদ্ধে পরাজয়ের পর

জর্জ কাইজার (১৮৭৮-১৯৪৫) প্রচুর সংখ্যক নাটক রচনা করেছেন এর ফলে জার্মানীর ভাববাদী শ্রেষ্ঠ নাট্যকার হিসেবে তিনি পরিগণিত হন। ১৯৩৩ সালে তাঁর কোনো নাটক মঞ্চস্থ করা নিষিদ্ধ হয়। ১৯৩৮ সালে ইনি সুইজারল্যাণ্ডে চলে যান। তাঁর নাটকের মূল বিষয় হল মানুষের স্বাধীনতাহীনতা, এবং যন্ত্রশিল্পের ও পুঁজিবাদী অর্থনীতির দরুণ মানুষের ব্যক্তিত্বের বিনাশ এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর যে রাজনৈতিক ও সামাজিক ওলটপালট ঘটে গিয়েছে তার বিবরণ দেওয়া। তাঁর মানবিকতা-বোধ কেবলমাত্র এই চেয়েছিল যে, মানুষকে তার প্রকৃতিগত মুক্ত ও শান্তিপূর্ণ জীবনযাপন করতে দেওয়া হোক। তাঁর প্রবন্ধ "আফটার এ লস্ট ওয়ার" (১৯৪১) সার্বজনীন একটা রাজনৈতিক সত্য উদ্‌ঘাটন করেছে, এবং অ্যাডলফ্ হিট্‌লারের দ্রুত উত্থানের কারণ সম্বন্ধে আলোকপাত করেছে; এবং বিশেষ ক'রে ন্যাশনাল সোশ্যালিজ্‌ম্ সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য প্রকাশ করেছে।

একটা যুদ্ধে পরাজয়ের পর যখন চারদিকে অনাহার ও ক্ষুধার রাজত্ব, এবং লাম্পট্যের জয়জয়কার, যখন সব মূল্যবোধ নষ্ট হয়ে গিয়েছে, তখন অপদার্থেরই পোয়াবারো। তার মনের মধ্যে কাজ ক'রে যায় যতরকম হীন প্রবৃত্তি, সে

বুঝতে পারে যে মানুষের সব অসহায়তা থেকে মুক্ত করার জন্যে শপথ গ্রহণ করলেই সে সকলের উপর ছুরি ঘোরাতে পারবে। সেইজন্যে সে প্রতিজ্ঞা করেই যায়, কেবল প্রতিজ্ঞাই করে যে, তার নেতৃত্ব গ্রহণ করলেই সে মানুষের সব অভাব দূর করে দেবে।

এবং যে জাতি তার সবই খুইয়েছে, সে আর কোনো উপায় না দেখে নিজের নির্বুদ্ধিতার জন্যই এইসব ফাঁকা আওয়াজে বিশ্বাস করে ; যে আওয়াজ দিয়ে সাধারণ মানুষের কোনো কল্যাণ হয় না, কিন্তু শপথকারীরই গৌরব বাড়ে, ক্ষমতা লাভের জন্যে তার নোংরা লোলুপতাই বাড়তে থাকে। প্রথম দিকে, বিশ্বাসকারীর সংখ্যা ছিল কম, কিন্তু দম্ভটা আরও জোর আওয়াজ তুলতে লাগল, প্রতিজ্ঞাগুলোই ক্রমেই বেশ লম্বা-চওড়া হয়ে উঠতে লাগল। কেউ তা বিচার করে দেখতে চায় না, হিসাব করে দেখে না। যাদের খোয়া যাবার কিছুই নেই, তারা ভেবে দেখতেও চায় না, খোঁজখবর নিতেও চায় না ; তারা ঐ জাদুকরের ডাকেই সাড়া দেয়, প্রতারিত হতে চায়, তার পরিণামে ঐ জাদুকরই এনে দেয় তাদের সর্বনাশ। ক্ষুধায় কাতর হয়ে, এবং ঐ আওয়াজে অভিভূত হয়ে, স্বাধীনতা ও শান্তির আশ্বাসে অধীর হয়ে তারাও তাদের এই আকাঙ্ক্ষিত জিনিসের জন্যে চীৎকারে গলা যোগ দেয়।

সেই পরম বদমায়েসটি তার লক্ষ্যে পৌছেছে। এখন সে তাদেরকেই পিষে মারছে যাদের সে ডাঁহা মিথ্যা কথা বলে ধোঁকা দিয়েছিল, অসহ্য যন্ত্রণা দিয়ে চলেছে তাদের। তাদের শাসন করছে ও তাদের শোষণ করছে। এইটেই তার অত্যাচারের আনন্দ, সে তাই তার প্রাসাদের গায়েই তৈরি করেছে কয়েদখানা। সে শিকলের ঝনঝনা শুনতে পায়, অত্যাচারিতের আর্তনাদ শুনতে পায়, আর অমনি আরও স্ফীত হয়ে উঠে ভাবতে থাকে যে, সবার জীবন ও অস্তিত্বের উপর তার কতটা হাত। যখন সকলে অনাহারে মরছে, অবসন্ন হয়ে পড়ছে, তখন গায়ে মিথ্যা লেবেল লাগিয়ে সেই কয়েদখানার পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছে লরী—তাতে বোঝাই করা আছে প্রাসাদের জন্যে সবচেয়ে সেরা খাদ্য ও পানীয়। নতুন মিথ্যার জন্যে জিভ যেন নতুন নতুন কথা খুঁজে বেড়াচ্ছে তখন, যেসব মিথ্যা কখনোই সত্যে পরিণত হবে না।

কিন্তু ক্রমেই মানুষের বোধগম্য হয় যে, তার দেওয়া একটা প্রতিজ্ঞা অনুসারেও তো একটাও কাজ হচ্ছে না। এজন্যে তারা তাদের রাগ যদিও চেপে থাকার চেষ্টা তখনও করছে, কিন্তু এই রাগ ক্রমশই মানুষের মধ্যে

ছড়িয়ে পড়ছে। তবুও সব-কিছুই চলেছিল চাপা-গলায় ফিসফাস শব্দে; কিন্তু প্ল্যান এখন পাকা হয়ে গিয়েছে: এই উদ্ধত আর নির্লজ্জ মিথ্যাবাদীকে সরাতে হবে। লরীর স্টিয়ারিং হুইল যখন একদিন বিকল হল, লরী গিয়ে ধাক্কা দিল দেওয়ালে, আর তার থেকে ক্ষুধার্ত মানুষের সামনে যখন অপূর্ব খাদ্যসামগ্রী উল্‌টে পড়ল—সেইটেই হল সংকেত। শিকল ভেঙে বেরিয়ে পড়ল কিছু সংখ্যক মানুষ, প্রহরীদের পরাস্ত করল, তারপর সেই জনতা আক্রমণ করল ঐ প্রাসাদ, খুন করার জন্যে প্রস্তুত হয়েই।

এঁতে ভয় পেয়ে ঐ দুরাত্মাটি খুব দ্রুত চিন্তা করতে লাগল -কী করা যায়। নিজের কৃতকাজের জন্যে কারও সামনে দাঁড়াবার সাহস তার নেই, সে এমনই কাপুরুষ। একটা সুড়ঙ্গপথে সে নিজেই গিয়ে ঢুকল ঐ কয়েদখানায়, গোঁফ ও চুলের কায়দা একটু বদল করে নিয়ে। খুঁটিনাটি করে না দেখলে তাকে তখন চেনা যায় না, সে ঐ ছদ্মবেশে নিজেকেই শৃঙ্খলিত করল, তার পর মুক্ত হবার জন্যে আর্তনাদ করতে লাগল। বিদ্রোহীরা তার ইচ্ছা পূরণ করল, তাকে মুক্ত করে দিল, তখন সে ছুটতে লাগল, যেন সে নিজেকেই তাড়া করে চলেছে। একবার সে বেশ জোরালো বক্তৃতা দিল, বক্তৃতায় সে মানুষকে ঐ অত্যাচারীর কবল থেকে মুক্ত করার আশ্বাস দিল। এবারও মানুষ দেখল তারা কিভাবে বোকা বনতে পারে। সে জনতাকে নিয়ে চলল নিজেকেই ধ্বংস করার কথা দিয়ে। আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে জনতা সেই লোকটিকেই অনুসরণ করে চলল যাকে বিনাশ করতে চায় তারা সেই পলাতক কাপুরুষটির উপর অপবাদের অজস্র বোঝা চাপিয়ে সে নিজের মাথার জন্যেই বেশ মোটা অঙ্কের পুরস্কার ঘোষণা করে; এবং দ্বিতীয়বারের জন্যে আবার সে'ই কিনা হয়ে যায় একজন বাছাই-করা নায়ক যার আজ্ঞা সবাই পালন করতে ও তাকে অনুসরণ করতে রাজি হয়ে গেল। কিন্তু কেউই আসল ব্যাপারটা বুঝল না। খুব গোপনে সে দাঁড়ায় তার লম্বা আয়নার সামনে, সে নিজেকে দেখতে যেমন অবিকল সেই চেহারাটা সে দেখে ও দেখে আত্মহারা হয়ে যায়, এবং তখন তার পরবর্তী ছদ্মবেশ নিয়ে মহড়া দিতে আরম্ভ করে দেয়। একজন চিত্রতারকার মতন কিংবা একজন রিপোর্টারের মতন নিজের বিরুদ্ধে প্রচুর প্রচারপত্র বিলি করে অজস্র বিত্ত সঞ্চয় করার মতন এই কাজ।

দ্বিতীয় বার যখন তার বিরুদ্ধে হৈচৈ আরম্ভ হল ও তাকে খুঁজে বার

করার চেষ্টা আরম্ভ হল, তখন সে নতুন একটা প্ল্যান করল—সে ব'নে গেল এক সাধু। বনের মধ্যে এক কুঁড়ে-ঘরে সে উপবাস ক'রে ও প্রার্থনা ক'রে কাটায়। যে বোকা মানুষের দলকে কোনো মানুষের সাহায্য করার উপায় নেই, তারাই তার কাছে যায় পুণ্যসঞ্চয়ের জন্যে, তারা যায় এই দেবতুল্য ব্যক্তিটির কাছে। এবার সে তার চরম জয়ে জয়ী হয়, এখন সে তার খুশিমত এমন প্রতিজ্ঞা করতে পারে যা পালন করার কোনো দায় তার নেই।

টমাস মান্

টমাস মান্ (১৮৭৫-১৯৫৫) লিউবেকের এক সঙ্গতিসম্পন্ন উচ্চমধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান। ১৯০০ সাল থেকে তাঁর লেখক-জীবনের সূত্রপাত, লিখেই তিনি তখন থেকে জীবিকা অর্জন আরম্ভ করেন। ১৯৩৩ সালে তিনি চেকোস্লোভাকিয়ায় চলে যান, তার পর যান সুইজারল্যাণ্ডে ও পরে আমেরিকায়। যুদ্ধ শেষ হবার পর তিনি কয়েকবার জার্মানীতে আসেন, এবং ১৯৫২ সালে সুইজারল্যাণ্ডেই বসবাস স্থাপন করেন। এই শতকের জার্মানীর শ্রেষ্ঠ উপন্যাসকার হিসাবে তিনি গণ্য। মনস্তত্ত্বভিত্তিক বাস্তবতাকেই তিনি উপন্যাসিক ঐতিহ্য রূপে অনুসরণ করেন, এবং ব্যঙ্গ বিদ্রূপ ও শ্লেষ ইত্যাদি প্রয়োগ করে উপন্যাসকে আরও শ্রীমণ্ডিত করেন। বিশেষ করে তাঁর প্রথম দিকের রচনায় টমাস মান্-এর প্রধান বিষয়ই ছিল শিল্পীর ও মধ্যবিত্তশ্রেণীর মধ্যে তুলনামূলক বিশ্লেষণ, এবং সাধারণভাবে তিনি শিল্পের ও আধ্যাত্মিক পরিশুদ্ধির প্রবণতাকেই সর্ববিধ ব্যাধির ও অবনতির কারণ বলে বর্ণনা করেছেন। তিনি জ্ঞানবুদ্ধির সুউচ্চ স্তরে দাঁড়িয়ে সময়ের গতি পর্যবেক্ষণ করেছেন, এবং ইউরোপের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের মূল্য নিরূপণ ক'রে তিনি ক্ষয়িষ্ণুতার পর্যবেক্ষক থেকে সুদৃঢ় মানবিকতাবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠেছেন। এই শতকের প্রথম দিকে তিনি রাজনৈতিক ব্যাপারে নিজেকে জড়িত না ক'রে বেশ নীরবই ছিলেন, তারপর তিনি কঠোর ভাবে ন্যাশনাল সোশ্যালিজম মতবাদের বিরুদ্ধে দাঁড়ান ও গণতান্ত্রিক জীবনযাত্রার পদ্ধতির প্রতি তাঁর সমর্থন জানান। "বুডেনব্রুকস" ছাড়া তাঁর অন্যান্য উল্লেখযোগ্য উপন্যাস হচ্ছে "দি ম্যাজিক মাউনটেন" (১৯২৪), "জোসেফ অ্যাণ্ড হিজ ব্রাদার্স" (১৯৩৩-১৯৫৩), এবং "ডক্টর ফাউসটাস" (১৯৪৭)।

বুডেনব্রুকস

টমাস মান্-এর উপন্যাস "বুডেনব্রুকস" (১৯০১) একটি অতিরিক্ত শিরোনাম-ভূষিত, সেটি হচ্ছে "একটি পরিবারের ক্ষয়"। চারটি পুরুষের কাহিনী এতে লিপিবদ্ধ। লুবেকের একটি বণিক-পরিবারের কথা এতে বলা হয়েছে। তাদের আত্মবিশ্বাসের ও উদ্দীপনাময় জীবন থেকে আরম্ভ করে তাদের অযোগ্য ও অপটু জীবনে পরিণতি পর্যন্ত। শেষ পরিণতির সময়ে মধ্যবিত্ত সমাজ থেকে তারা একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। তরুণ হ্যান্নো বুডেনব্রুক হচ্ছে সেই চরিত্র যার মধ্যে দিয়ে এটি দেখানো হয়েছে। তাঁর মধ্যে শিল্পী-গুণ আছে প্রভূত পরিমাণে, সে স্পর্শকাতর ও বড়ই অভিমানী। একটি বলিষ্ঠ মধ্যবিত্ত পরিবারের এই-যে অধঃপতন ঘটল তার মূল কারণ হচ্ছে জ্ঞানবুদ্ধির বিপুল বিকাশ ও শিল্পের প্রতি প্রবণতা। একটি পরিবারের এই অদৃষ্টের যে কথা টমাস মান্ বলেছেন সেইটেই সাধারণভাবে হচ্ছে ঐতিহাসিক ও সামাজিক বিবর্তনের কারণ, এবং সেইটেই হচ্ছে শহরবাসীর জীবন থেকে মধ্যবিত্ত জীবনে রূপান্তরেরও সমাজনৈতিক হেতু। এ সম্বন্ধে অনেক পরে, ১৯৫০ সালে, লেখক যে মন্তব্য করেন তা এই : "আমি আমার ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনের অভিজ্ঞতাকেই উপন্যাসে রূপ দিয়েছি,···অবশ্য এ কথা আমি তখন ভাবিনি যে একটা মধ্যবিত্ত-পরিবারের এ রকম ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার বিবরণ দেওয়ার মধ্য দিয়েই আমি আরও অনেক ছিন্নবিচ্ছিন্নতার কথাই বলে ফেলেছি, এবং বস্তুত পক্ষে আমাদের সাংস্কৃতিক ও সামাজিক বিবর্তনের ইতিহাসের চরম কথাটিও বলা হয়ে গিয়েছে।" আমাদের উদ্ধৃত অংশে আমরা দেখতে পার, উচ্চমধ্যবিত্তশ্রেণীর ঐ পরিবারের দ্বিতীয় ধাপের একজন কনসাল জীন বুডেনব্রুককে ; টনির বাপ-মা তাদের এক মেয়ের জন্যে পাত্রের সন্ধান করছেন। বাহ্যিক অনেক ব্যাপারই সব বিষয়ের উপর বিশেষ প্রভাব ফেলে থাকে, কিন্তু অল্পবয়সী ছেলেমেয়েদের মনের ভাব সেখানে কোনো আমোল পায় না।

কয়েকদিন পরে বেড়িয়ে ফিরে আসার সময় মেং স্ট্রীটের মোড়ে গ্রূনলিশের সঙ্গে দেখা হল টনির। গ্রূনলিশ বলল, 'সেদিন তোমার সঙ্গে দেখা না-হওয়ায় আমি খুবই দুঃখিত হয়েছি, মিস। আমি সেদিন তোমার মাকে আমার শ্রদ্ধা জানাতে গিয়েছিলাম। কিন্তু তুমি তখন ছিলেনা, এজন্যে আমার

যে কত আক্ষেপ হয়েছে তা প্রকাশ করা কঠিন। এখন এখানে তোমার সঙ্গে দেখা হওয়ায় খুবই আনন্দ পেলাম।'

কুমারী বুডেনব্রুক চুপ করে তার কথা শুনছিল। তার আধ-চোখা চোখ তুলে সে গ্রুনলিশের দিকে তাকাল, কিন্তু তার দৃষ্টি ওর বুক পর্যন্তই মাত্র গেল। একটি মেয়ে একটি ছেলেকে পরিমাপ করে নেয় বা প্রত্যাখ্যান করে যে ভাবে টনির ঠোঁটে সেই রকম একটা বিদ্রূপের ভঙ্গি ফুটে উঠল। তার ঠোঁট একটু নড়ল, কিন্তু সে কী কথা বলবে! সে কথা এমন হতে পারে যাতে হের্ বেনডিক্স গ্রুনলিশের পাঁজর একেবারে ভেঙে যেতে পারে, ও সে শেষ হয়ে যেতে পারে। কথাটা এমন সাজিয়ে-গুছিয়ে বলতে হবে যাতে ও একেবারে আহতও যেমন হবে তেমনি মর্মান্তিক ভাবে বুঝতে পারবে সব ব্যাপারটা।

তার বুক পর্যন্ত তাকিয়ে টনি বলল, 'এ আনন্দটা দু পক্ষের নয়, হের্ গ্রুনলিশ।' এই বিষ-বাণটি ছাড়ার পর সে তাকে ফেলে রেখে একেবারে বাড়িতে চলে গেল, তার মাথা যেন ফাঁকা মনে হচ্ছে, সে যে কথাটা এমন সহজ ভাবে বলতে পেরেছে এজন্যে সে গর্ব বোধ করতে লাগল। সে শুনল আগামী রবিবারে হের্ গ্রুনলিশকে নৈশভোজে নিমন্ত্রণ করা হয়েছে। তার আগেই সে কথাটা বলে ফেলতে পেরেছে এটা তার বাড়তি আনন্দ।

সে সেদিন এল। সে নতুন ফ্যাশানের জামা পরে আসেনি, একটা বেশ সুন্দর ফ্রক-কোট পরেই এসেছে, সেটা অবশ্য একটু কোঁচকানো; তবুও তাকে বেশ রাশভারি ও মান্যলোকের মতই দেখাচ্ছিল। তার মুখ বেশ তাজা ও হাসিখুশি, মাথায় টেড়ি কাটা গোঁফ পাকানো ও গন্ধদ্রব্য-মাখা। সে বেশ পরিতৃপ্তির সঙ্গে খেল মাছ, সুপ, মাখন-মাখানো কফি ও আলুর সঙ্গে বাছুরে মাংস-ভাজা, পুডিং ইত্যাদি। যখন মিষ্টান্ন দেওয়া হল তখন সে তার চামচ তুলে দরজার পর্দার কারুকাজের দিকে চেয়ে নিজের মনেই বলল, 'মাপ করবেন। আমি যথেষ্ট খেয়ে ফেলেছি। কিন্তু পুডিং—অপূর্ব হয়েছে! আমি আর-এক টুকরো পুডিং দিতে অনুরোধ করব—' এই কথা বলে সে কনসালের স্ত্রীর দিকে একটু ধূর্তের মতন তাকাল। কনসালের সঙ্গে সে ব্যবসা ও রাজনীতি নিয়ে বেশ গলা ছেড়ে ও মাতব্বরের মত কথা বলতে লাগল। কনসালের সঙ্গে সে থিয়েটর নিয়ে ও ফ্যাশন নিয়ে আলোচনা করতে

লাগল; টম, ক্রিস্টিয়ান ও ক্লোথিলডে এবং এমনকি ক্লারা ও ইডা জুংমান্ সম্বন্ধেও বেশ ভালো-ভালো কথা বলতে লাগল। টনি চুপচাপ বসে রইল; টনিকে ওর মধ্যে জড়িত করতে চাইল না গ্রুনলিশ; মাঝে মাঝে তার দিকে অবশ্য তাকাতে লাগল; কখনো তার মুখে হতাশা কখনো-বা উৎসাহ ফুটে উঠতে লাগল।

গ্রুনলিশ যখন সেদিন বিদায় নিল তখন সে টনির সঙ্গে তার প্রথম দেখা হবার সময় তার মনে যে ছাপ পড়েছে, সেই ছাপটাই যেন আরও স্পষ্ট করে পেয়ে গেল। 'বেশ ভালো বংশের ছেলে।' বললেন কনসালের স্ত্রী 'একজন প্রশংসার যোগ্য খ্রীষ্টান ভদ্রলোক।' বললেন কনসাল। ক্রিশ্চিয়ান তার কথা বলার ভঙ্গি আগের থেকে আরো ভালো অনুকরণ করতে পারল। টনি ভ্রূ একটু কুঁচকে সবার কাছ থেকে বিদায় নিল, তার মনে হল এই ভদ্রলোকটি তার বাপ-মায়ের মন বেশ সহজেই ও খুব অল্পসময়ের মধ্যেই জয় করে নিয়েছে বটে, কিন্তু এখনো ভদ্রলোকটির শেষ তার দেখা হয়নি।

তার মেয়েবন্ধুদের সঙ্গে দেখাশুনা করে একদিন সন্ধ্যাবেলা বাড়িতে ফিরে টনি দেখল নানাচিত্রে সাজানো ঘরটায় বসে গ্রুনলিশ তার বাবাকে সার্ ওয়ালটার স্কটের 'ওয়েভারলি' পড়ে শোনাচ্ছে। তার উচ্চারণ বেশ ভালো, এর কারণ আছে, সে বলল ব্যবসায়-সংক্রান্ত কাজে তাকে যেতে হয়েছিল ইংলণ্ডে। আর-একটি বই হাতে নিয়ে টনি একটু তফাতে বসল, তখন হের্ গ্রুনলিশ তাকে আস্তে জিজ্ঞাসা করল, 'আমাদের বইটি তোমার বুঝি পছন্দ নয়, ফ্রাউলিন?' এর উত্তরে সে মাথা একটু ছুটিয়ে একটু বিদ্রূপের ভঙ্গিতেই বলল, 'না। একটুও না।'

এতে থতমত খেল না গ্রুনলিশ। বহুপূর্বে-মৃত তার বাবা-মার কথা সে বলতে লাগল, এবং জানাল যে তার বাবা ছিলেন একজন পাদ্রী, একজন খ্রীষ্টান, ও একজন বিশ্বনাগরিক-গোছের মানুষ। এই সাক্ষাতকারের পর সে চলে গিয়েছিল হামবুর্গে। সে যখন বিদায় নিতে এসেছিল টনি তখন সেখানে ছিল না। সে জুংমানকে বলল, 'ইডা, লোকটা চলে গিয়েছে।' উত্তরে সে বলল, 'দেখতেই পাচ্ছ, বাছা।'

আট দিন পরে আবার প্রাতরাশের ঘরে এই দৃশ্যের অবতারণা হল। নটার সময় সেখানে টনি দেখল তার বাবা ও মা টেবিলে বসে আছেন। তার কপালে চুমো খাবার জন্যে সে মাথা নত করে তাঁদের কাছে দাঁড়াল; তার

পর বসল। বেশ ক্ষিদেও পেয়েছে। ঘুমে তার চোখ তখনও লাল। সে চিনি মাখন পনির নিয়ে নিল।

তোয়ালের মধ্যে ডিম নিয়ে চামচ দিয়ে সেটা ভাঙতে-ভাঙতে টনি বলল, 'তোমাকে এখানে পেয়ে কী ভালোই লাগছে, বাবা।'

'আজ আমি আমাদের ঘুম-কাতুরেটার জন্যে অপেক্ষা করছিলাম।' বললেন কনসাল। তিনি ধূমপান করছিলেন ও ভাঁজকরা খবরের কাগজ দিয়ে টেবিলে টোকা দিচ্ছিলেন। তাঁর স্ত্রী ধীরে-ধীরে খাওয়া সেরে নিয়েছেন, এখন তিনি সোফায় গা এলিয়ে দিয়েছেন।

কনসাল বলতে লাগলেন, 'টিলডা এখন রান্না ঘরে ব্যস্ত। অনেক আগেই আমি কাজ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়তে পারতাম। কিন্তু আমাদের মেয়েটির ব্যাপারে একটা জটিল বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনা আরম্ভ করায় এখনো কাজে যেতে পারি নি।'

টনির মুখ তখন রুটি-মাখনে ভরা, প্রথমে সে বাবার দিকে তারপর মায়ের দিকে তাকাল। তার চোখে ভয় ও কৌতূহলের ছাপ।

কনসাল বললেন, 'তুমি খেতে থাক, বাছা।' কিন্তু টনি তার ছুরি রেখে দিয়ে চেঁচিয়ে বলে উঠল, 'কি কথা তা শিগগির বলে ফেল বাবা, শিগগির বলো।' তার বাবা কেবল বললেন, 'তুমি খাওয়াটা আগে সেরে নাও।'

টনি খেয়ে নিল ডিম মাখন পনির ও কফি। তার ক্ষিদে এবার গিয়েছে। সে অনুমান করার চেষ্টা করতে লাগল—কি কথা। তার গাল থেকে সকালের প্রসন্ন প্রলেপ মুছে গেছে, তার মুখ যেন একটু পাণ্ডুর হয়েই এল। তারপর সে মধু খেয়ে নিয়ে জানাল তার খাওয়া হয়ে গিয়েছে।

কনসাল বলল, 'তোমার সঙ্গে যে কথা বলতে চাই তা এই চিঠিতে আছে।' খবরের কাগজের বদলে এখন একটা বড় নীল খাম দিয়ে তিনি টেবিল বাজাতে লাগলেন। বললেন, 'সংক্ষেপে বলি—বেনডিক্ট গ্রুনলিশ একটা বেশ চমৎকার ও ভালো ছেলে। আমরা তাকে বেশ ভালো ভাবেই চিনে নিয়েছি। সে লিখছে যে, আমাদের মেয়েটির প্রতি তার বেশ টান হয়েছে, এবং বিবাহের জন্যে সে এই প্রস্তাব পাঠিয়েছে। এ বিষয়ে আমাদের মেয়েটির মত কী?'

টনি গা এলিয়ে বসে ছিল, মাথা নোয়ানো ছিল, একটা রিং সে তার ডান হাত দিয়ে অযথাই পাক খাওয়াচ্ছিল। হঠাৎ সে সোজা হয়ে বসল, তার

চোখ জলে ভরে এল। বিপন্ন সে, তার গলা শুনে তাই মনে হল, সে বলল, 'আমার কাছ থেকে লোকটা কী চায়? তার আমি কী ক'রেছি।' একথা বলে সে কেঁদে উঠল।

কনসাল তাঁর স্ত্রীর দিকে তাকালেন। তার পর খুব শান্ত ভাবে তাঁর মেয়েকে বললেন, 'শোনো। এমন বিচলিত হলে কেন। তুমি জান তোমার বাবা-মা তোমার ভালোই চান। তোমাকে যে মর্যাদা দেওয়া হচ্ছে তা তুমি প্রত্যাখ্যান করবে—এ পরামর্শ তাঁরা তোমাকে দিতে পারেন না। আমি জানি ওর প্রতি এখনো তোমার কোনো আকর্ষণ জন্মায় নি, কিন্তু ধীরে-ধীরে তা আসবে। আমি তোমাকে জোর দিয়ে বলছি এতে সময় লাগে, কিন্তু তা আসে। তুমি যে কী চাও তা তুমিই জান না। তোমাদের বয়সী মেয়েদের এমন হয়। হৃদয়ের মতন মনও এখন বিক্ষিপ্ত থাকে। হৃদয়কেও কিছু সময় দিতে হবে; আর মনকে রাখতে হবে খোলা—অভিজ্ঞ লোকদের উপদেশ যাতে গ্রহণ করতে পারে ঐ মন। কেননা, তাঁরা তো তোমার মঙ্গলই চান।'

'আমি তার বিন্দুবিসর্গ কিছু জানিনে,' টনি বিরক্তির সঙ্গে বলতে লাগল, ডিমের দাগ-লাগা তোয়ালে দিয়ে মুছতে লাগল চোখ, বলল, 'আমি তার সম্বন্ধে যা জানি তা হচ্ছে ছাগলের মতন হলদে দাড়ি আছে তার, আর বেশ ফলাও ব্যবসা করে।' তার উপর-ঠোঁট কাঁপতে লাগল, এখনি বুঝি কান্নায় ভেঙে পড়বে; দৃশ্যটা বড়ই করুণ।

খুব একটা মমতার ভঙ্গি দেখিয়ে কনসাল তাঁর চেয়ারটি টনির কাছে একটু টেনে নিয়ে তিনি মৃদু হেসে তার মাথায় হাত দিলেন।

'বলো তো লক্ষ্মীসোনা', বলো তো টনি, 'তুমি তার সম্বন্ধে কী জানতে চাও। তুমি এখনো একটা ছোট্ট মেয়ে, বুঝলে? চার সপ্তাহের জায়গায় সে যদি বাহান্ন সপ্তাহ এখানে না থাকে তাহলে এর চেয়ে ভালো করে তাকে জানবে কী ক'রে? তুমি এখনো খুবই ছোট, পৃথিবী চেনার মতন চোখই হয়নি, এইজন্যে যাঁরা তোমার ভালো চান, তাদের কথায় তোমার বিশ্বাস রাখতে হবে।'

অসহায়ের মতন ফোঁপাতে-ফোঁপাতে টনি তার বাবার হাতের উপর মাথা রেখে বলল, 'আমি বুঝতে পারছিনে, আমি বুঝতে পারছিনে। সে আসে, এবং সবার সম্বন্ধে মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে, তার পর চলে যায়। তারপর

তোমাকে লেখে যে, সে - লেখে যে, আমি—কিছুই আমি বুঝতে পারছিনে! এমন সে কেন করছে? তার আমি কী করেছি?'

কনসাল আবার হাসলেন। 'এ কথা তুমি আগেও বলেছ, টনি। এতেই তোমার শিশুদের মতন মনের পরিচয় পাচ্ছি। আমার মেয়েটির জানা উচিত যে, কেউ তার উপর জোর খাটাতে চায় না, কেউ তাকে কষ্ট দিতে চায় না। আমরা বেশ শান্তভাবে বিষয়টা বিবেচনা করে দেখতে পারি; আর, এটা এখন যখন গুরুতর ব্যাপার তখন তো বেশ ধীর-স্থির ভাবে ভেবেচিন্তে দেখতে হবেই। ইতিমধ্যে হের্ গ্রুনলিশের চিঠির একটা উত্তর দিয়ে দেব, তাতে তার প্রস্তাবে রাজির কথাও বলব না, অরাজির কথাও বলব না। অনেক ভাববার কথা আছে; একথায় সবাই রাজি তো? তুমি কি বলছ? এখন তোমার বাবা নিশ্চয় তাঁর কাজে যেতে পারেন, কি বল? এবার চলি, বেটসি?'

'এসো প্রিয় জীন।'

তার মা তাকে বললেন, 'আর-একটু মধু নাও, টনি।'

টনি চুপ করে মাথা নীচু করে বসে ছিল। তার মা বললেন, 'খাও। খেতে তো হবে।'

টনির চোখের জল ক্রমে শুকিয়ে এল। ভাবতে ভাবতে তার মাথা গরম হয়ে উঠেছে। হা ভগবান! কী সব কাণ্ড! সে অবশ্য জানত যে একদিন তাকে বিয়ে করতে হবে, একজন ব্যবসায়ীরই স্ত্রী সে হবে, আর একটা বেশ পাকাপোক্ত সুবিধাজনক বিবাহিত জীবনই তার আসবে, তার পারিবারিক মর্যাদার সঙ্গে যার নাকি খাপ খায়। কিন্তু হঠাৎই, তার জীবনে এই প্রথম, এই রকম সত্যিকারের একটা মানুষ তাকে কিনা বিয়ে করতে চায়! এ'তে মানুষের মনে কীরকম ভাব হবার কথা! এখন এই টনি বুডেনব্রুকের পক্ষে সেইসব কথাই লাগসই হয়ে দেখা দিচ্ছে যে ভয়ানক-ভয়ানক কথা এতদিন সে পড়েছে কেবল বইতে। তার 'হাত', তার 'সম্মতি' 'যতদিন জীবন থাকবে'! হায় ভগবান, এখন এ বিষয়ে কোন্ পথ নিতে হবে?

'আর মা, তুমিও কি ঐ কথা বলো—আমাকে—আমার সম্মতি দিতে হবে?' এ কথা বলার সময় 'আমার সম্মতি' কথাটা বলতে সে থতমত খেল। এটা যেন বেশ লম্বা কথার মতন ও বড়ই বিশ্রী শোনাল তার কাছে। কিন্তু এমন-একটা পরিচ্ছন্ন ভাষা এই বুঝি সে প্রথম ব্যবহার করল। তার আত্ম-

সংযমের অভাবের জন্যে যে সংকোচ বোধ করতে লাগল। দশ মিনিট আগে তার যেমন মনে হয়েছিল, এখনো তার হের্ গ্রুনলিশকে বিবাহ করার কথাটা তার চেয়ে কম যুক্তিহীন মনে হচ্ছে না। কিন্তু যে মর্যাদা সে পেয়ে যাবে সে কথা ভাবতে তার অবশ্য ভালোই লাগছিল।

'আমি তোমাকে রাজি হয়ে যেতেই বলছি, বাছা। তোমার বাবা তোমাকে এ কথা বলেন নি। তোমাকে অরাজি হতে তিনি মানা করেছেন—এই মাত্র। এরকম কথা না বলা আমাদের দায়িত্ববোধের অভাবই বোঝাবে। শোনো লক্ষ্মীটি, তোমার কাছে যে যোগাযোগের সুযোগ এসেছে তা খুবই ভালো। তুমি বেশ মানমর্যাদা নিয়ে হামবুর্গে যাবে, আর সেখানে বেশ স্টাইলে বাস করবে।'

টনি নিশ্চল হয়ে বসে রইল। তার ঠাকুরদার ঘরে যেমন আছে সেই রকম সিল্কের পর্দার ছবি ফুটে উঠল তার চোখে। আর, ম্যাডাম গ্রুনলিশ হয়ে সে কি সকালবেলা চকোলেট পান করবে? এসব কথা জিজ্ঞাসা করা ঠিক হবে না, সে ভাবল।

তার মা বলতে লাগলেন, 'তোমার বাবা তো বললেন যে ভেবে দেখার সময় পাবে। কিন্তু তোমাকে বলতে বাধ্য হচ্ছি এ রকম সুযোগ রোজ আসে না, এতে তোমার ভাগ্য খুলে যাবে, বিয়ে করলে এই রকম বিয়েই করতে হয়। এ কথা তোমাকে বলা আমার কর্তব্য। আজ তোমার কাছে যে পথ খুলে গিয়েছে এইটেই তোমার জীবনপথ, এই পথই তোমার নেওয়া উচিত।'

টনি কি-যেন ভাবছিল, বলল, 'হ্যাঁ।' তাদের পরিবার সম্বন্ধে তার দায়িত্ব সম্বন্ধে সে সচেতন। তার পরিবার নিয়ে সে গর্বিতও। তাদের পারিবারিক ইতিহাস সে মন্থন করেছে। সে, টনি বুডেনব্রুক, সে হচ্ছে কনসাল বুডেনব্রুকের মেয়ে, শহরের পথ দিয়ে সে যেত সম্রাজ্ঞীর মতন, তখন রাস্তার পোর্টার মাথার টুপী নামিয়ে, মাথা নীচু ক'রে তাকে অভিবাদন করত। রস্টকের দর্জি বেশ ভালোভাবেই তার কারবার আরম্ভ করে; কিন্তু দেখতে-দেখতে তার ভাগ্যই একেবারে ফিরে যায়, প্রভূত উন্নতি করে সে। টনিরও কর্তব্য আছে। যে ভাবে সে পারে সেইভাবে তাদের পরিবারের মান-মর্যাদা সে বাড়াবে—এক ধনীর সঙ্গে, এক অভিজাত ব্যক্তিকে বিয়ে ক'রে। এই উদ্দেশ্যেই টম কাজ নিয়েছে আপিসে। হ্যাঁ, এই বিয়েটা নিঃসন্দেহেই একটা সংগত পন্থা। কিন্তু—কিন্তু—টনি যেন তার চোখের

সামনে দেখতে লাগল ঐ লোকটাকে, তার হলুদ রঙের সোনালি গোঁফ, তার লালচে হাসিহাসি মুখ, তার নাকের ডগার আঁচিল, ও তার হাঁটার অদ্ভুত ভঙ্গিটা। সে যেন অনুভব করতে লাগল তার উলের পরিচ্ছদ, যেন শুনতে লাগল তার মৃদু গলা...

মা বললেন, 'আমরা শান্তভাবেই বিবেচনা করব। আমরা কি ইতিমধ্যে কিছু ঠিক করে ফেলেছি ?"

'ও, না, না, না।' হঠাৎ বলে উঠল টনি। 'ও' শব্দটা সে বেশ তিক্ততার সঙ্গেই বলে উঠল। বলল, 'কী বিশ্রী ব্যাপার! তাকে বিয়ে করতে যাব কেন ? আমি তাকে নিয়ে কেবল ঠাট্টাবিদ্রূপই করেছি, ব্যঙ্গই করেছি। এ ছাড়া কিছুই করি নি। আমি বুঝতে পারছি নে, সে আমাকে সহ্য করবে কী ক'রে। লোকটার অস্থিমজ্জায় একটু দম্ভ থাকা দরকার।'

সে রুটির উপর মধু ঢালতে লাগল।

শিলার সম্বন্ধে শেষ রচনা

১৯৫৫ সালে শিলারের সার্ধশতবার্ষিক স্মরণ উপলক্ষে টমাস মান্ স্টাটগার্টে ও ভেইমারে ভাষণ দেন; এই বছরেই টমাস মান্-এরও মৃত্যু ঘটে। তাঁর সেই ভাষণের শেষ অংশ এখানে উদ্ধৃত হচ্ছে। এতে শিলারের মহত্ত্বের কথা ও তাঁর বাণীর চিরন্তন মূল্যের কথা বলা হয়েছে; এ'তে টমাস মান্ সম্বন্ধেও অনেক ধারণা পরিষ্কার হয়েছে, শিলার যাকে মানবপ্রেমিক বলেছেন, টমাস মান্ সেই অর্থে মানবপ্রেমিক রূপে উদ্ভাসিত হয়েছেন। দুইটি বিশ্বযুদ্ধের পরও মানবজাতির বোধ জাগ্রত হল না ব'লে তিনি এখানে মানবজাতির কাছে আবেদন জানিয়েছেন ও তাকে সতর্কও করে দিয়েছেন। আমাদের কালে সর্বজনীন মানবিকতাবোধ একান্ত দরকার, এর দ্বারাই আত্মঘাত থেকে মানবজাতির মুক্তি হতে পারে।

সাত বছর পরে, যখন তিনি 'ভ্যালেনস্টাইন' রচনা করছেন তখন তিনি ভিলহেলম্ ফন হামবোলড্ট-কে লেখেন, "এ কথা সত্য যে আমি যে পথ ধ'রে চলেছি সে পথ আমাকে গেটের এলাকায় নিয়ে গিয়ে হাজির করবে। সেখানে গিয়ে আমাকে তাঁর উপযুক্ত প্রতিযোগী হতে হবে। এ কথা না বললেও চলে যে, তাঁর কাছে পরাজিত আমাকে হতেই হবে। কিন্তু, এ সত্ত্বেও একটা কথা বলার আছে—আমার মধ্যে এমন কিছু আছে যা আমার

নিজস্ব, যা গেটে কখনোই অর্জন করতে পারবেন না ; তিনি আমার থেকে শক্তিমান বলেই আমার বা আমার রচনার কোনো ইতরবিশেষ ঘটবে না। এর দ্বারাই, আমার মনে হয়, হিসাবের বেশ মিল হয়ে যাবে। আমার মনে যখন একটু বল আসে তখন আমি দৃঢ় ভাবে বিশ্বাস করে ফেলি যে, সমালোচকেরা আমাদের মধ্যের পার্থক্যটা দেখিয়ে দিতে পারেন, কিন্তু দুজনের রচনাশৈলীর একটিকে উপরে বা নীচে বসাতে পারেন না ; কিন্তু পাশাপাশি বসিয়ে উচ্চাদর্শের নমুনা হিসাবে দাখিল করতে পারেন।" নিজেকে উপযোগী করে তুলতে দীর্ঘকাল ধ'রে অস্বীকার করার সময় শিলার যে সত্যিই নিজেকে উপযুক্ত করে তুলেছিলেন এই উক্তিই হচ্ছে তার সংক্ষিপ্ত প্রমাণ। গেটের কথাও প্রায় এই রকমই, তিনি বলেছেন, "শিলার বড়, না, আমি বড়—এ কথা নিয়ে জার্মানরা খুব কলরব করে থাকেন। কিন্তু তাদের খুশি হবার কথা এই কথা ভেবে যে, দুজন জার্মান সন্তান আছেন যাদের নিয়ে কলরব করা যায়।" কিন্তু গেটের কাছে মৃত শিলার যা হতে পেরেছিল, শিলারের কাছে গেটে তা হতে পারেন নি, সেটি হচ্ছে পবিত্র মূর্তি। গেটের জীবনের শেষ দিকে তাঁর পুত্রবধূ ওটিলাই মন্তব্য করেছিলেন যে, শিলারকে অনেক সময় তাঁর বিরক্তিকর মনে হয়। এ কথা শুনে গেটে মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে বলেছিলেন, "তুমি এতই পৃথিবীর সঙ্গে আবদ্ধ, এতই পার্থিব ব্যাপারে জড়িত যে, তার নাগাল তুমি পাবে না। তুমি দুঃখী।"

গেটে তাঁর শেষ জীবনে যে ভর্ৎসনা জানিয়ে গিয়েছেন সে কথা মনে রেখে আজ আমরা এখানে উপস্থিত। তাঁর মৃত্যুশয্যার পাশে শিলার যদি থাকতেন এজন্যে ব্যাকুলতা জানিয়েছিলেন গেটে, আমাদের সতর্ক থাকতে হবে, আমরা যেন পার্থিব ব্যাপারে আত্মহারা হয়ে নিজেদের দৈন্য প্রকাশ করে না ফেলি। শিলারের স্মৃতিরক্ষার বিষয়ে আমরা যেন ভুল পথে চালিত না-হই ও ভুল সিদ্ধান্ত না-নিই। আমরা যেন মনে না করি যে, আমাদের কালের সঙ্গে তাঁর সুর খাপ খাচ্ছে না, তিনি সেকেলে, আমাদেরকে বলার তাঁর আর কিছু নেই। এই যে মনোভাব—এইটেই আসলে সেকেলে। তাঁর রচনা সম্প্রতি পুনরায় পাঠ করে আমার মধ্যে তীব্র অনুভূতির সঞ্চার হয়েছে। যিনি তাঁর নিজের ব্যাধিকে পুরোপুরি করায়ত্ত করতে পেরেছিলেন' তিনি আমাদের এই ব্যাধিগ্রস্থ যুগটার উপযুক্ত চিকিৎসক হবার যোগ্য। তাঁর রচনা পাঠ করলেই তা বোঝা যাবে।

কোনো জীব অসুস্থ হয়ে পড়তে পারে, ক্ষয় হয়ে যেতে পারে তার শরীরে কোনো বিশেষ উপাদানের বা ভিটামিনের অভাবে। মনে হয় এই অপরিহার্য উপাদানই হচ্ছে "শিলার"। আমাদের সমাজ শরীরে যার মারাত্মক অভাব ঘটেছে। আমি যখন তাঁর "পাবলিক অ্যানাউন্সমেণ্ট অব দি হোরেন" পুনর্পাঠ করি, তখনই আমার এই কথা মনে হল। সেই অদ্ভুত গদ্যরচনাটিতে তিনি এমন আইডিয়া প্রকাশ করেছেন যা তাঁর কালেও হয়তো সেকেলে মনে হয়ে থাকবে, কিন্তু সেই সময়েরই দুঃখদুর্দশা নিয়ে তিনি অদ্ভুত উপায়ে অনেক কথা বলেছেন। তিনি তাকে সেই সময়ের কথা বলেছেন যখন "আসন্ন যুদ্ধের হুংকার আমাদের দেশকে সচকিত করে তুলেছে, যখন রাজনৈতিক দলের অন্তর্দ্বন্দ্ব ও স্বার্থের সংঘাত প্রত্যেক গোষ্ঠীর মধ্যে ঐ একই যুদ্ধের বীজ বপন করছে, তখন এই রাজনৈতিক বিবাদের সর্বব্যাপ্ত দৈত্যের হাত থেকে আর পরিত্রাণ নেই। কথাবার্তা বলেও নয়, লেখালেখি করেও নয়।" তিনি বলেছেন, বর্তমানের এই তুচ্ছ রেষারেষির ব্যাপার, কারারুদ্ধ করা, মানুষের মনকে পিষে মারা ইত্যাদি বাড়তে থাকবে, মানুষের মনকে উন্নত ও সর্বজনীন বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট করে তাকে মুক্ত ক'রে আনা ততই অবশ্য করণীয় কাজ— এ হচ্ছে মানবতাবোধ, এ হচ্ছে পার্থিব প্রভাব থেকে অনেক উৎকৃষ্ট। তিনি বলেছেন, রাজনৈতিকভাবে বিভক্ত বিশ্বকে একই পতাকা-তলে সমবেত করতে হবে। সে পতাকা হচ্ছে সত্যের ও সৌন্দর্যের। কোনো ঘটনায় যাদের মন কখনো উত্তেজনায় অধীর বা হতাশায় কাতর হয়ে পড়বে সেই সব পাঠকের মনে সান্ত্বনার বাণী ও মুক্তির আশ্বাস আনাই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। কোনো রাজনৈতিক সংঘাতের মধ্যেও তাঁর রচনা কঠোর কুঠার হয়ে উঠেছে, কখনো হালকা-ভাবে কখনো-বা কঠিনভাবে তিনি ব্যক্ত করেছেন তাঁর অভিমত। তাঁর এই পত্রিকায় কোনো দলের হয়ে কথা বলা একেবারে নিষিদ্ধ ছিল। বর্তমান বিশ্বের ঘটনার কথা এতে থাকত না, এবং অদূর ভবিষ্যতে মানবজাতির দশাই-বা কী হবে, তার কোনো উল্লেখ না করে, অতীত সম্বন্ধে জানবার জন্যে ইতিহাসের আশ্রয় নেওয়া হত, ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে জানবার জন্যে দর্শনের। উন্নত ও আদর্শস্থানীয় মানবতাবোধেরই পীঠস্থানরূপে গণ্য হবে এটি, যুক্তির দ্বারা যা স্পষ্টই প্রমাণিত হয়েছে, কিন্তু হায়, জীবনে যা সত্য হয়ে উঠল না। উত্তম আইডিয়া, নিখুঁত নীতি ইত্যাদির উপরেই পৃথিবীর মঙ্গল নির্ভর করে। সুতরাং "সৌন্দর্য ও

শৃঙ্খলা, ন্যায়বিচার ও শান্তি, এই পত্রিকার এইটেই হচ্ছে মূলকথা; মূল বক্তব্য।"

এ রকম প্রচেষ্টাকে আমরা যেন দুর্বল সৌন্দর্যবাদ না বলি, এবং আজকাল যাকে বলা হয় পলায়নবাদ, তার সঙ্গে যেন এর তুলনা না করি। একটি জাতির মনে নীতিবোধ ও সাংস্কৃতিক চেতনা জাগ্রত করতে পারলে, এবং তার মনে বোধ ও বুদ্ধি ও বোধ উদ্রিক্ত করতে পারলেই সেই জাতি বুঝবে যে, অন্য দেশে, ভিন্ন ঐতিহাসিক পরিবেশে, অন্যপ্রকার আদর্শে ও সামাজিক অবস্থায় যারা বাস করে, তারাও প্রত্যেকে মানুষ। এটা বাস্তবতা থেকে পলায়ন নয়। মানবিকতার জন্যে কাজ করা, সৌন্দর্য ও শৃঙ্খলার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ, ন্যায়বিচার ও শান্তি প্রার্থনা করা, এবং পারস্পরিক দ্বন্দ্ব না চাওয়া, ভাঁহা মিথ্যার প্রশ্রয় না দেওয়া ও ঘৃণা পরিহার করা—এসব কি অলস সৌন্দর্যতত্ত্বের মধ্যে গিয়ে আত্মগোপন? আত্মগোপন তো নয়ই, এইটিই হচ্ছে জীবনের সঙ্গে অন্তরঙ্গতম নিবিড়তা, এটা হচ্ছে মানুষের চিত্তকে মুক্ত করে উদ্বেগ ও ঘৃণা থেকে মানুষকে পরিত্রাণ দেবার জন্যেই একটা ধর্মযুদ্ধ-বিশেষ। তবুও শিলার তাঁর বাগ্মিতার ও কবিত্বশক্তির মধ্যে দিয়ে যে সর্বজনীনতার ও বিশুদ্ধ মানবিকতাবোধের স্বপ্নের কথা প্রকাশ ও প্রচার করেছেন তা একটা নিস্প্রাণ আদর্শ, বাসী, সেকেলে ও অপ্রচলিত বলে তাঁর কাল মনে করেছিল। সে সময়ে যা নতুন, প্রয়োজনীয়, জীবন্ত ও কার্যকর বলে সেই যুগ মনে করেছিল সেগুলি ছিল জাতিকেন্দ্রিক বিশেষ কয়েকটি ভাবাবেগ মাত্র। শিলারের যে জীবনী কার্লাইল লিখেছেন তা অন্য দিক থেকে প্রশংসনীয়, কিন্তু তিনি তাঁর নায়কের সমালোচনা করে বলেছেন তাঁর হৃদয় মার্কুইস পোসা-র হৃদয়ের মত "সমগ্র মানবজাতির জন্যে স্পন্দিত হত, সমগ্র বিশ্বের জন্য, এবং ভবিষ্যৎকালের মানুষের জন্য।" গ্রীকদের বা রোমানদের বিপরীত কথাই বলেছেন শিলার, বলেছেন, "আমরা আধুনিকেরা", তিনি এ কথা বলেছেন তখনই যখন তিনি ঘোষণা করেন যে, দেশপ্রীতি একটা অপরিণত চেতনা, মানুষের আদিম কালেই এর উপযোগিতা ছিল। তিনি লিখেছেন, "একটি জাতির জন্যে লেখাটা হচ্ছে একটা ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ লক্ষ্য মাত্র। দার্শনিক মনোভাবাপন্নদের কাছে এই সংকীর্ণতা অসহনীয়। এ রকম যাঁদের মনের কাঠামো তাঁরা কখনো নিজেদের মানবজাতির একটা পরিবর্তনীয় আকস্মিক আবেষ্টনীর মধ্যে বেঁধে রাখতে পারেন না। সবচেয়ে

গুরুত্বপূর্ণ একটা জাতিও কি মানবজাতির একটা অংশ নয়? সেই জাতির হয়ে কিছু করার স্পৃহা যদি সমগ্র মানবজাতির কল্যাণের জন্যেই হয়ে থাকে তাহলে সেইটেই একটা ঐতিহাসিক পদক্ষেপ।"

এই আধুনিকতার রীতি সত্ত্বেও কার্লাইল তাঁকে অতি-আধুনিকতার দায়ে দোষীই করেছেন বলা চলে, তিনি বলেছেন, "আমাদের জীবনের আসক্তির জন্যে আমাদের দরকার স্বাতন্ত্র্যবোধ। আমাদের মধ্যে যে সহানুভূতি আছে তা যদি সর্বত্র ব্যাপ্ত করে দেওয়া যায় তাহলে এই বিস্তৃতির ফলে তা এতই অস্পষ্ট হয়ে যাবে যে তার দ্বারা আর কারোই কোনো উপকার হবে না।··· মানবজাতির প্রতি বিশ্বজনীন ভালোবাসা হচ্ছে মানব চরিত্রের এক অতিসংকট-জনক ও শক্তিহীন বৈশিষ্ট্য।···(শিলারের ইতিহাস-সংক্রান্ত রচনায়) যে উন্নত বলিষ্ঠ ও প্রদীপ্ত উদ্দীপনা দেখা যায় তা যদি একটু সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ থাকত, তাহলে তার ফল অধিকতর ভালো হত।"

কার্লাইলের এই উদ্ধৃত মন্তব্য একটি যুগের কঠিন মনোভাবই প্রকাশ করছে, সেটি হচ্ছে স্বাদেশিকতার যুগ। কিন্তু ভাষাটা যেন অন্যের নয়, গতকালের। মানুষের চিন্তায় জোয়ার-ভাটা আছে। আমরা তো দেখতে পাচ্ছি, এককালে যা ছিল অভিনব তা হয়ে যাচ্ছে অপ্রচলিত, এবং যে আইডিয়াকে অকেজো বলে বাতিল ক'রে দেওয়া হয়েছিল তাই আবার আমাদের কালের নূতন আইডিয়া বলে পুনর্জীবিত হয়ে উঠছে সমকালীন, এবং যা কখনো হয় নি, সেই আইডিয়াই হয়ে উঠছে আমাদের জীবনমরণের বিষয়। আজ তবে আমরা কোথায় এসে দাঁড়িয়েছি? স্বাদেশিকতার ধারণা, "সংকীর্ণ গণ্ডি"র ধারণা এখন অতীতের বস্তু হয়ে গিয়েছে। আমরা অনুভব করতে পারি যে, কোনো রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বা বুদ্ধিবৃত্তি-সংক্রান্ত কোনো সমস্যা সমাধানে ঐ জিনিস আমাদের কোনো সাহায্যই করতে পারে না। বিশ্বজনীনতাই এখনকার প্রধান দাবী, এবং আমাদের উদ্বিগ্ন চিত্তেরও প্রয়োজন। "মানবজাতি" কথাটা, মানুষমাত্রেরই প্রতি সম্মান সংক্রান্ত আইডিয়া ও যতদূর সম্ভব ব্যাপকভাবে সহানুভূতি বিতরণ—এসবই "মানব-চরিত্রের শক্তিহীন বৈশিষ্ট্য" আর নেই, সুতরাং তা আমাদের আবেগকে "অকেজো"ও করে দেয় না। এই সর্বব্যাপী আবেগই আমাদের এখন প্রয়োজন, এবং বেশ তীব্রভাবেই এই প্রয়োজন আমরা অনুভব করি। সমগ্র মানবজাতির বোধ যদি জাগ্রত না হয়, তার মর্যাদাবোধ যদি জেগে

না-ওঠে, এই মর্যাদার উৎস কোথায় তা যদি সে খুঁজে বার করতে না-পারে, তাহলে মানবজাতির আর রক্ষে নেই, মানসিক ভাবেই কেবল নয়, তার অস্তিত্বেও আর চিহ্ন থাকবে না।

· গত অর্ধশতাব্দী মানবজাতির পিছিয়ে পড়াটা লক্ষ্য ক'রে চলেছে, তার সংস্কৃতির মর্মান্তিক অবক্ষয়, তার শিষ্টতাবোধের শালীনতার বিচারবোধের আনুগত্যের ও বিশ্বস্ততার এবং সর্বোপরি প্রাথমিক যে জিনিসটার দরকার সেই বিশ্বাসভাজনতার হ্রাস কিরকম ভয়াবহভাবে ঘটছে, তাও লক্ষ্য করেছে গত অর্ধশতাব্দী। দুইটি বিশ্বযুদ্ধ জন্ম দিয়েছে বর্বরতার ও তীব্র লালসার (এই দুইটি আলাদা করা যায় না), এবং বুদ্ধিবৃত্তি ও নৈতিক মান মর্মান্তিকভাবে নামিয়ে দিয়ে গিয়েছে, এবং যা রেখে গিয়েছে তা হচ্ছে এক বিশৃঙ্খল অবস্থা ; এই বিশৃঙ্খলা পৃথিবীকে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ থেকে পরিত্রাণ দিতে পারবে না, এবং সেইখানেই সব শেষ হয়ে যাবে। প্রবল ক্রোধ ও আতঙ্ক, অহেতুক ঘৃণা, ভয়, ও নিগ্রহ করার জন্যে প্রচণ্ড লালসা এখন মানবজাতিকে পেয়ে বসেছে। মনুষ্যজাতি এখন সুপরিকল্পিত ঘাঁটি স্থাপনের জন্যে মহাশূন্য জয় ক'রে উল্লাস করছে, এবং ধ্বংস করার অস্ত্র নির্মাণের জন্যে, সেই নৃশংস কাজ সম্পাদনের জন্যে, সূর্যের মহাশক্তিকেও নকল করার চেষ্টা করছে।

এই কি হে সত্যিই প্রকৃত মানুষ,
আমাদের দেবতার মতন গঠন ?
তাদের এ সৃষ্টি কি ছাখে চাক্ষুষ
অলিম্পিয়াস থেকে ওই দেবগণ ?
আমাদের কাছ থেকে পায়নি তারা
পৃথিবীকে তার নিজগৃহের মতন ?
অবশেষে এই ফল পেল বেচারা
সঙ্গীবিহীন হয়ে বিদেশে ভ্রমণ ?

এটি হচ্ছে "দি ইলুসিয়ান ফেস্টিভাল'এ সেরেসের বিলাপ। কিন্তু কণ্ঠস্বরটি শিলারের। তিনি আহ্বান জানিয়েছিলেন "উৎকৃষ্টতর আইডিয়া, পবিত্রতর মনোভাব, মহত্তর নীতি গড়ে তোলার জন্যে নীরবে পরিশ্রম করে যাও," কিন্তু তাঁর সে আহ্বানে কান না দিয়ে মানবজাতি নির্বোধের মতন চলছে, যাহান্নমে যেতে বসেছে, কারিগরিতে ও খেলাধুলায় বিশ্বরেকর্ড স্থাপন করে চলেছে, এবং সর্বনাশ ডেকে আনতে উদ্যত হয়েছে, যা নাকি সম্পূর্ণ অকাম্য নয়।

১৮৫৯ সালে যখন শিলারের মৃত্যুশতবার্ষিক অনুষ্ঠিত হয়েছিল, তখন এক উদ্দীপনার তরঙ্গ সমস্ত জার্মানীকে এক করে দিয়েছিল। আমরা শুনেছি, সত্যই নাকি এরকম হয়েছিল ; দৃশ্যটা কি রকম অভূতপূর্ব হয়েছিল অনুমান করতে পারি। চিরকালের ছিন্নবিচ্ছিন্ন জার্মান জনগণ তাদের কবিকে সম্মান জানাবার জন্যে এক সূত্রে বাঁধা হয়ে গিয়েছিল। এটা হয়েছিল জাতীয়-উৎসব। আমাদের এই উৎসবটাও তাই হোক। রাজনৈতিক এই মহাপাতকের মধ্যেও বিভক্ত বিচ্ছিন্ন জার্মানী তাঁর নামে এক হয়ে উঠুক। এটা হলে খুবই ভালো হয়। কিন্তু আমাদের এই বর্তমান কালে, আসুন, আমরা তাঁর এই স্মরণ-উৎসবে একটা অর্থপূর্ণ নিদর্শন রেখে যাই। এই উৎসব বিশ্ব-মানবিক মমত্ববোধ উৎসবে পরিণত হোক—সেইটেই হবে তাঁর উন্নত মনের মহত্ত্বের প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধা নিবেদন, যে পৃথিবী মানুষের জন্ম দিয়েছে সেই পৃথিবীর সঙ্গে মানুষের চিরন্তনতার চুক্তিই ছিল তাঁর কাম্য। তাঁর সমাধির ও তাঁর নির্বাণেব এই উৎসবের মধ্যে দিয়ে তাঁর দুঃসাহসিক ইচ্ছার কিছুটা অন্তত আমাদের মধ্যে প্রবেশ করুক ; সৌন্দর্য, সত্য, সৌজন্য, নৈতিক উৎকর্ষ, আত্মিক স্বাধীনতা, শিল্প, ভালোবাসা, শান্তি, এবং মানুষের নিজের প্রতিই মানুষের শ্রদ্ধা—তিনি এসবের জন্যেই পরম ইচ্ছা প্রকাশ করে গিয়েছেন ; এসব গুণের খুব সামান্য অংশও অন্তত আমাদের মধ্যে প্রবেশ করুক।

ভেনিসে মৃত্যু

টমাস মান্-এর "ডেথ ইন ভেনিস" (১৯১৩) উপন্যাসেও শিল্পী ও মধ্যবিত্ত সমাজের মধ্যের পার্থক্য দেখানো হয়েছে। গুস্তাভ আসচেনবাক একজন লেখক, তাঁর ধারণা তিনি উভয় প্রকার জীবনযাপন-প্রণালী রপ্ত করে নিয়েছেন, কেননা আত্মসংযমের দ্বাবা তিনি জীবনের আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ও শৃঙ্খলা অর্জন করতে পেরেছেন। এত কষ্ট ও ক্লেশের দ্বারা অর্জিত তাঁর জীবনের সুর ও সংগতি হঠাৎ তার তাল কেটে ফেলল একটি সৌন্দর্যের আবির্ভাবে ; এই সৌন্দর্য মূর্ত হয়ে এল টাডৎসিও নামক একটি বালকের মধ্যে, ভেনিসের সমুদ্রকিনারের এক বিলাসবহুল হোটেলে ছেলেটির সঙ্গে তাঁর দেখা। এক প্রবল আবেগে আসচেনবাক প্রায় যন্ত্রচালিতের মত বালকটিকে অনুসরণ করতে লাগলেন। আমাদের উদ্ধৃতিটি গল্পের শেষ অংশ থেকে নেওয়া, এখানে একটি স্বপ্নের বিবরণ আছে, স্বপ্নের মধ্যেই তাঁর মধ্যে প্রবল উল্লাসের সঙ্গে তাঁর কামনা তাকে গ্রাস করেছে। তাঁর ভয় হল, তিনি যেন বুঝতে

পারলেন তাঁর পতন অনিবার্য। তিনি "একজন শিল্পী, তিনি একটা মর্যাদা অর্জন করেছেন," যিনি মনে করেন যে সব রকম পতন-স্খলন তিনি এমনভাবে জয় করে ফেলেছেন যা কি না "দৃষ্টান্তের স্থল," তাঁরও পতন ঘটল একজন শিল্পী হিসাবে, সৌন্দর্যের প্রতি লালসার জন্যে, গভীর আকর্ষণের জন্যে। স্ট্রবেরি খেয়ে তিনি আক্রান্ত হন কলেরায়, তিনি যখন এই ব্যাধিতে ও সেই সঙ্গে জ্বরে কাতর হয়ে সমুদ্রতটে মারা যাচ্ছেন, তখন দেখেন ছেলেটা তাঁকে ইশারা করছে। এখানে টমাস মান্ নিজের সম্বন্ধে যা বলেছেন তা হুবহু মিলে যাচ্ছে, "ইতিহাস লেখক ধ্বংসোন্মুখদের বিবরণ লেখক, ব্যাধিগ্রস্তদের ও মৃত্যুর প্রতি অনুরক্ত, শিল্পীরূপে অতলস্পর্শী গভীরতার প্রতি অনুরাগ।"

সেই রাত্রে তিনি ভয়ানক এক স্বপ্ন দেখলেন—তাঁর গভীর ঘুমের মধ্যে তিনি মানসিক ও কায়িক যে অভিজ্ঞতা অনুভব করলেন তাকে স্বপ্নই যদি বলা হয় তাহলে এ এক স্বপ্ন। তিনি যা দেখলেন তা একেবারেই বাস্তব নয় বলে তিনি বোধ করতে লাগলেন, নিজেকেও তিনি এর মধ্যে জড়িত বোধ করলেন না কেবল মনে হতে লাগল যে, এ ঘটনা ঘটছে তাঁর চেতনার মধ্যেই, ঘটনাগুলো আসছে বাইরে থেকে, এসব তিনি বাধা দেবেন সে শক্তিও তাঁর নেই। ঘটনাটি ঘটে গেল। তারপর তাঁকে ছেড়ে চলেও গেল। কিন্তু তাঁর সারা জীবনের চেষ্টার তিনি যে একটা শিল্পসংস্কৃতির কাঠামো গড়ে তুলেছেন সেটিকে ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে একেবারে ধ্বংস ক'রে দিয়ে চলে গেল।

এর আরম্ভটা ছিল ভয়; ভয় ও কামনা—তার সঙ্গে ছিল একটা ভয়ংকর কৌতূহল। রাত্রি গভীর হতে লাগল, সেই সঙ্গে তাঁর অন্তরাত্মা অধীর হয়ে উঠতে লাগল। বহুদূরে তিনি শুনতে পেলেন খুব জোরে শব্দ হচ্ছে, সে শব্দ এলোমেলো, কলরব, গণ্ডগোল। ঘড়ঘড় শব্দ হতে লাগল, কি-যেন ভেঙে পড়ার শব্দ হল, বজ্রপাতের শব্দ হল, তীক্ষ্ণ স্বরে কুকুরের ডাক, একটা আর্তনাদের ধ্বনি, তার শেষে একটানা ঐ শব্দ। এইসব শব্দের সঙ্গে, এবং এইসব শব্দকে ছাপিয়ে একটা বংশীধ্বনি বেজে উঠল এমন শব্দে যাকে বলা যায় নিষ্ঠুর মধুরতা; সেই শব্দে ক্রমশ সেই শ্রোতার সর্বাঙ্গ মুগ্ধ ও মোহিত হয়ে যেতে লাগল। তিনি একটা কণ্ঠধ্বনি যেন শুনলেন, শুনলেন যা আসছে তা হচ্ছে 'এক অপরিচিত দেবতা'। চারদিকের কুয়াশাকে ঘিরে ধরল একটা দীপ্তি, ঐ আলোয় তিনি দেখতে পেলেন তাঁর দেশের বাড়ির কাছের সেই

পর্বতের দৃশ্য। অরণ্যের উচ্চতা থেকে, ঐ গাছের কাণ্ডের উপর দিয়ে, শ্যাওলা-জমা ঝুলন্ত পাহাড়ের উপর দিয়ে গড়িয়ে, এক সৈন্যবাহিনী আসছে ভীষণ শব্দ করতে-করতে, মানুষের ও পশুর মিলিত পদধ্বনি, তারা চীৎকার করতে করতে আসছে, তারা আসছে নাচতে-নাচতে। মেয়েদের কোমরবন্ধ থেকে যে লোমের আচ্ছাদন ঝুলছে, তাই নিয়ে তারা হোঁচট খাচ্ছে। মাথা পিছন দিকে ঝুলিয়ে তারা গলা ছেড়ে চিৎকার করছে, ও তাদের ঢোলক শূন্যে তুলে ধরছে। তারা উন্মুক্ত ছোরা দিয়ে আস্ফালন করছে ও মশাল থেকে আলো নিক্ষেপ করছে! দুই হাত দিয়ে নিজের বুক আঁকড়ে ধ'রে তারা চ্যাঁচাচ্ছে; তাদের কোমর জড়িয়ে ধরে আছে কুণ্ডলী পাকানো সাপ, তারা জিভ লকলক করছে। পুরুষদের সর্বাঙ্গে লোম ও মাথায় শিং, তারা মাথা নীচু ক'রে ও হাত ও উরু একসঙ্গে উপরে তুলে এমন ভাবে ড্রাম পিটছে যে তাতে বজ্রধ্বনি বেজে উঠছে। দাড়িহীন যুবকরাও আছে ঐ দলে, তাদের গলায় অস্ত্রের মালা। তারা কতকগুলো ছাগলের পিছনে ধাওয়া করছে ও ঐ অস্ত্র দিয়ে ছাগলের গায়ে আঘাত করছে; তারপর তাদের নিয়ে ছুটছে জয়োল্লাস করতে-করতে। ঐ দলের সকলেই পাগলের মতন চীৎকার করছে, চীৎকারে কী-সব ধ্বনি করছে কিন্তু শেষে আছে দীর্ঘ একটা উ শব্দ; এটা একই সঙ্গে এতই মধুর ও এমন ভীষণ লাগছিল, জীবনে যা কখনো শোনা যায় নি। তাড়া-খাওয়া হরিণের ভয়ার্ত আর্তনাদের মত ঐ শব্দ, যেন একই সঙ্গে অনেকগুলি ঐরকম হরিণ চীৎকার করছে। এই ভাবেই ওরা বুঝি সর্বাঙ্গ দোলাতে-দোলাতে নিয়ে চলেছে নৃত্যের জন্যে। এই কারণে ঐ ধ্বনি থামছে না। কিন্তু বংশীধ্বনিটি কখনো আস্তে কখনো জোরে সব শব্দ ছাপিয়ে বাজতে-বাজতেই চলেছে। এই শব্দে তিনিও প্রলুব্ধ হচ্ছেন যিনি এই শব্দের কোলাহলের মধ্যেও নির্লজ্জভাবে প্রতীক্ষা করে চলেছেন তাঁর শিকারের জন্যে, এবং নিজে আত্মসমর্পণের জন্যে। তিনি কেঁপে উঠলেন, ভীত হয়ে উঠলেন, তাঁর সম্মুখে যে আগন্তুক এসে উপস্থিত হয়েছে সে হচ্ছে ...ার মর্যাদার ও আত্মসংযমের পরম শত্রু, তার হাত থেকে নিস্তার পাবার ... তিনি চেষ্টা করতে লাগলেন। কিন্তু ঐ চীৎকার পাহাড়ের গায়ে ...ত হয়েছে আর তীব্র ভাবে প্রতিধ্বনিত হতে লাগল; শব্দ আরও প্রবল ...য় উঠল, একেবারে উন্মাদ আওয়াজ তুলল, সেই উন্মাদনায় তিনি ভেসে গেলেন। তাঁর সমস্ত বোধ ঐ শরীরগুলির মধ্যে পাক খেতে লাগল, ও

ছাগলের গায়ের তুর্গন্ধে, বদ্ধজলের পচা গন্ধে, এবং ক্ষত, অপরিচ্ছন্নতা ও ব্যাধির বিষবাষ্পে তাঁর চেতনা আচ্ছন্ন হয়ে গেল।

সেই অসুখী মানুষটি সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়ে জেগে উঠলেন, একেবারে যেন নড়বড়ে হয়ে গেলেন, এবং ঐ দানবের খপ্পরে পড়ে একেবারে অসহায় হয়ে গেলেন। তিনি আর কারও চোখ এড়িয়ে চলতে চাইলেন না, লোকে কিছু সন্দেহ করতে পারে কিনা সেদিকেও আর কোনো লক্ষ্য রাখলেন না। যাই হোক, অনেকে চলে যাচ্ছে, অনেক স্নানের কেবিন খালি হয়ে পড়ে আছে, খাবার-ঘরে অনেক জায়গা ফাঁকা ; কোনো বিদেশীকে রাস্তায় আর দেখাই যাচ্ছে না বলতে গেলে। মনে হয়, ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে গিয়েছে। চাপা দেবার অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও। সবত্রই বুঝি ছড়িয়ে পড়েছে আতঙ্কের ছায়া। কিন্তু মুক্তার মালা গলায় ঐ মহিলাটি এখনো তাঁর পরিবার-পরিজন নিয়ে থেকে গিয়েছেন। হয়তো গুজবটা তাঁর কানে পৌঁছয় নি, কিংবা তিনি এসব পরোয়া করেন না। টডৎসিও আছেই। এক-এক সময় আসচেন-বাকের মনে যখন প্রবল পাপ জমে উঠেছে তখন তাঁর মনে হয়েছে যে, হয়তো মৃত্যু এবং ভয় এই দ্বীপ থেকে সব প্রাণীকে এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যাবে ; কেবল থেকে যাবেন তিনি ও তাঁর কাম্য বস্তুটি। সকালবেলা সমুদ্র কিনারে অনেকক্ষণ ধ'রে তাঁর বেপরোয়া দৃষ্টিটি ঐ ছেলেটির উপর স্থির হয়ে থাকত। রাত্রিবেলা সব লজ্জা সংকোচ জলাঞ্জলি দিয়ে তিনি শহরের সরু রাস্তা ধরে ঐ ছেলেটির পিছন-পিছন যেতেন, মনে হত মৃত্যুও যেন চলেছে সঙ্গে সঙ্গে। এই রকম সময়ে তাঁর মনে হত যে, নৈতিক কানুন বলে কিছুই আর নেই, কেবল দানবীয় বিকৃত আকাঙ্ক্ষাই একমাত্র জেগে আছে আশা হয়ে।

প্রেমিকের মতনই তিনি চান খুশি করতে, সফল নাও হতে পারেন এই চিন্তায় ভোগ করতেন অশেষ যন্ত্রণা। তিনি তাঁর সাজসজ্জার বাহার বাড়ালেন, শৌখিন টাই বাঁধলেন, শৌখিন রুমাল নিলেন, এবং যুবজনোচিত অনেক অনেক ঘটা করে নিলেন। তিনি অনেক যত্ন ক'রে রত্ন ধারণ করলেন, অনেক গন্ধ দ্রব্য মাখলেন, এবং প্রত্যেক দিন অনেক সময় নিতে লাগলেন। সাজগোজে, তার পর যখন খাবার ঘরে ঢুকতেন তখন তিনি বেশ প্রস্তুত হিত উদ্দীপ্তও বটে। সম্মুখে যৌবনের ঐ তাজা সৌন্দর্য দেখে নিজের এই [illegible]সছে শরীরের জন্যে নিজের উপর বিতৃষ্ণা তাঁর জাগত। তাঁর এই চোখা চেহা টা ও পাকা চুল দেখে তিনি হতাশায় ডুবে যেতে লাগলেন। তিনি তাঁর চেহারায়

যৌবনের দীপ্তি ও উজ্জ্বলতা ফুটিয়ে তোলার জন্যে অনবরতই হোটেলের নাপিতের কাছে যেতে লাগলেন।

একজন সন্ধ্যাবেলা ঐ ছেলেটিকে অনুসরণ করতে-করতে শহরের একেবারে মাঝখানে গিয়ে পৌঁছলেন। ছোট ছোট রাস্তা, স্কোয়ার, খাল ও ব্রিজের গোলক ধাঁধায় পড়ে গেলেন তিনি—সবই যে প্রায় একরকম দেখতে। অবশেষে তিনি পথ হারালেন। তিনি কোথায় এসে গেছেন তা তিনি জানেন না, তার একমাত্র চেষ্টা যে, যার জন্যে তাঁর চোখের এই তৃষ্ণা সে যেন চোখের দৃষ্টির বাইরে চলে না যায়। তিনি দেয়ালের গা দিয়ে চোরের মতন হাঁটতে লাগলেন, তিনি কোনো বাড়ির বা কোনো মানুষের পিঠের উপর দিয়ে উঁকি দিতে লাগলেন; এই উত্তেজনা তাঁকে ক্লান্ত করে ফেলতে লাগল, কিন্তু বহুক্ষণ তিনি তাঁর ক্লান্তি সম্বন্ধে উদাসীনই ছিলেন। টাডৎসিও অন্যান্য লোকের পিছন-পিছন হাঁটছিল, সরু রাস্তায় সে অন্য সকলকে এগিয়ে যাবার জন্যে রাস্তা ছেড়ে দিচ্ছিল। তার পর গতি মন্থর ক'রে পিছন ফিরে চেয়ে সে ঠিক বুঝে নিচ্ছিল যে, তার প্রেমিকটি তাকে অনুসরণ করছেন। তিনি বুঝতে পারলেন, ছেলেটি সব বুঝেছে। এ'তে তিনি আরও অভিভূত হলেন। ঐ চোখ-দুটির দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে, সম্পূর্ণরূপেই প্রেমকাতর হয়ে তিনি তাঁর আশায় ভর করে এগোতে লাগলেন; তিনি শেষে দেখলেন যে, তিনি প্রতারিত হয়েছেন। পোলিশ পরিবারটি একটা খিলান-করা ব্রিজ পার হল, তারা ব্রিজের উপর উঠে গেলে তাদের আর দেখা গেল না; তার পর তিনি যখন উপরে উঠলেন তখন তাদের আর দেখলেন না। তিন দিকে তিনি খোঁজ করলেন ডানে বায়ে ও সামনের দিকে। কিন্তু বৃথা। হতাশ হয়ে তিনি ত্যাগ করলেন এই অনুসন্ধান।

তাঁর মাথা দপদপ করতে লাগল, ঘামে তাঁর শরীর ভিজে গিয়েছে, অসম্ভব পিপাসা পেয়েছে তাঁর। তিনি তখন কিছু একটা খাবারের সন্ধান করতে লাগলেন, একটা ছোট ফলের দোকান দেখে তিনি সেখানে গিয়ে কিনলেন কিছু স্ট্রবেরি। একটু বেশিই পেকে গিয়েছিল এই ফল। তিনি হাঁটতে-হাঁটতে খেতে লাগলেন ঐ অত্যধিক পাকা ফল। রাস্তাটা গিয়ে একটা পার্কে মিশেছে। তিনি জায়গাটা চিনতে পারলেন, কয়েক সপ্তাহ আগে এখানে বসেই তিনি পালিয়ে যাবার পরিকল্পনা করেছিলেন। তিনি একটা কুয়োর সিঁড়ির উপর বসলেন। বেশ নিরিবিলি জায়গাটা, তিনি

কুয়োর মধ্যে একটু ঝুঁকে দেখলেন, চারদিকের জঞ্জালের মধ্যে ও পাথরের খাঁজে-খাঁজে ঘাস গজিয়েছে। চারদিকে অতি জীর্ণ কতকগুলো বড় বড় বাড়ি, তার মধ্যের একটি বাড়ি অনেকটা প্রাসাদের মত। তার বড়-বড় জানালা সব খোলা, ছোট ছোট ব্যালকনি। বাড়িটার নীচ-তলায় ওষুধের কারখানা, দমকা বাতাসে সেখান থেকে কারবলিক অ্যাসিডের গন্ধ আসছে।

এখানে বসে আছেন সেই মান্য ব্যক্তিটি: যিনি শিল্পের সঙ্গে মর্যাদার সমন্বয় ঘটিয়েছেন, লিখেছেন 'দি অ্যাবজেক্ট' নামের বইটি, তাতে অপূর্ব ক্লাসিক মহিমায় যিনি সব রকম বিশৃঙ্খলা ও উচ্ছৃঙ্খলতার বিরুদ্ধে অনেক কথা বলেছেন, অধঃপতিতদের ও অধঃপাতের সম্বন্ধে যিনি কঠোর মন্তব্য করেছেন, এখানে বসে আছেন সেই মান্য ব্যক্তিটি যিনি জ্ঞানচর্চা করতে-করতে এতটা উর্ধ্বে উঠে গিয়েছেন, যাঁকে সরকারি ভাবেও মর্যাদা দেওয়া হয়েছে এবং তাতে তিনি আরও মাননীয় হয়ে উঠেছেন; যাঁর রচনার স্টাইল সমস্ত স্কুলে একটা মডেল হিসেবে দাখিল করা হয়ে থাকে। সেই ব্যক্তিটি বসে আছেন এখানে। তাঁর চোখের পাতা বন্ধ, চোখের তারা-দুটি কেবল এপাশ ওপাশ করছে। তাঁর মুখ দিয়ে দু-একটি শব্দ যা বেরিয়ে পড়ছে তা স্থির মস্তিষ্কের কথা নয়, সে কথা ঐ অর্থহীন স্বপ্নেরই প্রতিধ্বনি মাত্র।

কয়েকদিন পরে গুস্তাভ আসচেনবাক সকালবেলা হোটেল থেকে বের হলেন অন্যান্য দিনের তুলনায় একটু দেরিতেই। তাঁর বেশ অসুস্থ বোধ হচ্ছিল, তাঁর মাথা ঘুরছিল, কিন্তু এটা তাঁর কেবল শারীরিক কোনো অসুস্থতার জন্যেই কিনা তা তিনি বুঝতে পারছিলেন না, সঙ্গে সঙ্গে একটা আতঙ্ক একটা ভয় তাঁকে পেয়ে বসছিল, একটা নৈরাশ্য ও অসহায়তাও অনুভব করছিলেন তিনি। কিন্তু এসব তাঁর নিজের জন্যেই কিংবা বাইরের জগতের কোনো ব্যাপারের জন্যেই—তা তিনি ধরতে পারছিলেন না। হোটেলের লবিতে তিনি কিছু মালপত্র বেশ বেঁধে-ছেঁদে রাখা আছে, তিনি দেখলেন। এগুলি কার তা জানতে চেয়ে তিনি শুনলেন যে, এগুলি হচ্ছে সেই পোলিশ পরিবারের। এতে তাঁর মুখের ভাব কিছু বদলাল না, তিনি মাথা একটু নাড়লেন, অবান্তর প্রশ্নের অযথা উত্তর পেলে মানুষ যেভাবে মাথা নাড়ে, সেইভাবে তিনি মাথা নাড়লেন। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, 'কখন?', লোকটি উত্তর দিল, 'দুপুরের আহারাদির পরে।' তিনি মাথা নাড়লেন। তারপর চলে গেলেন সমুদ্রের কিনারে।

এখানকার দৃশ্যও তেমন ভালো লাগল না তাঁর। অগভীর জলে গুঁড়ো ঢেউ খেলে বেড়াচ্ছে। যেখানে এত প্রাণের স্পন্দন ছিল, বর্ণের এত সমাহার ছিল সেই সমুদ্রতট এখন প্রায় শূন্য, এবং অপরিচ্ছন্নও বটে। জলের ধারেই তেপায়ার উপর একটা ক্যামেরা দাঁড় করানো, কেউ ফেলে গেছে নিশ্চয় ; এর কালো কাপড়ের ঢাকনাও উড়ে গেছে হাওয়ায়।

টডৎসিও ওখানে ছিল, তার কেবিনের সামনেই, তার তিন-চারটি খেলার সঙ্গী এখনো তার সঙ্গে আছে। আসচেনবাক তাঁর চেয়ারটা কেবিন ও জলের মাঝামাঝি জায়গায় নিয়ে গেলেন ; হাঁটুর উপর কম্বল-চাপা দিয়ে নিলেন। সামনে চেয়ে রইলেন। এখন যে খেলা হচ্ছে তা তদারক করার কেউ নেই, কেন না বড়রা সকলেই মালপত্র গোছাতে বোধ হয় ব্যস্ত। এখন খেলাটা চলেছে তাই এলোমেলো ভাবে। কোমরে বেল্ট বাঁধা বেশ শক্তসমর্থ ছেলেটি, যার নাম হচ্ছে জ্যাসচিউ, বেশ রেগে গিয়েছে, তার চোখে বালি ছোড়ার জন্যে তার এই রাগ। সে টডৎসিও-কে লড়াইয়ের জন্যে চ্যালেঞ্জ করল, অল্প সময়ের মধ্যেই হেরে গেল টডৎসিও। সে প্রতিশোধ নেবার সুযোগটা ছাড়ল না। সে টডৎসিওর পিঠের উপর হাঁটু দিয়ে তাকে অনেকক্ষণ চেপে রাখল, এবং বালুতে তার মুখ ঘষে দিতে লাগল। অনেকক্ষণ ধরে সে এরকম করল, মনে হতে লাগল যে, ছেলেটার দম বুঝি বন্ধই হয়ে যাবে। উঠবার জন্যে অনেক চেষ্টা করতে লাগল ছেলেটি, কিন্তু হাজার চেষ্টাতেও সে তা পারল না। তখন আসচেনবাক তাকে উদ্ধার করার জন্যে যেই লাফিয়ে উঠবেন বলে ঠিক করছেন, সেই সময় জ্যাসচিউ তাকে ছেড়ে দিল। টডৎসিওর মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছে, সে একটু উঠে বসল, ঐ ভাবে রইল অনেকক্ষণ, তার চোখ নিষ্প্রভপ্রায়, তার চুল এলোমেলো। তার পর সে উঠল, ধীরে ধীরে হেঁটে চলে যেতে লাগল। অন্যরা তাকে প্রথমে ডাকল, তার পর অনুনয়-বিনয় করল, কিন্তু তাদের কথায় সে কান দিল না। জ্যাসচিউ-এর হয়তো অনুতাপ হল, সে তার বন্ধুর পিছন-পিছন গিয়ে ভাব করে নিতে চাইল, কিন্তু টডৎসিও কাঁধে ঝাঁকি দিয়ে তাকে চলে যেতে বলল। তার পর সে গেল জলের ধারে। তার পা খালি, ডোরাকাটা কাপড়ের স্যুট তার পরনে, তার বুকের কাছে লাল গ্রন্থি দেওয়া।

মাথা নীচু করে সেইখানে সে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। ভিজে বালির মধ্যে পায়ের আঙুল দিয়ে ঘষে-ঘষে কি-যেন খুঁজতে লাগল। তার পর সেই

অগভীর জলে সে নামল, এখানে সবচেয়ে গভীর জল হচ্ছে হাঁটু পর্যন্ত। ঐ জলে সে হাঁটতে লাগল। একটু থেমে সমুদ্রের দিকে সে চেয়ে রইল। তার পর বাঁ দিকে চলল। সে তার মেজাজের জন্যেই সম্ভবত তাদের সঙ্গীদের চোখের আড়াল হল। ঐ চলে যাচ্ছে একটা নিঃসঙ্গ প্রাণী, সমুদ্রের বাতাসে তার চুল উড়ছে। দূর থেকে দেখা যাচ্ছে তাকে। আর-একবার সে দাঁড়াল। অদ্ভুত একটা ভঙ্গি ক'রে একটা হাত ওর উরুর উপর রেখে তার কাঁধের উপর দিয়ে সে ফিরে তাকাল কিনারের দিকে। যিনি এসব লক্ষ্য করছিলেন, তিনি ঠিক সেই ভাবেই বসে রইলেন যে দিন তিনি হোটেলের লবি-তে বসে-বসে প্রথম দেখেছিলেন ঐ ধূসর বর্ণের চোখ, যখন তাঁদের দুজনের চোখাচোখি হয়ে গিয়েছিল। তিনি চেয়ারে হেলান দিয়ে বসলেন, ঐভাবেই দেখতে লাগলেন ছেলেটির চলা-ফেরা। তার পর চোখ তুললেন, মনে হল টডৎসিওর চাহনির উত্তর দেবার জন্যেই। তার পর তাঁর মাথা ঝুলে পড়ল তাঁর বুকের উপর; চোখের পাতার নীচে চোখ-দুটি তখনও চেয়ে আছে; তাঁর মুখের উপর নেমে এসেছে গভীর ঘুমের ছায়া। তাঁর যেন মনে হয়েছিল যে, ঐ সুন্দর ছেলেটি তাঁর দিকে চেয়ে হেসেছে, আর, তাঁকে সংকেত করেছে—তাঁর সেই পরম আশারই হাতছানি বুঝি এটা।

কয়েক মিনিট পরে, কেউ তাঁর সাহায্যে এগিয়ে আসার আগেই, এই বৃদ্ধ লোকটি তাঁর চেয়ারেই অবসন্ন হয়ে পড়েছেন। লোকজন এসে তাঁকে তাঁর কামরায় নিয়ে গেল। রাত্রি হবার আগেই তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাশীল পৃথিবী তাঁর মৃত্যু-সংবাদ পেয়ে স্তম্ভিত হয়ে গেল।

হাইনরিখ মান্

প্রজা

টমাস মান্-এর ভ্রাতা হাইনরিখ মান্ (১৮৭১-১৯৫০) তাঁর রচনাদি জার্মানীতে নিষিদ্ধ হবার পর প্রথমে চেকোস্লোভাকিয়ায় ও পরে কালিফোর্নিয়ায় চলে যান। তাঁর নভেল ছোটগল্প সবই রাজনৈতিক পটভূমিকায় লেখা, এতে তিনি কাইজারের আমলের মধ্যবিত্তসমাজ, ভাইমার রিপাবলিক ও নাৎসীদের কবলিত জার্মানী—সব কয়টিকেই নির্মম ভাবে সমালোচনা করেছেন। তাঁর রচনারীতি হচ্ছে তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ ও মাঝে মাঝে অদ্ভুত অতিরঞ্জন। তাঁর অনেক

প্রবন্ধে ও পুস্তিকায় হাইনরিখ মান্ মানবিক সমাজবাদের কথা বলেছেন, এবং ন্যাশনাল সোশ্যালিজম ও সামরিকতন্ত্রের বিরোধিতা করেছেন। তাঁর নভেল "দি সাবজেক্ট" ১৯০৬ থেকে ১৯১৪ সালের মধ্যে লেখা, কিন্তু ১৯১৮ সালের আগে তা প্রকাশ করা যায়নি। এই বইতে তিনি দ্বিতীয়-ভিলহেলমের আমোলের মুখোশ খুলে দিয়েছেন, এতে তিনি মধ্যবিত্তশ্রেণীর একটি ব্যক্তিকে দেখিয়েছেন কীভাবে সে কাইজারের ও গির্জার কাছে আত্মবিক্রয় করে এক অমর্যাদাজনক এক "প্রজা"র মতন ব্যবহার করে, আবার সেইসঙ্গেই দুর্বল নিম্নশ্রেণীর মানুষকে পীড়ন ও শোষণ করে। ডায়েডরিখ হেসলিং হচ্ছে সেই ব্যক্তিটি। ক্ষমতা লাভের চেষ্টা করতে গিয়ে তার মানসিক অধঃপতন সম্পূর্ণ হয়ে যায়। আমাদের প্রথম উদ্ধৃতিটি হচ্ছে বেকার কর্মচারীদের একটা আন্দোলন নিয়ে, এখানে রাজতন্ত্র ও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় শ্রমিকশ্রেণীর বিরুদ্ধে একজোট হয়ে দাঁড়িয়েছে ; এতে উচ্চশ্রেণীর উপর তাদের শোচনীয় নির্ভরতার বিষয়টি প্রকাশ করা হয়েছে, এবং সমরতন্ত্র ও ধর্মোন্মাদনার রূপটিও ফুটে উঠেছে। নতুন ফ্যাক্টরির মালিক রূপে হেসলিং-এর বক্তৃতা হচ্ছে আমাদের দ্বিতীয় উদ্ধৃতি, ওটিকে যদি অতিরঞ্জনের দ্বারা ব্যঙ্গ করা হয়েছে, তবুও সেইকালের মালিক ও শ্রমিকের মধ্যের সম্পর্কটা কিরকম ছিল, তা পরিস্ফুট হয়েছে।

১৮৯২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের সেই ঠাণ্ডা ও কনকনে আবহাওয়ায় অনেক সময়ই সে বড় একটা ঘটনা ঘটার আশায় পথে-পথে ঘুরত। উনটার ডেন লিনডেন* একটু যেন বদলে গিয়েছে। কিভাবে বদলাল তা কেউ বুঝতে পারে না। অশ্বারোহী পুলিশেরা রাস্তার মোড়ে-মোড়ে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে। পথচারীরা ক্ষমতার এই দাপটটা পরস্পরকে দেখাচ্ছে। "বেকারেরা"। তাদের আসাটা দেখার জন্যে লোকজন একটু দাঁড়িয়ে গিয়েছে। তারা উত্তর দিক থেকে ছোট-ছোট দলে বেশ ধীরে-ধীরে আসছে। উনটার ডেন লিনডেনে এসে তারা একটু দ্বিধাগ্রস্থ হল, একটু হতবুদ্ধিও যেন হয়ে গেল, চোখ-চাওয়া-চাওয়ি ক'রে একটু পরামর্শ করে নিল, তার পর প্রাসাদের দিকে ঘুরল। এখানে তারা পকেটে হাত ঢুকিয়ে চুপ করে দাঁড়াল।

* বার্লিনের একটি বুলেভার্ড, এখান থেকে ব্রানডেনবুর্গ গেটে যাওয়া যেত। এখন এটি পূর্ব-বার্লিনে।

রংচটা ওভারকোটের উপর বৃষ্টি পড়ছে, তারা পিঠ কুঁজো করে দাঁড়াল। রাস্তা দিয়ে গাড়ি তাদের গায়ে চাকা থেকে জল ছিটিয়ে চলে যাচ্ছে। অনেকেই তাকাতে লাগল তাদের পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছেন যেসব অফিসর তাদের দিকে, কেউ কেউ তাকাচ্ছে গাড়ির মহিলাদের দিকে, কেউ-বা লম্বা লোমওলা জামা গায়ে দিয়ে যাঁরা হেঁটে-হেঁটে বার্গস্ট্রাসের দিক থেকে আসছেন, তাদের দিকে। কিন্তু কারও মুখেই কোনো ভাবান্তর নেই। কোনো রাগ নেই, কোনো কৌতূহলও নেই। তারা যেন কিছু দেখতে চায় না, তাদেরই সকলে দেখুক—এই যেন তাদের ইচ্ছে। অন্যেরা অবশ্য প্রাসাদের জানালার দিক থেকে চোখ ফেরাচ্ছে না। তাদের মুখের উপর বৃষ্টি পড়ছে। ঘোড়ায় চেপে একজন পুলিশম্যান চেঁচিয়ে-চেঁচিয়ে তাদের তাড়া করে নিয়ে চলল, রাস্তার এক কোণ থেকে অন্য কোণে, কিন্তু তারা এর মধ্যেই থেমে গিয়েছে। মনে হতে লাগল এই কোটরগত মুখের মধ্যে পৃথিবী যেন ডুবে গিয়েছে, ঐ মুখের উপর সন্ধ্যার ছায়া নেমেছে, এবং তাদের পিছনের শক্ত প্রাচীরের উপরেও নেমেছে ঐ ছায়া। ধীরে-ধীরে রাত্রিও নেমে আসছে।

"আমি বুঝতে পারছিনে পুলিশ কেন তেমন জোরালো ভাবে কাজ করছে না।" ডায়েডরিখ বলল, "এই জনতা নিশ্চয়ই ইতর ও অবাধ্য।"

ভায়েবেল বলল, "ব্যস্ত হোয়ো না। পুলিশকে ঠিক কী করতে হবে তা তাদের বলে দেওয়া হয়েছে। যেসব ভদ্রলোক এ ব্যাপারে ব্যবস্থা করছেন তাঁরা নিশ্চয়ই ভেবেচিন্তে কিছু ঠিক করে রেখেছেন—এ কথা আমি নিশ্চয় করে বলতে পারি, রাষ্ট্রে এ রকম পচন ধরলে তা প্রথমেই দমন করা ঠিক না। তাকে একটু পাকতে দিতে হবে, তার পর করতে হবে পাকা ব্যবস্থা।"

পাকতে দেওয়ার যে কথা ভায়েবেল বলল তার দিন ক্রমশই এগিয়ে আসতে লাগল। ২৬ তারিখে সেই দিন এসে গেছে বলে মনে হল। বেকারদের আন্দোলন এবার আরম্ভ হল দৃঢ়সংকল্প নিয়ে। উত্তর দিকের রাস্তা থেকে তাদের তাড়িয়ে দেওয়া মাত্র তারা অন্য রাস্তা ধরে আরো বেশি সংখ্যায় এসে পড়ল। উনটার ডেন লিনডেনে ছোটছোট দল একত্র হল, তারা পৌঁছল প্রাসাদের কাছে, পিছিয়ে এল, আবার পৌঁছল। তাদের প্রতিরোধ করা গেল না, জোয়ারের জলের মতন তারা এগোল। যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে গেল, পথচারীরা জড়ো হয়ে ঐ ভিড়ের মধ্যে এসে পৌঁছল, ঐ ভিড়ে যেন ডুবে গেল তারা, বিবর্ণ ঐ জনসমুদ্র বলিষ্ঠ বিক্রমে এগিয়ে যেতে লাগল,

আওয়াজ তুলতে লাগল, এবং ডুবন্ত জাহাজের মাস্তলের মত তারা তুলে ধরে আছে কয়েকটি দণ্ড, যার গায়ে লাগানো ব্যানার, তাতে লেখা—"রুটি! কাজ!" ঐ ভিড় ডিঙিয়ে একটা পরিষ্কার চাপা গর্জন এখানে এসে পৌছল—"রুটি! কাজ!" ঐ ভিড়ের উপর দিয়ে গড়াতে গড়াতে যেন এসে পৌছল বজ্রগর্ভ মেঘ: "রুটি! কাজ!" ঘোড়সওয়ার পুলিশ আক্রমণ করল। ঢেউয়ের মত উত্তাল হয়ে উঠল জনতা, চাপা গলায় ধ্বনি তুলল, ঐ বিশৃঙ্খলার মধ্যে নারীকণ্ঠের কাকলি বেজে উঠল, "রুটি! কাজ!"

জনতাকে চার্জ করল পুলিশ। জনতার কৌতূহলী অংশ একেবারে সরে গেল ফ্রাঃেডরিখ মেমোরিয়ালের কাছ থেকে। কিন্তু তাদের মুখ বন্ধ করা যায়নি, কার্পেট পিটলে তা থেকে যেমন ধূলো ছড়ায় তেমনি কথা ছড়াচ্ছে তাদের মুখ দিয়ে; এরা হচ্ছে ক্ষুদে অফিসার, আপিসে যাবার পথ এখন বন্ধ হয়ে গিয়েছে বলেই তাদের এত কথা। বিকৃত মুখ ক'রে কে যেন ডায়েডরিখকে চেঁচিয়ে কি বলল, সে চিনতে পারল না তাকে, কিন্তু লোকটা হচ্ছে হের্ ফন বারনিম। লোকটার পিছনে সে যেতে চেষ্টা করল, কিন্তু একটা প্রবল ধাক্কায় রাস্তার অন্য দিকে গিয়ে পড়ল, একটা কাফের জানালার কাছে। সে জানালা ভাঙার শব্দ শুনতে পেল, এবং একজন শ্রমিকের চীৎকার শুনল, "আমার মাথায় উচু-টুপী ছিল না বলে সেদিন আমাকে ওরা ওখান থেকে ভাগিয়ে দিয়েছে।" এই কথা বলে সে অন্যান্যদের সঙ্গে জানালা দিয়ে ভিতরে ঢুকে উল্টোনো টেবিল ও ভাঙা পোয়ালা-পিরিচের উপর পড়ল, এবং এ ওর পেটে থাপড় দিয়ে সাহায্যের জন্যে চীৎকার করতে লাগল। "কেউ আসছে না। এখানে যে বাতাসই প্রায় বন্ধ।" আরও অনেকে এসে গেল। পুলিশ তাদের ঠেলছেই। তার পর তারা দেখল রাস্তার মাঝখানটা একেবারে সাফ, একটা বিজয়ী মিছিল যাওয়ার জন্যে রাস্তাটা যেন ফাঁকা করা হয়েছে। তখন একজন বলল, "কেন! এ তো উইলিয়ম!"

ডায়েডরিখ এখন বাইরে এসে গেছে। কেউ বুঝতে পারল না কী ক'রে এই জনতা এমন সংঘবদ্ধ হয়ে সারা রাস্তা ভরাট ক'রে একেবারে ঘোড়-সওয়ারদের কাছে এসে গেল। যেখানে একটি ঘোড়ার উপর বসে আছেন কাইজার। হ্যাঁ। স্বয়ং তিনি। সকলে তাঁর দিকে তাকাতে-তাকাতে চলে গেল। ধ্বনি দিচ্ছিল যারা সেই জনতাকে ছত্রভঙ্গ করা হয়ে গিয়েছে, তারাও চলে যাচ্ছিল। তারাও তাকাল তাঁর দিকে। বিশৃঙ্খল একটা জনতার

মাথার উপর হেলমেট মাথায় দিয়ে বসে আছে এক তরুণমূর্তি। ইনি কাইজার। তারা তা দেখল। প্রাসাদ থেকে তাঁকে নেমে আসতে তারা তাঁকে বাধ্য করেছে। তারা চীৎকার করেছিল: "রুটি! কাজ!" তাই তিনি নেমে এসেছেন। তাঁর এখানে আসা ছাড়া আর কোনো-কিছুরই পরিবর্তন ঘটেনি। তবুও জনতা মার্চ ক'রে চলেছে, যেন তারা চলেছে টেম্‌পেলহফ ফিলডের * দিকে।

রাস্তার ধারে, ভিড় যেখানে পাতলা, সেখানে মধ্যবিত্ত-পরিচ্ছদ-পরা লোকগুলো বলাবলি করতে লাগল, "ঈশ্বরকে ধন্যবাদই দিতে হয়। তিনি কী করতে চলেছেন তা তিনি জানেন।"

"কি করতে যাচ্ছেন তিনি?"

"ঐ ইতরদের তিনি দেখতে চান কার ক্ষমতা বেশি। তিনি তাদের প্রতি সদয় ব্যবহার করার চেষ্টা করেছেন। দু বছর আগে তিনি যে ডিক্রি জারি করেন তাতে তিনি অনেক-কিছু করেছেন। কিন্তু এরা বড়ই উদ্ধত হয়ে উঠেছে।"

"ওঁর কোনো ভয় নেই। এ জন্যে ওঁকে তারিফ করতে হবে। দেখ ভাই, এটা একটা ঐতিহাসিক সময়!"

ডায়েডরিখ এ কথা শুনে একটু যেন চমকেই উঠল। যে বৃদ্ধভদ্রলোকটি ঐ কথা বলছিলেন তিনি তার দিকে তাকালেন।

তিনি বললেন, "শোনো হে যুবক, আমাদের এই তরুণ কাইজার এখন যা করছেন ছোটরা তাদের পাঠ্যবইয়ে তা একদিন পড়বে। দেখে রেখো।"

অনেকেই গর্বে বুক ফোলালো, আর তাদের মুখে শ্রদ্ধার ভাব ফুটে উঠল। যাঁরা কাইজারের সঙ্গে সঙ্গে চলেছিল তারা দৃঢ়সংকল্প নিয়েই যেন নীচের দিকে চেয়ে লোকজনের দিকে তাকাল। লোকজনের মধ্যে দিয়ে তারা ঘোড়া নিয়ে চলল, তাদের ভঙ্গিটা এমন যে, একটা মস্ত খেলায় তারা যেন হেঁটে-হেঁটে চলার কাজটা দেখাচ্ছে। জনসাধারণের এর কি ক্রিয়া হচ্ছে তা দেখার জন্যে তাবা মাঝেমাঝেই আড়চোখে তাকাচ্ছে। কাইজার অবশ্য কেবল নিজেকেই দেখছিলেন, এবং তাঁর কৃতিত্ব আঁচ করছিলেন। তাঁর মুখে গুরুতর চিন্তার ছাপ, তাঁর তাঁবে যে শতসহস্র মানুষ আছে তিনি তাদের দিকে

*পূর্বতন সামরিক কুচকাওয়াজের ময়দান, এখন বার্লিনের প্রধান বিমানবন্দর

দৃষ্টিপাত করছিলেন। ওদের তুলনায় তিনি তাঁর ওজন বুঝে নিচ্ছিলেন, ঐ বিদ্রোহী অপদার্থ ভৃত্যদের কাছে এই স্বর্গদূত-সদৃশ্য প্রভুর মূল্য তিনি পরিমাণ করছিলেন। তিনি একা এবং কোনো রক্ষী না নিয়ে এদের মধ্যে এসে গিয়েছেন, তার একমাত্র শক্তি হচ্ছে তাঁর মহৎ উদ্দেশ্য। ভগবান্ যদি তেমন চাইতেন তাহলে ওরা তাঁকে আক্রমণ করতে পারত। তিনি নিজেকে এক পবিত্র কর্তব্যের হাতে সমর্পণ করেছেন। ঈশ্বর যদি তাঁর সহায় হন, তাহলে তারা তা বুঝতে পারবে। তাহলে তাঁর কাজের একটা ছাপ তাদের মনে থেকে যাবে, আর থেকে যাবে নিজেদের অপদার্থতার স্মৃতি।

একজন তরুণ আর্টিস্টের আলগা একটা টুপী মাথায় দিয়ে ডায়েডরিখের পাশে-পাশে হাঁটছিল, সে বলল, "এ জিনিস আগেও আমরা দেখেছি। মস্কোতে নেপোলিয়ন একাই জনসাধারণের সঙ্গে মিশে গিয়েছিলেন।"

"কিন্তু এটা ভয়ংকর কাজ।" সায় দিয়ে বলল ডায়েডরিখ। অন্যজন কেবল কাঁধ ঝাঁকি দিল।

"এটা একটা অভিনয়। কিন্তু তাও তেমন পাকা নয়।"

ডায়েডরিখ তার দিকে তাকাল, সে কাইজারের মত চোখ দীপ্ত করে তোলার চেষ্টা করল।

"তুমি বোধ হয় ওদেরই একজন।"

সে ঠিক করতে পারলো, কাদের মত। তার কেবল মনে হল যে, জীবনে এই বুঝি প্রথম একটা মহৎ উদ্দেশ্যের বিরোধী সমালোচনার সামনে তাকে দাঁড়াতে হয়েছে। ভিতরে-ভিতরে উত্তেজিত হলেও সে লোকটার কাঁধের দিকে তাকাল, কাঁধ তেমন চওড়া না। আশেপাশের লোকরাও অসন্তোষ প্রকাশ করতে লাগল। ডায়েডরিখ এবার রুখে উঠল। সে তার পেট দিয়ে তার এই শত্রুটিকে দেয়ালে চেপে ধরল, তার টুপীতে ঘুষি মারতে গেল। অন্যেরাও তাকে মারতে উদ্যত হল। অল্পক্ষণের মধ্যে টুপীটা মাটিতে গড়াগড়ি খেতে লাগল, তার পর তার সঙ্গে লোকটাও। যেতে যেতে ডায়েডরিখ তার সঙ্গীদের বলল, "ও নিশ্চয় কখনো সৈন্যবাহিনীতে ছিল না। তার গায়ে কোনো কাটা দাগ নেই।"

সেই সাদা-গোঁফের বুড়োলোকটি এসে গেছেন আবার, তিনি ডায়েডরিখের কর-মর্দন করলেন।

"বেশ করেছ, বেশ করেছ।"

ডায়েডরিখ হাঁফাতে-হাঁফাতে বলল, "একথা শুনলে মেজাজ ঠিক রাখা যায়? এই ঐতিহাসিক মুহূর্তটা ও পণ্ড করে দিতে চায়!"

"তুমি কাজের কাজ করেছ।"

"আমি বরাবরের জন্যে সৈন্যবাহিনীতে থাকতে পারলে খুশি হতাম।" বলল ডায়েডরিখ।

কে-একজন তার নোটবই নেড়ে-নেড়ে বলতে লাগল, "আমরা সেই জিনিসটা চাই। যাকে বলে আবহাওয়া। ভালো আবহাওয়া। এক্ষুনি তুমি একজন কমরেডকে পিটুনি দিয়েছ। কি, দাওনি?"

ডায়েডরিখ হাঁফাতে-হাঁফাতেই বলল, "ওটা একটা সামান্য ব্যাপার। যে কোনো আভ্যন্তরীণ শত্রুর বিরুদ্ধে আমি আবার ওরকম করতে রাজি আছি। কাইজার আমাদের সহায়।"

রিপোর্টারটি মন্তব্য করল, "চমৎকার।" তারপর তার নোট বইয়ে লিখল, "ভয়ংকর উত্তেজিত জনতার মধ্যে সর্বশ্রেণীর লোক একবাক্যে বলতে লাগল যে, আমাদের আন্তরিক আনুগত্য ও পূর্ণ আস্থা আছে ঐ সুমহান ব্যক্তিটির উপর।"

"হুররে।" চীৎকার করে উঠল ডায়েডরিখ, সকলেই ঐ আওয়াজ করছিল। ঐ ধ্বনির মধ্যে এগতে এগতে হঠাৎ সে এসে পৌঁছে গেল ব্র্যানডেনবুর্গ গেটে। তার দু পা আগে-আগে কাইজার চলেছিলেন জনতার মধ্যে দিয়ে। ডায়েডরিখ তাঁর দিকে তাকাতে পেরেছিল, সে তাকিয়েছিল পাথরের মত শক্ত দৃঢ় প্রতিজ্ঞায় ভরা ঐ মুখের দিকে, এবং প্রদীপ্ত ঐ চোখের দিকে। কিন্তু এতই চীৎকার সে করেছে যে, তার নিজের চোখের দৃষ্টিই ঝাপসা হয়ে গিয়েছে। বিয়ার খেলে মনমেজাজ যেমন আকুল উল্লাসে অধীর হয়ে ওঠে, অনেকটা সেইভাবে হাওয়ায় ভাসতে-ভাসতে সে চলল। সবার মাথার উপর দিয়ে নিজের টুপীটা নাড়তে লাগল অদ্ভুত উন্মাদনায়। ওইখানে ঐ ঘোড়ার উপর, যে গেটের কাছে অনেক বিজয়-আনন্দ হয়েছে, সেই গেটের নীচে পাথরের মত শক্ত ও উজ্জ্বল ক্ষমতার প্রতিমূর্তি অশ্বপৃষ্ঠে চলেছেন। সেই ক্ষমতা, আমার উপরে যা লাঠি ঘোরায় আর আমরা যার পদতল চাটি! যে ক্ষমতা পদদলিত ক'রে যায় ক্ষুধা অসম্মান ও ঘৃণা। যার বিরুদ্ধে আমরা কিছুই করতে পারিনে, কেননা আমরা এই ক্ষমতাকে ভালোবাসি। এটা আমাদের রক্তের সঙ্গে মিশে আছে, কেননা আমরা এর বশ্যতা স্বীকার করে

নিয়েছি। আমরা এর একটা পরমাণু মাত্র, তিনি থুতুতে যা ফেলেছেন আমরা তার অণু মাত্র। আমরা প্রত্যেকেই এক-একটা অপদার্থ, আমরা শৃঙ্খলা-পরায়ণ, নিউ টিউইনস* এর শৃঙ্খলা পরায়ণ জনসমাবেশের মতন আমরা উপরে উঠতে থাকি। কখনো সেনাবাহিনীতে, কখনো সরকারী দপ্তরে, কখনো গির্জায় ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে, কখনো অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানে, কখনো ক্ষমতাবান ক্ষুদ্র গোষ্ঠীতে, এই রকম উঠতে-উঠতে আমরা শৃঙ্গে উঠি, উঠি সেই উচ্চে যেখানে আছে সেই ক্ষমতা—পাথরের মতন শক্ত ও সেইসঙ্গে প্রদীপ্ত। এর মধ্যেই আমরা বাস করি, এর মধ্যে অংশ নিই আমরা, যারা এর ধারে-কাছে নেই আমরা তাদের প্রতি নির্দয়; এবং এই ক্ষমতা আমাদের যখন পিষতে থাকে তখনো আমরা জয়োল্লাস করি; এর দ্বারাই প্রকাশিত হয় আমাদের ভালোবাসা!

পুলিশম্যানরা গেটে বেষ্টনী দিয়ে রেখেছিল, তাদেরই একজন ডায়েডরিখের বুকে এক প্রবল ঘা দিল, এতে তার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে গেল; কিন্তু তার চোখে জয়ের উল্লাস লেগেই আছে, যেন সে'ই এতক্ষণ ঐ দুর্দশাগ্রস্ত লোকদের উপর চোখ রেখে ঘোড়া চেপে চলে গেল, যে লোকেদের দাবিয়ে দেওয়া হয়েছে ও যারা তাদের ক্ষুধাই গিলে ফেলেছে। তাঁকে অনুসরণ কর! কাইজারকে অনুসরণ কর! ডায়েডরিখের মত সকলেই এই রকম বোধ করতে লাগল। তারা একটা বেষ্টনী ভাঙল। ঐ, ওখানে আবার দ্বিতীয় বেষ্টনী। তাদের সরে যেতে হল পাশে, এমন পথ তারা খুঁজতে লাগল যাতে তারা টায়ারগার্টেন ** পৌঁছতে পারে। অল্প কয়েকজনই পেল এই পথ। ডায়েডরিখ একা হয়ে গিয়েছে, সে ঘোড়া-চলার পথের দিকে গেল, কাইজারের দিকে গেল, কাইজারও তখন একা। একজন লোক উন্মাদনার চরমে পৌঁছেছে, নোংরা, অগোছালো, চোখ-দুটো তার দৈত্যের মতন: কাইজার লোকটার দিকে তাকালেন, তাঁর দৃষ্টি দিয়ে লোকটাকে যেন বিদ্ধ করে দিলেন। ডায়েডরিখ তার টুপী ছিঁড়ে ফেলল, তার মুখ হাঁ করা, কিন্তু, মুখ দিয়ে কোনো আওয়াজ বের হচ্ছে না। হঠাৎ সে থেমে যাওয়ায় পা পিছলে সে একটা খানায় পড়ল, পা-দুটো শূন্যে উঠে গেছে, সর্বাঙ্গ কর্দমাক্ত। কাইজার একটু হাসলেন। কাইজার তাঁর অনুচরদের দিকে তাকালেন, নিজের উরুর

* এটা একটি সমাজ, ডায়েডরিখ এই সমাজের লোক

** চিড়িয়াখানা ও পার্ক, এখন পশ্চিম-বার্লিনে

ডায়েডরিখ হাঁফাতে-হাঁফাতে বলল, "একথা শুনলে মেজাজ ঠিক রাখা যায় ? এই ঐতিহাসিক মুহূর্তটা ও পণ্ড করে দিতে চায় !"

"তুমি কাজের কাজ করেছ।"

"আমি বরাবরের জন্যে সৈন্যবাহিনীতে থাকতে পারলে খুশি হতাম।" বলল ডায়েডরিখ।

কে-একজন তার নোটবই নেড়ে-নেড়ে বলতে লাগল, "আমরা সেই জিনিসটা চাই। যাকে বলে আবহাওয়া। ভালো আবহাওয়া। এক্ষুনি তুমি একজন কমরেডকে পিটুনি দিয়েছ। কি, দাওনি ?"

ডায়েডরিখ হাঁফাতে-হাঁফাতেই বলল, "ওটা একটা সামান্য ব্যাপার। যে কোনো আভ্যন্তরীণ শত্রুর বিরুদ্ধে আমি আবার ওরকম করতে রাজি আছি। কাইজার আমাদের সহায়।"

রিপোর্টারটি মন্তব্য করল, "চমৎকার।" তারপর তার নোট বইয়ে লিখল, "ভয়ংকর উত্তেজিত জনতার মধ্যে সর্বশ্রেণীর লোক একবাক্যে বলতে লাগল যে, আমাদের আন্তরিক আনুগত্য ও পূর্ণ আস্থা আছে ঐ সুমহান ব্যক্তিটির উপর।"

"হুররে।" চীৎকার করে উঠল ডায়েডরিখ, সকলেই ঐ আওয়াজ করছিল। ঐ ধ্বনির মধ্যে এগতে এগতে হঠাৎ সে এসে পৌঁছে গেল ব্র্যানডেনবুর্গ গেটে। তার দু পা আগে-আগে কাইজার চলেছিলেন জনতার মধ্যে দিয়ে। ডায়েডরিখ তাঁর দিকে তাকাতে পেরেছিল, সে তাকিয়েছিল পাথরের মত শক্ত দৃঢ় প্রতিজ্ঞায় ভরা ঐ মুখের দিকে, এবং প্রদীপ্ত ঐ চোখের দিকে। কিন্তু এতই চীৎকার সে করেছে যে, তার নিজের চোখের দৃষ্টিই ঝাপসা হয়ে গিয়েছে। বিয়ার খেলে মনমেজাজ যেমন আকুল উল্লাসে অধীর হয়ে ওঠে, অনেকটা সেইভাবে হাওয়ায় ভাসতে-ভাসতে সে চলল। সবার মাথার উপর দিয়ে নিজের টুপীটা নাড়তে লাগল অদ্ভুত উন্মাদনায়। ওইখানে ঐ ঘোড়ার উপর, যে গেটের কাছে অনেক বিজয়-আনন্দ হয়েছে, সেই গেটের নীচে পাথরের মত শক্ত ও উজ্জ্বল ক্ষমতার প্রতিমূর্তি অশ্বপৃষ্ঠে চলেছেন। সেই ক্ষমতা, আমার উপরে যা লাঠি ঘোরায় আর আমরা যার পদতল চাটি ! যে ক্ষমতা পদদলিত ক'রে যায় ক্ষুধা অসম্মান ও ঘৃণা। যার বিরুদ্ধে আমরা কিছুই করতে পারিনে, কেননা আমরা এই ক্ষমতাকে ভালোবাসি। এটা আমাদের রক্তের সঙ্গে মিশে আছে, কেননা আমরা এর বশ্যতা স্বীকার করে

নিয়েছি। আমরা এর একটা পরমাণু মাত্র, তিনি থুতুতে যা ফেলেছেন আমরা তার অণু মাত্র। আমরা প্রত্যেকেই এক-একটা অপদার্থ, আমরা শৃঙ্খলা-পরায়ণ, নিউ টিউইনস* এর শৃঙ্খলা পরায়ণ জনসমাবেশের মতন আমরা উপরে উঠতে থাকি। কখনো সেনাবাহিনীতে, কখনো সরকারী দপ্তরে, কখনো গির্জায় ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে, কখনো অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানে, কখনো ক্ষমতাবান ক্ষুদ্র গোষ্ঠীতে, এই রকম উঠতে-উঠতে আমরা শৃঙ্গে উঠি, উঠি সেই উচ্চে যেখানে আছে সেই ক্ষমতা—পাথরের মতন শক্ত ও সেইসঙ্গে প্রদীপ্ত। এর মধ্যেই আমরা বাস করি, এর মধ্যে অংশ নিই আমরা, যারা এর ধারে-কাছে নেই আমরা তাদের প্রতি নির্দয়; এবং এই ক্ষমতা আমাদের যখন পিষতে থাকে তখনো আমরা জয়োল্লাস করি; এর দ্বারাই প্রকাশিত হয় আমাদের ভালোবাসা!

পুলিশম্যানরা গেটে বেষ্টনী দিয়ে রেখেছিল, তাদেরই একজন ডায়েডরিখের বুকে এক প্রবল ঘা দিল, এতে তার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে গেল; কিন্তু তার চোখে জয়ের উল্লাস লেগেই আছে, যেন সে'ই এতক্ষণ ঐ দুর্দশাগ্রস্ত লোকদের উপর চোখ রেখে ঘোড়া চেপে চলে গেল, যে লোকেদের দাবিয়ে দেওয়া হয়েছে ও যারা তাদের ক্ষুধাই গিলে ফেলেছে। তাঁকে অনুসরণ কর! কাইজারকে অনুসরণ কর! ডায়েডরিখের মত সকলেই এই রকম বোধ করতে লাগল। তারা একটা বেষ্টনী ভাঙল। ঐ, ওখানে আবার দ্বিতীয় বেষ্টনী। তাদের সরে যেতে হল পাশে, এমন পথ তারা খুঁজতে লাগল যাতে তারা টায়ারগার্টেন ** পৌঁছতে পারে। অল্প কয়েকজনই পেল এই পথ। ডায়েডরিখ একা হয়ে গিয়েছে, সে ঘোড়া-চলার পথের দিকে গেল, কাইজারের দিকে গেল, কাইজারও তখন একা। একজন লোক উন্মাদনার চরমে পৌঁছেছে, নোংরা, অগোছালো, চোখ-দুটো তার দৈত্যের মতন: কাইজার লোকটার দিকে তাকালেন, তাঁর দৃষ্টি দিয়ে লোকটাকে যেন বিদ্ধ করে দিলেন। ডায়েডরিখ তার টুপী ছিঁড়ে ফেলল, তার মুখ হাঁ করা, কিন্তু, মুখ দিয়ে কোনো আওয়াজ বের হচ্ছে না। হঠাৎ সে থেমে যাওয়ায় পা পিছলে সে একটা খানায় পড়ল, পা-দুটো শূন্যে উঠে গেছে, সর্বাঙ্গ কর্দমাক্ত। কাইজার একটু হাসলেন। কাইজার তাঁর অনুচরদের দিকে তাকালেন, নিজের উরুর

* এটা একটি সমাজ, ডায়েডরিখ এই সমাজের লোক

** চিড়িয়াখানা ও পার্ক, এখন পশ্চিম-বার্লিনে

উপর চাপড় দিয়ে হাসলেন। ঐ খানার মধ্যে থেকে ডায়েডরিখ দেখতে লাগল—কাইজার চলে যাচ্ছেন, তখন তার মুখ হাঁ করা।

তার শ্রমিকদের উদ্দেশে ডায়েডরিখের বক্তৃতা

…ডায়েডরিখ বিয়ার পান শেষ করে, তাঁর পরিবারের সকলের আগে-আগে নীচতলায় নেমে এলেন। উঠোন একেবারে পরিষ্কার করে ধোয়া হয়েছে। ফ্যাক্টরির গেটে ফুলের মালা, তার মাঝখানে বোনা হয়েছে একটা কথা "স্বাগতম !!" তার সামনে বৃদ্ধ হিসাবরক্ষক সটবায়ার দাঁড়িয়ে, সে বলল, "নমস্কার ডক্টর। আমার কিছু কাজ বাকি ছিল বলে উপরে যেতে পারিনি।"

"আজকের জন্যে সেটা রেখে দিলেই পারতে।" বলেই সটবায়ারকে পেরিয়ে সে চলে গেল। ব্যাগ স্তূপ করে রাখা হয় সে ঘরে, সেখানে গিয়ে সে দেখল সব শ্রমিকদের। তারা সার বেঁধে সকলে সেখানে দাঁড়িয়ে, যে বারোজন শ্রমিক কাগজের মেশিন চালায়, কাগজ-কল চালায়, ও কাগজ কাটার কল চালায়, তারা আছে ; আর আছে তিনজন কেরাণী, ও সেই মেয়ে-কর্মীটি যার কাজ হচ্ছে ঐ র‍্যাগ বা পুরনো কাপড়চোপড় ভাগ-ভাগ করে রাখা। শ্রমিকেরা তাদের গলা সাফ করে নিল, একটু থামল, তার পর কয়েকজন মেয়ে-কর্মী একটা বাচ্চা মেয়েকে ঠেলে দিল, তার হাতে ছিল ফুলের গুচ্ছ, মিষ্টি গলায় সে ডক্টরের স্থখসমৃদ্ধি প্রার্থনা করে তাকে স্বাগত জানাল। ডায়েডরিখ বেশ সহৃদয় ভঙ্গিতে ফুল নিল। এখন গলা সাফ করার পালা তার। সে তার পরিবারের লোকজনের দিকে তাকাল, তারপর এক এক করে প্রত্যেকের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিল, এমন কি সেই কালো-দাড়ি-ওলা কারিগরটির দিকেও, ঐ লোকটার চাউনিতে সে একটু বিব্রত বোধ করলেও সে আরম্ভ করল—

"সমবেত সকলে ! তোমরা যখন আমার অধীনস্থ ব্যক্তি, আমার কর্মচারী, আমি তোমাদের শুধু বলতে চাই যে, ভবিষ্যতে এখানে প্রবলভাবে কাজ করা হবে। আমি ব্যবসাটাকে জাগিয়ে তোলার জন্যে বদ্ধপরিকর। অল্প কিছু-দিন আগে এখানে যখন কোনো মনিব ছিল না, তখন তোমাদের মধ্যের অনেকেই হয়তো ভেবেছিলে যে, আলসেমি করে কাটিয়ে দিলেই চলবে। ওটা মারাত্মক ভুল। এ কথা আমি বিশেষ করে বলছি সেই পুরনো কর্মচারীদেরই যারা আমার শ্রদ্ধেয় বাবার আমল থেকে এখানে কাজ করছে।"

গলা আরও তুলে, আরও তেজী মেজাজে ও রূঢ় ভাবেই বলল, একবার তাকাল পুরনো কর্মচারী সটবায়ারের দিকে—

"এখন আমি হাল নিজের হাতে ধরেছি। আমার উদ্দেশ্য সহজ। আমি তোমাদের এক চমৎকার ভবিষ্যতে নিয়ে যেতে চাই, আমি তোমার সুন্দর দিন দেখাতে চাই। এ কাজে আমাকে যারা সাহায্য করবে আমি তাদের আন্তরিক ভাবে স্বাগত জানাই। যারা আমার এ কাজে বাধা দেবে, আমি তাদের গুঁড়ো ক'রে ফেলব।"

সে তার চোখ দীপ্ত করে তোলার চেষ্টা করল, তাঁর গোঁফ উঁচু হয়ে উঠল।

"এখানে মনিব একজনই। সে মনিব আমি। আমি কৈফিয়ত দেব কেবল ঈশ্বরকে ও আমার বিবেককে। পিতার মতন স্নেহ আমি সর্বদাই তোমাদের করব। কিন্তু আমার অনমনীয় মনোবলের কাছে তোমাদের সব বৈপ্লবিক মতলব ধূলিসাৎ হয়ে যাবে। যদি কখনো তোমাদের কারও একজনের সঙ্গে—"

কালো দাড়ির সেই কারিগরের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখল সে। কারিগরটি একটু সন্ধিগ্ধভাবে তাকিয়েছিল। "—সোশ্যাল ডেমোক্রাট চক্রের সামান্য যোগ দেখতে পাই, তাহলে আমি আমার সঙ্গে তার সব সম্পর্ক চুকিয়ে দেব। কেননা প্রত্যেকটি সোশ্যাল ডেমোক্রাটকে আমি আমার ব্যবসায়ের শত্রু বলে মনে করি। এবং মনে করি আমার পিতৃভূমিরও সে শত্রু···এখন নিজের নিজের কাজে যাও, ও আমি যা বললাম ভেবে ছাখো।"

হঠাৎ সে ঘুরে দাঁড়াল ও জোরে-জোরে নিশ্বাস ফেলতে লাগল। এই কড়া-কড়া কথা বলায় তার মাথা ঘুরতে আরম্ভ করেছে, একটা মানুষকেও আর চিনতে পারছে না। তার পরিবারের সকলে সশ্রদ্ধভাবে ও হতভম্ব হয়ে তার পিছন-পিছন চলল; কর্মীরা এ ওর মুখের দিকে বোবার মতন অনেকক্ষণ চেয়ে রইল। তার পর বিয়ারের বোতলের কাছে গেল তারা, আজকের উৎসবের জন্যে এর আয়োজন ছিল।

জোসেফ রথ

র‍্যাডেটৎসকাইমার্শ

জোসেফ রথ (১৮৯৪-১৯৩৯) হচ্ছেন অস্ট্রীয় লেখক, তিনি নিজের কালের সমালোচনা ক'রে ও আধুনিক সভ্যতার ত্রুটিবিচ্যুতি প্রকাশ ক'রে নভেল

লিখতে আরম্ভ করেন। তাঁর এই সমালোচনামূলক মনোভাব সত্ত্বেও তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনাগুলিতে তাঁর মনের বিষাদ ও অবসাদই বেশি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সমাজের বিশেষ একটি দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে লেখা এই রচনাগুলিতে মূল বক্তব্য বিষয় হচ্ছে অস্ট্রো-হাঙ্গেরীয় সাম্রাজ্যের পতন। রথ-এর সবচেয়ে বেশি পরিচিত নভেল হচ্ছে "র‍্যাডেটৎসকাইমার্শ" (১৯৩২), এতে তিনি সম্রাটের প্রতি অনুগত অফিসার ও সরকারী কর্মীদের একটি পরিবারের বিবরণ দিয়েছেন। এই পরিবার ট্রোটা নামে অভিহিত। এই পরিবারের শেষ প্রতিনিধি বেশ বিশ্বাসী ও সৎ কিন্তু প্রাণশক্তি তাব কম, বিশ্বযুদ্ধে তার প্রাণ যায়। অস্ট্রীয় রাষ্ট্রের পতনের ঐতিহাসিকতা দেখানো হয়েছে এই চরিত্রটির মধ্য দিয়ে। আমাদের উদ্‌ধৃতাংশে দেখানো হচ্ছে—সম্রাট্ ফ্রান্সিস জোসেফ সামরিক কুচকাওয়াজ দেখছেন, এর থেকেই একজন সম্রাট কিভাবে তাঁর শেষ-পরিণতিতে গিয়ে পৌঁছচ্ছেন তার একটা চিত্র পাওয়া যাচ্ছে। রথ কিন্তু সম্রাট্‌কে ক্ষুরধার ব্যাঙ্গবিদ্রূপ এখানে করেন নি, স্তুতির ছলে একটু চাপা নিন্দা করেছেন, তার সঙ্গে সহানুভূতিও মেশানো আছে। এইটি একটি বিষাদময় বিদায়ের দৃশ্য।

সম্রাট বৃদ্ধ। পৃথিবীর মধ্যে তিনি বৃদ্ধতম সম্রাট্। তাঁর চারদিকে মৃত্যুর পদধ্বনি। সমস্ত মাঠ একেবারে ফাঁকা, কেবল মাত্র ভুলে-যাওয়া একটা রুপালি কাস্তের মতন সম্রাট সেখানে একা। সেখানে দাঁড়িয়ে তিনি অপেক্ষা করছেন। অনেক দিন ধ'রেই তাঁর বিষণ্ণ ফাঁকা দৃষ্টি এক শূন্যতার দিকে চেয়ে আছে। তাঁর মাথায় একেবারে টাক, গোলাকৃতি মরুভূমির মতন তা দেখতে। তাঁর মুখের দু পাশে শাদা দাড়ি, তুষার দিয়ে তৈরি দুটি পাখার মত দেখতে। তাঁর মুখের চামড়া কুঁচকে গিয়েছে, বহুদিন থেকে ফেলে-রাখা চষা-জমির মতন তার চেহারা। তার শরীর কৃশ, পিঠ একটু বাঁকা। বাড়ির মধ্যে তিনি ছোট-ছোট পা ফেলে চলেন। কিন্তু সদর রাস্তায় এলেই তিনি তাঁর পা শক্ত করার চেষ্টা করেন, হাঁটুতে জোর আনার চেষ্টা করেন, হাল্কা পায়ে চলার চেষ্টা করেন, আর পিঠ টান করার চেষ্টা করেন। তিনি তাঁর চোখে কৃত্রিম স্নেহমমতা ফুটিয়ে তোলেন, সে দৃষ্টি রাজকীয় গরিমায় ভরে তুলতে চান। তাঁর দিকে যে'ই তাকায় তিনি তার দিকে তাকাচ্ছেন বলে মনে হয়, যে'ই তাঁকে অভিনন্দন জানায় তাঁর চোখ দেখে মনে হয় তিনিও তাকে অভিনন্দিত

করছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁর চোখের সামনে দিয়ে জনতার মুখ ভেসে চলে যেত, এবং সোজাসুজি দৃষ্টি মেলে দাঁড়িয়ে থাকতেন তিনি, যিনি এখন দাঁড়িয়ে আছেন জীবন ও মৃত্যুর সীমারেখায় ; ঘরবাড়ি অরণ্য বা পাহাড়ের বাধা থাকা সত্ত্বেও দিগন্তের যে রেখা দেখা যায়, তিনি এখন সেই রেখায় এসে পৌঁছেছেন। অনেকে মনে করত যে ফ্রানৎস জোসেফ তাদের চেয়ে কম জানেন, কেননা তিনি তাদের চেয়ে বৃদ্ধ হয়েছেন। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তিনি অনেকের থেকেই অনেক বেশি জানতেন। তিনি তাঁর সাম্রাজ্যের সূর্যকে অস্তাচলে নেমে যেতে দেখেছেন, তবু তিনি কিছু বলেন নি। তিনি জানতেন যে, ঐ সূর্য অস্ত যাবার আগেই তাঁর মৃত্যু হবে। যে কথা তিনি জানতেন ও বুঝতেন তাও না-জানার ভাণ ক'রে তিনি সে সম্বন্ধে অনেক কথা মন দিয়ে শুনতেন। কেননা, তিনি শিশুর ও বৃদ্ধের চালাকি দিয়েই সকলকে সৌন্দর্যের পথে নিয়ে যেতে চাইতেন। তাঁর থেকেও চালাক বলে যারা গর্ব করত তাদের সেই গর্ব দেখে তিনি মনে-মনে হাসতেন। তিনি বেশ সরলভাবে চালাকি করতেন, কেননা তাঁর উপদেষ্টাদের মতন চালাক হওয়াটা সম্রাটের পক্ষে শোভা পায় না। তিনি চালাক সেজে থাকা থেকে সরল সেজে থাকাটাই পছন্দ করতেন। তিনি যখন শিকারে যেতেন, তাঁর বন্দুকের সামনেই যে তখন শিকার এনে পৌঁছে দেওয়া হত তা তিনি জানতেন। অন্য জন্তুও তিনি মারতে পারতেন বটে, কিন্তু তা না মেরে তিনি কেবল সেইটেকেই মারতেন যেটা এনে তাঁর সামনে ফেলা হত। তিনি ওদের কৌশল যে বুঝতে পারছেন তা ওদের বুঝতে দেওয়া বৃদ্ধ রাজার পক্ষে শোভন নয়, এবং তাঁর শিকার-সহায়কের চেয়ে তিনি যে ভালো শিকার করতে পারেন তা তাদের জানতে দেওয়াও ঠিক না। একটা রূপকথা তাঁকে বললে তিনি তা বিশ্বাস করে ফেলেছেন—এমনি ভাণ করতেন। কেউ অসত্য কথা বলছে এটা জানতে পারা সম্রাটের পক্ষে সংগত নয়। কেউ তাঁকে নিয়ে হাসাহাসি করতে তিনি তা যেন দেখতেই পেতেন না। কেউ তাঁকে নিয়ে হাসছে এটা বুঝতে পারা সম্রাটের শোভা পায় না। যতক্ষণ তিনি লক্ষ্য করতে না-চাইতেন ততক্ষণ হাসিটা হাস্যকরই বোধ হত। তাঁর যখন জ্বর হয়েছিল, এবং তাঁর চারদিকের সকলে যখন কাঁপছিল, তাঁর ব্যক্তিগত চিকিৎসক তাঁকে যখন মিথ্যা কথা বলল যে, জ্বর নেই, তখন সম্রাট বললেন, "তবে তো সব ঠিক আছে", যদিও তিনি জানতেন যে, জ্বর তাঁর আছেই। কোনো সম্রাট কোনো চিকিৎসককে

মিথ্যা কথার দায়ে দোষী করতে পারেন না। তার উপর, তিনি জানতেন যে, মৃত্যুর সময় তখনও তাঁর হয় নি। তিনি এ কথাও জানতেন যে, অনেক রাত্রে তিনি জ্বরের যন্ত্রণায় ছটফট করেছেন, কিন্তু ডাক্তার তার কিছুই জানেন না। কেননা, অনেক সময় তাঁর অসুখ হত, কিন্তু কেউ টের পেত না। অন্য সময়, তিনি সুস্থ থাকলেও অনেকে বলত তিনি অসুস্থ, তখন তিনি তাদের কথা বিশ্বাস করার ভাণ করতেন। যেখানে লোকে মনে করল তিনি দয়াবান, সেখানে তিনি উদাসীন হয়ে যেতেন। যেখানে তাঁকে লোকে মনে করত, তার মনে কোনো দাগ কাটছে, সেখানে তাঁর হৃদয় ব্যথিত হত। তিনি দীর্ঘকালের জীবনে এটা বুঝতে পেরেছেন যে, সত্য কথা বলা বেকুবি। লোকের কোনো ভুল হলে তিনি কিছু মনে করতেন না। তাঁর বিশাল সাম্রাজ্যে তাঁকে নিয়ে রঙ্গতামাশায় তাঁর যতটা বিশ্বাস ছিল ততটা বিশ্বাস ছিল না প্রকৃত কোনো কাজের প্রতি। কিন্তু পার্থিব ব্যাপারে বা ঠাট্টাবিদ্রূপ দিয়ে নিজের ওজন বোঝার চেষ্টা করা সম্রাটের মানায় না। এইজন্যে সম্রাট কোনো কথা বলতেন না।

একদিন তিনি ট্রেনে চাপলেন, পুবের দিকে দ্রুত চলল সেই ট্রেন।

রুশ সীমান্তের দশ মাইলের মত দূরে, জেদ নামক গ্রামে একটা পুরনো প্রাসাদে সম্রাটের থাকার ব্যবস্থা হল। অফিসাররা যেসব কুড়ে-ঘরে আছেন, ঐ রকম একটা কুটীরে তাঁর থাকার ইচ্ছে ছিল। বহুকাল হল প্রকৃত সামরিক জীবন উপভোগ করেন নি। একবার মাত্র এ রকম জীবন তিনি উপভোগ করেন। সেই ইতালীয় অভিযানের সময়ে তিনি তাঁর বিছানায় জ্যান্ত একটা মাছি দেখেছিলেন, কিন্তু কাউকে কিছু বলেন নি। তিনি সম্রাট; কখনো পোকামাকড় নিয়ে কথা বলেন না। এই অভিমত তাঁর সে সময়েও ছিল।

শোবার ঘরের জানালা বন্ধ ছিল। সে রাত্রে তিনি ঘুমাতে পারেন নি। কিন্তু তাঁকে পাহারা দেবার যাদের কথা তারা সবাই ঘুমাচ্ছিল। সম্রাট তাঁর লম্বা ও ঢোলা শার্ট গায়ে দিয়ে বিছানা থেকে উঠলেন, এবং যাতে কারো ঘুম না ভাঙে এজন্যে সন্তর্পণে গিয়ে সরু ও বেশ উঁচু জানালায় ছিটকিনিটা খুললেন। তিনি সেখানে দাঁড়িয়ে শরৎকালের ঠাণ্ডা বাতাস বুক ভরে নিলেন, নীল আকাশের অগণ্য তারা দেখতে লাগলেন, ও সেপাইদের জ্বালা ক্যাম্প-ফায়ার দেখতে লাগলেন। তাঁকে নিয়ে লেখা একটা বই তিনি পড়েছেন, তার এক জায়গায় লেখা হয়েছে—"প্রথম ফ্রানৎস জোসেফ

রোমাণ্টিক নন"। বৃদ্ধ লোকটি ভাবলেন, আমি রোমাণ্টিক নই, তারা লেখে। কিন্তু আমি ক্যাম্প-ফায়ার ভালোবাসি। তিনি একজন সাধারণ লেফন্যাণ্ট ও যুবক হলে ভালো হত। তিনি ভাবতে লাগলেন, হয়তো আমি রোমাণ্টিক নই, কিন্তু আমি যুবক হতে চাই। সেই সময় সম্রাট ভেবেছিলেন—হয়তো আমি ভুল করছিনে, কেননা আঠারো বছর বয়সে আমি সিংহাসনে উঠেছি। "আমি সিংহাসনে উঠেছি" এই কথা-কয়টি সম্রাটের কাছে বড়ই উদ্ধত কথা বলে মনে হল। কেননা, সেই সময়ে নিজেকে সম্রাট বলে তিনি ভাবতেই পারেন নি। কথাটা সত্যি। ঐ বইতেই লেখা আছে যে, বেশ জাঁকজমক করেই তাঁকে সিংহাসনে বসানো হয়। এ বিষয়ে সন্দেহই নেই যে, তিনি ফ্রানৎস জোসেফ দি ফার্স্ট, অর্থাৎ কিনা তিনি এই সিংহাসনের প্রথম-ফ্রানৎস জোসেফ। জানালার বাইরে তারাখচিত নীল আকাশ গোল হয়ে উপুড় হয়ে আছে। গ্রামগুলি সমতল ভূমিতে বিস্তৃত হয়ে পড়ে আছে। তিনি শুনেছেন এই জানালাটা নাকি উত্তর-পুব দিকের। তাহলে তিনি চেয়ে আছেন রাশিয়ার দিকে। কিন্তু তিনি সীমান্ত কোন্‌টা স্বভাবতই তা ধরতে পারছেন না। এই সময়ে সম্রাট্ ফ্রানৎস জোসেফ তাঁর সাম্রাজ্যের সীমানা দেখতে পেলে খুশি হতেন। তিনি একটু হাসলেন। রাত্রিটা নিটোল, নিস্তব্ধ ও তারাময়। সম্রাট জানালার কাছে দাঁড়িয়ে রইলেন। তিনি কৃশ, তিনি বৃদ্ধ। সাদা রাত্রিবাস প'রে তিনি এখানে দাঁড়িয়ে। এই অন্তহীন রাত্রির সম্মুখে নিজেকে তাঁর অতি সামান্য আর অতি নগণ্য ব'লে বোধ হল।

তাঁর তাঁবুর সামনে সব চেয়ে ক্ষুদ্র যে সেপাইটি টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে, সে হচ্ছে তাঁর চেয়ে বেশি শক্তিশালী। সবচেয়ে ক্ষুদ্র সেপাইটি। আর, তিনি কিনা সর্বাধিনায়ক। প্রত্যেকটি সেপাই এই সর্বশক্তিমান সম্রাট প্রথম-ফ্রানৎস জোসেফের নামে আনুগত্যের শপথ নিয়েছে। ঈশ্বরের শুভেচ্ছাতেই তিনি সম্রাট, এবং তিনি সেই সর্বশক্তিমান ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখেন। সেই সর্বশক্তিমান ঐ নীল আকাশের সোনালি তারার পিছনে লুক্কায়িত আছেন, মানুষের কল্পনার পরপারে আছেন তিনি। এসব তাঁরই তারা, এ আকাশও তাঁর—যে আকাশ সারা পৃথিবীর উপর আচ্ছাদনের মতন উপুড় হয়ে আছে, সেই বিশাল পৃথিবীর একটা অংশ হচ্ছে এই অস্ট্রো-হাঙ্গেরীয় সাম্রাজ্য, যে সাম্রাজ্য প্রথম-ফ্রানৎস জোসেফের উপর সমর্পণ করেছেন সেই সর্বশক্তিমান। কিন্তু প্রথম-ফ্রানৎস জোসেফ এখন শীর্ণ বৃদ্ধ একটা মানুষ, জানলার কাছে সে ভয়ে-ভয়ে দাঁড়িয়ে

আছে—কোনো প্রহরী আবার জেগে না-যায়। ঝিঁঝি পোকার ঝংকার শোনা যাচ্ছে। রাত্রির মতন তাদের ঝংকারেরও যেন শেষ নেই, সম্রাটের মনে রাত্রিও যেমন প্রসন্নতা এনে দিয়েছে, এই ঝিঁঝিরাও তাই দিচ্ছে। এক-একবার সম্রাটের মনে হচ্ছে যে, তারারাই বুঝি গান গাইছে। তিনি একটু শিউরে উঠলেন। কিন্তু জানালা বন্ধ করতে তাঁর ভয় হল। খোলার সময় শব্দ হয়নি বটে, কিন্তু বন্ধ করতে গিয়ে শব্দ হয়ে যেতে পারে। তাঁর হাত কাঁপছিল। তাঁর মনে পড়ল, অনেক কাল আগে তিনি সৈন্যদের কুজকাওয়াজ দেখেছিলেন তাঁর জেলায়। এই শোবার ঘরের কথাও তাঁর মনে পড়ে গিয়েছে অনেক দিন বাদে। কিন্তু এর মধ্যে দশ বিশ বা আরও অনেক বেশী সময় কেটে গিয়েছে কিনা তা তিনি বলতে পারছেন না। তিনি যেন সময়ের সমুদ্রে সাঁতার কাটছেন, কোনো লক্ষ্যের দিকে চলছেন না অবশ্য, এদিকে-ওদিকে ভাসছেন, কখনও কখনও বা গিয়ে পড়ছেন কোনো সামুদ্রিক পাহাড়ের উপর। একদিন-না-একদিন ডুবতে তাঁকে হবেই। তিনি হাঁচলেন। নিশ্চয় ঠাণ্ডা লেগেছে। কেউ না জেগে ওঠে বলে তিনি চেষ্টা করেছিলেন। তিনি কান পেতে রইলেন। পাশের ঘরে কিছু নড়ে-চড়ে উঠল না। তিনি সাবধানে জানালা বন্ধ করে, আস্তে-আস্তে পা ফেলে তাঁর বিছানায় গেলেন। তিনি তারাখচিত ঐ আকাশের ছবিটা নিজের সঙ্গে নিয়ে নিয়েছেন। তিনি চোখ বুজেও তা দেখতে লাগলেন। তার পর তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন—যেন আকাশের ওই চন্দ্রাতপের নীচে।

তিনি সৈন্যসমাবেশের মধ্যে থাকলে যেমন জেগে ওঠেন, তেমনি কাঁটায়-কাঁটায় চারটের সময় জেগে উঠলেন। তাঁর বালকভৃত্যটি তাঁর ঘরে এসে গিয়েছে। তিনি বুঝতে পারলেন, দরজার বাইরে তাঁর সহকারী অপেক্ষা করছে। হ্যাঁ, এবার দিবারম্ভ করতে হবে। সারা দিনের মধ্যে এক ঘণ্টা কালও তিনি একা থাকতে পারবেন না। এই ক্ষতি পূরণের জন্যে রাত্রে মিনিট পনেরো সময় তিনি ঐ জানলার ধারে কাটিয়ে নিয়েছেন। এই রকম ভাবে একটু আনন্দ চুরি করার বিষয় তিনি একটু ভাবলেন, ও হাসলেন। তিনি বালকভৃত্যটির দিকে চেয়ে একটু হাসলেন, সম্রাটের মুখে এমন হাসি জীবনে সে এই প্রথম দেখে থতমত খেয়ে গেল, সে দেখল তাঁর দাড়ি কেমন এলোমেলো হয়ে আছে, সে দেখল সম্রাটের মুখের রং কেমন হলুদ, সে দেখল তাঁর মাথার টাকে চামড়া ফেটে কেমন চটা উঠছে। সে বুঝতে পারলনা

ঐ বৃদ্ধ মানুষের হাসির সঙ্গে যোগ দেওয়া উঠিত, না, চুপ করে থাকা উচিত। হঠাৎই সম্রাট শিস দিয়ে উঠলেন। তিনি সত্যিই তাঁর ঠোঁট সরু ক'রে কুঁচকে নিয়েছেন। তাঁর দুদিকের দাড়ি যেন কাছাকাছি হয়ে এল। সম্রাট শিস দিতে লাগলেন, একটা পরিচিত সুর, যদিও তা একটু অন্যরকম ক'রে নেওয়া। এটা একটা অতি নগণ্য রাখালদের বাঁশির সুর। সম্রাট বললেন, "এটা কী সুর, কাদের গান আমি তা জানতে চাই।" কিন্তু তা তো বালক-ভৃত্যটি জানে না। কিছুক্ষণ পরে সম্রাট স্নানের ঘরে গেলেন, হাত-মুখ ধুতে-ধুতে তিনি ভুলে গেলেন গানটা।

খুবই কর্মব্যস্ত দিনটা। ফ্রানৎস জোসেফ কাগজের টুকরোগুলি দেখতে লাগলেন, তাতে আজকের দিনের কর্মসূচী লেখা আছে, প্রতি ঘণ্টার কাজের কথা। এখানে একটি মাত্র গ্রীক অরথোডক্স গির্জা আছে। একজন রোমান ক্যাথলিক বিশপ প্রথমে প্রার্থনা পরিচালনা করবেন, তার পর গ্রীক অরথোডক্স যাজক তা পাঠ করবেন। 'এইসব যাজকীয় উৎসবের মতন অন্য কোনো ব্যাপার তাঁকে এমন ক্লান্ত করে না। তার মনে হল, একজন পূজনীয় ব্যক্তির সামনে যেমন নিজেকে সন্ত্রস্ত করে নিতে হয়, ঈশ্বরের সামনে তিনি সেইভাবে নিজেকে আত্মস্থ করে নেবেন। তিনি তো বৃদ্ধ হয়ে গিয়েছেনই। সম্রাট ভাবলেন, ঈশ্বর তাঁর কোনো-কোনো ত্রুটি নিশ্চয় মার্জনা করবেন। কিন্তু ঈশ্বর আমার চেয়েও বৃদ্ধ, এবং হয়তো তাঁর কোনো-কোনো আদেশ আমার পক্ষে দুর্বোধ্য হতে পারে, আমার কোনো-কোন আদেশ যেমন আমার সেনাবাহিনীর সৈন্যদের বোধগম্য হয় না! প্রত্যেক অধীনস্থ ব্যক্তি যদি তার উপরওলাকে সমালোচনা করে তবে এর শেষ কোথায়! ঐ জানালার ভিতর দিয়ে সম্রাট দেখতে পেলেন ঈশ্বরের সূর্য উঠছে। তিনি বুকে ক্রস চিহ্ন এঁকে হাঁটু ভাঁজ করলেন। স্মরণাতীত কাল থেকে প্রত্যেক দিন সকালে সূর্য উঠছে। তিনি সারা জীবন সূর্যোদয়ের আগে উঠে থাকেন, একজন সেপাই যেমন তার উপরওলা অফিসারের আগে ওঠে। সব রকম সূর্যোদয়ের সঙ্গে তাঁর পরিচয় আছে, গ্রীষ্মকালের অগ্নিবর্ণ আবির্ভাব থেকে শীতকালের কুয়াশাচ্ছন্ন আবির্ভাব পর্যন্ত—সব তাঁর জানা। কবে তাঁর জীবনে বিপর্যয় ঘটেছে, কবে সৌভাগ্যকর কি ঘটেছে, সে সম্বন্ধে তিনি সন-তারিখ, দিন মাস কি বছর কিছুই মনে করতে পারবেন না। কিন্তু তাঁর জীবনে স্মরণীয় ঘটনা ঘটেছে যেদিন, সেদিনের সকালটার কথা তাঁর মনে আছে। তিনি বুঝতে পারেন, এই

সকালটা ভালো, এইটে মন্দ। প্রত্যেক সকলেই তিনি তাঁর বুকের উপর ক্রস্‌চিহ্ন এঁকেছেন, হাঁটু গেড়ে বসেছেন, যেমন রোজ সকালে গাছেরা সূর্যের দিকে পাতা মেলে দেয়, সেই দিনে ঝড় আসবে কিংবা তাদের উপরে কুঠারের আঘাত পড়বে, অথবা মারাত্মক কুয়াশা আসবে, কিংবা দিনটি শান্ত ও প্রসন্ন থাকবে—এসব বিবেচনা না করেই তারা মেলে দেয় তাদের পাতা।

কুর্‌ট টুচলস্কি

স্বদেশ

কুর্‌ট টুচলস্কি (১৮৯০-১৯৩৫) ভাইমার রিপাবলিক আমলের একজন কড়া সমালোচক, তিনি ছিলেন মানবিকতাবাদী সমাজবাদী ও শান্তিকামী। তিনি সারাজীবন মধ্যবিত্তদের অকর্মণ্যতার ও আত্মতৃপ্ততার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে গিয়েছেন। রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়ার, সামরিকতন্ত্রের ও অন্ধ-দেশ-প্রীতিরও তিনি ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। তিনি ১৯২৪ সালে জার্মানী ত্যাগ করেন, পরে তিনি সুইডেনে যান। ন্যাশনাল সোশ্যালিস্টদের অভ্যুদয়ে তিনি একেবারে হতাশ হয়ে পড়েন। তাঁর সমালোচনামূলক ও বিদ্রূপাত্মক রচনার শেষ সংগ্রহগ্রন্থ থেকে তাঁর এই "হোমল্যাণ্ড" রচনাটি নেওয়া, রচনা-সংগ্রহটি ১৯২৯ সালে প্রকাশিত হয়। রচনাসংগ্রহটির নাম দেন তিনি "ডয়েশল্যাণ্ড, ডয়েশল্যাণ্ড, অ্যাবার অল"। তাঁর এই রচনার প্রথমেই এ বিষয়ের উল্লেখ আছে। এখানেই, বোধ হয়, একবার মাত্রই টুচলস্কি কোনো বিষয়ে 'হ্যাঁ' বলেছেন, কিন্তু তবুও তিনি দোষগুণবিচারের মনোভাব পরিত্যাগ করেননি, তিনি দেশপ্রীতি ও অন্ধ-দেশপ্রীতি এ দুয়ের মধ্যে প্রভেদ দেখিয়েছেন।

এখন, আমরা অনেক ব্যাপারেই বলেছি—না। সমবেদনার ক্ষেত্রে—না। প্রেমের ক্ষেত্রে—না। ঘৃণার ব্যাপারে—না। আবেগে—না। এবার আমরা একবার মাত্র বলতে চাই—হ্যাঁ। হ্যাঁ বলতে চাই গ্রামাঞ্চলের সকলকে, এবং আমাদের দেশ জার্মানীকে।

সেই দেশকে, যেখানে আমরা জন্মেছি ও যেখানকার ভাষা আমরা ব্যবহার করি।

আমরা যদি স্বদেশকে ভালোবাসি তাহলে সেটা কোন্ দেশ তা নিয়ে মাথা

ঘামিয়ো না। কিন্তু বিশেষ করে এই দেশটাকে কেন– অন্যদেশকে নয় কেন? অনেক তো সুন্দর-সুন্দর দেশ আছে।

হ্যাঁ। আছে। কিন্তু সেসব দেশে আমরা হৃদয় খুলে কথা বলতে পারিনে। যদি-বা বলি, তাহলে তা অন্য ভাষায়।

জার্মানীর প্রত্যেকটি জায়গায় গিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে যদি বলা হয়—আ, কী অপূর্ব। তাহলে তা সত্যভাষণ নয়। প্রত্যেক অঞ্চলেই কোনো কোনো বিষয়ের মিল আছে, আর, আমাদের প্রত্যেকের কাছেই তাদের মধ্যে পার্থক্যও আছে। কারো কারো কাছে পাহাড়ই মনোরম লাগে, যেখানকার মাঠ বা তৃণক্ষেত্র থেকে আঁকাবাঁকা সরু পথ দেখা যায়, পাহাড়ি হ্রদের কিনারে যেখানে পাওয়া যায় জলের জঙ্গলের ও প্রস্তরশিলার সুঘ্রাণ, এবং যেখানে একেবারে একা হয়ে যাওয়া যায়। এইখানে যদি হয় তোমার স্বদেশ, তাহলে তুমি তার হৃদয়স্পন্দন অনুভব করতে পারবে। কিন্তু বাজে বইতে, চুটকো কবিতায় ও সিনেমায় এ জিনিসটা এমন মিথ্যা করে দেওয়া হয়েছে যে, তুমি স্বদেশকে ভালোবাস বলতেই লজ্জা পাবে। কিন্তু যে জানে পর্বতের গান জিনিসটা কি, এর প্রতিধ্বনি যে শুনতে পায়, যে গ্রামদেশের সুরসংগতি অনুভব করতে পারে.. না, সে যদি কেবল বুঝতে পারে এইটেই তার মনের মত জায়গা—তাহলে এইটেই তার স্বদেশ। এই ভূমি, এই পর্বত, এই হ্রদ তখনই হয়ে যায় তার। এই ভূমির একটি কণারও সে মালিক না হলেও। এই যে বোধ, এটা কোনো রাজনীতির প্রভাব দিয়ে গড়া নয়, এই বোধ দিয়েই আমরা আমাদের দেশকে ভালোবাসি। রাস্তা দিয়ে এইভাবে বাতাস খেলে যায়, অন্য কোনো ভাবে নয়—এই জন্যেই এ'কে ভালোবাসি; কিংবা যে-আলোকের খেলা দেখে আমরা অভ্যস্ত তার জন্যেই। এই রকম আরও হাজার-হাজার কারণ থাকতে পারে যার তালিকা দেওয়া সম্ভব নয়, এবং যার সম্বন্ধে আমরা সচেতনও নই, অথচ যার প্রভাব আমাদের রক্তে মিশে আছে।

অজস্র ভুল ও অসংগতি সত্ত্বেও আমরা এ'কে ভালোবাসি। স্থাপত্যের মধ্যে সময়ের জগাখিচুড়ি দেখে তাকে এড়িয়ে যাবার জন্যে অন্য রাস্তা ধ'রে চম্পট দিতে হয়, আমরা এসব বর্বরতা উপেক্ষা করার চেষ্টা করি। আমরা ভালোবাসি এই ভূমি। যদিও কোনো জঙ্গলের মধ্যে বা জনবহুল জায়গায়, কোনো রাজকুমারের চটকদার ছবি আমাদের আতঙ্কিত করে তোলে, তা-

তুলুক, আমরা সেটা এড়িয়ে সব-কিছু তুচ্ছ ক'রে উলেন আচ্ছাদিত ভূমির উপরে গিয়ে বেড়াই—অপূর্ব সৌন্দর্য উপভোগ করি।

অনেক সময়ই এই সৌন্দর্য একটু অভিজাত্যমণ্ডিত এবং জার্মান তো বটেই। আমি ভুলতে পারিনে যে, এই প্রাসাদের চারধারে হাজার-হাজার চাষী দুর্দশার মধ্যে বাস করেছে, এবং সেইজন্যেই এটা গড়া সম্ভব হয়েছে—কিন্তু এ সত্ত্বেও, আবার বলি, এসব সত্ত্বেও এটা চমৎকার। জন্মদিনের উৎসবের সময় টেবিলে রাখবার মত অ্যালবাম এটা নয়; সে রকম অ্যালবাম অজস্র আছে। তার উপর ও-জিনিস তো কখনো সম্পূর্ণ জিনিস হতে পারে না। জার্মানীর এমন জায়গা, এমন-একটি কোণ, এমন-একটি গ্রাম্য দৃশ্য থাকতে পারে, ফটোগ্রাফার যা তার ক্যামেরায় তুলতে পারেনি; তা ছাড়াও তো একটা কথা আছে—প্রত্যেকের মনের মধ্যে ব্যক্তিগত একটা জার্মানী তো আছেই! আমার জার্মানী হচ্ছে উত্তরদিকে। এর আরম্ভ হচ্ছে মধ্য-জার্মানী থেকে, যেখানে ছাদের উপরের হাওয়া বেশ পরিষ্কার, এবং যতই উত্তর দিকে যাওয়া যাবে ততই তোমার হৃদ্‌স্পন্দন বেড়ে উঠবে, তুমি পেয়ে যাবে সমুদ্রের সুগন্ধ। সেই সমুদ্র—যা নাকি এখনো কয়েক কিলোমিটার দূরে, তা সত্ত্বেও ঐ কুটীরগুলিরও তো বিশেষ তাৎপর্য আছে; আমরা সেখানে দাঁড়াই, কেননা এর পরেই সমুদ্র। আমরা সমুদ্রের জন্যেই এখানে এসেছি। ঝোপঝাড়ের উপর দিয়ে হাওয়া বয়ে চলেছে, আমাদের দাঁতে-দাঁতে লেগে মসৃণ বালু কিড়কিড় করছে।

সমুদ্র। আমাদের শিশুকালের স্মৃতি ভুলবার নয়। সেখানে যে সময় কাটিয়েছ তার একটি ঘণ্টাও মন থেকে উপড়ে ফেলতে পারবে না। এবং প্রতি বছরের সেই "শুভদিন!" শুনবার আনন্দ মুছে ফেলতে পারবে না। ভূমধ্যসাগর যদি অমন সুনীলসুন্দর...তাহলে জার্মান সাগর! এবং বীচ-গাছের সেই জঙ্গল; এবং সেই শ্যাওলা, যার উপর দিয়ে হাঁটাটা মখমলের উপর দিয়ে চলার মতন, নিজের পায়ের শব্দই শোনা যায় না। আর, জঙ্গলের মধ্যের সেই ছোট পুকুরটা, যার জলের উপর নেচে-নেচে বেড়াচ্ছে ডাঁশ পোকা, গাছগুলো ছোঁয়া যায় না, কিন্তু হাওয়া যখন তার মধ্যে গর্জন করতে থাকে, তখন তার ভাষাটা বোঝা যায়···না, জার্মানী সব বিষয়ে সবার উপর টেক্কা দিচ্ছে না; সবার ঊর্ধ্বেও নয়। কখনোই না। কিন্তু এ থাকতে চায় সবার সঙ্গে। এই আমার স্বদেশ। এখানে স্বীকারোক্তিটা করা যাক···

হ্যাঁ, এই দেশকে আমরা ভালোবাসি।

এবার আমি কয়েকটি কথা বলতে চাই—

যারা নিজেদের "জাতীয়তাবাদী" বলে তারা মিথ্যা কথা বলে; তারা মধ্যবিত্ত-সমরবাদী ছাড়া কিছু না; তারা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্যে এই দেশের উপর ও এর ভাষার উপর একচেটে আধিপত্য করছে। কেবল মর্নিং-কোট গায়ে দেওয়া সরকারি প্রতিনিধিরা, প্রফেসররা, স্টীল হেলমেটধারী পুরুষ ও মহিলারা মিলেই জার্মানী নয়। আমরাও এখানে আছি।

তারা মুখ হাঁ ক'রে চীৎকার করে, "জার্মানীর নামে···!" তারা চ্যাচায়: "এ দেশ আমরা ভালোবাসি, আমরাই ভালোবাসি, তোমরাও বাসো।" এ কথা সত্যি না।

দেশাত্মবোধ ব্যাপারে আমরা সকলকে আমাদের অতিক্রম করে যেতে দিয়ে থাকি—আমরা আন্তর্জাতিকতা অনুভব করি। দেশপ্রীতির ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদেরকে কেউ অতিক্রম করে যাচ্ছে না; ল্যাণ্ড-রেজিস্টারে যার নামে জমির স্বত্ব লেখা আছে, সেও না। এ জমি আমাদের।

তারা আমার কাছে অত্যন্ত ন্যক্কারজনক, তারা—যারা নিজের দেশপ্রাণ বলে মনে করে, কিন্তু আসলে যারা ঠিক তার বিপরীত। তারা এই ভূমির এতটুকু কল্যাণ করে না, তারা কেবলই এর টুকরো-টুকরো অংশ ধ'রে টানাটানি করে, এর অরণ্য কেটে তছনছ করে, এর আকাশ এর ঢেউ নিয়ে কাড়াকাড়ি করে। ঠিক সেই রকম উৎসাহের সঙ্গে তারা এইসব করে যে উৎসাহ নিয়ে আমরা দেশপ্রাণতা থেকে সরে থাকতে চাই। আমরা দেশের পতাকাকে কানাকড়ি দাম দিইনে—কিন্তু আমরা আমাদের দেশকে ভালোবাসি।

রাস্তা চলতে চলতে জাতীয়-পার্টিরা যেমন ড্রাম পিটতে-পিটতে চলে, সেই অধিকার নিয়েই আমরা—অবিকল সেই অধিকার নিয়েই আমরা লিখি ও বক্তৃতা দিই ঐসব জাতীয়-গাধাদের চেয়ে অনেক ভালো জার্মান ভাষায়। আমাদের জন্ম এখানে। ঠিক ওই অধিকার নিয়েই আমরা নদীর উপর, অরণ্যের উপর, সমুদ্রতটের উপর, তৃণভূমির উপর, বাড়িঘরের উপর আমাদের দাবি জানাই। জার্মানীকে ঘৃণা করার অধিকারও আমাদের আছে, কেননা জার্মানীকে আমরা ভালোবাসি। জার্মানী সম্বন্ধে যখন কেউ কিছু বলে তখন আমাদের কথাও ভাবতে হবে। আমরা কমিউনিস্ট হই, ইয়ং

সোশ্যালিস্ট হই, প্যাসিফিস্ট হই, যেই হই-না কেন, সর্ব রকমের আমরা সকলেই স্বাধীনতা ভালোবাসি; লোকে যখন "জার্মানী"র কথা ভাবে তখন আমাদের কথাও ভাবতে হবে। জার্মানীতে কেবল জাতীয়-পার্টিরাই আছে এ রকম ভাণ কার খুবই সোজা।

জার্মানী হচ্ছে একটি নানাভাবে বিভক্ত করা দেশ। আমরা তার একটা অংশ।

এর মধ্যে একটা বড়রকমের পার্থক্য হচ্ছে এই-যে, কোনো পতাকা ছাড়াই, কোনো সমরসম্ভার ছাড়াই, কোনো ভাবাবেগ এবং কোনো উন্মুক্ত তরবারি ছাড়াই একটি জিনিস স্থির আছে, তা হচ্ছে পিতৃভূমির প্রতি আমাদের নীরব অনুরাগ।



এটি একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ও চমকপ্রদ বই। কয়েক শতাব্দীর জার্মান সাহিত্যের আনুপূর্বিক কথা এতে ধারাবাহিক ভাবে বলা আছে। সপ্তম শতকে লেখা হিলডেব্রান্‌ড-এর গান থেকে আরম্ভ ক'রে কাণ্ট, লেসিং, হারডার, গেটে, শিলার, ক্লাইস্ট, ব্রেখ্‌ট, মান্‌, বেন্‌ প্রভৃতি আরও অনেক জার্মান গ্রন্থকার, কবি ও দার্শনিকের রচনার নিদর্শন এতে উদ্‌ধৃত আছে। এই রচনাসংগ্রহে বিভিন্ন সাহিত্যিক আন্দোলন ও সাহিত্য-যুগ সম্বন্ধে যে ব্যাখ্যামূলক বিবরণ দেওয়া হয়েছে, যাঁরা জার্মান সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত তাঁদের কাছেও তা বিশেষ মূল্যবান সম্পদ বলে গণ্য হবে। এই বই জার্মানির ইতিহাস, তার প্রাণবানতা, তার সংস্কৃতি, তার সামাজিক জীবন প্রভৃতি জ্ঞাতব্য বহু বিষয়ের একটা দলিল-বিশেষ।

